এই আবেদনের প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "The man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother." এই বাঙালী মায়ের পরিচয় মধুসূদন তাঁর নিজের মায়ের মধ্য দিয়েই পেয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু বাঙালী মায়ের মধ্যেও ভগবতী দেবী অনন্যা। তাঁর সন্তানগৌরবের চেয়ে বোধ করি এই কারণেই বিদ্যাসাগরের মাতৃ-গৌরব বেশী ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণায়*

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আজ আপনারা হরিকৃষ্ণমন্দিরে এসেছেন এক পরম শুভদিনে—সংস্কৃতে যাকে বলে "পুণ্যাহ"। আজ বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব—কত শত ধর্মার্থীই না আজ সেখানে আসবেন সেই পরম পুরুষের বিদেহী আশীর্বাদের স্পর্শ পেতে। আমি আপনাদের কাছে আজ এই মহান যুগাবতার সম্বন্ধে মাত্র দুচারটি কথা বলব—বলতে আনন্দ হয় বলে। তাঁর সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আমার ভক্তি-অর্ঘ নিবেদন না ক'রে যদি ব্যক্তিগত ভাবে বলি কী ভাবে তিনি আমার জীবনে এসেছিলেন "নিশার ঘন তিমির দিয়ে ঊষা যেমন নেমে আসে"—তাহ'লে আশা করি কারুরি আপত্তি হবে না—আরো এই জন্যে যে এতে ক'রে তাঁর পুণ্য প্রভাবের একটা দিক উজ্জ্বল করে দেখানো হবে—যাকে বলা যেতে পারে জিজ্ঞাসুর কাছে আপ্তকামের পথনির্দেশ। কীভাবে শত শত অন্বেষুর আঁধার জীবন এই মহাপুরুষ তাঁর আলোর দানে ধন্য করেছিলেন তার খানিকটা পরিচয় মিলবে যদি আমাকে আপনারা সাধারণ জিজ্ঞাসুদের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করেন।

আমার বয়স তখন হবে তের কি চোদ্দ। আমার এক পিসতুত ভাই নির্মলেন্দু লাহিড়ি (যিনি পরে অভিনেতা হ'য়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন) ছিলেন ঠাকুরের ভক্ত। তাঁর সঙ্গে আমি প্রায়ই তর্ক করতাম ঈশ্বর যে আছেন তা না জেনে মেনে নেওয়ার মানে হ'ল অন্ধ বিশ্বাস। নির্মলদা উত্তরে উদ্ধৃত করতেন ঠাকুরের কথা "ওরে পাকা ছেলে! বিশ্বাসের আবার কবে চোখ থাকে? হয় বল্ জ্ঞান—যে দেখেছে, নয় বিশ্বাস—যে দেখে নি কিন্তু জ্ঞানীর এজাহারে যার আস্থা আছে। বিশ্বাস মাত্রেই তো অন্ধ।"

"কিন্তু নির্মলদা, তেমন জ্ঞানী কোথায় যাঁর এজাহার মানব? অন্ততঃ এযুগে তো চোখে পড়ে না—"

"থাম্ থাম্ পাকা ছেলে! না জেনে ডেঁপোমি করিস নে, পড়"—ব'লেই আমার হাতে গুঁজে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথমভাগ।

বইটি পড়তে না পড়তে কেন জানি না বুকের মধ্যে যাকে বলে "অশ্রুসাগর উঠল দুলে দুলে দুলে ফুলে ফুলে।" কী ভাবে—তার কেমন ক'রে বর্ণনা করি? খানিকটা বলা যেতে পারে উপমা দিয়ে। বিলেতে একটি রঙ্গমঞ্চে একবার দেখেছিলাম

* গত ১৮ই মার্চ সকালে শ্রীদিলীপকুমার রায় সমবেত শতাধিক শ্রোতা ও শ্রোত্রীদের মধ্যে এই ভাষণটি দিয়েছিলেন—পুনার হরিকৃষ্ণমন্দিরে। তিনি ভাষণটি দিয়েছিলেন ইংরেজীতে, এখানে তার সারাংশ তিনি নিজেই বাংলায় লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। —উঃ সঃ

একটি মরুভূমির দৃশ্য। কিন্তু হঠাৎ প্রেক্ষাগৃহের বাতি গেল নিভে—বাতি জ্বলতে না জ্বলতে দেখি কি—ওমা! ঘূর্ণ্যমান রঙ্গমঞ্চের কল্যাণে সুন্দর বাগান বাড়ি—নদীতীরে!! এক মুহূর্তে জাদুকরের জাদুদণ্ডের ছেঁাওয়ায় সব কিছু যেমন ওলট পালট হ'য়ে যায় 'কথামৃত' আমার কিশোর মনে ঠিক তেমনি ওলটপালট এনে দিল।

কিন্তু হ'লে হবে কি, অবিশ্বাস হ'ল সেই জাতের তৈরী যার বিশেষণ হচ্ছে—"মরিয়া না মরে রাম"। নির্মলদাকে বললাম; "শ্রীম লিখেছেন বটে, কিন্তু শুধু স্মৃতিশক্তির উপর ভর ক'রে তো। রিপোর্ট ভুল—"

"ফের, পাকা ছেলে? শ্রীম মহাযোগী, মহাভক্ত—অসামান্য তাঁর স্মৃতিশক্তি। তিনি ঠাকুরের কথা যা যা শুনতেন রোজ ফিরে এসেই লিখে রাখতেন তাঁর দিনপঞ্জিকায়। দেখবি?"

"দেখব না?" ব'লে মহাউৎসাহে নির্মলদার সঙ্গে গেলাম শ্রীম-র ওখানে। গিয়ে যা দেখলাম আমার 'তীর্থংকর' দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছি, 'Among the Great' বইটিতেও আছে। কাজেই সেসবের পুনরুক্তি করব না, কেননা আপনাদের মধ্যে অনেকেই সে-বিবৃতি পড়েছেন, কিম্বা ইচ্ছা করলে পড়তে পারেন। শুধু একটি কথা বলব এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের সম্বন্ধে যাঁর লেখা প'ড়ে লক্ষ লক্ষ জিজ্ঞাসুর মন ঝুঁকেছে শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যোজ্জ্বল ব্যক্তিরূপের দিকে।

শ্রীম আমার মুখে যেই শুনলেন যে, আমি তাঁর কাছে এসেছি ঠাকুরের কথা শুনতে—সেই তিনি চেঁচিয়ে ডাকলেন: "ওরে প্রভাস! আয় আয়—দেখে যা একটি ছোট ছেলে এসেছে আমার কাছে ঠাকুরের কথা শুনতে রে, ঠাকুরের কথা শুনতে!" ব'লেই আমার দিকে চেয়ে: "দেখ বাবা! দেখ—আমার গায়ে কাঁটা দিয়েছে।" আমি সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলাম—সত্যিই রোমহর্ষণ যাকে বলে। মনে হ'ল গুরুভক্তি বটে!

সেই থেকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির সামনে করতাম রোজ ধ্যান, ডাকতাম তাঁকে: "ঠাকুর! তোমার উপদেশ মেনে যেন চলতে পারি—সব ছেড়ে যেন ভগবানকে চাইতে পারি।" যেতাম বেলুড় মঠে ও দক্ষিণেশ্বরে প্রেরণা পেতে। সবচেয়ে বেশি প্রেরণা পেতাম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ছোট ঘরটিতে। পরে সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ প্রায় সবই দেখেছি, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ছোট শয়নকক্ষটিতে ঢুকতে না ঢুকতে মনে যেভাবে জেগে উঠত ভক্তির জোয়ার তেমনটি আর কোনো তীর্থে ওঠে নি—কেবল হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে ছাড়া। কিন্তু হরিদ্বারের গঙ্গা জীবন্ত করুণাধারা হ'লেও শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বর যেমন আমার কাছে চিরদিনই হ'য়ে এসেছে তীর্থের তীর্থ—তেমনি আজও তাঁর 'কথামৃত' হ'য়ে রইল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বেদ বা গীতা। কতবারই যে পড়েছি এ অপূর্ব বইটি—সারা জগতে যার জুড়ি নেই! আর পড়তে না পড়তে হৃদয় হয়েছে উর্ধ্বমুখী। এখনো প্রায় রোজই কয়েক পাতা পড়ি এ-বইটি থেকে। আপনারা সবাই পড়বেন এই বইটি বাংলায় কিম্বা ইংরাজিতে—'Gospel of Sri Ramkrishna' নিখিলানন্দের লেখা! আমি মাঝে মাঝে ব'লে থাকি যে যদি আমাদের "সেকুলার" গভর্ণমেণ্ট কোনোদিন আমার হিন্দু ভক্তিপ্রিয়তায় রুষ্ট হ'য়ে আমাকে পুলিপোলাও চালান দেন আর কৃপাভরে বলেন সে-দ্বীপান্তরে মাত্র একটি বই সঙ্গে নিতে পারব, তবে আমি শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঁচখণ্ড বাঁধিয়ে পুরে নেব আমার নির্বাসিত জীবনের উপজীব্য স্বরূপ।

শেষে কেবল আর একটি কথা বলব। এযুগে অনেকের মুখেই শুনতে পাই—"সবই তো বিজ্ঞানের হাতে, আধ্যাত্মিকতার দৌড় কতটুকুই বা।"

উত্তরে শুধু বলব : "যিনি জেগে না ঘুমোতে চান, চোখ চেয়ে পথ চলতে চান তিনি যেন শুধু একটিবার ভাবেন কী বিপ্লব জগতে ঘটে গেছে শুধু একটি পূজারী ব্রাহ্মণের তপস্যায়—যাঁর না ছিল পুঁথিপড়া পাণ্ডিত্য, না লেকচারের হাঁকডাক বা লেখার মুন্সিয়ানা। অথচ এই একটি মানুষ তাঁর অশোক শিষ্য অগ্নিপুরুষ বিবেকানন্দের মাধ্যমে সমস্ত জগতে আজ প্রণম্য বলে গণ্য হয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের লোকসেবা এমনকি নাস্তিকেরাও প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ "সেকুলার" নীতিবাদ প্রচার না করা সত্ত্বেও। জগতে ধর্মের বহু ব্যভিচার হয়েছে সব দেশেই। ফলে অনেক চিন্তাশীল মানুষই মনে আঘাত পেয়ে আজকের দিনে কান্না শুরু করেছেন যে ধর্ম অসহিষ্ণুতার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হ'য়ে জগতের বহু অহিতসাধন করেছে। অভিযোগটা মিথ্যা, কারণ ধর্মের স্বভাব ধারণ করা—"ধারণাৎ ধর্ম ইত্যাহু:"—বলা উচিত ছিল ধর্মের নামে গোঁড়ামি করেছে অনিষ্ট। সিন্ধুউদার ঠাকুর তাই পই পই ক'রে মানা করতেন—"মতুয়ার বুদ্ধি করিস্ নি রে! নিজের পথে চল্ কিন্তু আর সবাইয়ের পথই ভুল এমন কথা বলিস্ নি।"

জগতে অসহিষ্ণুতার সব চেয়ে বড় প্রতিষেধক—খাঁটি ধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন এই খাঁটি ধর্মের অনন্যসাধারণ উদ্‌গাতা, উদারতার মূর্তিমান বিগ্রহ। গোঁড়ামিকে তাই তিনি চাবুক মেরেছেন বারবারই তাঁর সহজ সরল কিন্তু তীব্র চলতি ভাষায়। আর তাঁর কথায় যে "পাহাড় ট'লে যেত" তার কারণ তিনি পেয়েছিলেন ভগবতীর "চাপরাশ"। ফলে তিনি আজ সর্বদেশেই অর্থার্থীর না হোক—আর্ত জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীর প্রণাম পেয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে তাই শুনুন গাই আজ তাঁর পুণ্য চরণে প্রণাম ক'রে :

একলা পথের পান্থ হ'য়ে সব পথিকের সঙ্গ নিলে।
"বাসলে ভালো মিলবে আলো সব পথেই—" এ-মন্ত্র দিলে।

কাটলে বাঁধন পরতে রাখী,
তোমায় বলে কি বৈরাগী—

প্রাণমৃণালে যার ফলে নীলকমল প্রেমের মন্দানিলে!
ছাড়লে নিখিল আনতে টেনে নিখিলনাথে এ নিখিলে॥

অঢেল মেলে মোহের মুনি, যশের যোগী শক্তি-অধীর।
কোটির মাঝে গোটিক মেলে আত্মভোলা প্রেমের ফকির।

তাই তো হ'য়ে সর্বহারা
ভাঙলে কালোর পাষাণ-কারা,

অহংকারের মরণ সেধে অমরণীর গান গাহিলে।
সবার তরে আপন-পরের সীমারেখার দাগ মুছিলে॥

সংস্কৃত-শিক্ষা প্রসঙ্গে

স্বামী জীবানন্দ

আজকাল প্রায়ই অনেকের মুখে একটা কথা শোনা যায়, যা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে অর্থের সন্ধান দেয় না তা শিখে কোন লাভ নেই। অর্থাৎ অর্থকরী বিদ্যাই প্রয়োজনীয়, অন্য বিদ্যা বর্জনীয়। ইদানীং বিদ্যার লাভালাভ বিচার করা হয় অর্থোপার্জনের মাধ্যমেই। মা সরস্বতীর স্থান মা লক্ষ্মীই প্রকারান্তরে অধিকার করে নিচ্ছেন! বিদ্যা যে জ্ঞান অর্জনের জন্য তা আমরা ভুলতেই বসেছি।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার বিষয়ে ছাত্রদের বেশ পরিশ্রম করতে হয়, অথচ ইহা এমন একটি জিনিস

যা এত কষ্ট করে শেখা হবে—কিন্তু জীবনে টাকা রোজগারের উপায় তা বাংলাতে পারবে না। এটি নিশ্চয়ই দুঃখের বিষয়। তথাপি টাকাই জীবনের সব নয় এবং অর্থোপার্জনই মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে না আর হওয়া উচিতও নয়। আংশিক প্রয়োজন হয়তো অর্থের দ্বারা মিটতে পারে। এ দিকটি ছাড়া জীবনের আরও বহু দিক রয়েছে, সংস্কৃতের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক অতীব নিগূঢ়। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার কথা ধরা যাক। আজ পৃথিবীর নানা দেশ ভারতের কাছ থেকে শান্তির বাণী শোনবার জন্যে ঐকান্তিক আগ্রহে উৎকণ্ঠিত কেন? এর কারণ ভারতের যুগযুগ-বাহিত সভ্যতা ও ঐতিহ্যের মধ্যে একটা অদ্ভুত জীবন-দর্শন রয়েছে যার মূলকথা হচ্ছে বিশ্বমৈত্রী, প্রেম, কল্যাণ। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির উৎস আমাদের বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্‌, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ। এগুলি তো সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সংস্কৃতের সঙ্গে ভাল পরিচয় না থাকলে ভারতীয় ঐতিহ্যের নিগূঢ় মর্মগ্রহণ কঠিন। আর এই মর্মগ্রহণ কি কম প্রয়োজনীয় জিনিস?

আবার ভারতের প্রধান ভাষাগুলির বেশির ভাগই সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত। বাংলা, হিন্দী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, তেলেগু, মালয়লম্‌ প্রভৃতি ভাষার শব্দসম্ভার নিয়ে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় না কি, যে সংস্কৃতই অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার আদি-জননী? বিরাট হিমাদ্রির বরফপুষ্ট জলধারায় গঙ্গা যমুনা সিন্ধু ব্রহ্মপুত্রের মতো এরা সংস্কৃতের অমৃতনিশুন্দিনী শক্তিতে সঞ্জীবিত। বাংলা ভাষার যে কোনও একখানা বই নিয়ে লক্ষ্য করলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, শতকরা ৮০% ভাগেরও বেশী তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দে পুস্তকখানি পূর্ণ, তা ছাড়া রূপান্তরপ্রাপ্ত অর্থাৎ তদ্ভব শব্দসংখ্যাও নগণ্য নয়।

অনেকে হয়তো বলবেন সংস্কৃত থেকে বাংলার উৎপত্তি হয়নি, হয়েছে প্রাকৃত থেকে। তাহলেও প্রাকৃতের আলোচনায় ঐ একই জিনিস এসে পড়ে। আর সংস্কৃতের শব্দসম্পদে বাংলা যদি পরিপুষ্টি লাভ করে থাকে তাতেই বা হয়েছে কি, সেগুলি তো এখন বাংলার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। চিরদিন কি সংস্কৃতের দ্বারস্থ হয়ে থাকতে হবে? বাংলা ভাষার স্বাধীন সত্তা এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকবে না? প্রাচীনা সালঙ্করা পিতামহীর মতোই কি নবীনা পৌত্রী বিভূষিতা হবে? না তা নয়—নবীনা নব্যভাবেই সুসজ্জিতা হবেন। ভাষার ক্ষেত্রেও গতানুগতিকতা ছেড়ে নবনব রূপে নবনব ভাবে ছুটে চলবে প্রগতির দিকে। বদ্ধ জলের মতো নয়, খরস্রোতা তটিনীর মতো নানা তরঙ্গভঙ্গে লীলায়িত হবে ভাষার গতি। তা নইলে অচল পঙ্গু ভাষার কোন মূল্য নেই। জগতের বিভিন্ন ভাষার শব্দৈশ্বর্য পরিপাক করবার শক্তি যে ভাষায় বর্তমান সেই-ই তো প্রাণবন্ত। সঙ্কীর্ণতা যত নাশ হবে ভাষার পরিধিও হবে তত বিস্তৃত। নবীন ভাব গ্রহণ করতে হবে বলেই কি জননীর জননীত্ব অস্বীকার ক'রে তাঁকে নির্বাসিতা করতে হবে? জননীকে গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিতা করে পরম শ্রদ্ধায় পূজা করলে গৌরব বাড়বে বই কমবে না। যে নবীন প্রাচীনকে ধ্বংস ক'রে নবীনত্বের বড়াই করে সে মূর্খ; কিন্তু যে প্রাচীনকে যোগ্যস্থান দিয়ে তার ভাবটিকে নবীনতার রঙে রাঙিয়ে তোলে সেই-ই বিজ্ঞ। তার সৌধ হয় দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, বালির বাঁধের মতো তা সহজেই ভেঙে পড়ে না।

ইয়োরোপে গ্রীক ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার সঙ্গে ইংরেজীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, কিন্তু সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙলার যে সম্পর্ক তা তার চেয়ে বেশী গভীর ও ব্যাপক। শুধু ভাষা কেন, আমাদের অস্থিমজ্জায় এর প্রভাব বিদ্যমান। কি সামাজিক, কি নৈতিক, কি আধ্যাত্মিক সব

জায়গাতেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব সুপরিস্ফুট। সংস্কৃতের অনুপ্রেরণা যুগ যুগ ধরে আমাদের জাতীয় প্রাণ সঞ্জীবিত করেছে। এখন যদি এই প্রভাব ও অনুপ্রেরণা থেকে আমরা বিচ্যুত হই, তবে আমাদের প্রাণের রস যে বিশুষ্ক হয়ে যাবে তাতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। জাতির সাংস্কৃতিক মেরুদণ্ড, সমাজের ভিত্তি ভূমিসাৎ হবে। ধর্মময় ভারতীয় জীবনের স্রোত ভিন্নমুখে প্রধাবিত হলে পতন অবশ্যম্ভাবী—সমস্ত চিন্তাশীল এবং কল্যাণকামী ব্যক্তিই এ বিষয়ে একমত। বাংলা ভাষার সহিত সংস্কৃতের যে সম্বন্ধ ভারতের অধিকাংশ ভাষার সহিত সংস্কৃতের সম্বন্ধ সেইরূপই। স্বাধীন হওয়ার পর বিদেশে আমাদের মর্যাদা বেড়েছে এবং দেশে বিদেশে সকলেই আমাদের কাছে অনেক কিছু আশা করছে। এ সময়ে আমাদের কৃষ্টি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন প্রয়োজন, সেইজন্য অত্যন্ত নিষ্ঠা ও মনঃসংযোগ সহকারে সংস্কৃত-শিক্ষা আবশ্যক।

আইন, গণিত, বিজ্ঞান ও শাসনতন্ত্রের পারিভাষিক শব্দগুলি সমস্তই সংস্কৃত থেকে গ্রহণ অথবা সংস্কৃতের সাহায্যে তৈরী করা হচ্ছে। পারিভাষিক শব্দগুলি বুঝতে গেলেও সংস্কৃতশিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার্য।

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের বেদবেদান্তকে মঠ মন্দির থেকে বের করে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি সংস্কৃত ভাষা সকলকে পরম যত্নে ও আগ্রহে শিখতে ও সংস্কৃতের অমূল্য রত্নরাজি দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করে সাধারণের মধ্যে প্রচার করতে বলতেন। সংস্কৃত ভাষাকে সহজ, সরল, যুগোপযোগী করার বাসনাও তাঁর অন্তরে ছিল। জাতিকে তুলতে গেলে সংস্কৃতের ব্যাপক প্রসার যে চাই তা তিনি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন।

'সংস্কৃত ভাষা শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের অমূল্য সম্পদ। যে ভাষার মাধ্যমে ব্যাস-বাল্মীকি-মনু, ভাস-ভবভূতি-কালিদাস, চাণক্য-শংকরাচার্য রামানুজ তাঁদের জ্ঞানভাণ্ডার পরিবেশন করেছেন সে ভাষা কত গৌরবের তা ভাববার নয় কি? প্রাচ্যের ষড়দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ এ সবের তুলনা কোথায়? রামায়ণ-মহাভারতের অপূর্ব চরিত্রগুলি স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের জাতীয় চরিত্রগঠনে সাহায্য করে আসছে। গীতা উপনিষদের সার্বভৌম উদারভাব সর্বজনগ্রাহ্য। বেদান্তই একমাত্র প্রকৃত সমন্বয়সাধক। এসমস্ত অমূল্য সম্পদ যদি অনাদর করে দূরে ফেলে রাখি তবে বেগুনওয়ালার মতো হীরকখণ্ডের মূল্য নিধারণ করতে কোনদিনই পারব না। পাশ্চাত্ত্যের জার্মানী প্রভৃতি দেশে সংস্কৃতের চর্চা খুব বেশী। আমাদের সংস্কৃতের প্রতি অনাদর স্থায়িরূপ ধারণ করলে এমন দিন আসতে বিলম্ব হবে না যখন বেদবেদান্তের একটা কথা শোনবার জন্যে পাশ্চাত্ত্য মনীষীর দিকে ঔৎসুক্যের সহিত দৃষ্টিপাত করতে হবে। তখন ভারতের উত্তরকালীনরা হয়তো শুনবেন বেদের উৎপত্তি ইয়োরোপেই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন পাশ্চাত্ত্যের আমরা বিজ্ঞান রাজনীতি প্রভৃতি গ্রহণ করব কিন্তু ভিক্ষুকের মতো নয়, বিনিময়ে আমরা দেব মানুষের অমূল্য সম্পদ্ আধ্যাত্মিকতার সন্ধান। বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে আমাদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা যতই থাক্ তাতে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু অন্যদেশের আধুনিক সাহিত্য ও সভ্যতার পল্লবগ্রাহিতা থাকলেই আমরা বিজ্ঞ আখ্যা লাভ করি। তথাকথিত অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও ভারতীয় আদর্শকে ধরতে না পেরেও বিজ্ঞ ব'লেই পরিচিত ও সম্মানিত!

আজকাল প্রাদেশিকতার বিষ পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র যেন দিন দিন পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। একটি রাজ্য তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যের ভাষাকে

দমিয়ে রাখবার জন্তে যে সব জঘন্ত কাজ করছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বা রাজ্যের অধিবাসী এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী হলেও একটি বিষয়ে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জাতির পরম ঐক্য রয়েছে তা হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা। অতএব সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক প্রচারে প্রাদেশিকতার জ্বালা-ময় বিষ থেকে ভারতবাসী অনেকটা মুক্ত হতে পারবে এবং ঐক্যও বাড়বে সন্দেহ নেই।

সংস্কৃত মৃত ভাষা নয়—এ ভাষা মরতে পারে না। এর নাম অমরভাষা—দেবভাষা। অমৃতের সন্ধান দেয় তাই অমর ভাষা। দৈবী সম্পদ, সাত্ত্বিকী বৃত্তি জাগায় বলে দেবভাষা। যাঁরা এই পরম পবিত্র ভাষাকে মৃত বলে উপেক্ষা করেন, তাঁদের মধ্যেই মৃতের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। সংস্কৃতে কথা বলা যায় না খুব কঠিন বলে এইরূপ একটা অভিযোগ আছে। কিন্তু স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রভাষার উন্নতির যেভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে ঠিক সেই রকমই যদি চেষ্টার ত্রুটি না থাকে তবে বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর দ্বারা এই কঠিন ভাষাকেই সহজ সরল কথ্য ভাষার উপযোগী করে তৈরী করা যেতে পারে। দক্ষিণ ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলী এ বিষয়ে আদর্শস্থল। রাষ্ট্র ও পণ্ডিতসমাজের সমবেত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় এ সমস্যার সমাধান অনায়াসেই হবে এবং সংস্কৃত বিদ্যাদ্বারা অর্থোপার্জনের পথও উন্মুক্ত করা যাবে।

সমস্ত দিক বিচার করে মনে হয় ভারতবর্ষে সংস্কৃত-শিক্ষা ব্যতীত আদর্শ শিক্ষা হতেই পারে না এবং উন্নতিও হবে ব্যাহত। যে সমস্ত শিক্ষাসংস্কারক সংস্কৃতকে বাদ দিয়ে শিক্ষাসংস্কারের চিন্তা করেন তাঁরা ভুলে যান গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে গাছ বাঁচে না। মূলো নাস্তি কুতঃ শাখা?

অপ্রকাশিত লোকসঙ্গীত

শ্রীঅমলেন্দু মিত্র, এম্‌-এ

[উদ্বোধনের ফাল্গুন, ১৩৬২ সংখ্যায় কতকগুলি অপ্রকাশিত লোকসঙ্গীত পাঠকপাঠিকাগণকে উপহার দিয়েছিলাম এই সংখ্যায় আরও কয়েকটি পরিবেশিত হল।]

দীনরঞ্জনের পদ—

নিম্নলিখিত কালী-সঙ্গীতগুলি "রতন লাইব্রেরীতে" পাওয়া গিয়েছে। কবিপরিচয় জানতে পারা যায় না। এঁর পদ বা গান পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে জ্ঞাত নই।

(১)

একতালা

অশান্ত পরাণে শ্যামা মা আমার কর শক্তি দান,
সঙ্কটেতে পড়ি, ডাকিমা শঙ্করী, সঙ্কটনাশিনী কর পরিত্রাণ।
ভ্রান্তিবশে দিন গেল ভবদারা, পূজি নাই শ্রীপদ হয়ে জ্ঞানহারা,
কুজন দুজন রিপু বাধা দেয় মা তারা, হৃদয়জ্বালা তারা কর গো নির্বাণ।
ঘুচাও নিরানন্দ, আনন্দদায়িনী দুর্লভ রাঙাপদ কর মা প্রদান।
ওমা দক্ষবালা, ঈশ্বর-ঈশানী, বিশ্বরূপধরা গিরিশগৃহিণী
তুমি পরমাপ্রকৃতি ভবপ্রসবিনি, পরমাণুমূল চেতনারূপিণী,
দাও মা চৈতন্ত শিবসোহাগিনি, শঙ্করবন্দিত-পদে দাও মা স্থান।

বৃথা কাজে দিন গেল মা বিমলা, নাশ দীনরঞ্জনের ভীষণ ভবজ্বালা,
সাঙ্গ হবে যেদিন কর্মভূমের খেলা (সেদিন) পাষাণের মেয়ে হয়ো না পাষাণ॥

(২)

ঝাঁপতাল

হৃদয়ে রেখেছি শ্যামা যত দুখ দিয়েছ মোরে,
পাষাণ হলেও যেতে গ'লে, বুকভাঙ্গা দুখ আছি ধরে।
সন্তানের সনে সর্বদা কেন কর মা প্রবঞ্চনা,
দুখ দিয়ে কি সুখে থাক, মুখ দেখে কি মন গলে না,
মার মায়া কি এমনি ধারা ডাকলে ছেলে, পায়না সাড়া,
সদাই কি বয় দুখের ভারা, প্রাণ কাঁদে কি এমনি করে ?
কুলহারা হইয়ে কালী, পাথারে ভাসি নিশিদিন,
নিতান্ত নিদয়া হয়ে নাশিবে না কি এ দুর্দিন,
কামদা কাঁদে কিঙ্কর, ভেসে যায় মা ধর ধর
আসিয়ে দুর্গতি হর মা, হররমা হরষঅন্তরে।
বাসে আর বাসনা নাই মা, রেখ না আর মায়াঘোরে
সাধিলে বাদ, মিটলা সাধ, থাকব কেন ফাঁদে পড়ে,
কেন মা যাতনা সব, বুক ভাঙ্গা দুখ হৃদে বব,
চরণ দুটি ধরে রব, ছাড়ব না আর মা তোমারে।
সুখ তরে এল সংসারে সন্তাপে দিন কেটে গেল,
মা হয়ে সন্তানে শ্যামা এত দুখ কি দেওয়া ভাল,
ভজনহীন রঞ্জনের ভালে, সুখ দিলে না কোন কালে
(এবার) থাকব তোমার চরণতলে, দেখব শমন লয় কি করে॥

(৩)

ঝাঁপতাল

এসেছ কদিনের তরে, জান না কিরে যেতে হবে
মনে ভেব না, এ ভবনে চিরদিন থাকিতে পাবে।
মোহিত হয়ে মায়াকুহকে ভাব কি রবে চিরকাল,
হরষে সদা মররে ঘুরে, ভাব না পিছে আছে কাল
কামিনীকাঞ্চনরসে নিয়ত তাহে আছ ভেসে,
জান না কিরে অবশেষে, পাতান হাট ভেঙ্গে যাবে।
অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে কওনা কথা কারো সনে,
দীন ভিখারী নিকটে গেলে চাওনা ফিরে তার পানে,
নিজ শুভকামনা কর সদা গরবে ফেটে মর
মনে ভাব হায় * * * *
গত হয়েছে কতকাল কত যে ছিল মহীতলে
কত কাণ্ড এ ব্রহ্মাণ্ডে হয়ে গেছে রে কালে কালে,
দুর্যোধন যে মানীশ্রেষ্ঠ, সেই গেছে পেয়ে কষ্ট,
সময় থাক্‌তে ভাব ইষ্ট, নইলে কষ্ট পেতে হবে।
ত্যজিয়ে তনু যেদিনে যাবে ত্যজিয়ে এ ধরাধাম
অনায়াসে তরিতে পার, যদি কয়বে হরিনাম,
ডাকিলে সেই কর্ণধারে, অবোধে যায় ভবপারে,
রঞ্জন অন্তরে তারে, ভাবে নাই কি হবে তবে॥

ভবতারিণীবন্দনম্

শ্রীশ্রীনিবাসকান্ত কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, সিদ্ধান্তরত্ন

(১)

যস্যাঃ পাদরজঃকণাভিরমরৈ রুক্ষীকৃতা মূর্ধজা
লব্ধুং যৎকরুণাকণানপি চিরং ধ্যায়ন্তি যাং যোগিনঃ।
রাজ্ঞী রাসমণির্যকাং সুরধুনীতীরে সমস্থাপয়দ্
বন্দে তাং ভবতারিণীং ভবভয়াচ্ছ্রীরামকৃষ্ণার্চিতাম্।

(২)

ব্রহ্মাদীনমরান্ কৃশাণুমরুতো জ্যোতিস্তমস্তারকাঃ
সূর্যাচন্দ্রমসৌ নভোদিননিশা বর্ষর্তুমাসগ্রহান্।
দৈতেয়ান্ মনুজান্ পশূংস্তরুলতায়ন্যানি সর্বাণি চ
সূতে সংহরতে প্রশাস্ত্যবতি যা তস্মৈ নমঃ কোটিশঃ॥

বঙ্গানুবাদ

যাঁহার চরণ ধূলি মাখিয়ে মস্তকে
করিয়াছে দেবগণ রুক্ষ কেশচয়,
যাঁহার করুণাকণা লভিবার তরে
করে ধ্যান যোগিগণ জীবন ভরিয়া—
যাঁহাকে পরমহংস রামকৃষ্ণদেব
পূজিয়ে লভিলা সিদ্ধি, রাণী রাসমণি
করেন প্রতিষ্ঠা যাঁর সুরধুনী তীরে,
বন্দি ভবভয়ে সেই ভবতারিণীকে। ১॥

বিরিঞ্চি মহেশ হরি যত দেবগণ
আলোক আঁধার তারা অনল অনিল,
রবিশশী নবগ্রহ আকাশ বৎসর
ষড় ঋতু বার মাস দিবা বিভাবরী,
দানব মানব আর পশু তরুলতা
অন্য যত কিছু ভবে করিছে বিরাজ
তা সবে করেন যিনি সৃজন পালন
শাসন সংহার, আমি কোটি কোটি বার
সেই ভবতারিণীকে করি নমস্কার। ২॥

লোয়ন-লাখা*

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এম্‌-এ

সৌরাষ্ট্রের সন্তসমাজে লাখা-লোয়নকে খুব উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। কথিত আছে এঁরা বিক্রম সংবতের ১৩০০।১৪০০ সনের লোক, সৌরাষ্ট্র-স্থিত হালার প্রান্তের জামখম্ভালিয়া গ্রাম ছিল এঁদের বাসভূমি। লোয়ন কামারের মেয়ে। লাখা গোয়ালা যুবক। লোয়ন ছিল পরমাসুন্দরী; তার সারা

* 'কল্যাণ' পত্রিকার জুলাই, ১৯৫০ সংখ্যায় শ্রীআনন্দজী কালিদাস বাঘেলালিখিত 'ভক্ত-গাথা—সন্ত লোয়নলাখা' অবলম্বনে।

অঙ্গ দিয়ে যেন সৌন্দর্য ঝরে পড়ত। নিজের দৈহিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে তার সচেতনতা কম ছিল না। সর্বদাই সে যেন গর্বোন্মত্ত হয়ে থাকত। লাখাও ছিল সুন্দর শক্তিশালী যুবক। সমস্ত গ্রাম তার ভয়ে ভীত হয়ে থাকত। এই যুবক-যুবতীদ্বয়ের আচরণ অনৈতিক ও সমাজ-ধর্ম বিরোধী হলেও মুখ ফুটে কেউ কিছুই বলত না।

চৈত্র মাস। সৈলনসী নামক একজন প্রসিদ্ধ সাধুর আম্থস্তালিয়া গ্রামে পদার্পণ হয়েছে। লোক দলে দলে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে চলল। গ্রামের মহিলারা ঘড়া করে নদী হতে জল আনার সময় পথের নানা স্থানে একজোট হয়ে উক্ত মহাত্মার বিষয়ে আলাপ করছিল। লোয়নও ঘড়া নিয়ে জল ভরতে যাচ্ছিল। মাঝপথে থেমে সেও তাদের কথাবার্তা শুনতে লাগল। এক নারী ব্যঙ্গভরে লোয়নকে জিজ্ঞাসা করল,—"লোয়ন বোন! তুমি মহাত্মাকে দর্শন করতে যাবে না?"

লোয়ন কটাক্ষভরা ব্যঙ্গের অর্থ বুঝে বলল—"যাই যদি তবে আটকায় কে?"

অপর নারী উত্তর করল,—"কেন? লাখা ভাই আর কে?"

এই কথায় লোয়নের হৃদয় যেন তীরবিদ্ধ হল। জীবনে এই প্রথম নিজের চরিত্র-হীনতার প্রতি তার দৃষ্টি পড়ল। আচরণের প্রতি মনে মনে ঘৃণা জন্মাল। তাকে অত্যন্ত সংকুচিতা হতে দেখে এক বৃদ্ধা অতি স্নেহপূর্ণ ভাষায় বললেন,—"লক্ষ্মী লোয়ন! দোষ নিস্ নি মা! ভগবান তোকে রূপ ও সৌন্দর্য দিতে এতটুকুও কার্পণ্য করেন নি। এই গ্রামের সমস্ত নারীর তুই শোভা। মা! যৌবন মত্ততা আনে। জীবনের এই সময়টা খুব হুঁসিয়ারির সময়, খুব বুঝে সুঝে চলতে হয়। ভগবান তোকে কি সুন্দর শরীর দিয়েছেন। একে খারাপ পথে নিয়ে গিয়ে নষ্ট করিস নি। জীবনকে প্রভুর প্রেমের দিকে ঘুরিয়ে দে। তুই উদ্ধার হয়ে যাবি। মা! ভগবান বড়ই দয়ালু!"

লোয়নের দৃষ্টি খুলে গেল। মাথায় ঘড়া বসিয়ে সে সোজা সাধু-গোষ্ঠীর দিকে চলতে লাগল। বাড়ী ফেরার কথা মনেই রইল না। জনৈক সাধুর কাছে সাধু সৈলনসীর পরিচয় জেনে নিয়ে সে জনতা ভেদ করে নিঃসঙ্কোচে তাঁর চরণপ্রান্তে উপস্থিত হল। এখন সে সাধুর চরণধূলিরূপী গঙ্গাতে স্নান করে পবিত্র হতে চলেছে। সাধু সৈলনসী তখন রথ থেকে নামছিলেন। এক তরুণীকে আসতে দেখে সম্বর্ধনার্থ আগত গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করলেন,—"এ বোনটি কে?" গ্রামবাসী লোয়নকে দেখে সংকুচিত হল ও মহাত্মার সামনে লোয়নের জীবনের চিত্র অংকিত করতে লাগলো। ইতিমধ্যে লোয়ন সেখানে উপস্থিত। সাধু মহাত্মাকে কিভাবে প্রণাম-নমস্কার করতে হয় তাও তার জানা ছিল না। সাধু সৈলনসী যোগসিদ্ধিবলে লোয়নের মনের উথলিত ভাব বেশ করে বুঝে নিলেন ও তাকে উদ্ধার করতে কৃতনিশ্চয় হয়ে বললেন,—'আয় মা! তুই বাবাকে জল খাওয়াতে এসেছিস তো?"

লোয়ন অত্যন্ত করুণভাবে বলল,—"বাবা, আপনি এই পাপিনীর হাতের জল পান করবেন?"

সাধু মুক্তকণ্ঠে বললেন,—"হাঁ, হাঁ নিশ্চয়ই খাবো। মেয়ে ঘড়া ভরে জল খাওয়াতে এসেছে আর আমি খাবো না মা! ঘড়া নামা আর আমার জল খাওয়া। তোর নামটি কি মা?" সে খুব ধীরে ও সংকুচিত ভাবে বলল,—"লো-য়-ন। আমি কামারের মেয়ে বাবা।" সাধু বললেন,—"বাঃ বাঃ তুই তো দেখছি আমাদের মহাত্মা দেবায়নের জাত।"

জীবনে সে এই প্রথম সাধুর চরণে নিজের মাথা নত করল। মহাত্মাকে জল পান করিয়ে সে বলল,—"এই অভাগী মেয়েকে পবিত্র করো

বাবা।" লোয়নের চোখ হতে জল ঝরতে লাগল। কণ্ঠ গদ্‌গদ হয়ে উঠল। আর কণ্ঠের স্বরে মূর্তিমতী দীনতা প্রকটিত হল। লোয়ন আবার বলল,—"বাবা, আপনি কি এই অপরাধিনীর কুটীরকে চরণধূলি দিয়ে পবিত্র করবেন?" সাধু বললেন,—"ওখানে যাবার তো অবসর হবে না, মা। যেখানে আমার থাকবার স্থান হয়েছে সেখানে অবশ্যই যাবি।"

"ওখানে কি করে যাবো বাবা? গাঁয়ের সকলের চোখে আমি পতিতা, তিরস্কারের পাত্রী। আমার তো ভীষণ বদনাম। লোকে আমায় দেখলে ঘৃণা প্রকাশ করে।"

"মা, ভাবিস্ নি। ভগবানের শরণাপন্ন হলে কি কেউ পাপী থাকতে পারে? জীবনে ভুল কার না হয়? বড় বড় ঋষি মুনিদেরও ভুল হয়েছে। তুই তো অজ্ঞান বালিকা মাত্র। মানুষ কৃতকর্মের জন্য যখন পশ্চাত্তাপ করে, আর অমন কাজ করবো না বলে প্রতিজ্ঞা করে, তাঁর চরণে পতিত হয়, তখন দয়াময় ভগবান তাঁর পূর্বকৃত সব অপরাধ ভুলে যান, মার্জনা করেন। তুই বিচলিত হ'স্ নি। ওখানে অবশ্যই আসবি। ভগবন্নামকীর্তনের পুণ্য গঙ্গাধারা তোকে পবিত্র করে দেবে। তুই নিজেই শুধু যে ত্রাণ পাবি তা নয়, অপরকেও ত্রাণ করতে পারবি।"

সাধুর আদেশে লোয়ন আবার ঘড়া পূর্ণ করে স্বগৃহে ফিরে এল।

* * *

ভগবান ভাস্কর অস্তাচলে গেছেন। সাধু-শিবিরে ভগবানের আরতি হতে লাগল। ঘণ্টা ঘড়ি, শাঁখ ইত্যাদির ধ্বনিতে সারা গ্রাম মুখরিত হয়ে উঠল। লোয়ন আজ আর রূপগর্বিতা নয়, সাধ্বী সে। সাদা কাপড় প'রে নামকীর্তনের সময় সে মহাত্মা শৈলনসীর চরণপ্রান্তে শান্তভাবে উপবিষ্টা। লোয়ন পূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে নাম শুনে যাচ্ছিল। বয়োবৃদ্ধ মহাত্মা শৈলনসী কৃপা-পরবশ হয়ে তার মাথায় হাত রেখে বললেন,—"দেখ্, ভগবানের সামনে অনন্ত দীপ জ্বলছে। এই সময় দীপের শিখা ঊর্ধ্বগামী। এইভাবে তুইও মনকে নিরন্তর অতি উঁচুতে ভগবানের দিকে তুলে রাখ্। দীপের জ্যোতি উচ্চ-নীচ, শত্রু-মিত্র, আপন-পর ভেদ না করে সকলকেই সমানভাবে আলো দিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে তুইও হৃদয়ে সম-ভাব বজায় রাখ্‌বি।"

"বাবা, আমি অবলা জাতি·· ···"

"মা, তুই অবলা নোস্। তুই তো অনেক পথভ্রষ্টকে সত্যপথ দেখিয়ে সেই পথে নিয়ে যাবি। তুই দেবী। তুই ভগবানের অভয় শরণ নিয়েছিস্। সুরদাস, তুলসীদাস প্রভৃতিকে তোর মত দেবীরাই তো ভগবানের পথে নিয়ে গিয়েছিল। আজ থেকে তুই ভগবানের দাসী হয়ে গেলি। মা, সত্যে দৃঢ় থাকবি। এই কায়া-মায়ার মোহকে নাশ করবি। এই মায়াকে দূরে থেকে নমস্কার করা চাই। 'আমি' ও 'আমার' নেশাতে সত্যকে যেন ভুলিস্ না। শরীরের সৌন্দর্য বিদ্যুৎচমকের মতই অনিত্য। এর এতটুকুও বড়াই করিস্ নি।"

—"ভগবান ও আপনার দয়ায় আমি তাইই করবো।"—লোয়ন বললে।

—"আচ্ছা মা, বাপের এই তুচ্ছ দান তুই গ্রহণ কর।" এই বলে মহাত্মা শৈলনসী নিজের ভজন করবার তানপুরাটি লোয়নের হাতে তুলে দিলেন। বললেন, "মা, একে লজ্জা দিস্ নি। এর শোভা বাড়াতে থাক্‌বি। এর সাহায্যে নিত্য ভগবানের নাম কীর্তন করবি ও করাবি। জগৎ তোর সাথী হবে।"

কম্পিত হস্তে লোয়ন তানপুরাটি গ্রহণ করলো। অতি দীনভাবে বলল, "বাবা, আমি তো এর যোগ্য নই।"

মহাত্মা বললেন, "এই দুর্বলতা ত্যাগ কর্ মা।

এটিকে নিয়ে তুই নিদ্রিত সৌরাষ্ট্রকে জাগিয়ে তোল্। এই তানপুরা বাজাতে বাজাতে যখন নামকীর্তনে তুই মত্ত হয়ে যাবি তখন কত শত শত নরনারী সেই ধ্বনি শুনে পবিত্র হয়ে যাবে।"

সেখানে উপস্থিত সাধুরা তখন লোয়নের মধ্যে সাক্ষাৎ জগদম্বার দর্শন পাচ্ছিলেন ও মহাত্মা সৈলনসীর কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মহাত্মা বললেন, "ভগবানের সিংহাসনের সামনে প্রজ্বলিত অখণ্ড জ্যোতির তেজে লোয়নের এতকালের সঞ্চিত পাপ ভস্মীভূত হয়ে গেল।" কীর্তনান্তে সকলে ঘরে ফিরলেন।

আরও কয়েক দিন সেখানে থেকে স্থানত্যাগের পূর্বে মহাত্মা লোয়নকে বললেন, "মা, আমি চললাম। সাবধানে থাকিস্। প্রভুর নামের মহিমা বাড়াবি।" উত্তরে লোয়ন বলল, "বাবা, ভগবান ও আপনার দয়ায়, আমি, যেমন বলেছেন সেইভাবেই চলবো।"

সাধুদের বিদায় দেবার সময় লোয়ন কেঁদে ফেলল। লাখার প্রেমপাশ থেকে তাকে মুক্ত করতে না পারায় তার বাপ মা তাকে ফেলে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। এখন ঘরে একলা থেকে সেই তানপুরায় ঝংকার তুলে প্রভুর গুণ গাইতে গাইতে লোয়ন প্রেমাশ্রুতে তানপুরার প্রত্যেকটি তার সিক্ত করতে লাগল।

লাখা এদিকে চুরি করার উদ্দেশ্যে বাহিরে গিয়েছিল। কিছুদিন পরে সে ঘরে ফিরে এল। লোয়নের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সে এখন অত্যন্ত অধীর। গৃহপ্রাঙ্গণে পদক্ষেপ করতেই সে বিস্মিত হয়ে গেল। দেখল লোয়নের কোলে তানপুরা, হাতে খঞ্জনী, চোখে অবিরাম জলধারা। ভগবন্নাম-কীর্তনে সে মত্ত। তার কণ্ঠে শত কোকিলের স্বরের মধুরতা। অর্ধবিকশিত কমল-কোরকের মত তার অক্ষিপল্লব কম্পিত। প্রভু-প্রেমে বিগলিত হৃদয়ের অমৃতধারা অশ্রুবিন্দুরূপে গণ্ডদেশে প্রবাহিত। ভাব-সমাধিতে শরীর দোদুল্যমান। লোয়নের এই নবীন রূপ দর্শনে লাখা নিস্তব্ধ। সে নিঃশব্দে সেখানে বসে পড়ল। কিছু পরে চোখ খুলে লোয়ন দেখল সামনে লাখা বসে আছে। লোয়ন গম্ভীরস্বরে বলল, "এসো লাখা ভাই! কতক্ষণ এসেছ?........."

লোয়নের এই নির্বিকার শব্দ লাখার কাছে বড় ভাসাভাসা ঠেকল। সে বলল, "লোয়ন, আমি এখনই বাহিরে থেকে ফিরছি। কিন্তু এখন তোমাকে ছাড়া তো আমার জীবনে আর কিছুই ভাল লাগে না; যেখানেই যাই তোমার মোহিনী-মূর্তি সর্বদাই মনের মধ্যে নাচতে থাকে; একটু-খানিও তোমায় ভুলে থাকতে পারি না। সাধুনীর মত হাতে এসব নিয়ে কি করছ? এ সব ঢং কেন?"

"সাধু হওয়া সহজ নয় লাখা ভাই! এই কুমারী শরীর আমি পরের হাতে বেচে দিচ্ছিলাম। আমার মত অধম নারীর পক্ষে সাধু হয়ে যাওয়া কম বিস্ময়ের কথা নয়! আমি কি নিয়ে কি করছি তাতো নিজের চোখেই দেখছো। সাধুর আদেশ মত ভগবানের গুণগান করে জীবনের মল ধুয়ে ফেলছি, জীবনের মহার্ঘ মূল্য চুকিয়ে চলেছি।"

—"তোমার এই সব কথা আমার মোটেই ভাল লাগছে না। সাদা কাপড় প'রে তুমি নিজের সোনার শরীরকে লজ্জা দিচ্ছ। এ ভারী অন্যায়।"

—"লাখা ভাই! ভগবানের কৃপায় আমার মধ্যে যা বিষ ছিল তা এখন আর নেই। এতদিন প্রভুর অমূল্য দান এই মানবদেহকে কলঙ্কিত করে এসেছি। এখন একে আরও কলঙ্কিত করলে প্রভুর কৃপাকে অবহেলা করা হবে। এসো, এখন প্রভুর নাম-কীর্তনে তুমিও আমার অংশীদার হও। এখন আমাদের উভয়ের জীবন প্রভুর কৃপায় একসাথে প্রভুর নামে মেতে উঠুক।"

—"লোয়ন! পাগলের মত কি বকছ? হৃদয়

খোলো। প্রীতির প্রবাহ বহাও। লাখা এসব দেখতে শুনতে পারে না।"

এর পর লোয়ন তাকে তানপুরা সহযোগে গান গেয়ে শোনাল। বলল, "প্রভুর নাম কর। সৎসঙ্গের গঙ্গায় ডুব দাও, অনেক চুরি করেছ। কত প্রাণী বধ করেছ। গরীব দুঃখীর হৃদয়ের শাপ কুড়িয়েছ। মলমূত্র-ভরা হাড়মাসের খাঁচাকে খুব ভালবেসেছ। নরককে স্বর্গ মনে করেছ। এবার জাগো। সত্যপথে চলে ভগবানের স্মরণ নাও। তোমার আগের লোয়ন মরে গেছে। সাধুর কৃপায় সে নবজন্ম পেয়েছে। আমার সঙ্গে আর সেই পূর্বের ব্যবহার করো না। তা যদি না পার তবে নিজের বিবাহিত পত্নীর সঙ্গে প্রেম কর। আমাকে নিজের বোন মনে কর।"

লোয়নের কথায় লাখার হৃদয়ে যেন বজ্রপাত হল। সে বলতে লাগল, "লোয়ন তোমার জন্যে মা-বাপ, ঘরদুয়ার, স্ত্রী ও জাতি, লজ্জা-সরম সব ছেড়েছি, তোমার দাস হয়েছি আর আজ সেই তুমি আমায় উপদেশ দিতে আসছ! এই জেদ ছাড়, নয় তো ছ'টার সময় তোমায় হত্যা করব আর নিজের ওপর স্ত্রী-হত্যার পাপ নেব।"

—"তাতে আর কি? অনেক পাপ করেছো, না হয় তাতে আর একটি যোগ হবে। তাই হোক্।"

—"কি, তোমার মরণেও ভয় নেই?"

—"ভয় হয় পাপীর। মৃত্যু তো প্রভুর নিমন্ত্রণ। তুমি আমি ও সকলেই সে নিমন্ত্রণ পাব একদিন না একদিন, তা সে আজই হোক বা কয়েক বছর পরেই হোক! এ তো আনন্দের! এই নশ্বর জগৎ ছেড়ে প্রভুর পরমানন্দময় পাদপদ্মে পৌঁছাবার এই সাধন তো আনন্দেরই। এতে ভয় পাবার কি আছে? সেই দিনকে তো সদা স্বাগত করছি যেদিন হরির লোককে হরির ধামে পৌঁছে দেবে। সে মৃত্যু তো সদা অভিনন্দনীয়।"

লোয়নের কথায় লাখার ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল। তার কোন যুক্তিই লাখা শুনল না। কামকলুষিত হৃদয়ে সে লোয়নের ফুলের মত দেহকে নিজের বাহুপাশে আবদ্ধ করল। পরিস্থিতি বুঝে লোয়ন ধীরে বলতে লাগল, "ভুলে যাচ্ছ। একলা অসহায় অবলাকে নিজের বাহুবলে পরাজিত করায় বাহাদুরী কি! মনের দোষ উৎখাত করাতেই তো বাহাদুরী। তুমি শূরবীর। নিজের মনকে জয় করে পুরুষত্ব দেখাও। আমাকে তো সর্ববলশালী প্রভুই রক্ষা করবেন।" "প্রভু! বাঁ—চা—ও" বলতে বলতে লোয়নের কণ্ঠ রুদ্ধ হল। এদিকে লাখার শরীরে আগুনের হল্‌কা বয়ে যেতে লাগল। সারা শরীর জ্বলতে লাগল। ভয়ে লোয়নকে ছেড়ে দিয়ে সে মূর্ছিত হয়ে গেল। এই অবসরে লোয়ন ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

মূর্ছা থেকে জেগে লাখা দেখল তার সারা অঙ্গে কুষ্ঠ ফুটে উঠছে। দুঃখিতচিত্তে ঘরে গিয়ে সে শয্যাগ্রহণ করল। এই রোগ-শয্যায় লাখার বারটি বছর কেটে গেল। লোয়ন এখন আর সাধারণ কামারের সুন্দরী মেয়ে নয়। সৌরাষ্ট্রের সাধুসমাজে সম্মানিত একজন। মহাত্মা শৈলনসী দেশ পর্যটন করতে করতে আবার জামখণ্ডালিয়া গ্রামে উপস্থিত হলেন। পিতা-পুত্রীর হৃদয়স্পর্শী মিলন হ'ল। সাধুহৃদয়া লোয়ন নির্লিপ্তভাবে মহাত্মার কাছে লাখার রোগারোগ্য ও ঈশ্বরভক্তির প্রার্থনা জানাল। তিনি লোয়নের প্রার্থনা স্বীকার করে বললেন, "লোয়ন! ঈশ্বরেচ্ছায় লাখা ভাল হয়ে যাবে। শুধু লাখা কেন, মিথ্যারূপসাগরে ডুবেছে এমন পথভ্রষ্ট যে কোন মানুষই যদি ভগবন্নাম কীর্তন ও ভজন অবলম্বন ক'রে প্রভুর শরণ নেয়, তবে সে নিজের কুকর্ম ধ্বংস ক'রে ভগবানের জন হয়ে যায়।"

বার বছর বাদ আজ অকস্মাৎ লোয়ন, লাখার ঘরে উপস্থিত। পরিবারের লোকেরা লোয়নের পদার্পণে নিজেদের ধন্য মনে করল। লাখা একটি খাটে শুয়ে মহাব্যাধির যন্ত্রণা ভোগ করছিল।

লোয়ন কাছে গিয়ে বলল,—"লাখা ভাই, বড় কষ্ট হচ্ছে ?" পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে লাখা চোখ উঁচু করে দেখল যে লোয়ন সামনে দাঁড়িয়ে। তার চোখ জলে ভরে গেল। ভরা গলায় সে বলল—"দেবী লোয়ন! তুমি সাধ্বী। আমি অতি নীচ। তোমার সত্য ও মঙ্গলময় কথাগুলি অবজ্ঞা করে আমি তোমায় কষ্ট দিয়েছি, তারই ফল এখন ভুগছি।......অনেক তো হল। দেবী, দুঃখীকে দয়া কর। এই মহারোগের মহাকষ্ট হতে আমি যেন রেহাই পাই।"

লোয়ন স্নেহার্দ্রস্বরে বিনীতভাবে বলল, "লাখা, প্রভু বড়ই দয়ালু। তিনি পুরনো কথা মনে রাখেন না। বর্তমান দেখেন। তাঁর শরণাপন্ন হয়ে যাও। প্রভুর কৃপায় কিছুই অসম্ভব নয়। তোমাকে এক শুভ সংবাদ দিতে এসেছি।" এইটুকু বলে লোয়ন লাখার পূতিগন্ধপূর্ণ খাটিয়ার পাশে মাটিতে বসে পড়ল আর মাতৃভাবে লাখার মাথায় হাত রেখে বলল, "লাখা, সাধু শ্রীসৈলনসী মহারাজ এসেছেন। ওঁর কীর্তন শুনতে আসবে ?"

লাখা উত্তর দিল, "আমার পরম ভাগ্য; আমার মত অভাগার দ্বারা অত বড় মহাত্মার দর্শন হবে। তুমি বড় কৃপা করেছ। আমি অবশ্যই যাবো।"

লোয়ন বলল, "সাধুর কৃপায় তোমার অবশ্যই মঙ্গল হবে। ভগবন্নাম-কীর্তনে অবশ্যই আসবে। আমি জায়গার বন্দোবস্ত করে রাখবো।"

লাখা ঠিক সময়েই হাজির হল। কীর্তন আরম্ভ হয়েছে। চার প্রহর রাত্রি কীর্তন শ্রবণ ও কীর্তন করার পর সাধু লাখাকে নিজের কাছে ডেকে স্নেহভরে বললেন, "লাখা, শারীরিক পশু বল অপেক্ষা সত্যের বল কত প্রবল তা তো নিজের চোখে দেখলে। বাবা! আজ থেকে সত্যপথে চলবে। অসত্য, অন্যায়, অনাচার কখনও করো না। ভগবানের পবিত্র ও মধুর নাম কখনও ভুলো না। নাও, ভগবানের পুণ্য চরণামৃত পান করে শুদ্ধ হও।" এই বলে মহাত্মা সৈলনসী লাখার দেহের উপর ভগবানের নাম জপ করতে করতে নিজের হাত বুলিয়ে দিলেন ও তাকে চরণামৃত পান করালেন। দেখতে দেখতে লাখার দেহ হতে সেই মহাব্যাধি এমন ভাবে দূর হয়ে গেল যে কখনও যে সেখানে রোগ ছিল তার কোন চিহ্নই রইল না। শরীর দিব্যকান্তিতে দীপ্ত হয়ে উঠল। নিজের পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে লাখা প্রথমে মহাত্মার চরণে ও পরে লোয়নের চরণে প্রণাম করল। এরপর সমস্ত সাধু-মণ্ডলীকে প্রণাম করে নিজের জীবনকে প্রভুর ভজনে লাগিয়ে রেখে প্রভুর পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করল। ধন্য লোয়ন, ধন্য লাখা।

অভয় কবচ

শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য

আমার ভেঙেছে ভীতির বাঁধ,
আমি অভয় কবচ বক্ষে বেঁধেছি, ভেঙেছে ভীতির বাঁধ!
মাভৈঃ, মাভৈঃ, মাভৈঃ।
আমি ন্যায়ের দণ্ড উচ্চে তুলিয়া লক্ষ্যে যাবই যাবই—
আমি আলোক পাবই পাবই।
আমার উদ্যম হৃদে উথলি উঠিছে, ফুকারি উঠিছে সাধ—
গুমরি গুমরি রুদ্ধ এ প্রাণ ভেঙেছে সকল বাঁধ॥

পিশাচের মুখচুন—
এই জাগরণে লাগে যেন তার কাটা ঘায়ে আজ নুন।
অত্যাচারীর বুক ধুয়ে ছোটে তাজা টক্‌টকে খুন।
পিশাচ পায়না ভাবিয়া সে কি যে করিবে
মরিবে বুঝিবা এখনি মরিবে—
হিংসার বিষে হয়েছে সে আজ দিশাহারা উন্মাদ।
তার দম্ভের কুয়াশা ভেদিয়া ওঠে মোর আশাচাঁদ।
আমার ভেঙেছে ভীতির বাঁধ,
আমি অভয় কবচ বক্ষে বেঁধেছি, ভেঙেছে ভীতির বাঁধ॥

ওরে ভীরু অসহায় নিপীড়িত তোরা চল্ চল্ ছুটে চল্,
বুক বেঁধে নিয়ে অক্ষয় বলে "মাভৈঃ, মাভৈঃ" বল্।
কাল চলিয়া গিয়াছে যাহা
পাবনা ফিরিয়া তাহা।
স্থাণুর মতন পড়িয়া রহিব ? আরনা, আরনা, আরনা।
আমি দর্পিত পদে ছুটিয়া চলিব ধারিব বাধার ধার না।
আমি জীর্ণ করিব দীর্ণ করিব যত ধ্বংসের ফাঁদ,
আমি ধূলায় মিশাব যত অন্যায় বাঁধা নিয়মের বাঁধ॥

সকল বিবাদ বাধা লঙ্ঘিয়া দুর্বারে দু'পা ছোটে,
আমার শিরায় শিরায় তপ্ত শোণিত ফোটে টগ্‌বগি ফোটে।
মোর মর্ম-গোমুখী ঘর্মধারায়
উলসি ভাসাব পাষাণ কারায়,
নৃত্যের তালে হর্ষে মাতিয়া চিত উদ্দাম ছোটে।
আমি নব প্রভাতের শুনি আহ্বান
তাই "জাগৃহি" গাহি জয় গান—
জড়তা টুটিয়া চলেছি ছুটিয়া কে করিবে গতিরোধ ?
সকল বাধার রক্ত শুষিয়া নিব তার প্রতিশোধ॥

আমার বক্ষে অভয় কবচ দেখেছিস তোরা কেউ ?
এরি বলে আমি জাগাই নিত্য নব জীবনের ঢেউ।
আমার অভয় কবচ, অভয় কবচ মাতার আশীর্বাদ
রক্ষা করিছে অভয় কবচ ঘুচাইয়া পরমাদ।
আমার বক্ষে অভয় কবচ মাতার আশীর্বাদ
আমারে রক্ষা করিছে, করিবে এখনো টুটাবে সকল বাঁধ।
ভেঙেছে ভীতির বাঁধ!
আমার ভেঙেছে ভীতির বাঁধ!!

স্মৃতির অঞ্জলি

শ্রীমতী শীলা সেন

সে আজ আঠাশ বৎসরের কথা। আমার একটি আত্মীয় রাজকার্য উপলক্ষ্যে কুমিল্লায় বদলি হন এবং সেখানে আর একটি আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়া উঠেন। ঐ সময়ে বেলুড় মঠের অধুনা লোকান্তরিত স্বামী জগদানন্দ মহারাজ এবং নিখিলানন্দজী (বর্তমানে নিউইয়র্ক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের পরিচালক) প্রভৃতি কয়েকটি সাধু সেখানে তাঁহার বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। আমার আত্মীয়টি জগদানন্দ মহারাজের সৌম্য মূর্তি ও নিখিলানন্দ মহারাজের পাণ্ডিত্য দেখিয়া উভয়ের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাদের সঙ্গে অল্পদিনেই খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মে। বৈকালে মধ্যে মধ্যে জগদানন্দ মহারাজের সঙ্গে তিনি সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইতেন। একদিন শহরের বাহিরে খোলা মাঠে দুইজনে বেড়াইতে যান। সান্ধ্য গগনে সূর্যদেব অস্তাচলোন্মুখ, প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করিয়াছে; মাঠ হইতে গরুগুলি রাখাল বালকদের সঙ্গে ধীরে ধীরে শ্রান্ত দেহে আলয়ে ফিরিতেছে। জগদানন্দ মহারাজ এই স্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে মাঠের ধারে বসিয়া পড়িলেন। আমার আত্মীয়টিও বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জগদানন্দ মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, "বি—বাবু, আপনার সময় হয়েছে, শীঘ্রই গুরুলাভ হবে।" এইকথা শুনিয়া আমার আত্মীয়টি কতকটা অবিশ্বাসের ও উপহাসের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, সময় তো আমার রোজই হচ্ছে।"

আমার আত্মীয়টির পিতা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তাঁহার গৃহে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, যোগবাশিষ্ঠ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ধর্মপুস্তক ছিল। ছেলেবেলায় মধ্যে মধ্যে আত্মীয়টি, যখন কিছু করিবার না থাকিত উক্ত গ্রন্থগুলি পাঠ করিতেন। ঐ পুস্তকগুলির কোনও একস্থানে পাঠ করিয়াছিলেন যে শ্রীভগবান বলিতেছেন, "সময় হইলে আমি গুরু প্রেরণ করি।" বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব হওয়ায় ছেলেবেলা হইতেই তিনি তাঁহার পিতার ধর্মভাবে সংক্রামিত হন। মনে করিতেন যে যখন সময় হইবে তখন গুরুলাভ হইবে, চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। আন্তরিক মুক্তিলাভের ইচ্ছা যেন অজ্ঞাতে তাঁহার মনে উঁকি মারিত। ইহাই ছিল তাঁহার মানসিক অবস্থা।

জগদানন্দ মহারাজের এই কথাগুলি শুনিতেই যেন শৈশবের ধর্মপুস্তকের "যখন সময় হইবে গুরু আসিবেন"—এই স্মৃতি অলক্ষ্যে উদয় হইল। যাহা হউক কয়েকদিন পরে হঠাৎ কুমিল্লা হইতে তাঁহাকে ছুটিতে যাইতে হইল ও তিনি কলিকাতায় আসিয়া রহিলেন। নিখিলানন্দ মহারাজ আসিবার সময় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি বেলুড় মঠে শীঘ্রই ফিরিবেন, অবসর পাইলে তথায় গিয়া যেন তিনি তাঁহার (নিখিলানন্দজীর) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

যে উদ্দেশ্যে ছুটি লওয়া তাহা শেষ হইল। অবসর প্রচুর। কোনদিন বৈকালে কোন আত্মীয়ের বাটী, কোনদিন সিনেমা ইত্যাদি দেখিয়া সেই অবসর কাটিতে লাগিল। হঠাৎ (অজ্ঞাতেই বলিতে হইবে) একদিন শুভমুহূর্ত উপস্থিত হইল। সেদিন বৈকালে আর কোথাও যাইবার নাই, আত্মীয়টি ভাবিলেন আজ বৈকালটা বেলুড়মঠে নিখিলানন্দ মহারাজের কাছেই বেড়াইয়া কাটাইয়া আসি। তিনি তো আমাকে যাইতে বলিয়াছিলেন। তদনুসারে আত্মীয়টি অপরাহ্ণে বেলুড় মঠে আসিয়া

নিখিল মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ ও চা খাইয়া কলিকাতা ফিরিবেন মনে করিতেছিলেন এমন সময় নিখিলানন্দজী বলিলেন, "মহাপুরুষ মাহারাজের সঙ্গে দেখা করবেন ?"

মহাপুরুষ মহারাজ কে ? কেমন লোক? কেন দেখা করিবেন ?—ইত্যাদি চিন্তা না করিয়াই আত্মীয়টি বলিলেন, "হাঁ, মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে দেখা করব।" নিখিলানন্দজী চলিয়া গেলেন এবং কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে আসুন।" তাঁহাকে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে লইয়া যাইতে যাইতে নিখিল মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বি—বাবু, দীক্ষা নেবেন ?" দীক্ষা কি, কেন লইবেন এসব চিন্তা করিবার কোন অবসর না পাইয়াই যন্ত্রচালিতের ন্যায় আমার আত্মীয়টি বলিলেন, "হাঁ মহারাজ, নেবো।"

মহাপুরুষ মহারাজকে আমার আত্মীয়টি দর্শন করিলেন,—প্রথম দর্শন। নিখিলানন্দজী তাঁহার দীক্ষার কথা তুলিলেন। শুনিয়া মহাপুরুষ মহারাজ খানিকক্ষণ আমার আত্মীয়টির মুখের দিকে কিছু না বলিয়া, চাহিয়া রহিলেন। এ চাওয়ার অর্থ কি ? আত্মীয়টি তখন কিছুই বুঝিলেন না। তিনি যে অহেতুক কৃপাসিন্ধু তখন সে ভাব আসিল না। এমনই তাঁহার অশুভ সংস্কার সে সময় কার্য করিতেছিল, তিনি ভাবিলেন যে তিনি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বলিয়াই তাঁহাকে মহাপুরুষ মহারাজ দীক্ষা দিতে রাজী হইলেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহাকে কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "আগামী মঙ্গলবার স্নান করে দশটার সময় এস।" এ বিষয়, আত্মীয়টির মনের ভিতর বিশেষ কোন রেখাপাত করিল না। যাহা হউক, নির্দিষ্ট দিনে স্নান করিয়া বালকদের যেমন নূতন কিছু আসিলে কৌতুক হয়, সেইভাবে আসিয়া মহাপুরুষ মহারাজের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

মহাপুরুষ মহারাজ সকাল সন্ধ্যায় যে ন্যূনতম সংখ্যা জপ করিতে বলিয়াছিলেন তাহা আত্মীয়টি করিয়া চলিলেন। মাঝে মাঝে মনে হইত এত কম জপ করিয়া কি আর এমন উন্নতি হইবে, কিন্তু বেশী করিবার তাঁহার সময়ও ছিল না, আগ্রহও ছিল না। এমনি করিয়া দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কাটিয়া গেল। তিনি মধ্যে মধ্যে স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত হইতেন। মহাপুরুষজী তাঁহাকে স্নেহভরে কত আদরযত্ন করিতেন তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ক্রমে তাঁহার চাকরি হইতে অবসর হইল। হঠাৎ শরীরও ভাঙ্গিল। তখন তাঁহার চৈতন্যের উদ্রেক হইল। যে অমোঘ বীজ সিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁহার ভিতর বপন করিয়া দিয়াছিলেন তাহা নিজের কাজ করিতে আরম্ভ করিতেছে। সময় না হইলে কিছু হয় না। যতই আমরা ব্যস্ত হই না কেন, কালের জন্য প্রতীক্ষা অনিবার্য। ইতোমধ্যে সৌভাগ্যক্রমেই বলিতে হইবে সংসারের কিছু কিছু আঘাতও আসিয়া পড়িতে লাগিল। আত্মীয়টি বুঝিতে পারিলেন সংসারে সকলের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলা অসম্ভব। ঝঞ্ঝাবাতে বিক্ষিপ্ত তরণীর ন্যায় আমার আত্মীয়টি নিজেকে অসহায় মনে করিতে লাগিলেন এবং উপলব্ধি করিলেন যে শ্রীগুরুই একমাত্র রক্ষাকর্তা। সংসারের সুখ আলুনি বোধ হইতে লাগিল, শ্রীগুরু নানাভাবে কখনও ধ্যানে, কখনও স্বপ্নে তাঁহাকে অহেতুক কৃপা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কে যেন কিছুদিনের জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া নির্জনবাস করাইতে লাগিল। নির্জনবাসে শ্রীগুরুচরণে নির্ভরতা ক্রমে ক্রমে ফুটিল। অপ্রত্যাশিতভাবে সকল অভাব নিজের বা স্বজনগণের বিনা সাহায্যে অপসারিত হইতে লাগিল। কোন মধুময় স্বপ্নরাজ্যের আলোক কোথা হইতে কিভাবে আসিয়া অন্তরে জলজল করিয়া সর্বসংশয়ের অবসান

করিতেছিল। শ্রীগুরুদেব যে ন্যূনতম সংখ্যা বীজ-মন্ত্র জপ করিতে বলিয়াছিলেন, এখন তাহা বাড়িয়া অনেক বেশী সংখ্যা জপ চলিতে লাগিল। আজ জীবনের নিভৃত সন্ধ্যায় আমার আত্মীয়টি মহাপুরুষ মহারাজের কৃপায় অভিভূত। এই 'গুরুশক্তি' কি প্রকৃতির 'স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনের নিয়ম' (Law of Spontaneous Variation) দ্বারা এই রূপান্তর আনিল?

অদ্ভুত এই শক্তি! আমার বৃদ্ধ আত্মীয়টি এখন নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছেন। কে তাঁহাকে এরূপ করিল? কে তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার সূর্যরশ্মির ন্যায় ধীরে ধীরে আলোকিত করিতেছে? আশ্চর্যের বিষয়, কোন সংশয় উপস্থিত হইলে অপ্রত্যাশিতভাবে অজ্ঞাত ব্যক্তি দ্বারা কি করিয়া সমাধান হইতেছে? তবে অন্তরে এখন সর্বদাই অনুতাপের বহ্নি ধীরে ধীরে জ্বলিতেছে। সর্বদাই মনে হইতেছে, কেন প্রথম হইতে সদ্‌গুরুর সঙ্গ অধিক করি নাই। উত্তর কে দিবে? কাল না প্রারব্ধ?

একবার কোন কারণে তিনি কলিকাতায় আসিয়া মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে কার্যগতিকে দেখা করিতে পারেন নাই। ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লেখায় মহাপুরুষজী যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার প্রাণ বিগলিত হইয়া গিয়াছিল, কত আপনার জন তখন কি বুঝিতে পারিয়াছিলেন? কত তাঁহার স্নেহ, কত কৃপা! তিনি (মহাপুরুষ মহারাজ) ৮ই অক্টোবর, ১৯৩০ তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

"* * * আসিতে পার নাই, তা কি হইয়াছে? অন্যসময় সুবিধামত আসিবে। * * * ঠাকুর তোমাদের কল্যাণ করুন।

সতত শুভানুধ্যায়ী—শিবানন্দ"

আত্মীয়টি ভাবিয়াছিলেন, মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতে না পারায় হয়ত তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু কি স্নেহপূর্ণ উত্তর আসিল!

এখন ঐ আত্মীয়টি তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে লোকান্তরিত শ্রীগুরুর প্রতিকৃতি সমক্ষে ভক্তি-অশ্রু নিবেদন করিয়া ধন্য হইতেছেন। যখন তাঁহাকে সশরীরে পাইয়াছিলেন, তখন যদি এই আবেগ ও ব্যাকুলতা আসিত! যাহা হউক সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুদেবের [illegible] শ্রীপাদ-পদ্মে মিলিত হইবার জন্য [illegible] প্রতীক্ষা করিয়া জীবনের অবশিষ্ট [illegible] কাটাইতেছেন। ধন্য শ্রীগুরুর দয়া; [illegible] জগদানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী!

জীবন-জিজ্ঞাসা

শ্রীরমেন্দ্রনাথ ম[illegible]

জীবনের পায় হাঁটা পথে হলো [illegible]
কোন রাঙা কোন বা সবুজ [illegible]মন।
প্রলেপ লেগেছে আঁ[illegible] বর্ণালী,
জীবনের ফুল ফল [illegible] সোনালী
মনছোঁয়া আকা[illegible]পের তারায় ;—
মাঝে মাঝে [illegible] কোন ছলনায়।

জীবনের প্রজ্ঞাদীপ্ত প্রজ্বলিত জানি হৃ[illegible]
আনে পথ প্রদর্শন করে করে যেথা [illegible]
জানি দূর বনান্তের বাণী মেঘে [illegible]
নিত্যকার জীবনখেলায় যারা শুধু [illegible]
তাদেরই বুকের পাঁজরে আলো [illegible]লা
সত্য ও শাশ্বত হবে ধর্ম-[illegible]।

কিছু দুঃখ কিছু সুখ জীবনের নিয়ে পথ চলা
দেখে দেখে পৃথিবীর প্রান্তলীন শুচির শ্যামলা।
তাই ছন্দ পদে পদে উঠি বাজে নূপুর-নিক্কণে
অন্তরের অস্থির যন্ত্রণা পুষে কর্দম-কাঞ্চনে!
দিনে রাতে কালো আলো বিচিত্রের তীরে বসে ভাসা,
চলন্ত পথের মাঝে তাই জাগে জীবন-জিজ্ঞাসা।

পাঠকের পত্র

(১)

গত চৈত্র (১৩৭২) মাসের উদ্বোধনে শ্রীসুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী 'বাংলার কথকতা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমাদের জনৈক অধ্যাপক-পাঠক এই সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

"সুরেনবাবুর কথকতা সম্বন্ধে লেখা প্রবন্ধটা সময়োপযোগী সন্দেহ নেই কিন্তু কথকতাকে "আধুনিক" করার যে প্রস্তাব তিনি করেছেন সেটা আমার আদৌ সমর্থনীয় বলে মনে হয় না। মাইক, স্লাইড ও সমবেত কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত সহযোগে যে অনুষ্ঠান হবে তাকে 'শিক্ষাপ্রদ' 'মনোজ্ঞ' সব কিছুই বলা যায় কিন্তু নিশ্চয়ই কথকতা নয়। কথকতা একান্তই গ্রাম্য সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠান, তার পুনরুজ্জীবন করতে হবে সেই সমাজজীবন ও তার অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবনের দ্বারা। বেতারে 'কথকতা'র কৃত্রিমতা একেবারে হাস্যাস্পদ নয় কি? 'কথক ঠাকুর' একা বেতারকেন্দ্রে পুঁথি নিয়ে গেলেন কাল্পনিক শ্রোতাদের অবসরবিনোদনের খানিকটা কৌতুক সরবরাহের জন্য, তাকেও বলতে হবে 'কথকতা', যার বৈশিষ্ট্য হ'ল Contagious cordiality, Warmth of feeling!! কাজে কাজেই বলতে হয় "ভাগবত পুরাণের কথা-কাহিনীগুলিকে শুধু একঘেয়ে আজগুবী গল্প বা রূপকথা না করিয়া উহাদের পটভূমিতে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের যুক্তি দেখানো প্রয়োজন।" (পৃঃ ১৪০) একবারও মনে হ'ল না যে এই প্রয়াস কী মর্মান্তিক পরিহাস!

আমি নিজে শুধু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নই, আধুনিকতম ভাবধারার অনুশীলন আমার উপজীবিকা, অথচ প্রতিবাদ করতে হ'ল আমাকে! 'আধুনিক' হওয়া আমি বুঝি, কিন্তু সব কিছুকেই যাদুঘরের পশুপাখীর মত নির্জীব, প্রাণহীন অবস্থায় সাজিয়ে রাখা জাতীয় সংস্কৃতির নবজাগরণ বা নবকলেবর গ্রহণ—এটা বহুজনবিঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও আমার কাছে একটা দুর্বোধ্য ব্যাপার। এই সব নকল লোকসংস্কৃতির প্রাদুর্ভাব মনকে পীড়া দেয়, তাই মত ব্যক্ত করা প্রয়োজন বোধ করলাম।"

পত্রলেখক কতকগুলি যুক্তিপূর্ণ খাঁটি কথা বলিয়াছেন। কথকতা এবং অনুরূপ পুরাতন অনুষ্ঠানগুলির রূপান্তরীকরণের সময় ঐ সকল অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত নীতিগুলি যাহাতে অব্যাহত থাকে সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

—উঃ সঃ

(২)

জগতাই (মুর্শিদাবাদ) হইতে শ্রীহিরন্ময় মুন্সী লিখিতেছেন—

"শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম সাধন" সম্বন্ধে গত চৈত্রের উদ্বোধনের 'কথাপ্রসঙ্গে' যা' বলা হয়েছে সেটার গূঢ় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আরও দু'একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথমেই বলা দরকার যে ঘটনাটা সম্বন্ধে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে'র সঙ্গে অক্ষয়কুমার সেন রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'র মিল নেই। ব্রাহ্মণ পাচক দ্বারা মুসলমানী খানা তৈরী করবার ব্যবস্থা মথুরবাবুর নির্দেশিত হলেও "কাছা খোলার" কথাটা লীলাপ্রসঙ্গকার উল্লেখ করেন নি। এটা শুধু পুঁথিকারের 'পুঁথি'তে উল্লিখিত হয়েছে—'কথাপ্রসঙ্গে' এই কথাই স্বীকৃত:

যদি তাই হয়, তবে তার গূঢ় উদ্দেশ্যও নিশ্চয়ই আছে! মহাপুরুষের কার্যকলাপ অনেক সময়েই সাধারণের কাছে রহস্যময়, যদিও অতি সরল সহজলীলায় মহাপুরুষগণ জনমানসে এক অচিন্ত্য শক্তিতে প্রকাশিত হন। "মহাপুরুষের কোন বিশেষ আচরণের তাৎপর্য সম্বন্ধে বিভিন্ন পর্যবেক্ষক অনেক সময়েই পৃথক পৃথক অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন"—কথাটা অতীব সত্য। তাই বলে তাঁদের বিশেষ আচরণের যে বিশেষ উদ্দেশ্য নাই একথাও বলা চলে না। শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুব্রাহ্মণকুলে জন্মেছিলেন—সে ক্ষেত্রে হিন্দুত্বের সংস্কারের সঙ্গে ইসলামী সংস্কারের সংঘাত সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। বিভিন্ন দুটি সংস্কারের সংঘাত কাটিয়ে 'সিনথেটিকালি' এক পরিপূর্ণতায় পৌঁছে দেওয়াই মহাপুরুষের মহাপূরণকারী লীলা! খ্রীষ্ট বলেছেন, I come not to destroy, but to fulfil. শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও এই পরিপূরণের আদর্শটি সুস্পষ্ট! সাংস্কারের ইসলামের মর্মকথা ঈশ্বর ও ঈশ্বরপ্রেরিতে আত্মনিবেদন। খাদ্য ও সাজ পোষাক "এহো বাহ্য" মাত্র। ওটা দেশকালিক ব্যাপার। আরবের খাদ্য খানা ও পোষাক বাংলা দেশে না মানলেও ইসলাম সাধনার কোন ক্ষতি হয় না। বহু ইসলাম সাধক মৎস্য মাংস পেঁয়াজ রশুন প্রভৃতি বর্জন করেছেন এখনও দেখা যায়। বরং ইসলামের তরিকা অনুযায়ী

আল্লা ও রসুলে অটুট টানই যে ইসলামের আসল চেহারা—এটা স্বীকার না করে পারা যায় না। বস্তুতঃ যে সংস্কার অন্য সংস্কারকে আঘাত করে না বরং মিলিয়ে চলে এমন সংস্কারকে স্বীকার করা দোষের নয়। তাই মথুরবাবু হিন্দুসংস্কারে আঘাত লাগবে বলেই ঠাকুরকে গোমাংস খেতে নিষেধ করেছিলেন ও ব্রাহ্মণ পাচক দ্বারা মুসলমানী খাদ্য পাকের যথাবিহিত নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঠাকুরও সেটা মেনে নিয়েছিলেন এইজন্য যে এটা মেনে চললেও ইসলামী সাধনায় পরিপূর্ণতার কোন ত্রুটি হয় না। কারণ এটা তো ইসলামে ধর্মান্তর বা 'কনভার্সন' নয়। এটা যে সত্যিকারের ইসলাম গ্রহণ। কনভারসন্ হলে ঠাকুরের রামকৃষ্ণ নাম বদলিয়ে হয়তো রহিমতুল্লা রাখতে হতো। এই গেল এক দিকের কথা।

অপর দিকে দেখা যায় মহাপুরুষগণ যুগে যুগে এত সরল হয়ে আসেন যে তাঁদের বুঝতে হলে সরলতা ছাড়া বোঝা যায় না। ঠাকুরের জীবনে এরূপ সরলতার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। যে যা বলে সব কথাই তিনি মেনে নিতেন অকপটে। তাঁর অসুখের সময় যে যা বলেছে তাই তিনি মেনে নিয়েছেন—ও সেরূপ চলতে চেষ্টা করেছেন। চাতক পাখীর ব্যাপারে, নরেনের কথায় শরতের হিমলাগানো প্রভৃতি ঘটনায় তিনি একেবারে সরল শিশুটির মতো বিশ্বাস করেছেন। শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ নন, অবতারকল্প মহাপুরুষকে তিনটি লক্ষণে ধরা যায় যথা—Abnormally normal, Wisely foolish, Gorgeously simple. এই Wisely foolish অংশটিই এই প্রকার আচরণের গূঢ় তাৎপর্য বলে মনে করি। যেন মনে হয় এই সমস্ত মহাপুরুষ অসাধারণ সাধারণ—একেবারে বোকা রকমের—কতকটা অসহায়। যে যা বলে এঁরা নির্বিবাদে তাই মেনে নেন। ঠাকুরের বেলাতেও এটা ঘটেছিল বললে ভুল হয় না। এইটাই তাঁর এবম্প্রকার আচরণের গূঢ় তাৎপর্য মনে হয়।

পত্রলেখকের চিঠির প্রথমাংশ পূর্বোক্ত 'কথাপ্রসঙ্গে' আমাদেরই মন্তব্যের প্রতিধ্বনি। শেষার্ধে লেখক একটি নূতন চিন্তা উপস্থাপিত করিয়াছেন। পাঠক-পাঠিকাগণকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। —উঃ সঃ

সমালোচনা

বুদ্ধ-প্রসঙ্গ—মহেশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন, বিশ্বভারতী, ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭; পৃষ্ঠা—৫৮+৮; মূল্য ৸৹ আনা।

বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার ১১৯তম প্রকাশন বর্তমান পুস্তকটি প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত স্বর্গীয় দার্শনিক-লেখক মহেশচন্দ্র ঘোষের বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রথম প্রবন্ধটির নাম 'গোতম বুদ্ধের আত্মচরিত'। ইহাতে মূল পালি ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে স্বীয় চরিত সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের যে সব উক্তি আছে তাহাদের অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া লেখক বুদ্ধের জীবন-কাহিনীর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে বুদ্ধদেবের জীবনের কতকগুলি ঘটনা সম্পর্কে প্রচলিত কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণা দূরীকৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'গোতমের সাধনা ও সিদ্ধি' তথাগতের সাধনা ও বোধিলাভের পর তৎপ্রচারিত সত্যের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সহজ দিগ্‌দর্শন। 'নির্বাণতত্ত্ব'-নামক তৃতীয় প্রবন্ধটিতে সুপণ্ডিত লেখক মূল্যবান গবেষণা ও প্রখর মননের পরিচয় দিয়াছেন। ত্রিপিটকের নানা গ্রন্থ হইতে নির্বাণের বহুবিধ উপমা, ব্যাখ্যা, প্রতিশব্দ ও বিশেষণ আহরণ করিয়া এবং উপনিষদের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা লেখক নির্বাণের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের শেষ পঙ্‌ক্তিগুলি—

"এই সমুদায় আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, নির্বাণ ও ব্রহ্ম এতদুভয়ের মধ্যে অতি আশ্চর্য সাদৃশ্য। এ সাদৃশ্য যে কেবল অবর বিষয়ে তাহা নহে; মৌলিক তত্ত্বেও সাদৃশ্য এবং একত্ব। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই—নির্বাণ ও ব্রহ্ম একই।"

সাম্প্রদায়িক মতবাদের ঊর্ধ্বে বুদ্ধজীবন বুদ্ধশিক্ষার সর্বজনীন আধ্যাত্মিক আবেদন 'বুদ্ধ-প্রসঙ্গে'র প্রবন্ধত্রয়ে অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট। বইখানির বহুল সমাদর কামনা করি।

—স্বামী হিতানন্দ

বুদ্ধদেব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭ হইতে শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত। ৭৭ পৃষ্ঠা; মূল্য ১॥০ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ ভগবান বুদ্ধকে "অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া উপলব্ধি" করিতেন। কবিতায়, গানে ও ধর্মতত্ত্বালোচনায় তাঁহার বিষয়ে তিনি প্রাণ ঢালিয়া যে সকল প্রশস্তি করিতেন সেইগুলি বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের সার্ধদ্বিসাহস্রিক জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে আলোচ্য পুস্তকে সংকলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের 'বুদ্ধদেব', 'বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ,' ও 'মৈত্রীসাধন' ইতিপূর্বে কোন পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। উপোদ্‌ঘাত হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'প্রার্থনা' শীর্ষক কবিতাটি তাঁহার হস্তলিপিতে মুদ্রিত হইয়াছে। ভগবান বুদ্ধদেব আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তিনি সকল মানুষকে আপন বিরাট হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া দেখা দিয়াছিলেন—এই কথা রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবে 'বুদ্ধদেব' নিবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। বুদ্ধ যাহাকে ব্রহ্মবিহার বলিয়াছেন তাহা শূন্যতার পন্থা নয়। অমিত মনকে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করিয়া তোলাই ব্রহ্মবিহার। 'ব্রহ্মবিহার' শীর্ষক প্রবন্ধে কবিগুরু বলিয়াছেন,

"এ পদ্ধতিকে তো কোনো ক্রমেই শূন্যতালাভের পদ্ধতি বলা যায় না। এই তো নিখিললাভের পদ্ধতি, এই তো আত্মলাভের পদ্ধতি, পরমাত্মলাভের পদ্ধতি।"

বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ শুনিয়া অনেকে হয়ত চমকিত হইবেন। অশ্বঘোষের রচিত মূল সংস্কৃত একখানি গ্রন্থ ছিল, উহার নাম 'শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র'। উহা লুপ্ত হইয়াছে, কেবল চীনভাষায় ইহার অনুবাদ এখন বর্তমান আছে। উক্ত গ্রন্থে ভক্তিবাদের কথা রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ' রচনাতে উচ্ছ্বসিতভাবে দেখাইয়াছেন যে, অবতারবাদ ও ভক্তিবাদের দিকটাই বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া ভারতে বৌদ্ধধর্মের পরিণামরূপে বিরাজ করিতেছে। অধ্যাপক আনেসাকি ধর্ম-ইতিহাস-আলোচনার আন্তর্জাতিক সম্মিলন-সভায় যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহার সারাংশ রবীন্দ্রনাথ এইভাবে দিয়াছেন,—

"অমিত বুদ্ধের দয়াতেই জীবের মুক্তি। এই অমিত, সুখাবতী নামক বৌদ্ধশাস্ত্রের আনন্দলোকের অধীশ্বর। ইনি সর্বশক্তিমান্, করুণাময়, মুক্তিদাতা। যে কেহ ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিবে সে বুদ্ধকে মনশ্চক্ষুতে দেখিতে পাইবে ও মৃত্যুকালে সমস্ত পার্ষদমণ্ডলীসহ অমিত আসিয়া তাহাকে আদরে গ্রহণ করিবেন। এই অমিতাভের জ্যোতি বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত, দৃষ্টি মেলিলেই দেখা যায়; এই অমিতায়ুর প্রাণ মুক্তিধামে নিত্যকাল উপলব্ধ, যিনি যাহা ইচ্ছা করেন লাভ করিতে পারেন।"

এই গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গভীরতত্ত্বপূর্ণ। ইহাতে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের আপাতবিরুদ্ধ মতগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া ঐক্য দেখান হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে প্রচলিত চিন্তাশূন্য মতগুলিকে খণ্ডন করিয়া রবীন্দ্রনাথ উহার মর্মবাণী এইভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন যে, সর্বভূতের প্রতি প্রেম জিনিসটি শূন্যপদার্থ নহে। এমন বিশ্বব্যাপী প্রেমের অনুশাসন কোনো ধর্মেই নাই। প্রেমের দ্বারা সমস্ত সম্বন্ধ সত্য ও পূর্ণ হয়, কোনো সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। অতএব প্রেমের চরমে যে বিনাশ—ইহা কোনোমতেই শ্রদ্ধেয় নহে।

ভারতে শিক্ষাধারার ইতিহাস—শ্রীমতী শান্তিময়ী সিংহ, এম্-এ, বি-টি প্রণীত। প্রকাশক: নিউ এডুকেশনাল পাবলিশার্স, ১২৭এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ১১১ পৃষ্ঠা; মূল্য তিন টাকা।

ভারতের ব্রিটিশ আমলে প্রবর্তিত নব্য শিক্ষাধারার সম্পূর্ণ এবং ক্রমিক ইতিবৃত্তের বাংলা ভাষায় কোনো বই না থাকায় গ্রন্থকর্ত্রী সেই অভাব দূর করিবার জন্য এই পুস্তক প্রণয়ন

করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মহাশয় বইখানির ভূমিকা লিখিয়াছেন। সাধারণ শিক্ষক ও শিক্ষিকারা ও শিক্ষণ-শিক্ষা-বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীরা এই পুস্তক পড়িয়া শিখিবার মত অনেক কথা পাইবেন।

সূচনাতে গ্রন্থকর্ত্রী উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে ব্রিটিশ জাতির ভারত-ত্যাগ পর্যন্ত নব্যশিক্ষার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়াছেন। ব্রিটিশ আগমনের প্রারম্ভে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার কথা প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে কিভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহার আভাস। নব্যশিক্ষার প্রবর্তনে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার কথা তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত। ভারত সরকার কর্তৃক দেশের শিক্ষাভার গ্রহণ এবং লর্ড কার্জনের অবদান সম্বন্ধে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। স্যাড্লার কমিশনের রিপোর্ট ও দ্বৈতশাসনকালে এ দেশের শিক্ষা সংস্কারের কথা লেখিকা সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে বলিয়াছেন। কংগ্রেসী আমলে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ও যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনা নবম ও দশম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

পুস্তকখানির ভাষা প্রাঞ্জল। ইহাতে পাঠক-পাঠিকাবর্গ ভারতে নব্যশিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাসের পরিচয় লাভ করিবেন।

—স্বামী মৈথিল্যানন্দ

Yogiraj Gambhirnath—By Sri Akshaya Kumar Banerjea—M. A., Retired Principal, Maharana Pratap Degree College, Gorokhpur. Published by Sadhu Avedyanath, Gorakhnath Temple, Gorakhpur, pp. 181+xxxiv; Price—Rs. 3/8/-

গোরখপুর মহারাণা প্রতাপ ডিগ্রি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক ইংরেজীতে লিখিত 'যোগিরাজ গম্ভীরনাথ' পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। সুদীর্ঘ ৩৪ পৃষ্ঠার ভূমিকায় দার্শনিক-লেখক ভারতীয় সাধনায় যোগরহস্যপ্রসঙ্গে নাথযোগী সম্প্রদায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান নির্ণীত করিয়াছেন। অতঃপর তেরটি অধ্যায়ে যোগিবর গম্ভীরনাথের যোগ-সাধনার আরম্ভ, তপস্যা, সাধনা ও সিদ্ধি সুন্দরভাবে পর পর বর্ণিত হইয়াছে। সংসার-বিরক্ত কাশ্মীরী যুবকের, শান্তি লাভের আশায় গোরখপুর মঠে আগমন ও সদ্গুরু-লাভ, বারাণসী ও প্রয়াগের ঝুঁসিতে যোগসাধনা, পরিব্রাজকভাবে নর্মদা পরিক্রমা, গয়ার কপিল-ধারার গুহায় কঠোর নির্জন সাধনা ও সিদ্ধিলাভ, পরে শান্ত সমাহিত জীবন্মুক্ত অবস্থায় মঠে প্রত্যা-বর্তন এবং যোগ ও বেদান্তের ভিত্তিতে আধুনিক সমাজে ধর্মশিক্ষা-প্রচার প্রভৃতির আলোচনা পর পর বইখানিতে সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মহাপুরুষদের জীবনের অধিকাংশই কাটে লোক-চক্ষুর অন্তরালে, তাই অনিচ্ছাবশতও লেখককে কয়েকস্থলে বাধ্য হইয়া কল্পনার সাহায্য লইতে হইয়াছে। যোগীর মন বিচার-বিশ্লেষণের ঊর্ধ্বে, এ জন্য দুএক জায়গায় যোগিরাজের কর্ম বা ব্যবহারের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মনে হয়, লেখকের নিজের মতই ব্যক্ত হইয়াছে। পুস্তকখানি যোগিরাজ গম্ভীরনাথের জীবনের মহাবাণী শত শত পাঠকের মর্মস্থলে পৌঁছাইয়া দিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এই গ্রন্থের একটি বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হইলে ভাল হয়।

—স্বামী নিরাময়ানন্দ

বৌদ্ধ দর্শন—শ্রীরণজিৎকুমার সেন প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত, শ্রীমা প্রকাশনী,

১, রমেশ মিত্র রোড, কলিকাতা—২৫ ; পৃষ্ঠা—৭১ ; মূল্য—দেড় টাকা।

বৌদ্ধ দর্শন এমনই বিপুল যে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে ইহার সম্যক পরিচয় দেওয়া অত্যন্ত কঠিন, তথাপি লেখক আলোচ্য পুস্তকটিতে বৌদ্ধ দর্শনের মূল কথাগুলি সংক্ষেপে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারভাষা সাবলীল। কেবল বৌদ্ধ দর্শনই পুস্তকে আলোচিত হয় নাই, ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যের উপর এই দর্শনের প্রভাব সম্বন্ধেও বহু কথা লেখক বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেইজন্ম ইহার নাম 'বৌদ্ধ-দর্শন' না হইয়া 'বৌদ্ধ-দর্শন ও সংস্কৃতি' হইলেই বোধ হয় ভাল হইত। স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি মনীষীর প্রাসঙ্গিক কতকগুলি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বৌদ্ধ দর্শনের একটি তুলনামূলক মূল্যনির্ণয়ের প্রয়াস বইখানির একটি প্রশংসনীয় দিক। কয়েকটি উৎকট বানানভুল চোখে পড়িল।

ছোটদের শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীমৃণালকান্তি দাসগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীমা প্রকাশনীর পক্ষে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, ১ রমেশ মিত্র রোড, কলিকাতা—২৫ ; পৃষ্ঠা—৭২ ; মূল্য এক টাকা চার আনা মাত্র।

লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনকাহিনী ছোটদের উপযোগী করিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রচেষ্টা অনেকাংশে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। ছেলেমেয়েরা বইটি পড়িয়া আনন্দ পাইবে কিন্তু ইহাতে বহু বানান ভুল দৃষ্ট হইল যাহা শিশুসাহিত্যে বাঞ্ছনীয় নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যকালের নাম ছিল গদাধর, আদর করিয়া অনেকে 'গদাই' বলিতেন ; কই, 'গদা' নামের উল্লেখ তো কোন নির্ভরযোগ্য পুস্তকে দেখা যায় না।

রামামৃত সাধন-বিজ্ঞান—শ্রীচিন্তাহরণ মুখোপাধ্যা : কর্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক—শ্রীনরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২৭ নং বিধান পল্লী, যাদবপুর, কলিকাতা—৩২। পৃষ্ঠা—২২০ ;মূল্য ৫৲ টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে মূলতঃ শ্রীশ্রীরামঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ পূর্ববঙ্গের সাধুপ্রবর কর্তৃক তাঁহার শিষ্যগণকে লিখিত পত্রাবলীর সারসঙ্কলন শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতার শ্লোকসমূহের ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সর্বত্রই যে শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত গীতাশ্লোকের সঙ্গে পত্রসারাংশ যথাযোগ্যভাবে সাজানো হইয়াছে একথা বলা যায় না। বইটিতে একটি অলৌকিক জিনিস সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে—"জয়ন্তী মা"র চিঠি। "মেরুপৃষ্ঠ-ঋষি সূক্ষ্মদেহধারিণী" বলিয়া লেখক শ্রীশ্রীজয়ন্তীমার পরিচয় দিয়াছেন। সূক্ষ্মশরীরবিশিষ্টা জয়ন্তী মা রক্তমাংসের শরীরধারী মানুষের মত কিভাবে লিপি পাঠাইতে পারেন তাহা পাঠক-সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়। যদিও অজ্ঞানান্ধ অবিশ্বাসী লোক-সমাজে ইহার প্রচার নিষিদ্ধ—এইরূপ উক্তি পুস্তকের মধ্যেই রহিয়াছে তথাপি কেন ইহা ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া সর্বজনসমক্ষে বাহির হইল ঠিক বুঝিতে পারা গেল না। কয়েকটি অত্যাশ্চর্য ছবিও কৌতূহল সৃষ্টি করে, যথা: উড্ডীয়মান গরুড়ের উপরে সত্যনারায়ণরূপী শ্রীশ্রীরামঠাকুর, হংসারূঢ় 'গুরু-দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর।' গ্রন্থের শেষাংশে আয়ুর্বেদশাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া "দীর্ঘজীবন লাভের উপায়" এবং অথর্ববেদীয় শ্রীশ্রীরামোপনিষদের পদ্যে বঙ্গানুবাদ সংযোজিত হইয়াছে।

বিদ্যামন্দির পত্রিকা (১৯৫৬)—বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের এই সুসম্পাদিত ও সুমুদ্রিত ষষ্ঠ বার্ষিক সংখ্যাটি পড়িয়া আমরা আনন্দ পাইয়াছি। স্বামী বিমুক্তানন্দজীর "পৌরাণিকী" এবং অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দজীর "জননী সারদামণি" ও "ভক্ত হরিদাস" (হিন্দীতে) পত্রিকাটির মর্যাদা

বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীমান করুণাময় নন্দীর "ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে বাঙালীর অবদান", শ্রীমান অমিতাভ দাশগুপ্তের "রবীন্দ্রকাব্যে বাস্তববোধ", শ্রীমান শংকর সেনগুপ্তের "বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর" এবং শ্রীমান সমীররঞ্জন মজুমদারের "বৈষ্ণব সাধনায় বাঙালী" প্রশংসনীয় প্রবন্ধ। ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কৃষি, সঙ্গীত ও রাজনীতি সম্বন্ধে লেখা আছে; ভ্রমণ কাহিনী ও শরীরচর্চা বিষয়ক একটিও রচনা না থাকিবার ত্রুটি দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতে হইল।

বিদ্যাপীঠ (চতুর্দশ বর্ষ)—দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের এই পত্রিকাখানিতে ছাত্র, শিক্ষক ও পরিচালকগণের লেখা আছে। বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত ও হিন্দীতে রচিত প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতাবলীর মোট সংখ্যা ৩৬। শ্রীমান প্রণবকুমার লাহিড়ীর "ভারতীয় নারীর আদর্শ ও শ্রীশ্রীসারদা দেবী" প্রবন্ধটি সুন্দর হইয়াছে। শ্রীমান প্রশান্ত পালের "পুরানো ঘর" ছবিটি শিল্পী-হস্তের পরিচায়ক।

—স্বামী জীবানন্দ

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমহেন্দ্রনাথ—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘটক-প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, ৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—৬; পৃষ্ঠা—১৯০+১৪; মূল্য—২॥০ টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ মধ্যম সহোদর পুণ্যচরিত্র শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত একজন স্বাধীন চিন্তানায়ক এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিক বলিয়া অনেকের শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, কাব্য, শিল্প, সাহিত্য এবং আরও বহুতর বিষয়ে রচিত শ্রীমহেন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলি তাঁহার বিস্ময়কর বহুমুখী প্রতিভার পরিচায়ক। কিন্তু গ্রন্থই গ্রন্থকর্তার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারে না, প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ দ্বারাই ভিতরের মানুষের প্রকৃত সন্ধান মিলে। প্রচারবিভ্রম এবং মান-যশ-লোক-খ্যাতির উত্তেজনা হইতে দূরে অবস্থিত সমসাময়িক ভারতের আত্ম-সমাহিত এই মহামনীষীর একটি আন্তর পরিচিতি তাঁহার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যলাভে ধন্য শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘটক বর্তমান গ্রন্থে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই চেষ্টার উপজীব্য হইল দিনের পর দিন শ্রীমহেন্দ্রনাথের নিকট গিয়া তিনি যে সকল কথোপকথন শুনিয়াছেন এবং যে সব ভাব ও আচরণ লক্ষ্য করিয়াছেন সেইগুলি। বিভিন্ন জিজ্ঞাসুর সহিত আলোচিত মহেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গগুলি একাধারে ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান এবং উহাদের উপর একটি শক্তিশালী মনের স্বকীয় আলোক-সম্পাতও বটে। মাঝে মাঝে লিপিকার প্রসঙ্গগুলির বিষয় বিভাগ করিয়া পাঠকের বুঝিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। সুধীসমাজে বইটি সমাদরণীয়।

সাধনার আলো—শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়ুয়া-প্রণীত; 'সঙ্ঘ-সাথী' কার্যালয়, ৯৭।১কে, টালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—১১০+১৪০+২৬; মূল্য—২৲ টাকা।

চট্টগ্রাম জেলার গুজরা নামক পল্লীতে ১২৮৫ বঙ্গাব্দে তারাচরণ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবধি তাঁহার ভিতর অনন্যসাধারণ ধর্মানুরাগ লক্ষিত হয় এবং উহা ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া উত্তরকালে তাঁহাকে একজন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষরূপে পরিণত করিয়া শ্রীতারাচরণ পরমহংস নামে বিখ্যাত করে। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু সাধারণ অর্থে কখনও সংসার করেন নাই। সত্য, ব্রহ্মচর্য, ঈশ্বরপ্রেম, মানবসেবা এবং ধর্মীয় উদারতা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। শত শত নরনারী তাঁহার পুণ্যসঙ্গ লাভে ধন্য হইয়াছেন। ১৯৪৮ সালে সাধকপ্রবর কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন। বর্তমান গ্রন্থটি তাঁহার উপদেশ-সংগ্রহ। প্রসঙ্গতঃ তাঁহার ধর্মজীবনের বহু কথাও ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। অধ্যাত্মানুরাগী পাঠক-পাঠিকা এই মহাপুরুষের জীবন-কথা এবং উপদেশগুলি পড়িয়া প্রচুর অনুপ্রেরণা লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব—গত এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে লণ্ডনের ক্যাক্সটন্ হলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মবার্ষিকী সোৎসাহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। হলটি জনসমাগমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সভার পরিচালনা করেন লণ্ডনস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। তিনি তাঁহার মনোরম ভাষণে বলেন,—

"বর্তমানে আমরা একটি ভীষণ দিশাহারা অবস্থার মধ্যে বাস করিতেছি। মানুষের অন্তরে শান্তি নাই এবং চিন্তা করিয়া দেখিবারও অবসর নাই কোথায় কিসের অভাব রহিয়াছে। মানুষের অন্তরে ভাব-বিশৃঙ্খলা রহিয়াছে বলিয়াই তো বাহিরে এত বিশৃঙ্খলা। * * * এখন যেরূপ শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর মর্ম উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে ইতঃপূর্বে সেরূপ আর কখনও হয় নাই। তাঁহার উপদেশাবলীর মধ্যে একটি বিশেষ উপদেশ এই—যদি ভগবানের সেবা করিতে চাও, তবে তোমাকে উহা করিতে হইবে মানুষ ভাইএর মধ্য দিয়া। বস্তুতঃ মানবজাতির সেবার মধ্য দিয়াই আমরা নিজেদের এবং জগতের শান্তি আনিতে পারি। আমার মতে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সব চেয়ে বড় জিনিস যাহা দিয়াছেন তাহা হইতেছে ভয়শূন্যতা। * * * যদি আমরা ভীত হই তবে মন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে আর মনুষ্যত্ব হইতে দূরে সরিয়া যাইতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী মানুষকে ভয় হইতে মুক্তি দেয়। উহা তাহাকে এমন একটি পথে লইয়া চলে যেখানে ভয় নাই, কেননা সে জানে, সে অগ্রসর হইতেছে সত্যের দিকে—মানবজাতির একতা, ভ্রাতৃত্ব এবং ঈশ্বরবিশ্বাসের দিকে।"

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের উপরোক্ত কথাগুলি ভারতীয় এবং ইয়োরোপীয় শ্রোতৃমণ্ডলীর উচ্চ হর্ষধ্বনি উদ্রিক্ত করে।

এই সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজীকে (যিনি স্বামী নির্বাণানন্দজীর সহিত আমেরিকার বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচারের বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনান্তে ভারতে ফিরিবার পথে লণ্ডন বেদান্ত কেন্দ্রে আগমন করেন) ইংলণ্ডের বেদান্তানুরাগী বন্ধুগণ কর্তৃক একটি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হয়। শিল্পী মিঃ ফ্রেডরিক অস্টিন উহা পার্চমেণ্ট কাগজে লিখিয়াছেন। লণ্ডন বেদান্তকেন্দ্রের সহকারী অধ্যক্ষ মিঃ জন হজ্ (John Hodge) উহা পাঠ করেন।

স্বামী মাধবানন্দজী তাঁহার ভাষণে বলেন,—

"ভারতীয়দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান অবদান হইল তাঁহার সেবাধর্মের উপদেশ। এই মহান্ ঋষি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন, অখিল সৃষ্টি হইল ঈশ্বরেরই বিভিন্ন আকৃতিতে প্রকাশ। দরিদ্র এবং পীড়িতকে আমরা 'সাহায্য' করিতে পারি এইরূপ মনে করা অর্থহীন, কেননা তাহা হইলে আমরা ঈশ্বরকেই 'সাহায্য' করিতে বসিয়াছি। তবে আমরা মানুষরূপী ভগবানকে সেবা করিতে পারি। এইরূপে জীবনের যে কোন কর্মক্ষেত্রে আমরা যাহাই করি না কেন, সবই ভগবানের পূজা বা উপাসনার ভাবে করা উচিত। অবশেষে আমরা দেখিতে পাইব এইভাবে ভগবানের সেবা করিয়া আমরা নিজেদেরই উপকার করিয়াছি।"

প্রখ্যাত লেখক ও অস্ত্রচিকিৎসক মিঃ কেনেথ ওয়াকার শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করেন। সর্বশেষ বক্তা শ্রীতারাপদ বসু শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার সুসমঞ্জস বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উল্লেখ করেন। ভারতের নবজাগরণে শ্রীরামকৃষ্ণের দানের সম্বন্ধেও তিনি বর্ণনা করেন। লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ঘনানন্দজী সভানেত্রী এবং বক্তাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা পরিসমাপ্ত হয়।

বাত্যা ও বন্যা সেবা—কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম গত ৭ই জুন হইতে সদর থানায় সাম্প্রতিক বাত্যা-পীড়িতগণের মধ্যে সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছেন। তমলুক শাখাকেন্দ্র সুতাহাটা থানায় অনুরূপ সেবাকার্য পরিচালনা করিতেছেন। শিলচর শাখাকেন্দ্র হইতে কাছাড় জেলার হাইলাকান্দি

অঞ্চলে বন্যাসেবার ব্যবস্থা হইয়াছে। গত বৎসর (১৯৫৫) ডিসেম্বর মাস হইতে মাদ্রাজ রাজ্যের তাঞ্জোর ও রামনাদ জেলায় বাত্যা এবং বন্যায় দুর্দশাগ্রস্তদিগের মধ্যে মিশন যে সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা এখনও চলিতেছে। বর্তমানের কর্মসূচী হইল গৃহহীনদিগের পুনর্বাসন।

শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব—মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ (৭ই জুন) হইতে চারি দিনব্যাপী বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ প্রতিদিন সন্ধ্যায় যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে অতি সুন্দর সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষণে সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণে উৎসাহ ও শান্তি দিয়াছিলেন। মালদহ মিশন পরিচালিত বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকগণের স্বহস্তনির্মিত নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্যাদি এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যমূলক পোষ্টারে সজ্জিত একটি প্রদর্শনী উৎসবের চারিদিনই খোলা ছিল। প্রতিদিন রাত্রিতে শ্রীরামরসায়ন-কীর্তন ও ভজনাদির ব্যবস্থা ছিল। কাটিহার আশ্রমের স্বামী অনুপমানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ৪র্থ দিন (রবিবার) ভোরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বৃহৎ তৈলচিত্র লইয়া প্রভাতী কীর্তন শহরবাসীকে আনন্দ দান করিয়াছিল। ঐ দিন আশ্রমে বিশেষ পূজা, হোম, ও ভোগারতির পর বেলা ১টা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় তিন সহস্র নরনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পশ্চিম দিনাজপুর এবং মালদহ জেলার বিভিন্ন অংশ হইতেও বহু ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। মালদহ শহর হইতে ২২ মাইল দূরবর্তী মথুরাপুর গ্রামে পরদিন বিকালে স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

বালিয়াটি (ঢাকা) রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ১১ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২১তম জন্মোৎসব স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দকে প্রভূত আনন্দ ও উদ্দীপনা দিয়াছে। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ মধ্যাহ্নে সমাগত প্রায় দেড় সহস্র নরনারায়ণকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। অপরাহ্নে স্বামী প্রণবাত্মানন্দের সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হয়। সারদামণি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ আবৃত্তি এবং শ্রীমতী হেনা রায় চৌধুরী সারদামণি দেবীর জীবনাদর্শ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সত্যকামানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও জননী সারদাদেবীর জীবনী আলোচনা করেন। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীঅক্ষয় কুমার রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে আর একটি সভায় স্বামী সত্যকামানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন এবং স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন, সাধনা ও বাণী সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ সায়াহ্নে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ প্রায় দেড় হাজার নরনারীর সম্মুখে ছায়াচিত্রযোগে স্বামী বিবেকানন্দের সাধনা, ত্যাগ ও সেবা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীঅজিতকুমার দত্ত চৌধুরীর সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। বক্তা ছিলেন মাণিকগঞ্জ মহকুমার এস-ডি-ও বাহাদুর, উকীল মসিউদ্দিন আহম্মদ (রাজা মিঞা), মণীন্দ্র নিয়োগী, এম-এল-এ শ্রীমুনীন্দ্র ভট্টাচার্য, স্বামী সত্যকামানন্দ, স্থানীয় হাই স্কুলের হেড্‌মাস্টার শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার ও স্বামী প্রণবাত্মানন্দ। তৎপর রাত্রি ৯ ঘটিকায় স্থানীয় শিল্পী কুটেশ্বর শীল তাঁহার চিত্তাকর্ষক পুতুল নাচ দ্বারা রাবণবধ অভিনয় দেখাইয়া সমাগত সকলের আনন্দবর্ধন করেন।

রঁাচি মোরাবাদী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে গত ১৩ই আষাঢ় (২৭শে জুন) শ্রীরামকৃষ্ণ-

বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে স্থানীয় দুর্গা-মন্দির প্রাঙ্গণে একটি বৃহৎ সভা হয়। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সুন্দরানন্দজী উহার পরিচালনা করেন। অপর বক্তা ছিলেন স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ এবং স্বামী বেদান্তানন্দ। শ্রীদুঃখহরণ নায়েক, কুমারী মীরা বিশ্বাস ও শ্রীমতী রেণুকা সেন ভজন গান করেন। আশ্রম কর্তৃক ব্যবস্থাপিত সঙ্গীত ও রচনা প্রতিযোগিতার কৃতীদিগকে পারিতোষিক দেওয়া হয়।

চণ্ডীপুর (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ—এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৩-৫৪ সালের মুদ্রিত কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে এই মঠে অবতার ও মহাপুরুষগণের আবির্ভাব-তিথিতে ও দুর্গাপূজাদি পর্বোপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা হয়। প্রতিমাতে শ্রীশ্রীকালীপূজা ও শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৫৩ ও '৫৪ সালে আশ্রমের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৩৬ (বালিকা-৫২) এবং ১২৬ (বালিকা-৫২)। গ্রন্থাগারে ৮ খানি দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত রাখা হইয়াছিল। ৫৬৫ খানি পুস্তকের মধ্যে পাঠকগণকে পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তক সংখ্যা ৫৫০। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে ১৩,৬৬১ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করেন। দৈনিক রোগীসংখ্যা গড়ে ৮৪। চণ্ডীপুরের নিকটবর্তী বামুন-আড়া গ্রামের বিরাট মেলায় প্রতি বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও জলসত্রদান ও সাময়িক সেবাকার্য করা হয়। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আশ্রমে এবং গোপীনাথপুর, শ্রীকৃষ্ণপুর, ঈশ্বরপুর, হাঁসচড়া, ভীমেশ্বরী, ভগবানপুর ও কাজলাগড়ে সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নব প্রকাশিত পুস্তক

(১) Women Saints of East & West—লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টার (৬৮ ডিউকস্ এভিনিউ, মুসওয়েল হিল, লণ্ডন, এন্-১০) হইতে প্রকাশিত শ্রীসারদাদেবী শতবর্ষ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ। স্বামী ঘনানন্দ এবং স্যর জন্ স্টুয়ার্ট ওয়ালেস্ সি-বি কর্তৃক সম্পাদিত। ভূমিকা লিখিয়াছেন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত; প্রস্তাবনা লিখিয়াছেন কেনেথ ওয়াকার, এম্-এ, এফ্-আর-সি-এস, ও-বি-ই। পৃষ্ঠা (সাইজ—৮$\frac{3}{8}$ × ৫$\frac{1}{4}$) —২৭৪ + ১৮; মূল্য—১০৲ টাকা।

বইটি চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম Women Saints of Hinduism. বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্তের প্রসিদ্ধা নারী সাধিকাদের বিশদ কাহিনী পৃথক পৃথক প্রবন্ধে মনোজ্ঞভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অংশের ১৪টি প্রবন্ধের তিনটি লিখিয়াছেন লণ্ডন বেদান্ত কেন্দ্রের পরিচালক এবং গ্রন্থ-সম্পাদক স্বামী ঘনানন্দ নিজে। অপর লেখক-লেখিকাদের নাম টি এস্ অবিনাশীলিঙ্গম্, এস্ সচ্চিদানন্দ পিল্লাই, স্বামী পরমাত্মানন্দ, টি এন্ শ্রীকান্তাইয়া, শ্রীমতী চন্দ্রকুমারী হাণ্ডু, মিসেস লাজওয়ান্তী মদন, শ্রী বি বি খের, শ্রী পিরোজ আনন্দকার, শ্রীমতী সরোজিনী মেহতা, শ্রী পি শেষাদ্রি, মহোপাধ্যায় কে এস্ নীলকণ্ঠন্ এবং স্বামী চিরন্তনানন্দ।

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের তিনটি প্রবন্ধে বৌদ্ধ এবং জৈন সাধিকাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। একটি রচনার নাম 'মি চাও বু—ব্রহ্মদেশের একজন মহা-সাধিকা', লেখিকা—মিসেস্ চিট্ থুঙ্।

তৃতীয় ভাগের নিবন্ধ-সংখ্যা—৯; ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড এবং আমেরিকার কয়েকজন বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং লেখক এই অংশে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী নারী-সাধিকাদের পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থের চতুর্থভাগের বিষয়—'জুদীয় এবং সুফীধর্মের

মহিলা সাধিকাগণ'; প্রবন্ধ-সংখ্যা—২; প্রথমটির লেখক আইজাক চেট্ [Isaac chait, M. A (Oxon), Rabbi : Sheffield, England]; দ্বিতীয়টি লিখিয়াছেন ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী।

দেশকালের গণ্ডীর বাহিরে বিশ্ব-নারীর ভাগবত-চরিত্রমহিমার উপলব্ধি করিবার সুযোগ উপস্থাপিত করিয়া এই গ্রন্থটি একটি সার্থক কীর্তিরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য।

(২) **Footfalls of Indian History**—By Sister Nivedita. ভগিনী নিবেদিতার সুবিখ্যাত পুস্তকের নূতন সংস্করণ। মায়াবতী (আলমোড়া) অদ্বৈত আশ্রম (কলিকাতা শাখা): ৪, ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা—১৩) হইতে স্বামী গম্ভীরানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। (পূর্বে এই গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন লঙম্যান কোম্পানী)। পৃষ্ঠা (ক্রাউন অক্টেভো)—২১৬; মূল্য—কাগজে বাঁধাই ৩৲ টাকা, কাপড়ে বাঁধাই ৪৲ টাকা।

সূচীপত্র—

The History of Man as Determined by Place; The History of India and its Study; The Cities of Buddhism; Rajgir: An Ancient Babylon; Bihar; The Ancient Abbey of Ajanta; The Chinese Pilgrim; The Relation Between Buddhism and Hinduism; Elephanta—The Synthesis of Hinduism; Some Problems of Indian Research; The Final Recension of the Mahabharata; The Rise of Vaishnavism under the Guptas; The Historical Significance of the Northern Pilgrimage; The Old Brahmanical Learning; The City in Classical Europe; A Visit to Pompeii; A Study of Banaras.

সারনাথ, অজন্তা এবং এলিফ্যাণ্টার তিনখানি সুন্দর ঐতিহাসিক চিত্র সম্বলিত।

(৩) **Cradle Tales of Hinduism**—By Sister Nivedita

প্রকাশক—স্বামী গম্ভীরানন্দ, অধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী (আলমোড়া) পৃষ্ঠা (ক্রাউন অক্টেভো)—৩০০+৮; মূল্য—কাগজে বাঁধাই ৩৲ টাকা, কাপড়ে বাঁধাই ৪৲ টাকা।

ভগিনী নিবেদিতার এই বইখানি পূর্বে লঙম্যান কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত হইত। প্রথম সংস্করণ বাহির হয় ১৯০৭ সালে। সম্প্রতি অদ্বৈত আশ্রম পুস্তকটি প্রকাশের ভার লইয়া বর্তমান নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

সূচীর প্রধান অংশ—

The Cycle of Snake Tales; The Story of Shiva, the Great God; The Cycle of Indian Wifehood; The Cycle of Krishna; Tales of the devotees; A Cycle of great kings; A Cycle from the Mahabharata.

মলাটে 'দুর্গার বজ্র' এবং আরম্ভে 'সন্ধ্যার কথক ঠাকুর' শিল্পগুরু অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের এই দুটি ছবি পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গভীর বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়া ভগিনী নিবেদিতার ভারতীয় পুরাণ-কাহিনীর এই বর্ণনা ও মূল্যনির্ণয় যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনই শিক্ষাবহ।

The Ramakrishna Movement—Its Ideal and Activities—(Second Edition)—By Swami Tejasananda. Published by Swami Vimuktananda, Secretary, Ramakrishna Mission Saradapitha, Belur math, Howrah. পৃষ্ঠা—ডিমাই অক্টেভো ৪২+৪; মূল্য—১।০ আনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আদর্শ ও কার্যাবলী সম্পর্কিত এই পরিচিতি-পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ যে ব্যাপক সমাদর লাভ করিয়াছিল এক বৎসরের মধ্যে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশই ইহার প্রমাণ।

পুস্তকটির বিষয়-সূচী—

1. Sri Ramkrishna, 2. Sri Sarada

Devi—the Holy Mother, 3. Swami Vivekananda, 4. Origin of the Ramakrishna Math and Mission, 5. Belur Math—a Symbol of Unity, 6. Expansion of Work in India and Abroad, 7. Worshipful Service, 8. Orientation in Monastic Ideal, 9. Need of a Cultural Synthesis, 10. India's Message of Peace, 11. India to Conquer the World. ইহা ছাড়া চারটি পরিশিষ্টে যথাক্রমে দেওয়া হইয়াছে—(১) Extracts from the Memorandum of Association of the Ramakrishna Mission, (২) Extracts from the Rules and Regulations of the Ramakrisnna Mission, (৩) Activities of the Ramakrishna Math & Mission in India and Abroad as in 1953, (৪) Centres in India and Abroad.

পুস্তকে ২৮টি ছবি আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কেন্দ্র করিয়া 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' মন্ত্রে অনুপ্রাণিত যে অসাম্প্রদায়িক ধর্মসংঘ এই যুগে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, লক্ষ্য ও প্রসার-ক্রমকে সংক্ষেপে হৃদয়ঙ্গম করিতে এই বইখানি প্রচুর সহায়তা করিবে, সন্দেহ নাই।

বিবিধ সংবাদ

দরিদ্র-বান্ধব-ভাণ্ডারের কার্যবিবরণী—কলিকাতার ৬৫।২ বি বিডন ষ্ট্রীটস্থ দরিদ্রবান্ধব-ভাণ্ডার একটি জনসেবাব্রতী প্রতিষ্ঠান। আমরা ইহার দ্বাত্রিংশত্তম বর্ষের (১৯৫৪) কার্যবিবরণী পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। নিম্নে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পাঁচটি বিভাগের আলোচ্যবর্ষের কার্যাবলী সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল :—

(১) চিত্তরঞ্জন দাতব্য চিকিৎসালয়—এই বিভাগে ৪টি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হয়। মোট ৯১,৮৮৫ জনকে (অ্যালোপ্যাথিক মতে ৪৯,৯৭১ এবং হোমিওপ্যাথিক মতে ৪১,৯১৪) ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ২৭,১৮১ ; দৈনিক উপস্থিতির গড়-সংখ্যা ২৯৮'৩।

(২) দরিদ্রবান্ধবভাণ্ডার চেস্ট ক্লিনিক—সপ্তাহে তিন দিন—রবি, বুধ ও শুক্রবারে বেলা ১১টা হইতে ১২½টা অবধি এই বিভাগে হৃদ্‌রোগী এবং বিশেষ করিয়া যক্ষ্মা রোগীদের আধুনিক পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয় ও প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। আলোচ্য-বর্ষে ১৩,৩২৭ রোগীর মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ছিল ১,৮৩৯। ক্লিনিকে একটি এক্‌স্‌রে যন্ত্র ও লেবরেটরী আছে।

(৩) শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন (১০৫।২' রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা)—১৪টি শয্যা-সমন্বিত এই বিভাগে ফুসফুসের যক্ষ্মারোগী-গণকে প্রথম অবস্থায় ৩।৪ মাস রাখিয়া চিকিৎসা করা হয়। আলোচ্য বর্ষে ৪১ জন (পুরুষ ২২, স্ত্রীলোক ১৯) যক্ষ্মারোগাক্রান্তকে ভর্তি করিয়া চিকিৎসা করা হইয়াছিল, ৩৬ জনের উল্লেখযোগ্য ভাবে চিকিৎসা-সাফল্য ঘটে।

(৪) সচ্চিদানন্দ গ্রন্থাগার—একটি অবৈতনিক পাঠাগারসংলগ্ন এই লাইব্রেরীটি বৃহস্পতিবার ব্যতীত সন্ধ্যা ৬॥ হইতে ৮॥টা পর্যন্ত খোলা থাকে। এখানে বালকবালিকাদিগকে মাসিক মাত্র ৵০ আনা এবং

প্রাপ্তবয়স্কগণকে।০ আনা চাঁদায় পড়িবার সুযোগ দেওয়া হয়। আলোচ্যবর্ষে পুস্তক-সংখ্যা ছিল ৩৮৮৬ (ইংরেজী ৭১৪); সভ্যসংখ্যা ১০৪।

(৫) সেবা বিভাগ—আলোচ্য বৎসরে দুর্গত পরিবারসমূহকে ১৭৮৯৷৷৶১৫ সাহায্য করা হইয়াছিল। নিয়মিত দুঃস্থ প্রার্থীগণকে দেওয়া হয় ৯৬০৲ টাকা এবং সাময়িক সাহায্য বাবদ খরচ হয় ৮২৯৶০ আনা।

কলিকাতায় কাঁকুড়গাছি অঞ্চলে ২২এ ও ২২ই, শিবকৃষ্ট দাঁ লেনে ১০ বিঘা ১৪ ছটাক জমির উপর শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন নামে ৫০টি শয্যাযুক্ত একটি প্রসূতিসদন ও ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে। এখানে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও থাকিবে।

ইম্ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী — ইম্ফল (মণিপুর) শ্রীরামকৃষ্ণসমিতির উদ্যোগে গত ২৬শে ও ২৭শে মে (১৯৫৬) বাবুপাড়া পূজামন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২১ তম জন্মোৎসব সুসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন মণিপুর রাজ্যের জুডিসিয়াল কমিশনার শ্রীব্রজনারায়ণ এই উপলক্ষ্যে আহূত একটি সাধারণ সভা পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় দিন পূজা হোম ও প্রসাদবিতরণ হয়। শিলচর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী পুরুষাত্মানন্দ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে চিত্তস্পর্শী আলোচনা করেন।

মন্নাল গ্রামে অনুষ্ঠান—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসি-শিষ্য পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর জন্মোৎসব তদীয় জন্মস্থান মন্নাল গ্রামে (পোঃ মন্নালবন্দীপুর, জেলা হুগলী) গত ২৯শে বৈশাখ (১২ই মে '৫৬) পূজার্চনা, শাস্ত্রপাঠ, হোম, ভজন-কীর্তনাদির মাধ্যমে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা ভক্তিবিনম্রচিত্তে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। বেলুড় মঠের স্বামী সংশুদ্ধানন্দ মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করেন। হাওড়া ও কলিকাতার অনেকগুলি ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্যামপাহাড়ী (বীরভূম) শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠ—এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির ১৯৫৫ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ২০ বিঘা জমির উপর মনোরম স্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক পরিবেশে ১৯৫১ সালে স্বামী বিবেকানন্দের সেবাদর্শে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষাপীঠের ঈপ্সিত কার্যাবলীর মধ্যে বিগত বর্ষগুলিতে রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে একটি জুনিয়র বেসিক স্কুল (ছাত্রসংখ্যা—৮০) এবং মাধ্যমিক স্কুল বোর্ডের অনুমোদনপ্রাপ্ত একটি আবাসিক জুনিয়র হাই স্কুল (ছাত্রসংখ্যা—১১২)। একটি শিল্প-বিদ্যালয়ের জন্যও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় ১৫ বিঘা জমি ক্রয় করা হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানটি রামপুরহাট হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে, দুমকা রোডের উপর অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটি অতিথি ভবনও আছে।

পল্লীবঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণজয়ন্তী

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আশ্রমসমূহ ব্যতীত বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় বহু প্রতিষ্ঠান হইতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২১তম জন্মোৎসব পরিনির্বাহের সংবাদ আমরা পাইয়াছি। স্থানাভাবে এই সকল উৎসবের বিশদ বিবরণ ছাপিতে পারা গেল না। কোন কোন স্থলে বেলুড় মঠ বা উহার কোন শাখাকেন্দ্র হইতে মঠের সাধুরা উৎসবে যোগদান ও বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। পূজা, পাঠ, যজ্ঞ, প্রসাদ বিতরণ, বক্তৃতা, কথকতা, ভজন, কীর্তন, রামায়ণ-গান, যাত্রা প্রভৃতি ধর্মমূলক নানা অনুষ্ঠান এই উৎসবগুলির সুপরিকল্পিত কর্মসূচি ছিল। কোন কোন প্রতিষ্ঠান রচনা-প্রতিযোগিতারও আয়োজন করেন। আমরা নিম্নে স্থান এবং প্রতিষ্ঠানগুলির নাম লিপিবদ্ধ করিলাম :—

২৪ পরগণা জেলায়—মথুরাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, চারিগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সাউথ বিষ্ণুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব পরিচালক-মণ্ডলী, বেলঘরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি, ভাটপাড়া বান্ধব সমিতি, ইছাপুর প্রবুদ্ধ-ভারত সঙ্ঘ, বারদ্রোণ রামকৃষ্ণ আশ্রম, আমতলা (পোঃ কল্যানগর) রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, নোনা-চন্দনপুর (ব্যারাকপুর) রামকৃষ্ণসেবা সঙ্ঘ, ইছাপুর রামকৃষ্ণ-সাধন সমিতি, নব-ব্যারাকপুর শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সমিতি।

হাওড়া জেলায়—হরিশপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম, বেণানগর (পোঃ অভয়নগর) শ্রীরাম-কৃষ্ণ আশ্রম,কদমতলা শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধন সঙ্ঘ, মাজু শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব সমিতি।

হুগলী জেলায়—নীরদগড় (পোঃ পাণ্ডুয়া) শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সমিতি, জনাই শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবকসম্মিলনী, ভাঙ্গামোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম, ভদ্রকালী রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচর্য বালিকাশ্রম, ভদ্রেশ্বর সারদাপল্লী উন্নয়ন পরিষদ্।

মেদিনীপুর জেলায়—আরিট শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, খেপুত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম।

নদীয়া জেলায়—রাণাঘাট রামকৃষ্ণ জন্ম-বার্ষিকী কমিটি, নবদ্বীপ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, কলাইঘাট (রাণাঘাট) শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ।

বাঁকুড়া জেলায়—সোনামুখী শ্রীরামকৃষ্ণোৎ-সব সমিতি।

বর্ধমান জেলায়—অণ্ডাল শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব কমিটি, কাটোয়া শ্রীরামকৃষ্ণসেবাশ্রম, দোমড়া (পোঃ ত্রিলোকচন্দ্রপুর—বর্ধমান) শ্রীরাম-কৃষ্ণ কুটীর।

কোচবিহার জেলায়—চৌধুরীহাট শ্রীরাম-কৃষ্ণ আশ্রম।

কুলহাণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের অনুষ্ঠান—কুলহাণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের উদ্যোগে গত ২৩শে বৈশাখ (৬ই মে) ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সকালে শোভাযাত্রা ও সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে পূজা, হোম এবং দরিদ্রনারায়ণগণকে প্রসাদবিতরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈকালে তমলুক রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সুশান্তানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। ২৪শে হইতে ৩০শে বৈশাখ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষামন্দির কর্তৃক যথাক্রমে বৈষ্ণবচক উচ্চ বিদ্যালয়, সুলনী উচ্চ-বিদ্যালয় ও গোপালনগর, খাদিনান, রাইন ও কল্যাণপুরে পূজা, ধর্মসভা ও ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্যজীবনী আলোচিত হয়।

বিহারের কয়েকটি উৎসব-সংবাদ

ধানবাদ—রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি গত ২১শে ও ২২শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীর আয়োজন করেন। বিশেষপূজা-হোম-ভজন-দরিদ্রনারায়ণসেবা ও যাত্রা-গান-বক্তৃতাদি উৎসবের কর্মসূচি ছিল। কোল মাইন-ওয়েলফেয়ার কমিশনার শ্রী এস পি সিংএর পরিচালিত একটি জনসভায় বেলুড়মঠের স্বামী অচিন্ত্যানন্দ, সাহেবগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীশিব-বালক রায়, সুপ্রীমকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট শ্রীএন্ এল্ ভাগানিয়া এবং স্থানীয় আশ্রমসেবক ভাষণ দেন।

লাহেরিয়া সরাই—বীণাপাণি ক্লাবে ১৪ই মার্চ হইতে ৫ দিন শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পূজার্চনা, বক্তৃতা, কীর্তন, দরিদ্রনারায়ণ সেবা এবং অখণ্ড শ্রীশ্রীতারকব্রহ্ম নামমহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

আরেরিয়া—শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ১৪ই মার্চ হইতে ১৮ই মার্চ পর্যন্ত তিনদিন উৎসব পরিপালন করেন। বালকবালিকাদিগের আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা এবং উদয়াস্ত নাম সংকীর্তন ছিল কর্মসূচির নানাবিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। কাটিহার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী অনুপমানন্দ উৎসবে যোগদান ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

উদ্বোধন

বৃথা

দৃষ্টা নানা চারুদেশাস্ততঃ কিং
পুষ্টাশ্চেষ্টা বন্ধুবর্গাস্ততঃ কিম্।
নষ্টং দারিদ্র্যাদিদুঃখং ততঃ কিং
যেন স্বাত্মা নৈব সাক্ষাৎকৃতোঽভূৎ ॥
স্নাতস্তীর্থে জহ্নুজাদৌ ততঃ কিং
দানং দত্তং দ্ব্যষ্টসংখ্যং ততঃ কিম্।
জপ্তা মন্ত্রাঃ কোটিশো বা ততঃ কিং
যেন স্বাত্মা নৈব সাক্ষাৎকৃতোঽভূৎ ॥

—আচার্য শঙ্কর, অনাত্মশ্রীবিগর্হণপ্রকরণম্, ৩, ৪

যাঁহার সত্তায় সকল বৈচিত্র্য রূপ পাইতেছে, সকল ভালবাসা, সকল প্রাপ্তি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে সেই অন্তরস্থিত পরমাত্মাকে যদি সাক্ষাৎ করিতে না পারা গেল তাহা হইলে নানা রমণীয় দেশ দর্শন করিয়াই বা কি ফল, প্রিয় বন্ধুবর্গের পোষণেই বা কি গৌরব আর দারিদ্র্যাদি যাবতীয় কষ্ট যদি দূর হয় তাহাতেই বা কি সার্থকতা? আত্মাকে ছাড়িয়া যত কিছু ভ্রমণ তাহা শুধু শারীর শ্রম, আত্মদর্শন-বিযুক্ত যত কিছু দেখা তাহা শুধুই চক্ষুর ক্লান্তি। প্রিয়জনের মধ্যে যদি নিখিল-প্রীতির উৎসকে ধরিতে না পারা যায় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ভালবাসিয়া কেবল মোহেরই সঞ্চার। আত্মা রূপ পরমধনকে বাদ দিয়া যদি পার্থিব সম্পদকে বড় করিয়া দেখিতে যাও তাহা হইলে উহা সম্পদ নয়—বিপদ, সুখ নয়—পুঞ্জিত দুঃখ-ভার।

জাহ্নবী প্রভৃতি কত পবিত্র তীর্থে স্নান করিলাম, কিন্তু হইল কি? পুণ্যলাভের আশায় ষোড়শ দান করিলাম, কি পাইলাম? কোটিবার মন্ত্র জপ করিয়াও দেখিয়াছি, কই, হৃদয় তো ভরিল না। না, কিছুতেই কিছু হইবার নয়, পাইবার নয়, ভরিবার নয়। আত্মার সাক্ষাৎকার বিনা সবই বৃথা।

কথাপ্রসঙ্গে

শিশু

"এই দেহের অভ্যন্তরে একটি শিশু বসিয়া আছে, তাহাকে যদি জানিতে পার তো সাতটি উগ্র শত্রুকে জয় করিতে পারিবে।" —বলিয়াছেন, বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। শিশুটি কে? সারা শরীরে অবিশ্রান্ত সঞ্চরণশীল প্রাণ; প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, প্রতি শিরায় উপশিরায় স্নায়ুতন্ত্রীতে, প্রতি জীবকোশে আলস্যহীন কুণ্ঠাহীন তাহার নর্তন, ক্রিয়া—কিন্তু বিন্দুমাত্র আসক্তি নাই, পক্ষপাত নাই; সত্যই সে শিশু—শিশুর মত এই দেহের খেলা-ঘরে খেলিতে বসিয়াছে, যে কোন মুহূর্তে যদি খেলাঘর ভাঙ্গিয়া যায় হাততালি দিয়া চলিয়া যাইবে, অপর জায়গায় আর একটি খেলার আসর জমাইবে। চোখ কান প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি একটু কাজ করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, আবার ঐটুকু কাজের মধ্যেই কত তাহাদের ভালমন্দ বিচার, কত আসক্তি-বিরাগ! প্রাণের কিন্তু ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই—আমাদের জাগ্রতাবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয়নিচয় যখন সক্রিয়, প্রাণ তখন তাহাদের পিছনে থাকিয়া উৎসাহ দিতেছে; আবার চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি নিদ্রায় যখন অচেতন, প্রাণ তখনও জাগিয়া। জাগিয়া জাগিয়া ঘুমন্ত ইন্দ্রিয়-মনের নৈষ্কর্ম্য দেখিতেছে—যেন সঙ্গীবিহীন শিশু নিঝুম দ্বিপ্রহরে আপনার মনে পল্লীপথে গান গাহিয়া ফিরিতেছে! ইহাও যে শিশুর এক খেলা।

শতবাসনা-ব্যাকুল সদাক্ষুব্ধ নিত্য-অতৃপ্ত এই রক্তমাংসের দেহের মধ্যে এমন একটি নিরাকাঙ্ক্ষ, আত্মতৃপ্ত শিশু বসিয়া আছে—এই অনুভূতি নিশ্চিতই মূল্যবান। তাই উপনিষদের উপদেশ—প্রাণরূপ শিশুকে জানো, জানিয়া দুই চোখ, দুই কান, দুই নাক ও মুখ—মস্তকস্থ বিষয়োপলব্ধির এই সাতটি ক্ষেত্রকে জয় কর। ঐ সাতটি ক্ষেত্র যখন উচ্ছৃঙ্খল থাকে তখন তাহারা মানুষকে মোহাবর্তে ফেলিয়া অনবরত নাকাল করিয়া মারে। উহাদিগকে সংযত করিতে পারিলেই মানুষ জীবনের নিগূঢ় সত্যকে ধারণা করিবার যোগ্যতা লাভ করে। উহাদিগকে সংযত করিবার উপায় প্রাণ-বিজ্ঞান।

দেহাভ্যন্তরচারী প্রাণ শিশু বটে, কিন্তু পরম-শিশু নয়। পরম-শিশু হইলেন চৈতন্যস্বরূপ ভগবান—যিনি প্রাণেরও প্রাণ, প্রাণকেও যিনি খেলায় লাগাইয়া খেলা করিতেছেন, চরাচর অখিল বিশ্ব-জগৎকে যিনি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে বার বার বাহির করিয়া আবার টানিয়া লইয়া প্রকাশ-বিলয়ের লীলায় মত্ত রহিয়াছেন। মহাপ্রলয়ে প্রাণ-শিশুও ঘুমাইয়া পড়ে কিন্তু পরম-শিশু ভগবানের ঘুম নাই। সত্ত্ব-রজ-স্তমঃ—তিনগুণের উর্ধ্বে তিনি, জাগরণ-স্বপ্ন-নিদ্রা তিন অবস্থার অতীত তিনি। কিছুরই তিনি বশ নন, কোথাও তিনি বাঁধা নন, কোন বেড়াই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, কোন বিশেষণই তাঁহাকে সংজ্ঞিত করিতে পারে না। স্বতন্ত্র, চিরমুক্ত, নিরাভরণ, নির্লক্ষণ, উলঙ্গ শিশু। উপনিষদের প্রাণশিশুর দিগ্‌দর্শন লইয়া পরবর্তী স্মৃতিপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র শিশুর উপমাতেই ভগবানের শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। যুগে যুগে ভাবুক ও কবিগণ বিশ্বনিয়ন্তার শিশুত্বকে তাঁহাদের রচনার ও সঙ্গীতের একটি অনবদ্য শ্রেষ্ঠ উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

ভগবান মানুষদেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন, মনুষ্যজন্মে কত অদ্ভুত কীর্তি দেখাইয়া যান, কিন্তু ভক্ত সেই সকল কীর্তির অপেক্ষা তাঁহার শৈশব-কালের ছুটাছুটি খেলাধূলাটাই বেশী করিয়া মনে রাখে। ভগবানের যে তখনও অবতারত্ব-স্বীকারের দায়িত্ব দেখা দেয় নাই, কর্তব্যের জোয়াল কাঁধে চাপে নাই—এই মায়িক জগতের ভালমন্দ হইতে তখনও তিনি দূরে, অতিদূরে—সরযূতীরের খেলায়

মাঠে, যমুনাতটের ঝাড়ে জঙ্গলে। তখনই তো তিনি ত্রিগুণাতীত ভগবান, নির্মায়িক, নিষ্কিঞ্চন নিরভিমান, আত্মারাম শিশু।

ভক্তশ্রেষ্ঠ বিল্বমঙ্গলের বর্ণনা—

শিশুর বাঁশী বাজিতেছে। কি আশ্চর্য শক্তি সেই বাঁশীর! স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল—তিন লোক পাগল হইয়া উঠিয়াছে। আবাঙ্‌মনসোগোচর গম্ভীর প্রশান্ত বেদসত্য কথা কহিতে চাহিতেছে। নিশ্চল মহীরুহের গায়ে রোমাঞ্চ দেখা দিয়াছে। কঠিন শৈলশ্রেণী বিগলিত, মৃগকুল বিবশভাবে দাঁড়াইয়া, মূক গাভীদলের মুখে আনন্দধ্বনি। বাঁশীর সুরে গোপগণের প্রাণ, বংশীবাদক শিশুর সহিত মিলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, যোগি-ঋষিগণের চিত্তমঞ্জরীতে দেখা দিয়াছে অহৈতুকী ভক্তির মুকুল। সপ্তস্বর প্রকাশ করিয়া, মহা ওঁকার নাদ বিশ্বভুবনে প্রকট করিয়া যে বাঁশী বাজিতেছে—শাশ্বত শিশুর সেই দিব্য মুরলীধ্বনির জয় হউক!

দুঃসহ প্রেষ্ঠ-বিরহ

অসহ্য হৃদয়-বেদনা—যিনি প্রিয়ের প্রিয়, এই নিখিল সংসারে সর্বাপেক্ষা ভালবাসিবার বস্তু, তাঁহার সান্নিধ্য হইতে বঞ্চিত থাকিবার মর্মান্তিক ব্যথা! কিন্তু সেই দুর্বিষহ বিরহের দাহ আবার ভক্তের নিকট আকাঙ্ক্ষিতও বটে। কেননা—

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ-নির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥

কৃষ্ণবিদ্বেষী কর্তৃক অর্গলাবদ্ধা কৃষ্ণদর্শনে অপারগ গোপিকাগণের শ্রীকৃষ্ণবিরহের তীব্র জ্বালায় সকল অশুভ কর্ম পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া গেল। বাকী যে রহিল সকল শুভ কর্মের স্বর্ণশৃঙ্খল—সেই শৃঙ্খল হইতেও তাঁহারা মুক্ত হইলেন। বাস্তবে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে না পারিয়া ধ্যানযোগে তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া যে পরমানন্দের বন্যা নামিল সেই বন্যায় তাঁহাদের শুভকর্মসমূহ ভাসিয়া গেল। এইরূপে শুভ এবং অশুভ দুইই দূর হওয়ায় তাঁহারা গুণময়ী মায়া হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। (ভাঃ, ১০।২৯।১০)

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিকাগণের বিরহ একটি নিত্যকালের আধ্যাত্মিক সত্যের পরিজ্ঞাপক। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মভক্তগণকে বলিতেন, "সাকার না মানো রাধাকৃষ্ণের ঐ টানটুকু নেবে।" কোন্ সুদূর উত্তুঙ্গ পর্বতশৈলে তটিনী জন্মলাভ করিয়াছে কিন্তু মহাসমুদ্রের আকর্ষণ সে কি অবহেলা করিতে পারে? যতদিনই লাগুক, যত বাধাই আসুক, সমুদ্রে না মিলিয়া তাহার কি শান্তি আছে? মহাসাগরকে পাইবার আশায় তাহার দুর্গম চলার পথের সকল কণ্টক কুসুমের সৌরভই বহন করিয়া আনে। কষ্টকে সে কষ্ট বলিয়া মানে না। বিচ্ছেদ তাহার তপস্যা—আনন্দ। সেইরূপ মানুষেরও জীবনের লক্ষ্য ভগবান। চিরদিন মানুষ খেলাঘর লইয়া মত্ত থাকিতে পারে না—ভগবানকে চাহিবার, তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া কাঁদিবার, তাঁহার জন্য তীব্র অভাববোধ করিবার শুভলগ্ন তাহার জীবনে একদিন আসিতে বাধ্য। যেমন করিয়া পৃথিবীর রসে, সূর্যের আলোতে তাহার দেহ পরিপুষ্ট হয়, প্রাণরক্ষার জন্য মুহূর্তে মুহূর্তে তাহাকে বাতাস টানিতে হয়, দিনের পর দিন জল পান করিতে হয়—যেমন করিয়া সে ভাবিতে শিখে, তাহার বুদ্ধিবিচারের উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়, দশটা দেখিয়া শুনিয়া পুঁথি পড়িয়া সে মনোলোকের ঐশ্বর্য সঞ্চয় করে ঠিক তেমনি করিয়াই, সময় হইলে ভগবদ্-বিরহের আগুন একদিন তাহার ভিতর জ্বলিয়া উঠে—মানব-প্রকৃতির স্বভাববশেই জ্বলিয়া উঠে। দেহের আকাঙ্ক্ষা, জৈবিকপ্রাণের তৃষ্ণা, মনের বিকাশশীলতা যেমন কল্পনা নয়, অপ্রত্যাখ্যেয় সর্বজনীন সত্য, অনন্ত প্রেমস্বরূপ ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার ইচ্ছা সেইরূপই মানুষের জীবনের একটি বৈজ্ঞানিক সত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ব্যাকুলতা হলেই অরুণ-

উদয় হল। তারপর সূর্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন।" অতএব ব্যাকুলতা দুর্লভ ধন, বিরহ সাধকের চির-আকাঙ্ক্ষিত সম্বল—যে সম্বলে সংসারের ভাল-মন্দ সকল প্রকার মোহ চুরমার করিয়া সাধক একদিন সংসার-সার ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে।

যুগ যুগ ধরিয়া দেশ-দেশান্তরের কতশত বিরহীর দিব্য চরিত্র ধর্মসাধনার ইতিহাস আলোকিত করিয়া আছে। আরও কত শত সহস্র অজ্ঞাত অশ্রুত আউল-আউলী মানুষের পর্যবেক্ষণের অন্তরালে ভগবানের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া পৃথিবীর মাটি ভিজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহার হিসাব কে রাখিয়াছে? ইঁহাদের সেই অশ্রুই তো স্বার্থ-দ্বেষ-হিংসাজর্জরিত এই কঠিন পৃথিবীতে চিরকালের জন্য শান্তির অমৃত হইয়া রহিয়াছে। ইঁহাদের বিরহ-সঙ্গীতই তো চিরকালের জন্য দুঃখ-বিপদ-নিরাশার মধ্যে মানুষের হৃদয়ে তুলিতেছে লোকাতীত অভয়, আশা ও আনন্দের সুর।

দুঃসহ প্রেষ্ঠ-বিরহ! কবি বিদ্যাপতির বর্ণনায়, যেন ভরা ভাদ্রের তিমিরময়ী কৃষ্ণা রাত্রি জীবনে নামিয়া আসিয়াছে। ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশে লেশমাত্র আলো নাই, মেঘ গর্জন করিতেছে, বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, শত শত বজ্র ভীম রবে ফাটিয়া পড়িতেছে। তথাপি ভয় পাইলে চলিবে না, আশা ছাড়িলে চলিবে না। হয়তো এই দুর্যোগ ঠেলিয়াই মধ্যরাত্রে চিরবাঞ্ছিত অতিথি দরজায় আসিয়া দাঁড়াইবেন। তাই নির্নিমেষ নয়নে অন্ধকার ভেদ করিয়া তাঁহারই পথের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে, শূন্য মন্দিরে তাঁহারই প্রতীক্ষায় রাত্রি জাগিয়া কাটাইতে হইবে—সে রাত্রি যত দীর্ঘই হউক, যত ভয়ঙ্করই হউক, যত নিঃসঙ্গই হউক।

আবার সপ্তদশ শতাব্দীর একজন ইংরেজ ভগবদ্-বিরহীর* মুখেও বিদ্যাপতি-মীরাবাইএর গান শুনিতে পাইতেছি—

"হে আমার ভগবান, আমি যেন সেই প্রেমের পথ ধরিয়া চলিতে পারি যেখানে অন্য কিছুর উপর স্বার্থবুদ্ধি নাই। কত ভালবাসা তোমায় ঢালিয়া দিব তাহা যে আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম; আমার সকল কল্পনা, সকল কামনা যে এখানে হার মানিয়াছে। হে আমার প্রিয়তম, তুমিই ঠিক করিয়া দিও এই ভালবাসার সীমা কোথায় টানিব। আমি তো জানি, ইহার সীমা নাই। যত তোমায় ভালবাসি, আমার অন্তরাত্মার অভীপ্সা তোমার জন্য ততই উদ্বেল হইয়া উঠে, ততই আমি চাই তোমার জন্য কাঁদিতে, তোমার জন্য দুঃখবরণ করিয়া লইতে।"

"বিভক্ত সত্তা"

'সংস্কৃতি' সম্বন্ধে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি পুস্তকে ("Four Phases of Culture"—By R. D. Sinha Dinkar) শ্রীজওহরলাল নেহরু একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ভারতবাসীদেরই উদ্দেশ্যে তাঁহার কিছু প্রাণের বেদনা ইহাতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভূমিকাটির অনেক অংশ 'লেখা' না বলিয়া সবাক্ চিন্তা (loud thinking) বলা যাইতে পারে—একান্ত আপনার জনদের কাছে ঘরোয়া মনের ভাব প্রকাশ। কিন্তু মনের ভাব ছাপার অক্ষরে দেখা দিলে উহা আর 'ঘরোয়া' থাকে না, সর্বসাধারণ উহা পড়ে এবং পড়িয়া খুশীমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। 'নিউইয়র্ক টাইম্‌স্ ম্যাগাজিন' (১১ই মার্চ, ১৯৫৬) নেহরুজীর ঐ ভূমিকাটি হইতে সঙ্কলন করিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন—নাম দিয়াছেন, "ভারতবর্ষের 'বিভক্ত সত্তা'র ব্যাখ্যায় নেহরু।" (Nehru explains India's 'split personality') 'Split Personality' কথাটি বর্তমান মনোবিজ্ঞানের

* Dame Gertrude More.

একটি সংজ্ঞা। কখনও কখনও নানাপ্রকার অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে মানুষের মনের একতা নষ্ট হয়, পরস্পরবিরুদ্ধ আবেগরাশির সংঘাতে তাহার সামগ্রিক ব্যক্তিত্বটি তখন যেন দুই বা ততোধিক টুকরা হইয়া যায়; এক একটি টুকরা এক এক ক্ষেত্রে কাজ করিতে থাকে। যেমন, এক টুকরা ডাকাতি করে, আর এক টুকরা অন্য সময়ে এমন সাধু আচরণ করে যে লোকে অবাক হইয়া যায়। একই ব্যক্তি এমন পরস্পর-বিরুদ্ধ আচরণ কি করিয়া করে তাহার ব্যাখ্যায় বর্তমান মনোবিজ্ঞান বলেন ঐ ব্যক্তি বস্তুতঃ আর এক ব্যক্তি নয়—এক দেহ-মনে দুইটি ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে—ডাকাত ও সাধু। উহার personality (ব্যক্তিত্ব) এখন আর একটি অখণ্ড শক্তি নয়—উহা বিভক্ত (split) হইয়া গিয়াছে। ব্যক্তিত্বের এই খণ্ডীভবন একটি চরম মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ, মানুষের জীবনে উহা একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা সন্দেহ নাই। নিউইয়র্ক টাইম্‌স্‌ ম্যাগাজিনের দেশবিদেশের পাঠকমণ্ডলী এখন জানিবে সমগ্র ভারত-মানসে এইরূপ একটি ভীষণ বিপর্যয় আসিয়াছে, স্বয়ং ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইহাতে শঙ্কিত। নেহরুজী তাঁহার মনোবেদনা প্রকাশের জন্য বর্তমান মনোবিজ্ঞানের ঐ সংজ্ঞাটি ব্যবহার না করিলেই বোধ করি ভাল করিতেন। উহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু অপপ্রচার ঘটিতে পারে।

নেহরুজীর মনোবেদনার প্রধান বিষয় হইল ভারতবর্ষে এখনও জাতিভেদপ্রথা কেন রহিয়াছে।

"অসংখ্য বিভাগ লইয়া জাতিপ্রথা ভারতবর্ষের একটি নিজস্ব সৃষ্টি। অস্পৃশ্যতা, সকলে একসঙ্গে বসিয়া ভোজনে বাছবিচার, সকলের সহিত বিবাহে বিধি-নিষেধ ইত্যাদি অন্য কোন দেশে নাই। ইহার ফলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বর্তমান কালেও ভারতীয়েরা অপরের সহিত মিশিতে কষ্টবোধ করে। শুধু তাই নয়, ভারতের প্রত্যেক জাতি অপর দেশে গিয়াও ঐ জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে। ভারতবর্ষে আমাদের অধিকাংশ মানুষই এই ব্যাপারটিকে মানিয়াই নেন, বুঝিতেই পারেন না অন্যান্য দেশবাসীর কাছে ইহা কিরূপ বিস্ময়কর ও চিত্তপীড়াদায়ক।

"ভারতবর্ষে আমরা যেমন একই সঙ্গে বিপুলতম সহিষ্ণুতা এবং চিন্তা ও মতের উদারতার বিকাশ সাধন করিয়াছি তেমনিই আবার সৃষ্টি করিয়াছি সঙ্কীর্ণতম সামাজিক আচরণ। এই 'বিভক্ত সত্তা' আমরা বহন করিয়া চলিয়াছি; আজও ইহার বিরুদ্ধে আমাদিগকে যুঝিতে হইতেছে। আমরা আমাদের রীতিনীতি ও অভ্যাসের দুর্বলতা ও ক্ষুদ্রতাগুলিতে অনেক সময়ে নজর দি না। পূর্বপুরুষগণের উচ্চ ভাবরাশির দোহাই দিয়া ওগুলিকে ঢাকিতে যাই। কিন্তু ঐ দুয়ে যে একটি বাস্তব বিরোধ রহিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। এই বিরোধের যদি সমাধান আমরা না করিতে পারি তাহা হইলে এই 'বিভক্ত সত্তা' লইয়াই আমাদিগকে চলিতে হইবে। * * * যে আণবিক যুগের সূচনায় আমরা দাঁড়াইয়া, তাহাতে প্রবল ঘটনাসমূহের চাপে আমাদিগকে অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইতেই হইবে। যদি আমরা না পারি তাহা হইলে জাতি হিসাবে আমরা ব্যর্থ হইয়া যাইব এবং যে সব গুণ আমাদের আছে তাহাও আমাদিগকে খোয়াইতে হইবে।"

বর্তমান জাতিপ্রথার কুফল সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দও অনেক কড়া কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এই প্রথার পূর্বেতিহাস বিস্মৃত হন নাই। এককালে জাতিবিভাগ ভারতীয় জাতির সামগ্রিক লক্ষ্য—আধ্যাত্মিক সত্যের অনুশীলনের সহায়ক ছিল এবং সমাজের অনেক কল্যাণসাধনও করিয়াছিল। যে সকল ঐতিহাসিক কারণে সেই কল্যাণকর প্রথা বর্তমান সামাজিক প্রগতির পরিপন্থী আচার-পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে তাহারও বিশ্লেষণ স্বামীজী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে 'অস্পৃশ্যতা' আপোষহীন কঠিন হস্তে সর্বপ্রকারেই তুলিয়া দেওয়া উচিত কেননা উহা মানুষের কোন প্রকার সুনীতি ও বিবেকের সমর্থন পাইবার যোগ্য নয়। কোন কালেই উহা সমাজের কোন মঙ্গল করে নাই এবং করিতে পারে না। কিন্তু 'জাতিপ্রথা' কিভাবে এবং কতটা তুলিতে হইবে সে সম্বন্ধে স্বামীজী আরও ধীরতা ও বিশ্লেষণাত্মক বিচার অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন।

"মূলে জাতির অর্থ ছিল—এবং সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এই অর্থ প্রচলিত ছিল—প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ প্রকৃতি, নিজ বিশেষত্ব প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা। এমন কি খুব আধুনিক শাস্ত্রগ্রন্থসমূহেও বিভিন্ন জাতির একত্র ভোজন নিষিদ্ধ হয় নাই; আর প্রাচীনতর গ্রন্থসমূহের কোথাও বিভিন্ন জাতিতে বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই। তবে ভারতের পতনের কারণ কি? জাতি সম্বন্ধে এই ভাব পরিহার। * * * বর্তমান বর্ণবিভাগ (caste) বাস্তবিক পক্ষে জাতি নহে, বরং উহা জাতির উন্নতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ। উহা যথার্থ ই প্রকৃত জাতির অর্থাৎ বিচিত্রতার স্বাধীন গতিরোধ করিয়াছে। কোন বদ্ধমূল প্রথা বা জাতিবিশেষের বিশেষ সুবিধা বা কোন আকারের বংশানুক্রমিক শ্রেণীবিভাগ প্রকৃতপক্ষে জাতিকে অব্যাহত গতিতে যাইতে দেয় না, আর যখনই কোন জাতি আর এইরূপ নানা বিচিত্রতা প্রসব করে না, তখনই উহা অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। অতএব আমি আমার স্বদেশবাসিগণকে এই বলিতে চাই যে জাতি উঠাইয়া দেওয়াতেই ভারতের অধঃপতন হইয়াছে। * * * জাতি নিজ প্রভাব বিস্তার করুক, জাতির পথে যাহা কিছু বিঘ্ন আছে সব ভাঙ্গিয়া ফেলা হউক—তাহা হইলেই আমরা উঠিব।" (স্যার এস্ সুব্রহ্মণ্য আয়ারকে লিখিত পত্র; চিকাগো, ৩রা জানুয়ারী ১৮৯৫)

স্বামীজী নানাস্থলে লিখিয়াছেন যে, জাতিভেদ ধর্মবিধান নয়, উহা একটি সামাজিক বিধান মাত্র। "উহা নিজের কার্য শেষ করিয়া এক্ষণে ভারতগগণকে দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে।" মানুষের নিজের স্বত্ববুদ্ধি যত জাগ্রত হইবে ততই জাতিভেদের নাগপাশ শিথিল হইতে থাকিবে। অতএব পন্থা হইল সমাজে ব্যাপক শিক্ষাপ্রচার যাহাতে মানুষের মর্যাদাবোধ বাড়ে; তাহার চোখ খুলিয়া যায়। উচ্চবর্ণসমূহকে টানিয়া নীচে নামাইবার চেষ্টা না করিয়া নিম্নবর্ণগণকে অবাধে উচ্চবর্ণের শিক্ষা ও সংস্কৃতি দিয়া উপরে উঠাইতে হইবে।

শুধু তিরস্কার করিয়া, গালিগালাজ বা দুঃখ প্রকাশ করিয়া জাতিভেদ উঠিবার নয়। সমাজে অর্থনৈতিক ও শিক্ষার বৈষম্য দূর করাই ভারতবর্ষের আশু কর্তব্য—জাতিভেদের বিরুদ্ধে চিৎকার নয়। সেই চিৎকারে ভারতবর্ষ এক পাও অগ্রসর হইবে না—যাহারা ভারতের সম্বন্ধে কতকগুলি অপপ্রচারের সুযোগ খুঁজে তাহাদেরই আনন্দ বর্ধন করা হইবে মাত্র। জাতিভেদ একটি বৃহৎ সমস্যা সন্দেহ নাই কিন্তু উহা অপেক্ষা আরও বড় বড় সমস্যা রহিয়াছে, যেগুলির সমাধান আমাদিগকে আগে করিতে হইবে।

যাহা লক্ষ্য করিয়া শ্রীনেহরু 'Split Personality' শব্দটির ব্যবহার করিয়াছেন তাহা স্বামী বিবেকানন্দও বার বার উল্লেখ করিয়া গিয়াছিলেন।

"হিন্দুধর্মের ন্যায় আর কোন ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরীব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম এরূপ করে না। ভগবান আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ধর্মের কোন দোষ নাই। তবে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড 'পারমার্থিক ও ব্যবহারিক' নামক মতদ্বারা সর্বপ্রকার আসুরিক অত্যাচারের যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে।" —(আমেরিকা হইতে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখিত পত্র; ২০।৮।১৮৯৩)।

'আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড' যাহা করিয়াছে তাহা নিশ্চিতই সমগ্র জাতির দুষ্কৃতি নয়। ভারতমানসের সত্তা বিভক্ত হয় নাই। আদর্শ এবং আচরণের বৈষম্য ভারতীয় জাতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়, সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষীরাই এই কলঙ্কের জন্য দায়ী। স্বামীজীর মতে "মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা" যত দ্বারে দ্বারে প্রচারিত হইবে, শিক্ষার দ্বারা অত্যাচারিতগণের যত চোখ খুলিয়া যাইবে ততই জাতিভেদ বা অনুরূপ সামাজিক অমঙ্গলগুলি লঘু হইয়া আসিবে। অতএব ভাঙ্গার জন্য ব্যস্ত না হইয়া আমরা যেন গড়ার দিকে মনোযোগ দিই।

দুইটি ছবি

সকালে সমীরবাবুকে অযোধ্যাসিং তাহার ইতিবৃত্ত শুনাইতেছিল—কলিকাতার রাস্তার পুরাতন কাগজের কারবারী হিন্দুস্থানী যুবক অযোধ্যা সিং। কাঁধে তাহার একটি বোরা, বোরার মধ্যে ক্রীত

খবরের কাগজ, পুরাতন মাসিকপত্র ইত্যাদি এবং দাঁড়িপাল্লা ও কয়েকটি বাটখারা। বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ঐ কাগজ সে কেনে। আড়ৎদারের কাছে লাভ রাখিয়া বেচিয়া দেয়।

অযোধ্যা সিং বলিয়া গেল: তাহার বাড়ী—গয়া জিলায়। কলিকাতায় আসিয়াছে আজ পাঁচ বৎসর। সকালে স্নান সারিয়া, কিছু খাইয়া বেলা ৮টা নাগাদ সে কাজে বাহির হয়, ডেরায় ফিরিতে ১২টা/১টা বাজে। এক এক দিন এক একটি অঞ্চলে যায়, কোন দিন শ্যামবাজার-বাগবাজার, কোন দিন সিঁথি-বরাহনগর বা বহুবাজার-ইটালি। গলি গলি ঘুরিয়া প্রত্যেক দিন ৫।৬ মাইল হাঁটিতে হয়। বৈকালে আর একাজে বাহির হয় না, দাদার ছোট কাপড়ের দোকানে 'মদদ্' দেয়। সে কলিকাতায় আসিয়াছিল প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায়; কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে ২৫৲ টাকা মূলধন লইয়া এই ব্যবসায় আরম্ভ হয়। মাসে সে রোজগার করে ১০০ টাকা হইতে ১৫০ টাকার মধ্যে। জীবনযাত্রা তাহার খুবই সরল। বেশ মোটা টাকাই সে বাড়ীতে মণিঅর্ডার করে ও জমায়। তাহার মনে কোন অভিযোগ নাই, উদরান্নের কোন ভয়ও নাই।

বিকালের ডাকে সমীরবাবু মফস্বলের এক শহর হইতে একটি চিঠি পাইলেন, লেখক—১৯ বৎসর বয়স্ক জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক।

"* * * আমি ভদ্রঘরের সন্তান। গত ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ-মাধ্যমিক-শিক্ষাপরিষদ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাস্তুহারা হইয়া ভারতে আসি এবং গত ১৯৫৪ সালে... মহাবিদ্যালয়ে I. A. পড়িতে আরম্ভ করি। কিন্তু ১ বৎসর পরে অর্থাভাবে পড়া বন্ধ করিতে বাধ্য হই। তৎপর বাড়ীতে থাকিয়া প্রাইভেট টিউশনি করিতে থাকি এবং সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করি। গত ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদ হইতে সারস্বত ব্যাকরণের প্রথম (আদ্য) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি এবং এই বৎসর (১৯৫৬) কাব্যের প্রথম পরীক্ষা দিয়াছি।

প্রায় বৎসরাধিক কাল হইল বিভিন্ন স্থানে চাকুরির চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হইয়াছি। প্রথম কারণ কোন বিভাগেই আমার বিশেষ আত্মীয়-স্বজন নাই এবং দ্বিতীয় কারণ এই জেলায় বিশেষ কোন কলকারখানা ও অফিসাদি না থাকায় চাকরি হইবার সম্ভাবনা নাই। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়া বহু দরখাস্ত করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির কোন উত্তর পাই নাই এবং কতকগুলি কলিকাতায় যাইয়া নিজব্যয়ে ইণ্টারভিউ দিতে লিখিয়াছিল। আমি বর্তমানে যে অবস্থায় আছি তাহাতে কলিকাতায় কেবলমাত্র ইণ্টারভিউ দিতে যাওয়া অসম্ভব। হয়ত চোখের সম্মুখে ধীরে ধীরে বাবা, মা ভাইবোনদের মৃত্যু দেখিতে হইবে এবং আমাকেও আত্মহত্যা করিতে হইবে। বর্তমানে জীবনধারণের উপযোগী যে কোন চাকরি পাইলে সংস্কৃত পড়িতে পারিতাম এবং হয়ত বাড়ীর দুই এক জনকে বাঁচাইতে পারিতাম।"

সমীরবাবু ভাবিতে লাগিলেন সকালের ও বিকালের ছবি দুটি কত বিপরীত! একদিকে কলেজেপড়া, প্রাইভেট টিউশনি, চাকরির চেষ্টা, ইণ্টারভিউ—ভদ্র বাঙ্গালী যুবকের আত্মগ্লানি, ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন জগৎ; অপরদিকে স্বাবলম্বন, কায়িকশ্রমনিষ্ঠা, অধ্যবসায়, দ্বিধাহীন শঙ্কাহীন সাফল্যে আলোকিত অযোধ্যা-সিংএর সহজ দুনিয়া। হয়তো এই দ্বিতীয় ছবিতে কবিতা নাই, সাহিত্য নাই, 'সংস্কৃতি' নাই কিন্তু মা ভাইবোনদের মৃত্যু এবং আত্মহত্যার সঙ্কল্পও তো নাই!

সংস্কৃত ভাষার বলিষ্ঠ প্রভাব

গত ১৬ই শ্রাবণ (১লা আগস্ট, ১৯৫৬) পুণা, ভাণ্ডারকর প্রাচ্য গবেষণা মন্দিরে শ্রীজওহরলাল নেহরু সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে যে মন্তব্যগুলি করিয়াছেন তাহা ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীরই উপযুক্ত। উক্ত গবেষণা মন্দির হইতে মহাভারতের শান্তিপর্ব ও শল্যপর্ব সংক্রান্ত তিন খণ্ড সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হইয়াছিল এবং শ্রীনেহরু উহাতে বক্তৃতা দেন।

তিনি বলেন, শান্তিপর্ব সংক্রান্ত গ্রন্থটি পাঠ

করিলে আমাদের মন মহাভারতের সেই বিরাট যুগ ও পটভূমিকার দিকে ধাবিত হইয়া যায়—যখন আমাদের প্রাচীন রাজা ও রাজ্যসমূহ ছিল। সেই রাজা এবং রাজত্ব ধ্বংস হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু মহাভারত একটি বিপুল মহাকাব্য হিসাবে চিরকাল ভাস্বর হইয়া থাকিবে এবং দেশের কোন পরিকল্পনায় রাজনীতিকদের ভূমিকার গুরুত্ব অপেক্ষাও উহার মূল্য অধিক স্বীকৃত হইবে।

ভাব ও চিন্তাজগতে ভারতের গৌরব যে সংস্কৃত ভাষার মধ্য দিয়াই আসিয়াছে সেই প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী বলেন—

"সংস্কৃত ভাষা অতীত ভারতের একটি বিশিষ্ট রূপই নয়, ভারতের হাজার হাজার বৎসরের ইতিহাসে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। * * * বিশ্বে ধ্যান ধারণা অপেক্ষা শক্তিশালী আর কিছু নাই। কখনও কখনও কাজের প্রয়োজন, কিন্তু চিন্তাই অধিকতর প্রয়োজন। মানুষের চিন্তাধারাকে যে ভাষা উদ্বুদ্ধ করিতে পারিল এবং মানুষকে জ্ঞান বিতরণ করিল একমাত্র সেই ভাষাই শক্তিশালী। সংস্কৃতের মাধ্যমেই ভারতীয় জনগণের সংস্কৃতি সবচেয়ে বেশী বিকাশ হইয়াছে। ভারতকে রাজনৈতিক সত্তার দিক হইতে সম্প্রসারিত করা কিংবা ভাঙ্গিয়া দেওয়া চলিতে পারে, কিন্তু এই মৌলিক ভাষাটি সমগ্রভাবে ভারতের উপর প্রভাব চালাইয়া যাইবে। * * * যুগ যুগ ধরিয়া শুধু ভারতই নহে, সমগ্র পণ্ডিত ও মনীষীরা সংস্কৃতকে শ্রদ্ধার আসন দিয়া আসিয়াছেন।"

সংস্কৃত ভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী আশাবাদী। সংস্কৃত তথাকথিতভাবে আজ একটি কথ্য ভাষা না হইলেও এতকাল ইহা যে মর্যাদা পাইয়া আসিয়াছে ভবিষ্যতেও যে ঐ মর্যাদা পাইয়া চলিবে এই বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। ইহা অতীতের ন্যায় আগামী দিনেও ভারতের একটি অমূল্য ভাষা থাকিবে।

পাঠকের পত্র

হাওড়া হইতে জনৈক পাঠক লিখিতেছেন—

"আষাঢ় মাসের উদ্বোধন পত্রিকায় শ্রীনিত্যরঞ্জন গুহঠাকুরতা 'ইচ্ছাশক্তির প্রভাব' প্রবন্ধে তাঁহার পিতৃদেবের জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখিয়া এবং তাঁহার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবকে নিঃসন্দেহ মনে গ্রহণ করিয়াও আমরা বিস্মিত হইয়াছি এইরূপ একটি 'Mystic' প্রবন্ধ কেমন করিয়া 'উদ্বোধনে' স্থান পাইল।

সিদ্ধাই যে ঈশ্বর লাভের অন্তরায় এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে নিঃস্ব করিয়া দিয়াছিলেন নরেন্দ্রনাথের নিকট। ইচ্ছাশক্তির অভাব হইলে কোনও মহৎ কার্যই সম্পন্ন হয় না কিন্তু ইহার প্রভাব সিদ্ধাইরূপে আসিয়া পড়ার লোভ হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ অনেক সময় ধ্যানজপ পর্যন্ত বন্ধ রাখিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'ইচ্ছাশক্তির প্রভাব' অনেকের নিকট সিদ্ধাইয়ের নামান্তর বলিয়া বোধ হইবে। * * *"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাহাকে 'সিদ্ধাই' বলিতেন এবং সাধককে যাহা হইতে সতর্ক থাকিতে বলিতেন উহারই মহিমা প্রচারের জন্য আলোচ্য প্রবন্ধটি আমরা ছাপি নাই। রজস্তম দ্বারা আচ্ছন্ন ও বিক্ষিপ্ত মনকে সাত্ত্বিক চিন্তা ও অভ্যাস দ্বারা যদি শান্ত ও সংযত করা যায় তাহা হইলে উহার শক্তি কত বৃদ্ধি পায় মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্রে এই বিষয়ের বিস্তারিত দিগ্‌দর্শন আছে। মনঃশক্তির এই দূরপ্রসারী সম্ভাবনা নিশ্চিতই বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনার যোগ্য। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার একাধিক প্রবন্ধে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিরই নির্ণায়ক হিসাবে আমরা নিত্যরঞ্জনবাবুর প্রামাণিক তথ্য-সম্বলিত লেখাটি প্রকাশ করিয়াছি।

৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার সাত্ত্বিক প্রকৃতির জন্যই তাঁহার গুরু মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহাকে অসাধারণ ইচ্ছাশক্তিলাভের আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, মনোরঞ্জন বাবু কখনও এই শক্তির অপপ্রয়োগ করিবেন না, শুধু নিঃস্বার্থ আর্তসেবার জন্যই প্রয়োগ করিবেন। আলোচ্য প্রবন্ধটি ভাল করিয়া পড়িলে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। আমাদের বিচারে লেখাটির মধ্যে 'ইচ্ছাশক্তির প্রভাব' যেমন প্রকাশ পাইয়াছে তেমনি ফুটিয়া উঠিয়াছে সাধন-জীবনে ঈশ্বরনির্ভরতা, গুরূপদেশনিষ্ঠা এবং নিঃস্বার্থ ও নিরভিমান লোকসেবাব্রতের আদর্শ।

শিলাব্রহ্ম

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

ব্রহ্মজ্ঞানীরা জেনেছেন শুনি
বর্ণিতে তোমা পাননি বাণী।
মূঢ় অভাজন আমিও তোমারে কিছু ত জানি।

আমার জন্য ভাব হতে রূপে
ধাপে ধাপে তুমি এসেছ নামি
শেষে মোর ঘরে গিয়েছ থামি।

ঋষিরা হেরিল তোমা "আদিত্য-
বর্ণোজ্জ্বল তামস পারে
অজ অমূর্ত অমনা দিব্য
অপ্রাণ সিত পুরুষাকারে।

দশ দিক তব কর্ণযুগল
শীর্ষ তোমার স্বর্গলোক,
বেদ তব বাক্, বায়ু তব প্রাণ
তপন চন্দ্র তোমার চোখ,
সর্বভূতের অন্তরাত্মা
মহীতল তব পদোদ্ভব,
নিখিল বিশ্ব হৃদয় তব।"

এই ঘোর রূপ সংবরি তুমি
হোতার হোত্রে লভিলে হবি,
দেব হিরণ্যগর্ভের রূপে
বন্দিল তোমা বেদের কবি।

পার্থেরে তুমি দেখালে যেরূপ
কুরুক্ষেত্র-রথের 'পরে,
সে রূপ হেরিয়া শতরণজয়ী
সে বীর তরাসে কাঁপিয়া মরে।

পুরাণ হেরিল শেষ শয্যায়
প্রলয়সাগরে, পদ্মনাভ!
তাহাতে মূঢ়ের কি হ'লো লাভ?

চক্র-শঙ্খ-গদা-পঙ্কজ
ধরিয়া তোমার চতুর্ভুজে,
ভক্তের ধ্যানে উদিলে একদা
হেরিল তাহারা চক্ষু বুজে।

ধ্যান হতে তুমি নামিলে রূপে
পূজিত হইলে ফুলচন্দনে প্রদীপে ধূপে
বিরাট দেউলে রত্নবেদীতে
ঐশ্বর্যের আবেষ্টনে।
কৃপা ত হলো না মূঢ় দীন হীন এ অভাজনে।

হাসিয়া তখন দ্বিভুজে ধরিলে
মুরলী, তাহার শুনিনু তান
আরো কাছে পেতে চাহিল প্রাণ।

বুঝেছি মহতো মহীয়ান তুমি
অণোরণীয়ান তাও যে প্রভু,
যত বড় হও ছোট হতে তুমি পারো যে তবু।
বেদ-বেদান্তে একলা থাকিবে কেমন ক'রে?
আমি তোমা চাই, আরো বেশি তুমি চাও যে মোরে।

শালগ্রামের রূপ ধরি শেষে
আসিলে আমার খড়ের ঘরে।
বিরাজ করিছ তুলসীপত্র শয্যা'পরে।

ঋষিরা তোমারে জেনেছেন ভালো
আমি রই হয়ে কৃতাঞ্জলি।
একেবারে তোমা চিনিনা এখন কি ক'রে বলি।

"নির্জনে দৈ পেতে মাখন তুলতে হয়। জ্ঞান-ভক্তিরূপ মাখন যদি একবার মনরূপ দুধ থেকে তোলা হয়, তা হ'লে সংসার-রূপ জলের উপর রাখলে নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাসবে। কিন্তু মনকে কাঁচা অবস্থায়—দুধের অবস্থায়, যদি সংসাররূপ জলের উপর রাখ, দুধ জলে মিশিয়ে যাবে।"
—শ্রীরামকৃষ্ণ

কৃষ্ণ

স্বামী বিবেকানন্দ

(পূর্বে অপ্রকাশিত)

[স্বামিজী এই বক্তৃতাটি দিয়াছিলেন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিস্কো অঞ্চলে। বক্তৃতাকালে আইডা আনসেল (Ida Ansell) নাম্নী জনৈকা শ্রোত্রী তাঁহার ব্যক্তিগত অনুধ্যানের জন্য ইহার সাংকেতিক লিপি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি ভাষণটি প্রকাশের জন্য ইহার সাংকেতিক লিপি উদ্ধার করেন। মূল ইংরেজী বক্তৃতাটি Vedanta and the West (হলিউড্ বেদান্ত সোসাইটির মুখপত্র) পত্রিকায় জানুআরি-ফেব্রুআরি, ১৯৫০ সংখ্যায় বাহির হইয়াছে। যেখানে লিপিকার স্বামীজীর ভাষণের কথাগুলি ঠিকমত ধরিতে পারেন নাই সেখানে …… চিহ্ন দেওয়া আছে। ( ) প্রথম বন্ধনীর মধ্যেকার অংশ স্বামীজীর ভাব পরিস্ফুটনের জন্য লিপিকার কর্তৃক সন্নিবেশিত।]

যে কারণ-পরম্পরার ফলে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান, প্রায় সেইরূপ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল। শুধু ইহাই নয়, তদানীন্তন ঘটনাবলী বর্তমানেও আমরা ঘটিতে দেখি।

কোন নির্দিষ্ট আদর্শ রহিয়াছে। কিন্তু ইহাও ঠিক যে, মানবজাতির একটি বৃহৎ অংশ এই আদর্শে পৌছিতে পারে না, উহা ধারণাতেও আনিতে পারে না।…… যাঁহারা শক্তিমান তাঁহারা ঐ আদর্শ অনুযায়ী চলেন, অনেক সময়েই অক্ষমদিগের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি প্রকাশ পায় না। শক্তিমানের নিকট দুর্বল তো শুধু কৃপারই পাত্র! শক্তিমানরাই আগাইয়া যান।…… অবশ্য ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি যে দুর্বলের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সাহায্যপরায়ণ হওয়াই উচ্চতম দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দার্শনিকগণ আমাদের হৃদয়বান্ হওয়ার পথে বাধা হইয়া দাঁড়ান। এখানকার এই কয়েক বৎসরের অস্তিত্ব দ্বারা এখনই সমুদয় অনন্ত জীবনটি নির্দিষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে—এই মতের যদি অনুসরণ করিতে হয়……তবে ইহা আমাদের কাছে বিশেষ নৈরাশ্যসূচকই হইবে……এবং দুর্বল-গণের দিকে আমাদের ফিরিয়া তাকাইবার অবসরই থাকিবে না। কিন্তু এই মত স্বীকার যদি অবশ্যম্ভাবী না হয়—পূর্ণতালাভের জন্য আমাদের অবশ্য-অতিক্রমণীয় বহু অভিজ্ঞতা-ক্ষেত্রের মধ্যে এই জগৎ যদি একটিমাত্র শিক্ষালয়ই হয়, অনন্ত জীবন যদি শাশ্বত নিয়ম অনুযায়ীই গঠিত, রূপায়িত এবং পরিচালিত হইতে থাকে আর শাশ্বত নিয়ম ও অপরিমিত সুযোগ যদি প্রত্যেকের জন্যই প্রতীক্ষা করিয়া থাকে তাহা হইলে তো আমাদের তাড়াহুড়া করিবার কোন প্রয়োজন নাই। সমবেদনা জানাইবার, চারিদিকে চাহিবার এবং দুর্বলকে সহায়তা দিয়া তুলিয়া ধরিবার সময় সেক্ষেত্রে আমাদের তো প্রচুরই রহিয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের সম্পর্কে সংস্কৃতে আমরা দুইটি শব্দ পাই; একটির অনুবাদ—'ধর্ম', অপরটির—'সম্প্রদায়'। ইহা খুবই বিস্ময়কর যে, শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য ও বংশধরগণের অবলম্বিত ধর্মের কোন নাম নাই, (যদিও) বিদেশীরা ইহাকে হিন্দুধর্ম বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বলিয়া অভিহিত করেন। 'ধর্ম' বস্তুটি একই, তবে 'সম্প্রদায়' অনেক। যে মুহূর্তে তুমি ধর্মের একটি নাম দিতে যাও, ইহাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়া অন্যান্য হইতে আলাদা করিয়া ফেল, তৎক্ষণাৎ উহা একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়, উহা তখন আর ধর্ম থাকে না। সম্প্রদায় শুধু নিজের মতটিই (প্রচার করে) এবং ইহাও ঘোষণা করিতে ছাড়ে না যে উহাই একমাত্র সত্য, অন্যত্র কোথাও আর সত্য নাই। পক্ষান্তরে ধর্ম বলে যে, জগতে একটিমাত্র ধর্মই হইয়াছে এবং একটিই আছে। দুইটি ধর্ম কখনও ছিল না। একই ধর্ম বিভিন্ন স্থানে উহার বিভিন্ন

দিক (উদ্‌ঘাটিত করিতেছে)। আমাদের কাজ হইল মানবজাতির লক্ষ্য এবং তাহার বিকাশের সুযোগ সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করা।

ইহাই ছিল শ্রীকৃষ্ণের মহৎ কীর্তি : আমাদের চক্ষুকে স্বচ্ছ করিয়া ঊর্ধ্বে এবং সম্মুখে আগুয়ান মানবজাতিকে উদার দৃষ্টিতে দেখিতে শিখানো। যে বৃহৎ হৃদয় সর্বপ্রথম সকলের মতের মধ্যে সত্যকে দেখিতে পাইয়াছিল সে তো তাঁহারই, প্রত্যেক মানুষের জন্য সুন্দর সুন্দর কথা তো তাঁহারই মুখ হইতে প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল।

এই যে কৃষ্ণ—ইনি বুদ্ধের কয়েক সহস্রবর্ষের পূর্ববর্তী। এমন বহু লোক আছেন যাঁহারা কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতায় বিশ্বাসবান্ নন। কাহারও কাহারও বিশ্বাস—প্রাচীন সূর্যোপাসনা হইতেই (শ্রীকৃষ্ণের পূজা প্রচলিত হইয়াছে।) সম্ভবতঃ কৃষ্ণ নামের বহু ব্যক্তি ছিলেন। এক কৃষ্ণের বিষয় উপনিষদে উল্লেখ আছে, একজন কৃষ্ণ ছিলেন রাজা, আর একজন সেনাপতি। সবগুলি এক কৃষ্ণে সম্মিলিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আমাদের কিছুই আসিয়া যায় না। ব্যাপার এই যে, যখন এমন কেহ একজন আবির্ভূত হন যিনি আধ্যাত্মিকতায় অনুপম তখন নানাপ্রকার পৌরাণিক কাহিনী তাঁহাকে ঘিরিয়া রচিত হয়। কিন্তু বাইবেল প্রভৃতি যত ধর্মগ্রন্থ এবং উপাখ্যান-সমূহ যাহা এইরূপ এক ব্যক্তির উপর আরোপিত হয়—ঐগুলিকে তাঁহার চরিত্রের (ছাঁচে) নূতন করিয়া ঢালা প্রয়োজন। বাইবেলের নিউ টেস্টা-মেণ্টের গল্পগুলি খ্রীষ্টের জীবন (এবং) চরিত্রের আলোকেই রূপায়িত করা উচিত। বুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতীয় সমস্ত কাহিনীতেই পরের জন্য ত্যাগ—তাঁহার সমগ্র জীবনের এই প্রধান সুরটি বজায় রাখা হইয়াছে। ·····

কৃষ্ণের মধ্যে আমরা পাই·····তাঁহার বাণীর দুইটি প্রধান ভাব : প্রথম—বিভিন্ন মতের সমন্বয় ; দ্বিতীয়—অনাসক্তি। মানুষ রাজসিংহাসনে বসিয়া, সেনাবাহিনী পরিচালনা করিয়া, জাতিসমূহের জন্য বড় বড় পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিয়াও পূর্ণতায় অর্থাৎ চরমলক্ষ্যে পৌছিতে পারে। ফলতঃ কৃষ্ণের মহাবাণী যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রচারিত হইয়াছিল।

প্রাচীন পুরোহিতকুলের ঢংঢাং, আড়ম্বর ও ক্রিয়াকলাপাদির অসারতা কৃষ্ণের সুস্পষ্ট দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল, তথাপি এই সমস্তের মধ্যে তিনি কিছু ভালও দেখিয়াছিলেন।

তুমি যদি শক্তিধর হও, উত্তম। কিন্তু তাই বলিয়া, যে তোমার মত বলবান নয় তাহাকে অভিশাপ দিও না।······ প্রত্যেকে এই কথাই বলিয়া থাকে, "হতভাগ্য লোক তোমরা !" কে আর বলে, "আহা আমি কী হতভাগ্য যে তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিতেছি না ?" লোকেরা নিজ নিজ সামর্থ্য, সঙ্গতি ও জ্ঞান অনুযায়ী যতদূর করিবার ঠিকই করিতেছে, কিন্তু কী আফশোষ, আমি তো তাহাদিগকে নিজের স্তরে টানিয়া তুলিতে পারিতেছি না !

তাই কৃষ্ণ বলিলেন, আচার-অনুষ্ঠান, দেবার্চনা, পুরাণকথা এ সকল ঠিকই।······ কেন ? কারণ তাহারা একই লক্ষ্যে পৌছাইয়া দেয়। ক্রিয়া-কলাপ, শাস্ত্র, প্রতীক—এ সবই সমগ্র শিকলটির এক একটি কড়া। উহা শক্ত করিয়া ধর। দরকার ইহাই। যদি তুমি অকপট হও আর যদি শিকলের একটি কড়াও ধরিতে পারিয়া থাক তবে ছাড়িয়া দিও না, শিকলের বাকী অংশটুকুও তোমার কাছে আসিতে বাধ্য। (কিন্তু লোকে) ধরিতে চায় না। তাহারা কেবল ঝগড়া-বিবাদে এবং কোন্‌টি ধরিব এই বিচারেই সময় কাটায়, ফলে কোন কিছুই ধরা আর হয় না। ······সর্বদা আমরা সত্যকে 'খুঁজিয়াই' বেড়াই, কিন্তু উহা 'লাভ' করিতে চাই না। আমরা চাই শুধু ঘুরিয়া বেড়ানো ও খোঁজখবর করার মজা। আমাদের প্রচুর শক্তি

এইভাবেই ব্যয়িত হইতেছে। সেইজন্য কৃষ্ণ বলিতেছেন,—একই কেন্দ্র হইতে প্রসারিত শৃঙ্খল-গুলির যে কোন একটি ধরিয়া ফেল। কোন একটি পদক্ষেপ অপরটি হইতে শ্রেষ্ঠ নয়।······ কোন ধর্মমতকে নিন্দা করিও না, যতক্ষণ ইহাতে আন্তরিকতা থাকে। যে কোন একটি কড়া জোর করিয়া ধর, তাহা হইলে উহা তোমাকে কেন্দ্রে টানিয়া লইয়া যাইবে।······ তোমার নিজের হৃদয়ই বাকী যাহা কিছু সব বলিয়া দিবে। অন্তরের গুরুই সকল মত, সমস্ত দর্শন উদ্ঘাটন করিবেন।

খ্রীষ্টের মতো কৃষ্ণও নিজেকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। নিজের মধ্যে তিনি দেবতাকে দর্শন করিয়াছিলেন। বলিলেন,—"এক দিনের জন্যও আমার পন্থার বাহিরে যাইবার কাহারও সাধ্য নাই। সকলকেই আমার কাছে আসিতে হইবে। যে কোন আকৃতির উপাসনা করুক না কেন আমি উপাসকের সেই উপাস্যের উপর বিশ্বাস দিই এবং ঐ আকৃতির মধ্য দিয়াই তাহার নিকট উপস্থিত হই।······" শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

কৃষ্ণ নিজের স্বাতন্ত্র্যে দাঁড়াইয়া আছেন। সেই নির্ভীক ভঙ্গীতে আমরা ভয় পাইয়া যাই। আমরা তো সব কিছুর উপর নির্ভরশীল······কতক-গুলি মিষ্ট কথা, অনুকূল অবস্থা! যখন আত্মা কিছুরই উপর নির্ভর করিতে চায় না, এমনকি জীবনের উপরও নয়—তাহাই তত্ত্বজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, মনুষ্যত্বের উচ্চতম ভূমি। উপাসনাও এই একই লক্ষ্যে লইয়া যায়। উপাসনা বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ খুব জোর দিয়াছেন—ঈশ্বরের ভজনা।

আমরা জগতে নানাপ্রকার উপাসনা দেখিতে পাই। রুগ্ন ব্যক্তি ভগবানকে খুব ডাকে।······ যাহার ধনসম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে সেও ধনলাভের আশায় খুব প্রার্থনা করে। ঈশ্বরেব জন্যই যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন তাঁহার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। (প্রশ্ন হইতে পারে:) "যদি ঈশ্বর থাকেন তবে এত দুঃখকষ্ট কেন?" ভক্ত বলেন—"······জগতে দুঃখ আছে; (কিন্তু) তাই বলিয়া আমি ভগবানকে ভালবাসিতে ছাড়িব না। আমার (দুঃখ) দূর করিবার জন্য আমি তাঁহার উপাসনা করি না। তাঁহাকে আমি ভালবাসি কেননা তিনি স্বয়ং প্রেমস্বরূপ।" অন্য (প্রকারের) উপাসনাগুলি অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের: কিন্তু কৃষ্ণ এইগুলির উপর কোনও দোষারোপ করেন নাই। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা অপেক্ষা কিছু করা ভাল। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের উপাসনা আরম্ভ করিয়াছে সে একটু একটু করিয়া উন্নত হইতে থাকিবে, ক্রমশঃ তাঁহাকে নিষ্কামভাবে ভালবাসিতে পারিবে।······

সংসারের এই জীবনে কিরূপে পবিত্রতা লাভ করিব? আমাদের সকলকে কি অরণ্য-গুহায় যাইতে হইবে?······ না, তাহাতে লাভ কিছু নাই? মন যদি বশীভূত না থাকে তবে গুহায় বাস করিলেও কোন ফল হইবে না, কারণ এই একই মন সেখানেও নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে। আমরা গুহাতেও দেখিব বিশজন শয়তান, কেননা যত সব শয়তান উহারা তো মনেই। মন বশে থাকিলে আমরা যেখানেই বাস করি না কেন উহা গুহার সমান।

আমাদের নিজেদের মানসিক সংস্কারই আমরা যে জগৎকে দেখিতেছি উহা সৃষ্টি করে। আমাদেরই চিন্তাধারা বস্তুনিচয়কে সুন্দর বা কুৎসিত করে। সমস্ত সংসারটাই রহিয়াছে আমাদের মনের মধ্যে। যথাযথ দৃষ্টিতে সব কিছু দেখিতে শিখ। প্রথমতঃ এইটি বিশ্বাস কর যে, জগতে প্রত্যেক জিনিসেরই একটি অর্থ আছে। জগতের প্রতিটি দ্রব্যই সৎ, পবিত্র ও সুন্দর। যদি তোমার চোখে কোন কিছু মন্দ ঠেকে তবে মনে করিয়ো যে সত্যের আলোকে তোমার উহা বুঝা হইতেছে না। সব দোষ নিজের উপর লও। ······যখন আমরা এইরূপ বলিতে প্রলুব্ধ হই যে, জগৎ অধঃপাতে যাইতেছে, তখন

আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত; তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে বস্তুসমূহকে যথাযথ ভাবে দেখিবার শক্তি আমাদের নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

দিবারাত্র কর্ম কর। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"দেখ, আমি জগদীশ্বর, আমার তো কোন কর্তব্য নাই। প্রত্যেক কর্তব্যই বন্ধন। কিন্তু আমি কর্মের জন্যই কর্ম করি। যদি ক্ষণমাত্রও আমি কর্ম হইতে বিরত হই, (সব কিছু বিশৃঙ্খল হইবে)।" অতএব কর্তব্যভাব মাথায় না রাখিয়া কেবল কাজ করিয়া যাও।

এই সংসার যেন একটি খেলা। তোমরা তাঁহার খেলার সাথী। কোন দুঃখ, কোন দুর্গতির কথা না ভাবিয়া কাজ করিয়া চল। কদর্য বস্তিতে এবং সুসজ্জিত বৈঠকখানায় তাঁহারই লীলা দেখ। লোককে উঠাইবার জন্য কর্ম কর। তাহারা যে পাপী বা হীন তাহা বলিয়া নয়; শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বলেন না।

জান কি সৎকাজ এত কম হয় কেন? কোন ভদ্রমহিলা একটি বস্তিতে গেলেন।......তিনি কয়েকটি টাকা দিয়া বলিলেন, "আহা, গরীব বেচারীরা, ইহা লইয়া সুখী হও।" ......আবার কোনও সুন্দরী হয়তো রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে একজন দরিদ্রকে দেখিলেন এবং কয়েকটি পয়সা তাহার সামনে ছুড়িয়া দিলেন। ইহা কিরূপ অন্যায় ভাব দেখি! আমরা ধন্য যে এই বিষয়ে বাইবেলে ভগবান আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। যীশু বলিতেছেন, "যেহেতু তোমরা আমার এই ভ্রাতৃগণের দীনতমের জন্য ইহা করিলে সেজন্য উহা আমারই জন্য করা হইল।" তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পার এইরূপ ভাবা নিন্দার কথা। সাহায্য করার ভাবটি মন হইতে দূর করিয়া দাও, তারপর উপাসনা করিতে যাও। ঈশ্বরের সন্তানসন্ততি যে তোমার প্রভুরই পুত্রকন্যা। (সন্তান তো পিতারই ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি।) তুমি তো তাঁহার সেবক। ......জীবন্ত ঈশ্বরের সেবা কর! ঈশ্বর তোমার নিকটে অন্ধরূপে, খঞ্জরূপে, দরিদ্ররূপে, দুর্বল বা পাপীর মূর্তিতে আসেন। তোমার উপাসনার কী চমৎকার সুযোগ! যে মুহূর্তে ভাবিলে যে তুমি "সাহায্য" করিতেছ তৎক্ষণাৎ সমস্ত আদর্শটি নষ্ট করিয়া নিজেকে অবনত করিয়া ফেলিলে! এইটি জানিয়া কাজ কর। প্রশ্ন করিবে, "তার পর?" তোমাকে আর হৃদয়-ভেদী ভয়ানক দুঃখে পড়িতে হইবে না।...... তখন আর কর্মবন্ধন থাকিবে না। সব কিছু খেলা হইয়া যাইবে, আনন্দে পরিণত হইবে। কর্ম কর। অনাসক্ত হও। ইহাই সম্পূর্ণ কর্মরহস্য। যদি আসক্ত হও, দুঃখ আসিবে।......

জীবনে আমরা যাহাই করিতে যাই উহার সঙ্গে নিজেদের এক করিয়া ফেলি। একটি লোক কটু কথা শুনাইল, আমার মনে হইতে লাগিল যে ক্রোধের সঞ্চার হইতেছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ক্রোধ এবং আমি এক হইয়া গেলাম—ইহার পরই দুঃখ! নিজেকে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত কর, আর কিছুর সঙ্গে নয়; কারণ আর সব কিছুই অসত্য। যাহা সত্য নয় তাহার প্রতি আসক্তিই দুঃখ আনে। একমাত্র সত্তা বর্তমান যাহা সত্য, একমাত্র জীবন রহিয়াছে যাহাতে গ্রাহ্য নাই (গ্রাহকও) নাই।......

কিন্তু অনাসক্ত ভালবাসায় তোমাকে আঘাত পাইতে হইবে না। যাহা কিছু কর, ক্ষতি নাই। বিবাহ করিতে পার, সন্তান হউক ···তোমার যাহা খুশি তাহা করিতে বাধা নাই—কিছুই তোমাকে আঘাত দিবে না। "আমার" এই বোধে কিছুই করিও না। কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য সম্পাদন; কর্মের জন্যই কর্ম। তাহাতে তোমার কি? তুমি নির্লিপ্তভাবে পাশে দাঁড়াইয়া থাক।

যখন আমরা ঐরূপ অনাসক্তি লাভ করি তখনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অদ্ভুত রহস্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। বুঝিতে পারি—কিরূপে এখানে

প্রখর কর্মচাঞ্চল্য ও স্পন্দন, আবার সঙ্গে সঙ্গে চরম শান্তি ও নিস্তব্ধতা; কিভাবে প্রতিক্ষণে কর্ম আবার প্রতিক্ষণে বিশ্রাম। ইহাই সংসারের রহস্য—একই সত্তায় নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তি, একই আধারে অনন্ত এবং সান্ত। তখনই আমরা রহস্যটি আবিষ্কার করিব। "যিনি অনন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে অপার শান্তি দেখিতে পান এবং নিঃসীম নিস্তব্ধতার ভিতর চরমকর্মচাঞ্চল্য লক্ষ্য করেন তিনিই যোগী হইয়াছেন।" কেবল তিনিই প্রকৃত কর্মী, আর কেহই নন্। আমরা একটু কাজ করিয়াই ভাঙিয়া পড়ি। ইহার কারণ কি? আমরা কাজের সঙ্গে নিজেদের জড়াইয়া ফেলি বলিয়া। যদি আমরা আসক্ত না হই তাহা হইলে কাজের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পূর্ণ বিশ্রাম পাইতে পারি।……

এইরূপ অনাসক্তিতে পৌঁছানো কত কঠিন! সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে অপেক্ষাকৃত সহজ পথ ও উপায়গুলির নির্দেশ দিতেছেন। (পুরুষ বা স্ত্রীলোক) প্রত্যেকের পক্ষে সহজতম রাস্তা হইতেছে ফলের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বিগ্ন না হইয়া কর্ম করা। বাসনাই বন্ধন সৃষ্টি করে। আমরা যদি কর্মের ফল চাই, তবে শুভ হউক আর অশুভই হউক উহার ফল ভুগিতেই হইবে। কিন্তু যদি আমরা আমাদের নিজেদের জন্য কর্ম না করিয়া ঈশ্বরের মহিমার জন্যই করি তাহা হইলে ফল আপনা আপনি চলিয়া যাইবে। "কর্মেই তোমার অধিকার কিন্তু ফলে নহে।" সৈনিক ফলের আশা না করিয়া যুদ্ধ করে। সে তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যায়। যদি পরাজয় হয় তাহা সেনাপতির,—সৈনিকের নয়। ভালবাসার জন্যই আমরা কর্তব্য পালন করিব—অধ্যক্ষের উপর ভালবাসা, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা।……

যদি শক্তি থাকে, বেদান্তদর্শন আলোচনা দ্বারা স্বাধীন হও। তাহা যদি না পার তো ঈশ্বরের ভজনা কর। তাহাও যদি না পার কোন প্রতীকের উপাসনায় ব্রতী হও। ইহাও সামর্থ্যে না কুলাইলে লাভের বিষয় না ভাবিয়া কিছু সৎ কাজ কর। তোমার যাহা কিছু আছে ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করিয়া দাও। যুদ্ধ কর—আগে চল। "যে কেহ ভক্তিভরে আমার পূজাবেদিতে পত্র, জল, এবং একটি পুষ্প অর্পণ করে আমি তাহা প্রীতির সহিত গ্রহণ করি।" যদি তুমি কিছুই না করিতে পার, একটি সৎ কাজও যদি তোমার দ্বারা না হয়, তবে তাঁহার (প্রভুর) শরণ লও। "ঈশ্বর সমস্ত জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাদিগকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় চালাইতেছেন। তুমি সর্বান্তঃকরণে তাঁহারই শরণাগত হও……।"

শ্রীকৃষ্ণ (গীতায়) ভক্তির আদর্শ সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে সব আলোচনা করিয়াছেন এইগুলি উহাদের কয়েকটি। বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টের ন্যায় কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া রচিত ভক্তিবিষয়ক আরও মহাগ্রন্থ আছে।……

শ্রীকৃষ্ণের জীবন-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। যিশু এবং কৃষ্ণের জীবনে প্রচুর সাদৃশ্য আছে। কোন্ চরিত্রটিকে অপরটি হইতে ধার করা হইয়াছে এইরূপ একটি আলোচনা চলিতেছে। উভয় ক্ষেত্রেই পটভূমিতে একজন অত্যাচারী রাজা ছিলেন। উভয়েরই জন্ম হইয়াছিল একই অবস্থায়। দুই-জনেরই মাতাপিতাকে বন্দী করিয়া রাখা হয়। দুইজনকেই দেবদূতেরা রক্ষা করিয়াছিলেন। উভয়-ক্ষেত্রেই তাঁহাদের জন্মবৎসরে যে শিশুগুলি ভূমিষ্ঠ হয় তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল। শৈশবাবস্থাও একই প্রকার।…… আবার পরিণামে উভয়েই অপর কর্তৃক নিহত হন। কৃষ্ণ নিহত হন একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায়; তিনি তাঁহার হত্যাকারীকে স্বর্গে পুণ্যগতি লাভের বর দেন। খ্রীষ্টকে যখন হত্যা করা হয় তিনি আততায়ীর মঙ্গল কামনা করেন এবং তাহাকে স্বর্গে লইয়া যান।

নিউ টেস্টামেণ্ট এবং গীতার উপদেশসমূহে

বহু মিল আছে। মানুষের চিন্তাধারা একই পথে অগ্রসর হয়। ······কৃষ্ণের নিজের কথায় আমি তোমাদিগকে ইহার উত্তর দেখাইতেছি: "যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয় তখনই আমি অবতীর্ণ হই। বার বার আমি আসি। অতএব যখনই দেখিবে কোন মহাত্মা মানবজাতির উন্নয়নে সচেষ্ট, বুঝিবে আমার আবির্ভাব হইয়াছে এবং পূজা করিবে।······"

কিন্তু তিনি যদি বুদ্ধ বা যিশুরূপে অবতীর্ণ হন তবে ধর্মে ধর্মে কেন এত মতভেদ? তাঁহাদের উপদেশাবলী তো পালন করা উচিত! হিন্দুভক্ত বলিবেন, ঈশ্বর স্বয়ং খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং অন্যান্য আচার্য (লোকগুরু) রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হিন্দু দার্শনিক বলিবেন: ইঁহারা মহাপুরুষ এবং নিত্যমুক্ত। সমস্ত জগৎ কষ্ট পাইতেছে বলিয়া ইঁহারা মুক্ত হইয়াও নিজেদের মুক্তি গ্রহণ করেন না। বার বার তাঁহারা আসেন, নরশরীর ধারণ করেন এবং মানবজাতিকে সাহায্য করেন। শৈশব হইতেই তাঁহাদের স্বরূপের জ্ঞান অবিলুপ্ত থাকে এবং কি উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অবতরণ সেবিষয়েও তাঁহারা সচেতন থাকেন।······ আমাদের মত বন্ধনের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।······নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছাতেই তাঁহারা আসেন। বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি স্বতই তাঁহাদিগের ভিতর সঞ্চিত হয়। আমরা ঐ শক্তিকে উপেক্ষা করিতে পারি না। সেই আধ্যাত্মিকতার ঘূর্ণিপ্রবাহ অগণিত নরনারীকে টানিয়া আনে এবং ইহার গতি চলিতেই থাকে কেননা ঐরূপ মহাপুরুষের শক্তি পিছনে রহিয়াছে। তাই যতদিন না সমগ্র মানবজাতির মুক্তি এবং এই পৃথিবী-গ্রহের খেলার পরিসমাপ্তি হয় ততদিন পর্যন্ত ইহা চলিতেই থাকে।

যাঁহাদের জীবন আমরা অনুধ্যান করিতেছি সেই মহাপুরুষগণের নাম মহিমান্বিত হউক! তাঁহারাই তো জগতের জীবন্ত ঈশ্বর। তাঁহারাই তো আমাদের উপাস্য। ভগবান যদি মানবীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমার কাছে উপস্থিত হন তাহা হইলেই কেবল আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি। তিনি তো সর্বত্র বিরাজমান। কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি কই? নরশরীরে সীমাস্থিত হইলেই আমাদের পক্ষে তাঁহাকে দেখা সম্ভবপর।······ যদি মানুষ এবং······ জীবসমূহকে ঈশ্বরেরই বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া মানি, তাহা হইলে মানবজাতির এই সমস্ত আচার্যকে বলা উচিত নেতা এবং গুরু। অতএব, হে দেববন্দিতচরণ মহাপুরুষগণ, তোমাদিগকে নমস্কার! হে মানুষের পথপ্রদর্শকগণ, তোমাদিগকে নমস্কার! হে মহাশিক্ষকগণ, তোমাদের প্রণাম! হে পরমনায়কগণ, চিরকালের জন্য তোমাদের উদ্দেশে আমাদের প্রণতি!

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগীতা

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত, এম-এ

ব্যাসের আশিস্ পেয়ে সঞ্জয় সে দিব্য চক্ষুষ্মান,—
যুগের যজ্ঞাগ্নি-পাশে বসি' একা নিশিদিনমান
অন্ধ নরপতি-কাছে বলিবেন যুদ্ধের বারতা
হ'য়ে আছে স্থিরীকৃত। প্রভাতের আলোময় কথা
সর্ব রণ-ক্ষেত্র ব্যাপী প্রসারিত বিপুল ব্যাপ্তিতে,—
ধ্বংসের ভূমিকা ল'য়ে জাগে যুগ-দেবতার চিতে
সৃষ্টির নূতন ছন্দ ;—রণবাদ্য ওই বুঝি বাজে,
কালের সমুদ্রতটে প্রলয়ের ঘন মেঘ সাজে।

সরে গেল যবনিকা সঞ্জয়ের আঁখির সম্মুখে
একটি পলকে যেন, হেরিলেন অদূরের বুকে
অসংখ্য শিবির রাজি,—ধনুর্ধর শত লক্ষ বীর
উন্নত বিশাল বক্ষ, সারি সারি সমুন্নত শির।
দেখিলেন,—দুর্যোধন গিয়া গুরু দ্রোণাচার্য পাশে
রণ-সম্ভারের কথা কহিছেন বিপুল উচ্ছ্বাসে।
বুকে তাঁর বিজয়ের বহু আশা, গতিতে দৃপ্ততা,—
জীবনের আয়োজন বুঝি আজ লভে সার্থকতা
সমর-তরঙ্গ-দোলে প্রান্তরের বীর্যের বন্যায়!
ব্যূহের আকারে ওই পাণ্ডবের সৈন্য দেখা যায়!

সহসা দেখেন চাহি' বিষাদ-ব্যাকুল পার্থ বীর,
শরীরে রোমাঞ্চ তাঁর,...শুষ্ক মুখ, কেমন অস্থির!
জানু পেতে রথ'পরে বসে আছে,—কাতর জিজ্ঞাসা
নয়নের কোণে তাঁর : ফুটে' ওঠে বেদনার ভাষা ;—
'হত্যা করি' স্বজনেরে এই যুদ্ধে কি মোর মঙ্গল ?'
গাণ্ডীব পড়িছে খসি,'—আঁখি-পদ্ম জলে টলমল!
'হে কৃষ্ণ, চাহিনা জয়, রাজ্যসুখ? সেও তো না চাই,
আচার্য ও পিতামহে বধ করি,' কোন লাভ নাই
বেঁচে এই বিশ্বমাঝে ;—হে মাধব, স্বজনের বধে
কি সুখ লভিব আমি ? ইহাতে যে বিপুল জগতে
কুলনাশকারী রূপে কলুষিত হ'বে মোর নাম।"
এই বলে' সব্যসাচী বসিলেন ত্যজি' ধনুর্বাণ!

কেশব দাঁড়ায়ে তাঁর সম্মুখেতে,—আয়ত নয়নে
যুগ-চেতনার দৃষ্টি, কি দেখেন দিগন্তের কোণে ?
জানু স্পর্শি বাম বাহু ধরে' আছে পাঞ্চজন্যখানি,
অভয়ের ভঙ্গী নিয়ে ডান হাত,—স্বর্গলোক ছানি'
কী যেন অমৃত-বার্তা দিয়ে যায় সম্মুখে তাঁহার!
নব-দূর্বাদলশ্যাম দেহ হ'তে জ্যোতির বিথার
কেবল ছড়া'য়ে যায় শাশ্বতের বিপুল মহিমা!
অনন্তের অন্তহীন সত্যবোধ পার হয়ে সীমা
অসীমের রূপলোকে সে-ইংগিতে পায় অধিষ্ঠান!
তামস সে দূরে যায়, রজঃ লভে সত্ত্বের সম্মান!

নাই সেথা দুর্বলতা, পৌরুষ-হীনতা কিছু নাই—
সেথা মৃত্যু স্বর্গ আনে, যুদ্ধ জয় আহ্বান জানায়
সসাগরা ধরণীরে!—নশ্বরত্ব নাহিক আত্মার,
এ-অমৃত বার্তা আসে, সে-অমৃত রূপ হ'তে তাঁর!
সর্বশাস্ত্র-সমাহৃত আনন্দের স্বরূপ সুন্দর ;
সাংখ্য আর পাতঞ্জল সমন্বয় লভে পর পর!
সে-বালক নচিকেতা,—মৃত্যুর অন্বেষা তাঁর এসে
এ-রূপের পদপ্রান্তে এক সুর নিয়ে যেন মেশে!
কর্ম আসে কামহীন, ভক্তির আলোকে মধুময়—
জ্ঞান মিলে রচে হেথা মুক্তির সে ত্রিবেণী অক্ষয় ;
যখন অধর্ম আসে, এ-রূপের ঘটে আবির্ভাব
দুষ্কৃতের শাস্তি দিতে,— এ-অভয় জীবনের লাভ।

এ-রূপ অক্ষর কভু, অব্যক্ত, ব্যক্ত বা কভু জাগে,
অধ্যাত্মের জ্যোতি তাই আলিঙ্গনে নিত্য বেঁধে রাখে!
হৃষীকেশ বলে তাই—'সব্যসাচি, বধিছ কাহারে ?'
অর্জুন চমকি' জাগে,—দেখে তাঁর জাগে চারিধারে
অসংখ্য বদন নেত্র, সংখ্যাহীন দিব্য আভরণ,
দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত, দিব্যমাল্যে মূর্তি সুশোভন,
সহস্র সূর্যের প্রভা সে-রূপেরে করে দীপ্তিমান,
সমগ্র জগৎ ভাসে,—সে-রূপের লীলা অফুরান্।
সে-দেহে দেবর্ষি জাগে, ব্রহ্মার যে সেথা পদ্মাসন,
অব্যয় পরম বেদ্য, সে-পুরুষ নিত্য সনাতন!
মুখে জ্বলে হুতাশন, বিশ্বভূমি তেজে তপ্ত তাঁর,
আদি মধ্য অবসান, নাই নাই কোথা নাই আর!
সে-রূপের দেহ হ'তে বিশ্বে হয় তাপ সঞ্চারিত,
এ-বিশ্বেরে গ্রাস করি' পুনর্বার করে আলোকিত!

এ-রূপ দেখিল পার্থ,—জানিল সে নিজ পরিচয়,
যুগের সন্ধ্যায় জাগা অভয়ের কান্তি মধুময়!
গেল ভীষ্ম, গেল দ্রোণ, গেল কর্ণ, কৃপ, দুর্যোধন,—
ধ্বংসের হোমাগ্নি কুণ্ডে, সৃষ্টির সে বীজ উচ্চারণ!
পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজে, সুর জ্ঞান-ভক্তি সমন্বিতা,—
কুরুক্ষেত্র হতে জাগে পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীগীতা।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম

স্বামী জীবানন্দ

জগৎপালক ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং নরশরীরে শ্রীকৃষ্ণ*রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সহস্র সহস্র বৎসর ধরে আমরা শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন করে চলেছি; যতদিন চন্দ্রসূর্য থাকবে, যতদিন মানব-সভ্যতা সনাতন হিন্দুধর্মের সঙ্গে মহান্ ঐক্য রাখবে ততদিন এই পুণ্য তিথিটি মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হবে না।

দানবরাজ কংসের অত্যাচারে জগৎ প্রপীড়িত। এই উৎপীড়ন আর দীর্ঘকালের অনাচারে সাধারণের মধ্য থেকে ধর্মভাব নষ্ট হতে চলেছে। ধর্মপরায়ণতার অভাবে ভোগবাসনার বৃদ্ধি ও অজ্ঞানতার রাজত্ব! তাই প্রয়োজন হয়েছে নতুন করে শাস্ত্রব্যাখ্যার, নিজের মহাব্যক্তিত্বপূর্ণ জীবনের মধ্য দিয়ে ধর্ম ও সংস্কৃতির তাৎপর্য নির্ণয়ের। আবশ্যক হয়েছে ভোগ ও ত্যাগ, হিংসা ও অহিংসা, কর্মযোগ ও কর্মসন্ন্যাস—এই সমস্ত আপাতবিরুদ্ধ ভাব ও আদর্শের সমন্বয়সাধনের। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত পরস্পর-বিবদমান রাজ্যগুলির মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠাও তো চাই!

নিষ্ঠুর কংসের কারাগারে মাতা দেবকী ও পিতা বসুদেব শৃঙ্খলিত। সেখানে সেই লৌহময় কঠিন কারাকক্ষে জন্ম হবে ভগবানের! জগতে কত সুন্দর সুন্দর স্থান রয়েছে তবে কারাগারে জন্ম কেন? সমস্ত বন্ধনের মোচনকর্তা যিনি, যাঁকে পেলে সব চাওয়া-পাওয়ার অবসান হয়ে যায়, তিনি কি জগতের কঠিনতম বন্ধনস্থান বন্দিশালাকে পবিত্র করার জন্যই এখানে জন্ম নিচ্ছেন?

সাধারণ মানুষের চেয়ে যখন কোন পুণ্যবান পুরুষের জন্ম হয় তখনই প্রকৃতির মধ্যে নানা শুভ লক্ষণ প্রকাশ পায়, আর যখন স্বয়ং শ্রীভগবান অবতীর্ণ হচ্ছেন তখন যে কত অলৌকিক শুভ সূচনা দেখা যাবে তা আর আশ্চর্য কি? মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানবুদ্ধির বিচারে এগুলি হয়তো অবিশ্বাস্য। তবু যেন কারুর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই যখন এ সব ঘটে থাকে তখন মুগ্ধ মানব বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে।

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী* তিথি। নিশীথ রাত্রি। ঘোর অন্ধকারে ধরণী সমাচ্ছন্না। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, নৈঋত, বায়ু, অগ্নি, ঊর্ধ্ব, অধঃ দশ দিকই হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে উঠল। সর্বত্রই আনন্দের তরঙ্গ। ভাদ্র মাস। ভরা বর্ষা। কানায় কানায় পূর্ণ নদীগুলি তাই আবিল, কিন্তু সে আবিলতা ক্ষণমধ্যেই যেন কোথায় অন্তর্হিত হল—গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী স্বচ্ছতোয়া। সরোবরগুলিতে শত শত পদ্ম ফুটতে লাগল। বনের বৃক্ষলতায় অসংখ্য ফুল। ফুলে ফুলে মধুমক্ষিকা মধুপানরত। ভ্রমরের গুঞ্জনে চারিদিক মুখরিত। পবিত্র সমীরণ কী সুখস্পর্শ! ব্রাহ্মণগণের নির্বাপিতপ্রায় যজ্ঞাগ্নি সহসা প্রদীপ্ত হয়ে গেল।

শুধু বহির্জগতেই কি আনন্দের পরিপ্লাবন? সাধু-মহাত্মাদের অন্তরেও অভূতপূর্ব আনন্দ! জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ত্রিলোকেই অপ্রত্যাশিত আনন্দানুভূতি। স্বর্গে দুন্দুভিনিনাদ হল। দেবতা ও মুনিগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।

"মনাংস্যাসন্ প্রসন্নানি সাধূনামসুরদ্রুহাম্।
জায়মানেঽজনে তস্মিন্ নেদুর্দুন্দুভয়ো দিবি।"

ভাগবত, ১০।৫

* কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

* রোহিণ্যামর্ধরাত্রে চ যদা কৃষ্ণাষ্টমী ভবেৎ।
তস্যামভ্যর্চনং শৌরের্হন্তি পাপং ত্রিজন্মকম্॥ (ভবিষ্যপুরাণ)
রোহিণীনক্ষত্রের সঙ্গে অর্ধরাত্রে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথির মিলন-সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জন্মগত পাপ বিনাশ করে।

মুহুর্মুহু মেঘগর্জন শোনা যাচ্ছে। সর্বান্তর্যামী বিষ্ণুভগবান্ জন্ম গ্রহণ করলেন দেবরূপিণী জননীর গর্ভ থেকে।

বসুদেব দেখলেন এক অপূর্ব শিশু। কমলনেত্র, চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন, গলায় কৌস্তুভমণি, পীতাম্বর, নবীন মেঘের মত শ্যামবর্ণ। মাথায় মণিখচিত মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল। অলকরাজির কী শোভা! উজ্জ্বল চন্দ্রহার, কেয়ূরকঙ্কণ—কত অলঙ্কারে সর্বাঙ্গ সুশোভিত।

"তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং
শঙ্খগদার্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং
সান্দ্রপয়োদসৌভগম্॥
মহার্হবৈদূর্যকিরীটকুণ্ডলত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলম্।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভির্বিরোচমানং বসুদেব
ঐক্ষত॥"

ভাগবত, ১০।৩, ১০

কে এই শিশু? বসুদেব দীর্ঘকাল যাঁর ধ্যান করেছেন, যাঁর স্মরণ-মননে দিবারাত্র কাটাচ্ছেন, যাঁর চিন্তায় কঠিন বন্দিদশাতেও তিনি ধীর স্থির অচঞ্চল—এই তো সেই! এ যে স্বয়ং বিষ্ণু শিশুরূপে অবতীর্ণ! কারাগার আলোয় আলোময় হয়ে গেছে। এমন তো কখনও দেখা যায় না। বসুদেব ভুলে গেলেন অপত্যস্নেহ—তিনি ভগবৎভাবে বিভোর হয়ে বিষ্ণুর স্তব করতে লাগলেন।

"হে ভগবান, আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছি যে আপনি আনন্দস্বরূপ, চিদ্‌ঘনমূর্তি, আবরণশূন্য সকলের আত্মা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয়ের মধ্যে অনুস্যূত থাকলেও আপনি ইন্দ্রিয়ের অবিষয় এবং নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, অবিকারী। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ রজোগুণে আপনারই মায়াবলে সৃষ্ট, সত্ত্বগুণে বিশ্বপালন আপনিই করছেন আর তমোগুণে লয়কার্য আপনার দ্বারাই হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তো আপনারই বিভিন্ন রূপ।

স ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া বিভর্ষি শুক্লং খলু
বর্ণমাত্মনঃ।
সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং কৃষ্ণঞ্চ বর্ণং তমসা
জনাত্যয়ে॥

ভাগবত, ১০।২০

আপনি সকল লোককে রক্ষা করতে ইচ্ছা করে এখানে জন্ম নিয়েছেন। দুষ্ট কংস আমার গৃহে আপনার জন্ম হবে এই কথা শুনে আপনার অগ্রজগণকে নিধন করেছে। আপনি জন্মেছেন জানলেই সে এখনই ছুটে আসবে অস্ত্র উদ্যত করে।"

বিশুদ্ধসত্ত্বগুণান্বিতা জননী দেবকীও নবজাতকে মহাপুরুষের লক্ষণ দেখে বুঝলেন সাক্ষাৎ বিষ্ণুই তাঁর পুত্ররূপে অবতীর্ণ। তিনিও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললেন, "হে সর্বেশ্বর, প্রলয়কালে সমুদয় চরাচর বিনষ্ট হলে একমাত্র আপনিই অবশিষ্ট থাকেন। মরণশীল মানুষের মৃত্যুভয় স্বাভাবিক, সকলের আশ্রয় আপনি ছাড়া তার আর কোন নির্ভয় স্থান নেই। ক্রূরস্বভাব উগ্রসেনপুত্র কংসের ভয়ে আমরা ভীত। আমার চিত্ত অত্যন্ত অস্থির হচ্ছে। পাপিষ্ঠ কংস যেন জানতে না পারে যে আপনি আমার গর্ভজাত। আপনি ভয়হারী, আপনার শঙ্খচক্রগদাপদ্মশোভিত চতুর্ভুজান্বিত ধ্যানাস্পদ অলৌকিক ঐশ্বর রূপ উপসংহার করুন।"

দেবকী কংসরোষ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছেন, অন্তর্যামী হরি তাই জননীকে আশ্বাস দিতে চান পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে।

অপূর্ব শিশুর মুখ হতে অপূর্ব বাণী নির্গত হল। "মা, এই জন্মেই আমি তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছি তা নয়, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর যখন বর্তমান ছিল, সেই সময়ও আমি তোমার পুত্র হয়েছিলাম। জন্ম জন্মান্তরে আমি তোমার পুত্র, তুমি আমার জননী। তুমি নিজেকে অত দীনহীন মনে করো না, তুমি তো সাধারণ মানবী নও। ব্রহ্মার আদেশে প্রজা-সৃষ্টির জন্যে তোমরা কঠোর তপস্যা করেছিলে।

সায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুমি ছিলে পৃশ্নি, বসুদেব ছিলেন সুতপা প্রজাপতি। শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় সমভাবে চলেছিল তোমাদের সুকঠিন তপস্যা, প্রাণায়ামে তোমাদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অভীষ্ট লাভের জন্যে গলিত পত্র ও বায়ুমাত্র আহার করে তোমরা আমার আরাধনায় রত ছিলে। এইরূপ কঠোর তপস্যায় তোমাদের বহুবর্ষ অতীত হয়েছিল। প্রতিনিয়ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে হৃদয়ে আমাকে ধ্যান করায় আমি তোমাদের উপর অত্যন্ত প্রীত হয়ে বর দিতে চাইলে তোমরা 'আমার মত' সন্তান প্রার্থনা করেছিলে। এই সংসারে আমার ন্যায় গুণসম্পন্ন আর কে আছে? তাই আমিই তোমাদের পুত্র হয়ে পৃশ্নিপুত্রনামে পরিচিত হই। দ্বিতীয় জন্মে তোমরা কশ্যপ ও অদিতিরূপে আমাকেই পুত্ররূপে কামনা করায় আমি আবার তোমাদের পুত্র হয়ে জন্মাই। উপেন্দ্র নামে তখন বিখ্যাত হয়েছিলাম, অত্যন্ত খর্বাকৃতি হওয়ায় 'বামন' নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করি। ইহাই আমার বামন অবতার। এই আমার তৃতীয় জন্ম, এবারেও আমি তোমাদের কাছেই এসেছি, কারণ তোমাদের মতো সুকৃতিপরায়ণ আর কোথায়? আমার কথা সত্য ব'লে জেনো। আমার পূর্ব পূর্ব জন্ম স্মরণ করাবার জন্যে আমি আমার চতুর্ভুজ মূর্তি তোমাদের দেখালাম, দ্বিভুজ প্রাকৃত মানুষের মত আকার দেখে তোমরা আমাকে চিনতে পারতে না। তোমরা দুজনে আমার উপর স্নেহবশতঃ পুত্রভাবেই হোক আর ব্রহ্মভাবেই হোক একবার মাত্র চিন্তা করলেই পরমা গতি প্রাপ্ত হবে।"

"যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন চাসকৃৎ।
চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেথে মদ্গতিং পরাম্॥"

ভাগবত, ১০।৪৫

এই কথা বলে শিশুরূপী ভগবান নীরব হয়ে আত্মমায়া দ্বারা দ্বিভুজ বালকে পরিণত হলেন। যেন অতি সাধারণ অসহায় মানবশিশু! মাতাপিতার সামনেই এই অলৌকিক দৃশ্য সংঘটিত হল।

'আমাকে নন্দগোপগৃহে নিয়ে চল'—এইরূপ ভগবৎপ্রেরণায় বসুদেব সযত্নে শিশুকে কোলে নিয়ে কারাগারগৃহ-সূতিকাগার থেকে নির্গমনের ইচ্ছা করলেন।

অচিন্ত্য যোগমায়ার প্রভাবে দ্বারপালগণের ইন্দ্রিয়বৃত্তি অপহৃত, তারা জাগ্রত থেকেও অচেতন-প্রায়! পুরবাসীরাও গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত।

কারাকক্ষের বৃহৎ কপাট লৌহশৃঙ্খলে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। বসুদেব পুত্রসহ দরজার কাছে এলেন। আপনা হতেই দরজা খুলে গেল। এ কী দৈবী মায়া!

বসুদেব নিঃশব্দে অগ্রসর হতে লাগলেন। আকাশে গুরুগুরু মেঘগর্জন হচ্ছে—অবিশ্রান্ত বর্ষণ। মহাপ্রলয় হবে নাকি? অনন্তদেব শেষনাগ নিজের ফণা বিস্তারে জল নিবারণ করতে করতে পিছনে যেতে লাগল। পথে যমুনা। ভীষণ বারিপাতে গভীর জলরাশির বেগে যমুনা আরও তরঙ্গিত হয়ে উঠল। তরঙ্গসঙ্কুল নদীও বসুদেবের যাওয়ার পথ করে দিতে চায়! সবাই যে আজ ভগবানের স্পর্শব্যাকুল!

শৃগালরূপধারিণী মায়ার নির্দেশিত পথে বসুদেব অক্লেশে দুস্তর যমুনা পার হয়ে নন্দব্রজে উপনীত হলেন। সেখানে দেখলেন সকলেই সুষুপ্তিতে মগ্ন। তখন তিনি অন্তঃপুরে গিয়ে নিজের পুত্রকে যশোদার শয্যায় রেখে তাঁর নবজাত কন্যাটিকে নিয়ে অন্ধকার লৌহময় কারাকক্ষে ফিরে গেলেন। তারপর দেবকীর শয্যায় শিশুকন্যাটিকে দিয়ে নিজের পদদ্বয়ে লৌহশৃঙ্খল বদ্ধ করে পূর্ববৎ অবস্থান করতে লাগলেন।

নন্দরাণী যশোদা পরিশ্রান্তা, নিদ্রাভিভূতা ও অপগতস্মৃতি হওয়ায় তাঁর নবজাত সন্তানটি পুত্র কি কন্যা তা জানতে পারেন নি।

রজনীপ্রভাতে সূর্যের আলোয় পৃথিবী ঝলমল করে উঠল। সুকুমার পুত্রের চন্দ্রমুখ দর্শনে এসে ব্রজবাসীরা নন্দগৃহকে আনন্দমুখর করে তুলল।

পাঞ্চজন্য

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কোথায় কৃষ্ণ লুকায়ে রয়েছ—আত্মনির্বাসনে
কুরুক্ষেত্রে শেষ কি তোমার জীবনের লীলাখেলা,
অর্জুন-সখা, কোন মথুরায় কিসের আকর্ষণে ?
হিংসাদগ্ধ পৃথিবীর বুঝি শেষ হয়ে আসে বেলা।

ভয়রাশি মনে আকাশে জমিছে কাল-বৈশাখী ঝড়
থম থম করে মহাঅরণ্য আবেগ-রুদ্ধ প্রাণ
আথাল-পাথাল মেঘে মেঘে ডাকে বিদ্যুৎ কড় কড়
ঘূর্ণি হাওয়ার অন্ধ খেয়ালে নাহিক পরিত্রাণ।

সাগরের জলে চেতাইয়া উঠে তরঙ্গ শত শত
ধারা-নিবদ্ধ কলঙ্করেখা দিগন্তে উঠে জাগি'
বালুবেলাভূমে অলস-বিলাস আজিকে তন্দ্রাহত
শ্মশানে বুকে মৃত্যুর শিখা জ্বলিছে আহুতি লাগি।

এর মাঝে তুমি রহিবে শয়ানে আলসে দৃষ্টিহীন
নয়নে তোমার মোহ-অঞ্জন এখনো রয়েছে মাখা,
হে সারথি তব রথের চক্র হয়েছে কি গতিহীন
পাঞ্চজন্য শিয়রে তোমার আছে উপাধানে ঢাকা ?

অলস-শয়ন পরিহরি হরি, দাঁড়াও বাহিরে আসি
পাঞ্চজন্য দক্ষিণ করে তুলে ধর একবার
বাজাও বাজাও চলুক সে ধ্বনি দিক্‌দিগন্তে ভাসি
নিদ্রিত দেশ জাগিয়া উঠুক খুলিয়া রুদ্ধদ্বার।

ইঙ্গিতে তব আসিয়া দাঁড়াক অন্তর নির্ভয়
শিরায় শিরায় রক্তের ধারা উঠুক চঞ্চলিয়া
দৃঢ় বাহুমূলে অমোঘ শক্তি উৎসাহে দুর্জয়
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন উঠুক প্রজ্বলিয়া।

তুমি চল আগে পশ্চাতে তব কোটি কোটি নরনারী
নূতন কুরুক্ষেত্র রচিয়া শুনাও নবীন গীতা,
সুদর্শনের শাণিত শক্তি অলক্ষে সঞ্চারি'
শেষ করে দাও সমুখে শত্রু পিছনে ভণ্ড মিতা!

বাজাও তোমার পাঞ্চজন্য বাজাও বাজাও হরি
ভয় ভেঙ্গে যাক, দুর্বল মনে আসুক কঠিন পণ
শ্রীকৃষ্ণ তুমি জাগ্রত হও, পাঞ্চজন্য ধরি'
দক্ষিণ হাতে তুলে ধর তুমি শাণিত সুদর্শন।

শ্রীরাধা

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

ভারতবর্ষের বৈষ্ণবসাধনায় ঠাকুরাণী শ্রীরাধা সর্বাগ্রগণ্য তত্ত্বরূপে স্বীকৃত হয়ে আছেন। দার্শনিক যুক্তি অনুসরণ করে ভক্তগণ শ্রীরাধার প্রামাণ্য নিরূপণে অগ্রসর হয়ে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্র-সংহিতা প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থাবলম্বনেই রাধা-কথার প্রামাণ্য সংস্থাপন করেছেন। এই সমুদয় দার্শনিক যুক্তি ও প্রমাণের অবসরে নানাবিধ পৌরাণিক উপাখ্যানমূলক লীলাকাহিনীও এই রসময়ী শ্রীরাধার প্রতি প্রেমিক ভক্তমাত্রকে একান্ত আকৃষ্ট করেছে।

এর মূলানুসন্ধানের তথ্য থেকে অনুভব করা যায়, ভারতের সর্বস্তরের সাধনপদ্ধতিতেই শক্তিমানের সঙ্গে শক্তিতত্ত্বও নিঃসংশয়রূপে স্বীকৃত হয়েছে। এমনকি বেদান্তের কঠোর জ্ঞানসাধনায় ও একক কূটস্থ ব্রহ্মের পক্ষেও অঘটন ঘটান সম্ভব হয়নি—মায়ারূপিণী স্বশক্তিকে অবহেলা করে। অন্যান্য ক্ষেত্রে, সাংখ্যাদিদর্শন বা তন্ত্রাদিতে তো তা সমধিক প্রসিদ্ধ। হিন্দুর সর্বথা নির্ভরক্ষেত্র সর্বপ্রাচীন বেদশাস্ত্রেই তার স্পষ্ট প্রকাশ বিদ্যমান। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্‌রূপিণীর ব্রহ্মানুভূতিজনিত দেবীসূক্তে, রাত্রিসূক্তে, অথর্ববেদে, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ এবং কেনোপনিষদ্ প্রভৃতিতে শক্তিতত্ত্বের রূপপরিচয় সুন্দর ব্যক্ত হয়েছে এবং এভাবে মায়া বা ব্রহ্মশক্তিরূপে পৃথক্ প্রকাশসত্ত্বেও তাঁকে ব্রহ্মেরই জ্ঞানবলক্রিয়ারূপা স্বাভাবিকী শক্তির পরিচয়ে উভয়ের অভিন্নতাই উপনিষদে দেখান হয়েছে। অথচ এই অদ্বয় ব্রহ্মেরই একটা কল্পিত ভেদ অনুসরণ করে মায়া ও মায়ী বা শক্তি ও শক্তিমানরূপেই বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলকারণতার পরিচয় দেওয়া হয় অর্থাৎ অদ্বয়াবস্থার যে বিভিন্ন প্রকাশ তা' মায়াদ্বারেই সম্ভব—একথা উপনিষদ্‌সিদ্ধ তত্ত্ব।

তা'তে বলা হয়, ব্রহ্মের যে অমোঘ সঙ্কল্প—"স ঐক্ষৎ", "সোঽকাময়ত" প্রভৃতি,—এই ব্রহ্ম-সঙ্কল্প বা শক্তি একই তত্ত্ব। শক্তিতত্ত্ব বিষয়ে সাধকগণ তপস্যাদ্বারা জান্‌তে পেরেছিলেন যে, এই শক্তি আত্মগুণে নিগূঢ়।—"দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্"। এর প্রয়োজনীয়তাও তাঁরা জেনেছিলেন—এক অদ্বয়ব্রহ্ম একক অবস্থায় স্বাত্মভূত, তরঙ্গবৎ অনন্ত আনন্দরসসমষ্টি উপলব্ধি বা আস্বাদন করতে পারছিলেন না, সে জন্যেই অর্থাৎ আত্মস্বরূপোপলব্ধির প্রয়োজনেই তিনি স্বয়ংই দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়লেন।

তারপর ক্রমধারায় শক্তির অবস্থান্তর দ্বারা অনন্তভাবের মধ্যে নিজেকে অনুপ্রবিষ্ট করে সর্বরসাস্বাদন করলেন। নারদপঞ্চরাত্র একথাটি বড় সুন্দর করে বলেছেন—

"একাকী স তদা নৈব রমতে স্ম সনাতনঃ।
স লীলার্থং পুনশ্চেদমসৃজৎ পুষ্করেক্ষণঃ॥"

* * *

লীলোপকরণাং দেবঃ প্রকৃতিং ত্রিগুণাত্মকাম্।
মায়াসংজ্ঞাং পুনঃ সৃষ্ট্বা তয়া রেমে জনার্দনঃ॥"

সুতরাং এ শক্তিতত্ত্বটিকে আর পৃথক তত্ত্ব বলা চলে না। যদি তদীয় শক্তি আর তিনি অভিন্ন তবে তাঁর সে স্বরূপ যে সার্বদানন্দময়তা, শক্তিরও তা'হলে তদ্রূপতাই এসে গেল। তন্ত্র এজন্যে চিন্ময়ী বা আনন্দময়ী কথা বহুভাবে উল্লেখও করে থাকেন।

এখন কথা হ'ল এই চিন্ময়ী বা আনন্দময়ীই যদি শক্তির স্বরূপ, তবে তাঁরই পরিণামভূত এই জগৎপ্রপঞ্চেরও চিন্ময়তা ও আনন্দময়তাই হওয়া সঙ্গত, দুঃখাদি বা জাড্য কখনো হ'তে পারে না; অথচ তা-ই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এক্ষেত্রে তন্ত্রশাস্ত্র, বৈষ্ণবশাস্ত্র ও পুরাণাদিতে দেখা যায়, শক্তিরও আবার ভেদ স্বীকার করা হয়েছে,—স্বরূপ-শক্তি, মায়াশক্তি প্রভৃতি। অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন আত্মোপলব্ধির প্রেরণায় নিজেই দ্বিধা বিভক্ত হলেন, তেমনি ব্রহ্মবিভাগজা শক্তিও সৃষ্টিপ্রেরণায় পুনরায় ত্রিধা বিভক্তা হ'য়েছেন। তন্মধ্যে স্বরূপ-শক্তি ভিন্ন অপর দু'টিও এসে গেল—মায়াশক্তি ও তটস্থা। মায়াশক্তিই 'সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মিকা, পরিণামিনী, তা' থেকেই' লীলাবিলাস ক্রমে হ'ল জগৎপ্রপঞ্চ। বিষ্ণুপুরাণ তাই বলেছেন—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥"

অর্থাৎ বিষ্ণুশক্তি বা স্বরূপশক্তি হ'ল পরা। ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি যা' জীবভূতা তা' হ'ল দ্বিতীয়া, তাই তটস্থা শক্তি। তৃতীয় হ'ল অবিদ্যা বা প্রকৃতি অর্থাৎ মায়াশক্তি। স্বরূপভূতা বিষ্ণুশক্তিকে আবার ত্রিধা ভাগ করা হয়েছে—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। অর্থাৎ ব্রহ্মের সৎ, চিৎ ও আনন্দ—এই তিন তত্ত্বে তিন ভাব—ত্রিভাবে ত্রিশক্তি। তাই স্বরূপভূতা শক্তিই সচ্চিদানন্দতত্ত্বের ত্রিভাবে সন্ধিনী সম্বিৎ ও হ্লাদিনীময়ী। বিষ্ণুপুরাণ বলেছেন—"হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ"। তাতেও ভগবানের সৎ-চিৎ ও আনন্দতত্ত্বের মধ্যে প্রথম দু'টি হ'ল অস্তিত্বেরই পরিপূরক, আনন্দ বা হ্লাদিনীতেই হয়ে থাকে সর্বতত্ত্বের পূর্ণতা। অর্থাৎ লৌকিক জগতেও যেমন সকল বৃত্তিরই পরিণামে আনন্দপ্রাপ্তিই চরম সার্থকতা, তেমনি লোকাতীত ক্ষেত্রেও আনন্দপর্যবসায়িতাতেই তাদের সার্থকতা। সুতরাং হ্লাদিনীতে গিয়েই সর্বতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা।

এই স্বরূপ-শক্তিকেই বলা হয় যোগমায়া। ভগবানের সঙ্গে এর সাক্ষাৎ যোগ রয়েছে বলে, ইনি কখনো ভগবৎস্বরূপকে আচ্ছন্ন করেন না; কারণ ইনিও ত চিদ্রূপিণী, বরং ভগবত্তত্ত্বকে প্রকাশিত করেই দেন। ব্রহ্মা চণ্ডীতে এই আত্মমায়া যোগমায়ারই আরাধনা করেছিলেন, বাহ্যমায়ার নয়। বাহ্যমায়াই সত্ত্বাদিগুণময়ী ও জগদ্রূপে পরিণামশীলা এবং ব্রহ্মের স্বরূপাবরণী। পুরাণে বা ভক্তিশাস্ত্রে এভাবে শক্তির বিভেদ অত্যন্ত স্পষ্ট। দার্শনিক-সিদ্ধান্তে এভাবে মায়ার বিভেদ প্রতীয়মান না হলেও একেবারে বিভেদবিহীন—তা'ও বলা যায় না। সেক্ষেত্রেও মায়া ও অবিদ্যা মূলতঃ অভিন্ন হ'লেও একটা বিভেদ প্রদর্শনের চেষ্টাও আছে। শুদ্ধসত্ত্ব ও অশুদ্ধসত্ত্বাশ্রয়তাদ্বারা মায়া ও অবিদ্যা—দু'টি সংজ্ঞার কথা দর্শনশাস্ত্রে বলা হ'য়েছে। "সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াঽবিদ্যে"—ইতি পঞ্চদশী।

আর এভাবে শক্তিদ্বারে জগৎসৃষ্টি প্রভৃতির লীলায় ভগবান্ নিজে আপন শক্তিতে অনুপ্রবেশ করে আছেন বলে এই বিশ্বপরিণাম মূলতঃ ভগবৎ-

পরিণামই হ'য়ে দাঁড়াল। কারণ, যদিও এই প্রাকৃত-শক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে না, অর্থাৎ তিনি যেন আত্মবিভাগ করে প্রকৃতিসৃষ্টিদ্বারা তা'তেই সর্বকর্মভার ন্যস্ত করে কর্তৃত্ব বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত, যেহেতু তিনি কেবলানন্দানুভবস্বরূপ, আত্মারাম; তথাপি নিজেরই প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি সম্ভাবিত করে নিজেই তা'তে লীলাস্বাদন করেন বলে তাঁরই সৃষ্ট তদভিন্ন শক্তির পরিণামে তাঁর পরিণাম হ'তে আর অবশিষ্ট কি রইল? অথচ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় বিকারী পরিণাম নয় বলে এইটি অচিন্ত্য অর্থাৎ তর্কের বহির্ভূত বিষয়।

তা'হলে দেখা গেল ভগবন্নিহিত অনন্ত ভাবতরঙ্গ একক ব্রহ্মে অব্যক্তরূপে স্তিমিত ছিল, শক্তিদ্বারেই তাদের প্রকাশ সম্ভব হ'ল। অর্থাৎ ভগবানের সকল ঐশ্বর্য ও মাধুর্য নামান্তরে প্রকটিত হ'ল। ব্রহ্মের ঐশ্বর্যবত্তা "ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে" প্রভৃতি শ্রুতিতেই প্রমাণিত হয়। তাঁর মাধুর্যবত্তা ও "রসো বৈ সঃ রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" প্রভৃতি শ্রুতিতে স্পষ্ট প্রমাণিত আছে। ভগবানের এই দু'টি রূপের সন্ধান শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতির দ্বারা জানা গেলেও তাঁকে লাভ করে তাঁর উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত তা না জানারই তুল্য। এজন্য চরম জানার আকর্ষণেই ভগবল্লাভ বা ব্রহ্মসিদ্ধি জীবের ঈপ্সিত। কিন্তু দণ্ডধর রাজরূপে রাজার পরিচয় জানলেও দণ্ডদাতা ও দণ্ডার্হ ব্যক্তিতে যেমন ভীতি-সঙ্কোচ, বিচ্ছেদ-ব্যবধান অবশ্যম্ভাবী, তেমনি ঐশ্বর্যময় ভগবানের স্বরূপোপলব্ধিতেও ভয়-সঙ্কোচ বিনাশের আশা কোথায়? ভয়ে ভক্তি আর নির্ভয়ের প্রেম কখনো এক কথা নয়। অথচ শ্রুতি বলেছেন তিনি অভয়-স্বরূপ। তাই প্রকৃত ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি ভগবানের ঐশ্বর্যরূপের অপেক্ষা ভগবানকে চান আত্মজনরূপে, বিবিধ সঙ্কোচ ব্যবধানের বিলয় করে আপনরূপে। এই আত্মজন হওয়া বা অপরকে আত্মজন করা—উভয়ক্ষেত্রেই লৌকিকজগতেও দেখা যায় প্রীতি-ভালবাসাই অবলম্বনীয় পথ। তেমনি প্রীতি-প্রেমের মধ্য দিয়ে আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে আত্মজন করে নেওয়ার সাধনাই রসময় ভগবানের মধুর সাধনা।

কথা হ'ল ক্ষুদ্র জীব এই বিশেষ শক্তি পাবে কোথায়?—দার্শনিক ব্যাখ্যায় দেখা যায় জীব বলে পৃথক কোন সত্তাই নেই। ব্রহ্মই প্রকৃতিপরিণত বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিবিম্বিত, তা-ই হয়েছে জীব—"অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য"। অথবা যদি ভিন্নরূপতাও স্বীকার করে অংশ-কলা প্রভৃতি বলে সিদ্ধান্ত করা যায়, তা'তেও জীবের মধ্যে ব্রহ্মের স্ব-ভাব প্রকারান্তরে মলিনভাবেও থাকতে বাধ্য। অর্থাৎ জীব যদি ব্রহ্ম বা ভগবানের অংশও হয় তথাপি তদীয় আত্মশক্তির সন্ধিনীসম্বিৎ ও হ্লাদিনীর একটা রূপ জীবের মধ্যে স্ফুট হোক কি অস্ফুট হোক, শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হোক তা' রয়েছে। তা'তে বলা যায় জীবের মধ্যে অবস্থিত ঐ হ্লাদিনী শক্তিই প্রেমরূপে প্রকাশিত হ'য়ে থাকে। এই হ্লাদিনীর প্রকৃতস্বরূপ বা মূল অবস্থিতি হ'ল সন্ধিনী ও সম্বিৎ-এরও পূর্ণতা প্রাপ্তিতে, ব্রহ্মের রসরূপতায় যা "আনন্দম্ ব্রহ্ম ইতি ব্যজনাৎ"—আনন্দ। পুরাণ ও ভক্তিশাস্ত্র সকলেই একবাক্যে বলেছেন এই পরিপূর্ণ হ্লাদিনীই রসময়ী শ্রীরাধা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ তাই বলেছেন—"পরমাহ্লাদরূপা চ সন্তোষহর্ষবর্ষিণী"। এই স্বকীয় আহ্লাদ বা হর্ষ-আনন্দ বা রসরূপতা উপলব্ধির জন্যেই অদ্বিতীয় ভগবান্ নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করেছিলেন, তাই বলা হয় রসময়ের রাসমণ্ডলে শ্রীরাধার সৃষ্টি।—

"রাসক্রীড়াধিদেবী চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
রাসমণ্ডলসম্ভূতা রাসমণ্ডলমণ্ডিতা॥" (ব্রহ্ম বৈঃ পুঃ)

আপত্তি হ'তে পারে, এ যেন হ'ল তত্ত্ব,—ভাবময় অবস্থা বিশ্লেষণ; তাতে বৃন্দাবনের গোপকন্যা বৃষভানুদুহিতা শ্রীমতী রাধার আবির্ভাবে এর সামঞ্জস্য কোথায়? দার্শনিক যুক্তি অনুসারে ব্রহ্মেরই শক্তি বা মায়া (বাহ্যমায়া) যদি বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ডরূপে বাস্তবে পরিণত হ'তে পারেন এবং স্বয়ং ভগবানও যদি লীলার জন্যে মানবরূপে অবতীর্ণ হ'তে পারেন, তবে সে-ই দার্শনিক যুক্তিক্রমে ভগবানের সূক্ষ্মতম হ্লাদিনী শক্তিই বা স্থূলে এসে কেন বিগ্রহবতী হ'য়ে লীলানুচরী হ'তে পারেন না? বিশেষতঃ লীলাই যেখানে জগতের মূলে—"তত্ত্ব লীলাকৈবল্যম্,"—সেখানে শক্তি ভিন্ন লীলাই ত অস্বাভাবিক। মায়াশক্তিতে লীলা প্রদর্শন সম্ভব হ'ল, কিন্তু স্বরূপশক্তিতে তা' অসম্ভাবিত—এর সদুত্তর কি? বরঞ্চ বলা যায় ভগবানের এ রহস্যময় পরম ভক্তিযোগ, যা' দীর্ঘকাল জীবের অগোচর ছিল, সে পরম যোগতত্ত্ব জগতে ব্যক্ত ক'রবার জন্যেই ভগবান্ ও ভগবতী মহাশক্তিকে মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হ'তে হ'য়েছিল গোপ-গোপিকারূপে।

এ ভাবে দেখা যাচ্ছে পরমহ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধার সত্তা যেমন ভগবৎস্বরূপ ভগবদভিন্ন শুদ্ধানন্দরূপে, রসরূপে; তেমনি জীবের মধ্যেও রয়েছে প্রেম-ভালবাসারূপে মানব-মানবীর আকর্ষণ-বিকর্ষণের আকারে সর্বজীবের আনন্দরসানুভূতি-রূপে। কিন্তু অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব ভগবানের ন্যায় তো মায়াধীশ নয়, তাই মায়াবশ্যতা নিবন্ধন এ প্রেম কলুষিত, স্বার্থবন্ধান্বিত, আত্মবাঞ্ছাপ্রবণ। তাই এ প্রেম প্রকৃত প্রেম নয়, একে বলা যায়, কামনা বাসনার হেতু কাম। সুতরাং তা' যতই গভীর ও উন্মাদনাকর হোক্ প্রেমের পর্যায়ে কিছুতেই পরিচিত হ'তে পারে না। তথাপি এই বীজটি মূল সত্তার কোরক। একে শুদ্ধ শাস্ত্র আত্মবাঞ্ছাহীন পরম তত্ত্বে উন্নীত ক'রে নিতে পারলে সন্ধিনী, সম্বিতের পূর্ণতার ন্যায় এবং পূর্ণতাপ্রাপ্তিতেও তা' হ্লাদিনীরূপে স্বরূপে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। অর্থাৎ পরম প্রীতি বা বৈষ্ণবের ভাষায় "পি-রী-তি" ভাবের সাধনায় আত্মসুখলিপ্সা তিরোহিত হ'লে প্রিয়তমে প্রীতিমাত্র সম্বলে সর্বত্র প্রিয়তমের শব্দ-স্পর্শ রূপ-রস-গন্ধানুভবের তন্ময়তায় গোপীভাবের সিদ্ধিতে ঘটতে পারে এই অন্তরস্থিত কলুষিত কামেরও নবরূপান্তর, প্রেমরূপা হ্লাদিনীর রূপায়ণে শ্রীরাধার স্বরূপ প্রকাশ। জীবের মধ্যেও এই হ্লাদিনী বা শ্রীরাধার স্বরূপ প্রকটিত হ'লেই—এই রাধার সঙ্গে শ্রীভগবানের হবে মিলন-লীলা, জীবাত্মা পরমাত্মার রসসঙ্গ। চিরমধুর ভগবানের মাধুর্যময় স্বরূপের এ ভাবে সম্ভাবিত হয় আনন্দরতি, ঐ শ্রীরাধার স্বরূপ-অনুভূতিতে। বৃষভানুনন্দিনী মহাভাবময়ী শ্রীরাধার তাই বৃন্দাবনভূমিতে মানবী তনুতে মহাপ্রকাশ। এ ভাবেই এসেছে জীবেরও জীবনে পরম সার্থকতা, তাঁর মহাবির্ভাবে ফল-সংসিদ্ধি।

প্রেম

"Love—What a volume in a word,
an ocean in a tear."—Tupper.

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

সে যে গভীর হইতে গভীরতর
পরাণের টানাটানি,
সে যে বোঝার অতীত, মৌন ভাষায়
সুদূরের কানাকানি!
সে যে অসীম সাগরে শুক্তি-মুক্তা—
দাম তার নেই কভু;
সে যে গঙ্গার জল, জাত তার নেই
জাত দিতে পারে তবু!

সে যে হোমের আগুন—পুড়াইয়া দেয়
মঙ্গল যাহা নহে;
সে যে ব্রাহ্মণবেশী, যজ্ঞোপবীত
আপন শরীরে বহে!
সে যে অসীম মরুতে খাল কেটে আনে
বিগলিত রসধারে।
সে যে একটি স্বর্গ গড়ে রেখে দেয়
জীবনেরও পরপারে॥

দ্বারকায় কয়েকদিন

শ্রীবিজনকুমার গোস্বামী

হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের স্মৃতি-সম্বলিত আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া, অমর অজ্ঞাত ভাস্করদের, যাঁহারা সম্রাট শাহজাহানের কল্পনাকে অতি নিপুণভাবে বাস্তব রূপ দিয়াছেন, মনে মনে প্রণাম করিয়া—আমরা দ্বারকায় পথে রওনা হইলাম।

১৯৫৫ সালের অক্টোবরের এক সন্ধ্যায় আমরা আগ্রা ষ্টেশনে গাড়িতে উঠিলাম। ছোট গাড়ি রাত্রি দেড়টায় মেশানা জংশন পৌঁছিল। সেখান হইতে গাড়ি বদল করিয়া ভেরাবেল পৌঁছিলাম সকাল সাড়ে সাতটায়। এইবার দ্বারকার গাড়ি; অতি মন্থরগতি এবং এক এক স্টেশনে এত অধিক সময় অপেক্ষা করিতেছিল যে গাড়ির সকলেই ক্রমে বিরক্ত হইতেছিল, ধৈর্য রাখিতে পারিতেছিল না। ছোট ছোট স্টেশন, খাবার জিনিস পাওয়া যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহার উপর স্টেশনের কর্মচারীরা পর্যন্ত গাড়ির সকল খবর দিতে পারেন না, ছাপান সময়ের তালিকা (পশ্চিম রেলপথের) সঙ্গে ছিল, কিন্তু তাহাতেও সকল খবর মেলে না। প্রথমে শুনিলাম সকাল ১১টায় পৌঁছিব, তাহার পর শুনিলাম রাত্রি আটটা, তাহার পর শুনিলাম পাকা খবর রাত্রি দেড়টা! এই পাকা খবর শুনিয়া মন অধৈর্য হইয়া উঠিল। কখন সকলে নিদ্রাভিভূত হইয়াছি জানিতে পারি নাই, হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙ্গিল দেখি গাড়ি স্থির হইয়া গিয়াছে। উঠিয়া দেখি জানালার সম্মুখে প্ল্যাটফরমের উপর পরিষ্কার অক্ষরে বড় বড় করিয়া লেখা দেবনাগরী অক্ষরে 'দ্বারকা'।

তবে দ্বারকায় আসিয়াছি! উঠ, উঠ, উঠ—তাড়াহুড়া করিয়া বিছানাপত্র গুছাইয়া নামিয়া পড়িলাম। স্থির করিয়াছিলাম এত রাত্রে কোথাও না যাইয়া স্টেশনেই বিশ্রাম করিব এবং রজনী প্রভাত হইলে শহরের ভিতর আশ্রয় লইব।

"তীর্থগমন দুঃখভ্রমণ মন উচাটন হয়ো না রে,
তুমি ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস শীতল হওনা
অন্তঃপুরে।"

সাধক প্রসাদ গাহিয়াছেন, কিন্তু এবার দেখিলাম সব সময়ে তীর্থগমন দুঃখভ্রমণ নয়, ভগবৎকৃপা থাকিলে, শ্রীভগবানের আশীর্বাদ থাকিলে অভাবনীয় ভাবে সমস্ত যোগাযোগ হইয়া যায় এবং ভগবানের আহ্বান সত্যসত্য উপলব্ধি করা যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, ওরে অনেকদিন ধরে যেখানে লোকে বসে ঈশ্বরকে ডেকেছে সেইস্থানে তাঁর বিশেষ প্রকাশ জান্‌বি; অনায়াসেই উদ্দীপনা হয় সেই সকল স্থানের মাহাত্ম্যে। যেমন জল সব স্থানে থাক্‌লেও যে সকল স্থানে কূয়া বা পুষ্করিণী আছে সেখান হতে জল গ্রহণ করতে কোন পরিশ্রম করতে হয় না।

স্টেশনে আমাদের রাত্রি অতিবাহিত করিতে হয় নাই, কারণ অবতরণ করিবামাত্র কুলিরা এবং টাঙ্গাওয়ালা বলিল, "চলিয়ে সাহেব, বাঙ্গালী ধরমশালা আভি খোলা হ্যায়, তোতাদ্রী মঠ।" এত রাত্রেও ধর্মশালা খোলা আছে শুনিয়া আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলাম, কারণ এত পথ অতিক্রম করিয়া মন বিশ্রামের জন্য আনচান করিতেছিল। 'বহুত আচ্ছা, চলো' বলিয়া আমরা টাঙ্গায় আসিয়া বসিলাম। দুইখানি টাঙ্গা একটাকা করিয়া ভাড়া।

চতুর্দিকের জ্যোৎস্নালোক যেন প্রভুর অনুচরের ন্যায় স্নিগ্ধ হাসিতে আমাদের স্বাগত জানাইতেছিল। আনন্দপরিপ্লুত অন্তরে সেই নিস্তব্ধ রাত্রে আমরা চলিতে লাগিলাম দ্বারকানাথজীর দুর্গের

সঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা তোতাদ্রী মঠে আসিয়া পড়িলাম। মোহান্তজী তীর্থযাত্রীদের পরমাত্মীয়জ্ঞানে সেবা করিয়া থাকেন; সেই কারণে অত রাত্রেও তিনি আমাদের সহিত রীতিমতভাবে গল্প আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণুবিৎ স্বামিজী শ্রীগুরুর নির্দেশে ধর্মপ্রচার ও তীর্থযাত্রিগণের সুবিধার জন্য এই মঠ স্থাপন করেন। এই অঞ্চলে অত্যন্ত জলকষ্ট, কিন্তু তোতাদ্রী মঠে যাঁহারা উঠেন তাঁহাদের সে কষ্ট থাকে না, কারণ মঠাধ্যক্ষরা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ৫টি কূপ আশ্রমের ভিতরেই খনন করিয়াছেন। আশ্রমটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বৈদ্যুতিক আলো আছে।

পরদিবস প্রাতে পূর্ণিমার দিন আমরা মঠ হইতে আধ মাইল দূরে দ্বারকানাথজীর মন্দিরে যাই। প্রকাণ্ড দুটি তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতে হয়। প্রথমে উদ্যান, দক্ষিণপার্শ্বে বলরামজীর বিগ্রহ, এবং উদ্যান অতিক্রম করিয়া সম্মুখে নাটমন্দির ও তাহার বামপার্শ্বে প্রধান মন্দিরে দ্বারকানাথজী অপূর্ব রাজবেশে দণ্ডায়মান, নানাভাবে ভজনরত অগণিত ভক্তবৃন্দকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিতেছেন এবং আশীর্বাদ করিতেছেন।

ইহাই হইল ভগবানের আদি বাড়ি; পুরাণে কথিত আছে যে একমাত্র ভগবানের বাড়ি ছাড়া তাঁহার লীলাস্থল দ্বারকা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়াছে। দ্বারকানাথজীর মন্দিরের পার্শ্বে সত্যভামা, জাম্ববতী, সরস্বতী, মহালক্ষ্মী ইত্যাদি অষ্ট মহিষীর মন্দির। মন্দিরের নিকটেই গোমতী নদী। তীর্থযাত্রীরা সকলেই এই নদীতে পুণ্যস্নান করেন। অত্যধিক লবণাক্ত জল। স্নান করিবার পূর্বে সরকারি ট্যাক্স জনপ্রতি ✓০ আনা করিয়া দিতে হয়। স্নান করিবার পর আমরা নদীসংলগ্ন গোপালজীর মন্দিরে যাইলাম। ঐ মন্দিরে গোপালজী, গোমতী দেবী এবং তদীয় পিতা বশিষ্ঠদেব—এই তিন বিগ্রহ আছে।

ধৃতরাষ্ট্রের সভায় দ্রৌপদীদেবী যখন বিশেষভাবে লাঞ্ছিতা হইতেছিলেন তাঁহার পঞ্চ স্বামী, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি ও রাজন্যবর্গের সম্মুখে, সেই সময়ে তিনি এই দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইয়াছিলেন। দ্বারকানাথজীকে সেই সময়ে রুক্মিণীদেবী আহারের সমস্ত আয়োজন করিয়া নিবেদন করিতেছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল প্রভু চঞ্চল হইয়াছেন—কি হইল, কি হইল। রুক্মিণীদেবী মহা চিন্তায় পড়িলেন; তবে কি প্রভুর সেবার কোন ত্রুটি হইল! দ্বারকানাথজী তখন দেবীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,—না দেবী তোমার সেবার কোন ত্রুটি হয় নাই, আমি অন্য কারণে চঞ্চল হইয়াছি; আমাকে এই মুহূর্তে দ্বারকা পরিত্যাগ করিতে হইবে, আমার ভক্ত দ্রৌপদী দেবীর মহাবিপদ। এই বলিয়া দ্রৌপদী দেবীর নিকট তৎক্ষণাৎ আসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন,—হে দেবী, তুমি আমার দ্বারকানাথ বলিয়া শরণ করিয়াছিলে বলিয়া এই সুদূর পথ অতিক্রম করিয়া আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। তুমি যদি অন্তঃকৃষ্ণকে শরণ করিতে ত সেই মুহূর্তেই আমাকে পাইতে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥

এই প্রকার শ্রীভগবানের লীলা ও অপার করুণার নানা কথা স্মরণ করিতে করিতে অগণিত ভক্তবৃন্দ মন্দির পরিক্রমা করিতেছিল, কেহ দুই করে তালি দিতে দিতে নামগুণগান করিতেছিল, কেহ বা ধ্যানমগ্ন ছিল।

রুক্মিণীদেবীর মন্দির পৃথকভাবে এখান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে। মহামুনি দুর্বাসার আদেশে তাঁহার রথ অশ্বের পরিবর্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণী দেবী নিজেরাই টানিতেছিলেন। কোমলাঙ্গ রুক্মিণী দেবী এই কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং পিপাসার্ত হইয়াছিলেন।

দুর্বাসা মুনির আদেশ পালন না করিয়া তিনি পথি-মধ্যে রথ থামাইয়া জল গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুনি ইহার জন্য দেবীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার মিলন হইবে না, উভয়ে পৃথকভাবে অবস্থান করিবেন।

দ্বারকানাথজীর মন্দিরের কিয়ৎদূরে মহামায়ার মন্দির আছে। কথিত আছে, দক্ষযজ্ঞের পর সতীদেহের এক অংশ এখানে পড়িয়াছিল এবং ইহা বাহান্নপীঠের এক পীঠ। ইহারই নিকটে সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দিরও আমরা দর্শন করিলাম। মহাদেবের মূর্তির সম্মুখে নাটমন্দিরে প্রকাণ্ড একটি পাথরের ষাঁড়ের মূর্তি আছে।

দ্বারকানাথজীকে নানা সময়ে নানাভাবে দর্শন করিতে পাইয়াছিলাম। দ্বারকানাথজীর সম্মুখে নাটমন্দিরে একটি দীর্ঘ মুকুর আছে, অত্যধিক ভিড়ের সময় পশ্চাৎ ফিরিয়াও উহার মধ্য দিয়া সম্পূর্ণ বিগ্রহ দেখা যায়। পুনঃ পুনঃ দ্বারকানাথজী দর্শন করিয়াছি এবং প্রতিবারই মনে হইয়াছে, 'আজ যাহা নিতান্ত বাস্তব দুদিন পরে তাহা স্বপ্ন', কারণ এখান হইতে বহুদূরে, দেড়সহস্র মাইলেরও অধিক দূরে আমার নিবাস। স্মরণ নাই কোন্ সুদূর অতীতে কবে, কোথায় দ্বারকানাথজীর কথা শ্রবণ করি এবং ক্রমে ক্রমে দর্শনবাসনা জাগরিত হয় এবং পরিণামে দ্বারকানাথজীর কৃপা সত্য সত্য লাভ করি। কয়েকদিন এই পুণ্যধামে বাস করিয়া দ্বারকানাথজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া আমরা বিদায় প্রার্থনা করিলাম। ষ্টেশনে আসিলাম। গাড়ি ছাড়িল, আমরা জানালার ধারে বসিয়া আছি করজোড়ে এবং দ্বারকানাথজীর দণ্ডায়মান মূর্তি মনে মনে ভাসিতে লাগিল। ক্রমে গাড়ি বহুদূর অগ্রসর হইল এবং মন্দিরচূড়াটি অদৃশ্য হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি কথা স্মরণ করিতে লাগিলাম, ওরে দেবস্থান, তীর্থস্থান দেখে এসেই কি সে সব মন থেকে তাড়িয়ে দিতে হয়, না সেইভাব নিয়ে কিছুকাল থাকৃতে হয়। তীর্থদর্শন ক'রে এসে জাবর কাটতে হয় বুঝলি।

শ্রীমধ্বাচার্য

শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী, তর্ক-বেদান্ততীর্থ

আবির্ভাব

যাঁহাদের জীবনের দীপ্তিতে ভারতভূমি উজ্জ্বল হইয়াছে শ্রীমধ্বাচার্য তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইনি মাধব বা মধ্বাচারি—সম্প্রদায় প্রবর্তক দ্বৈতবাদী বেদান্তী। ইঁহার জীবনীর উপাদান হইতেছে নারায়ণ পণ্ডিতাচার্য লিখিত মধ্ববিজয় ও মণিমঞ্জরী নামক গ্রন্থদ্বয়। শ্রীসুব্বারাও, এম্-এ, শ্রীসি এন্ কৃষ্ণস্বামী আয়ার, শ্রীসি এম্ পদ্মনাভ আচারী এবং শ্রীসি আর কৃষ্ণ রাও প্রভৃতি মহোদয়গণও সম্ভবতঃ 'মধ্ববিজয়' গ্রন্থ এবং কোন শিলালিপি বা কিম্বদন্তী আশ্রয় করিয়া ইংরেজী ভাষায় মধ্বাচার্যের জীবনী লিখিয়াছেন।

দক্ষিণ কানাড়া জেলায় 'উডিপির' প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান—আট মাইল দক্ষিণপূর্বদিকে বেলিগ্রাম নামক স্থানে এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার নাম মধিজী ভট্ট। ইনিই মধ্বাচার্যের পিতা। তাঁহার আর একটি নাম মধ্যগেহ। ব্রাহ্মণের সহধর্মিণীর নাম ছিল বেদবতী। সংসারযাত্রা নির্বাহের পথে প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক না হইলেও ব্রাহ্মণের বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রসম্মত আচারনিষ্ঠা ছিল গভীর। ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-দম্পতির একটি পুত্র ও এক কন্যা-সন্তান অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করে। বহুদিন যাবৎ সন্তানের অভাবে তাঁহাদের মনঃকষ্টের সীমা ছিল না।

অবশেষে মধিজী ভট্ট ও বেদবতী 'উডিপি'র নারায়ণের নিকট পুত্র-সন্তান প্রার্থনা করেন। নারায়ণ তাঁহাদের কামনা পূরণ করিলেন। ১১১৮ খ্রীষ্টাব্দের শুক্লদশমীতে বেদবতীর ক্রোড় অলঙ্কৃত করিয়া শ্রীমধ্বাচার্য আবির্ভূত হইলেন। সি, এন্ কৃষ্ণস্বামী আয়ারের মতে আচার্যের জন্ম-বৎসর ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ; পদ্মনাভ আচারীর মতে খ্রীঃ ১২৩৮ সাল। পিতা শাস্ত্রবিধানানুসারে জাতকের নাম রাখিলেন বাসুদেব।

বাল্যকাল

বালক ক্রমে পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিল। এইরূপ প্রবাদ আছে যে মধ্যগেহ পুত্রকে পঞ্চম বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই মুখে মুখে বহু সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করাইয়াছিলেন। সপ্তম বৎসরের উপনয়নের পর অধ্যয়নের নিমিত্ত বালককে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। কেহ কেহ বলেন, তিনি শৈশবে অনন্তেশ্বর মঠে অধ্যয়ন করেন। বাল্যকালে বাসুদেব ক্রীড়াকৌতুক ব্যায়াম, সন্তরণ প্রভৃতিতে দিবসের অধিককাল অতিবাহিত করিতেন। সেই সময় তাঁহার পাঠে বিশেষ মনোযোগ ছিল না। তবে বালকের মেধা এবং প্রতিভা ছিল অসাধারণ। একটি ঘটনা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, "বাসুদেব, তুমি পড়াশুনা করনা কেন?" বাসুদেব উত্তর দিল "আমি রোজ রোজ এক রকম পড়া পড়িতে পারিব না।" শিক্ষক মহাশয় তখন পাঠ্যপুস্তকের কতকগুলি কঠিন কঠিন অংশ জিজ্ঞাসা করিলেন। বাসুদেব তৎক্ষণাৎ তাহার যথাযথ উত্তর দিল। ইহার পর হইতে শিক্ষক মহাশয় বালককে তাহার নিজ ইচ্ছামত চলিতে বাধা দিতেন না। এইভাবে বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া বাসুদেব নিজ গৃহে শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সংসারে বীতস্পৃহ ছিলেন, শাস্ত্রাধ্যয়নের ফলে অধিকতর বৈরাগ্যের উদয় হইল। মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। তদনুযায়ী একদিন গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া অচ্যুত প্রকাশাচার্য (অন্য নাম পুরুষোত্তম তীর্থ) নামক জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার পিতা কোনরূপে সংবাদ পাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং পুত্রকে স্বগৃহে ফিরাইয়া লইয়া আসিলেন।

সন্ন্যাস

কিছুকাল গৃহে বাস করিয়া পরে পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্বক পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বাসুদেব অচ্যুতপ্রকাশের নিকট সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হইলেন। গুরুদত্ত নাম হইল মধ্বাচার্য। অচ্যুতপ্রকাশ ছিলেন অদ্বৈতবাদী। তাঁহার নিকট নবীন সন্ন্যাসীর বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন চলিতে লাগিল, কিন্তু প্রায়ই গুরুশিষ্যে তর্ক হইত। তর্কে মধ্ব সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদই খণ্ডন করিতেন। কথিত আছে, অচ্যুতপ্রকাশ প্রথমে মধ্বাচার্যকে ইষ্টসিদ্ধি গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের পর অচ্যুতপ্রকাশ মধ্বের আর একটি নাম দিলেন—পূর্ণপ্রভাত। এতদ্ব্যতীত মধ্বাচার্য আনন্দতীর্থ, আনন্দজ্ঞান, জ্ঞানানন্দ এবং আনন্দগিরি* নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের পর গুরু তাঁহাকে অনন্তেশ্বর মঠের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহারই উপর অধ্যাপনার ভার অর্পণ করিলেন। এখন হইতে তিনি অনেক সময় সাধন-ভজনে নিরত থাকিতেন, কখন কখনও বা পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্র বিচার করিতেন।

দিগ্বিজয়

এইভাবে কিছুকাল কাটিলে কিঞ্চিন্ন্যূন ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মধ্বাচার্য গুরুর সহিত দাক্ষিণাত্য বিজয়ে বহির্গত হন। প্রথমে তাঁহারা বিষ্ণুমঙ্গল হইয়া ত্রিবেন্দ্রমে যাত্রা করিলেন।

* শঙ্করভাষ্যের টীকাকার আনন্দগিরি স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

ত্রিবেন্দ্রমের রাজসভায় শৃঙ্গেরীমঠের তদানীন্তন শঙ্করাচার্য বিদ্যাশঙ্করের সহিত বিচার হয়। বিচারে কেহই পরাজিত হইলেন না। 'বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস' প্রণেতা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন, "মধ্বাচার্যই পরাজিত হইয়াছিলেন।" এই ঘটনার পর হইতেই অদ্বৈতমতের সহিত মধ্বমতের বিরোধ প্রচারিত হইতে থাকে। ত্রিবেন্দ্রম্ হইতে তাঁহারা শ্রীরঙ্গম যাত্রা করিলেন।

শ্রীরঙ্গমে অদ্বৈতবাদিগণের সংখ্যা অল্প ছিল, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাবলম্বীরই ছিল প্রাধান্য। সেইজন্য সেখানে তিনি সহজেই নিজ মত প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন। এই বৎসর মধ্বাচার্য রামেশ্বরে গুরুর সহিত চাতুর্মাস্য-ব্রতানুষ্ঠান করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যখন মধ্বাচার্য বিদ্যাশঙ্করকে পরাজিত করিতে পারিলেন না অথচ অদ্বৈত মতও গ্রহণ করিলেন না তখন বিদ্যাশঙ্কর বলেন,—তুমি যতদিন প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া প্রচার করিতে না পারিবে ততদিন তোমার মত গৃহীত হইবে না। এই কথা স্মরণ করিয়া মধ্বাচার্য দাক্ষিণাত্যবিজয় হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া উড়িপিতে প্রথমে গীতাভাষ্য রচনা করেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি উত্তর ভারত পরিভ্রমণার্থ বহির্গত হইলেন। উত্তর ভারতে তাঁহার অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সত্য তীর্থ—নামে এক বিদ্বান সন্ন্যাসী এই সময়ে তাঁহার মতে আকৃষ্ট হন। পরিব্রজ্যাকালে মধ্বাচার্য উপবাস, তপস্যা প্রভৃতি অবলম্বনে অনেক কাল কাটাইয়াছিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে কখনও কখনও তিনি বন্যপশু ও দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত আবার কখনও বা বিভিন্ন দেশীয় রাজন্যবৃন্দ কর্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে বদ্রিনারায়ণে ব্যাসদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। ব্যাসের আদেশে নাকি তিনি ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া প্রচার করেন। বদ্রিনারায়ণ হইতে হরিদ্বার, হৃষীকেশ পর্যন্ত পর্যটন করিতে করিতে প্রত্যাবর্তনের পথে বঙ্গ, বিহার, পুরী ও অন্ধ্র প্রদেশ ভ্রমণ করেন। এই সময় রাজমাহেন্দ্রীতে অশেষশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, গজপতিরাজের মন্ত্রী শমীশাস্ত্রী ও শোভন ভট্ট নামক দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসের পর শমীশাস্ত্রীর নাম হয় নরহরি তীর্থ। শোভন ভট্ট পরিচিত হন পদ্মনাভতীর্থ এই নামে। উভয়ে বহু টীকাদি রচনা করিয়া মধ্ব-সম্প্রদায় প্রবর্তনে সাহায্য করেন। একদা মধ্বাচার্য স্বকৃত-ভাষ্যসম্বলিত একখানি ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থ অচ্যুত প্রকাশকে প্রেরণ করেন। গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিয়া তিনি এত সন্তুষ্ট হন যে, অবশেষে অদ্বৈত মত পরিত্যাগ করিয়া মধ্বমত গ্রহণ করেন। ইহাতে দেশে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অচ্যুত প্রকাশ প্রত্যহ সমগ্র ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য অধ্যয়ন করিয়া জলগ্রহণ করিতেন। একাদশীর পরদিন সমগ্র ভাষ্য অধ্যয়ন করিয়া জলগ্রহণ করায় তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইত। তাঁহার এই কষ্ট লাঘবার্থ মধ্বাচার্য ৩২টি শ্লোকে 'অণুভাষ্য' নামক এক সংক্ষিপ্ত ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য রচনা করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন।

মতপ্রচার

ইহার পর ক্রমশঃ বহুলোক মধ্বাচার্যের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা, যুক্তিকৌশল, প্রতিভা ও মেধায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কথোপকথন শুনিতে উপস্থিত হইত ও অনেকে তাঁহার মত গ্রহণ করিত। তিনি সম্প্রদায়রক্ষার জন্য, উড়িপি, সুব্রহ্মণ্য, মধ্যতল প্রভৃতি কয়েকস্থানে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং কয়েকজন সন্ন্যাসীকে ঐ সকল মঠের ভার দিয়া স্বীয় মত প্রচার করাইতে লাগিলেন। উড়িপিতে মধ্বাচার্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। উড়িপি মাধ্বগণের অতি পবিত্র তীর্থ। জীবনে অন্ততঃ একবার সেখানে তাঁহাদের যাওয়া চাই। এই স্থানেই মাধ্বাচার্য তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা করেন।

ইহার পর আচার্য দ্বিতীয়বার উত্তর ভারতে যাত্রা

করিয়া দিল্লী, কুরুক্ষেত্র, গয়া, কাশী প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। কাশীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া তিনি পণ্ডিতদের সহিত শাস্ত্রবিচারে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় বহুলোক কাশীতে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। উত্তর ভারত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এইবার তিনি প্রায়ই দক্ষিণ কানাড়া জেলায় অবস্থান করিতেন, কখনও কখনও বিষ্ণুমঙ্গলে গিয়া কিছুকাল থাকিতেন। এই সময়েও তাঁহার অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। কথিত আছে এই সময় পুণ্ডরীকপুরী ও পদ্মনাভ নামে দুইজন পণ্ডিত মধ্বের সহিত বিচারের জন্যও উপস্থিত হন। বিচারে পদ্মনাভ পরাজিত হন; আর পুণ্ডরীকের জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া যায়।

ক্রমে অদ্বৈতমতের সহিত মাধ্বমতের এত বিরোধ উপস্থিত হইল যে শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ বিদ্যাশঙ্করের আজ্ঞায় দুস্যদল কর্তৃক মধ্বের পুস্তকালয় বাজেয়াপ্ত হয়। পরে ঐ দেশের রাজা জয়সিংহের সাহায্যে পুস্তকগুলির উদ্ধার করা হইয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে মধ্বাচার্য যখন বিষ্ণুমঙ্গলে সেই সময় এক রাজসভায় ত্রিবিক্রম পণ্ডিতাচার্য নামক এক বিখ্যাত পণ্ডিত পনর দিন যাবৎ মধ্বাচার্যের সহিত বিচার করিয়া পরাস্ত হন ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইঁহারই অনুরোধে মধ্বাচার্য ব্রহ্মসূত্রের 'অনুব্যাখ্যান' নামে আর একটি পদ্যভাষ্য রচনা করেন। ত্রিবিক্রমাচার্যও সূত্রভাষ্যের উপর 'তত্ত্বদীপন' টীকা রচনা এবং 'বায়ুপুত্র' নামে মধ্বের মাহাত্ম্যপ্রকাশক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে মধ্বকে বায়ুর তৃতীয় অবতার বলা হইয়াছে। এই ত্রিবিক্রমের পুত্র নারায়ণ পণ্ডিতই 'মধ্ববিজয়' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা।

ইহার পর বহুলোক মধ্বাচার্যের শিষ্য হইল। মধ্বের কনিষ্ঠ সহোদর এবং অপর সাতজন এই সময় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসের পর মধ্ব-ভ্রাতার নাম হয় বিষ্ণুতীর্থ। ইনি 'সদি' মঠের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। শেষ বয়সে মধ্বাচার্য ব্রহ্ম-সূত্রের 'ন্যায়বিবরণ', 'কৃষ্ণামৃত মহার্ণব', 'কর্মনির্ণয়' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এইবার যেন তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। ইহার কিছুকাল পরে আনুমানিক ৮০ বৎসর বয়সে আচার্য মাঘ মাসের শুদ্ধা নবমী তিথিতে নশ্বর শরীর পরিত্যাগ করেন। এই দিবসটি মাধ্বগণের নিকট বিশেষ স্মরণীয়।

উপসংহার

মধ্বাচার্য (স্থূল) শরীর পরিত্যাগ করিলেও যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চন্দ্রসূর্যাস্ত কাল পর্যন্ত নষ্ট হইবার নয়। তাঁহার শরীর দৃঢ়, বলিষ্ঠ, মুখ সুন্দর ও উজ্জ্বল, শরীরের গঠন পালোয়ানের মত ছিল। তাঁহার মনের ক্ষমতা ছিল ততোধিক। বিচারে যে কোন লোককে অভিভূত করিতে পারিতেন। তাঁহার অনেক যোগবিভূতি ছিল বলিয়া মধ্ববিজয়ে বর্ণিত আছে। মধ্বাচার্যের কণ্ঠ খুব সুমিষ্ট ছিল এবং তিনি সুগায়ক ছিলেন। একবার গানে একব্যক্তিকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষা ছিল সরল, গ্রাম্যতাদোষবর্জিত ও অলঙ্কারবিহীন। মধ্বাচার্য নারায়ণকেই পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। একাদশী তিথিতে সকলকে নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা দিতেন ও ঐ দিবস যাহাতে হরিস্মরণ ও শাস্ত্রালোচনায় অতি-বাহিত হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি দিতে বলিতেন। জীবহিংসা নিষেধ করিতেন। তিনি ভস্ম ও রুদ্রাক্ষের পরিবর্তে চন্দন ও তুলসীর মালা ব্যবহার-প্রথা প্রবর্তন করেন। মধ্বের দর্শন অতি প্রবল ও যুক্তিপূর্ণ। এই প্রবন্ধে তাহা আলোচ্য নয়। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের মধ্যে ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ও গীতা ভাষ্য সমধিক প্রসিদ্ধ। দশখানি উপনিষদের ভাষ্য, কৌষীতকী উপনিষৎ ভাষ্য, নারায়ণ উপনিষৎ ভাষ্য, কৈবল্যোপনিষৎ ভাষ্য ইঁহার রচিত। এতদ্ব্যতিরিক্ত ৭০।৭৫ খানি গ্রন্থও আছে, অনেকগুলি ভাষ্য, টীকা ও বার্তিক, কতকগুলি সম্পূর্ণ মৌলিক।

অর্জুনের প্রার্থনা

(গীতা ১১শ অধ্যায় হইতে অনূদিত)

শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী

১

তব মাহাত্ম্য কীর্তন শুনি,
এ মহাজগতে হে হৃষীকেশ।
যত নরনারী ভাসে আনন্দে,
তব অনুরাগে ওগো দেবেশ।
রাক্ষসকুল ত্রস্ত-ব্যাকুল
পলায় যে পারে যেদিক পানে।
সিদ্ধ যাঁহারা বন্দিবে তোমা—
যুক্তিযুক্ত সবে এ জানে।

২

তোমারে কেননা বন্দিবে সবে,
ওহে অনন্ত দেবাদিদেব।
ব্যক্ত বা অব্যক্ত অতীত
যে ব্রহ্ম,—তুমি তাহাই দেব।
তুমি ব্রহ্মার আদিগুরু প্রভু—
এই জগতের পরমাধার।
হে শংখপাণি চরণে তোমার
শত শত বার নমস্কার।

৩

হে অনন্ত-রূপ তুমি আদিদেব,
যেহেতু অনাদি পুরুষ তুমি।
জানি নিশ্চয় তোমা মাঝে লয়
পায় সুবিশাল পৃথ্বীভূমি।
সকলি তো তব জ্ঞানের গোচর,
এ বিশ্বে জ্ঞেয় তুমিই জানি।
হে বিশ্বব্যাপী অনন্তরূপ—
তব পদাশ্রয়ে নিখিল প্রাণী।

৪

বায়ু যম আর অগ্নি বরুণ,
সবই তব রূপ জগন্নাথ।
প্রজাপতি তুমি—তুমি শশাংক,
প্রপিতামহ লহ প্রণিপাত।
এ প্রণতি মোর চরণে তোমার
শতদল হয়ে উঠুক ফুটে।
সহস্রধারে প্রণাম আমার—
চরণে তোমার পড়ুক লুটে।

৫

অজ্ঞান আমি প্রণয়ের বশে,
তোমার মহিমা না বুঝি কিছু।
"কৃষ্ণ" "যাদব" "সখা" সম্ভাষি—
অবজ্ঞাভরে ক'রেছি নীচু।
পরিহাসছলে বান্ধবমাঝে,
আহার বিহার শয়নকালে।
অনাদরে তোমা বলেছি যা কিছু,
অনুশোচনার আগুন জ্বলে।
ওগো অচ্যুত এ ত্রুটি আমার,
আপনার গুণে ক্ষম হে ক্ষম।
হে অমিত-তেজ সর্বস্বরূপ—
হে বিশ্বরূপ নম হে নম॥

ধর্মজীবন ও নারী

শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী

ধর্মজীবন অর্থে সাধারণতঃ আমরা বুঝি সাত্ত্বিক ভাবে জীবন যাপন। সাত্ত্বিক ভাবে জীবন যাপনের সবচেয়ে বেশী প্রচলন হিন্দুজাতির মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। যথাসর্বস্ব বিশ্বনিয়ন্তার চরণে উৎসর্গ করে অতি কঠোর সংযম ও একনিষ্ঠা নিয়ে তপশ্চর্যা শুধু ভারতবাসীরই সাধ্যায়ত্ত। এখনও আমাদের অগোচরে কত গুহাকন্দরে, কত নিভৃত নির্জন স্থানে কত শত মহাপুরুষ ঈশ্বরচিন্তায় তদ্‌গত হয়ে আছেন তার হিসাব কে রাখে?

ধর্মপ্রাণ ভগবদ্ভক্তগণের মায়া-মোহমুক্ত পবিত্র জীবন দেখলে অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যও মনপ্রাণকে যেন উর্ধ্বে তুলে ধরে, তখন কেবল মনে হয় কি নিয়ে কিসের মধ্যে আমরা এমন করে জড়িত হয়ে আছি! এত দেখেশুনেও কি আমাদের এতটুকু চৈতন্য হয় না যে, ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমরা মানুষ—'মান্ হুঁস' অর্থাৎ সব কিছুতে বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত করে আমাদের সত্যিই হুঁসিয়ার হতে হবে, মানুষ নামের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে? কিন্তু এমনই মায়ার কুহকে, এমনই খেলা নিয়ে আমরা ভুলে থাকি যে, পর মুহূর্তেই আবার সবকিছু ভুলে 'আমার আমার' করে অস্থির হয়ে পড়ি। আমাদের অনিত্য মায়ামোহে আচ্ছন্ন করে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম ভুলিয়ে রাখার এ অপূর্ব কৌশলও ভগবানেরই বিচিত্র লীলা।

শাস্ত্র বলেন, যে শক্তির প্রভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যন্ত্রের মত চালিত হচ্ছে, যা নাকি ধরাছোঁয়ার অতীত মনে হয়—"অবাঙ্‌মনসোগোচরম্" সেই অনন্ত শক্তি এবং তাঁর দ্বারা চালিত জগৎ, এই দুয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্যই নেই। পার্থক্য শুধু আমাদের মনে। আমরা এমন করে অনিত্য বস্তুতে নিজেদের জড়িয়ে রেখেছি, আমাদের শক্তিকে এমন সীমাবদ্ধ করে রেখেছি, যে মানুষও যে কোনওদিন দেবতা হতে পারে, তার এতখানি ক্ষমতা, এতখানি জ্ঞান-বুদ্ধি আছে এ আমাদের ধারণাতীত। সেই অন্তর্নিহিত জ্ঞানকে কর্মের দ্বারা ও বিবেকবুদ্ধির দ্বারা চালিত করে ক্রমশঃ সেই পরম সত্তায় পৌঁছাবার পথে এগিয়ে যেতে হবে। এই হল ধর্মজীবনের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য শুধু পুরুষের নয়, নারীরও।

মানুষ যখন ক্রমশঃ উচ্চস্তরে উঠে যায় তখন আর তাকে কোনও জাগতিক বস্তু প্রলুব্ধ করিতে পারে না, সে তখন ভগবদ্ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক স্বর্গীয় আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। তখন আর তার কামনা বাসনার কিছুই থাকে না, থাকে শুধু একটা সব-পাওয়ার অপূর্ব পরিতৃপ্তি। হৃদয়-তন্ত্রীতে তখন একই সুর ধ্বনিত হতে থাকে। কিন্তু সেই ভাবকে মনের মধ্যে বিকশিত করতে হলে, কিছু পরিশ্রম করতে হবে। নিজের অজস্র ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিপূরণে সর্বদা ব্যস্ত যে জীবন এতদিন কাটিয়ে এসেছি সে জীবনে কখনো ঐ ভাব আসতে পারে না। নতুন জীবন চাই—সাত্ত্বিক জীবন—ধর্মজীবন। পুরুষেরও চাই, মেয়েদেরও চাই।

ভগবান্, তুমি কে, কেমন তোমার রূপ, কোথায় তোমার অস্তিত্ব, কি ভাবে আমি তোমার ধারণায় আনবো, আমার ধ্যানে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করব, কিছুই জানি না। কিন্তু এটা ঠিকই জানি, সকল লোকচক্ষুর অন্তরালে বসে এক দিব্যশক্তি আমাদের প্রতিক্ষণ চালিত করছে। কোনও একটা দিব্য প্রেরণা না পেলে, পরম লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথের নির্দেশ না পেলে, কেমন করে আমরা তোমাতে পৌঁছাব এবং তুমিই যে আমি সে জ্ঞান, সে যোগ্যতা তুমি কৃপা করে না দিলে কেমন করে আমি তোমায়

চিনব, বল? তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; আমি সমস্যা, তুমি সমাধান; আমি তোমার, তুমি একান্ত আমারই, এ ধারণা, এ বিশ্বাস আমার মনে তুমিই তো জাগাবে, তবেই তো আমি তোমায় চিনবো এবং তবেই তো ক্রমশঃ আমি তোমার সাথে এক হয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করব? সে অপূর্ব তেজ ও শক্তির বিন্দুমাত্র পেতে হলেও আমায় তোমার উদ্দেশ্যে কর্ম করে যেতে হবে আজীবন। তোমায় অর্পিত কর্ম করতে করতে তবেই তো একদিন আমার সকল কর্মের ফল—তোমাকে আমি পাব।

মানুষের এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন, ক'দিন তার মেয়াদ কেউ বলতে পারে না। তাই এই আসা যাওয়ার মাঝখানের দিন ক'টার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা চাই। অর্থাৎ সৎ চিন্তা, সৎকর্মের মধ্যে সর্বদা নিজেকে সমাহিত করতে হবে অনন্যশরণ হয়ে, তাঁরই চিন্তায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে হবে, তবেই আমরা ধর্মজীবন যাপন করতে সক্ষম হবো। ধর্ম-জীবনের সঙ্গে নারীর কি বা কতখানি সম্বন্ধ এর উত্তরে শুধু এইটুকুই বলতে পারি, যে নারীত্বের মধ্যেই জগতের মাতৃত্বের পরিচয়। সে রকম শুদ্ধ-সত্ত্ব নারী দেখলে 'মা' শব্দ স্বতঃই মুখ থেকে উচ্চারিত হয়। 'মা' ডাকের মত মধুর ডাক আর কিছুই নাই। মা ডাকে সমস্ত দুঃখ গ্লানি, মনের সব রকম অবসাদ দূরীভূত হয়। সন্তানের যত বিপদই আসুক না কেন একবার মা'র কোলে আশ্রয় পেলে কোনও বিপদই তাকে স্পর্শ করতে পারে না, মাতৃশক্তির এমনই অপূর্ব মহিমা।

তাই মাতৃজ্ঞানে যদি সেই পরমশক্তির চিন্তা আমরা করতে পারি, সন্তান যেমন মা বই কিছু জানে না, সেই মহাশক্তিকে যদি আমরা মা'র মূর্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তাঁকে সেইভাবে যদি আমরা ধ্যানে, জ্ঞানে উপলব্ধি করতে পারি তবেই আমাদের সবকিছু সাধনা, সব কর্ম, গন্তব্য স্থলে পৌঁছাবার সবকিছু প্রচেষ্টা অতি সুন্দর সহজ, সরল ও সার্থক হয়ে ওঠে।

শিব ও শক্তি যেমন অভেদ, এককে ছেড়ে দিলে অন্যের কিছুই থাকে না, সেরকম পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ। পুরুষ বাঁচতে পারে না, নারী বিনা। দুজনের জীবনে দুজনের ঠিক ঠিক সাহচর্য পেলে তবেই দুজনে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। সকল কাজে দুজনেরই সমান অধিকার। দুজনেরই পরম লক্ষ্যে পৌঁছাবার একই পথ, একই উপায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" "ওঠ, জাগ, আশীর্বাদ লাভ করে নিজের যোগ্যতাকে প্রবুদ্ধ করে তোল।" তোমার যে কি শক্তি, কি সামর্থ্য আছে তাকে জাগিয়ে তোল, তোমার হৃদয়স্থিত কুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ কর, মহাশক্তির অংশস্বরূপ নারী-শক্তির মহিমা প্রকটিত কর। কত মহীয়সী নারী এযাবৎ ভারতবর্ষে নিজেদের সুকৃতির ফলে জীবনের নানাক্ষেত্রে অক্ষয়কীর্তি রেখে গেছেন। পুরাকালে সর্বংসহা সীতা, পতিব্রতা বেহুলা ও সাবিত্রী, বিদুষী মৈত্রেয়ী, গার্গী, গিরিধারীর চরণে সম্পূর্ণ সমাহিতা চিতোরের মহারাণী মীরাবাঈ—এরকম আরও কত মহীয়সী নারীর অপূর্ব দৃষ্টান্ত তাঁদের চিরস্মরণীয় করেছে।

এ যুগের জ্বলন্ত আদর্শ আমাদের পরমারাধ্যা শ্রীমা সারদা দেবী কত বুভুক্ষুর মুখে অন্ন তুলে দিতে, কত নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, কত দুঃখীর চোখের জল মোছাতে যে মর্ত্যে এসেছিলেন ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তিনি ছিলেন যেন নারীরূপে সারা বিশ্বের মা। কোনও দিন কোনও সন্তান তাঁর কাছ থেকে বিফলমনোরথ হয়ে ফেরেনি। যে ভাবে যখন যে যা চেয়েছে তাই তিনি মুক্তহস্তে সবাইকে দিয়েছেন। তাঁর বরাভয় হস্ত সন্তানের জন্য সর্বদাই প্রসারিত থাকত।

ধর্মজীবনের উচ্চশিখরে আরোহণ করতে হলে

পুরুষকে যেমন কঠোর সাধনা অবলম্বন করতে হয়, নারীকেও ঠিক তাই করতে হয়। তবে পুরুষের চেয়ে মেয়েকে সবরকমে সংযত করে রেখে পরম-লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে অনেক বেশী বাধা-বিঘ্ন, মান-অপমান, অত্যাচার সহ্য করতে হয়। মীরাবাঈ তাঁর গিরিধারীলালকে পাওয়ার জন্য সংসারে কত উৎপীড়ন সয়েছিলেন, কিন্তু তাতে তিনি এতটুকু বিচলিত হননি।

আবহমান কাল থেকে এই চিরন্তনী প্রথা চলে আসছে যে নারী চিরদিনই পুরুষের অধীন। পুরুষ যদি ধর্মপ্রাণ, সংযত ও উন্নত-চরিত্রের হয় তবেই সে সংসারে নারীর আদর, নারীর সম্মান, নারীর স্থান থাকে—সংসার শান্তিপূর্ণ হয়, নারীকেও তখন পুরুষের সত্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে চলতে হয়। দুজনের সম্মিলিত সংযম ও পবিত্রতায় সংসার স্বর্গাদপি গরীয়সী হয়ে ওঠে, আদর্শ জীবনে পরিণত হয়। আর যদি কোনও সংসারে, কোনও কথায়, কোনও কাজেই নারী ও পুরুষের মধ্যে মনের মিল না থাকে, পুরুষ যে সৎকাজে হস্তক্ষেপ করে নারী যদি তাতে বাধা সৃষ্টি করে এবং নারীর কাজে পুরুষ বাধা দেয়, সে স্থলে কোনও কাজই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না, উপরন্তু ঝগড়া ও অশান্তির আগুন প্রতিনিয়ত জ্বলতে থাকে, নির্বাপিত হওয়ার কোনও উপায়ই থাকে না। দুজনের শক্তিতে দুজনে সহায়ক হয়ে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যেতে পারলেই কালে সেই দিব্য শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। তাই নারীকে উপাধি দেওয়া হয়েছে পুরুষের সহধর্মিণী।

সংসারে থেকে, স্বাভাবিক মানুষের মত সব কিছু আচার-ব্যবহার করেও, মানুষ কত মহান্, কত শ্রেষ্ঠ হতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে তা তিনি প্রতি কার্যে দেখিয়ে গিয়েছেন। আমরা ভেবে ভেবে আত্মহারা হয়ে পড়ি যে মানুষে এ কি করে সম্ভব হয়? কিন্তু একবারও ভেবে দেখিনা যে এই অপূর্ব সংযম, অপূর্ব ভক্তিবিশ্বাস, অপূর্ব নিষ্ঠা—এর পিছনে কত বড় নারীশক্তির প্রেরণা রয়েছে। শ্রীশ্রীমা যদি অমনটি না হতেন তবে কি ঠাকুরেরই সাধ্য ছিল এমন হওয়া? মাকে ঠাকুরই প্রচার করেছেন, ভবতারিণী জ্ঞানে সর্বস্ব তাঁর পায়ে অর্পণ করে। আর মাও এসেছিলেন তাঁরই এ অলৌকিক কার্যকলাপে তাঁর একমাত্র সহকারিণীরূপে। কেউ কারুর চেয়ে এতটুকু কম নন। তবু ঠাকুর বারবার বলে গেছেন, "ও যদি এমন না হত, তবে আমিই কি পারতাম এমন হতে?" ঠাকুরের জীবনে নারীর আসন অনেক উর্ধ্বে। তিনি প্রত্যেক নারীকেই (কি ইতর, কি ভদ্র) 'মা' সম্বোধন করতেন। সাধক রামপ্রসাদও তাঁর প্রতি গানে তাঁর ভুবনমোহিনী মাকেই মূর্ত করে তুলেছেন। মনু বলেছেন "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"—এমন যে সীতা সাবিত্রীর দেশ আমাদের, মহীয়সী নারীদের জন্য তা ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

পাশ্চাত্য থেকে স্বামী বিবেকানন্দ নিয়ে এলেন সঙ্গে করে আইরিশ মহিলা ভগিনী মার্গারেট নোবলকে। আমাদের দেশের জন্য তিনি দেহ মন প্রাণ নিবেদন করলেন, তাই তো তাঁর নাম স্বামীজী দিলেন ভগিনী নিবেদিতা। আপ্রাণ পরিশ্রম করে স্বামীজীর নির্দেশমত মেয়েদের সুশিক্ষার জন্য স্কুল তৈরী করলেন। ভগিনী নিবেদিতার এতবড় ত্যাগ, নিষ্ঠা ও গুরুভক্তি প্রত্যেক নারীর জীবনে আদর্শস্বরূপ। আমাদের দেশের মেয়েদের যতটুকু ক্ষমতা আপ্রাণ যত্নে নিজেকে উন্নত করতে ও দেশকে ভালবাসতে চেষ্টা করতে হবে। দেশের কল্যাণের জন্য দেশবাসীর দুঃখ দুর্দশা মেটাবার জন্য, পুরুষদের ন্যায় মেয়েদেরও যত্নবান হতে হবে। এটা ধর্মজীবনেরই অঙ্গ। এইরূপেই আমরা আমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের মহিমা অটুট অক্ষয় করে রাখতে পারব।

জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হলে, সদ্ভাবে জীবন-যাপন করতে হলে প্রথমেই দরকার জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলের প্রতি ভাল ব্যবহার ও সত্যনিষ্ঠা ও সেই প্রেমময় জগৎকারণের চরণে অটুট বিশ্বাস ও ভক্তি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ভারতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হলে হয় না, সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রী-গুরুগ্রহণ, নারীভাবে সাধন, সেজন্যই মাতৃভাব প্রচার ও নারীমঠ স্থাপনের সংকল্প। চিন্তা ও কার্যের স্বাধীনতাই জীবন, উন্নতি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের একমাত্র সহায়।

একের প্রকাশ

শ্রীশক্তিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক কথা বলার মাঝে
　　না-বলা এক কথা,
আজকে আমার মরম মাঝে
　　জাগায় করুণ ব্যথা।
অনেক তারার মাঝে শুধু
　　একটি তারার চাওয়া,
আমার মনে জাগিয়ে দিলে
　　না পাওয়া আর পাওয়া।
আঁচলভরা ফুলের মাঝে
　　একটি ফুলের বাস,
করলে মনে বেদন-মধুর
　　অতীত পরকাশ।
অনেক পাখীর কূজন মাঝে
　　একটি 'কুহু' ধ্বনি,
স্বচ্ছ মনে আনলে টেনে
　　চিন্তা চিরন্তনী।
শালুক পাতা ছাপিয়ে জলে
　　একটি সরোজ ভাসে,
শ্যামকিশলয় ঢাকা দিয়ে
　　একটি কুসুম হাসে।

দৃষ্টি

শান্তশীল দাশ

তোমারে খুঁজেছি আমি দূরে বহু দূরে,
তীর্থে তীর্থে দেবালয়ে ; বহু পথ ঘুরে,
গিয়েছি দুর্গম দেশে ক্লান্ত দেহ বহি,
দর্শন পাবার আশে শত দুঃখ সহি।
তোমার মেলেনি দেখা—ব্যর্থ পর্যটন ;
অবিশ্রান্ত দিবানিশি অন্ধ অন্বেষণ।

প্রশ্ন জাগে বারে বারে বিক্ষুব্ধ অন্তরে :
একি শুধু অকারণ মিথ্যা কল্পনার
পিছে ছুটে মরে সব যুগ যুগ ধরে
যাত্রীদল—নেই কোন অস্তিত্ব তোমার ?
তুমি নেই, মিথ্যা সব তীর্থ দেবালয়,
কল্পনাবিলাসী মনে তোমার আশ্রয়।

সংশয়ের মাঝে শুনি অস্ফুট গুঞ্জন :
আমি তো রয়েছি, কোথা তোর দু'নয়ন !

জাতিভেদের মূলকথা ও ক্রমপরিণতি

[শাস্ত্র হইতে যে প্রকার প্রতিভাত হয়]

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

যাঁহারা সর্বভূতে শ্রীভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন ও তাহা স্বীয় জীবনে উপলব্ধি করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, সেই হিন্দুগণের মধ্যে জাতিভেদ-প্রথা কি প্রকারে প্রবিষ্ট হইল, এই বিষয়ে ইদানীন্তনকালে শিক্ষিতসমাজে নানা মতভেদ দেখা যায়। সেই সকল বাদানুবাদের মধ্যে না গিয়া আমাদের সুপ্রাচীন শাস্ত্র—শ্রুতি ও স্মৃতি এই বিষয়ে কি বলেন, তাহাই প্রস্তাবিত প্রবন্ধে আলোচনা করিব। শ্রুতি ও তদনুগামিনী স্মৃতিতে এই বিষয়ে আপাতদৃষ্টিতে দুইপ্রকার অভিমত পরিদৃষ্ট হয়—নব কল্পারম্ভে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই জন্মগত জাতিভেদ এবং মানবসৃষ্টির পরবর্তিকালে গুণ ও কর্মানুসারে জাতিভেদ। ঐতিহাসিক ঘটনা ও বস্তুর স্বরূপ উভয় প্রকার হইতে পারে না, এজন্য জাতিভেদপ্রথার প্রারম্ভ বিষয়ে উক্ত উভয়প্রকার অভিমতই বস্তুগতিতে সত্য মনে করা কঠিন। সুতরাং জাতিভেদবিষয়ক শাস্ত্রবাক্যসকলের তাৎপর্য কি, কি তাহাদের প্রতিপাদ্য, তাহা পূর্ব ও উত্তরমীমাংসাসম্মত যুক্তিসংযোগে বিচার দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে, কারণ শাস্ত্রীয় রীতি অনুসারে শাস্ত্রবাক্যের অর্থনিরূপণই শাস্ত্রের তাৎপর্যাবধারণের অভ্রান্ত উপায়। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন,—"আর্ষ (ঋষিদৃষ্ট বেদ) ও ধর্মোপদেশকে (বেদমূলক স্মৃতি ইত্যাদিতে বর্ণিত উপদেশ সকলকে) যিনি বেদের অবিরোধী তর্কের দ্বারা (পূর্ব ও উত্তরমীমাংসাসম্মত যুক্তির দ্বারা) বিচার করেন, তিনিই ধর্মকে জানিতে পারেন, অপরে নহে।" (মনুসংহিতা, ১২।১০৬) ইত্যাদি।[১] এই মহাজনবাক্য অনুসরণ করিয়া মীমাংসাশাস্ত্রানুসারে জাতিভেদের উৎপত্তিবোধক শাস্ত্রবাক্যসকলের বিচার করিয়া তদ্বিষয়ক একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি। জাতিভেদের উৎপত্তি প্রতিপাদক উক্ত উভয়প্রকার শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্যগুলি এই—

জন্মগত জাতিভেদ প্রতিপাদক শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য

জন্মগত জাতিভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য এই—

(১) "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"

(তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৩।১২।১৩, ঋগ্বেদ সং ১০।৯০।১২)। পূজ্যপাদ সায়ণাচার্যকৃত ভাষ্য-অনুসারে ইহার অর্থ এই—"ইঁহার (সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার) মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল।" (২) "প্রজাপতিঃ অকাময়ত প্রজায়েয় ইতি, সঃ মুখত স্ত্রিবৃতং নিরমিমীত * * ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণামজঃ পশুনাম্" (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭।১।১।৪)—"প্রজাপতি কামনা করিয়াছিলেন, উৎপন্ন হইব, তিনি মুখ হইতে ত্রিবৃৎস্তোমকে উৎপাদন করিয়াছিলেন * * মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণকে এবং পশুগণের মধ্যে ছাগকে উৎপাদন করিয়াছিলেন," ইত্যাদি। "মধ্যতঃ সপ্তদশঃ"

১ প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে প্রধান প্রধান কয়েকটি স্থল ব্যতিরেকে মূল শাস্ত্রবাক্যসকল আমরা উদ্ধৃত করিতেছি না। তবে সেই বাক্যসকলের টীকাদি অবলম্বনে যথার্থ অনুবাদ প্রবন্ধমধ্যে প্রদর্শিত হইতেছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক তত্তৎস্থলে উল্লিখিত সংখ্যানুসারে আকরগ্রন্থে মূল শ্লোকগুলি দেখিয়া লইবেন। মহাভারতের উদ্ধৃতি-সংখ্যাসকল বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত নীলকণ্ঠের টীকাসহ মূল মহাভারত হইতে প্রদত্ত হইতেছে।

(তৈঃ সং ৭।১।১।৫) ইত্যাদি শ্রুতিতে উদর হইতে বৈশ্যের উৎপত্তি পঠিত হইয়াছে।

উক্ত শ্রুতিবাক্যসকলের অনুকূল স্মৃতিবাক্য এই—

"ব্রাহ্মণো মুখতঃ সৃষ্টো ব্রহ্মণো রাজসত্তম।
বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ সৃষ্ট উরুভ্যাং বৈশ্য এব চ॥
বর্ণানাং পরিচর্যার্থং ত্রয়াণাং ভরতর্ষভ।
বর্ণশ্চতুর্থঃ সম্ভূতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো বিনির্মিতঃ"॥

(মহাভাঃ শান্তিঃ ৭২।৪—৫)। ইহার অর্থ—"হে রাজশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন, বাহুযুগল হইতে ক্ষত্রিয় সৃষ্ট হইয়াছেন এবং উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য সৃষ্ট হইয়াছেন। আর বর্ণত্রয়ের পরিচর্যার জন্য চতুর্থ বর্ণ শূদ্র তাঁহার পাদযুগল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।" শান্তিপর্বে ৩০৮।২০ শ্লোকে ব্রহ্মার নাভি হইতে বৈশ্যের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল শ্রুতিবাক্য ও তদনুগামী স্মৃতিবাক্য হইতে প্রতিভাত হয়—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার তত্তৎ অবয়ব হইতে ব্রাহ্মণাদি তত্তৎ জাতির পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে উৎপত্তি হওয়ায় জাতি জন্মগতই। সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাতেই তাঁহার বিভিন্ন অবয়ব হইতে বর্ণচতুষ্টয়ের বিভিন্নভাবে সৃষ্টি হইয়াছে।

গুণকর্মগত জাতিভেদ প্রতিপাদক শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য

এইবার গুণকর্মগত জাতিভেদের প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যগুলি দেখা যাক—

(১) "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ একমেব, তদেকং সন্ন ব্যভবৎ, তচ্ছ্রেয়োরূপমসৃজত ক্ষত্রম্" (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, কাণ্ব, ১।৪।১১); (২) "স নৈব ব্যভবৎ, স বিশমসৃজত" (ঐ, ১।৪।১২); (৩) "স নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত" (ঐ, ১।৪।১৩)। ভগবান শঙ্করাচার্য-কৃত ভাষ্য এবং আনন্দগিরি-কৃত টীকানুসারে এই শ্রুতিবাক্যসকলের অর্থ এই—"অগ্রে (ক্ষত্রিয়াদি জাতির উৎপত্তির পূর্বে) ইহা (এই ক্ষত্রিয়াদি জাতি) একমাত্র ব্রাহ্মণজাতিরূপেই বর্তমান ছিল। তিনি (ব্রাহ্মণ জাতিতে 'আমি' এই প্রকার অভিমানসম্পন্ন প্রজাপতি) একা ছিলেন বলিয়া (জগতের পরিপালক ক্ষত্রিয়াদি ছিল না বলিয়া) ব্রাহ্মণ জাতির যাহা কর্তব্যকর্ম, তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি (সেই ব্রাহ্মণজাত্যভিমানী প্রজাপতি, ব্রাহ্মণ) প্রশস্তরূপ ক্ষত্রিয় জাতিকে সৃষ্টি করিলেন।" "তিনি (ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তিকর্তা ব্রাহ্মণ, বিত্ত উপার্জনকারীর অভাবে) কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না, তিনি বৈশ্য জাতিকে সৃষ্টি করিলেন।" "তিনি (ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির উৎপত্তিকর্তা ব্রাহ্মণ, পরিচারকের অভাববশতঃ) কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না, তিনি শূদ্রজাতির সৃষ্টি করিলেন, ইত্যাদি।

উক্ত শ্রুতিবাক্যের অনুকূল স্মৃতিবাক্য এই—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কর্মভির্বর্ণতাং গতম্॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণা ক্রোধনা প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়ালুব্ধাঃ সর্বকর্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥"

*   *   *

"ব্রহ্ম চৈব পরং সৃষ্টং যে ন জানন্তি তেঽদ্বিজাঃ।
তেষাং বহুবিধাস্ত্বন্যা তত্র তত্র হি জাতয়ঃ॥
পিশাচা রাক্ষসাঃ প্রেতা বিবিধা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।
প্রণষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানাঃ স্বচ্ছন্দাচারচেষ্টিতাঃ॥

(মহাভাঃ শান্তিঃ ১৮৮।১০—১৪, ১৭—১৮)

পূজ্যপাদ নীলকণ্ঠ ও হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশকৃত টীকাবলম্বনে ইহাদের অর্থ এই—"বর্ণ (জাতি) সকলের মধ্যে প্রভেদ নাই, কারণ এই সমস্ত জগৎ ব্রাহ্ম (ব্রাহ্মণজাতিযুক্ত)। ব্রহ্মা কর্তৃক পূর্ব সৃষ্টই (ব্রাহ্মণই) কর্মসকলের দ্বারা বর্ণতা (বিভিন্ন জাতিভাব) প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা

কামভোগপ্রিয়, উগ্রস্বভাব, ক্রোধপরায়ণ, সাহসী এবং রক্তবর্ণ (রজোগুণপ্রধান), স্বধর্মত্যাগী (ব্রাহ্মণের ধর্মত্যাগী) সেই ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা গোসকল হইতে ও কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন, পীতবর্ণ (রজঃ ও তমোগুণযুক্ত) এবং স্বধর্মের (ব্রাহ্মণ্যধর্মের) অনুষ্ঠান করিতেন না, সেই ব্রাহ্মণগণ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা হিংসা ও মিথ্যাপ্রিয়, লোভী, সকল প্রকার কর্মের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন, কৃষ্ণবর্ণ (তমোগুণযুক্ত) শৌচাচারবিহীন সেই ব্রাহ্মণগণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" * * * "যাঁহারা সৃষ্ট সমস্ত পদার্থকে পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন রূপে জানেন না [অথবা অন্য ব্যাখ্যা—সৃষ্ট (হিরণ্যগর্ভ কর্তৃক প্রকাশিত) এই পরব্রহ্মকে (উৎকৃষ্ট বেদকে) যাঁহারা জানেন না],[২] তাঁহারাই অব্রাহ্মণ। নানাদেশে তাঁহাদের বহুবিধ জাতিসকল আছে। তাঁহারাই পিশাচ, রাক্ষস, প্রেত ও নানাবিধ ম্লেচ্ছজাতিতে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছেন"[৩] ইত্যাদি।

পূর্বমীমাংসা ৩।২।২ অধিকরণন্যায়বলে গুণকর্মগত জাতিভেদপক্ষই গ্রহণীয়।

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে পরস্পর-বিরুদ্ধ এই উভয়বিধ শ্রুতিবাক্য ও তদনুগামী স্মৃতিবাক্যসকলের তাৎপর্য কি? উভয় প্রকার বাক্যই শাস্ত্রবাক্য, তাহাদের কোনটিকেই অপ্রমাণ বলা চলিবে না, সুতরাং অগ্রাহ্যও করা চলিবে না। সেইহেতু মীমাংসান্যায় প্রয়োগ দ্বারা উক্ত বাক্য সকলের প্রতিপাদ্য কি, তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। লক্ষ্য করিতে হইবে—জন্মগত জাতি প্রতিপাদক "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" (তৈঃ আঃ ৩।১২।১৩) এবং "প্রজাপতিঃ অকাময়ত" (তৈঃ সং ৭।১।১।৪ ইত্যাদি—এইগুলি মন্ত্রবাক্য।[৪] [শেষোক্ত শ্রুতিবাক্যসকলও যে মন্ত্রবাক্য, ইহা "বর্ণ্যন্তে সপ্তমে কাণ্ডে মন্ত্রাঃ কেঽপ্যশ্বমেধগাঃ" (তৈঃ সং ৭।১ সায়ণভাষ্য, উপোদ্‌ঘাত ২৯)—"সপ্তম কাণ্ডে অশ্বমেধযজ্ঞে বিনিয়োগের উপযুক্ত কতকগুলি মন্ত্র বর্ণিত হইতেছে", ইত্যাদি ভাষ্যবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়]। আর গুণকর্মানুসারে জাতিভেদ প্রতিপাদক "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" (বৃঃ ১।৪।১১) ইত্যাদি—এইগুলি ব্রাহ্মণবাক্য। পূর্ব মীমাংসাতে ৫।১।৯ "ব্রাহ্মণপাঠাৎ মন্ত্রপাঠস্য বলীয়স্ত্বাধিকরণে" প্রয়োগ সামর্থ্য থাকায় (কর্মানুষ্ঠানকালে মন্ত্রের দ্বারা কর্মাঙ্গকলাপের স্মরণ করিয়া সেই অঙ্গসকল ক্রমশঃ অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া) ব্রাহ্মণ-পাঠাপেক্ষা মন্ত্রপাঠের বলবত্তা নিরূপিত হইয়াছে; তদনুযায়ী প্রস্তাবিতস্থলে মন্ত্রপাঠের প্রাবল্য স্বীকার করিয়া জন্মগতজাতিবিভাগই স্বীকার করিতে হয়। তাহা কিন্তু সম্ভব হইতেছে না। কারণ পূর্ব মীমাংসাতেই ৩।২।২ "ঐন্দ্র্যা গার্হপত্যে বিনিয়োগা-ধিকরণে" অনুষ্ঠেয় কর্মের ক্রমনিরূপণ ব্যতিরিক্তস্থলে মন্ত্রপাঠাপেক্ষা ব্রাহ্মণপাঠেরই বলবত্তা নিরূপিত হইয়াছে, কারণ ব্রাহ্মণপাঠ অপ্রাপ্ত বিষয়ের বোধ উৎপাদন করে। প্রস্তাবিতস্থলে "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" (বৃঃ ১।৪।১১) ইত্যাদি এই ব্রাহ্মণবাক্য-সকল কোন প্রকার অনুষ্ঠেয় বিষয় প্রকাশিত করিতেছে না, আর মন্ত্রের ন্যায় তাহার প্রয়োগ-সামর্থ্যও নাই। অবিদ্যার কার্য বর্ণনা করিতে

২ এই শেষোক্ত ব্যাখ্যাই আমাদের নিকট সঙ্গত মনে হয়। ইহার সমর্থন পরে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

৩ এই বিষয়টিতে পাঠকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

৪ বেদ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রে অনুষ্ঠেয় বিষয়সকল বর্ণিত হইয়াছে। কর্মানুষ্ঠানকালে মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে সেই অনুষ্ঠেয় বিষয়সকলের স্মরণ করিয়া কর্মানুষ্ঠান করিতে হয়। ব্রাহ্মণ মধ্যে মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ, কর্মবোধক বিধি, কর্মের দ্রব্য ও দেবতা ইত্যাদি বিবৃত হইয়াছে।

প্রবৃত্ত হইয়া অজ্ঞাতজ্ঞাপিকা শ্রুতি উক্ত ব্রাহ্মণ-বাক্যসকলে অবিদ্যার কার্যভূত চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টি বর্ণনা করিতেছেন। এই প্রকারে উক্ত ব্রাহ্মণবাক্যসকলে অন্য প্রমাণ দ্বারা অপ্রাপ্ত বিষয়ের বোধ উৎপাদিত হইতেছে বলিয়া পূঃ মীঃ ৩।২।২ অধিকরণন্যায়বলে এই ব্রাহ্মণ-বাক্যসকলই হইবে পূর্বোক্ত মন্ত্রবাক্য সকল অপেক্ষা প্রবল। লোকমধ্যে সকলে প্রবলেরই অনুসরণ করিয়া থাকে, সেইহেতু প্রস্তাবিত স্থলে প্রবল ব্রাহ্মণ পাঠানুসারে তৎপ্রতিপাদ্য গুণ ও কর্মগত জাতিভেদ পক্ষই যে শ্রুতি ও তদনুগামী স্মৃতিবাক্যসকলের প্রতিপাদ্য, সুতরাং তাহাই গ্রহণীয়, *মন্ত্রবাক্যপ্রতিপাদ্য জন্মগতজাতিভেদপক্ষ নহে, ইহাই* নির্ণীত হয়।*

বিশেষ ফলপ্রদ উপাসনা প্রতিপাদক হওয়ায় "ব্রাহ্মণোঽস্য" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠও ব্যর্থ নহে।

কিন্তু ব্রাহ্মণপাঠই এইস্থলে প্রবল হইলে "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" ইত্যাদি মন্ত্রবাক্য তো ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। আর তাহা যদি ব্যর্থ হয়, কোন বিষয় প্রতিপাদনে যদি তাহার অবকাশ না থাকে, তাহা হইলে "সাবকাশনিরবকাশয়োর্মধ্যে নিরবকাশস্য বলীয়স্ত্বম্"—"সাবকাশ ও নিরবকাশের মধ্যে নিরবকাশই বলবান্ হইয়া থাকে", [যেমন নির্ধন ব্যক্তি বলপূর্বক ধনীর ধন অপহরণ করে], এই মীমাংসাসম্মতন্যায় বলে নিরবকাশ (কোন প্রকার প্রতিপাদ্যবিহীন) মন্ত্রপাঠই হইবে প্রবল। সেইহেতু প্রস্তাবিতস্থলে তদনুসারে জন্মগত জাতিই স্বীকরণীয় হইবে। তাহাও কিন্তু সম্ভব হইতেছে না। কেন? কারণ—"তাৎপর্যগ্রাহক ষড়্বিধলিঙ্গ প্রমাণের" প্রয়োগ দ্বারা "বিরাট্প্রাপ্তিরূপ স্বর্গাত্মক ফললাভের" (তৈঃ আঃ ৩।১২।১৮ সায়ণভাষ্য) জন্য অর্থাৎ প্রজাপতিলোক লাভের জন্য মানসযজ্ঞ-রূপ এক প্রকার উপাসনা উক্ত মন্ত্রসকলে প্রকাশিত হইয়াছে। (১) উপক্রম ও উপসংহার, (২) অভ্যাস, (৩) অপূর্বতা, (৪) ফল, (৫) অর্থবাদ এবং (৬) উপপত্তি, এই ছয়টির নাম 'তাৎপর্যগ্রাহক লিঙ্গপ্রমাণ।'

লিঙ্গ শব্দের অর্থ—জ্ঞাপক চিহ্ন। বেদের *কোন্ প্রকরণে কি বস্তু প্রতিপাদিত হইয়াছে* অর্থাৎ সেই প্রকরণের তাৎপর্য কি, তাহা নিরূপণের জন্য এই লিঙ্গ ছয়টির প্রয়োগ হয়। বেদবাক্যসকলের তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্য মীমাংসাশাস্ত্রসম্মত নানা প্রকার উপায় আছে, এই তাৎপর্যগ্রাহক লিঙ্গসকলের প্রয়োগ তাহাদের অন্যতম। কোন প্রকরণের উপক্রমে (প্রারম্ভে) যদি কোন বিষয় উল্লিখিত হয়, উপসংহারেও (শেষেও) যদি সেই বিষয়টিই বর্ণিত হয়, মধ্যস্থলেও যদি সেই বিষয়টির অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ কথন) থাকে, সেই বিষয়টি যদি অপূর্ব হয় (শ্রুতিভিন্ন অন্য প্রমাণ দ্বারা অজ্ঞাত হয়), সেই বিষয়টির অনুশীলন বা জ্ঞান হইতে যদি অনুশীলনকারীর বা জ্ঞাতার কোন বিশেষ ফল লব্ধ হয়, সেই বিষয়টি বুঝাইবার জন্য যদি আখ্যানাদিরূপ কোন প্রকার অর্থবাদবাক্য থাকে এবং সেই প্রকরণে প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রকার সংশয়ের নিরাকরণের জন্য যদি উপপত্তি (যুক্তি) থাকে, তাহা হইলে সেই বিষয়টিই যে শ্রুতির সেই প্রকরণের প্রতিপাদ্য, তৎপ্রতিপাদনেই যে শ্রুতির তাৎপর্য, ইহাই নির্ণীত হয়। প্রস্তাবিতস্থলে উক্ত লিঙ্গ ছয়টির প্রয়োগ এইরূপ—

"ব্রাহ্মণোঽস্য" ইত্যাদি মন্ত্রসকল শ্রুতির যে প্রকরণে পঠিত হইয়াছে, সেই প্রকরণে "দেবা

* এইস্থলে মীমাংসাশাস্ত্রসম্মত যে ন্যায়সমূহ প্রদর্শিত হইল এবং পরেও যে ন্যায়সকল প্রদর্শিত হইবে, সাধারণ পাঠক যে সেই সকলের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন প্রবন্ধলেখক এই প্রকার দুরাশা পোষণ করেন না। তবে, শাস্ত্রার্থনিরূপণের জন্য এই প্রকার শাস্ত্রসম্মত উপায়সকল আছে এবং তাহাদের প্রয়োগ দ্বারা গুণকর্মগতজাতিবিভাগই সিদ্ধ হয়, এইটুকুমাত্র তাঁহাদের বুদ্ধিতে আরূঢ় হইলেই লেখক সফলকাম হইবেন।

যজ্ঞমতন্বত" (ঐঃ আঃ ৩।১।৬)—"দেবগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন" এই প্রকারে 'উপক্রম' (আরম্ভ) করিয়া "যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ" (ঐঃ ৩।১২।১৮)—"দেবগণ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন"—এই প্রকারে 'উপসংহার' (বর্ণনার শেষ) করা হইয়াছে। সেই মানসযজ্ঞের অঙ্গকলাপ কি তাহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে যে বিরাট পুরুষ সেই মানসযজ্ঞে হবনীয় পশুরূপে কল্পিত হইয়াছেন, সেই পুরুষের হস্তপদাদি অবয়ব সকল কি, সেই যজ্ঞে অপেক্ষিত ঘৃত, কাষ্ঠ ইত্যাদি বস্তু সকলই বা কি, তাহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ"—"ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ হইতে উৎপন্ন হইলেন" (ব্রাহ্মণজাতি তাঁহার মুখ), "বসন্ত ঋতু এই যজ্ঞে ঘৃত" (ঐঃ আঃ ৩।১২।৬) "গ্রীষ্ম ঋতু যজ্ঞকাষ্ঠ" (ঐ) ইত্যাদি প্রকারে যজ্ঞাঙ্গ-সকলের বর্ণনা-দ্বারে এবং "যজ্ঞং তন্বানাঃ" (ঐঃ আঃ ৩।১২।৭)—"মানসযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন" ইত্যাদি প্রকারে অঙ্গী মানস যজ্ঞের 'অভ্যাস' (পুনঃ পুনঃ বর্ণনা) ইহাতে পরিদৃষ্ট হয়। এই প্রকার যে মানসযজ্ঞ, তাহাকে শ্রুতিভিন্ন অন্য প্রমাণ দ্বারা অবগত হওয়া যায় না বলিয়া ইহার 'অপূর্বতা' (অন্য প্রমাণের দ্বারা জ্ঞানের বিষয় না হওয়া) সিদ্ধ হয়। "তে নাকং মহিমানং সচন্তে" (ঐঃ আঃ ৩।১২।১৮)—"সেই উপাসকগণ বিরাট-প্রাপ্তিরূপ স্বর্গাত্মক মহিমাকে প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি প্রকারে সেই মানসযজ্ঞের 'ফল' বর্ণিত হইয়াছে। "প্রজাপতির প্রাণরূপ দেবতাগণ যখন সঙ্কল্প প্রভাবে পুরুষকে উৎপন্ন করিলেন" (তৈঃ আঃ ৩।১২।১২) "পুরাকালে প্রজাপতি উপাসকগণের উপকারের জন্য ইহা বলিয়াছিলেন" (তৈঃ আঃ ৩।১২।১৭), ইত্যাদি 'অর্থবাদ'বাক্যও ইহাতে পরিদৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণাদিজাতি সেই যজ্ঞীয় পশুরূপ বিরাট পুরুষের মুখাদি হইতে কি প্রকারে উৎপন্ন হইবে, বসন্ত ইত্যাদি ঋতুই বা কি প্রকারে ঘৃত প্রভৃতি হবনীয় দ্রব্য হইবে, ইত্যাদি প্রকার সংশয়ের উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন—"কতিধা ব্যকল্পয়ন্" (তৈঃ আঃ ৩।১২।১২)—"কত প্রকারে কল্পনা করিয়াছিলেন" এবং "কৃতোঽকল্পয়ন্" (তৈঃ আঃ ৩।১২।১৮) ইত্যাদি এই প্রকারে যে সন্দংশ-ন্যায়* প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাই এই স্থলে 'উপপত্তি' (যুক্তি)। তাহাতে ইহাই বলা হইল যে, এই সকলই কল্পনা মাত্র, শ্রুতির নির্দেশানুসারে বিশেষ ফললাভের জন্য এইপ্রকার কল্পনা পূর্বক উপাসনা করিতে হইবে, ইত্যাদি। এইপ্রকারে তাৎপর্যগ্রাহক এই ষড়বিধ লিঙ্গপ্রমাণবলে নির্ণীত হইল যে—"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" ইত্যাদি বাক্যসকলে একপ্রকার উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে, তৎপ্রতিপাদনই উক্ত স্থলে শ্রুতির তাৎপর্য ; ব্রহ্মার মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদি জাতির উৎপত্তি প্রতিপাদনে নহে। আর উপাসনাও এক প্রকার ক্রিয়া, এই মন্ত্র সকলে সেই উপাসনার ক্রম বর্ণিত হইতেছে বলিয়া পূঃ মীঃ ৫।১।১৯ অধিকরণ ন্যায় এইস্থলে সার্থক হয়। ব্রাহ্মণপাঠ ইহাকে

* 'সন্দংশন্যায়—(সাঁড়াশী ন্যায়)—"অন্তরালে (মধ্যস্থলে) বিহিত হওয়াই সন্দংশ।" ভাব এই—সাঁড়াশীর দুইটি অবয়ব ; এই অবয়বদ্বয়ের মধ্যে অঙ্গারাদি বস্তুকে গ্রহণ করা হয়। এই প্রকারে সাঁড়াশীর মধ্যে যে বস্তুটি গৃহীত হয়, তাহা যেমন অন্যান্য বস্তু হইতে ভিন্নরূপে গৃহীত হয়—তদ্রূপ এই সন্দংশ-ন্যায় বলে সাঁড়াশীর দুইটি অবয়বের মধ্যে যে বাক্যগুলি পঠিত হয়, তাহারা তৎপ্রকরণে পঠিত অন্যান্য বাক্যাপেক্ষা বিশিষ্ট অর্থ প্রতিপাদন করে। প্রস্তাবিতস্থলে "কতিধা ব্যকল্পয়ন্" (তৈঃ আঃ ৩।১২।১২) এই বাক্যটি হইল সাঁড়াশীর একটি অবয়ব, আর "কৃতোঽকল্পয়ন্" (ঐ ৩।১২।১৮) এই বাক্যটি হইল অপর একটি অবয়ব। এই অবয়বদ্বয়ে কল্পনা করিবার কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত অবয়বদ্বয়ের মধ্যে পঠিত যাবতীয় বস্তুই যে উপাসনার্থে কল্পনার জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাই নির্ণীত হয়। এই কল্পিত পদার্থসকলের সাদৃশ্যবশতঃ উপমান প্রমাণ বলে সন্দংশের বহির্ভূত 'পুরুষরূপ পশু', 'বসন্তঋতুরূপ ঘৃত' (তৈঃ আঃ ৩।১২।৬) ইত্যাদি পদার্থসকলও যে উপাসনার জন্য কল্পিত—ইহাও নির্ণীত হয়। অভিজ্ঞ পাঠক সায়ণভাষ্যসহ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের উক্ত প্রকরণ আলোচনা করিলে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

বাধা দান করিতে পারে না। সুতরাং মন্ত্রপাঠের প্রাবল্যবলে উক্ত মন্ত্রবাক্যসকলে উপাসনা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহারা ব্যর্থ নহে, ইহাই নির্ণীত হইল। আর "সঃ মুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত··· ব্রাহ্মণো মনুষ্যানাম্" (তৈঃ সং ৭।১।১।৪) ইত্যাদি মন্ত্রসকলও ব্যর্থ হইয়া পড়ে না, কারণ উক্ত মন্ত্রসকলে সোমযজ্ঞের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা সোমযজ্ঞের উক্ত প্রকার মহিমা জানেন, তাঁহারা অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের (সোমযজ্ঞের) অনুষ্ঠান করিতে ও তাহার ফল প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন" (তৈঃ সং ৭।১।১।৬) ইত্যাদি স্পষ্ট বাক্যসকল হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। অতএব 'নিরবকাশের বলীয়স্ত্ব ন্যায়ের' প্রবৃত্তি এইস্থলেও হইতে পারে না।

শ্রুতিবাক্যের উভয় প্রকার তাৎপর্য স্বীকারে শ্রুতির ব্যর্থতা

কিন্তু লোকমধ্যে তো দেখা যায়—"সৈন্ধব আনয়ন কর" ইত্যাদি এই প্রকার বাক্যসকলের দুই প্রকার অর্থ হয়, যথা—'সৈন্ধব লবণ আনয়ন কর' ও 'সিন্ধুদেশজাত ঘোটক আনয়ন কর'। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ উক্ত মন্ত্রবাক্যসকলের অর্থ উভয় প্রকার হউক, তাহারা যথাক্রমে উপাসনা ও সোমযজ্ঞের মহিমা প্রতিপাদন করুক এবং ব্রহ্মার মুখাদি অবয়ব হইতে ব্রাহ্মণাদি জাতির উৎপত্তি, প্রতিপাদন করুক। তদুত্তরে বলা যায়—লোকমধ্যে প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষয়ে শব্দের এই প্রকার অর্থবৈবিধ্য স্বীকৃত হইলেও অতীন্দ্রিয় বিষয়ক শ্রুতিবাক্যে তাহা স্বীকার করা যায় না। শ্রুতি অতীন্দ্রিয় বিষয় প্রতিপাদন করেন; সুতরাং শ্রুতিবাক্যের দুই প্রকার তাৎপর্য স্বীকার করিলে, কোন্ তাৎপর্যটি শ্রুতির অভিপ্রেত তাহা নির্ণীত হইবার কোন উপায় না থাকায়, লোকের শ্রুতির উপর আস্থা থাকিবে না; ফলে লোককল্যাণকামিনী শ্রুতি ব্যর্থ হইয়া পড়িবেন। কিন্তু 'আম্রবৃক্ষ রোপিত হইলে আম্রফল লাভই হয় তাহার মুখ্য প্রয়োজন, তথাপি ছায়া ও আলানি কাষ্ঠলাভ ইত্যাদি হয় তাহার অবান্তর প্রয়োজন।' প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ উপাসনা ও স্তুতি প্রতিপাদনে উক্ত মন্ত্রবাক্যসকলের মুখ্য তাৎপর্য থাকিলেও 'ব্রহ্মার মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদি জাতির উৎপত্তি' প্রতিপাদনে উক্ত বাক্যসকলের অবান্তর তাৎপর্য স্বীকার করিতেছ না কেন? বলিতেছি;—সত্য বটে বিচারকালে শ্রুতিবাক্যের অবান্তর তাৎপর্য কোন কোন স্থলে স্বীকৃত হয় (উত্তর মীমাংসা ১।৩।২ ভূমাধিকরণ দ্রষ্টব্য), কিন্তু সন্দংশন্যায় দ্বারা নিয়মিত 'অবান্তর প্রকরণ প্রমাণ' তাদৃশ অবান্তর তাৎপর্যের নিয়ামক হয়। প্রস্তাবিত স্থলে সন্দংশন্যায় উপাসনার জন্য কল্পিত অঙ্গপ্রতিপাদনেই বিনিযুক্ত, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সেইহেতু ব্রহ্মার মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদি জাতির উৎপত্তিতে উক্ত মন্ত্রবাক্যসকলের অবান্তর তাৎপর্যও স্বীকার করা যায় না। এই প্রকারে এতাবৎ পর্যন্ত বিচারে ইহাই নির্ণীত হইল যে—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" (বৃঃ ১।৪।১১) ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্য ও তদনুগামী স্মৃতিবাক্যের বলে ব্রাহ্মণাদি জাতিবিভাগ গুণকর্মগত, "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ", ইত্যাদি মন্ত্রবাক্য ও তদনুগামী স্মৃতিবাক্যবলে জন্মগত নহে।

জন্মগত জাতি প্রতিপাদক স্মৃতিবাক্যের তাৎপর্য কি?

এইরূপে দেখা গেল—"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" (তৈঃ আঃ ৩।১২।১৩) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য জন্মগত জাতিবিভাগ প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইল না। সেইহেতু তদনুগামী "ব্রাহ্মণো মুখতঃ সৃষ্টঃ" (মহাভাঃ শান্তিঃ ৭২।৪) ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যও তাহা প্রতিপাদন করিতে পারিল না। এক্ষণে সংশয় হয়—উক্ত স্মৃতিবাক্যসকল তো তাহাদের মূলভূত শ্রুতিবাক্যের ন্যায় উপাসনাদি কোনকিছুও প্রতিপাদন করিতে পারে না, কারণ স্মৃতির যে প্রকরণে তাহারা পঠিত হইয়াছে, তাহাতে তাদৃশ উপাসনা প্রভৃতির কোন প্রসঙ্গ নাই। সুতরাং

কোন্ বিষয়ে উক্ত স্মৃতিবাক্যসকল সাবকাশ হইবে (তাহারা কি প্রতিপাদন করিবে)? তদুত্তরে বলা যায়—ইহার মীমাংসা খুবই দুরূহ, 'বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানে লাঙ্গুল যোজনার' ন্যায়[৭] বহু পুরাণ বাক্যেরই কোন প্রকার সুষ্ঠু সমাধান অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তবে মনে হয়, ক্রমবিবর্তনের ফলে সমাজ তৎকালে যে অবস্থাতে উপনীত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াই সাধারণ মনুষ্যের শ্রদ্ধোৎপাদন, সমাজে বিশৃঙ্খলা-নিরাকরণ ও ধর্ম-ব্যবস্থাপনের জন্য পুরাণকারগণ হয়তো শ্রুতির ছায়াবলম্বনে উক্ত শ্লোকসকল পুরাণে প্রবেশ করাইয়া থাকিবেন—যেমন ধর্মব্যবস্থা প্রদর্শনের জন্য পরবর্তিকালে বহু দার্শনিক গ্রন্থেও জন্মগতজাতি প্রতিপাদনের জন্য নানা যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে।

গুণকর্মগত জাতিভেদের সমর্থক অন্যান্য যুক্তি ও স্মৃতিবাক্য

এইরূপে দেখা গেল, সুপ্রাচীনকালে একই আর্যজাতি জীবিকার্জনের ও দেশরক্ষাদি প্রয়োজনের তাগিদে তত্তৎ ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি (গুণ) ও কর্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি শূদ্রান্ত জাতিচতুষ্টয়ে স্বাভাবিকভাবেই বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অন্যথা সমাজব্যবস্থা চলে না। সর্বদেশেই নামে না হইলেও, ব্যবহারে এইপ্রকার স্বাভাবিক জাতিবিভাগ পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীভগবানও গীতামুখে বলিয়াছেন—"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ' (গীতা ১৪।১৩)। সুতরাং চাতুর্বর্ণ্যের এই বিভাগকে ভগবৎকৃত স্বাভাবিক বিভাগই বলিতে হইবে। এই প্রকারে বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইলেও সুপ্রাচীন কালে তাহা ইদানীন্তন কালের ন্যায় বংশগত হইয়া পড়ে নাই, গুণ ও কর্মানুসারে তখনও জাতি ছিল পরিবর্তনশীল। শূদ্রের মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত গুণ পরিদৃষ্ট হইলে তৎকালে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই গ্রহণ করা হইত। ব্রাহ্মণে তাদৃশ গুণ না থাকিলে তিনিও শূদ্ররূপে পরিগণিত হইতেন। নিম্নোক্ত শাস্ত্রবচনসকল সেই বিষয়ে প্রমাণ—

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শাস্ত্র বলিতেছেন,—"জাতকর্মাদি দ্বারা যাঁহারা সংস্কৃত, বেদাধ্যয়নশীল, শুচি, সন্ধ্যা-বন্দনা-জপ-হোম-দেবতাপূজন ও অতিথিসৎকারাদি ষট্কর্মে নিরত, তাঁহারা ব্রাহ্মণ। সত্যকথন, দান, অদ্রোহ, অনিষ্ঠুরতা, লজ্জা, ঘৃণা ও তপস্যা—ইহারা যে ব্যক্তিতে পরিদৃষ্ট হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ। যাঁহারা বেদাধ্যয়ন করেন, দেশরক্ষাদি কার্যে যুদ্ধাদি কর্ম করেন, ব্রাহ্মণগণকে দান করেন ও প্রজাগণের নিকট করগ্রহণ করেন তাঁহারা ক্ষত্রিয়। যাঁহারা বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, কৃষি-বাণিজ্য ও গোপালন করেন, তাঁহারা বৈশ্য। যাঁহারা বেদত্যাগ করেন, অশুচি, সকল প্রকার কর্মানুষ্ঠানকারী ও সকল প্রকার দ্রব্য ভক্ষণকারী, অনাচারী তাঁহারা শূদ্র। কিন্তু শূদ্রে যদি উক্ত সত্য কথন, দান ইত্যাদি গুণসপ্তক পরিদৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। আর ব্রাহ্মণে যদি উক্ত গুণসকল দেখা না যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া জানিবে", ইত্যাদি (মহাভাঃ শাঃ ১৮৯।১—৮)। এইস্থলে টীকাকার পূজ্যপাদ নীলকণ্ঠ স্পষ্টই বলিয়াছেন—"এই সত্যাদি গুণসপ্তকই বর্ণবিভাগের কারণ, জাতি (জন্ম) নহে। সমাজের যখন এই প্রকার পরিস্থিতি ছিল, তখন এই বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যে বৈবাহিক আদান প্রদানের জন্য কোন প্রকার বিধিনিষেধ ছিল না ইহা কল্পনা করা চলিতে পারে। পরবর্তী কালে জাতিভেদ জন্মগত হইয়া পড়িলে যে প্রকারে অনুলোম ও বিলোম বিবাহপদ্ধতি সমাজে নানা সঙ্করজাতি স্বীকৃতির প্রতি হেতু হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ শাস্ত্রে ভূরিশঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৭ বাল্মীকি রামায়ণ (শ্রীরামদাস মহাপণ্ডিত) কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৩।২৮)।

গুণকর্মগত জাতির মাত্র কর্মগত জাতিতে ক্রমপরিণতি

সমাজে লোকসংখ্যা যখন পরিমিত ছিল, তখন বর্ণ ও আশ্রম সকলের রক্ষক নৃপতিবৃন্দই গুণ-কর্মানুসারে বর্ণসকলকে নিয়মিত করিতেন এবং উচ্চাবচ শ্রেণীতে নিবিষ্ট করিতেন—ইহা স্বীকার করিলে অসঙ্গতি হইবে না, কারণ "কামং তান্ ধার্মিকো রাজা শূদ্রকর্মসু যোজয়েৎ" (বোধায়ণ স্মৃতি ২।৪।১০) ইত্যাদি স্মৃতিবচনসকল হইতে সেই প্রকার পরিস্থিতিই অবগত হওয়া যায়। কিন্তু মনুষ্যের কর্ম যে প্রকার প্রত্যক্ষসিদ্ধ গুণ সেই প্রকার নহে। তাদৃশ গুণহীন ব্যক্তিও রাজকোশে নিজেতে তাদৃশ গুণের অস্তিত্ব প্রদর্শনদ্বারা স্বীয় বর্ণের পরিবর্তন করিতে পারেন, মনুষ্য-চরিত্র পর্যালোচনা করিলে এই প্রকার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। সম্ভবতঃ ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র জাতকের বর্ণ নির্দেশ করিয়া তাহার জাতিনিরূপণে এই সময়ে নৃপতিগণকে সহায়তা করিত। [অদ্যাপিও আমাদের কোষ্ঠীতে বর্ণের নির্দেশ পরিদৃষ্ট হয়]। সুতরাং গুণানুযায়ী জাতি নিরূপণ করা ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া পড়িতে লাগিল, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। তখন কর্মানুসারে জাতি-নিরূপণের উপরই অত্যধিক গুরুত্ব আরোপিত হইতে থাকে। অন্যান্য কর্মের ন্যায় বেদপাঠরূপ কর্ম তখন হইয়া দাঁড়াইল জাতিনিরূপণের একটি প্রধান পরিমাপক। নিম্নোদ্ধৃত স্মৃতিবাক্যসকল সেই বিষয়ে প্রমাণ—"যতদিন বেদাধ্যয়ন না করে ততদিন তাহার জীবন শূদ্রের সমান" (বাশিষ্ঠ সং ২)। "বেদত্যাগ করিলে শূদ্র হয়, সেইহেতু বেদত্যাগ করিবে না" (বাশিষ্ঠ সং ১০)। "যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করে, সেই ব্যক্তি ইহজন্মেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়" (মনু সং ২।১৬৮, বাশিষ্ঠ সং ৩)। "বেদত্যাগী অনাচারী ব্যক্তিই শূদ্র" (মহাভাঃ শাঃ ১৮৯।৭) ইত্যাদি। এইভাবে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে—যাঁহারা বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি ব্রাহ্মণোচিত কর্মসকল অবলম্বনেই জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন তাঁহারা ব্রাহ্মণজাতিই রহিয়া গেলেন। যাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ বেদাধ্যয়ন সহ অন্যান্য তত্তৎবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকানির্বাহ করিতে লাগিলেন তাঁহারা হইলেন 'ক্ষত্রিয়' বা 'বৈশ্য'। আর যে আর্যগণ বেদাধ্যয়ন একেবারে ত্যাগ করিলেন এবং অপরের পরিচর্যাদি দ্বারা নানাভাবে জীবিকার্জন করিতে লাগিলেন তাঁহারা হইলেন 'শূদ্র'। অপরের পরিচর্যাদি দ্বারা যাঁহারা জীবিকানির্বাহ করেন তাঁহাদের ও তাঁহাদের পুত্রদের পক্ষে বেদাধ্যয়ন একেবারে ত্যাগ ব্যতীত উপায়ান্তরও ছিল না; কারণ নানাপ্রকার ব্রতবহুল বেদাধ্যয়ন তো দূরের কথা, সাধারণভাবে লেখাপড়া শিখিবার বিশেষ সুযোগও যে সেইরূপ লোকেরা প্রাপ্ত হন না, ইহা বর্তমানকালেও দেখিতে পাই।

সমদর্শিনী শ্রুতি শূদ্রের উপর অবিচার করেন নাই।

উপনয়নসংস্কার না হইলে বেদাধ্যয়নে অধিকার হয় না। "বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, গ্রীষ্মে রাজন্যম্, শরদি বৈশ্যম্" (তৈঃ ব্রাহ্মণ ১।১।২।৬)—বসন্তকালে ব্রাহ্মণের, গ্রীষ্মে ক্ষত্রিয়ের এবং শরৎকালে বৈশ্যের উপনয়নসংস্কার করাইবে"—ইত্যাদি শ্রুতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের জন্য উপনয়নসংস্কারের বিধান করিয়াছেন, শূদ্রের জন্য তাহা করেন নাই। সেইহেতু অনেকে বলেন—"হিন্দুগণের ধর্মশাস্ত্রই এই বিষয়ে শূদ্রগণকে বঞ্চিত করিয়াছে।" এই প্রকার আক্ষেপ কিন্তু সঙ্গত নহে, কারণ গুণ ও কর্মানুসারে জাতির নির্দেশকারিণী অনাদি শ্রুতি প্রত্যেক সৃষ্টিতে "হিংসাদি গুণযুক্ত সর্বকর্মোপজীবী শৌচাচার-পরিভ্রষ্ট বেদত্যাগী" (মহাভাঃ শাঃ ১৮৮।১৪) এতাদৃশ জনসমষ্টি যে বর্তমান থাকে, তাহা জানেন। সেইহেতু তাদৃশ জনসমষ্টির জন্য

উপনয়নসংস্কারের বিধান শ্রুতি করেন নাই। অনধিকারীর জন্ত কোন বিষয় বিহিত না হইলে, বিধানকর্তাকে তজ্জন্য পক্ষপাতী বলা যায় না। যেমন প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার না দিলে বিশ্ববিদ্যালয়কে কি পক্ষপাতদুষ্ট বলা চলে? জন্মগত জাতি স্বীকার করিলেই বরং শ্রুতির উপর উক্ত দোষ আসিতে পারিত। অনাচারীর জন্ত বেদপাঠ নিষিদ্ধ হওয়াও গুণকর্মগতজাতি-স্বীকৃতিরই সমর্থক, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে। [শূদ্রের যে বেদশ্রবণে অধিকার আছে, ইহা "শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্" (মহাভাঃ শাঃ ৩২৭।৪৯) ইত্যাদি বাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়।]

গুণকর্মগত জাতিচতুষ্টয়ের জন্মগত জাতিতে পরিণতি

এই প্রকারে দেখা গেল—একই আর্যজাতি গুণ ও কর্ম এবং বেদাধ্যয়ন ও তৎত্যাগ, প্রধানতঃ এই কারণসকলবশতঃ ব্রাহ্মণাদি চারিটি জাতিতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমতঃ এই জাতি-বিভাগ গুণকর্মগত থাকিলেও কালক্রমে লোকসংখ্যাবৃদ্ধি, বর্ণাশ্রমধর্মের রক্ষক সার্বভৌম নৃপতির অভাব, গুণকর্মানুসারে জাতিব্যবস্থাপনের দুঃসম্পাদ্যতা, মনুষ্যজাতির স্বীয় সন্তানসন্ততি বিষয়ে রক্ষণশীল মনোভাব ইত্যাদি নানাকারণে উহা জন্মগত জাতিতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাচীন গ্রন্থালোচনা হইতে জানা যায় তাৎকালিক নৃপতিগণ বহুকাল পর্যন্ত এই চারিটি জাতির ধর্মসাঙ্কর্য হইতে দেন নাই। কিন্তু ধর্মসাঙ্কর্য নৃপতিগণের চেষ্টায় নিরাকৃত হইলেও বর্ণসাঙ্কর্য অর্থাৎ উক্ত জাতি-চতুষ্টয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ যে নিরাকৃত হয় নাই, ইহা অবগত হওয়া যায়। যেমন ক্ষত্রিয় গাধিরাজ-তনয়া (বিশ্বামিত্রের ভগিনী) সত্যবতীর সহিত ঋষি ঋচীকের বিবাহ হইয়াছিল, বিবাহের সন্তান ঋষি জমদগ্নি ও তাঁহার পুত্র ভগবদবতার শ্রীশ্রীপরশুরাম কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতিরূপেই পরিগৃহীত হইয়াছেন। এতদ্দ্বারা ইহাই নির্ণীত হয় যে—তৎকালে এই বর্ণচতুষ্টয়ের সংমিশ্রণ হইত এবং সন্তান পিতার জাতি প্রাপ্ত হইতেন। শ্রীরামচন্দ্রের পিতা রাজা দশরথ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সমসাময়িক। রাজা দশরথের রাজ্যে সঙ্করজাতি ছিল না, ইহা "ন চাবৃত্তো ন সঙ্করঃ" (বাল্মীকি রা, আদি ৬।১২) ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ইহা বুঝিলে চলিবে না যে—তৎকালে জাতিচতুষ্টয়ের মধ্যে সংমিশ্রণ হইত না; তাহা রোধ করিবার সামর্থ্য নৃপতিগণের তো দূরের কথা স্বয়ং সৃষ্টি-কর্তারও আছে কিনা সন্দেহ; এমনই মনুষ্যজাতির স্বভাব। সুতরাং "দশরথের রাজ্যে সঙ্করজাতি ছিল না; ইহার তাৎপর্য—সন্তান পিতার জাতি প্রাপ্ত হইত, নূতন কোন জাতিরূপে পরিগণিত হইত না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ঋচীকপুত্র জমদগ্নি "বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন পুত্র মূর্ধাবসিক্ত নামক জাতিতে পরিগণিত হয়" (যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ১।৯১) ইত্যাদি বচনবলে 'মূর্ধাবসিক্ত' জাতিমধ্যে পরিগণিত হইতেন, ব্রাহ্মণজাতিরূপে নহে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক শূদ্র তপস্বীর মস্তকছেদন (বাল্মীঃ রামা, উত্তঃ ৮৯।৪) বর্ণসকলের ধর্মসাঙ্কর্য নিরাকরণের প্রয়াস মাত্র।

যাহা হউক মনুষ্য সমাজ কিন্তু গতিশীল পদার্থ। মহাভারতের যুগে দেখা যায়—উক্ত মূলজাতি-চতুষ্টয়ের সংমিশ্রণে আর্যসমাজ নানা সঙ্কর-জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে (মহাভাঃ শাঃ ২৯৬।৭—৯, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ১।৯০—৯৬)। যাজ্ঞবল্ক্য (ইনি বেদব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়নের ভাগিনেয়) ও পরাশর (ইনি সুপ্রসিদ্ধ বেদব্যাসের পিতা) প্রভৃতি তাৎকালিক সমাজ-ব্যবস্থাপক ঋষিগণ কীদৃশ পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে নানাপ্রকার সঙ্করজাতি স্বীকার করিয়াছিলেন, তাদৃশ সন্তান পিতার [যেমন জমদগ্নির বেলায় হইয়াছে], অথবা মাতার [যেমন

ইদানীন্তনকালেও কেরল দেশে (মালাবারে) কথঞ্চিৎ পরিদৃষ্ট হয়] জাতি অনুসারে কেন ভগবৎসৃষ্ট মূল চারিটি জাতিতেই নিবদ্ধ থাকে নাই, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। যদি আর্যসমাজ উক্ত মূল জাতিচতুষ্টয়ে নিবদ্ধ থাকিত, মনুষ্যকৃত এত শাখা উপশাখাতে বিভক্ত না হইয়া পড়িত, তাহা হইলে সমাজ এতটা বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হইয়া পড়িত না, যাহার ফলে এই সুপ্রাচীন জাতিকে এত দুর্ভোগ ভুগিতে হইতেছে।

জন্মগত জাতিও ছিল পরিবর্তনশীল; কালক্রমে বর্তমানাবস্থা

যাহা হউক, সমাজ কিন্তু অল্পকালের মধ্যে এই জন্মগত জাতিভেদ প্রথা স্বীকার করিয়া লয় নাই। নানাপ্রকার বিধিনিষেধ সত্ত্বেও উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হইবার স্বাভাবিক প্রবৃত্ত্যনুসারে জাতির পরিবর্তন চলিতেই ছিল। নিম্নোক্ত স্মৃতিবচনসকল হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। যথা—"ঋষিগণ যেখানে সেখানে পুত্রোৎপাদন করিয়া তপস্যার প্রভাবে তাহাদের ঋষিত্ব (ব্রাহ্মণত্ব) বিধান করিয়াছিলেন, (মহাভাঃ শাঃ ২৯৬।১৩)। বশিষ্ঠ, ঋষ্যশৃঙ্গ, শূদ্রাতে উৎপন্ন কাক্ষীবান্ পুত্র এবং কৃপ প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত (ঐ ২৯৬।১৪)। সুপ্রসিদ্ধ বেদব্যাস ইহার অপর দৃষ্টান্ত। তপস্যা প্রভাবে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভ অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা। আবার অন্যপ্রকারেও যে জাতিপরিবর্তন তাৎকালিক সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহা নিম্নোক্ত যাজ্ঞবল্ক্য বচন হইতে অবগত হওয়া যায়, যথা—জাত্যুৎকর্ষো যুগে জ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমেঽপি বা। ব্যত্যয়ে কর্মণাং সাম্যং পূর্ববচ্চাধরোত্তরম্॥" (যাজ্ঞঃ স্মৃতি ১।৯৬)। মীতাক্ষরাটীকানুযায়ী ইহার অর্থ এই—"জাতির উৎকর্ষ পঞ্চম ষষ্ঠ অথবা সপ্তম জন্মে হয়। বৃত্তির (জীবিকার জন্য অনুষ্ঠেয় কর্মের) ব্যতিক্রম হইলেও সেই প্রকারই হইবে। প্রতিলোমজ ও অনুলোমজ সঙ্করজাতিস্থলেও পূর্ববৎ হইবে।" ইহার দৃষ্টান্ত এই—ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিবাহিতা শূদ্রা স্ত্রীতে উৎপন্না কন্যা (নিষাদী) কন্যাবংশ পরম্পরাতে যদি ব্রাহ্মণেরই সহিত পরিণীতা হয়, তাহা হইলে তাদৃশী ষষ্ঠবংশোৎপন্না কন্যা যে পুত্রসন্তান প্রসব করিবে সেই সন্তান হইবে ব্রাহ্মণ। এই প্রকারে ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করতঃ জীবিকার্জন করে এবং এইভাবেই পুরুষানুক্রমে চলিতে থাকে, তাহা হইলে সপ্তম পুরুষে সেই ব্রাহ্মণবংশ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা ষষ্ঠ পুরুষে বৈশ্যত্ব এবং ক্ষত্রিয়বৃত্তি দ্বারা পঞ্চম পুরুষে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইবে, ইত্যাদি। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও বর্ণসঙ্কর অন্যান্য জাতিস্থলেও এই প্রকার ব্যবস্থা মূলগ্রন্থে দ্রষ্টব্য। তাৎকালিক সমাজে এই প্রকার ব্যবস্থা থাকায় ক্ষত্রিয়-বৃত্তি অবলম্বন করিলেও দ্রোণাচার্য এবং শিশুহন্তা শূদ্রবৃত্তি-অবলম্বী অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণরূপেই পরিগণিত হইতেন। কিন্তু কালক্রমে যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত এই প্রথাও বিলুপ্ত হইয়া আর্যসমাজ বর্তমান অবস্থাতে উপনীত হইয়াছে। শাস্ত্রালোচনা দ্বারা গুণকর্মগত ভগবৎসৃষ্ট জাতির এই প্রকার ক্রম-পরিণতিই নির্ণীত হয়। পরবর্তী যুগেও নিজেদের শৌর্যবীর্য ও বিত্তের প্রভাবে বহু ব্যক্তি উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছেন, যথা—মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি। ইদানীন্তন কালেও এতাদৃশ ঘটনা একেবারে বিরল নহে।

সংস্কৃতভাষা শিক্ষা দ্বারা প্রাচীন কৃষ্টির সহিত পরিচয়ই শতধা বিভক্ত হিন্দুজাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির উপায়

এই প্রকারে ইহাই নির্ণীত হইল যে, বর্তমানে যে আর্যজাতি হিন্দুনামে শতধা বিভক্তরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, তাহারা বস্তুতঃ একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত। একই রক্ত সকলেরই ধমনীতে প্রবাহিত। বৈদিক কৃষ্টি ও বিদ্যার অভাবপ্রযুক্ত, একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত হইলেও ইহাদের মধ্যে এতটা বিভেদ প্রতিভাত

হইতেছে। অবশ্য পরবর্তিকালে বিভিন্ন আর্য ও আর্যেতর জাতির সহিত ইহাদের সংমিশ্রণ আমরা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু গঙ্গাসাগরে দাঁড়াইয়া যেমন কতটা বারি গঙ্গাবারি, আর কতটাই বা যমুনা ইত্যাদি অন্যান্য নদী হইতে আগত, ইহা যেমন নির্ণয় করা যায় না; তদ্রূপ এই সুপ্রাচীন জাতির মধ্যে বিভিন্ন রক্তধারাকে আর পৃথক করা যায় না। সেই সমস্ত ধারা মিলিত হইয়া এক সুপ্রাচীন কৃষ্টির ধারক ও বাহকরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের যাহা কিছু গৌরবের বিষয়, সমস্তই সংস্কৃত ভাষাতে লিপিবদ্ধ আছে, আর সেই ভাষাতে অনভিজ্ঞতাই হইয়াছে আমাদের সমাজে এতটা বিভেদ প্রতীতির অন্যতম হেতু। প্রাচীনগণও যে ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বচনটি হইতে অবগত হওয়া যায়, যথা—"ইহাই চারিটি বর্ণ, যাঁহাদের জন্য ব্রহ্মা কর্তৃক পূর্বে ব্রাহ্মী সরস্বতী (বেদময়ী সংস্কৃতভাষা) বিহিত হইয়াছিল। লোভবশতঃ অন্যান্য কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া [বহু ব্যক্তি উক্ত ভাষাতে] অজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছে" (মহাভাঃ শাঃ ১৮৮।১৫)। সুতরাং যে ভাষাজ্ঞান ও তজ্জাত কৃষ্টির প্রভাবে ব্রাহ্মণ এখনও সমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থান করিতেছেন, সেই জ্ঞান যদি সেই ভাষাদ্বারে সমাজের সকল স্তরে ব্যাপ্ত করা যায়, তাহা হইলে সমাজে উচ্চাবচ ভেদ স্বতঃই ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণকে যদি নিম্নস্তরে অবতরণ করাইয়া জাতিগঠন করিতে যাওয়া হয়, তাহা হইলে ভারতে এক মনুষ্যজাতি বাস করিবে বটে, তাহা আর ভারতীয় আর্যজাতি থাকিবে না। পক্ষান্তরে সংস্কৃত ভাষার প্রসার দ্বারা যদি সমাজের নিম্নস্তরের জাতিগুলিকে ব্রাহ্মণত্বের স্তরে উন্নীত করা যায়, তাহা হইলেই ভারতীয় সৃষ্টির ধারক ও বাহকরূপে ভারতীয় আর্য জাতির বাঁচিয়া থাকা সম্ভব। মাতৃভাষা সহ পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহক ইংরেজী ভাষা আমাদের অবশ্য শিক্ষণীয়, এই বিষয়ে কোন প্রকার মতদ্বৈধ নাই। তৎসহ সংস্কৃতভাষা অবশ্য শিক্ষণীয় হইলে নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ যেমন জাগরিত হইবে, তদ্রূপ হইবে পূর্বজগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত জ্ঞানভাণ্ডারের সহিত পরিচয়। এইভাবেই বলিষ্ঠ জাতিগঠন হইবে। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী সংস্কৃত ভাষা ও জাতিগঠন বিষয়ে এই প্রকার অভিমতই পোষণ করিতেন। তাঁহার অভিপ্রেত "ইস্‌লামীয় শরীর ও বৈদান্তিকের মস্তিষ্ক-লাভ" এই প্রকারেই সম্ভব!

দ্বয়ী

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

আমি ও আমার

একা আসে জীব হেথা; একা যায় চলে,
আমার আমার তবু কতই না বলে!
কোন্ "আমি" সাথে আসে যাবার সময়
কয়টি "আমার" সঙ্গে অনুগামী হয়?

একের মূল্য

রাশি রাশি শূন্য যদি বসে আরপার
অঙ্ক হিসাবে দাম কতটুকু তা'র?
যেমন বাঁয়েতে মাত্র এক এসে জুটে,
সাথে সাথে সংখ্যাটির মূল্য ঊর্ধ্বে উঠে।

এখানে—ওখানে

আবদুল গণি খান

হেথা ! আগুনে যখন হল্কা—
মেঘে বিদ্যুৎ রণ ঝন্ ঝন্
হোথা জোছনা শান্তি জলসা
ছোটে উছলি উছলি শন্ শন্ !

হেথা হিংসার ছুরি হস্তে—
ঘোষে বন্দী মনের দ্বন্দ্ব
হোথা সুষমা শেফালি গন্ধে
হাসে আলো-চাঁদ ঘেরা ছন্দ !

হেথা মানুষ পেল না কোন দাম—
পেল বিক্ষোভ আর অনশন
হোথা তারায় তারায় ফুল-ডোর
শুধু ভ্রমরার মহা-গুঞ্জন !

হেথা ঈগল-শকুন কলরব—
জরা-মৃত্যুর সনে পরিচয়
হোথা ক্রীতদাসী ক্ষীণ 'রাবেয়া'
হাসে উল্লসি, তার নাহি ভয় !

হেথা রোগ-শয্যায় মৃত্যু—
হোথা মৃত্যুঞ্জয় সারথি
হেথা বন্ধন-গিঁঠা হতাশার
হোথা চীৎকার নয় : মুক্তি !

হেথা শত ধরমের পূজারী—
ফুঁকে বিভেদের নয়া তূর্য
হোথা সত্য-প্রেমের ইশারায়
ওঠে আকাশে স্নিগ্ধ সূর্য !

হেথা চুপচাপ আর ফুস-ফাস—
হোথা ফোয়ারা খুশির বৃষ্টি—
ঝরে পরিমল মহানন্দ
রহে শাশ্বতরূপ সৃষ্টি ! !

ভজনের উৎস

শ্রীতড়িৎকুমার বসাক

ভজন বলতে আমরা বুঝি ভক্তিমূলক গান। মানুষ আর দেবতা, মর আর অমর, ভৃত্য আর প্রভু, প্রেমিক আর প্রেমাস্পদ—কত না মধুর এই ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক। স্রষ্টা আর সৃষ্ট—এইতো সম্পর্ক দেবতা আর মানুষের মাঝে। সৃষ্ট চিরকালই জানতে চায় স্রষ্টার পরিচিতি—জিজ্ঞাসা-ভরে জানতে চায় তার উৎস কোথায় ? স্রষ্টার সন্ধান সে পায় নি, অথবা পেয়েছে। যদি পেয়ে থাকে তাহ'লে সে চেষ্টা করে স্রষ্টার একটা বর্ণনা দিতে ; তাই নানাভাবে ছন্দে সুরে হয় তার বন্দনা। আবার সব মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি তো সমান নয় ; তাই ওই দেবতার বর্ণনাও সব সময় সমান হয় না। ভারতের জনসংখ্যা ৩৩ কোটীর ওপর ; তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও ৩৩ কোটি রকম ফের। তাই একই অখণ্ড অদ্বয় ভগবৎসত্তাকে ভারতবাসী ৩৩ কোটি রূপে দেখেছে এবং ৩৩ কোটি ভজন গানে দেবতার বর্ণনা দিয়েছে।

আর যদি সে দেবতার দর্শন না পেয়ে থাকে তাহ'লে সে চেষ্টা করে দেবতার একটা কাল্পনিক প্রতিকৃতির বর্ণনা দিতে। মানুষের মনের গহনে দেবসত্তার প্রতি যে সহজাত ভাবপ্রবৃত্তি রয়েছে তারই বাইরের অভিব্যক্তি হচ্ছে ভজন।

সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে মানুষ যখন চোখের সমুখে দেখল সূর্যকে তখন সে সূর্যের বিজ্ঞানতত্ত্ব

জানতে পারল না; তাই সে শুধু বিমূঢ়ের মত সূর্যকে দেবতা বলে মেনে নিয়ে একটি প্রণাম জানাল তার উদ্দেশ্যে। এই সময়ই তার অন্তরের সুপ্তভক্তি-সাগরে উঠল একটা তরঙ্গ। আবার মানুষের অন্তরের সম্পদ যেমন সবার সমান নয়, তেমনি ভক্তিস্রোতের অনুভূতি-ক্ষমতাও সবার সমান নয়। যাই হোক, সেই ভক্তির স্রোতটা তার শুক্‌নো হৃদয়ে গড়িয়ে পড়ে সেখানে গজিয়ে তুলল নানা ভাবের ফসল। কারো হৃদয়ে জাগল শান্ত ভাব, কারো দাস্য, কারো সখ্য, কারো বাৎসল্য, আবার কারো বা মধুর ভাব। কিন্তু এ সব ক'টির মূলেই রয়েছে একমাত্র প্রেমের ভাব; আবার সেই প্রেমটা জন্মায় ভক্তির ক্ষেত হতে। এই ভক্তি বা তথাকথিত প্রেম নিবেদনের জন্যেই মানুষ প্রথম গেয়ে উঠল ভজন।

অহংকারী মানুষ চিরকাল নিজকে বড় করে দেখে, সে মনে করে 'আমিই সব'। অবশ্য একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে 'আমি' সেই অখণ্ড চৈতন্যঘন সৃষ্টিকারণরূপী সত্তার একটা ক্ষুদ্র অংশ নয়; কিন্তু এই 'আমি'টিই তো Eternal pulse-এর সমগ্র denotationটা দখল করে নেই। কাজেই আমিই সব বা "C'est moi" এর থিওরি খাটল না। তাই ক্ষুদ্র 'আমি' সেই বৃহৎ অখণ্ড অদ্বয় 'আমি'র কাছে যে প্রণতি জানায় তাকেই বলে ভজন। তাই দেখি, মানুষের ঐকান্তিক প্রার্থনা: আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে।

ভোরের পাখীর ডাকে ঘুম-ভাঙা মানুষ যখন একটা প্রশান্তি, একটা 'প্রবাতবাতাহতিকম্পিতাকৃতি' ভাব দেখে তখন তার মনের অন্তরতম প্রদেশ থেকেই বেরিয়ে আসে অস্ফুট গুঞ্জরণ। বাইরের নিসর্গের মত তার অন্তরেও ভক্তিস্রোত তার মনে দোলা লাগায়, মনের পাপগুলোও তখন মানুষ পুণ্যের দাঁড়িপাল্লায় ঝুলায়। তখন সে একটা অনুভূতি, একটা তীক্ষ্ণ রসচেতনা লাভ করে—যেটার ব্যাপ্তি বড় সূক্ষ্ম। সেই রসচেতনাটাই ভজনগীতির হরফে ছাপা হয়। প্রতীচীর কবি জন কীটস্‌ও কথাটা অনুভব করেছেন। তাই তিনি গেয়েছেন:

'Tis very sweet to look into the fair
And open face of heaven,—
to breathe a prayer
Full in the smile of the blue
firmament

এই হল ভজনের উৎসের পরিচিতি। প্রবন্ধ-কারের পক্ষে অবৈধ হলেও এই প্রবন্ধের গণ্ডীর বাইরের একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে। অবশ্য আমি জানি যে সেজন্যে পাঠকবর্গ মার্জনা করতে পারবেন না আমায়; fastidious সমালোচক তো মাফ করতেই জানেন না। যাই হোক, ভজনগানের একটা সুফল আমি বলছি।

ভজনগান গাইলে মনের সংযমশক্তিটা বাড়ে। কারণ, ভজনগানের প্রতিটি কলি গায়কের অন্তরের অন্তরতম কোণ হতে বেরিয়ে আসে। আবার, অন্যদিকে হাল্কা গানগুলো শুধু যে মনঃসংযমের শক্তিকে বাড়াতে পারে না, তা নয়; পক্ষান্তরে মনঃসংযমের শক্তিকে কমিয়ে দিতে সচেষ্ট থাকে। ভজনগানকে মনঃসংযমের আতস-কাঁচ বলে অভিহিত করা যেতে পারে; একটা আতস-কাঁচ যেমন সাতটা সূর্যরশ্মিকে একত্রিত করে এক পথে চালিত করে, একখানা ভজনগানও সেরূপ সাতশত দিকে বিক্ষিপ্ত মনকে একাগ্র করে তুলতে পারে।

ভজনগানের সাথে সাধারণ হাল্‌কা গানের তফাৎটা হলো এই যে, ভজনগীতি মনঃসংযমের আতস-কাঁচ; আর অন্যান্য গানগুলি যথা রঙীন কাঁচ। সে কাঁচটা রঙীন বটে; কিন্তু যথা। তাই তাকে দর্পণের মতো ব্যবহার করে আন্তরিক মানসিক বৃত্তিগুলির স্বরূপ ধরা পড়ে না।

সমালোচনা

উপনিষদের মর্মবাণী (দ্বিতীয় খণ্ড)—লেখক: শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, অধ্যক্ষ মুরারীচাঁদ কলেজ, শ্রীহট্ট; প্রকাশক—শ্রীরণজিৎ রায়, মণ্টু স্মৃতি ভাণ্ডার, পোঃ জলসুখ (শ্রীহট্ট) পৃষ্ঠা—১০৮+॥/০ ; মূল্য—।৵০ আনা।

এই পুস্তকের প্রণেতা কৃষ্ণযজুর্বেদীয় কঠ উপনিষদের প্রত্যেকটি মন্ত্র প্রথমে সরল বাংলায় ব্যাখ্যা করিয়া, পরে সেই মন্ত্রগুলির তাৎপর্য বিস্তৃতভাবে হৃদয়গ্রাহী করিয়া পাঠকের কাছে উপহার দিয়াছেন। অনেক স্থলে যে সকল মন্ত্রের অর্থ সহজে মূল শ্লোক হইতে বুঝা যায় না সেই সকল মন্ত্র তিনি নিজের গভীর পর্যালোচনা দ্বারা এমনভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যাহাতে পাঠকের বহু সন্দেহ নিরসন হইয়া যায়। কঠ উপনিষদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় যে আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য, তাহার সূচনা করিয়া প্রত্যেক বল্লীর অবান্তর বিষয়গুলিও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে লেখক সাংখ্যমত ও তাহার কোন কোন অংশের অযৌক্তিকতা এবং বৈষ্ণব দর্শনের কোন কোন পদার্থের সহিত কঠ উপনিষদের অর্থের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে হইলে মনের বিশুদ্ধতা, শান্ত সমাহিতভাব থাকা প্রয়োজন, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নত ভূমিতে আরোহণ করা প্রয়োজন, তাহার পর পরমাত্মার কৃপার অধিকারী হওয়া চাই ; চাই ত্যাগ, চাই বৈরাগ্য, চাই সন্ন্যাস, চাই সংযম, চাই তপস্যা। সর্বোপরি উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ আচার্যের কাছে এই তত্ত্ব শিখিতে হয়। উপযুক্ত আচার্য ছাড়া এ বিষয়ে জ্ঞানলাভের উপায় নাই। যুক্তি তর্ক বা কেবল পাণ্ডিত্যের দ্বারা এই আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। আলোচ্য পুস্তকে এই সমস্ত বিষয় শাস্ত্রসম্মত ও সুন্দর, সরল ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এই উপনিষদে যে নাচিকেত অগ্নির কথা আছে, 'তাহা ব্রহ্মের প্রতীক ; পরব্রহ্ম সেই অগ্নির মধ্যে এমনকি সকল জাগতিক বস্তুর মধ্যে প্রকাশিত'—এই কথাটি বুঝাইয়া গ্রন্থকার সমস্ত উপনিষৎ পদার্থগুলি যে আত্মতত্ত্বে পর্যবসিত হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন। জ্ঞানলাভের সাধনার ধারাটি যেরূপে উক্ত উপনিষদে নিগূঢ়ভাবে বিদ্যমান তাহা তিনি বিশদ করিয়া বলিয়াছেন (৩৯ পৃঃ ২৩ পং—৪৫ পৃঃ ৩ পং)। তাহার সারমর্ম এই যে সাধনার পথে সংযম, পবিত্রতা, একাগ্রতা, সূক্ষ্ম বিচারক্ষমতা, বিবেক, চিন্তাশীলতা এইগুলি অপরিহার্য।

পরলোক সম্বন্ধে লেখক নিজের অভিমত যুক্তি দিয়াছেন (৭৭ পৃঃ) যে ব্যক্তি ইহজীবনে পশুর মত কার্য করে, সে পশুর মত বা বৃক্ষলতার মত জীবন যাপন করে, পরজন্মে ঐরূপ ব্যক্তির পশু বা বৃক্ষজন্ম সম্ভব। পক্ষান্তরে যিনি যোগ-সাধনাদি অভ্যাস করেন তাঁহার ইহ জীবনের সুখাদি অনুমান করিয়া পরজন্ম উন্নততর জন্মের অনুমান হয়। এই যুক্তিটি শাস্ত্রানুসারী। কয়েকটি স্থলে বর্ণিত পদার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে।

—শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রগীতি (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীমৎ স্বামী যোগবিলাস মহারাজ কর্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মাতৃমন্দির, শিমুলতলা (ই, আর) শ্রীযোগবিনোদ আশ্রম হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—২৬ ; মূল্য ৵০ আনা।

আলোচ্য পুস্তিকাটিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে বিভিন্ন ব্যক্তির রচিত কতকগুলি সুন্দর স্তোত্র ও গানের সমাবেশ হইয়াছে। ইহাতে প্রদত্ত বীরভক্ত মহাকবি গিরিশচন্দ্র-রচিত বিখ্যাত "শ্রীরামকৃষ্ণ" কবিতা, নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু,

ভক্তপ্রবর মহাত্মা রামচন্দ্র এবং স্বামী যোগেশ্বরানন্দের স্তোত্র ও গানগুলি সকলের প্রাণে ভক্তিভাব বৃদ্ধির সহায়ক হইবে, সন্দেহ নাই।

লালু—শ্রীসুখেন্দুশেখর সরকার প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুধীরকুমার সরকার, ১০৫, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ ; পৃষ্ঠা—১০৪, মূল্য ১৸০ আনা।

আলোচ্য পুস্তকটি 'লালু' নামক একটি দরিদ্র যুবকের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া একটি বড় গল্পের রূপায়ণ। বর্তমান বাঙলার কত ছেলে দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণের মধ্যে থাকিয়া কিভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বিফল-মনোরথ হইতেছে এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া দুর্বহ জীবন যাপন করিতেছে পুস্তকটিতে তাহার একখানি নিখুঁত চিত্র সংবেদনশীল মনোভাব লইয়া তরুণ লেখক চিত্রণ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। লেখকের প্রচেষ্টা অনেকাংশে ফলবতী হইয়াছে।

গৌরব ও সমৃদ্ধি-সমুজ্জ্বল পূর্বপুরুষগণের শুধু ঐতিহ্য লইয়াই লালুর জীবন শুরু হয়। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর অতিকষ্টে গৃহশিক্ষকতা যোগাড় করিয়া আই-এস্-সি পাশ করা—কোন কোন দিন অর্ধাহারে থাকিয়া দিবারাত্র পরিশ্রমে বি-এস্‌সি পড়িবার সময় লালু যে অতি শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয় তাহা পাঠ করিয়া পাঠকের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে। সর্বত্রই ব্যথা বেদনা ও নৈরাশ্যের সুর—কোথাও আশার আলো নাই! কিন্তু ইহাই তো বর্তমান বাংলার বাস্তব চিত্র।

পুস্তকটিতে প্রাইভেট টিউটারকে পরমগুরু বলা হইয়াছে, ইহা অসমীচীন বোধ হইল; কারণ পরম-গুরু তিনিই যিনি জীবনে আধ্যাত্মিকতার আলোক-সম্পাত করেন। মাতা-পিতাকেও পরমগুরু বলা হইয়া থাকে। শিক্ষাদাতা গৃহশিক্ষক গুরু হইতে পারেন—পরমগুরু নয়। প্রারম্ভে "কৃতজ্ঞতা" শিরোনামায় লিখিত অংশে একান্ত ব্যক্তিগত সুরটি আমাদের ভাল লাগে নাই।

—জীবানন্দ

Mean You !—By Swami Pratyagatmananda Saraswati, Published by P. Ghosh ; P. Ghosh & Co, 20, College Street Market, Calcutta-12. Pages—32+8 ; Price Re 1-4 As.

স্বনামখ্যাত পণ্ডিত-সন্ন্যাসী, লেখক ও মনীষী স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতীর রচিত ১২টি ইংরেজী কবিতা বর্তমান পুস্তকে সংকলিত হইয়াছে। কবিতাগুলির বিষয়বস্তু অধ্যাত্মপথযাত্রী মানুষের বিভিন্ন স্তরের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতিকে অবলম্বন করিয়া। মানুষ স্বরূপতঃ অমৃতের সন্তান—সচ্চিদানন্দময় আত্মা, কিন্তু শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধময়ী ব্যবহারিক জগতের বিচিত্র প্রহেলিকা তাহার নিকট এই আত্মসত্য আবৃত করিয়া রাখে। তাই সম্রাট হইয়াও মানুষকে দীনের ন্যায় চোখের জল ফেলিতে হয়—(প্রথম কবিতা—'The Angel in Tears') অনন্ত গগনে অফুরন্ত আলোকের অধিকারী হইয়াও অন্ধকার কোণে পড়িয়া থাকিতে হয় (The Angel in Veil and on Wings)। কিন্তু চিরকাল নয়। অকূল পাথারে একদিন কাণ্ডারীর দেখা পাওয়া যায় (The Oarman's Pilot), অনন্ত প্রেম-সৌন্দর্য ও আলোর জীবনকে বরণ করে। (Everlasting Love, Loveliness & Light)। সে আলোক ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ববস্তু ব্যাপিয়া। জীবনের পরম স্বামীর দেখা পাইয়া মানুষ ধন্য হয়, তাঁহারই দিব্য সঙ্গীতের সুরে তাহার জীবনের সকল তন্ত্রী অনুরণিত হয়, গভীর প্রশান্তির ভিতর হইতে প্রেমময় নিত্যকৃষ্ণের বাঁশী বাজিয়া উঠে (The Flute of Silence)। কবিতাগুলি একাধারে অনবদ্য সাহিত্য-কীর্তি,

প্রখর দার্শনিক মনন এবং মরমীয়া সাধকের অজানা পথের অভ্রান্ত দিগ্‌দর্শন।

শ্রীমদ্ভাগবত (সংক্ষিপ্ত আখ্যানভাগ)—শ্রীগুণদাচরণ সেন প্রণীত। প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা । পৃষ্ঠা—৩২০ ; মূল্য—পাঁচ টাকা।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ ১৩৫৯ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা উদ্বোধনের ১৩৬০ সালের আষাঢ় সংখ্যায় সমালোচনা-স্তম্ভে উহার প্রশংসা করিয়াছিলাম। সুলিখিত এবং পাঠক-সাধারণের সমাদরণীয় এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিয়া আমাদের আনন্দ হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রসঙ্গগুলি বাদ দিয়া প্রত্যেক আখ্যানাংশ পর পর অতি সুন্দরভাবে সাজাইয়া গ্রন্থকার ভাগবত-কাহিনী পাঠক-পাঠিকার নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই কাহিনী-গুলির সার্থকতা তো শুধু চিত্তবিনোদন নয়, হৃদয়ে জ্ঞান-ভক্তি-বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের উন্মেষ করিতে উহাদের শক্তি অসীম। মাঝে মাঝে মূল সংস্কৃত শ্লোক নিবদ্ধ হওয়াতে গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১ম পৃষ্ঠার প্রারম্ভিক নিবেদনে লেখক শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা এবং শ্রীভাগবতের ভক্তিবাদ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন।

মাষ্টার মঙ্গল ও কবিতা বিতান—অক্রুর চন্দ্র ধর প্রণীত; প্রকাশক—মুজাফ্ফর হোসেন আহম্মদ, এল্-এল্-বি ; ৩, জয়কালী মন্দির রোড, ঢাকা। পৃষ্ঠা-৩০ ; মূল্য—৷৷০ আনা।

পূর্ববঙ্গের বহুসমাদৃত প্রবীণ কবি এবং শিক্ষাব্রতী শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধরের ৮টি কবিতার এই ক্ষুদ্র সংকলনটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। কবিতাগুলির নাম—মাষ্টার মঙ্গল, আমার সঞ্চয়, গুরুজী, কবির জীবনী, আমি কবি, আমরা মানুষ জাত, এ পৃথিবী আমাদের, ভয় নাই আর ভয় নাই। 'মাষ্টার মঙ্গল' কবিতাটিতে শিক্ষক-জীবনের মহান আদর্শ করুণ-বিদ্রূপ রসের সাহায্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অপর কবিতাগুলিতে জীবনের দীর্ঘপথভ্রমণে ধর্ম, সমাজ ও মানবচরিত্র সম্বন্ধে কবি যে ভূয়িষ্ঠ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহারই দিগ্‌দর্শন ব্যঞ্জিত। ভাব, ভাষা, ছন্দ সব দিক দিয়াই রচনাগুলি অনবদ্য।

CHETANA—ইংরেজী মাসিক পত্র। সম্পাদক—এস্ দীক্ষিত ; ৩৪, র‍্যাম্পার্ট রো, বোম্বাই-১ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য—২৲ টাকা।

১৯৫৬ সালের জানুআরি হইতে এই নূতন পত্রিকাখানির প্রথম বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। পর পর সংখ্যাগুলি পড়িয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। বেদান্তের সার্বভৌম আদর্শ পুরো-ভাগে রাখিয়া ভারতবর্ষের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যান ও প্রচার পত্রিকাটির লক্ষ্য। পরিচালকমণ্ডলীর সাধু উদ্যম জয়যুক্ত হউক।

বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন পত্রিকা—(অষ্টাবিংশতি বর্ষ, ১৩৬২)—হাওড়া, ১০৭, নেতাজী সুভাষ রোডে অবস্থিত বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানরূপে সুনাম অর্জন করিয়াছে। বিদ্যালয়ের এই বার্ষিকীটির রচনাগুলির মধ্যে ছাত্রগণের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা, প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং সুনীতি ও সদাচারের পরিচয় পাইয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। পত্রিকার এবং প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। বিদ্যালয়ের নানামুখী কর্মধারার পরিচয়বাহী অনেকগুলি আলোকচিত্র পত্রিকাটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয় পত্রিকা (নবম বর্ষ, ১৩৬২)—শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ পুরোভাগে রাখিয়া 'শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়' প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হইতেছে (ঠিকানা—১০৬, নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া ; ফোন—হাওড়া,

১৩৯১)। প্রতিষ্ঠানের এই নবম বার্ষিকী পত্রিকাটি পাইয়া আমরা সুখী হইয়াছি। 'বাণী', 'কবিতা', 'আলোচনা', 'জীবনী ও প্রবন্ধ', 'বিজ্ঞান', 'ইতিহাস', 'ভ্রমণ', 'গল্প' ও 'পরিক্রমা'—এই নয়টি স্তম্ভে ২৬টি রচনা স্থান পাইয়াছে। প্রাক্তন ও বর্তমান—উভয় ছাত্রেরাই লিখিয়াছেন। প্রতিষ্ঠান ও পত্রিকার পরিচালকগণকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি।

উদয়াচল (ওড়িয়া সাময়িকী-শ্রীমা-শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যা)—কলিকাতা, ২০ নং যদুলাল মল্লিক রোড-স্থিত রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ছাত্রাবাসের ওড়িয়া বিদ্যার্থিগণ এই সাময়িকীটি প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমা সারদাদেবী সম্বন্ধে অনেকগুলি সুলিখিত রচনা ওড়িয়া পাঠকমণ্ডলীকে এই মহীয়সী নর-দেবীকে জানিতে ও বুঝিতে সহায়তা করিবে। ছাত্রবন্ধুগণের উদ্যমকে অভিনন্দিত করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর প্রচার-সফর—বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন শাখাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী শিলং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম-সচিব স্বামী সৌম্যানন্দের সহিত গত এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি হইতে মে মাসের দশ দিন পর্যন্ত আসাম রাজ্যের নানাস্থানে একটি ব্যাপক প্রচার-সফর করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা ও আলোচনাগুলির বিষয়বস্তু সাধারণতঃ কেন্দ্রীভূত থাকিত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সনাতন বেদান্তিক ধর্মের আদর্শ ও সাধনা লইয়া। অনেকগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর আলোকে শিক্ষার আদর্শ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে ভাষণ দিয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহার ভ্রমণ স্থান ও ভাষণ-সংখ্যা লিপিবদ্ধ হইল :—ডিব্রুগড় (বাংলা বক্তৃতা ২, আলোচনা ১), তিনসুকিয়া (বঃ ১), ডিগবয় (বাং বঃ ৪, ইংরেজী বঃ ১, আলোচনা ১), নহরেলকাটিয়া (১), হুমহুমা (১), হোজাই (১), লামডিং (ইং বঃ ১), পাণ্ডু (১), ধুবড়ী (২), বগরিবাড়ী (১), গৌহাটি (১), নওগাঁ (২), শিলং (বাং বঃ ১, ইং বঃ ১), চেরাপুঞ্জি (ইং বঃ ১)।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী পূর্ববঙ্গের কয়েকটি শহরে ভ্রমণব্যপদেশে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ২রা ও ৩রা জ্যৈষ্ঠ সোনারগাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত তাঁহার ভাষণের বিষয় ছিল যথাক্রমে 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী' এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনবত্ব'। ৯ই জ্যৈষ্ঠ মৈমনসিং শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে তিনি 'ধর্মসমন্বয়' সম্বন্ধে বলেন। পরের দিন (২৪শে মে) ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে অনুষ্ঠিত বুদ্ধজয়ন্তীতে তিনি যোগ দেন এবং ভগবান বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে সর্বজনমর্মস্পর্শী আলোচনা করেন। ১৪ই হইতে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ চট্টগ্রামে তাঁহার ভাষণত্রয়ের বিষয় ছিল 'মানবসভ্যতায় বেদান্তের দান', 'আত্মার পরিচর্যা' এবং 'যুগপ্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণ'। ১৭ই হইতে ১৯শে জ্যৈষ্ঠ সম্বুদ্ধানন্দজী কুমিল্লায় তিনটি বক্তৃতা দেন : স্থানীয় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ('মনঃসংযম'), মহেশ প্রাঙ্গণে ('বর্তমান বিশ্বে ধর্মের স্থান'), এবং ঈশ্বর পাঠশালায় ('বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষ্যে 'ভগবান বুদ্ধের জীবন ও বাণী')। চাঁদপুর শহরের কালীবাড়ীতে এবং পুরাণবাজারে তিনি বলেন ২০শে ও ২১শে জ্যৈষ্ঠ (বিষয়—যথাক্রমে 'ধর্মসমন্বয়' ও 'সনাতন ধর্ম')। ফরিদপুরে তাঁহার দুটি বক্তৃতা হয় (২২শে জ্যৈষ্ঠ অম্বিকা হলে—'সকল ধর্ম কোথায় মিশিয়াছে ?'; ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, মহাকালী পাঠশালায় 'নারীশিক্ষা')। ২৪শে

জ্যৈষ্ঠ সমুদ্ধানন্দজী নারায়ণগঞ্জ আশ্রমে 'কর্মবাদ ও কর্মাভ্যাস' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহার অন্তিম বক্তৃতা প্রদত্ত হয় ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে। নির্বাচিত বিষয় ছিল— 'আদর্শ শিক্ষা'।

উত্তর কালিফর্নিয়ায় স্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী নির্বাণানন্দজী—উত্তর কালিফর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটির কর্মসচিব মিসেস সুলে (Mrs. H. D. B. Soule) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজীর এবং মঠ ও মিশনের অন্যতম ট্রাস্টি স্বামী নির্বাণানন্দজীর গত মার্চ মাসে উত্তর কালিফর্নিয়া সফরের একটি মনোজ্ঞ বিবরণী পাঠাইয়াছেন। উহা হইতে কিছু সঙ্কলন আমরা পাঠক-পাঠিকাবর্গকে উপহার দিতেছি।

২৯শে ফেব্রুআরি (১৯৫৬) বেলা ১টার সময় স্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী নির্বাণানন্দজী সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো আন্তর্জাতীয় বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। উত্তর কালিফর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটির নেতা স্বামী অশোকানন্দজী, তাঁহার সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী এবং সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো ও বার্কলে কেন্দ্রদ্বয়ের ৭৫ জন সভ্য শ্রদ্ধেয় অতিথিদ্বয়কে সম্বর্ধনা করিবার জন্য বিমান ঘাঁটিতে উপস্থিত ছিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজন এবং স্বল্প বিশ্রামের পর স্বামী অশোকানন্দজী তাঁহাদিগকে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো কেন্দ্রের নব-নির্মীয়মাণ মন্দির দেখাইতে লইয়া যান। মন্দিরটি যতদূর তৈরি হইয়াছে তাহা হইতেই অতিথিদ্বয় উহার সৌন্দর্য এবং সৌধের আভ্যন্তরীণ প্রশস্ততার একটি ধারণা লাভ করেন। ঐ স্থান হইতে তাঁহারা সোসাইটি-পরিচালিত মহিলা আশ্রমে যান এবং তথাকার ঠাকুরঘর দর্শন করেন। সন্ধ্যায় সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো কেন্দ্রের বর্তমান বক্তৃতা-হলে স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজীর নিয়মিত বুধবাসরীয় ভাষণের পর শ্রদ্ধাস্পদ অতিথিদ্বয় সমবেত ভক্তগণের সহিত পরিচয় ও আলাপাদি করেন।

পরের দিন, ১লা মার্চ মিসেস সুলে স্বামী মাধবানন্দজী, স্বামী নির্বাণানন্দজী এবং স্বামী অশোকানন্দজীকে মোটরে বার্কলে শহরে লইয়া যান। এখানে উত্তর কালিফর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটির একটি শাখাকেন্দ্র আছে। স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজীর উপর উহার দেখাশুনা করিবার ভার। মধ্যাহ্নভোজনের পর সকলে কালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। তথায় অধ্যাপক উইলসন পাওয়েল তাঁহাদিগকে প্রসিদ্ধ সাইক্লোট্রন যন্ত্র (পরমাণু-বিশ্লেষের জন্য ব্যবহৃত) দেখান। ঐ দিন সন্ধ্যায় পূর্বোক্ত সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো মহিলা-আশ্রমে ভারতীয় প্রথায় একটি ভোজের ব্যবস্থা হয়। প্রায় ত্রিশ জন স্ত্রী-ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। স্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী নির্বাণানন্দজী তাঁহাদিগের ধর্মবিষয়ক নানা প্রশ্নের উত্তর দেন।

২রা মার্চ অতিবাহিত হয় সান্‌ফ্রান্সিসকো হইতে ৩৫ মাইল দূরে ওলেমা নামক স্থানে। বনানীর পরিবেশে বিস্তীর্ণ উপত্যকায় এখানে একটি আশ্রম গড়িয়া উঠিতেছে। ১১ জন আমেরিকান ব্রহ্মচারী এখানে রহিয়াছেন।

৩রা মার্চ অতিথিদ্বয় উত্তর কালিফর্নিয়ার প্রাচীন 'মুর বনানী' (Muir woods) দেখিতে যান। এখানে বিখ্যাত রেড্‌উড্‌ বৃক্ষ আছে। কতকগুলির বয়স সহস্র বৎসরেরও অধিক। তৎপরে তাঁহারা সান্‌ফ্রান্সিসকোর প্রসিদ্ধ গোল্ডেন গেট পার্কে অবস্থিত স্টীনহার্ট মৎস্য-সংরক্ষণশালা (Steinhart Aquarium) এবং বিজ্ঞান শিক্ষালয় (Academy of Sciences) পরিদর্শন করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় বার্কলে কেন্দ্রে শ্রদ্ধেয় অতিথিদ্বয়কে উত্তর কালিফর্নিয়া বেদান্ত কেন্দ্রের সব শাখাগুলির তরফ হইতে ২২০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন স্বামী অশোকানন্দজী।

সোসাইটির ব্রহ্মচারিবৃন্দ ও পুরুষ ভক্তগণ কর্তৃক নর-দেব স্তোত্র (স্বামী বিবেকানন্দ কৃত "খণ্ডন ভব বন্ধন" গান) আবৃত্তি এবং আর একটি সঙ্গীতের পর সোসাইটির কর্মসচিব মিসেস স্লুপে স্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী নির্বাণানন্দজীর উদ্দেশ্যে লিখিত অভিনন্দন-পত্রটি পাঠ করেন। এই অভিনন্দন-পত্রে একদিকে যেমন ভারতবর্ষ হইতে আগত সম্মানিত সন্ন্যাসি-অতিথিদ্বয়ের উদ্দেশ্যে উত্তর কালিফর্নিয়ার বেদান্তানুরাগী বন্ধুগণের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও প্রীতি অভিব্যঞ্জিত হইয়াছিল অপর দিকে ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাঁহাদের বেদান্তের সর্বজনীন উদার শিক্ষার প্রতি উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী। আমেরিকার বেদান্তানুরাগিগণ বেদান্তকে কিভাবে দেখেন সেই প্রসঙ্গে অভিনন্দন-পত্রে বলা হইয়াছে—

"আমরা স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রচারিত মানবের দেবত্ব এবং প্রত্যক্ষ ঈশ্বরবুদ্ধিতে মানুষের পূজা অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। সুযুক্তির উপর স্থাপিত যে সর্বজনীন তত্ত্বের সন্ধান স্বামীজী দিয়া গিয়াছেন তাঁহার মাধ্যমেই ধর্মকে বুঝিতে ও রূপায়িত করিতে এবং সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত মূল একতা কোথায় তাহা ধরিতে আমরা যত্নশীল। আমরা হৃদয়ঙ্গম করি যে বেদান্ত একটি মতবাদ নয়—উহা মানুষের উচ্চতম ও মহত্তম চিন্তারাশির সমন্বয়।

যে ব্যক্তিসমূহের মধ্যে আদর্শ বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে তাঁহাদের ভিতর দিয়া ছাড়া আদর্শকে ঠিক ঠিক ধারণা করা যায় না ; এই জন্য আমরা সকল ধর্মের মহাপুরুষ ও অবতারগণকেই শ্রদ্ধা করি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রতি আমাদের একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে, কেননা, বেদান্তের ঔপপত্তিক ও কাযকরী শিক্ষাগুলি তাঁহাদের জীবনে আমরা অতি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিতে দেখিতে পাই।

আমরা বেশ জানি যে, সাধনার মাধ্যমে যদি আধ্যাত্মিক চেতনা ঘনীভূত না হয় তাহা হইলে বেদান্তের সমুন্নত আদর্শগুলি শুধু বাক্যবিলাসই রহিয়া যাইতে পারে। এজন্য ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সতর্ক। আমাদের মনে হয়, স্বামী বিবেকানন্দের অভিপ্রায়ানুযায়ী এবং পাশ্চাত্ত্য অধ্যাত্মবাদেরও ঐতিহ্য অনুসরণে আমরা কর্মের ভিতর উপাসনা-বুদ্ধি সঞ্চার করিয়া উহাকে একটি উচ্চস্তরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমরা যাহারা এই সোসাইটির কাজে ব্রতী রহিয়াছি—আমাদের যে একটি বৃহৎ দায়িত্ব আছে সে বিষয়ে আমরা সচেতন। জানি যে, একদিকে আমাদিগকে যেমন বেদান্তের মূলনীতিগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে—অপরদিকে আমাদিগকে সর্বদা অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হইবে যাহাতে বেদান্ত পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের বৃহৎ জীবন-রীতি হইতে বিযুক্ত একটি ধর্মগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়-মাত্রে না সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, ঐরূপ সম্প্রদায় যতই কেন চিত্তাকর্ষক মনে হউক না কেন। আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে এদেশে বেদান্তকে যদি সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হইতে হয় তাহা হইলে উহার পাশ্চাত্ত্য ঐতিহ্যকে একেবারে হটাইয়া দিলে চলিবে না, বরং ঐ ঐতিহ্যের পরিপূর্ণতা সম্পাদন করিতে হইবে। তবেই স্বামী বিবেকানন্দ যেমন চাহিয়াছিলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মহত্তম আদর্শ ও কীর্তির সংমিশ্রণে একটি নূতন সুসমঞ্জস সংস্কৃতির উদ্ভব হইবে।"

অভিনন্দনের উত্তরে স্বামী মাধবানন্দজী সোসাইটির সভ্যগণকে তাঁহাদের সৌজন্য ও আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, তিনি নিজে অপরের যেটুকু সেবা করিতে পারিয়াছেন উহা শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাতেই সম্ভবপর হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই দর্শনটির বিষয় বক্তা উল্লেখ করেন—যাহাতে তিনি দেখিয়াছিলেন তিনি যেন এক দূর দেশে গিয়াছেন, সেখানকার লোকগুলির চামড়া সাদা, তিনি তাহাদের এবং তাহারাও তাঁহার ভাষা জানেন না, তবুও তাঁহারা তাঁহার ভাব বুঝিতে পারিতেছেন। আবার স্বামী বিবেকানন্দ যখন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো ধর্মমহাসভায় দেখা দিলেন তখন যেন তাঁহার মধ্য দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণই নিজে আমেরিকাবাসীকে সম্বোধন করিয়াছিলেন। পরে পাশ্চাত্ত্যে যে সব সন্ন্যাসী আসিয়াছেন তাঁহারা উহাদের শিক্ষাধারাই প্রচার এবং স্বামীজী যে প্রভাব রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহারই দৃঢ়ীকরণের চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণোপদিষ্ট মহৎ সত্যসমূহ পৃথিবীতে পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইতে বহু বৎসর লাগিবে তবে উন্নতি আশানুরূপ অধিক মনে না

হইলেও কেহ যেন নিরুদ্যম না হন। সোসাইটির সকল ভক্তগণেরই কর্তব্য ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে আধ্যাত্মিক জীবনে আগাইয়া যাইবার এবং নিজেদের উদাহরণ দ্বারা অপর ব্যক্তিগণকেও ঐ জীবন-যাপনের প্রেরণা দিবার চেষ্টা করা।

স্বামী নির্বাণানন্দজী অভিনন্দনের উত্তর দেন বাংলাতে (ইহা স্বামী অশোকানন্দজী পরে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া শুনান)। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় যে উৎসাহ, কর্মোদ্যম ও আতিথেয়তা দেখিয়াছিলেন এবং এই দেশকে বেদান্ত প্রচারের উর্বর ক্ষেত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আমেরিকায় আসিয়া তিনি স্বামীজীর ঐ সব উক্তি আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছেন। আমেরিকানদের যে সব মহৎগুণ আছে তাহার সঙ্গে বেদান্তের শিক্ষা যদি সংযুক্ত হয় তাহা হইলে একটি সম্পূর্ণ অভিনব চিন্তাধারার জন্ম হইবে, ফলে গড়িয়া উঠিবে একটি অভূতপূর্ব নূতন সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিতে আমেরিকাবাসীর বদান্যতা, আতিথেয়তা ও কর্মোদ্যোগ আরও বিস্তৃত ও গভীর হইবে, তাঁহারা সারা পৃথিবীর মানুষকে আপনার বলিয়া দেখিতে পাইবেন। ইহাতে জগতের কল্যাণ ও শান্তি হইবে।

ইহার পরে স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী এবং পরিশেষে স্বামী অশোকানন্দজী সম্মেলনে ভাষণ দেন। বিভিন্ন বক্তৃতার মাঝে কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত অনুষ্ঠানটিকে সরস করিয়া তুলিয়াছিল। কর্মসূচীর অবসানে সমবেত সকলকে জলযোগ করানো হয়। তাহার পর সকলে ব্যক্তিগতভাবে অতিথিদ্বয়ের সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করেন।

৪ঠা মার্চ, রবিবার সকালে সান্‌ফ্রান্সিসকো সোসাইটির বক্তৃতাগৃহে স্বামী মাধবানন্দজী 'প্রাত্যহিক জীবনে বেদান্ত'* সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন। সমস্ত সভাগৃহ উৎসাহী শ্রোতৃমণ্ডলী দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। দাঁড়াইবার পর্যন্ত স্থান না থাকায় অনেককে ফিরিয়া যাইতে হয়। প্রারম্ভে কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী শ্রোতৃগণের নিকট শ্রদ্ধেয় বক্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় সান্‌ফ্রান্সিসকোর একটি বন্ধু-গৃহে একটি প্রীতি-সম্মেলনে স্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী নির্বাণানন্দজী প্রশ্নোত্তরদান ও ধর্মপ্রসঙ্গ করেন।

৫ই মার্চ ও ৬ই মার্চের কর্মসূচী ছিল যথাক্রমে ৭০ মাইল দূরের 'শান্তি আশ্রম' ও ১০০ মাইল দূরবর্তী কালিফর্নিয়ার রাজধানী স্যাক্রামেন্টো শহরের নূতন বেদান্তশাখাকেন্দ্র পরিদর্শন। ৭ই মার্চ প্রাতঃকাল সান্‌ফ্রান্সিসকোতে কতকগুলি দর্শনীয় স্থান ঘুরিয়া দেখিতে কাটে, সায়াহ্নে সোসাইটির সান্ধ্যসম্মেলনে স্বামী নির্বাণানন্দজী বাংলায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতিকথা বলেন (স্বামী অশোকানন্দজী উহা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া দেন)। তৎপরে স্বামী মাধবানন্দজী এক ঘণ্টারও অধিক সময় ধরিয়া সোসাইটির সভ্যগণ কর্তৃক উপস্থাপিত ধর্ম, দর্শন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সম্পর্কিত অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর দান করেন।

৮ই মার্চ শ্রদ্ধাভাজন অতিথিদ্বয় বিমানযোগে পোর্টল্যাণ্ড যাত্রা করেন। বিমানঘাঁটিতে স্বামী অশোকানন্দজী, স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী, মিসেস স্থুলে এবং সোসাইটির অনেকগুলি ভক্ত তাঁহাদিগকে বিদায়-সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিতে উপস্থিত ছিলেন।

সিয়েট্‌ল্ কেন্দ্রের বিবরণ—স্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী নির্বাণানন্দজী সান্‌ফ্রান্সিসকো হইতে পোর্টল্যাণ্ড বেদান্তকেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া ১৩ই মার্চ সিয়েট্‌ল্ পৌছান এবং এখানকার রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটিতে ছয় দিন অবস্থান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ১২১তম জন্মতিথি (১৪ই মার্চ) তাঁহারা এখানেই উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। ১৬ই মার্চ

* এই বক্তৃতাটি উদ্বোধনের আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। —উঃ সঃ

সোসাইটিতে তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে আয়োজিত একটি অভ্যর্থনা-সভায় স্বামী মাধবানন্দজী "বর্তমান ভারতের একজন দেব-মানব" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

স্থানীয় একটি সংবাদপত্র (The Seattle Post-Intelligencer, Wednesday, March 14, 1956) মন্তব্য করিয়াছেন—

"ভারতবর্ষ হইতে দুইজন ধর্মনেতা মঙ্গলবারে সিয়েট্ল্ পৌঁছিয়াছেন—উদ্দেশ্য স্থানীয় রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রটি পরিদর্শন এবং হিন্দুধর্মের 'শান্ত বাণী' প্রচার। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর হাল্কা ধূসরবর্ণ পোষাকে তাঁহাদিগকে বেশ মর্যাদাসম্পন্ন ও স্বচ্ছন্দ দেখাইতেছিল। যে ধর্মান্দোলনের দ্বারা ভগবানের বাণী প্রতি-বৎসর বেশী বেশী লোকের নিকট পৌঁছিতেছে তাঁহারা উহার কথা বলিতেছিলেন। স্বামী মাধবানন্দের মতে, যে প্রবর্তিত ধর্মভাব আমেরিকায় কাজ করিতেছে উহা ভারতেও সক্রিয়। তিনি বলেন,—"এই ধর্মীয় চেতনা হইতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে মানসিক উত্তেজনা রহিয়াছে উহা কমিয়া আসিবে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সহিত একত্ব বোধ করেন তিনি বিশ্বের কেন্দ্র-স্বরূপ—জগতের সব সমস্যারই তিনি সমাধান।" শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গে বক্তা বলেন যে, গভীর ভগবৎ-সান্নিধ্যই তাঁহাকে সক্ষম করিয়াছিল মানুষকে বুঝিতে ও শান্তি দিতে। স্বামী মাধবানন্দ আরও বলেন, "বেদান্তের সার্বভৌম আদর্শে অনুপ্রাণিত হিন্দু কোন দলের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে যান না। খ্রীষ্টধর্ম বেদান্তেরই একটি দিক প্রকাশ করে। ঈশ্বরের প্রতি আবেগ-ময় ভালবাসার ভাব দুয়েতেই বর্তমান এবং এই ভাবসাদৃশ্যই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে সম্মিলিত করিবে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই ঘটিবে উভয়ের মিলন।"

বিবিধ সংবাদ

পূর্ববঙ্গ ও আসামে শ্রীরামকৃষ্ণ জয়ন্তী

নিম্নোক্ত কয়েকটি স্থানে জনগণের প্রভূত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২১তম জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইবার সংবাদ পাইয়া আমরা সুখী হইয়াছি এবং পরিচালকমণ্ডলীকে আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি :—

ধুম (চট্টগ্রাম) বিবেকানন্দ সমিতি, কুমিল্লা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, যশোহর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ত্রিকগড় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, ইম্ফল শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি, হোজাই (নওগাঁ) রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, আগরতলা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম।

রাজকণিকায় (উড়িষ্যা) শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব—অন্যান্য বারের ন্যায় এবারেও শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথি পূজার দিন (৩০শে ফাল্গুন, ১৩৬২) স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসব আনন্দপূর্ণ পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের যথাবিহিত পূজা, পাঠ, ভজন, কীর্তনে আশ্রম-প্রাঙ্গণ আনন্দে মুখরিত হইয়াছিল। বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্বামী জগন্নাথানন্দ মহারাজ উৎকল ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজীর নিষ্কাম কর্মযোগ ও ভক্তিবাদ সভাপ্রাঙ্গণে প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। এই উৎসব উপলক্ষ্যে সহস্রাধিক নরনারী পরিতোষ-পূর্বক শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করেন।

আজমীরে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব—আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে ৩০শে ফাল্গুন, বুধবার দিবস আশ্রমে মঙ্গল আরতি, প্রার্থনা, ভজন, বিশেষ পূজাদি, শ্রীরামকৃষ্ণ বচনামৃত পাঠ ও আলোচনা হয়। স্থানীয় সরকারী অন্ধ বিদ্যালয়ের অবাঙালী ছাত্রদিগের বাংলা কীর্তন ও হিন্দী ভজন হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ৪ঠা চৈত্র রবিবার দিবস স্থানীয় টাউন হলে এক সার্বজনীন সভার অধিবেশন হয়। সভায় নেতৃত্ব করেন মযুদা ষ্টেটের রাও শ্রীনারায়ণ সিংহ, এম-এল-এ। পণ্ডিত শ্রীকিষণলাল দ্বিবেদী, শ্রীব্রহ্মদত্ত ভার্গব ও স্বামী আদিভবানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার হৃদয়গ্রাহী ভাষণে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই জড়বাদী যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে সত্যদ্রষ্টা বৈদিক ঋষিদের পারম্পর্য রক্ষা করিয়াছেন এবং পুণ্যভূমি ভারতের আধ্যাত্মিকতা পুনরুজ্জীবিত করিয়া জগতের সমক্ষে দেশের লুপ্ত গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্রী শ্রীতুং

ঢ বাবন, ৩ াশ্বন, .৩৬৩

মুদ্রণ. বেঙ্গল অটোটাইপ কো'

উদ্বোধন

শ্রীশ্রীদুর্গাস্তোত্রম্

শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী, তর্ক-বেদান্ততীর্থ

উদ্যদ্দীপ্রদশাস্ত্রশুভ্রমহসা দিঙ্মণ্ডলং ভাসতে,
রুদ্রোপেন্দ্রশশাঙ্কপূষমরুতো যস্যাঃ স্তুতিং কুর্বতে।
গন্ধর্বাসুরযক্ষরক্ষউরগা ভীতা দিশং ভিন্দতে,
তাং দুর্গাং বরদানমঙ্গলভুবং বন্দামহে মাতরম্ ॥১॥

বিদ্যাস্বাস্থ্যধনাদিভির্গুণগণৈরত্যন্ত-হীনা যদা,
সেয়ং ভারতমাতৃকা পরবশান্মুক্তাপ্যমুক্তা তদা।
দুর্গে ত্বং পরিপূর্ণবিশ্ববিভবে পূর্ণা যথা ভারতী,
ভূমিশ্রীর্ভবতি ব্যলীকরহিতা ন্যস্যানুকম্পাং তথা ॥২॥

বিঘ্নং ঢুণ্ঢিগণেশপাদরজসা সর্বং হরন্ত্যক্রমা,
লক্ষ্ম্যান্নং প্রদদত্যকিঞ্চনজনায়াঢ্যায় চেয়ং সদা।
জ্ঞানং জ্ঞানদয়োৎসৃজন্ত্যনুগয়া স্কন্দেন রূপং মতং,
সা দুর্গা সকলাগতেহ শরদি শ্রেয়ঃ প্রদাতুং শিবা ॥৩॥

কৈলাসালয়ভাগ্-ভবেশরমণী স্নেহাদ্রিনাথাঙ্কগা,
রামস্তোৎপলপূরণপ্রকরণে কারুণ্যবর্ষাকরী।
লৌলাপং বপুরাস্থিতস্য দিতিজস্যামর্দনাভেদিনী,
মূর্তিঃ সা বিপরীতরূপভৃদপি স্থেয়াদ্ধৃদন্তর্গতা ॥৪॥

যাঁহার উদ্গত, উজ্জ্বল দশ অস্ত্রের শুভতেজে দিঙ্মণ্ডল প্রকাশিত—রুদ্র, উপেন্দ্র, চন্দ্র, আদিত্য, মরুদ্‌গণ যাঁহার স্তুতি করিতেছেন—গন্ধর্ব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, সর্পগণ যাঁহার ভয়ে দিকে দিকে পলায়ন করিতেছে, বরদানে মঙ্গলপ্রসবিনী সেই দুর্গামাতাকে বন্দনা করি।১।

মাতৃভূমি ভারত পরাধীনতাপাশ মুক্ত হইয়াও বিদ্যা, ধনবত্ত, স্বাস্থ্য প্রভৃতি গুণে অত্যন্ত অপকর্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় যেন অমুক্ত থাকিয়া গিয়াছেন। জননি, দুর্গে! আপনার বিভব বিশ্বে পরিপূর্ণ। যাহাতে ভারতভূমি বিদ্যাদি-মণ্ডিত ও রোগরহিত হয় সেইরূপ অনুকম্পা বিতরণ করুন।২।

সেই এই মঙ্গলময়ী দুর্গা, ঢুণ্ঢি গণেশের পদরজঃ দ্বারা সমস্ত বিঘ্ন যুগপৎ বিনাশ, অনুগামিনী মহালক্ষ্মী দ্বারা ধনী-দরিদ্রনির্বিশেষে সর্বদা অন্নপ্রদান, জ্ঞানদা (সরস্বতী) কর্তৃক জ্ঞানবিতরণ ও

কার্তিকের কর্তৃক রূপপ্রদান পূর্বক শ্রেয়ঃ বিতরণ করিবার জন্য এই শরৎকালে সর্বকলান্বিত হইয়া আসিয়াছেন ।৩।

যিনি কৈলাসালয়ে মহাদেবের গৃহিণী, আবার (হিমালয়ে) স্নেহরসে অদ্রিনাথের ক্রোড়ালঙ্কারিণী (কন্যা), ১০৮টি পদ্মের পূরণকালে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি কৃপাবর্ষণকারিণী, আবার মহিষ-শরীর ধারণকারী অসুরের সম্যক্ মর্দনপূর্বক ভেদকারিণী, এইরূপ নানা বিলক্ষণ ভাবের প্রকাশক হইলেও তাঁহার সেই এক কল্যাণ-মূর্তি (আমাদের) হৃদয়মন্দিরে বিদ্যমান থাকুক ।৪।

শারদা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

বোধনেরই আগে এসেছে জননী শারদ-শ্রীর মাঝে,
গগনে গহনে ভুবন আলোকি' রূপটি তাঁহার রাজে।

মন্দির পানে চেয়ে—
কেন শুধু আছ ? মা যে আসিয়াছে সারা দেশখানি ছেয়ে।
হেরিছ না তাঁর আয়ুধোজ্জ্বল দশদিকে দশপাণি ?
প্রাচীদিগন্তে হেরিছ না তাঁর হৈম-মুকুটখানি ?
উদ্ধত নদী, শান্ত স্বচ্ছ হ'লো কার ইঙ্গিতে ?
কোন্ কথা বন করে আলাপন কুলায়ের সঙ্গীতে ?
কোথা পেল তরু লাক্ষা-পরশ জবায় যা আছে ফুটে ?
উত্তোলি' গ্রীবা উত্তর হ'তে 'মরালেরা' কেন জুটে ?
কাশের কেশর দুলায় কেশরী কেন জয় গৌরবে ?
কার অঞ্চল করে ঝল-মল তারকা-খচিত নভে ?

জননী আসেনি একা—
হেরি স্থলে জলে কমলে কমলে আরো কত পদরেখা।
এসেছেন বাণী সিত জ্যোৎস্নায় নভোহংসের পরে—
রমার আশিসে শ্যাম-সম্পদে গিরিপ্রান্তর ভরে।
বহি' গণবাণী সিদ্ধি-সূচনা এসেছেন গণপতি।
বৈরীজয়ের আয়োজন করে ময়ূরকেতন রথী।
মা যদি আসেনি, বঙ্গজননী তেয়াগি গেরুয়া বাস
পট্টবসনে কেন হুলু দেয় প্রচারিয়া উল্লাস ?
গঙ্গার তীরে তীরে—
শেফালির লাজ ছড়ানো হেরিয়া বুঝেছি মা এল ফিরে ॥

কথাপ্রসঙ্গে

মা

মাতৃপূজা আসিতেছে। তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে যখন শিখি নাই তখন হইতে যাঁহাকে প্রাণে প্রাণে চিনিয়াছিলাম, ভালবাসিয়াছিলাম, বাক্য-প্রকাশের শক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়াছিলাম, তাঁহার পূজা—তাঁহার শাশ্বত মহিমার নিবিড় উপলব্ধি। মাতৃপূজা আমাদের শ্রদ্ধাভক্তির স্বাভাবিকতম, সুষ্ঠুতম অভিব্যক্তি, আমাদের হৃদয়াবেগের সার্থকতম সমাপ্তি। আমি ক্ষুদ্র হইতে পারি কিন্তু মা আমার নিকট বৃহৎ, আমি দুর্বল হইতে পারি, দীন হইতে পারি কিন্তু জননী আমার নিকট শক্তিময়ী, ঐশ্বর্যময়ী; কোথাও যখন ঠাঁই পাই না মাতৃ-অঙ্ক তখন আমার জন্য চিরদিন খালি রহিয়াছে; কেহ যখন ডাকে না, সাড়া দেয় না, মায়ের হৃদয় আমাকে ব্যাকুল আহ্বানে পরিতৃপ্ত করে, নিঃশঙ্ক করে। মা আমার নিকট এতই সহজ, অথচ এত বিপুল, এত দূর-প্রসারী, এত গভীর। মায়ের সহিত আমার সম্বন্ধের তুলনা নাই।

সেই মায়ের পূজা। পার্থিব মাকে দেবী মূর্তিতে রূপান্তরিত করিয়া পূজা—দৈবী মূর্তি গড়িয়া পার্থিব মায়েরই সকল আবেগ সকল অনুভূতি আরোপ করিয়া পূজা। মাতৃপূজায় পার্থিব ও অপার্থিব, লৌকিক ও অলৌকিক—দুয়ের অপরূপ সামঞ্জস্য। মানুষ প্রথম মানুষকে চিনে মা বলিয়া। মানুষের প্রথম আকর্ষণ, প্রথম ভালবাসা জননীকে কেন্দ্র করিয়া। সেই আকর্ষণ, সেই ভালবাসা অসীমে গিয়া পৌঁছায় যখন মানুষ ভগবানকে মা বলিয়া উপলব্ধি করে। তাই কি শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, মাতৃভাব সাধনের শেষ কথা?

তিনি আরও বলিতেন, মাতৃভাব বড় শুদ্ধ ভাব। আমরা যখন প্রথম মায়ের কোলে আসিয়াছিলাম তখন প্রকৃতির কোন আবরণ আমাদিগকে আচ্ছাদিত করে নাই; উলঙ্গ দেহে স্বচ্ছ সংস্কারমুক্ত মন লইয়া আমরা ছিলাম মাতৃ-অঙ্কে শিশু। কী আনন্দের দিন ছিল সেই শৈশবকাল! ভয় ছিল না, সঙ্কোচ ছিল না, মোহ ছিল না, অহঙ্কার ছিল না। জাগিয়া দেখিতাম মায়ের কোলে রহিয়াছি, শুইয়া পড়িতাম মায়েরই কোলে। সারাদিন ছুটাছুটি করিতে করিতে মাঝে মাঝে মায়ের কাছে আসিয়া তাঁহার হাতের স্পর্শ না পাইলে চিত্ত শান্ত হইত না। চুম্বক যেমন লোহকে আকৃষ্ট করিয়া রাখে তেমনি মায়ের মুখখানি সারা শিশুকালকে এক দুর্নিবার কল্যাণ-শক্তিতে ধরিয়া রাখিয়াছিল। শৈশব কাটিল, ধীরে ধীরে সংসারে প্রবেশ করিলাম, একের পর এক আবরণ দেহ-মনকে আচ্ছাদিত করিয়া চলিল। অনেক ধুলাকাদা মাখিলাম, অনেক স্বার্থ, অনেক বাসনা-কামনা অনেক মোহ-দম্ভ সঞ্চয় করিলাম, অনেক বন্ধনে নিজেকে বাঁধিলাম। সেই নিরাবরণ শৈশব-স্মৃতি মনে মাঝে মাঝে উঁকি দেয় বই কি! মুক্তির বাসনা জাগে বই কি! আবার কি শিশু হইতে পারিব? সংসারের সকল কালিমা মুছিয়া আবার কি নির্মল হইতে পারিব?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, পারিবে, অতি সহজে পারিবে—ঈশ্বরের মাতৃভাবকে অবলম্বন কর। সন্তান যখন মায়ের কাছে যায় তখন তাহার কোন সঙ্কোচ থাকে না, ভয় থাকে না। ঈশ্বরের নিকট নিজেকে উন্মুক্ত করিবার সহজতম উপায় তাঁহার প্রতি মাতৃদৃষ্টি। উহাতে বুকে আসে স্বতঃস্ফূর্ত সাহস, নির্ভরতা। মাতৃনামে, মাতৃচিন্তায় চিত্তের সকল কলুষ তিরোহিত হয়। ঈশ্বরকে যখন মা বলিয়া ডাকি ও ভাবি তখন নিজের দুষ্কৃত ভুলিয়া যাই, জানি—তাঁহার অনন্ত ক্ষমা আমার উপর কখনও বিমুখ হইবে না। ভগবান যখন জননী

তখন তাঁহার শাসন নাই, কর্মবিধান নাই, ঐশ্বর্য নাই, পরাক্রম নাই—তিনি শুধুই আমার স্নেহময়ী জননী, আমাকে অঙ্কে ধারণ করাই তাঁহার কাজ। আমার ভুল-ত্রুটি, আমার নিন্দিত আচরণ, দুষ্টপ্রবৃত্তি—সবই তাঁহার অনন্ত স্নেহসমুদ্রে গোষ্পদের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর। মাতৃভাব ব্যতীত এমন শুদ্ধিবিধায়ক আর কি আছে? শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিকই বলিয়াছিলেন, মাতৃভাব বড় শুদ্ধভাব।

মাতৃভাব মনুষ্যহৃদয়ের একটি বিশিষ্ট সাত্ত্বিক অনুভূতি। এই অনুভূতির মাধ্যমে শ্রীভগবানকে চিন্তা করিতে সকল মানুষেই পারে। ধর্মের গণ্ডীর কোন প্রশ্ন উঠে না। কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি নাম ও মূর্তি হিন্দুদের মাতৃপূজার একটি বিশেষ অভিব্যক্তি কিন্তু জগজ্জননীর পূজা মূর্তি না গড়িয়াও করা চলে। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন আচার্য কেশবচন্দ্র সেনকে ঈশ্বরের মাতৃভাবে উপাসনার কথা বলিতেছেন তখন নিশ্চিতই তিনি কোন বিশিষ্ট দেবীমূর্তির চিন্তা বুঝাইতেছেন না। ভাবী বিবেকানন্দ—নরেন্দ্র কালীঘরে বসিয়া যেদিন মাতৃসঙ্গীত গাহিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সুখী হইয়া বলিয়াছিলেন, নরেন কালী মেনেছে। নরেন্দ্রের আধ্যাত্মিক বিকাশে মূর্তিপূজা মানিবার প্রয়োজন ও সার্থকতা ছিল। কিন্তু আচার্য কেশবচন্দ্রকে একদিন উপাসনার সময় 'মা' 'মা' বলিয়া উঠিতে শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যে আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন উহার পটভূমি সম্পূর্ণ পৃথক। কেশব 'কালী' মানেন নাই, 'মা' অর্থাৎ ঈশ্বরে মাতৃবুদ্ধি মানিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম কেশবের সাধনজীবনে মূর্তিপূজা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও মাতৃভাবে আরাধনা ছিল সম্পূর্ণ ন্যায্য ও সার্থক। আচার্য কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহচর্যে এই মাতৃভাবের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্প্রদায়ের গুণীরা বহু অনবদ্য মাতৃসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। এইগুলিতে দেবীর কোন সাকার মূর্তির বর্ণনা নাই, কিন্তু শ্রীভগবানের মহামাতৃত্বের সার্থক সমাদর রহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই সঙ্গীতগুলি শুনিয়া সমাধিস্থ হইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি যুগাবতার হন, যুগের সার্বজনীন ধর্মবোধের আলোক দান যদি তাঁহার 'মিশন' হয়, তাহা হইলে তিনি শুধু হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গীর সবলতা সম্পাদন করিতে আসেন নাই, সকল ধর্মের নরনারীর জন্যই তিনি কিছু সার্বজনীন শিক্ষা রাখিয়া গিয়াছেন। "মাতৃভাব বড় শুদ্ধভাব"—এইরূপই একটি শিক্ষা।

আজিকার জগতের প্রধান ব্যাধি কাম ও কাঞ্চন। এই ব্যাধির প্রতীকার শ্রীরামকৃষ্ণের দুটি কথায় অভিব্যক্ত—"টাকা মাটি—মাটি টাকা" এবং "আমার সন্তান ভাব।" সাংসারিক অভ্যুদয়ের জন্য টাকা চাই, কিন্তু জাগতিক অভ্যুদয়ই জীবনের একমাত্র কাম্য মনে করিলে মনুষ্যত্বের প্রচণ্ড অবমাননা করা হয়। তাই টাকাই জীবনের সর্বস্ব নয়। টাকার উপর অনাসক্তি সাধিতে হইবে। জানিতে হইবে মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সর্বোত্তম অভিব্যক্তির তুলনায় টাকার মূল্য মাটিই। যাঁহারা এই বিচার রাখেন তাঁহারা বিত্তের দাস হন না, বিত্তসঞ্চয়ের জন্য কখনও অধর্মাচরণ করেন না। তেমনি স্ত্রীজাতির ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতা বর্তমান সমাজের গৌরবের বিষয় হইলেও তাঁহাদের প্রতি শুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে সমাজ দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। নারীর রূপযৌবন এবং দেহবিলাসই যেন উত্তরোত্তর আজ পুরুষের পূজার সামগ্রী হইয়া উঠিতেছে। ইহা নারীর পূজা নয়, অপমান। শ্রীরামকৃষ্ণ এই অপমান হইতে নারীকে রক্ষা করিতে চান, রক্ষা করিয়া মানব-সমাজে নারীর যথার্থ মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। প্রতিষ্ঠার মন্ত্র—"আমার সন্তান ভাব।" শ্রীভগবানকে মাতৃভাবে যিনি উপাসনা করেন তিনি পৃথিবীর সকল নারীর ভিতর সেই মহাজননীর ছায়া প্রতিবিম্বিত দেখেন। বলেন,—

"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

মাতৃপূজা আসিতেছে—আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত একটি বৃহৎ দায়িত্বের-স্মরণের অবসর উপস্থিত। অনেকেই আমরা জগজ্জননীর মূর্তি গড়িয়া পূজা করিব। যাহারা মূর্তিতে বিশ্বাস করি না তাহারা তাঁহার অনন্ত পবিত্রতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, করুণা, ক্ষমার অনুধ্যান করিব ; ঐ গুলির সমষ্টির নামই তো মাতৃত্ব। দুই ভাবেই মাতৃপূজা চলে। দুই ভাবের মূলে একই তত্ত্ব—শুধু প্রণালীর পার্থক্য। জগজ্জননীর ভাবনা দ্বারা এই পৃথিবীতে আমরা একটি নূতন আলোক লইয়া আসিব—নারীর প্রতি শুদ্ধ দৃষ্টি। স্বার্থ-ঈর্ষা-কামকলুষহত পৃথিবীকে সুস্থ ও সবল করিবার পক্ষে এই দৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন।

সক্রিয় বেদান্ত

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, বেদান্ত প্রখর ভাবে কার্যকরী (intensely practical)। আত্মার সর্বভূতে অবস্থান-রূপ মহৎ সত্য সমাজের বিবিধ স্তরে প্রয়োগ করা চলে—করিতে পারিলে সমাজের ভিতর একটি নূতন কল্যাণশক্তি উদ্বুদ্ধ হয়। যে চৈতন্যশক্তি দিয়া আমরা জগতের সর্বপ্রকার জ্ঞান লাভ করি, দৈনন্দিন সকল ব্যবহার সম্পাদন করি উহাই আত্মা। আমার ভিতর, তোমার ভিতর, সকল মানুষের ভিতর সেই একই সর্বব্যাপী চৈতন্য জ্বল জ্বল করিতেছেন ; কবিকল্পনা নয়, সর্বজন-প্রত্যক্ষযোগ্য সত্য। এই চৈতন্যই ভগবান। মানুষের এই বৃহত্তম সত্যকে পুঁথিতে বা শুধু ধ্যানধারণার জন্য সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইহাকে টানিয়া আনিতে হইবে। স্বামীজী বলিতেন, রাণী মদালসার মতো শিশুর কানে এই গান শুনাইতে হইবে—'নিরঞ্জনোঽসি' —"তুমি নিষ্পাপ আত্মা।" আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা, সাহিত্য, শিল্প, সমাজ-সেবা, রাষ্ট্রনীতি মানুষের বৃহৎ সত্যের উপর স্থাপন করিতে হইবে। আচার্য বিনোবা ভাবে মাদ্রাজে কয়েকটি সাম্প্রতিক বক্তৃতায় এই বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

"আমাদের মহাপুরুষেরা আমাদের এই শিখিয়েছেন যে আত্মার মধ্যে সর্বভূত এবং সর্বভূতের মধ্যে আত্মা রয়েছে, যেন আমরা আর আশেপাশের প্রাণীসমূহ একে অপরের মধ্যে মিশে রয়েছি। * * * আপনার মধ্যে আমি আর আমার মধ্যে আপনি। ইহাই বেদান্তবেদের সারাংশ। উহাই আমাদের জীবনের মূল কথা। এই ভিত্তির উপর সারা ইমারতটি তৈরী করতে হবে। শরীরের জন্য আমার খাওয়ার দরকার, কিন্তু সকলকে খাইয়ে নিজে খাব। যে আশেপাশের সকল দুঃখীর সাহায্য ক'রে তার পরে খায় তার পক্ষে খাওয়া একরকম যজ্ঞ অথবা পূজা। এইজন্য সারা সমাজকে ঐ রকম শেখাতে হবে। আমাদের সাধুসন্তেরা চমৎকার সব ভজন রচনা করে আমাদের বড় উপকার করেছেন। ঐ সব ভজন শিশুদের শেখাতে হবে। * * * শিশুদের এই শেখানো হবে যে আমরা কেবল নিজের জন্য নয়, সকলের সেবার জন্যই আমরা। * * * যে শিক্ষায় আপন ও পরের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখানো হয়, অপরের খাওয়া জুটুক না জুটুক আমার জোটা চাইই এমন শেখানো হয় সে শিক্ষা আমাদের পক্ষে কোন কাজেরই নয়।"

বিজ্ঞানের অগ্রগতি ক্রমশই জগৎ ও জীবনের একত্ব প্রমাণ করিবার দিকে চলিয়াছে। স্বামীজী বলিতেন, বিজ্ঞানের সহিত বেদান্ত-সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ নাই—বরং বেদান্ত বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ করিবে। বিনোবাজী বলিতেছেন—

"অনেক লোক এরকম ধারণা পোষণ করেন যে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে ধর্মভাব নষ্ট হয়ে যাবে। আমি বলতে চাই যে এরকম যাঁদের চিন্তাধারা তাঁদের ধর্মে কোন শ্রদ্ধা নেই। প্রসারিত চিন্তাধারাকে ধর্ম আর সঙ্কীর্ণ চিন্তাধারাকে অধর্ম বলা যায়। বৈজ্ঞানিক যুগে ব্যাপক ভাবনাই টিকে থাকবে, সঙ্কীর্ণ ভাবনা নয়। এই জন্যই যখন বিজ্ঞান এত বেড়ে যাচ্ছে তখন অধর্ম টিকতে পারে না, ধর্মই টিকে থাকবে।

'আমার বাড়ী' এ রকম কথা বাদ দিন। এ আমার বাড়ী, শুধু এই এক ঘরই আমার নয়। অন্য সব ঘরও আমারই। এ ছাড়া বেদান্ত আর কি হতে পারে? বিজ্ঞানও এ ছাড়া আর কি বলছে? ভবিষ্যৎ যুগ, ধর্মের প্রকৃত অর্থকে অতি ভালভাবেই মর্যাদা দিবে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মগুলিতে যে মূর্খতার অংশ বিদ্যমান

আছে তা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যাবে। প্রতি ধর্মে যা নির্মল আছে তা উজ্জ্বলরূপে প্রকট হবে।"

মহতের স্মরণে

রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়ের পরলোক গমনে বঙ্গমাতা তথা ভারতজননী একজন শ্রেষ্ঠ কৃতী সন্তান হারাইলেন। যে সকল সদ্‌গুণ ভারতবর্ষের চারিত্রিক আদর্শে বরণীয় তাহাদের অনেকগুলিই আশ্চর্য সামঞ্জস্যে তাঁহার ভিতর দেখা গিয়াছিল; তাই তিনি সকল ধর্মের সকল স্তরের নরনারীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। সত্যই তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানতাপস—নিরভিমান, অনাড়ম্বর, উদারচেতা, পরদুঃখকাতর, গভীর ঈশ্বরবিশ্বাসী। জীবনের অধিকাংশ কাল শিক্ষাব্রত লইয়া কাটাইয়াছেন, অসাধারণ পারদর্শিতার সহিত উহা উদ্‌যাপন করিয়াছেন। তিনি রাজনীতিও করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক জীবন ছিল সর্বপ্রকার পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত। জীবনসন্ধ্যায় তাঁহার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা তিনি নিয়োগ করিয়াছিলেন নিঃস্বার্থ পরোপকারে। শ্রীভগবান এই পুণ্যাত্মার চিরশান্তি বিধান করুন, ইহাই আমাদের হৃদয়ের একান্ত প্রার্থনা।

ধর্মের অপব্যবহার

পনর বৎসর পূর্বে প্রকাশিত আমেরিকান লেখকের একটি বইএর উক্তিবিশেষ লইয়া সাম্প্রদায়িকভাবাপন্ন এক শ্রেণীর মুসলমানরা ভারতের নানা স্থানে কিছুদিন ধরিয়া যে হৈ হল্লা করিলেন তাহা বিশেষ পরিতাপের বিষয়। জগদ্বিখ্যাত ধর্মগুরুদের সম্বন্ধে আক্রমণাত্মক উক্তি অন্যায় সন্দেহ নাই। বইটিতে পয়গম্বর মহম্মদ সম্বন্ধে আমেরিকান লেখকের বিবৃতি যে আপত্তিকর তাহা পুস্তকের ভারতীয় সংস্করণের সাধারণ সম্পাদক রাজ্যপাল শ্রী কে এম মুন্সী এবং প্রধান মন্ত্রী নেহরুও স্বীকার করিয়াছেন। মুন্সীজী অনুতাপও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আন্দোলনকারীরা অত্যন্ত অশোভনভাবে যে কার্যকলাপ করিয়াছেন তাহা ভারতীয় নাগরিক হিসাবে তাঁহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে কলঙ্কপাত তো করিয়াছেই, পবিত্র ইসলাম ধর্মেরও গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। ধর্মের সম্মান যাঁহারা রক্ষা করিতে ব্যগ্র তাঁহাদের মধ্যে বিদ্বেষ, ঘৃণা, অসহিষ্ণুতা থাকা উচিত নয়। ঈশ্বরের দূত যখন মানবদেহ ধারণ করিয়া আসেন তখন মানুষের প্রশংসা-নিন্দা দুইই তাঁহাদের কাছে উপস্থিত হয়। তাঁহারা অবিচলিত ভাবে উহা সহ্য করেন। সকল প্রেরিত পুরুষই যেমন ভক্তের স্তুতি পাইয়াছেন তেমনি সমালোচকের নিন্দাও ভোগ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিন্দাস্তুতির উর্ধ্বে। আমরা জানি ভারতবর্ষে এমন অনেক মুসলমান আছেন যাঁহারা স্বসম্প্রদায়ের একশ্রেণীর লোকের এই সাম্প্রতিক গুণ্ডামিতে বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। ধার্মিক লোকের চরিত্রে যে পরমতসহিষ্ণুতাই প্রধানতম গুণ, কি হিন্দু কি মুসলমান কি খ্রীষ্টান কি পারসীক সকলকেই সর্বদা ইহা মনে রাখিয়া চলিতে হইবে। তবেই এই বহুধর্মের, বহুমতের আবাসভূমি ভারতবর্ষে একতা ও শান্তি থাকিবে।

দুই পাশে

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের বিরাট চওড়া রাস্তা দক্ষিণ হইতে উত্তরে বাহির হইয়া চলিয়াছে। যেখানে একদিন ঘন-বসতি বস্তী, ছোট বড় শত শত জীর্ণ অট্টালিকা, আঁকা বাঁকা গলি উপ-গলি নানা ভঙ্গীতে ছড়াইয়া ছিল আজ সেখানে বিস্তীর্ণ ফাঁকা ময়দান। মাঝখান দিয়া প্রশস্ত রাজপথ নির্মিত হইতেছে; দু পাশের উঁচু নীচু জমি এখনও শূন্য, যতদিন না বিত্তবানরা অগ্নিমূল্যে এক, দুই বা চার কাঠা করিয়া জমি কিনিয়া লইয়া বিরাট সৌধশ্রেণী উঠাইতেছেন ততদিন পর্যন্ত এইরূপই শূন্য থাকিবে।

সমীর বাবু বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, দুপাশের শূন্য ফাঁকা জায়গা দেখিয়া দেখিয়া চলিয়াছেন।

নির্মীয়মাণ রাস্তার দুপাশে দুটি দৃশ্য চোখে পড়িল। একদিকে ছাপড়া, জৌনপুর, বালিয়া জেলার দীর্ঘদেহ গোয়ালারা ভাঙ্গা বাড়ীগুলির ছড়ানো রাবিশ সরাইয়া, খানাখন্দর ভরাট করিয়া গরুমহিষের অস্থায়ী আস্তানা তৈরী করিয়া লইয়াছে; রাস্তার আশেপাশে আশ্রয়লাভে অভ্যস্ত যাযাবর পশুগুলি খোঁটায় দড়িবাঁধা হইয়া গভীর আরামে বিচালী চিবাইতেছে। তাহাদের অভিভাবকগণ কাছে বসিয়া খৈনি খাইতেছে, সুখদুঃখের কথা বলিতেছে, দুধের হিসাব করিতেছে।

রাস্তার অপর পার্শ্বে পাড়ার বাঙ্গালী যুবকরা দুটি ব্যাডমিণ্টনের কোর্ট বসাইয়াছে। তাহাদিগকেও মেহনত করিয়া জমি সমান করিতে হইয়াছে; সতর্ক দৃষ্টিতে রাখিতে হইতেছে এই সমান-করা জমিটি তাহাদের অনুপস্থিতিতে অপর কোন দল খাটালের জন্য না দখল করিয়া বসে! খেলা চলিতেছে। খেলুড়েরা সকলেই যে স্কুল কলেজের ছেলে তাহা নয়, আফিসের চাকুরেও আছে কেহ কেহ। দর্শকও মন্দ জমে নাই।

ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আলোবাতাসহীন সরু নোংরা গলির একখানি বা দুখানি স্যাঁতস্যাঁতে ঘর লইয়া কলিকাতার অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের গৃহ। সেই গৃহের ছেলেমেয়েরা ইমপ্রুভমেণ্টট্রাস্টের দৌলতে দুচার দিন যদি ফাঁকা জায়গায় একটু খেলাধুলার সুযোগ পায় তাহা তো আনন্দেরই বিষয়। তথাপি সমীর বাবু যুগপৎ দুটি দৃশ্য দেখিয়া একটু তাত্ত্বিক চিন্তা না করিয়া পারিলেন না। দুটি দৃশ্যের ভিতর তিনি যেন বাংলার বাসিন্দা—দুই মানবগোষ্ঠীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইলেন।

এক গোষ্ঠী জীবনসংগ্রাম সম্বন্ধে শুধু সচেতন নয়, ঐ সংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য যে কোন সুযোগ গ্রহণ করিতে দিবারাত্র তৎপর। শুধু শরীরের শক্তি নয়, মনের অদম্য উৎসাহ লইয়া তাহারা আগাইয়া চলিয়াছে। তাহাদের নিকট সুস্থ দেহে বাঁচিয়া থাকা এবং সংসার প্রতিপালন করা সর্বপ্রথম কর্তব্য। আভিজাত্য, লেখাপড়া, 'সংস্কৃতি', আমোদপ্রমোদ—এসব পরের কথা। এই গোষ্ঠী কখনো অনাহারে মরিবে না, স্ত্রীপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ভিক্ষা করিবে না। স্বাবলম্বন, কষ্টসহিষ্ণুতা, উদ্যম, অধ্যবসায় এবং গোষ্ঠীর একতা ইহাদের প্রধান মূলধন। এই সম্পদ যাহাদের নাই তাহারা জীবন-সংগ্রামে ইহাদের কাছে যে ক্রমশই হটিয়া যাইতে বাধ্য হইবে, ইহা তো প্রকৃতিরই নিয়ম।

আর এক গোষ্ঠীর জীবন সংগ্রামের গুটিকতক কৌশল মাত্র জানা। সেই পরিধির বাহিরে যুদ্ধ করিতে হইলে তাহারা শুইয়া পড়ে। তাহাদের উৎসাহ আছে কিন্তু জীবনসংগ্রামে ইহা পুরাপুরি ব্যয় করিতে তাহারা নারাজ। সামাজিক গৌরব, স্কুল কলেজের ছাপ, সাংস্কৃতিক ব্যাপৃতি, খেলাধুলা—এগুলি তাহাদের নিকট বাঁচিয়া থাকার অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান। এই গুলির জন্য তাহাদের বহু শক্তি ব্যয় হয়, জীবনসংগ্রামের জন্য যাহা থাকে তাহা বলবানদের সহিত প্রতিযোগিতার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। বুদ্ধিবৃত্তি ইহাদের সতেজ বলিয়া যে যাহার নিজের পথে চলিতেই ইহাদের বেশী ঝোঁক; দলগত অনৈক্য এই গোষ্ঠীর একটি বিষম দুর্বলতা—অভিশাপও বলা যাইতে পারে। জীবনধারণের দিক দিয়া এই দ্বিতীয় গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

সমীর বাবু ভাবিতে লাগিলেন, দ্বিতীয় গোষ্ঠীর ছোটরা ব্যাডমিণ্টনের কোর্ট ফাঁদে ফাঁদুক, কিন্তু কবে তাহাদের বড়রা দলে দলে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের ফাঁকা জায়গায় দ্বিতীয় গোষ্ঠীর লোকদের মতো খাটাল গড়িয়া তুলিবে?

জননীসীতাস্তুতিঃ*

(পঞ্চমাতৃকাস্তুত্যন্তর্গতা)

ডক্টর-শ্রীযতীন্দ্রবিমল-চৌধুরী-বিরচিতা

রঘুনাথ-হৃদানন্দ-চন্দন-জুষ্ট-সৌরভাম্ ।
নৌমি সীতাং জগদ্বন্দ্যাং মুনিমানসমোহিনীম্ ॥
ধরণীসম্ভবাং দেবীং ধরিত্রীপবিত্রীকরাম্ ।
লাবণ্যসৌভাগ্যসীমাং সর্বজনশুভংকরাম্ ॥
জননি কল্যাণকারিণি নৌমি ত্বাম্ ॥১

পতিতপাবনী ত্বং হি বিশ্বকলুষনাশিনী ।
অগ্নিপরীক্ষণং কুতঃ মাতরগ্নিস্বরূপিণি ॥
পাতালপ্রবেশো ন হি ; সুতমানসমন্দিরে ।
মাতস্তে নিত্যসংস্থানম্ আশীর্দেহি ক্ষেমংকরে ॥
জননি সন্তাপহারিণি নৌমি ত্বাম্ ॥২

পঞ্চবটীবিহারিণীং পঞ্চক্লেশঘাতিনীম্ ।
অশোককাননদ্যুতিম্ অশোকামৃতদায়িনীম্ ?
জননি যতীন্দ্রবিমলো নৌতি ত্বাম্ ।
চিরমঙ্গলময়ি যতীন্দ্রো নৌতি ত্বাম্ ॥৩

পঞ্চ-মাতৃকা-স্তুতির অন্তর্গত জননী সীতার স্তুতি

ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের আনন্দচন্দনে চর্চিতা হয়ে যিনি দিগ্‌দিগন্তর নিরন্তর সুরভিত করছেন, বিশ্ববন্দ্যা মুনিগণের মনোমোহিনী সেই জননী সীতাদেবীকে (বারংবার) প্রণতি নিবেদন করি। এই দেবী বসুন্ধরাসুতা হয়েও বসুন্ধরা-পবিত্রকারিণী, অসীম সৌন্দর্য-মাধুর্যশালিনী ও সর্বজনের শুভদায়িনী। কল্যাণকারিণি জননি ! তোমাকেই বারংবার প্রণাম। ১

তুমিই পতিতোদ্ধারিণী বিশ্বপাপ-বিনাশিনী। জননি ! তুমিই অগ্নিস্বরূপিণী ; তোমারই আবার অগ্নিপরীক্ষা ! পাতাল-প্রবেশও তো তুমি করনি ; প্রবেশ করেছ কেবল তোমার সন্তানদের মানসমন্দিরেই মাত্র—তুমি, মাতঃ ! সেখানেই চিরস্থায়িনী হয়ে রয়েছ। মঙ্গলকারিণি ! আমাদের নিত্য আশীর্বাদ কর। সন্তাপহারিণি জননি ! তোমাকেই বারংবার প্রণাম। ২

পঞ্চবটীবিহারিণী তুমিই (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ রূপ) পঞ্চক্লেশ-হারিণী। অশোক-কাননের দীপ্তি-স্বরূপা তুমিই আনন্দামৃত-দায়িনী। জননি ! তোমাকেই যতীন্দ্রবিমল বারংবার প্রণতি নিবেদন করছে। চিরশুভময়ী ! তোমাকেই যতীন্দ্রের বারংবার প্রণাম। ৩

* সর্বপ্রথম "মাতৃলীলা" (আগমনী) কথকথায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট্ অব কালচারে গীত।

'শরৎকালে মহাপূজা'

স্বামী ক্ষমানন্দ

প্রকৃতির শ্যামলিমা, প্রস্ফুটিত শেফালিকার বর্ষণ-প্রাচুর্য, নির্মল নীলিমায় পুলকিত শরতের প্রতিচ্ছবি এবং ইহাদেরই মঙ্গল-সম্ভারে সুসজ্জিত পূজাপ্রাঙ্গণ জগন্মাতার আগমনবার্তায় মুখরিত। ক্ষণস্থায়ী হইলেও, দুঃখ-বেদনার স্তিমিত হৃদয়াবেগ অপূর্ব রসাবেশে পরিপূর্ণ। আনন্দময়ীর আগমনী-গীতিসঞ্জাত আশার উন্মাদনা সন্তানবৃন্দকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে।

সর্বাধিষ্ঠাত্রীরূপে তিনি নিত্যা ও অব্যক্তা, আবার জড় ও অন্তর্জগতে থাকিয়া সকলের নিয়মন-কারিণী এবং যুগে যুগে কল্যাণমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সন্তান-সংরক্ষণ ও অশুভ বিমর্দনের কথা সর্বশাস্ত্র প্রসিদ্ধ। এই মহাশক্তির আরাধনার উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে যাইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে—শক্তিই জগতের মূলাধার। তিনিই মহামায়া, জগৎকে মুগ্ধ করিয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন। তিনি পথ না ছাড়িলে সচ্চিদানন্দকে লাভ করা যায় না। সেই আদ্যাশক্তির ভিতর বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই আছে; অবিদ্যা মুগ্ধ করে এবং বিদ্যা—যাহা ঈশ্বর পথে লইয়া যায়। অবিদ্যাকে প্রসন্ন করিতে হইবে, তাই শক্তির পূজাপদ্ধতি।

মহামায়ার স্বরূপজিজ্ঞাসু মহারাজ সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে মহর্ষি মেধা বলিয়াছিলেন—দেবী ভগবতী মহামায়া বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন দৃঢ়চেতাদের মন সবলে আকর্ষণ করিয়া মোহাবৃত করেন, সুতরাং অবিবেকীদের কা কথা! (চণ্ডী)। এই জন্যই নানা কিংবদন্তীতে ও শাস্ত্রাদি মুখে সকলকে ভগবতীর উপাসনায় প্রবর্তিত হইবার উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়। শরৎকালেই দেবী বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই শুভাবির্ভাবের স্মরণে প্রতিবৎসর মহোৎসবের আয়োজন হইয়া থাকে এবং ইহাই বঙ্গে ও বৃহত্তর বঙ্গে শারদীয়া মহাপূজা এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে নবরাত্র উৎসব নামে খ্যাত।

যে সকল পুরাণে দুর্গাপূজার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে বৃহন্নন্দিকেশ্বর (অধুনা অপ্রাপ্য), কালিকাপুরাণ ও দেবীপুরাণ অন্যতম। সর্বত্রই শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধনের পরিপ্রেক্ষিতে পূজাকাল ও বিধানাদি লিখিত হইয়াছে। মূল রামায়ণে ইহার সমর্থন না থাকিলেও দেবীভাগবত, মহাপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণাদি গ্রন্থে আমরা ইহার ইতিবৃত্ত পাইয়া থাকি। ইহা ছাড়া দুর্গাপূজা সম্বন্ধে অনেকগুলি মূল নিবন্ধও প্রসিদ্ধ আছে, যথা,—রঘুনন্দনকৃত দুর্গোৎসবতত্ত্ব, শূলপাণির দুর্গোৎসব বিবেক, মৈথিল পণ্ডিত বিদ্যাপতি ও বাচস্পতিমিশ্রের যথাক্রমে দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী ও দুর্গোৎসব প্রকরণ এবং কামরূপীয় (আসাম) দুর্গোৎসব প্রকরণ। এই সকল নিবন্ধকার নানা শাস্ত্রযুক্তি সহায়ে অতি কৃতিত্বের সহিত নিজ নিজ গ্রন্থে দুর্গোৎসবে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ক্রম ও বিধি লিখিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, নতুবা কেবল পুরাণাদিতে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর সহিত কার্যক্রম নির্ণয় করা দুরূহ হইয়া পড়িত।

দেবীর এই শরৎকালীন শুভাগমনের সহিত জননী-দুহিতার মায়িক সম্পর্ক সংযুক্ত হইয়া ইহাকে অপূর্ব ভাবসম্পদে-মণ্ডিত ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। নগ-রাজরাণী স্বীয় কন্যা উমাকে শিবগেহিনীরূপে দেখিয়া অপার আনন্দের অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই স্নেহপুত্তলীকে সদা সন্নিকটে পাইবার প্রবল প্রেরণায় স্বতঃই মাতার অন্তর গভীর বেদনায় ভরিয়া উঠিত। স্বামিগৃহ হইতে কন্যাকে বৎসরান্তে পিত্রালয়ে ফিরাইয়া আনিবার কাহিনী

মেনকার খেদোক্তিতে এবং আগমনী গানে এত সরস হইয়া উঠিয়াছে যে উহা একান্ত বাস্তববাদীর নীরস মনকেও মোহিত করে।

আমরা এবার দেবীর বিভিন্ন আবির্ভাব সংক্রান্ত পৌরাণিক কয়েকটি কাহিনীর উল্লেখ করিব। অত্যাচারী দুর্গমাসুরের বেদবিধি অধিকারে হোমানল-প্রদীপ্ত এবং সামগানে মুখরিত তপোবনগুলিতে বৈদিক অনুষ্ঠানসমূহ বন্ধ হইল এবং ইহাদের অনস্থশীলনের প্রতিক্রিয়া প্রতি সমাজ-শরীরে প্রকাশ করিয়া মানুষকে নীতিজ্ঞানহীন ও অলস করিয়া তুলিল, বর্ষণ-বিধুর ঋতুর কঠোর প্রভাব দৃষ্ট হইল প্রতিটি কর্ষণ-বিহীন শস্যক্ষেত্রে। শ্যামলা ধরণী ধারণ করিল ধুসর মরুর ভয়াল আকার। বুভুক্ষু নরনারীর করুণ-ক্রন্দনে এবং কল্যাণকামী ঋষিবৃন্দের সকাতর প্রার্থনায় অনন্ত চক্ষুষ্মতী দেবী শতাক্ষী আবির্ভূতা হইলেন শরতের শুভ্রাকাশে। অগণন চক্ষে নবরাত্রব্যাপী তাঁহার করুণাশ্রু বর্ষাধারায় বিগলিত হইয়া জীবধরিত্রীকে পুনরায় প্রাণচঞ্চল করিয়া তুলিল। যমদন্তস্বরূপ বা মৃত্যুভয়পীড়িত এই ঋতুতে মহামারীর প্রকোপ প্রতিহত করিয়া দেবীর এই অপ্রাকৃত পুণ্যদর্শন সকলকে অকালমৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ করে বলিয়াই এই অকাল পূজার প্রবর্তন। কোন্ স্মরণাতীতকাল হইতে ইহার যে প্রচলন হইয়াছিল কে তাহা বলিতে পারে, তবে লিপিবদ্ধ কাহিনী অনুসারে ইহা যে বহু পরবর্তী-কালের তাহা নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে।

মহিষমর্দিনীরূপে দেবীর তিনকল্পে তিনবার শরৎকালে আবির্ভাবের কাহিনী প্রচলিত। প্রথম কল্পে—শিবের বরে রম্ভাসুরের মহিষ নামে এক অমিতবলশালী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। বড় হইয়া ক্ষমতার মত্ততায় মহিষাসুর আস্তিক্যবুদ্ধি ভুলিয়া অত্যাচারী হইল এবং দেবগণকে স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিল। তাঁহাদের স্বর্গবিচ্যুতিতে লোক-সমাজে নানা বিপর্যয় দেখা দিল। সকলের সম্মিলিত প্রার্থনায় আবির্ভূতা হইলেন রণরঙ্গিণী অষ্টাদশ ভুজা, উগ্রচণ্ডা। দেবী উগ্রচণ্ডা আশ্বিনের মহানবমীতে মহিষাসুর নিধন করিলেন।

দ্বিতীয় কল্পে—অত্যাচারিতের করুণ-ক্রন্দনে জগন্মাতার পুনরাগমন হইল ষোড়শভুজা মূর্তিতে চারুশোভনা ভদ্রকালীরূপে। এই মূর্তিতে আর একবার আমরা তাঁহার দর্শন পাই দক্ষ যজ্ঞক্ষেত্রে (হিমালয়ের সানুদেশে কনখলে); উহা যেমনই মর্মস্পর্শী তেমনই ভয়ঙ্কর। শিবপ্রাণা সতী পতি-নিন্দায় গতাসু হইলেন। ধ্যানস্থ শিবের স্তিমিত-চক্ষে জ্বলিয়া উঠিল করালাগ্নি—রুদ্রবিষাণের প্রলয়ছন্দে আবির্ভূতা হইলেন কোটিযোগিনী-সমাবৃতা নৃত্যপরা ভদ্রকালী (দেবী ভাগবত, ৩।২৭।৮-১০)। তাই তাঁহার অন্য নাম দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী। আজও সেই দিব্যকাহিনীর স্মরণে বহু পূজাপ্রাঙ্গণে ধ্বনিত হয়—ওঁ দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি-পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ হ্রীঁ ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ—(যিনি) ওঁকাররূপিণী ও দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী (তিনি) কোটি যোগিনীবৃন্দের দ্বারা পরিবৃতা (হইয়া) প্রলয়ঙ্করী মূর্তিতে ভদ্রকালীর রূপ পরিগ্রহ করিয়া-ছিলেন, তিনিই পরব্রহ্মরূপা মহামায়া দুর্গা (তাঁহাকে) প্রণিপাত করি।

তৃতীয় কল্পের আবির্ভাব হিমালয়স্থিত মহামুনি কাত্যায়নের নিভৃত আশ্রমপ্রাঙ্গণে। আবার মহিষাসুর জন্মগ্রহণ করিয়াছে। দেবতাগণ তাহার অত্যাচারে জর্জরিত। মহিষাসুরের বধোপায় নির্ধারণে সম্মিলিত দেববৃন্দের সরোষ ললাটে ফুটিয়া উঠিল বহ্নিদহন। দেখিতে দেখিতে সেই উজ্জ্বল প্রভায় দশদিক আলোকিত করিয়া ধীরে ধীরে রূপান্বিত হইল এক মহামহিমময়ী দেবী মূর্তিতে। মহর্ষির তপঃশক্তিতে তিনি অমিত দীপ্তিময়ী ও সমূহ দেবতার আয়ুধাভরণে সুসজ্জিতা হইয়া আবির্ভূতা হইলেন মহিষাসুরনিধনক্ষমা দশপ্রহরণা দুর্গা মহামুনি কাত্যায়নের আশ্রমে এবং তাঁহার

দুহিতৃত্ব স্বীকারে তিনি বিশ্ববন্দিতা হইলেন কাত্যায়নী নামে। কাত্যায়নই সর্বাগ্রে নিবেদন করিলেন এই কন্যারূপিণী মাতৃমূর্তিকে তাঁহার অন্তরের পূজা ও প্রণতি। কন্যার পরাকাষ্ঠা মাতৃত্বে, তাই কন্যারূপিণী জগদম্বার আরাধনায় ইহাই মূল সূত্র। তাই বাংলার শারদীয়া মহাপূজা এই যুগ্ম ভাবাশ্রয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে। মনে হয় এই বিবরণের পটভূমিকা হইতে ইহার উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, এবং সেই জন্যই সম্ভবতঃ কুমারী পূজা ইহার অন্যতম অঙ্গরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। সৌম্যাঽসৌম্যতরা—ভক্তপরিপালিনীরূপে তিনি যেমন সৌম্যা আবার দৈত্যদিগের নিকট ততোধিক রুদ্ররূপিণী-অসৌম্যা। পূর্বতন ভীষণ রূপসমূহের সুসংস্কৃত এক অনুপম মাতৃমূর্তি—কঠোর ও কোমল ভাবের বিগলিত করুণাধারা। অসুরকে বধ করিতেছেন, হিংসার লেশমাত্র নাই, সদা সুপ্রসন্ন। শাসনে কঠোরা হইলেও অন্তর তাঁহার স্নেহশীতল।

ত্রিকালোক্তা দেবী উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী ও কাত্যায়নী মহাষ্টমীতে আবির্ভূতা হইয়া মহানবমীতে মহিষাসুরকে বার বার নিধন করিলেও, শেষোক্ত দশভূজা দুর্গারূপে তাঁহার পূজার সমধিক প্রচলন। কোন কোন স্থানে অন্য দুইটি মূর্তি নির্মাণ করিয়াও পূজা করিতে দেখা যায়। মহিষাসুরবধ বৃত্তান্তের ত্রিপুণ্যকৃৎ এ শুভ মহাষ্টমী অশেষ কল্যাণ ও আনন্দের উৎস বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহার এই অসুরবিনাশনের কীর্তি ভক্তিপূর্বক পাঠ বা শ্রবণ করিলে সকলে নিষ্পাপ ও বিপন্মুক্ত হয় ইহা স্বয়ং তাঁহারই স্বীয়ারোক্তি।

পুরাণান্তরে (দেবীপুরাণ, ২-২০ অধ্যায়) দেখা যায় আশ্বিনেরই মহানবমীতে তিনি ঘোরাসুর নিধনে নিযুক্ত হইয়াছেন। স্মৃতি-নিবন্ধকার রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার বিখ্যাত দুর্গোৎসব গ্রন্থে এই পুরাণের উক্তি উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন যে—দেবী পুরাণীয়েনাপি ষষ্ঠীতো নবমী পর্যন্তং পূজয়েৎ। তাই মনে হয় আশ্বিনের ষষ্ঠী তিথিতেই জগদ্বাসী পুনরায় তাঁহার দর্শন পাইয়া ধন্য হইল—এবার কেন্দ্র বিন্ধ্যাচল। অসুরাধিপতি দুন্দুভির অমিত বিক্রম ও নিষ্কলঙ্ক পৌরুষের সহিত, তাহার—তপস্যাপ্রসূত আত্মবিশ্বাস সংযুক্ত হইয়া তাহাকে সমগ্র জগতে একাধিপত্য স্থাপনে সমর্থ করিয়াছিল। একদা কৈলাস ভ্রমণ কালে সে আসুরিক বৃত্তির প্রভাবে পথভ্রষ্ট হইল। শিবাবাসে উপস্থিত হইয়া দেবীর দুর্লভ দর্শন পাইয়া সে উহার মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিল না এবং এই গর্হিত আচরণের ফলে সে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিল। অসুরেরা সর্বদাই উন্নতিকামী ও পরিশ্রমশীল। আবার সেই কঠোর তপশ্চরণ ও ভগবদ্দর্শন এবং তাঁহার বরে সর্বলোক জয় করিয়া তাহার স্পর্ধা উচ্চ সীমা অতিক্রম করিল। বিন্ধ্যবাসিনী ঘোরাসুর নিধনে আবির্ভূতা হইলেন অমিত সুন্দরী ক্রীড়ারতা বালিকারূপে। ভোগসামগ্রীর প্রাচুর্য ও সুপরামর্শের অভাবে আত্মবিস্মৃত অসুর দেবীকে ধরিবার জন্য লালায়িত হইলে সে অচিরে সসৈন্য নিহত হইল মহানবমীতে।

বীর্যবান কশ্যপাত্মজ শুম্ভ, নিশুম্ভ ও নমুচি। ইন্দ্রবজ্রে কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিধন শ্রবণে ব্যথিত ভ্রাতৃদ্বয় বৈরশুদ্ধির জন্য নিযুক্ত হইল কঠোর তপস্যায়। সেই পুরাতন কাহিনী। শক্তিমান অসুরদ্বয়ের অত্যুগ্র অত্যাচারের প্রমত্ত প্রতাপে এবং অত্যাচারিতের ভক্তিবিনম্র স্তুতিগানে পরমপাবনীকে লীলাচঞ্চল করিল। আবার তাঁহাকে দেখিতেছি হিমালয়ের ক্রোড়ে মুনি মাতঙ্গের বল্লরীবিজড়িত আশ্রমকুটিরের স্নিগ্ধ প্রাঙ্গণে, রণাঙ্গনের কোলাহল-বিবর্জিত শান্ত পরিবেশে অনিন্দ্যশ্রী দশভূজা দেবী কৌশিকী।

পূর্বোক্ত আখ্যায়িকাসমূহের সাহায্যে আমরা দেখিয়াছি যে মহিষাসুর, ঘোরাসুর এবং শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি অসুরগণের সংহারের নিমিত্ত দেবী দুর্গা

দশপ্রহরণা হইয়া শরতের আশ্বিনে উদ্ভূতা হইয়াছিলেন। কৈলাস তাঁহার নিত্য নিবাসস্থল এবং মূর্তি পরিগ্রহ করিলেন হিমালয়স্থিত কাত্যায়ন ও মাতঙ্গের আশ্রমে এবং বিন্ধ্যাচলে। তাই আজও বোধনপূজার পুণ্য প্রদোষে তাঁহাকে আহ্বান করা হয়—আবাহয়াম্যহং দেবীং মৃন্ময়ে শ্রীফলেঽপি বা, কৈলাসশিখরাদ্ দেবি বিন্ধ্যাদ্রের্হিমপর্বতাৎ—ইত্যাদি। কৈলাসশিখরে যে মূর্তিতে তুমি নিত্য বিরাজিতা, মহিষাসুর ও ঘোরাসুর বধার্থ যে দশভুজারূপে কাত্যায়নাশ্রমে ও বিন্ধ্যপর্বতে আবির্ভূতা হইয়াছিলে সেই মূর্তিতে তুমি এই বিল্বশাখা ও মৃন্ময়ী মূর্তিতে আগমন কর। শরৎঋতু-সম্ভবা বলিয়াই তাঁহার অন্যতম নাম শারদা। ঘটনা পরম্পরার বিচিত্র সমাবেশ দৃষ্ট হইলেও আশ্বিন মাসে যে দশভুজার জন্মাবির্ভাব হইয়াছিল উহাতে কোন মতদ্বৈধ নাই।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে (১২।১২) 'শরৎকালে মহাপূজা' এই বাক্যে ইহা প্রতীয়মান হয় যে শারদীয়া পূজার দ্বারা সকলেই সর্বপ্রকার ত্রিতাপনাশে সমর্থ হয় এবং কোন কোন ভাগ্যবান মূর্তিমতী ব্রহ্মবিদ্যা দুর্গার আরাধনা করিয়া তাঁহার কৃপায় এই দুর্লভ ব্রহ্মানুভূতিও লাভ করিয়া থাকেন। রাজ্যহৃত রাজা সুরথ এবং স্বজনপরিত্যক্ত সমাধি মহর্ষি মেধার নিকট দেবীর মহাত্ম্য শ্রবণান্তর তাঁহারই আশ্রমসংলগ্ন নদীতীরে দেবীর মৃন্ময়মূর্তি নির্মাণ করিয়া কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন এবং ত্রিবৎসরান্তরে জগদম্বিকার দর্শনলাভে ধন্য হইয়া নৃপতি ফিরিয়া পাইলেন রাজ্য এবং মুমুক্ষু সাধক সমাধি সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনের অধিকারী হইলেন।

"শক্তিপূজার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় বিশেষতঃ কলিতে"—স্বামী সারদানন্দজী বলিতেছেন, "প্রত্যক্ষ দেখিতেছি মানুষ জড় ও মনোরাজ্যে যাহা কিছু অধিকার লাভ করিয়াছে সব শক্তি আরাধনার ফলে। ···একালের উপাসকদের এ কথা প্রত্যক্ষানুভূত। তবে অঙ্গহীন হইলে বা বিধি ও শ্রদ্ধা বিরহিত হইলে পূজার সম্পূর্ণ ফল লাভ অসম্ভব এবং সময়ে সময়ে বিপরীত ফলও ঘটিয়া থাকে।" দেশে শক্তিপূজার বহুল প্রচার সত্ত্বেও এই মর্মন্তুদ দুর্দশার মূলে পাই তাঁহার এই পূর্বোক্ত বাণী। কেহ কেহ বলেন যিনি জগজ্জননী, তাঁহাকে যে যে রূপেই ডাকিবে, তিনি কি তাহাতে সাড়া দিবেন না? —সকলে সমানভাবে ডাকিতে পারে না সত্য; কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারেন যে, শিশুর অস্ফুট স্বর কাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য উত্থিত হইতেছে, সরল শিশুর মাতৃনির্ভরতাই তাহার একমাত্র সম্বল কিন্তু এ ক্ষেত্রে কি ইহা বর্তমান। যদি দেবীপূজায় আমাদের নিষ্ঠা নির্ভরতা কোন একটিও না থাকে, তাহা হইলে ইহা কি করিয়াই বা সম্ভব হয়। 'বাঙ্গালীর পূজা-পার্বণ' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মুদ্রিত) শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় লিখিয়াছেন "সম্প্রতি 'সার্বজনীন পূজা'র প্রচলন-বৃদ্ধি দেখিয়া যদি মনে করা যায় যে, আমাদের ধর্মবুদ্ধি আবার জাগিতেছে, তাহা হইলে নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেওয়া হইবে। যেখানে কেবল আমোদ-প্রমোদ উপভোগের প্রবৃত্তি ও প্রমত্ততা সুপ্রকট, সেখানে ধর্মবুদ্ধির জাগরণ সম্পর্কে কোন কথা মনে না আনাই ভাল। যেখানে প্রতিমা প্রস্তুতির মধ্যে অধ্যাত্ম তত্ত্বের প্রকাশ ও প্রচেষ্টার পরিবর্তে তথাকথিত আর্টের বাহার-বিড়ম্বনা ফুটিয়া উঠে, সেখানে যাহা হয়, তাহা পূজা নহে—পূজার বিদ্রূপাত্মক অভিনয় মাত্র।"

শারদীয়া মহাপূজা চতুরবয়বযুক্ত; মহাস্নান, পূজা, বলিদান ও হোম এই কয়টি অনুষ্ঠান (অবয়ব) সমন্বিত হইলেই হয়—মহাপূজা এবং এক দুর্গাপূজা ছাড়া এই সবগুলির একত্র সমাবেশ কোন পূজায় দৃষ্ট হয় না; সেইজন্যই পূজা করিবার সংকল্প নির্ণয়-কালে 'মহাপূজা' এই কথাটি উল্লেখ করিতে হয়। পূজার সময় নির্দেশিক সাতটি কল্পারম্ভের উল্লেখ

দেখা যায় ; তন্মধ্যে ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভের (ষষ্ঠী—নবমী) প্রচলন সমধিক। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস ও সপ্তমীর প্রাতে নবপত্রিকাশ্রয়ে দেবীর পূজাঙ্গনে আগমন হইলে আনুষ্ঠানিক পূজা আরম্ভ হয়। ইহা ছাড়া আরও সপ্তমী, মহাষ্টমী, সন্ধি, মহানবমী এবং বিসর্জন পূজা বিশেষ বিশেষ লগ্নে অনুষ্ঠিত হয়।

মহাস্নান: সপ্তমী হইতে নবমী পর্যন্ত প্রত্যহ দেবীর পূজারম্ভের পূর্বেই সঙ্গীত, নৃত্য ও বাদ্যাদি সহকারে বিভিন্ন দিগ্‌দেশ হইতে আনীত বহুবিধ সুরভিত ও সুদৃশ্য দ্রব্যসম্ভার ধীরে ধীরে অর্থপূর্ণ মন্ত্রোচ্চারণসহ দেবীকে নিবেদিত হয়। বিভিন্ন পুরাণে স্নানের উপচারগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। ইহাতে বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত মৃত্তিকার দ্বারা দেবীর অঙ্গমার্জনাকে মৃত্তিকাস্নান বলা হয়।

পূজন: সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনই শ্রেষ্ঠ পূজা, ধ্যানপর উপাসন মধ্যম, স্তুতি জপাদি তৃতীয় স্তরের এবং প্রতীক বা প্রতিমা অবলম্বনে আরাধনাই চতুর্থ স্তরের। বাহ্যবস্তুর অবলম্বনে সাধক ক্রমে ক্রমে সেই উত্তম ব্রহ্মসদ্ভাব লাভ করে, সুতরাং বাহ্যপূজা হইলেও বিবিধ অনুষ্ঠান, ধ্যান, উপাসনা স্তবস্তুতি ইত্যাদির সহায়ে এই চারিটি ক্রমের অনুবর্তন সমস্ত পূজায় অনুসৃত হয়।

সাত্ত্বিকাদি ভেদে পূজার উপচার বিভিন্ন হইলেও ইহার বিধিতে প্রভেদ নাই। এই পূজায় সমারোহ নাই। রাজসিক পূজক ঘটা করিয়া পূজা করে। ইহাতে তাহার লোকমান্য হইবার প্রবল স্পৃহা বিদ্যমান। তামসিক সাধকের পূজা বিধিহীন।

সুস্থ দেহ ও স্থির মন আরাধনার প্রথম সোপান। ইহাকে সর্বাগ্রে শুদ্ধ এবং সংস্কৃত না করিলে ইহা ইষ্টদেবতার অধিষ্ঠান হইতে পারে না। পূজাস্থান, উপকরণ, প্রতিমা ও দেবতার মন্ত্র সমূহকে শোধন করিলে পূজকের চিত্ত ধ্যানযোগ্যতা লাভ করে। পূজকের নিষ্ঠা, গৃহস্থের ভক্তি এবং ধ্যানসম্মত সুগঠিত দেবমূর্তি নির্মাণের দ্বারাই প্রতিমায় দেবতার আবেশ হয় বলিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করিয়াছেন। দেবীর যথাযথ অঙ্গ-সংস্থান ও আয়ুধাদির সন্নিবেশ না করিয়া কেবলমাত্র উহাকে দর্শনীয় করা বাঞ্ছনীয় নহে।

দেবীর জটামণ্ডিত মস্তক অর্ধেন্দুকলায় সুশোভিত, ত্রিনয়নভূষিতা কমনীয় পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখ-কান্তি, অতসীপুষ্পাভ দেহদ্যুতি, দাঁড়াইবার উন্নত ভঙ্গী এবং বিবিধাভরণে ভূষিত তাঁহার দেহ তারুণ্য ও অমল দন্তশ্রেণীর বিমল আভায় মাতৃত্বের মাধুর্য বর্ষণ করিয়া ত্রিভঙ্গিমঠামে মহিষাসুরকে মর্দন করিতেছেন। মৃণালসদৃশ দশবাহুতে দক্ষিণোর্ধ্বাধঃ ক্রমে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ ও শক্তি এবং বামকরনিকরে নিম্ন হইতে ঊর্ধ্বক্রমে ঢাল, সচাপধনু, নাগপাশ, অঙ্কুশ ও ঘণ্টা বা পরশু—অস্ত্রশস্ত্রসমূহ। তাঁহার পাদমূলে ছিন্নগ্রীব মহিষ এবং ঐ স্থান হইতে খড়্গধারী মহিষাসুর অর্ধনিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্রই দেবীর ত্রিশূল তাহার হৃদয়ে আমূল প্রোথিত হইয়াছে। তাহার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত, চক্ষু দুইটি লালবর্ণ ও বিস্ফারিত এবং দেবীর নাগপাশে তাহার কটিদেশ বেষ্টিত হওয়ায় ভ্রূকুটিকুঞ্চিত মুখ অতীব ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে। নাগপাশের দ্বারা তিনি কেশগুচ্ছ ধারণ করিলে সে রক্তবমন করিতে লাগিল। দেবীর পদতলে সিংহ এবং তাঁহার দক্ষিণ চরণ সরলভাবে উহার উপর ন্যস্ত এবং কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে অবস্থিত অন্যতম চরণের মাত্র অঙ্গুষ্ঠটি স্থাপিত। দেববৃন্দ-সংস্তুতা, উগ্রচণ্ডাদি অষ্টশক্তি-পরিবেষ্টিতা ধর্মার্থকামমোক্ষদাত্রী—দেবী সমগ্র জগৎকে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

ধ্যানান্তে দেবীকে নিবেদিত হইল হৃৎপদ্মাসন। সহস্রার হইতে ক্ষরিত সুধাধারায় তাঁহার শ্রীচরণ-যুগল ধৌত করিয়া মন প্রদত্ত হইল অর্ঘ্যরূপে। এইরূপে একে একে সমস্ত উপচার নিবেদন করিয়া সাধক দেখিলেন আর তাঁহার দিবার কিছুই নাই—

তাই আত্মনিবেদন করিয়া তিনি আপনাকে দেবী-ময় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইবার আত্মরূপিণী মহামায়াকে হৃদয়াষ্টদলপীঠ হইতে বাহিরে আসিয়া পূজা গ্রহণের জন্ম আহ্বান জানাইয়া যথাসাধ্য উপচারে তাঁহাকে পূজা নিবেদন করা হইলে তাঁহার আদেশ লইয়া তাঁহার সহিত আগত দেবপরিবার এবং অঙ্গ ও আবরণ দেবতাদের পূজা করা হইলে (দেবীর বিভিন্ন অঙ্গে অধিষ্ঠিত দেবতা, এবং তাঁহাকে আবৃত্ত করিয়া যে সকল দেবদেবীগণ বিদ্যমান রহিয়াছে তাঁহারা আবরণ দেবতা) পূজা সমাপন হইল।

বলিদান : 'বলি অর্থে উপচার বুঝাইলেও ইহার দ্বারা বিশেষতঃ পশুবলি বুঝিতে হইবে।' কেন এই বিধি?—সত্যই কি ইহা দেবীর তৃপ্তি-প্রদ? ইহার দুইটি অর্থ; একটি মুখ্য, অন্যটি গৌণ। দেবীভাগবতের টীকাকার শ্রীনীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন যে দেবী পূজাতেই বলিদান সঙ্গত, অন্যত্র নহে; কারণ ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী দেবী আমাদের স্বরূপনিরোধক এই ঘোর জীববুদ্ধি নাশ করিয়া ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতে প্রতিভাত হন—তাই তিনি বলিপ্রিয়া।

কামক্রোধৌ ছাগবাহৌ বলিং দত্ত্বা প্রপূজয়েৎ। সাধক মানসপূজায় দেবীর নিকট বলি দিতেছেন তাঁহার রাগ ও রোষ। অন্তর্নিহিত পশুভাবের নিরোধে দৈবশক্তির বিকাশই যথার্থ পশুবলির অর্থ। অন্য সাধকের বলি প্রদান ইহার গৌণার্থ জ্ঞাপক। যাঁহাদের বুদ্ধি মার্জিত নহে এবং যাঁহারা মাংসাশী তাঁহারা পশুবলি দিয়া পূজা করিবেন। পশুবলির মধ্যে ছাগ ও মেষ প্রভৃতি সপ্ত গ্রাম্য এবং মহিষাদি সপ্ত অরণ্যজ পশু উৎসর্গীকৃত হয়।

হোম : শারদীয়া মহাপূজা তিথি ও সময়সাধ্য, ইহা যথা সময়ে সম্পন্ন করিতে হয় এবং হোম-ক্রিয়াই ইহার শেষ অঙ্গ। মহানবমীর পূজা সম্পন্ন করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে দেবীর অধিষ্ঠান চিন্তা করিয়া আহুতি দিতে হয় কারণ অগ্নিই সকল দেবতার মুখস্বরূপ এবং আহুত দ্রব্য যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়াই তাঁহার কর্তব্য। আচার ভেদে বৈদিক ও তান্ত্রিক হোমের বিধান বর্তমান। প্রথমটি দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ তাই অনেকেই অন্য পর্যায়ের হোম করিয়া থাকেন। বৈদিক যুগের আহিতাগ্নি উপাসনার সহিত পরবর্তী যুগের প্রতিমা পূজার শেষে এই অনুষ্ঠান করিয়া উভয় কালের আরাধনায় এক যোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছে। পূর্ণাহুতি ও দেবীকে দক্ষিণান্ত করিয়া পূজা সমাপন হয়।

দশমী : রাবণনিধনের পর শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়-উৎসব এবং অযোধ্যাযাত্রা, দেবীর স্বগৃহে কৈলাসে প্রত্যাবর্তন এবং দুর্গা যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়াই মহানবমী পর্যন্ত তাঁহার পূজা করার পরে বিজয়া দশমীতে রাজাগণের শত্রুজয়ের জন্য জৈত্র-যাত্রা ও বলনীরাজন, অর্থাৎ জয়লাভেচ্ছু রাজন্য-বৃন্দের সৈন্য সম্বর্ধনার ব্যবস্থা দশমী কৃত্যের অঙ্গ। বর্তমানকালেও দেখা যায় এই দিনে কাহারও অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন না থাকিলেও এই দিনে সংবৎসরের জন্য যাত্রা করিয়া রাখেন—যাহাতে পরে তাঁহারা কোন বার তিথি না দেখিয়াও যে কোন দিন যাত্রা করিতে পারেন।'

পূজা অর্চা, আদর আপ্যায়ন, লোকলৌকিকতার দিব্য উন্মাদনায় অতিবাহিত তিনটি দিন দশমীর অনাকাঙ্ক্ষিত আবির্ভাবে মুহ্যমান। বিচ্ছেদবেদনা কাহাকে না ব্যথিত করে; বিশেষতঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যাঁহাকে পাওয়া যায়।

দেবীর তুষারধবল নিত্য নিলয়ে ফিরিয়া যাইবার আজ দশমীর বিসর্জন তিথি। কোথায় সে তুহিনাচল কৈলাস?—আমাদের মানসসরোবরের অতি সন্নিকটে যথায় ধ্যানমগ্ন সশক্তিক ধূর্জটির তপঃপ্রভাবে আমাদের অজ্ঞান কুজ্ঝটিকা দলিত ও ছিন্ন হইয়াছে।

দর্পণ বিসর্জন হইল। উহারই প্রতিচ্ছবিতে

তাঁহার আরাধনা হইয়াছিল। এখন সেই প্রতিবিম্ব বিম্বগত হইয়া কারণে প্রবেশ করিল। সর্ব বিপদ বিনাশিনী ও শান্তিকারিণী দুর্গাকে প্রদক্ষিণ করিয়া একদা যে উৎসবাঙ্গন বিত্ত ও বিজ্ঞানলাভেচ্ছু ভক্তবৃন্দের প্রার্থনায় মুখরিত হইয়াছিল তাহা শুদ্ধ হইল। সন্ধ্যাসমাগমে প্রতিমা উন্মুক্ত অম্বরতলে স্থাপিত। যে সুশোভিত বরণডালার মাঙ্গল্য সম্ভারে তাঁহার আগমনীর আবাহন-গীতি বাজিয়া উঠিয়াছিল আজ তাহাই আবার প্রতি হৃদয়ে বিসর্জনের করুণ সুরে ভরিয়া উঠিল এবং মাতৃ-আগমনের নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাধারার সুস্থির প্রতীতি লইয়া এবং পরস্পরকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি জানাইয়া আমরা পুনরায় তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় দিনাতিপাত করিব।

মুণ্ডক উপনিষদ্

(পূর্বানুবৃত্তি)

[তৃতীয় মুণ্ডক ; দ্বিতীয় খণ্ড]

'বনফুল'

শুভ্র-ভাতি যেই ব্রহ্মে সর্ব-বিশ্ব রয়েছে নিহিত
　　আত্মজ্ঞ পুরুষই জানে সেই ব্রহ্ম-ধাম
জন্মপাশ মুক্ত হয় সেই ধীমানেরা
　　সে পুরুষে পূজা করে যাহারা নিষ্কাম ॥১॥

মজিয়া বিষয়-রসে তাহারই কামনা করে যারা
　　কামনারই মাঝে তারা জন্ম লভে কামনা-বশেই
কিন্তু যিনি পূর্ণকাম, যিনি আত্মপ্রতিষ্ঠিত
　　সর্বকাম মুক্ত তিনি ইহ জীবনেই ॥২॥

শাস্ত্র পাঠ করিলেই আত্মারে যায় না পাওয়া
　　বুদ্ধি বা বিদ্যাও তার পায় না আভাস
যে সাধক আত্মাকেই ভাবে বরণীয়
　　তারই কাছে আত্মা করে আত্ম-প্রকাশ ॥৩॥

বল-হীন আত্মারে পায় না কখনও
সন্ন্যাস-রহিত জ্ঞান অথবা প্রমাদও
　　সে আত্মার দেয় না নির্দেশ,
এদের সহায়ে যদি কোন সুধী যত্ন করে
　　সেই শুধু ব্রহ্মধামে করিবে প্রবেশ ॥৪॥

জ্ঞান-তৃপ্ত ঋষিগণ এইরূপে আত্মারে জানিয়া
　　আত্মপ্রতিষ্ঠিত হ'ন, হ'ন শান্ত, হ'ন স্পৃহাহীন
আত্মস্থ এ ধীর-গণ সর্বব্যাপী ব্রহ্মে লভি
　　অবশেষে ব্রহ্মে হ'ন লীন ॥৫॥

বেদান্তের শ্রেষ্ঠজ্ঞান আত্মারে জেনেছেন যাঁরা
　শুদ্ধচিত্ত যাঁহারা সন্ন্যাসী, যোগী যাঁরা সদা যত্নবান,
ব্রহ্মলোকে যান তাঁরা ইহ জীবনেই,
　　অন্তকালে ব্রহ্মেই মহা-মুক্তি পান ॥৬॥

পঞ্চদশ অবয়ব হয় লীন আদি কারণেতে
　　ইন্দ্রিয়ের দেবতারা মূল দেবতাতে হয় লয়
সব কর্ম সব রূপ, আত্মার বুদ্ধিতে প্রকাশ,
　　সর্বোত্তম ব্রহ্মমাঝে একীভূত হয় ॥৭॥

বহমান নদীগণ সমুদ্রেতে মিশি
　　হয় যথা নাম-রূপ-হীন
নাম-রূপ-মুক্ত হয়ে বিদ্বানেরা সেইরূপে
　　ব্রহ্মে হ'ন লীন ॥৮॥

ব্রহ্মকে জানেন যিনি ব্রহ্মই হন তিনি
　　তাঁর কুলে হয় সবে ব্রহ্মজ্ঞ বিদ্বান
শোক পাপ পরিহরি' মায়া-গ্রন্থি ছিন্ন করি
　　বিমুক্ত হইয়া তিনি অমরত্ব পান ॥৯॥

ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়েতে এই মন্ত্র হয়েছে কথিত ;
　　কর্মপরায়ণ যাঁরা ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদ-পরায়ণ
একর্ষি অগ্নিতে যাঁরা নিয়মিত করেন হবন
　　　　হ'য়ে শ্রদ্ধান্বিত
যথাবিধি শিরোব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে যাঁদের
　　ব্রহ্মবিদ্যা কহিবে তাঁদের ॥১০॥

এ সত্য অঙ্গিরা ঋষি পুরাকালে বলিয়াছিলেন ;
　　অব্রতচারীর এতে নাহি অধিকার,
যাঁহারা পরম ঋষি তাঁহাদের নমস্কার
　　তাঁহাদের নমস্কার ॥১১॥

সমাপ্ত

গ্রামে দুর্গোৎসব

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

৫০।৬০ বছর আগে বেশীর ভাগ লোকদের দুর্গোৎসব গ্রামের বাড়ীতেই হ'ত এবং সেই একমাত্র ও সবচেয়ে বড় উৎসব ছিল গ্রামের।

গৃহিণীদের পতিপুত্র আসবেন কর্মস্থল থেকে হয়ত বৎসরান্তেই। সেকালে মেয়েরা প্রায়ই গ্রামে থাকতেন, শহরে বা কর্মক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে ঘোরার প্রথা কম ছিল। যাঁরা স্বামীর কাছে থাকতেন তাঁরাও ঐ উৎসব উপলক্ষ্যেই দেশে আসতেন। বৃহৎ পরিবারের সকলের জন্ম ৺পূজায় নতুন কাপড়, নানা বিদেশী ও শহরে জিনিস নিয়ে সে আসা। সে এক পরমোৎসবময় দিন ছোটদের ও বড়দেরও। কতদিন ভাইভাইয়ে, ভাইবোনে, ছেলেমেয়েতে দেখা হয় নি, মেয়েদের বাপের বাড়ী—শ্বশুরবাড়ী আসা হয় নি, দেখা হয়নি স্বজন-বন্ধুর সঙ্গে—সে এক মধুর আনন্দ।

সেদিনের গ্রামে প্রায়ই দু'চারখানি প্রতিমা পূজা হ'ত। ব্রাহ্মণ-ঘরে জমিদার-ঘরে বর্ধিষ্ণু পরিবারে সাধারণতঃ পুরুষানুক্রমিক পূজা হ'ত। কেহই সে পূজা ছাড়তে বা বাদ দিতে চাইতেন না। কুল-ক্রমাগত সে পূজা কোন সরিক কেউ না পারলে অন্য পাঁচজনে পালা করে হোক, চাঁদা করে হোক পূজাটি সম্পন্ন করতেন। চার বছর পাঁচ বছর পরে পরে সে পূজার পালা আসত। প্রতি বছরেই যাঁর পালা তিনি পূজামণ্ডপটি মেরামত করে, পরিষ্কার করে মার আগমনীর ব্যবস্থা করতেন পরম নিষ্ঠা ও ভক্তিভরে। বারোয়ারী পূজাও দু'একবার হ'ত গ্রামে।

আজকাল এই পূজার সময় বাড়ী থাকার বা দেশে যাওয়ার আনন্দ আর তেমনভাবে নেই। পূজাও অনেকের (পূর্ববঙ্গের) দেশবিভাগের পরে বাদ পড়ে গেছে। অর্থাভাব চূড়ান্ত হয়েছে। মনোভাবও আগের দিনের মত প্রসারিত নেই। আত্মীয়স্বজনের সম্পর্কের হিসাবের গণ্ডি নিতান্তই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। নানা বিপর্যয়ে—দুটি মহাযুদ্ধ, দেশ বিভাগ, উদ্বাস্তুজীবন নিয়ে মানুষ ও সমাজ বিপর্যস্ত হয়ে আছে। যাঁরা দু'চার জন সেকেলে মনোভাবের আছেন তাঁরা দেশের পূজা কর্তব্য অনুসারে করে আসেন। বেশীর ভাগ লোকই দেশকে মনে রাখেন নি। নিজের বাড়ীর পূজা না হলেও—অবস্থাপন্ন হলেও দেশে আর লোকে যান না। কিছুদিন আগে তাঁরা যেতেন। তাছাড়া রেশন যুগের কৃপায় যজ্ঞের দিনে অন্নপ্রসাদ দেওয়াও দুর্লভ হয়ে গিয়েছিল। প্রায় প্রথাটাও উঠে গেছে। ক্রমশঃ তারপর এ ছাড়া—প্রায় পঁচিশ বছর হ'ল কলকাতায় দু'একটি সার্বজনীন দুর্গোৎসব আরম্ভ হয়েছিল। তারপর এখন আর হিসাব নেই কতগুলি পূজা হয় আর কতরকমের প্রতিমা গড়া হয়! দেখতে দেখতে সমস্ত বাংলা দেশের দুর্গোৎসবের আনন্দের ক্ষেত্র কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠল কলকাতাতেই যেন। সঙ্গে সঙ্গে আর 'বারোয়ারী' নামও রইল না। নাম হয়ে গেল সর্বজনীন বা সার্বজনীন! এবং পূজার উৎসবের দৃষ্টিভঙ্গী ও রূপও একেবারেই আগের মত রইল না, অনেক বদলে গেল। তখনকার দিনে সাধারণ সকলের দুর্গোৎসবের প্রধান আনন্দ ছিল প্রতিমা দেখা, নিষ্ঠাবান লোকের ছিল পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া, সারাদিন কোনো না কোন পূজার কাজে লিপ্ত হওয়া—বাড়ীর পূজা হলে; না হলে গঙ্গাস্নান, উপবাস, অঞ্জলি, আরতিদর্শন এই সব ব্যাপারেই পূজার চারটি দিন কেটে যেতো। আর যাঁর ঘরে পূজা হ'ত তাঁদের আত্মীয়-স্বজন

অতিথি-অভ্যাগতদের ছাড়াও মধ্যে একদিন অবশ্যই কাঙালী ভোজন করানোর প্রথা ছিল। এখনো বড় বড় প্রাচীন পরিবারে—যেমন শোভাবাজার রাজবাটী ও অন্যান্য সম্পন্ন ঘরে এই প্রথা চলে আসছে। অনেকে কাঙালী ভিখারীকে নতুন কাপড়ও দিতেন।

এখন সর্বজনীন উৎসবে অতিথি-অভ্যাগত ও কাঙালীদের সে স্থানটুকু আছে কি না জানি না। বরং নতুন আর এক ধরন দেখা দিয়েছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর—মন্ত্রী বা পদস্থ লোকদের নিয়ে পূজা-মণ্ডপদ্বার (পর্দা) উন্মোচন,—প্রধান অতিথি বরণ, (বোধনের আগেই) সভাপতির ভাষণ! অর্থাৎ কিঞ্চিৎ সাহিত্যিক ধরনে মা-দুর্গার আগমন ও আগমনীকে বরণ। বোধনতলায় বেলগাছ—ঘট পূজা, বোধন করা সে সব বামুনপুরুতের 'নম নম' কাজ সারা। শহরের লোকের এতেও আনন্দ অবশ্য কম নয়, যিনি যেভাবে চান তিনি সেই ভাবেই পূজা দেখেন ও করেন। শিশু থেকে বৃদ্ধ বনিতা সকলে ভিন্ন প্রদেশীয়েরাও এ উৎসবে যোগ দেন, এও এক নতুনত্ব। সর্বজনীন উৎসবের আগের দিনে সকল প্রদেশীয়রা এতে এত বেশী যোগ দিতেন না। কেননা বাড়ীর পূজা ও বারোয়ারী পূজা সীমা বদ্ধ ছিল।

এখন শহরের পূজার কথা যাক।

প্রায় অনেকেরই দেশের বাড়ীতে যে দুর্গোৎসব হয়, অথচ ঘটনাচক্রে যাওয়া হয়ে ওঠে না, এমন অনেকের মত আমারও বার বার হয়েছে। প্রবাসে ছিলাম অনেকদিন, পালায় বছরে এসে পড়িনি হয়ত নানাকারণে। একালে সেকালের গুরুজনরা অনেকেই নেই। ছোটরা যাঁরা আছেন, তাঁরাই পূজাটি বজায় রেখেছেন নিষ্ঠা-ভক্তিসহকারে। সরিকী পূজা পালা করে হয়, যাঁর যে বছর পালা পড়ে।

এবারে ১৩৬২ সালে সহসা সপ্তমীর দিন সকালে গিয়ে পড়লাম দেশের গ্রামে। হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া সে গ্রাম। শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের রথের জন্য প্রসিদ্ধ। একসময়ে স্বাস্থ্যকর বলেও প্রসিদ্ধ ছিল! বর্ধিষ্ণুও। গঙ্গার কূলে গ্রাম, ওপারে শান্তিপুর। সপ্তমীর দুপুরের আগে বিপর্যয়—বৃষ্টি হয়ে গেছে, কোনক্রমে তো পৌঁছলাম দেশে। যতই সম্পন্ন বর্ধিষ্ণু গ্রাম হোক পথঘাট একেবারে পৌরাণিকভাবে শাশ্বত! চিরকালের পথ। দুধারে বন, মাঝে রাস্তা, তার মাঝে খানাখন্দে জল থৈ থৈ। গরুর গাড়ীর চাকার মোটা দাগ বাঁচিয়ে, জল কাদা খানা বাঁচিয়ে সাইকেল রিকশা চলতে লাগল, কখনো নেমে হাতে চালিয়ে, কখনো চড়ে পায়ে চালিয়ে।

বাড়ী পৌঁছলাম। প্রকাণ্ড সেকেলে বাড়ী, মস্ত সিংদরজা। ভিতরে ঢুকলেই প্রকাণ্ড উঠানের পূর্বদিকে পূজার দালানে প্রতিমা দর্শন হয়। দালানের পাশে নৈবেদ্যর কোঠা, গৃহদেবতা নারায়ণের ঘর। উঠানের চারদিকে সরু দালান ও তার কোলে ঘর ছোট বড়—ভাঁড়ারের ভিয়ানের ও অন্যান্য পূজার কাজের। বিশাল প্রাঙ্গণে রাত্রে যাঁরা নিজের পালায় যাত্রা গান, থিয়েটার পালা দেন তার প্রসর জায়গা হয়। গ্রামের লোক রবাহূত অনাহূত আসেন। প্রতিমা দেখেন, পূজা দেখেন, যাত্রা শোনেন—যদি হয়, না হয় তো আবার অন্ধকার বনপথে টর্চ বা হেরিকেনটি হাতে করে ফিরে যান চিরাচরিত অভ্যাসে। গ্রামে আলো নিয়ে বেরুনোই নিয়ম। পথে জমা জল আছে মাঝখানে, পাশে যদি যান বনের দিকে ব্যাঙ আছে, হয়ত সাপ আছে, মনে রাখতে হবে। শহরের লোকের মনে বেশী ভয়,—গ্রামের লোকের অত ভয় নেই। তারা একটু-আধটু অন্ধকারে হাততালি দিয়ে চলে যেতে পারে।

এবারে আমার শ্বশুরদের অন্য সরিকের পূজা ছিল। যে ক'জন আপনার লোক তাঁদের ছিলেন, প্রায় সকলে জড় হয়েছেন, সে ছাড়াও আমরা

এলাম। বড়দের বৃদ্ধদের চিনলাম নতুন লোকদের বৌ, জামাই, ছেলেমেয়েদের চিনতে দেরি হ'ল।

আরতির একটু আগে মণ্ডপে গিয়ে দাঁড়ালাম সম্পর্কীয় ও খুড়তাত দেবর ননদ জা সব একসঙ্গে। কুলের পূজা, বাড়ীর পূজা, সকলের মধ্যেই যেমন আনন্দ, তেমনি মমত্ববোধ। মনে হয়ে যায় সকলেই স্বজন আপনার লোক, এক বাড়ীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। অথচ হয়ত কলকাতার দশ বছরেও দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। সকলের সঙ্গেই বৌমা, বৌদি, খুড়িমা, জ্যেঠিমা, ঠাকুমা বলে চেনা পরিচয় হচ্ছে, এক বৃহৎ সংসারের মত।

আরতি শেষ হতে প্রায় ঘণ্টাখানেক হ'ল। সকলে পূজার দালানে খানিকটা বসা হ'ল। ঘোমটার যুগ আর গ্রামেও নেই ত্রিশ বছর আগের মত। খুড়শ্বশুররা পিসশ্বশুররা সকলে একদিকে বসলেন, মেয়েরা, বৌরা শাশুড়ীরা অন্যদিকে বসলেন দালানে। যাঁরা আরতি দেখে চলে যাবার চলে গেলেন, যাঁরা বাড়ীর লোক তাঁরা মা দুর্গার সামনে সরল আনন্দে বসে রইলেন কি যেন একটা অনুভূতি নিয়ে। অন্যদিকে ভোগের ঘর থেকে চারখানি করে লুচি আর নারিকেল নাড়ু সমস্ত আগন্তুক ইতরভদ্র সকলকে দেওয়া হ'তে লাগল, ৮মায়ের প্রসাদ—মহামায়ার প্রসাদ।

সহসা গান ধরলেন গুরুবংশের এক ভট্টাচার্য মহাশয় 'শ্যামাসঙ্গীত'। পুরানোকালের সঙ্গীত। গানটি, —'জাননারে মন, পরম কারণ, শ্যামা মা

শুধুই রমণী নয়,

মেঘেরি বরণ করিয়া ধারণ কখনো

কখনো পুরুষ হয়।'

কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীতও হ'ল—একেবারে সেকালের,

'তুমি একজন হৃদয়েরি ধন

সকলে আমার বলে সঁপে তোমায় প্রাণমন

কারো পিতা কারো মাতা কারো সখা সুহৃদ হও

ভাবে ডুবে যে যা বলে তাতেই তুমি তুষ্ট রও।'…

গুপ্তিপাড়ানিবাসী পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ স্বামীর রচিত গানও গাইলেন। খুড়শ্বশুররা তাঁর জন্মস্থানে একটি হরিমন্দির করেছেন। অধ্যাপক শ্রীহরিপদ সেনশাস্ত্রী মহাশয়—আর খুড়শ্বশুররা কিছু ধর্মকথা আলোচনাও করলেন। রাত্রি হবার ভয় নেই। পূজার সময়ে গ্রামে রাত্রি অনেক হলেও কিছু আসে যায় না। লোকের মনে তাড়া নেই। কলকাতার মত সকল পাড়ার সব ঠাকুর দেখা হ'ল না! প্রতিমা প্রতিযোগিতায় কোন্ কোন্ প্রতিমা প্রথমা হয়েছেন, কম বেশী ভালো এসব ভাবনা আলোচনাও নেই। এখানে মা দুর্গাকে মাতৃরূপেই—জননমাতা-রূপেই দেখা হয়। জননী বা মা কেমন সাজলেন, কেমন গহনা অলঙ্কার পরলেন, দেখে যেমন শিশু মাকে সুন্দর দেখে না, মাকে মা বলেই সুন্দর দেখে, যেমন জননী হোক। গ্রামের চিরকালের প্রথানুসারে গড়া প্রতিমাকে 'একমেটে', 'দোমেটে' থেকে মৃন্ময়ী মূর্তিতে প্রতিমা রচনা করে পঞ্চমীর রাত্রে 'চক্ষু দান' অবধি সমান আনন্দে গ্রামবৃদ্ধ গ্রামশিশুরা ঘিরে থাকেন।

ষষ্ঠীর দিন বোধন, তারপর তিন দিন পূজা—এই মহোৎসব। রূপ বা গান-বাজনা, অতিথি, অভ্যাগত, 'মাইক' সভাপতি, প্রধান অতিথির প্রশ্ন নেই। সেখানে মা দুর্গাই সব পরমা প্রধানা ঈশ্বরী মূর্তিতে বিরাজ করছেন। "সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি-সমন্বিতে"—সর্বভয়ত্রাণকারিণী, সর্ব আর্তি দূরকারিণী সর্বমঙ্গলমঙ্গলা সর্বার্থসাধিকা শরণ্যা ত্রিনয়নী গৌরী নারায়ণীকেই সব নমস্কার সব প্রণাম করে সকলে কৃতার্থ হ'ন। ক্ষণকালের জন্যও যেন শরণ গ্রহণ করেন।

তারপর অষ্টমী নবমীতে সকলে মায়ের প্রসাদ পেলাম। আর সন্ধ্যারতির পর সেই নানাবিধ গান ও কিছু আলোচনা।

বাড়ীতে এসেও শুনলাম দেবর গাইলেন,—

'এ মায়া প্রপঞ্চময় ভবরঙ্গ মঞ্চ মাঝে

কি খেলা খেলিছ মাগো সাজায়ে কতনা সাজে।...'

গানটি শুনলাম নীলকণ্ঠের গান। নীলকণ্ঠ, কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ, দাশরথি রায় এখনো গ্রামের জনসাধারণের কণ্ঠে ও সুরে বেঁচে আছেন। নতুন গান লোকে গায় শেখে, কিন্তু জীবনের দিবা অবসান হ'লে তাদের মনে পড়ে যায় 'কি কর বসিয়া মন'! তখন মনে পড়ে যায় নানা সাধকের রচিত নানা সঙ্গীত। কবে শুনেছিল যা গুরুজনের গুন গুন গানে। অথবা মেঠোসুরে চাষার গলায় কিংবা বাউল, ভিখারী, সাধু-সজ্জনের কণ্ঠে, সেই কথা সেই সুর মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে 'সাধের ঘুমঘোর কভু কি ভাঙিবে না ...।'

এসে পড়ল, বিজয়া দশমী।

সকালে পুরোহিত ৺মাকে বরণ ও দর্পণ বিসর্জন করে দধি-করমা করে বিজয়াদশমীকৃত্য করে চলে গেলেন। বিকালে মেয়েরা নানা সাজে সেজে মাকে বরণ করে পান মিষ্টি মুখে দিয়ে সিঁদুর পরিয়ে আঁচলে চরণ মুছিয়ে মায়ের কানের কাছে বললেন, 'আবার এসো মা, আবার এসো।'

পুরোহিত সিন্দূরের অক্ষরে নৈবেদ্য ও লক্ষ্মীর ঘরের দুয়ারের মাথায় লিখে গেছেন, "সম্বৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ"। গৃহিণীরা মেয়েরা ম্লান সম্ভ্রমে বার বার বলতে লাগলেন, 'আবার এসো মা, আবার এসো।' সকলের পতি পুত্র পিতা ভাল থাকবেন সকলকে নিয়ে আবার যেন পূজামণ্ডপে এসে পূজা করেন।

এখন শহরে বিজয়ার বরণ উৎসবকে বলা হয় সিঁদুর খেলা। শহরে একটি সরস্বতী পূজার ভাসানের একটি দিনের কথা বলি, বোঝা যাবে মানুষ কত লঘু ভাবে পূজা সম্বন্ধে কথা বলে। প্রতিমা তুলে নেওয়ার জন্য মুটে ডেকে এনেছে ছেলেরা এক জায়গায়। মুটেরা প্রতিমা বেদী থেকে নামাচ্ছে একজন ছেলে বললে এই 'জানানা হায় সামলে উতারো।'

এখন এখানকার কথাই বলি, প্রতিমা বিসর্জনের জন্য গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়া হল। এই সময়ে বেশ মজা হয় একটা গঙ্গা সম্বন্ধে। গুপ্তিপাড়ায় গঙ্গা অনেক দূরে সরে গেছেন। ভাদ্র আশ্বিন মাসে একটি বাঁওড় বা খাল পথে মা গঙ্গা গ্রামের খুব কাছে এসে পড়েন। এইখানেই প্রতিমা বিসর্জন করা হয়।

বিসর্জন দিয়ে ফিরে আসার পর সিদ্ধি ও মিষ্টি মুখে দেওয়ার, প্রণাম আলিঙ্গন করার প্রথা সর্বত্রই বাঙালীরা পালন করেন, প্রথমে নিজের বাড়ীতে তারপর স্বজনবন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে।

এখানে একটি চমৎকার পুরাতন প্রথা পালন করতে দেখলাম। কেননা আগে তো কখনো আমাদের সময়ে সকল মেয়েদের পূজার দালানে এসে বসা দেখিনি। হয়ত বর্ষীয়সীরা আসতেন।

দেখলাম, রাশিকৃত কলা পাতায় চিল্‌তে কেটে রাখা হয়েছে, দু' একটি ছোট খুরিতে ঘন করে আলতা গুলে রাখা হয়েছে; আর অনেকগুলি মোটা খড়কে কিংবা শক্ত কোনো কাঠি জড় করা রয়েছে তার পাশে। সকলে সেখানে এসে বসেছেন। তারপর শূন্য পূজার দালানে মণ্ডপের সামনে বসে কলাপাতার চিল্‌তের উপর আলতাতে খড়কে ডুবিয়ে 'দুর্গা' নাম লিখতে লাগলেন। যাঁরা লিখতে পারেন আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই লিখলেন, একবার—পাঁচবার যে যতবার ইচ্ছা। ভারি গভীর ও সুন্দর তাৎপর্যময় ভাবটি। মা চলে গেছেন নামটি মনে রাখার ঐকান্তিক মধুর আকাঙ্ক্ষা যেন দালান ভরে রয়েছে। সকলে অপেক্ষা করছেন লেখার জন্যে।

তারপর বেদীতে প্রণাম, গুরুজনদের প্রণাম করে সিদ্ধি মিষ্টি মুখে দিয়ে বিজয়া দশমী কৃত্য শেষ হ'ল। যেন সকলেরই মনে হ'ল নিরাপদে পরমানন্দে পূজা সমাপ্ত হয়ে গেছে। সকলে ভাল আছে। কোনো বিপদ সঙ্কট ঘটে নি, বাধা বিপত্তি হয়নি।

আর মনে রইল জেগে, "সম্বৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ।" হে জননী, হে জগন্মাতা, আবার এসো।

এখন একটি পুরাতন ঘটনা বলে কথা শেষ করি। সেকালের পঁয়ত্রিশ বছর আগের ঘটনা, সেকালের গুরুজন ও কর্তৃপক্ষের কাহিনী।

যে-সেকাল অনেক জায়গায় শেষ হয়ে গেছে!

সেবারো বাড়ীতে দুর্গোৎসব। ১৩২৮ সাল।

তখন বয়স কম আর আরো আগের কাল। বাইরের দিকে আসি না, সব শ্বশুর ভাসুর আছেন। ভিতর দিকে ভাঁড়ার ঘর রান্নার দেখা শোনাই করি। বিরাট আয়োজন, স্বজন আত্মীয় তো আছেনই প্রতিদিন অভ্যাগত অতিথি আর গ্রামবাসী ও বহু লোকজনের আহারের আয়োজন হ'ত। বেলা চারটা অবধি 'নগদী' পাইক, জমিদারের কর্মচারী শ্রেণীর লোক আসতো, খেয়ে যেতো। ব্রাহ্মণরা রান্না কোরে চলে গেলে আমি যারা দেরি করে আসতো, বলে যেতো তাদের খাবারটা রাখতাম এসে নিয়ে যেতো কিংবা খেয়ে যেতো।

এ ছাড়া রান্নাঘরের জল ভরানো, বাসন ডোবানো, বিকালের রান্নার যোগাড়, ভাঁড়ার দেওয়া, অনেকটা কাজের ভারই থাকত।

পূজার ষষ্ঠার দিন। একজন ভাসুর এসে বলে গেলেন, গয়লাপাড়ার লোকেরা জল দিতে আসবে, আপনি বৌমা সব ভরিয়ে রাখবেন।

ইতিমধ্যে দেখি, যেখান দিয়ে তারা জল ভরতে যাবে ভাঁড়ারের জলের জালা, রান্নাঘরের জলের চৌবাচ্চা,--সেই পথটি মাছের আঁশ, আর শিশুদের নোংরায় ভারি অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে।

বিকাল হয়ে গেছে—নগদীদের দু'একজনের ভাতও পড়ে আছে—রান্নাঘরে তখনো যেতে পারে নি।

এমন সময়ে চারজন ঝি যারা কাজ করে তারা এলো। ছোট পাটের কুয়ো উঠানে, সেখানে তারা বেশ নিশ্চিন্তভাবে হাত পা মেলে দাঁড়াল।

আমি তাদের বললাম, তোমরা অন্য কাজ করার আগে এই পথটি ধুয়ে দাও। নইলে রান্না ঘরে জল ভরার সুবিধে হবে না।

একবার, দু'বার, তিনবার বলার পরও তারা নির্বিকার। একটু বিরক্তভাবে বললুম, 'তোমাদের কানে কি কথা পৌঁছায় না? এখুনি ঐ সব অপরিষ্কার মাড়িয়ে তারা জল ভরতে ঢুকবে। তাড়াতাড়ি এসো।'

এবারে অকস্মাৎ তাদের একজন গালে হাত দিয়ে অভিনেত্রীর মত দাঁড়াল। তারপর বললে, 'তুমি কেনে বক্‌তে লেগেছ গা? যেনারা মনিব—তেনারা তো কিছু করতে বলছে না!'

আমি আশ্চর্য আর বিরক্ত হয়ে বললাম, তার মানে? তোমাদের রাখা হয়েছে কাজ করবার জন্যে—কে মনিব, কে হুকুম দিচ্ছে সে কথায় তোমাদের কি দরকার। যা বলছি করে নাও।'

তারা নিজেদের মধ্যেও আমাকে উদ্দেশ করে বলাবলি করতে লাগল, 'কেনে? কেনে করব গা? আপুনি কেনে বলবে? তুমি কেনে বলবে?'

এগিয়েও এলো না, কাজ করলে না এবং খুব কথা বলতে লাগল। আমি যেমন অপমানিত বোধ করলুম, তেমনি রাগে আবার চোখে জল এলো। কিন্তু আর কিছুই বলতে প্রবৃত্তি হ'ল না ঐ শ্রেণীর মেয়েদের।

ইতিমধ্যে গয়লাপাড়ার জলের ভারীদের নিয়ে একজন নগদী এলো। আর আমার শাশুড়ীও আমাকে খুঁজতে এলেন, বিকালে ঘাটে যাব কিনা জানতে।

তখনো ঝিয়েরা কোনকাজে হাত দেয় নি। নিজেদের মধ্যে অবজ্ঞা করে কথা বলাবলি উপহাস করছে। শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করতে এসে আমার মুখ দেখে বোধ হয় কিছু বুঝতে পারলেন। 'নগদী'ও

আমার কাছেই ভাত নেয়, সেও এসে দাঁড়াল। 'বৌমা আমার ভাত ?' তারপর ঝিদের মুখর কথাবার্তা আর আমাদের শাশুড়ীবৌয়ের নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা দেখে জিজ্ঞাসা করলে 'কি হয়েছে, ওরা চেঁচাচ্ছে কেন ? '

শাশুড়ী আমার কাছে শুনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তাঁর পুত্রহীনতার অসহায়তার অবস্থা তাঁকেও মর্মাহত করেছিল। তিনি শুধু বললেন, 'ওরা বৌমার কথা শুনছে না। জবাব করছে।'

নগদী রেগে গেল বললে, অ্যা তোরা বৌমার কথা শুনছিস্ না—কি ভেবেছিস্ ? জানিস্ না সেজবাবুর বৌমা উনি ?'

তারা বিপুল উৎসাহে তার সঙ্গেও বচসা আরম্ভ করল। 'কেনে শুনব ? শুনব নি।'

এবারে নগদী বিনাবাক্যে যে ঝিটি গোলমাল করছিল তার ঘাড় ধরে খিড়কী দরজার পথে বার করে দিল।

তারপর নিশ্চিন্তমনে তার রাশিকৃত ভাত, ডাল, চচ্চড়ী, মাছ অম্ল নিয়ে পরম পরিতোষে খেতে বস্‌ল।

পূজাবোধন, ষষ্ঠীর সন্ধ্যা বড় খারাপ কাটল। অকারণে অপমানকর কথা শুনেও বটে আর ঐ ঝিটাকে বার করে দেওয়াও ঠিক মনঃপূত হচ্ছিল না বছরকার দিনে। অথচ বুঝছিলাম নগদী ঠিক কাজই করেছে।

পরদিন সকালে ভাঁড়ারে আছি। সহসা এক খুড়শাশুরী ডাকলেন বললেন, 'বৌমা, একবার বাহিরে এসো'।

উঠে এলাম।

বললেন, 'কালকে মন্দা ঝিকে ভুবন নগদী বার করে দিয়েছে তোমার কথা শোনেনি বলে, তোমার ভাসুররা শুনেছেন। সে তো পূজা বাড়ীতে আর ঢুকতে পারছে না। বাবুদের কাছে কান্নাকাটি করছে। তা তাঁরা বলে পাঠিয়েছেন, যদি বৌমা মত দেন তো ভেতরে ঢুকবে, কাজ করবে। না হলে ভেতরে আসতে পাবে না। তুমি কি বল ?'

আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হ'লাম। বললাম, 'সে কি কথা শ্বশুর ভাসুররা যা ঠিক করবেন তাই হবে, আমায় কেন জিজ্ঞাসা করছেন ?'

খুড়শাশুড়ী বললেন, 'না, না, ও বড় অপমান করে কথা কয়েছে তোমার সঙ্গে, ছেলেরা সব শুনেছে, তুমি রাখলে তবে ওরা রাখবে।'

আমি বললাম, 'বছরকার দিন, আপনি ওকে রাখতে বলুন, কেন গরীব মানুষের 'রোজ' আর খাওয়া আনন্দ মাটী হবে। আবার ভাসুরেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, এতেই আমার লজ্জা হচ্ছে।'

কিন্তু সেখানকার পূজাবাড়ীতে গুরুজনদের এই পরিবারের ছোট বড় সকলের সম্মানের প্রতি লক্ষ্যটুকু—বড় ভাল লেগেছিল। না লক্ষ্য করলে হয়ত ঐ ক্ষুব্ধ ভাবটুকু মনে কাঁটার মত ফুটে থাকত। এই ব্যবহার'ও জিজ্ঞাসাটা আমার আর পুত্রহীন আমার শাশুড়ী শ্বশুরের মনে ক্ষোভ রাখল না।

এই প্রসঙ্গে আমার এক আত্মীয়া পরে বলেছিলেন, 'জানিস্, সোনার চুড়ী আর শাড়ীর অনেক খাতির……! ঝি চাকররা ঐটে দেখেই মান্য করে বিশেষ ক'রে পাড়াগাঁয়ে !'

একটু হাসলাম। সোনার চুড়ী আর শাড়ীর গৌরবের দিন আর তখন আমার ছিল না কিন্তু গুরুজনরা আমায় বাড়ীর বধূত্বের সম্মান দিয়েছিলেন।

আসে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

সাধক জগন্মঙ্গলব্রতী, ভাবুক শিল্পিদল,
স্বপ্নে ও ধ্যানে গড়ে যে নূতন ভাবের ভূমণ্ডল,
সমুজ্জ্বল সে ভুবনই যে আসে জীর্ণ জগৎপর—
করিতে তাহারে শুচি সুন্দর এবং মহত্তর।
মহামানবেরা আজি যা ভাবেন, কাল তো তাহাই হয়।
ভাব যে জমিয়া বস্তু হইতে সময় একটু লয়।
বাল্মীকির সে রামই আসেন—করুণার নাহি সীমা,—
মেশে সত্যের অরুণ আলোকে স্বপ্নের পূর্ণিমা।

২

মনুষ্যত্বে উচ্চ করিতে গুহা-মানবের স্তর—
দেশ ও জাতির ধ্যানীর লেগেছে বহু বহু বৎসর।
সূর্য গিয়াছে ক্ষয়ে কতখানি—কমেছে তাহার জ্যোতি—
গড়িতে একটি অমিতাভ—শুধু একটি জগজ্জ্যোতি।
গরুড়ের দৃঢ় স্থির আকাঙ্ক্ষা লইয়া অহিংসাকে
গড়েছে একটি অপাপবিদ্ধ গান্ধী মহাত্মাকে।
করেছে কঠোর কত তপস্যা মধু পূর্ণিমা রাত?
কত শরতের পদ্মের ধ্যানে—এলো রবীন্দ্রনাথ?

৩

পিপীলিকা তোলে বল্মীক—তাহা অদ্ভুত কিছু নয়,
ক্ষুদ্র সে—তার স্বপ্ন যে গড়ে সুবিশাল হিমালয়।
টুনটুনি-ক্রোধ অগস্ত্য হয়ে সাগর শোষণ করে,
মন যে তাহার দর্পহারীর,—দর্পীরে নাহি ডরে।
মৃত্যু জানে না পাপও ফিরে আসে দেখি মাথা হয় হেট।
করে নিষ্পাপ যীশুর বিচার এখনো যে 'পাইলেট'।
প্রতিহিংসার কিছুই কমে না; কমে না তাহার জ্বালা
'সপ্তরথা'র বূহ রচে আজও, রচে নব কারবালা।

৪

ত্যাগীর ধ্যানেতে দধীচি গঠিত—তপস্যা ধরণীর—
পেয়েছে ভীষ্ম সম সংযমী—অর্জুন সম বীর।
হতেছে সমাজ সুসভ্যতর—সুক্ষ্ম চিত্রকলা,—
ছড়া দোঁহা ভাঙি বাহিরিয়া আসে কবির শকুন্তলা।
কবির স্বপ্ন আজও পাতে নব সাম্রাজ্যের ভিত,—
জীবকে করিছে উন্নততর—তাহাদের সঙ্গীত।
ছোট চাতকের কাকুতিতে ভাঙে সুর-সরিতের বাঁধ।
চকোরের ডাকে আগায়ে আসিছে যুগ যুগ ধরে চাঁদ।

৫

সৃষ্টিকে করে শ্রেষ্ঠতর যে স্থির সংকল্পই,
উৎকর্ষ তো লভে না ভুবন—ওই উপাদান বই।
তিলোত্তমারে গড়িয়া তুলিছে রসিক শিল্পী মন
ভাবই রূপের পরিমণ্ডল বাড়ায় অনুক্ষণ।
ফুরায় বন্ধ্যা শতাব্দী কত, নির্মম বর্ষ,
প্রাণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে তবে বিরাট আদর্শ।
অশোকের সাধ, ইচ্ছাশক্তি কালে যায় নাই ক্ষয়ে।
নব কলেবরে আবার আসিছে—বিপুল শক্তি লয়ে।

৬

কৃচ্ছ্র সাধনা করিতে হয়েছে জাতির গৃহশ্রীকে,—
ধরায় আনিতে দেবী ও মানবী সীতা ও সাবিত্রীকে।
মাতৃস্নেহ সাত সাগরেতে ঢেলেছে তাহার গা,
নরনারায়ণে সন্তান পেতে—হ'তে গোপালের মা।
বসুধাকে দিতে নূতন মহিমা নূতন লাবণ্য,
ধরি নর-তনু প্রেম আসে—আসে অবিনাশী পুণ্য।
যিনি সৎ চিৎ পরমানন্দ—নাহি পরিবর্তন—
বহু বহু রূপে ভাবগ্রাহী সে আসেন জনার্দন।

ধর্ম

স্বামী বিরজানন্দ

(পূর্বে অপ্রকাশিত মূল প্রবন্ধ*)

মনুষ্যজীবন পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে সকলেই নিজ নিজ অভাবমোচনের জন্য যারপর নাই যত্নবান। আমরা পানাহার করি ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য, কাজকর্ম করি গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট দূর করিবার জন্য, গৃহাদি নির্মাণ করি শীতাতপ নিবারণের জন্য, দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয় করি অর্থাভাব পূরণের জন্য; এমনকি বর্তমানে বিশেষ অভাব না থাকিলেও ভাবী অভাব উপস্থিত হইবার ভয়ে বিপুল অর্থ-সঞ্চয়ও করিয়া রাখি। যেসকল অভাব পূরণ না করিলে দেহযাত্রা নির্বাহ সুকঠিন হইয়া পড়ে কেবল যে সেইগুলির জন্যই আমরা চেষ্টাশীল তাহা নহে; গীতা বলিযাছেন,—"বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্"—যাঁহাদের বুদ্ধি একনিষ্ঠ নহে তাঁহাদের বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট এবং অগণ্য দিকে ধাবিত হয়। তাঁহারা কিসে ধন হইবে, কিসে মান হইবে, কিসে সকলের উপর প্রভুত্ব করিবেন, কি ভাবে জনসমাজে উচ্চপদ লাভ করিয়া সকলের গণ্যমান্য হইবেন তজ্জন্য সদা চিন্তাশীল, সদা ব্যস্ত। এমন কোন কষ্ট নাই যাহা তাঁহারা অম্লান বদনে স্বীকার না করেন, যাহার জন্য তাঁহারা প্রাণ পর্যন্ত পণ রাখিয়া তদনুরূপ কার্য না করেন। তাঁহারা মনের সাধে যেরূপ ইচ্ছা করুন তাহাতে আমাদের কটাক্ষ করিবার বিশেষ আবশ্যক নাই কিন্তু তাঁহাদিগকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। তাঁহারা কি মনের সমস্ত কল্পনা অনুযায়ী ফল উপভোগ করিয়া সম্পূর্ণ সুখী ও নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কি এই সকল তৃষ্ণা ব্যতীত অন্য কোন অভিনব তৃষ্ণা হৃদয়ে অনুভব করেন না? নিশ্চয়ই করেন, তাহা না করিলে তাঁহাদের তো ভোগ্য বস্তুর অভাব নাই, অন্য কোন অভাবেরও তাড়না নাই, তথাপি হৃদয় স্ফূর্তিহীন, চক্ষু নিস্তেজ, মুখচ্ছবি বিষাদে মলিন দেখিতে পাই কেন? আঁধার রাত্রির বিজলির মত অধরে কখনও হাসি ফুটিতেছে কিন্তু সে হাসির কোন অর্থ নাই। তরুতলবাসী সর্বপ্রকার পরিগ্রহত্যাগী নগণ্য অকিঞ্চন পারমার্থিক লোকের মুখে যে স্বর্গীয় মধুর চিত্তমোহন-কারী হাসি দেখিয়াছ তাঁহাদের তাহা কই? কিসের অভাবে সমস্ত ভোগসুখ পাইয়াও তাঁহাদের সুখ নাই—কোথা হইতেও শান্তি নাই!

এই সকল বিষয় নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, যেমন বাহ্যিক জগৎ আমরা দেখিতে পাইতেছি সেইরূপ একটি অন্তর্জগৎ রহিয়াছে, মানুষ কেবলমাত্র রক্তবসা ও মাংসপেশী সমন্বিত জীব নহে, তাহার মন বুদ্ধি ও জ্ঞানের অন্তরের অন্তরে চৈতন্যরূপে পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন। কিরূপে মানুষ অন্নাদি ভোজন ও সামান্য ভোগবিলাস পাইলেই সুখী হইতে পারিবে, কিরূপে সামান্য জড়ের উপাসনা ও জড়বস্তুলাভে তাহার অন্তরের চৈতন্যসত্তা আত্মার তুষ্টি সাধন করিবে? তিনি যে আমাদের প্রিয় হইতে প্রিয়তর, মধুর হইতেও মধুর; জীব যে তাঁহার রস আস্বাদন করিয়াছে, তাহা না হইলে তাঁহার দিকে মন ধাবিত হয় কেন? তাঁহার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয় কেন? যে তৃষ্ণার জল প্রকৃতি দেবী দান করিতে সমর্থা হন না, সে তৃষা অমৃতময় ধর্মবারি দ্বারা শীতল হয়। ধর্ম হইতে সুখকর বস্তু আর নাই।

* শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের লোকান্তরিত ষষ্ঠ অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ লেখকের কাগজপত্রের মধ্যে এই অপ্রকাশিত প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া যায়।—উঃ সঃ

যখন অশান্তিমেঘে হৃদয়গগন আচ্ছন্ন করে তখন কেবল ধর্মের প্রবল শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইয়া সেই মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, যখন নৈরাশ্য-আঁধারে চারিদিক তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তখন ধর্মের পবিত্র জ্যোতিই সেই ঘন তমোরাশি নাশ করিয়া ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল আশার আলোক জ্বালিয়া দেয়। এ সংসার যদি ধর্মের নির্মল কিরণে উদ্ভাসিত না থাকিত তাহা হইলে ইহা অরাজকতা-অন্ধকারে ডুবিয়া যাইত; সকলের উদ্দেশ্য যদি এক না হইত তাহা হইলে কে কাহাকে ভাল বাসিতে পারিত? কে কাহাকে সাহায্য করিত, কে কাহার জন্য প্রাণ দিত? তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? তোমার দুঃখে আমি দুঃখিত হইব কেন? তোমার যে অবস্থা আমারও যদি সেই অবস্থা না হইত, তোমারও যে উদ্দেশ্য আমারও যদি সেই উদ্দেশ্য না হইত তাহা হইলে তুমি বিনাশপ্রাপ্ত না হইয়া কি তিষ্ঠিতে পারিতে? এই বিপুল অনন্তকোটী জীবসঙ্ঘের বিরাট স্রোত বিরাট সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে, ইহার বিপরীত অভিমুখে যাইবার সাধ্য কাহারও নাই।

উদ্দেশ্য সকলেরই এক, কিন্তু পৃথক পৃথক ভাব অনুসারে ভাব অনন্ত। যে যে-ভাব আশ্রয় করিয়াই যাক না কেন পরিণামে এক স্থানে গিয়া উপনীত হইবেই হইবে, কেন না সমস্ত ভাবই সেই এক অনির্বচনীয় অভাবনীয় ভাব হইতেই আসিয়াছে এবং তাহাতেই শেষে মিশিয়া যাইবে; ইহাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আধ্যাত্মিক নিয়ম, ইহাই চরম সত্য, ইহাই ধর্মরাজ্যের গুহ্য রহস্য। আমাদের স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে ধর্ম পরস্পর হইতে পৃথক হইতে পারে কিন্তু তাহার কোন না কোন স্থানে একতা আছেই আছে। তোমার সহিত আমার না মেলে ক্ষতি কি? দুজনের মন বুদ্ধি ও ভাব সর্বতোভাবে একপ্রকার কখনই হইতে পারে না, দু জনে এক সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া কেহ কখনও চরম সীমায় পৌঁছিতে পারে নাই। আমার স্বভাব ও বলবীর্য অনুসারে আমি অগ্রসর হইব, তোমার সহিত আমার ভাবের কিংবা মতের অনৈক্য হইল বলিয়া আমারটি ভুল আর তোমারটিই সত্য একথা বলিতে পার না; কিংবা তুমি আমা অপেক্ষা উচ্চতর সোপানে আরূঢ় হইয়াছ, তুমি আমা অপেক্ষা উচ্চ অধিকারী, আমি নিম্ন অধিকারী বলিয়া আমার পথকে ভুল বা মিথ্যা বা মন্দ বলিবার অধিকার তোমার নাই। যে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছে সে কি যৌবন কালকে ভুল বলে? সেই চরমসীমায় উপনীত হইবার অনন্ত পথ পড়িয়া রহিয়াছে। পরমহংসদেব বলিতেন "মত পথ।" কালীবাটীতে আসিতে হইলে কেহ ঘোড়ার গাড়ীতে, কেহ নৌকাযানে, কেহ রেলপথে, কেহ বা হাঁটিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়; সেইরূপ ভগবানের কাছে পৌঁছিবার জন্য প্রত্যেক ধর্মই এক একটি পথ দেখাইয়া দিতেছে। লোকে নিজের নিজের জমি প্রাচীর দিয়া বেষ্টন করিয়া লয় কিন্তু আকাশকে কেহ খণ্ড খণ্ড করিতে পারে না, অখণ্ড আকাশ সকলেরই প্রাচীরবেষ্টিত জমির উপর সমভাবেই স্থিত রহিয়াছে। সেইরূপ লোকে সম্প্রদায় গঠন করে কিন্তু জানে না যে, তাহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান যেমন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও তেমনি অবস্থিত আছেন। সম্প্রদায় শত শত হউক, ক্ষতি নাই কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাব যেন কখনও না উৎপন্ন হয়। যদি আরও দুইশত সম্প্রদায় গঠিত হয়, যদি সেই পরমার্থ সত্যে উপনীত হইবার আরও দুইশত পথ আবিষ্কৃত হয় হউক, তাহাতে লাভ বই জগতের ক্ষতি নাই কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাব না গজাইয়া উঠে। সাম্প্রদায়িক ভাবে জগতের যত অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, ধর্মজগতের যত উন্নতি প্রতিহত হইয়াছে এমন আর কিছুতে হয় নাই। ধর্মের নামে কত সহস্রবার যে মেদিনী

লক্ষ লক্ষ নরনারীর শোণিতপ্রবাহে লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ধর্মের নামে অশান্তির রাজ্য বিস্তৃত হইয়া কত ভয়ানক দ্বেষ হিংসা প্রতিদ্বন্দ্বিতা-অনল জ্বালাইয়া দিয়াছে এবং সেই অনল যে অপরকে দগ্ধ করিয়া দ্বেষহিংসাকারীদেরই নাশের কারণ হইয়াছে তাহা অতীত ইতিহাস স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতেছে।

পরের বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কি অধিকার তোমার আছে? বিশ্বাস দিবার কর্তা ভগবান, তুমি তাঁহার কার্যের বিরুদ্ধাচরণ কর কোন্ সাহসে? এরূপ কার্যের দ্বারা তুমি কি তাঁহাকে অবিশ্বাস করিতেছ না? নাস্তিক বরং ভাল, তাহারও একটা সরল বিশ্বাস আছে; কিন্তু হে ধার্মিকাভিমানী, তুমি মনে মনে যাঁহাকে বিশ্বাস করিতেছ কার্যতঃ তাঁহাকেই অবিশ্বাস করিতেছ, তাঁহারই বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ। তুমি কি বিশ্বাস-ঘাতক নহ? নিষ্ঠা এক জিনিস, গোঁড়ামি আর এক জিনিস; অনুরাগ এক জিনিস, স্বার্থচরিতার্থতা আর এক জিনিস। নৈষ্ঠিক ভক্তের মুখ হইতে শান্তিময়ী বাণী ভিন্ন আর কিছুই নির্গত হয় না। তাঁহার জীবন একটি জ্বলন্ত ভক্তিবিশ্বাসের মূর্তি। তাঁহার হৃদয়ের কুটিলতা, নীচতা প্রভৃতি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। নিষ্ঠাই ধর্মের দৃঢ় ভিত্তি, নিষ্ঠাতেই ধর্মের তেজ নিহিত রহিয়াছে, নিষ্ঠাই ধর্মের বল। ধর্মসাধন করিতে হইলে এই নিষ্ঠাই চাই। এই একনিষ্ঠতা মহাবীর হনুমানের ছিল। তিনি গরুড়কে বলিয়াছিলেন—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ॥

"শ্রীনাথ এবং জানকীনাথ দুইজনেই পরমাত্মাতে অভেদ, তাহা আমি জানি, তত্রাচ কমললোচন রামই আমার সর্বস্ব।"

ধর্মজীবন লাভ করিতে হইলে সাধনার একান্ত প্রয়োজন। ধর্ম মুখে বলিবার জিনিস নহে, লোককে দেখাইবার জিনিস নহে; বহু বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই ধর্মলাভ হয় না, বহু বহু শাস্ত্র সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারিলেই ধার্মিক হওয়া যায় না। তাহাতে জোর আমাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইতে পারে, দশজনের কাছে মান সম্ভ্রম বড় জোর পাইতে পারি। শাস্ত্র আমাদের নানা পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। যদি আমরা ঠিক ঠিক সেই অনুযায়ী কর্ম না করি, যদি আমরা সেই মত জীবন গঠন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা না পাই তাহা হইলে তাহাতে আমাদের ফলবত্তা কি? শ্রুতি নিজেই বলিতেছেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

"তর্কযুক্তি দ্বারা, কিংবা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশক্তি দ্বারা বা বহু শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারাও এই আত্মাকে লাভ করা যায় না।" ধর্ম প্রাণের জিনিস; ধর্মই জীবন, এ জীবন তাঁহারই ছায়া মাত্র। জীবন তৈয়ার করাকেই ধর্ম বলে; এক একটি জ্বলন্ত জীবন তৈয়ার করিতে হইবে—যে জীবন কোটী কোটী নরনারীর ভবসমুদ্রযাত্রার ধ্রুবতারাস্বরূপ হইবে। এক একটা জ্বলন্ত জীবন শত শত শাস্ত্র অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। শাস্ত্র যে সত্য তাহার প্রমাণ কোথায়? এই মহাপুরুষদিগের জীবনই তাহার প্রমাণ, তাহারা সাক্ষাৎ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাহা শত সহস্র ঝঞ্ঝাবাতেও টলিবার নহে। এই ধর্মজীবনের যত হ্রাস বা অভাব হইবে, জানিও ধর্মের আসন্নকাল ততই সন্নিকটবর্তী। আলস্যের কাজ নয়, আলস্য দূরে পরিহার করিতে হইবে। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।" জড়তা পরিত্যাগপূর্বক উত্থিত হও, জাগ এবং অভীষ্টলাভ করিয়া সেই সত্যতত্ত্ব অবগত হও। ধর্মমূলক নিত্যনৈমিত্তিক গুটিকতক নিয়ম পালন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলে হইবে না। দেখিতে হইবে দিন দিন আমাদের মানসিক বল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে কি না, দেখিতে হইবে আমাদের জীবন উন্নত হইতেছে কি না। তাহা যদি না হয়

জানিবে নিশ্চয়ই আমরা ধর্মের নামে আর কিছুর আরাধনা করিতেছি। ধর্মজীবন লাভ করিতে সদসৎ বিচার ও সৎসঙ্গ নিতান্ত প্রয়োজনীয়—

মোক্ষদ্বারে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীর্তিতাঃ।
শমো বিচারঃ সন্তোষশ্চতুর্থঃ সাধুসঙ্গমঃ॥

"মোক্ষদ্বারে চারি দ্বারপাল আছেন, যথা শম, বিচার, সন্তোষ, চতুর্থ সাধুসঙ্গম।" যত্নপূর্বক এই চারি দ্বারপালের সেবা করিতে হইবে, অশক্ত হইলে তিনের অথবা দুয়ের সেবা অবশ্যই করা চাই, কেন না রাজগৃহে যেরূপ দ্বারীর শরণাপন্ন হইলে সে দরজা খুলিয়া দেয়, সেইরূপ এই চারি দৌবারিককে সন্তুষ্ট করিলে মোক্ষ-প্রাসাদে প্রবেশ করা যায়। বস্তুতঃ যিনি প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য যথার্থ যত্নশীল হন এবং শুভ ইচ্ছার সহিত ধীরভাবে আপনার অন্তরে সর্বদা তদ্বিষয়ক বিচার করিতে থাকেন তিনি অবিলম্বেই আপনার অভিলষিত পদার্থ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। যাঁহার শুভ ইচ্ছা আছে, যাঁহার জীবনের উচ্চ লক্ষ্য সাধন করিবার চেষ্টা বলবতী হয়, সদসৎ বিচার তাঁহার হৃদয়ে আপনা হইতেই স্ফূর্তি পায়। উপনিষৎ বলিয়াছেন—আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। "এই আত্ম-বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিতে হয়, মনে মনে বিচার আলোচনা করিতে হয় এবং নিবিষ্টচিত্তে ইহার ধ্যান করিতে হয়।" যাঁহাদিগের মন যথার্থ চিন্তাশীল নহে, যাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া সকল বিষয় বিচার করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের দুর্বল হৃদয়ে কোন গভীর বিষয় কখনই দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে না। তাঁহাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা অতি সামান্য আঘাতেই নষ্ট হইয়া যায়। যিনি যথার্থ বিচার-পরায়ণ হন, তাঁহার হৃদয়ে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় দুর্লভ সত্যসকল আপনা হইতেই প্রকাশিত হইতে থাকে। বিচার কর্তব্য জানিয়া কেহ যেন কুতার্কিকতা অবলম্বন না করেন, কারণ তদ্দারা বিন্দুমাত্র উপকার সাধিত না হইয়া সমূহ অনিষ্ট সংঘটনই হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারগণও এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ সাবধান করিয়া গিয়াছেন। সাধক আপনার হৃদয়ে আপনি বিচার করিবেন এবং যে বিষয়গুলি আপনি সিদ্ধান্ত করিতে না পারিবেন, অথবা যেগুলিতে তাঁহার সন্দেহ হইবে সেগুলির মীমাংসা করণার্থে জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত তদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন মাত্র। এইরূপ সৎসঙ্গ ও সদালোচনায় অজ্ঞানাবরণ ছিন্ন হইয়া যায়।

সঙ্গঃ সর্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ, স চেৎ ত্যক্তুং ন শক্যতে।
সদ্ভিঃ সহ প্রকুর্বীত, সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্॥

"সঙ্গ সর্বথা পরিত্যাগ করা উচিত, যদি সর্বসঙ্গ পরিত্যাগের অধিকারী না হও তবে সাধুসঙ্গ কর, সাধুসঙ্গ রুগ্ন আত্মার পক্ষে মহৌষধস্বরূপ।"

শূন্যং সংকীর্ণতামেতি মৃত্যুরপ্যুৎসবায়তে।
আপৎ সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জনসমাগমে॥

"জ্ঞানবান ব্যক্তির সংস্পর্শে সুখশূন্য ব্যক্তির শূন্যতা সঙ্কীর্ণ হয় এবং মৃত্যু উপস্থিত হইলে তাহাও উৎসবের ন্যায় প্রতীয়মান হয় আর আপৎসকল সম্পদের ন্যায় প্রকাশ পায়।"

যঃ স্নাতঃ শীতশীকরাসাধুসঙ্গেতি গঙ্গয়া।
কিং তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ
কিমধ্বরৈঃ॥

"যে ব্যক্তি সাধুসঙ্গরূপ নির্মল সুশীতল গঙ্গাতে স্নাত হন, তাঁহার দান, তীর্থসেবা, তপস্যা অথবা যজ্ঞাদিতে কি প্রয়োজন?" সাধুসঙ্গ যেরূপ বাঞ্ছনীয় অসৎ সঙ্গও সেইরূপ বর্জনীয়। গাছ যখন ছোট থাকে তখন তাহাকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া না রাখিলে মেষমহিষাদি যেমন তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলে সেইরূপ সাধনের প্রথমাবস্থায় দুষ্কর্মকারীদিগের সংসর্গে বাস করিলে নিজের অপরিপক্ব সুভাবগুলির সমূলে উচ্ছেদ সাধিত হইয়া পতন অবশ্যম্ভাবী হয়। মহাত্মা মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ মহাপাপিগণের এবং তাহাদিগের সহিত যাহারা সংসর্গ করে তাহাদিগের একই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। দৈহিক সংক্রামক রোগসকল যেমন অতি সহজে

অন্য দেহে সংক্রামিত হয় আত্মার পাপরোগসকলও অতি সহজে সেইরূপে তৎসংস্পর্শী ব্যক্তির আত্মাতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। সংব্যক্তির সহিত মিলনের নামই স্বর্গ এবং অত্যন্ত সংশয়াবৃত বিষয়ী ব্যক্তির সহিত সংসর্গের নামই নরক। আত্মাই অন্য আত্মাকে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, এক জীবনই অন্য জীবনের উপর কার্য করিতে পারে; জড় শক্তি কখনই চৈতন্যের উপর কার্যকরী হয় না, ইহাই বিশ্বের নিয়ম। যখন এইরূপে এক প্রাণ অন্য প্রাণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, এক জীবন অন্য জীবনের সাহায্যে উন্নততর সোপানে আরূঢ় হয় তখনই তাহাকে গুরুকরণ বা দীক্ষা কহে। সাধনার প্রবর্তকাবস্থায় বাহ্য জগৎ হইতে সাহায্য লইতে হয়, নানারূপ প্রক্রিয়া ও প্রণালীর মধ্য দিয়া না গেলে ধর্মরাজ্যে অগ্রসর হওয়া সুকঠিন ও অসম্ভব হইয়া পড়ে। পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের জীবন পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে তাঁহারা তাঁহাদের সাধনার প্রথমাবস্থায় কত অধিক বাহ্য প্রক্রিয়া ও প্রণালী দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য-স্বরূপ। তিনি প্রত্যেক ধর্মের যাবতীয় মত ও বাহ্য সাধনগুলি মান্য করিয়া এবং সেইমত কার্য করিয়া তাহার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, যেমন শুধু একটি চাউল বপন করিলে তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয় না, খোসাটি শুদ্ধ ধান্যটি বপন করিতে হয় সেইরূপ বাহ্যিক কার্য ও ক্রিয়া-কলাপ অসার ভাবিয়া ত্যাগ করিলে চলিবে না। যেমন বৃক্ষ উৎপন্ন হইবার পর খোসা বীজ হইতে আপনি খসিয়া যায় সেইরূপ ধর্মপথে দৃঢ় স্থিত হইলে বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপও অন্তর্হিত হইয়া যায়। যে পর্যন্ত আমাদের অন্তঃকরণ নির্মল না হইবে, যে পর্যন্ত ঠিক ঠিক অন্তরে অনিত্য বস্তু ত্যাগ করিয়া নিত্য বস্তুর অদর্শনে ব্যাকুলতা অনুভব না করিব, যে পর্যন্ত যেমন পরমহংসদেব বলিতেন, হরিনাম শ্রবণ মাত্র নয়নে অশ্রুধারা না বহিবে, সেই পর্যন্ত বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই সকল বাহ্যিক না ভাবিয়া চিহ্ন আচারব্যবহার ও রীতিনীতি-গুলিকেই যেন পরমধর্ম বলিয়া ভ্রমে না পড়ি, তাহারা আমাদের অভীষ্টদেবের নিকট উপনীত করিবার পথের সহায়মাত্র।

কর্ম না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না, মন শুদ্ধ ও পবিত্র না হইলে শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্রস্বরূপ ভগবানের দর্শনলাভ কিরূপে ঘটিবে? কায়মনোবাক্যে পবিত্রতাই ধার্মিক হইতে হইলে প্রধান দরকার। যখনই মনে কোন অপবিত্র ভাব আসিবে অমনি তাহাকে ধরিয়া দূর করিয়া দিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণই মনের নিকটে আপাতমনোহর নানা প্রলোভনের সুন্দর ছবি অঙ্কিত করিয়া তাহাকে তত্তদ্বিষয়ে আসক্ত করিয়া কুপথগামী করে। ইহাদিগকে ফিরাইতে হইবে, অসৎ হইতে সৎ বিষয়ে নিযুক্ত করিতে হইবে। আপাততঃ ইহা সহজ বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু সহজ নয় বলিয়া হতাশ হইবার কারণ কিছুই নাই। চাই অদম্য উদ্যম, নিরন্তর অভ্যাস—চাই বিবেক, চাই দৃঢ় অধ্যবসায়, চাই প্রবল আন্তরিক ইচ্ছা। এই প্রবল আন্তরিক ইচ্ছার সম্মুখে সমস্ত বাধাবিঘ্ন পথ প্রদান করে, কার সাধ্য সে গতি রোধ করে? যদি যথার্থ প্রবল ইচ্ছা থাকে সমস্ত শক্তি আসিয়া যাইবে। এরূপ শুভ ইচ্ছা মনে উদিত হইলে ভগবান স্বয়ং বল দান করেন। গীতা বলিয়াছেন—স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। "এই ধর্মের অল্পমাত্রও অনুষ্ঠিত হইলে মহৎ সংসার-ভয় হইতে ত্রাণ করে।" সর্বশক্তিসম্পন্ন ভগবান আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। আমাদের শক্তি ও বীর্যের অভাব কি? আমরা কেবল অবিশ্বাস করিয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না বই তো আর কিছু নয়। এই অবিশ্বাসের মূল হৃদয়ক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত করা চাই। তাঁহার বলে বলীয়ান হইয়া আমরা কি না করিতে পারি?

ভগবানের কৃপায় সকলই হইবে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার অধিকার তোমার নাই। তুমি কার্য-সাধনে অকর্মণ্য বা অক্ষম বলিয়া যদি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে তাহা হইলে কি ক্ষণমাত্র জীবিত থাকিতে পারিতে? দেখিতেছ না—তুমি ধর্মজীবনে নিজেকে দুর্বল ও অশক্ত ধারণা করিয়া ক্রমে ক্রমে জীবন্মৃত হইয়া পড়িতেছ! তুমি সামান্য অর্থসঞ্চয়ের জন্য কত অসহ্য ক্লেশ করিতেছ আর পরমার্থধন পরমেশ্বর তোমার ঘরে আসিয়া ডাকিয়া দিয়া যাইবেন ভাবিয়া রাখিয়াছ, ইহা কি তোমার অসমসাহসিকতা নহে? তুমি জড় অপরা বিদ্যা উপার্জনে নিজের শরীর পর্যন্ত ক্ষয় করিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছ আর সেই পরাবিদ্যা কি বিনা আয়াসে বিনা উদ্যমে আপনা হইতে স্ফূর্তি পাইবে? যদি বিদ্যাশিক্ষা করিতে গিয়া সরস্বতী দেবীর বরে কালিদাসের ন্যায় হঠাৎ বিদ্বান হইয়া যাইব বলিয়া বসিয়া থাকিতে তাহা হইলে কখনও কি বিদ্যাধনে ধনী হইতে পারিতে? ভগবানের উপর সে নির্ভরশীলতা তোমার কই? সে নির্ভরশীলতা যে অনেক পুরুষার্থসাধনের ফল; সে নির্ভরশীলতা যে নিজের অহংজ্ঞান বিনাশ পাইয়া 'ভগবানের আমি', 'আমি তাঁহার দাস' এই জ্ঞান দৃঢ় ধারণা হইলে তবে প্রকাশ পায়। তখন যে নিজের বলিবার কিছু থাকে না, দাসের আবার নিজের ইচ্ছা কি? নির্ভরশীলতা সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ-ত্যাগ বা আত্মোৎসর্গ ব্যতীত আসিতে পারে না। স্বার্থত্যাগই ধর্মের মূলমন্ত্র। ইহা ব্যতীত কেহ কখনও ধর্মরাজ্যে উন্নত জীবন লাভ করিতে পারে না।

ধর্ম দুই ভাবে বিভক্ত হইয়াছে:—সকাম ধর্ম ও নিষ্কাম ধর্ম। কোন কাম্যবস্তু লাভের প্রত্যাশায় যে ধর্ম করা যায় তাহাকে সকাম ধর্ম বলে; এবং কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কেবল ধর্মার্থেই ধর্ম করাকেই নিষ্কাম ধর্মসাধন বলে। নিষ্কামধর্ম সাধনই শ্রেষ্ঠ, কেননা সকাম ধর্মের ফল বিনশ্বর; ফলে আসক্তিই বন্ধনের কারণ; ইহাই আমাদিগকে দুঃখে নিমজ্জিত করে। বিশেষতঃ একটি সৎকার্য করিয়া ভগবানের কাছে ফল আকাঙ্ক্ষা করা আর একটি দ্রব্য দিয়া তাহার মূল্য আদায় করা কি এক কথা নহে? উহা শেষে একটি ব্যবসায়ে পরিণত হয়, তাহাতে ভগবচ্চরণে প্রেম কখনই উদিত হইতে পারে না। যে ভগবানকে সকামভাবে পূজা ও সেবা করে, সে নিজের কামনারই সেবা করে মাত্র। নিষ্কাম সাধক ভগবানকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই ভালবাসে; কেন ভালবাসে তাহা জানে না। এই প্রকার ভক্তই এই সংসারে সুখদুঃখের হাত এড়াইয়া পরম শান্তিময় সচ্চিদানন্দসাগরে আনন্দে ভাসিতে থাকেন। তিনিই অমৃতময় হন।

অনেকের বিশ্বাস যে গৃহস্থাশ্রমে থাকিলে ধর্ম সাধন করা যায় না, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বৃক্ষমূল আশ্রয় না করিলে ধর্মসাধন হয় না। গৃহস্থাশ্রম অর্থে যাঁহারা কেবল পুত্রাদি পালন ও অর্থোপার্জন করা মনে করেন তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। গৃহস্থ কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে শাস্ত্রের উক্তি:—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

"গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া সর্বদা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করিবেন এবং যে কোন কার্য সম্পাদন করিবেন তাহার ফল পরব্রহ্মে অর্পণ করিবেন।" সংসারের মধ্যে অবস্থান করিয়াও সুন্দররূপে নিষ্কাম ধর্ম সাধন করা যায়। সংসার বা সমাজ হইতে ধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু নহে। পরমেশ্বর স্বয়ং সংসারাশ্রমের মূলে অবস্থিত আছেন; সংসার সেই মহোত্তমেরই রাজ্য। প্রকৃত কর্তব্যপরায়ণ সাধকের পক্ষে সংসারের প্রত্যেক কার্যই ঈশ্বরের কার্য। গৃহী সাধক এইরূপে নিষ্কামভাবে ধর্মসাধন করিয়া পরমেশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিবেন। তিনি

প্রাণপণে কার্য করিবেন বটে কিন্তু কখনও তাহার ফলপ্রত্যাশী হইবেন না।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন :—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥

"তোমার কেবল কর্তব্য সম্পাদন করিবার অধিকার আছে, কিন্তু ফল প্রত্যাশা করিবার অধিকার কিছুমাত্র নাই, কর্মের ফলকামনায় তোমার যেন প্রবৃত্তি না জন্মে এবং অকর্ম করিতেও যেন তোমার আসক্তি না হয়।" সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তির মন সর্বদাই ভগবানে লগ্ন রাখা একান্ত কর্তব্য ; প্রলোভন চতুর্দিকে, সাধক যদি ভগবানের দিকে আকৃষ্ট না থাকেন, প্রলোভন তাহাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইবে ; সংসারকে মহাকূপ বলিয়া ধারণা করিতে হইবে ; আমরা যেন তাহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। কত সতর্কতা ও সাবধানতা আবশ্যক! সংসার আমাদের জন্ত হইয়াছে, আমরা সংসারের জন্ত হই নাই ; পদ্মপত্র যেমন জলে থাকে কিন্তু জল পদ্মপত্রে থাকে না সেইরূপ সংসারে থাক কিন্তু সংসার যেন তোমার ভিতর না থাকে। ইহাই প্রধান সাধন। এইরূপ নির্লিপ্ত ভাব কার্যে পরিণত করাই ধর্ম। এই ধর্মলাভ হইলে সাধক যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, সুখদুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, বিপদে সম্পদে তাঁহার সমভাব হৃদয়ে বিরাজ করে, তিনি কোন গুণে আবদ্ধ হন না, তিনি তখন গুণাতীত হন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, সত্ত্ব, রজ ও তম—এই গুণত্রয়ের অতীত যাঁহারা তাঁহারাই সাধু এবং এই গুণত্রয়ের মধ্যে যাহারা তাহারাই অসাধু। ধর্মই আমাদের তমোগুণ হইতে রজোগুণের মধ্য দিয়া সত্ত্বে উপনীত করে। এই সত্ত্বও আমাদের ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করাইতে পারে না, তবে ইহা আমাদিগকে তাঁহার অত্যন্ত নিকট পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। পরে গুণাতীত অবস্থায় উপনীত হইলে তবে সাধকের ঈশ্বরলাভ হয়। সাধক সাধনার কোন বিশেষ অবস্থায় নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, তাঁহাকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে। (ক্রমশঃ)

উমার পরীক্ষা

স্বামী মৈথিল্যানন্দ

গোস্বামী তুলসীদাস তাঁহার 'রামচরিত মানসে' হর-পার্বতীর চরিত্র যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা অপূর্ব ও অতুলনীয়। তিনি পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে নূতন রূপ দিয়া তাঁহাদের চরিত্র পরিস্ফুট ও মনোজ্ঞ করিয়াছেন। শঙ্করের রামভক্তি দেখিয়া সতীর স্তম্ভিত হওয়া, সতীর দক্ষযজ্ঞে গমন, যোগাগ্নিতে সতীর দেহত্যাগ, হিমালয়ের গৃহে পার্বতীর জন্মগ্রহণ, উমার তপস্যা, ও হর-পার্বতী-বিবাহ প্রভৃতি ঘটনাবলীর ভিতরে তুলসীদাস যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন।

হর-পার্বতীবিবাহে তিনি উমার চরিত্র অনবদ্য, উচ্চ আদর্শে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা চিরকাল ভারতীয় সমাজে প্রেরণা আনয়ন করিবে, সন্দেহ নাই।

যখন উমা হিমালয়ের ঘরে আসিলেন, তখন হইতেই সেখানে সকল সিদ্ধি ও সম্পদ্ ভরিয়া উঠিল।

"জব তেঁ উমা শৈলগৃহ জাঈ।
সকল সিদ্ধি সংপতি তহঁ ছাঈ॥"

মুনিরা আসিয়া হিমাচলে বাস করিতে লাগিলেন।

নদীগুলি পবিত্র সলিলে বহিতে লাগিল। পশু, পক্ষী ও পতঙ্গ পরম সুখ অনুভব করিতে লাগিল। সকল জীব স্বাভাবিক বৈর ত্যাগ করিতে লাগিল। প্রজারা সকলেই হিমালয়ের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হইয়া উঠিল। হিমালয়ের নিজের শোভা কেমন হইল? তুলসীদাস উপমা দিয়া বলিতেছেন যে রামভক্তি পাইলে ভক্তের যেমন শোভা হয়, হিমালয়ের তেমনি শোভা দেখা দিল।

"সোহ শৈল গিরিজা গৃহ আয়ে।
জিমি জন রামভগতিকে পায়ে॥"

একদিন দেবর্ষি নারদ কৌতূহলবশতঃ হিমালয়ের ভবনে আগমন করিলেন। হিমালয় তাঁহাকে যথারীতি অভ্যর্থনা ও সমাদর করিয়া অর্চনা করিলেন। তিনি ও রাণী মেনকা দেবর্ষিকে প্রণাম করিয়া কন্যা উমাকে প্রণাম করাইলেন। হিমালয় নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে ঋষি! আপনি তিন কালের কথা জানেন, শুধু তাই নয় আপনি সর্বজ্ঞ। আপনার সব লোকেই যাতায়াত আছে। আপনি এই কন্যার দোষ ও গুণ বিচার করিয়া বলুন।'

"ত্রিকালগ্য সর্বগ্য তুম্হ গতি সর্বত্র তুম্হারি।
কহহু সুতাকে দোষগুণ মুনিবর হৃদয় বিচারি॥"

নারদ হাসিলেন এবং মৃদুবাক্যে রহস্যময় অর্থপূর্ণ কথা বলিলেন। উমা সকল গুণের খনি। সে স্বভাবতঃই সুরূপা, সুশীলা, ও বুদ্ধিমতী। তাহার নাম উমা, অম্বিকা, ও ভবানী।

"কহ মুনি বিহঁসি গূঢ় মৃদুবাণী।
সুতা তুম্হারি সকল গুণখানী॥
সুন্দর সহজ সুশীল সয়ানী।
নাম উমা অম্বিকা ভবানী॥"

দেবর্ষি আরও বলিলেন যে উমার সকল লক্ষণই সুলক্ষণ। সে পতির প্রিয়া হইবে। তাহার এয়োতি অচল থাকিবে। উমার গুণে তাহার জনক-জননীর খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িবে। আবার নারদ হিমালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জানাইলেন যে উমা সকল গুণে ভূষিতা হইলেও দুই চারিটি দোষ আছে। সেই দোষগুলি উমার হাতের রেখায় ধরা পড়িয়াছে। তাহার পতির না থাকিবে কোন গুণ; কোন মান; পিতৃমাতৃহীন ও উদাসীন; অসংসারী ও জটাযুক্ত; অকামী ও উলঙ্গ এবং অমঙ্গল বেশপরা পতির সহিত তাহার বিবাহ হইবে।

"শৈল সুলচ্ছনি সুতা তুম্হারী।
সুনহু জে অব অবগুণ দুই চারী॥
অগুণ অমান মাতুপিতুহীনা।
উদাসীন সব সংসয় হীনা॥
জোগী জটিল অকাম মন নগন অমঙ্গল বেথ।
অস স্বামী এহি কহঁ মিলহি পরী হস্ত অসি রেখ॥"

দেবর্ষির কথা শুনিয়া হিমালয় ও মেনকা সন্তপ্ত হইলেন। কিন্তু উমার আনন্দের সীমা রহিল না। সখীরা রোমাঞ্চিত হইলেন এবং চোখে জলে ভরিয়া উঠিল। দেবর্ষি নারদের কথা মিথ্যা হইবার নহে—ইহা উমা মনে দৃঢ় করিয়া ধরিলেন। কল্পিত পতির পাদপদ্মে উমা প্রেম স্থাপন করিলেন এবং মনের কথা প্রকাশ করিবার এ অবসর নয় বলিয়া ভাব গোপন করিলেন। উমা সপ্রেমে সখীদের কোলে গিয়া বসিলেন। গিরিরাজ, রাণী, ও সখীরা দুশ্চিন্তার কূল পাইলেন না। তখন ধৈর্য ধরিয়া হিমালয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে প্রভু, বলুন কি উপায় করি।'

"কহহু নাথ কা করিয় উপাউ॥"

নারদ বলিলেন, 'বিধাতা কপালে যা লিখিয়াছেন, তা দেবতাই হউক, দৈত্যই হউক আর নর কি নাগ হউক কেহই মেটাইতে পারিবে না।' হিমালয়কে একেবারে হতাশ দেখিয়া দেবর্ষি একটি উপায়ের কথা নির্দেশ করিলেন। যদি শিবের সহিত উমার বিবাহ হয় তবে ভাল, কারণ শিবের দোষগুলিও গুণেরই সমান—একথা সকলেই বলে।

বিষ্ণু সাপের শয্যায় শুইয়া থাকেন, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাঁহার দোষ দেখেন না। সূর্য ও অগ্নি সব রসই ভক্ষণ করেন, কিন্তু কেহ তাহাদের নিন্দা করেন না। মা গঙ্গা ভাল ও মন্দ উভয় জলই বহিয়া লইয়া যান, কিন্তু তাঁহাকে কেহই অপবিত্র বলে না। যিনি শক্তি রাখেন তাঁহার কোনও দোষ নাই।

"সমরথ কহঁ নহিঁ দোষ গোসাঁঈ।"

নারদ সর্বপ্রকারে শিবের সহিত উমার বিবাহ অনুমোদন করিয়া বলিলেন, 'শঙ্কর স্বভাবতঃই শক্তিমান্ ও ঐশ্বর্যবান্। এই বিবাহে সব রকম কল্যাণ হইবে। তাঁহাকে আরাধনা করা কঠিন, কিন্তু যে কষ্ট সহিতে পারে, তাহার কাছে তিনি আশুতোষ। যদি তোমার কুমারী তপস্যা করে, তবে ত্রিপুরারি ভবিতব্যতাও বদ্‌লাইতে পারেন। পৃথিবীতে ত অনেক বরই আছে, কিন্তু এই কন্যার শিব ভিন্ন আর বর নাই।'

"জদ্যপি বর অনেক জগ মাহীঁ।
এহি কহঁ সিব তজি দূসর নাহীঁ॥"

এই বলিয়া দেবর্ষি উমাকে আশীর্বাদ করিলেন এবং ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। এদিকে মেনকা রাণী পতিকে একান্তে পাইয়া গদগদকণ্ঠে বলিলেন, 'হে নাথ! আমি মুনির কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যদি ভাল ঘর, ভাল বর, ও ভাল বংশ হয় এবং উমার অনুরূপ হয় তবেই কন্যার বিবাহ দিব। নচেৎ বরং উমা কুমারী থাকিবে, কিন্তু এমন বরকে উমা দিব না। হে নাথ! উমা আমার প্রাণের মত প্রিয়।'

"জোঁ ঘরু বরু কুলু হোই অনূপা।
করিঅ বিবাহু সুতা অনুরূপা॥
ন ত কন্যা বরু রহউ কুআঁরী।
কন্ত উমা মম প্রাণপিআরী॥"

এই বলিয়া মেনকা পতির পায়ে মাথা ঠেকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দৃঢ়চিত্ত হিমালয় নির্মম উত্তর করিলেন, 'হে রাণি! চাঁদের কিরণ শীতল না হইয়া আগুনের মত হওয়া সম্ভব, কিন্তু নারদের কথা অন্যথা হইবে না।' পরে স্নেহবিগলিত হইয়া হিমালয় বলিলেন, 'হে প্রিয়ে! শোক করিও না। শ্রীভগবানকে স্মরণ কর। উমাকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই তাহার কল্যাণ করিবেন।'

"প্রিয়া সোচু পরিহরহু সব সুমিরহু শ্রীভগবান।
পারবতিহি নিরময়উ জেহি সোই করিহহি কল্যাণ॥"

তপস্যা ছাড়া দুঃখ দূর করিবার অন্য উপায় নাই। তাই হিমালয় মেনকাকে বলিলেন যে সে উমাকে যেন তপস্যা করিবার শিক্ষা দেয়। মেনকা রাণী পতির কথায় আপাততঃ সান্ত্বনা পাইলেন এবং তখনি উমার নিকট গমন করিলেন। উমাকে দেখিয়া মার চোখে জল আসিল এবং কন্যাকে কোলে বসাইলেন। কিছু বলিতে গিয়া মেনকা বলিতে পারিলেন না। উমা মাকে আদর করিয়া মৃদু মৃদু বলিলেন, "মা! আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। একজন গৌরবর্ণ সুপুরুষ ব্রাহ্মণ আমাকে বলিলেন, 'উমা! তুমি তপস্যা কর। নারদ যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য। তোমার বাবা ও মার কাছে ইহা ভাল লাগিবে। তোমার তপস্যা সুখপ্রদ হইবে এবং দুঃখ ও দোষ নষ্ট করিবে।'" ইহা শুনিয়া মা মেনকার মুখে কথা সরিল না এবং পতিকে ডাকিয়া সকল কথা শুনাইলেন। মাকে ও বাবাকে বুঝাইয়া উমা তপস্যার পথে চলিলেন। উমা সুকুমারী, তাঁহার শরীর তপস্যার যোগ্য নয়। তবু তিনি ভাবী পতিকে স্মরণ করিয়া সকল ভোগ ত্যাগ করিলেন।

"অতি সুকুমার ন তনু তপ জোগূ।
পতি পদ সুমিরি তজেউ সব ভোগূ॥"

কঠিন তপস্যা করিয়া উমার দেহ যখন একেবারে ক্ষীণ হইয়া পড়িল তখন আকাশবাণী হইল—'হে গিরিরাজ-কুমারী! শোন, তোমার মনোরথ সফল হইয়াছে। এখন সকল দুঃসহ কষ্ট ত্যাগ কর। তুমি শিবকে পাইবে।'

"ভয়উ মনোরথ সুফল তব সুনু গিরিরাজকুমারি।
পরিহরু দুসহ কলেস সব অব মিলিহহিঁ ত্রিপুরারি॥"

আকাশ-বাণী শুনিয়া উমার রোমাঞ্চ হইল এবং তিনি আনন্দিতা হইলেন। কৈলাসে শিবের নিকট সপ্তঋষি আসিয়া উমার তপস্যার কথা জানাইলেন। শিব বলিলেন, 'তোমরা উমাকে পরীক্ষা কর। গিরিরাজকে পাঠাইয়া উমাকে বাড়ী আনাও এবং আমার সন্দেহ দূর কর।'

সপ্ত-ঋষি নানা প্রকারের প্রলোভন দেখাইয়া উমার নিকট বিষ্ণুকে বিবাহ করিবার প্ররোচনা দিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শিবের অযোগ্যতা দেখাইয়া তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। সপ্ত-ঋষি বলিলেন যে শিব সতীকে বিবাহ করিয়া তাহাকে ফাঁকি দেন এবং সতীর মৃত্যুর কারণ হন। এখন তিনি সুখে নিদ্রা যান, কোন চিন্তা নাই, সারা জগৎ ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। এখন তিনি স্বভাবতঃই একা থাকেন, এমন ব্যক্তির গৃহে কি কখনো স্ত্রী খাপ খায়?'

"অব সুখ সোচত সোচু ন হিঁ ভীখ মাঁগি ভব খাহিঁ।
সহজ একাকিন্হকে ভবন কবহুঁ কি নারী খটাহিঁ॥"

সপ্ত-ঋষি উমাকে আবার বলিলেন, 'হে উমা! তুমি এখনো আমাদের কথা রাখ, আমরা তোমার উপযুক্ত বর ঠিক করিয়াছি। তিনি অতিশয় সুন্দর, পবিত্র, আনন্দদায়ক ও সুশীল। বেদ তাঁহার যশোলীলা গান করিয়া থাকেন। নির্দোষ, সকল গুণে গুণবান্ বৈকুণ্ঠবাসী শ্রীপতি বিষ্ণুকে তোমার বর করিয়া আনিব।' এই কথা শুনিয়া উমা হাসিয়া বলিলেন, 'আপনারা বলিয়াছেন মহাদেব দোষময় এবং বিষ্ণু সকল গুণের ধাম। তথাপি যাহাতে যাহার মন মুগ্ধ হয় তাহাকেই তাহার প্রয়োজন।

"মহাদেব অবগুণভবন বিষ্ণু সকল গুণধাম।
জেহি কর মনু রম জাহি সন তেহি তেহী সন কাম॥"

সপ্ত-ঋষিকে উমা আরও বলিলেন: 'এখন এই জন্মটাই শিবের জন্য কাটাইলাম, এখন আর গুণ-দোষের বিচার কে করে? যদি আপনাদের মনে বিবাহ ঘটাইবার বিশেষ জেদ থাকে এবং ঘটকালী না করিয়া যদি আপনারা থাকিতে না পারেন, তবে কৌতুককারীদের ত আলস্য নাই, জগতে বর-কন্যা অনেক আছে তাহাদের বিবাহ দেওয়াইবেন। আমি জন্ম-জন্মান্তরের জন্য এই জেদ ধরিয়াছি যে হয় শিবকে বরণ করিব, নয়ত কুমারী থাকিব। যদি শিব নিজেও শতবার বলেন তথাপি নারদের উপদেশ আমি ছাড়িব না।'

"জনক কোটি লগি রগরি হমারী।
বরউঁ সম্ভু ন ত রহউ কুআঁরী॥
তজউঁ ন নারদ কর উপদেসূ।
আপু কহহিঁ সত বার মহেসূ॥"

উমার দৃঢ় সঙ্কল্প ও শিবপ্রেম দেখিয়া সপ্ত-ঋষি আর আত্মগোপন করিলেন না এবং ভক্তি-নম্র মুখে যুগপদ্ বলিয়া উঠিলেন,

"জয় জয় জগদম্বিকে ভবানী॥"

"আমি ভাবে বলেছি,—মা, এখানে যারা আন্তরিক টানে আসবে, তারা যেন সিদ্ধ হয়।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

আগমনী

শ্রীচিত্ত দেব
(শান্তিনিকেতন)

মনে তোকে রেখেছি মা
তোর কি মনে আছে আমায়।
কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে
ভুলেছিস কি এই অভাগায়॥

ভালোমন্দ তোর চরণে
সঁপেছিলাম, আছে মনে
কান্নাকাটি করে যখন
ভেসেছিলাম ধরা-ধারায়॥

আজ শরতে এই আকাশে
আনন্দ-রব কেন হাওয়ায়।
'মা আসবে' 'মা আসবে' বলে
কে সাজে আর কে-বা সাজায়॥

আমি মা অভাগা তেমন
মন করে তাই কেমন কেমন
সবার মা কি আমার মা নয়
ঢাক-ঢোলক কি মিছে বাজায়॥

ছেলেমেয়ে পুরুষনারী
সবার পানে চোখ ছুটে যায়
তোকে-ত দেখিনে মাগো
গোল বাধে তাই চাওয়া-পাওয়ায়॥

মনের কোণে চলছে খালি
খোঁজাখুঁজির জোড়াতালি
তুই এসে মোর সামনে দাঁড়া
হাত বুলিয়ে চোখের তারায়॥

আকান্ ব্রহ্মবাদ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিম আফ্রিকার গোল্ড-কোস্ট রাষ্ট্র, এখন ইংরেজদের অধীনস্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই দেশের অধিবাসিগণ শীঘ্রই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আশা করিতেছে। দেশের পরিমাণ প্রায় ৯০,০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ৪৫ লক্ষ। ভারতবর্ষের তুলনায় নিতান্তই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। দেশের অধিবাসীরা কৃষ্ণকায় নিগ্রো বা আফ্রিকান জাতির। ইহারা দুইটী মূল বিভাগে পড়ে। উত্তর গোল্ড-কোস্টের অধিবাসীরা Moshi 'মোশি' জাতির নানা উপজাতির মানুষ, ইহারা Dagomba 'দাগোম্বা', Mamprussi 'মাম্প্রুস্সি', Wala 'ওআলা' প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত, এবং ইহাদের মধ্যে মুসলমান ধর্ম অনেকটা প্রসার লাভ করিয়াছে। মধ্য ও দক্ষিণ গোল্ড-কোস্টে বাস করে Akan 'আকান্' জাতির লোকেরা, ও উহাদের সহিত সংপৃক্ত Guang 'গুআঙ্' জাতির লোকেরা। আকান্ জাতি সংখ্যায় ১০ লক্ষেরও অধিক হইবে, এবং ইহাদের কতকগুলি উপজাতি আছে, যথা,—Asante (Ashanti) বা Twi (Chwi) 'আসান্তে' (আশান্তি) বা 'ত্বী' (চ্বী) এবং Fante 'ফান্তে'। গোল্ড-কোস্ট দেশে সমস্ত বিষয়েই ইহারা একটী প্রগতিশীল জাতি। গোল্ডকোস্ট-এর সর্বজনপ্রিয় নেতা, দেশের নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত Kwame Nkrumah ক্বামে ঙ্‌ক্রুমা, যাঁহাকে Nehru of Gold-Coast 'গোল্ড-কোস্ট-এর নেহরু' বলা হয়, এই আকান জাতির ফান্তে শাখার লোক, ইঁহারই

নেতৃত্বে গোল্ড-কোস্ট এই বৎসরই ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা আদায় করিয়া লইতেছে।

আকান্ জাতির লোকেদের মধ্যে খ্রীষ্টান-ধর্ম কিছুটা প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু ইহাদের প্রাচীন ধর্মমতের প্রতি আস্থাশীল লোকই বেশী। অর্থাৎ প্রাচীন ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান ইহারা ত্যাগ করে নাই। দেশে জাতীয়তা-বোধ এখন বিশেষ ভাবে কার্য্যকর, সেইজন্য ইহাদের মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তি যাঁহারা (এমন কি যাঁহারা ইউরোপে গিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছেন ও যাঁহারা দুই পুরুষের খ্রীষ্টান), তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীন আকান্ ধর্ম ও ধর্মের সহিত ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত সামাজিক রীতি-নীতির সহানুভূতিপূর্ণ আলোচনা দেখা যাইতেছে। আকান্ জাতির দুই জন বিদ্বান্ ভদ্রলোকের নাম এই সম্পর্কে করা যাইতে পারে। একজন হইতেছেন Dr. Joseph Kwame Kyeretwie Boakye Danquah ডাক্তার যোসেফ কামে চেরেত্বীএ বোআচে দান্‌কোয়া। ইনি ১৮৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন, বৃত্তিতে ব্যারিষ্টার, বিদ্যার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক, এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে Ghana Congress Party-র নেতা, যে রাজনীতিক দল ডাক্তার কামে এন্ক্রুমার দ্বারা পরিচালিত Convention Peoples Party-র বিরোধী। ডাক্তার দান্‌কোয়া ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা আকান্ জাতির পূর্ব ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার মতে, খ্রীষ্টাব্দ ১০০০-এর পূর্বে, গোল্ড-কোস্ট-এর বহু উত্তরে, Senegal 'সেনেগাল' ও Niger 'নাইগার' নদীদ্বয়ের মধ্যে, Ghana 'গানা' নামে একটী সমৃদ্ধিশালী আফ্রিকান সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল—এই সাম্রাজ্যের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ এখন পাওয়া গিয়াছে। দেড় হাজার এক হাজার বছর আগে, আরব ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুসারে, এই বিশুদ্ধ আফ্রিকান জাতির লোকেরা তাহাদের রাজা ও পুরোহিতদের পরিচালনায় বিশেষ উচ্চস্তরের সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। পরে দ্বাদশ শতকে উত্তরের মোরোক্কো হইতে, সাহারা মরু অতিক্রম করিয়া আগত আরব ও Berber 'বের্‌বের' বা মুর জাতীয় মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, গানা-রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এইভাবে রাজ্য-ভঙ্গ হওয়ায় গানা জাতির লোকেদের অনেকে দক্ষিণের দিকে চলিয়া যায়, ও মধ্য গোল্ড-কোস্টে উপনিবিষ্ট হইয়া সেখানে 'আকান্' জাতিতে পরিণত হয়, ও ইহাদের ধর্ম ও সভ্যতা ক্রমে আকান্ সভ্যতা ও ধর্ম রূপে পরিবর্তিত হয়। 'গানা' শব্দের আধুনিক বিকারে 'আ-কান্' শব্দের উৎপত্তি।

রাজনৈতিক মতভেদ থাকা সত্ত্বেও, ডাক্তার দানকোয়া জাতীয়তাবাদী পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া গোল্ড-কোস্ট-এ সকলের নিকটে সম্মানিত। তাঁহার লেখা একখানি উপাদেয় বই আছে—The Akan Doctrine of God—a fragment of Gold Coast Ethics and Religion (Lutterworth Press, London 1944)। ইহাতে আকান জাতীয় পুরোহিত ও ধর্মনেতাদের বিচার অনুসারে পরমেশ্বর সম্বন্ধে এই আফ্রিকান জাতির ধারণা এবং সামাজিক আদর্শবাদ বিশেষ পর্য্যবেক্ষণের সহিত আলোচিত হইয়াছে। Dr. K. A. Busia বুসিয়া, গোল্ড-কোস্ট-এর রাজধানী Accra আক্রার নিকটে Achimota আচিমোতা গ্রামে স্থাপিত গোল্ড-কোস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক,—ইনি হইতেছেন গোল্ড-কোস্ট-এর আর একজন তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি, স্থানীয় ধর্ম ও সমাজ লইয়া ইনি সার্থক গবেষণা করিতেছেন। আশান্তি জাতির সম্বন্ধে ইঁহার একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ আমি পাঠ করিয়াছি। (African Worlds—Studies in the Cosmological Ideas and Social Values of African Peoples, Ed. by Professor Daryll Forde, International Africa Institute, Oxford University

Press, 1954, pp. 190-209)। ১৯৫৪ সালে পশ্চিম আফ্রিকা ভ্রমণকালে আক্রা নগরীতে ডাক্তার দানকোয়ার গৃহে আহূত হই, এবং কতকগুলি আফ্রিকান পণ্ডিত সজ্জনের সহিত তাঁহার গৃহে নৈশ-ভোজে আপ্যায়িত হই। তখন ডাক্তার দানকোয়ার বই পড়ি নাই, তবে তাঁহার সঙ্গে আকান্ ধর্ম সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছিল। ডাক্তার বুসিয়া ঐ সময়ে আমেরিকায় ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হয় নাই।

ইংরেজ লেখক Captain R. S. Rattray র‍্যাট্রে, যিনি গোল্ড-কোস্ট-এ বহুকাল ধরিয়া সরকারী কর্মচারী ছিলেন, আশান্তি বা আকান জাতি সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন, এবং আশান্তি সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার কতকগুলি প্রামাণিক বই আছে।

আকান্ জাতি এক সর্বশক্তিমান্ বিশ্বের আদি-কারণ-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি আস্থা পোষণ করে। এই পরমেশ্বরের নাম ইহাদের ভাষায় Onyan-kopon 'ওঞ্যান্‌কোপন্' অর্থাৎ 'একক অদ্বিতীয় বিরাট্ পুরুষ'। প্রত্যেক মানুষের এই সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সান্নিধ্য-লাভের শক্তি ও অধিকার আছে। ইহার জন্য মধ্যস্থ-রূপে কোনও পুরোহিতের আবশ্যকতা নাই। এই ওঞ্যান্‌কোপন্-এর পূজার জন্য পৃথক্ পুরোহিত-শ্রেণী নাই, কিন্তু ওঞ্যান্-কোপনের প্রতিভূ বা সগুণ প্রকাশ-স্বরূপ Obosom 'অবোসোম্' অর্থাৎ মূর্তিধারী অন্য দেবতার পূজায় পুরোহিতের আবশ্যকতা আছে। অন্য সমস্ত দেবতা ওঞ্যান্‌কোপনেরই অংশ, এবং তাঁহার মুখপাত্র। আশান্তি ধর্মে বিভিন্ন দেবতা আছে। নানা নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতারাই হইতেছেন প্রধান, নদী ও সাগর ওঞ্যান্‌কোপন-এর সন্তান। দেবতাদের সম্বন্ধে আকান্ জাতির ধারণা, অন্য ধর্মের লোকেরা তাহাদের অর্চিত বা সম্মানিত দেবতা, দেবদূত, সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতির সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকে, ঠিক তাহারই অনুরূপ। পূজা (নৈবেদ্য, সম্মাননা) দিয়া দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখিতে হয়, পরিবর্তে জীবনে সুখ সমৃদ্ধি শান্তি আনন্দ মিলে। দেবতারা তাঁহাদের পুরোহিতদের মাধ্যমেই ভক্তদের সঙ্গে ব্যবহার করেন, পুরোহিতদের উপর দেবতাদের 'ভর' হয়। সমগ্র বিশ্বজগৎ দেবতাময়—দেবতার মত এক অদৃশ্য শক্তি পাহাড়-পর্বত নদ-নদী সাগর-ভূমি গাছ-পালা পশু-পক্ষী সমস্তকেই আবিষ্ট করিয়া আছে। মনুসংহিতার উক্তি—"অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে তৃণ-গুল্মলতাদয়ঃ"—সেইরূপ ধারণা আকান্ জাতির মধ্যে প্রবল-ভাবেই বিদ্যমান। এই ধারণার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই আকান্ ও অনুরূপ আফ্রিকান ধর্ম-মতের একটী ইউরোপীয় সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে Animism, অর্থাৎ 'ভূতাত্মবাদ'। 'অবোসোম্' বা সগুণ দেবতাদের মধ্যে Asase Yaa "আসাসে-য়াআ" বা পৃথিবীদেবীর সম্মাননা অতি উচ্চে। পৃথিবী আমাদের ধারণ করেন, ফলমূল শস্যাদি দ্বারা আমাদের পোষণ করেন। কিন্তু অন্য দেবতাদের মত পৃথিবীদেবী ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেন না।

'অবোসোম্' বা দেবতাদের নীচেই asuman 'আসুমান্' অর্থাৎ দৈবীশক্তিযুক্ত বা জাদুগুণ-সম্পন্ন নানা জড়িবুটী, মালার দানা, উপলখণ্ড, ভেড়ার শিং বা লাউয়ের খোলের মধ্যে রাখা নানা তুকতাকের জিনিস। দিব্যগুণ বা শক্তিযুক্ত এই সব ছোট-খাট বস্তুকে পোর্তুগীসরা fetiçao 'ফেতিশাউ' (বা মানুষের হাতের কাজ) এই নাম দিয়াছিল। ইংরেজী শব্দ fetish অর্থাৎ 'তুকতাকের জিনিস', এই শব্দ থেকেই হইয়াছে, এবং তদনুসারে এই ধর্মকে, ইহার স্থূল বাহিরেকার দিকের জন্য লোকের দ্বারা বিচার অনুসারে এই জন্য আবার Fetishism বলা হয়। জাদুবিদ্যায়, এবং পাপময় অপদেবতার সাহায্যে মানুষের হানি করা প্রভৃতির সম্ভাবনায় ইহাদের বিশ্বাস অত্যন্ত অধিক। বনে জঙ্গলে নানা প্রকারের বামনাকার অপদেবতা বাস

করে, ইহাদের mmoatia বা ক্ষুদে' দেবতা বলে। Abayifo 'আবায়িফো' বা ডাইনীতে বিশ্বাস আছে। এক অরণ্যচারী রাক্ষসকে ইহারা মানে, তাহার নাম হইতেছে Sasabonsam 'সাসাবোন্সাম্'। এই অপদেবতাটীর চেহারার কল্পনা এইরূপ—সারা গায়ে লম্বা লম্বা লোম, লাল লাল ভাঁটা আকারের চোখ, লম্বা লম্বা পা, এবং পায়ের চেটো সামনে পিছনে দুই দিকেই চলে। খুব উঁচু কোন গাছের ডালে এই সাসাবোন্সাম্ পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকে, এব নিশ্চিন্ত পথচারী লোককে পা দিয়া ধরিয়া টানিয়া তুলে। কখনও কখনও এইসব অপদেবতা আবার দয়াও দেখায়,—বনের শিকারীরা ইহাদের অনুগ্রহ পাইয়া অনেক সময়ে রোগ দূর করিবার জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে।

আশান্তিদের ধারণা, মানুষের দৈহিক সমাবেশে সে পায় মায়ের কাছ থেকে রক্তমাংস বা দেহ-পিণ্ড (এদের পারিভাষিক শব্দ mogya মোজা), আর বাপের কাছ থেকে পায় আত্মা (ntoro 'স্তোরো')। পিতার সঙ্গে যে সম্বন্ধ, মাতার সঙ্গে সে সম্বন্ধ নাই। মায়ের সঙ্গে সম্পর্কটাকে ইহারা গভীরতর মনে করে বা করিত। সামাজিক ব্যবস্থা matriarchal বা মাতৃনিষ্ঠ, patriarchal বা পিতৃনিষ্ঠ নহে। mogya 'মোজা' বা দেহপিণ্ড বা রক্তমাংস এবং ntoro স্তোরো বা আত্মা ব্যতীত, মানুষের মধ্যে আরও দুইটী বস্তু আছে; একটী হইতেছে sunsum 'সুন্সুম্' বা তাহার 'অহং-ভাব বা ব্যক্তিত্ব', আর একটী হইতেছে kra বা 'জীবনী শক্তি'। 'সুন্সুম্' বা ব্যক্তিত্ব চিরস্থায়ী নহে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিনাশ হয়। Kra 'ক্রা' হইতেছে ঈশ্বর-দত্ত; কিন্তু sunsum সুন্সুম্ বা ব্যক্তিত্ব, ntoro স্তোরো বা আত্মা, ক্রা-য়ের মত পিতা হইতেই লব্ধ জীবের আধ্যাত্মিক উপাদান। আশান্তি জাতির মধ্যে, আমাদের বিভিন্ন গোত্রের মত, বিভিন্ন শ্রেণীর 'স্তোরো' ধরিয়া মানব-সমাজ গঠিত হইয়াছে।

আশান্তি (আকান) ধর্মের একটী প্রধান দিক্ হইতেছে, পিতৃপুরুষের প্রতি সম্মাননা, তাঁহাদের পূজা। ইহাকে এক প্রকার আকান সমাজের ভিত্তি বলা যায়। আকান জাতির মানুষ যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে, তাহারা এই পিতৃপুরুষের পূজা, এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্ব-প্রপঞ্চ সম্বন্ধে, সামাজিক একতা বা একাত্মভাব রক্ষা সম্বন্ধে আকান জাতির মনে যে গভীর আস্থা বিদ্যমান, সেগুলিকে সর্বত্র বর্জন করিতে পারে নাই। ইহা আকান ধর্মের আভ্যন্তর শক্তিরই পরিচায়ক। উপরে মানুষের জ্ঞানগোচরের অতীত, অব্যক্ত সর্ব-শক্তিমান পরমেশ্বর ওঞ্জান্কোপন্; পরে তাঁহারই বিরাট্ দেহের অংশ, মূর্ত নানা দেবতা; তাহার পরেই আসে পিতৃপুরুষ, শ্রাদ্ধের মত নানা অনুষ্ঠানের দ্বারা মানুষ সামাজিক-ভাবে ও ব্যক্তিগত-ভাবে পিতৃপুরুষগণের সঙ্গে যোগ রাখিয়া চলে, নহিলে তাহার সামাজিক মঙ্গল অসম্ভব। এই-সব পুরাতন বিচার বা বোধ ধর্মান্তরিত আকানের মনে-ও প্রবলভাবে বিদ্যমান। পুরাতন আকান ধর্ম নবাগত খ্রীষ্টীয় ধর্মকেও আপনার রঙ্গে রঙ্গাইয়া লইতেছে, যেমন অন্যত্র সমস্ত দেশেই হইয়াছে ও হইতেছে। ইস্লাম সম্বন্ধেও সেই কথা। ডাক্তার বুসিয়ার উক্তি প্রণিধানযোগ্য : The ceremonialism connected with ancestor-worship has made it a resilient force which Christianity has not assailed. Many Ashanti Christians join in *Adae* celebrations with their fellow country-men and share the sentiments that the ceremonials keep alive: a sense of tribal unity and continuity, and a sense of dependence upon the

ancestors. This aspect of Ashanti life has suffered little change from the impact of European civilisation. ......The Ashanti Christian most probably still accepts the view of the universe and of man that has dominated Ashanti thought for generations. It is a part of his cultural heritage...... The Ashanti concept of man has not changed either... .Moreover, Christian teaching has confirmed the Ashanti conception of the soul......On the social level, and in certain details of conduct, Christianity is influencing Ashanti society, but in matters like birth or funeral rites, where questions of the interpretation of the universe come in, the influence of Christianity is slight······ (পূর্বোল্লিখিত Dr. Daryll কর্তৃক সম্পাদিত পুস্তকের ২০৮ ও ২০৯ পৃষ্ঠা)।

ডাক্তার বুসিয়ার এই উক্তগুলিও লক্ষণীয় (পৃষ্ঠা ২০৫): The Gods are treated with respect if they deliver the goods, and with contempt if they fail ; it is the Supreme Being and the ancestors that are always treated with reverence and awe, a fact which an onlooker who has seen Ashanti chiefs or elders making offerings or pouring libations to the ancestors can hardly fail to observe. The Ashanti, like all other Akan tribes, esteem the Supreme Being and the ancestors far above gods and amulets. Attitudes to the latter depend upen their success, and vary from healthy respect to sneering contempt.

বুঝা যাইতেছে যে, আকান্ জাতির মধ্যে উচ্চ চিন্তার পরিচায়ক ঈশ্বর ও মানব বিষয়ে কতকগুলি ধারণা বা বিচার এতটা ব্যাপক-ভাবে ও গভীর-ভাবে স্থান করিয়া লইয়াছে যে, তাহা দূর করা কঠিন। ধর্মান্তরিত আকানের চিন্তাপ্রণালীতে, তাহাদের গৃহীত খ্রীষ্টান (ও সম্ভবতঃ ইসলাম) ধর্ম, আকান্ ধর্মের চিন্তা ও অনুষ্ঠানের রঙ্গে যে রঞ্জিত হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সহজ-ভাবেই, বিনা প্রশ্নে, ভারতীয় চিন্তাপদ্ধতিতে, 'ভারত ধর্মে' জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে পূর্ণ আস্থা পোষণ করে, এমন হিন্দু-বংশজ বহু খ্রীষ্টান ও মুসলমান যেমন এ দেশে দেখা যায়। ডাক্তার দানকোয়ার বইয়ে আকান্ ধর্ম-চিন্তকদের মত অনুসারে, পরমেশ্বর সম্বন্ধে ও জীব-প্রকৃতি সম্বন্ধে উহাদের বিচারের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরমেশ্বরের নানা নাম আকান্ ভাষায় প্রচলিত। এই-সব নামের বিশ্লেষণ করিলে, আকান্ ব্রহ্মবাদের যথেষ্ট দিগ্দর্শন লাভ করা যায়। আকান্ ভাষায় পরমেশ্বরের তিনটী মুখ্য নাম আছে—Onyame 'ওঞামে' যাহার অর্থ, সাধারণ ভাবে, 'পরমেশ্বর'; Onyankopon 'ওঞান্কোপন'—যিনি হইতেছেন মানুষের পূজার পাত্র ব্যক্তি-স্বরূপ পরমেশ্বর ; এবং Odomankoma 'ওদোমান্কোমা'—অর্থাৎ বিশ্বরূপ অক্ষর অক্ষয় পরমেশ্বর, যিনি এক হইলেও বহু এবং তাঁহার বহু রূপ সর্বত্র দৃশ্যমান ; অসীম, এবং ঐশ্বর্যশালী ভগবান ; অক্ষয় প্রাচুর্যের স্রষ্টা এবং দাতা। ওদোমান্কোমা সম্বন্ধে একটী গীত—

"ওদোমান্কোমা, তিনিই বস্তু (the Thing =the Universe—বিশ্ব-প্রপঞ্চ, সমগ্র-ভাবে প্রকৃতি) সৃষ্টি করিয়াছেন। তক্ষণকারী বিধাতা,

তিনিই বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি কি সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন ঋত (Esen =Order—পরিপাটী, নিয়মানুবর্তিতা, সব কিছুর আভ্যন্তর ধর্ম) ; তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন জ্ঞান, তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যু, এবং মৃত্যুর সারাৎসার।"

অন্য কয়েকটী নাম—Brekyirihunuade (ব্রেচিরিহুন্বাদে)—অর্থাৎ 'যিনি সামনে অথবা পিছনে অবস্থিত সব কিছুই দেখেন ও জানেন—সর্বদ্রষ্টা সর্বজ্ঞ' ; Abommubuwafre (আবোম্মুবু-ওআফ্রে)—অর্থাৎ 'যাহার নিকট আমাদের দুঃখ বেদনার কথা জানাই—বিপদ্‌বারণ' ; Nyaamane-kose (ঞাআমানেকোসে)—'আপদ্-বিপদ্ আসিলে যাঁহার কাছে সান্ত্বনা চাই' ; Tetekwa-framua (তেতেকাফ্রামুআ)—'যুগাদি-কাল হইতে যিনি বিদ্যমান' ; Oboadee (ওবোআদেএ)—'যিনি বিশ্ববস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রকৃতির স্রষ্টা' ; Opanyin (ওপাঞিন্)—'প্রভু, রাজা' ; Nana (নানা)—'আদি পুরুষ' ; ইত্যাদি।

পরমেশ্বরের নাম লইয়া ইহাদের মধ্যে নানা প্রবাদ আছে, সেগুলি সকলেই সময়মত প্রয়োগ করিয়া থাকে। এক হিসাবে বলিতে পারা যায় যে, ইহাদের দার্শনিক বিচার বা সমীক্ষা, আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রের সূত্রের মত, প্রবাদের আকারেই বা প্রবাদের মাধ্যমেই রক্ষিত এবং পরম্পরা ধরিয়া সুরক্ষিত হইয়া-ই আছে। এইরূপ দুই-চারিটী প্রবাদ, অথবা প্রবাদের আকারে ধর্ম-চিন্তার সূত্র :

(১) সব মানুষই ওঞামের সন্তান (অর্থাৎ 'অমৃতস্য পুত্রাঃ')—কেহই ভূমির পুত্র নহে।

(২) বাজ-পাখী বলে—যাহা-কিছু ওঞামে করিয়াছেন সবই ভাল।

(৩) পৃথিবী বিপুলা, রাজা কিন্তু ওঞামে।

(৪) ওঞামে যে নিয়ম (Order, ঋত) বাঁধিয়া দিয়াছেন, কোনও জীবিত মানব তাহার পরিবর্তন করিতে পারে না।

(৫) সকলে মিলিয়া যদি ওঞান্‌কোপন-এর সঙ্গে দুঃখ পাই, ব্যক্তিগত ভাবে কেহই তাহা হইলে দুঃখ পায় না।

(৬) আকাশের দিকে তাকাই, তবুও ওঞান্‌কোপন্‌কে দেখিতে পাই না; মাটিতে মুখ রগড়াইলে কি হইবে?

(৭) তোমার সুরাপাত্র আর কেহ ফেলিয়া দিক্, কি ক্ষতি? পরমেশ্বর আবার তাহা পূরণ করিয়া দিবেন।

(৮) ঈশ্বর তোমায় না মারিলে, জীবিত মানুষ আসিয়া তোমাকে মারুক, তুমি বিনষ্ট হইবে না।

(৯) যদি পরমেশ্বরের দাস হইতে চাও, কোনও শর্ত করিও না।

(১০) ওদোমান্‌কোমা ধনীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, দরিদ্রকেও সৃষ্টি করিয়াছেন।

(১১) ওদোমান্‌কোমা-ই মৃত্যুকেও বিষ পান করাইয়াছিলেন, আর কেহ নহে।

ডাক্তার দানকোয়ার মতে, আকান্ চিন্তা অনুসারে পৃথিবী বা বিশ্ব-প্রপঞ্চের অভ্যন্তরেই ঈশ্বর বিরাজমান ;—পরব্রহ্ম সম্বন্ধে ভারতের কথায় যেমন, "খেলতি অণ্ডে, খেলতি পিণ্ডে"—বিশ্বের বাহিরে অবস্থিত প্রভু বা ঈশ্বর নহেন : The Deity does not stand over against His own creation, but is involved in it. He is "of" it. খ্রীষ্টান মতানুসারে, পৃথক্ পাপ-পুরুষ শয়তানের অবস্থান, যেন ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তার বিরোধী ব্যাপার। আকান মতে, Nana, the principle that makes for good, is himself or itself (এখানে নির্গুণ ব্রহ্মের উপযুক্ত নপুংসক লিঙ্গের প্রয়োগ লক্ষণীয়) participator in the life of the whole, and is not only head, but because it is head (অর্থাৎ রাজা বা শাসক মূর্তিতে),

has to strive and struggle for the place of leader as the individuals of the group do, then physical pain and evil are revealed as natural forces which the Nana, in common with the others of the group, have to master, dominate, sublimate or eliminate...The being of Nyankopon, in the ideal the pursuit of which man hopes to be good, is revealed in its greatest perfection wher: all evil progressively mastered. The revelation may be slow, delayed, thwarted and obstructed by man's own ignorance, or sheer unwillingness to see the light where it shines most, but until that revelation is complete, evil will continue, not as apart from life, but as apart from life, but as part of life, a condition which makes it all the more necessary to have a complete knowledge of Nyankopon, for it is only in knowing him fully that evil is elimintated from the *Sunsum* and *Okara* (the soul) becomes complete master of his Destiny. (ডাক্তার দান্‌কোয়ার পুস্তক, পৃঃ ৮৮-৮৯)। এখানে বেদান্তের মত জ্ঞানের দিকে ঝোঁক দেওয়া লক্ষণীয়।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে আফ্রিকার কৃষ্ণকায় মানবের মনে আমাদেরই মত শাশ্বত সত্তা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিয়াছিল; এবং এই কৃষ্ণকায়, তথাকথিত অনুন্নত মানব যে বিচার ধারা গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা সমগ্র সভ্য জগতের কাছে আদরের সহিত আলোচনার বিষয়। ডাক্তার দানকোয়া আরও নানা খুঁটিনাটি কথায় আলোচনা করিয়াছেন—যেমন আকান ধর্মনীতি, মানবের নৈতিক প্রগতি, মানবজাতির সামূহিক প্রগতি। সত্য বা সদ্‌বস্তু সম্বন্ধে, জাতি ও মানব সম্বন্ধে, আদর্শ পুরুষ সম্বন্ধে আকান জাতির ধারণা, ইত্যাদি কতকগুলি গভীর বিষয়ে তিনি তাঁহার জাতির জ্ঞানী পুরুষদের বিচার বলিয়া যাহা ধরিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। কতদূর পর্য্যন্ত এই-সমস্ত বিচার সত্য-সত্যই আকান জাতির, আর কতদূর পর্য্যন্ত তাঁহার নিজের—এ বিষয়ে হয় তো প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু তিনি ইউরোপীয় বিদ্যায়—দর্শন, ইতিহাস, ব্যবহার-শাস্ত্র প্রভৃতিতে—বিশেষ পণ্ডিত হইলেও, নিজে জাতিতে আকান তো বটে; সুতরাং টীকাকার বা ব্যাখ্যাকার-রূপে তিনি যাহা বলিতেছেন, বা বলিতে চাহেন, তাহাও প্রাচীন আকান মতবাদের আধারেই পরীক্ষা করিতে হইবে। তবে এই আলোচনা প্রসঙ্গে একটী কথাই প্রমাণিত হইতেছে—বিভিন্ন চিন্তার ধারা প্রায়-ই এক-ই পথ ধরিয়া চলে, এবং এক-ই লক্ষ্যে গিয়া পঁহুছায়; এবং সমস্ত মতবাদের ভিতরে এক-ই মূল-সূত্র কাজ করিতেছে, সেই মূল-সূত্র হইতেছে—ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষা বা আদর্শের জন্য অথবা শাশ্বত বস্তুর জন্য আকুল আগ্রহ সব দেশের সব যুগের সব জাতির মানুষকেই এক করিয়া দিয়াছে॥

চলিয়াছি সেই আশা নিয়া"

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

আকাশের নীল আর শুভ্র চাঁদখানি,
সুন্দর দখিনা বায়, গন্ধময় ফুল—
আত্মপরিজনগণ প্রেম আর স্নেহ যত্ন দানি
ভুলায়ে রেখেছে মোরে।

বলিয়াছি কত—"ওগো, ভেঙে দাও ভুল
জোয়ারের টানে নিয়ে যেয়ো না আমারে—
হে পৃথিবী, নিবেদি তোমারে।

এই পৃথিবীর মায়া সহস্র বন্ধন দিয়া
বাঁধিয়াছে মোরে—
কে আমি, কোথায় ছিনু, কে আমারে দিল পাঠাইয়া
তার কথা ভাবিবার তরে
পৃথিবী একটু ছুটি দিল না আমায়।
দিন রাত্রি কাজ—কাজ, ভুলে আমি আপনারে যাই
বিঘ্ন কে জড়ায় পায় পায়—
মিথ্যা জানি এ পৃথিবী, তবু কেন ইহারেই চাই?

করি আত্মপ্রবঞ্চনা, নিজেরে ভুলাই মিথ্যা দিয়া,
সত্যকে চাহিনি পেতে, মিথ্যা নিয়ে দিবস কাটাই
ভুলেও ভাবিনি আমি আসিবার কালে
আসিনু কি নিয়া?
আজ আমি কাহারে সুধাই—
কহ কে দিবে উত্তর
তারপর?

যৌবন আসিল কবে—
আবার কখন গেল চলে,
আমার সকল স্বপ্ন, আশা ও ভরসা
দুই পায়ে দলে?
আজ বড় ক্লান্ত আমি, আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরি শুধু
কহ কোথা মিলিবে আশ্রয়?
আজ আসিয়াছে ক্ষণ শ্রান্তি ক্লান্তি বহি,
চাহি বরাভয়—
মনে হয় নাই রে সময়।

কে ডাকিয়া বলে যায়—"মিথ্যা আশা,
মিথ্যে ভালবাসা
ওরে মূর্খ, কি লইয়া আছিস ভুলিয়া?
আজ ভাব—কি যে এলি নিয়া
যাওয়ার সময় এলো
মিছে তোর বাঁধা আর বাসা।
রিক্ত এ পৃথিবী আজ; আকাশের নীল
আলোময় চাঁদ আর তারা,
ফুলসাজি, হাসি গান মিথ্যে হয়ে গেছে
আপনারে চেয়ে দেখি রিক্ত আমি,—আমি সর্বহারা।

আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরি, পেতে চাই একটু সান্ত্বনা;
কি চাহিয়া কি পেয়েছি পড়ে না তো মনে;
হারানো সত্যেরে খুঁজি,—
দেখা তার আজও মিলিল না।
হয়তো পাব সে সত্যে, চলিতে চলিতে
জীবনের শেষ প্রান্তে গিয়া;
চলিয়াছি সেই আশা নিয়া।

"জগতের মধ্যে যারা সেরা ও পরমসাহসী, যাতনাই তাদের বিধিলিপি। * * * আমার স্বাভাবিক অবস্থায় আমি তো নিজের দুঃখযন্ত্রণাকে সানন্দেই বরণ করি। কাউকে না কাউকে এ জগতে দুঃখভোগ করতেই হবে; আমি খুশী যে, প্রকৃতির কাছে যারা বলিপ্রদত্ত হয়েছে, আমিও তাদের একজন।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

(১।১১।১৮৯৯ তারিখের একটি পত্র হইতে)

কাব্যে অলঙ্কার-প্রয়োগের তাৎপর্য

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম্-এ, পি-আর্-এস্, পি-এইচ্-ডি

কালিদাসের উপমার কথা প্রসিদ্ধির ভিতর দিয়া এখন প্রায় জনপ্রবাদে পর্যবসিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যালোচনার পরিধি অতিক্রম করিয়া এখন সালঙ্কার-বাক্‌চাতুর্যের প্রসঙ্গেও কথাটি শিথিল ভাবে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। কালিদাসের উপমার কথা আমরা যখন বলি তখন আমরা শুধু মাত্র তাঁহার উপমা-অলঙ্কারের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের কথাই বলি না, তাঁহার অনুকরণীয় সালঙ্কার একটি বিশেষ প্রকাশভঙ্গির কথাই বলি। সুতরাং কালিদাস সম্বন্ধে উপমা কথাটির বাচ্য সর্ববিধ অলঙ্কার। সর্ববিধ অলঙ্কার অর্থে উপমা কথাটির ব্যবহার নিতান্ত অযৌক্তিক বা অসার্থক নয়; উপমাই সর্বপ্রকার অর্থালঙ্কারের মূলীভূত অলঙ্কার। আমরা একটু বিশ্লেষণ এবং বিচার করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইব, কোনও জাতীয় সাদৃশ্য বা সাধর্ম্যই হইল উপমা-অলঙ্কারের মূল—অন্যান্য সকল অলঙ্কারের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই এই সাদৃশ্য বা সাধর্ম্যের বিবিধ এবং বিচিত্র প্রয়োগ—হয় অন্বয়ার্থকরূপে না হয় নঙর্থকরূপে। বিরোধ বা বৈসাদৃশ্যও সাদৃশ্য এবং সাধর্ম্যেরই অপরদিক মাত্র।

উপমা-অলঙ্কারের এই যে বহু-অলঙ্কারমূলত্ব এ-বিষয়ে প্রাচীন আলঙ্কারিকগণই আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। অপ্যয় দীক্ষিত তাঁহার 'চিত্রমীমাংসা' গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

উপমৈকা শৈলূষী সংপ্রাপ্তা চিত্রভূমিকাভেদান্।
রঞ্জয়ন্তী কাব্যরঙ্গে নৃত্যন্তী তদ্বিদাং চেতঃ॥

অর্থাৎ—উপমা হইল একমাত্র নটী—যে বিচিত্র-ভূমিকা-ভেদ লাভ করিয়া কাব্যরূপ রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করে এবং কাব্যবিদ্‌গণের চিত্ত রঞ্জন করে।

আমরা একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, কথাটি খুব গূঢ়ার্থব্যঞ্জক। কাব্যের ভিতরে কাব্যরসিকগণের চিত্ত রঞ্জন করিবার জন্য যত প্রকারের কলাকৌশল তাহা মূলে ঐ একা উপমা-রূপিণী নটীরই বিচিত্র লীলাবিলাস। অপ্যয় দীক্ষিত তাঁহার নিজের কথার স্পষ্ট প্রমাণ করিবার জন্য একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মুখ এবং চন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া সব কথাটি বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

চন্দ্র ইব মুখমিতি সাদৃশ্যবর্ণনং তাবদুপমা। সৈবোক্তিভেদেনানেকালঙ্কারভাবং ভজতে। তথাহি। চন্দ্র ইব মুখং মুখমিব চন্দ্র ইত্যুপমেয়োপমা। মুখং মুখমিবেত্যনন্বয়ঃ। মুখমিব চন্দ্র ইতি প্রতীপম্। চন্দ্রং দৃষ্টা মুখং স্মরামীতি স্মরণম্। মুখমেব চন্দ্র ইতি রূপকম্। মুখচন্দ্রেন তাপ শাম্যতীতি পরিণামঃ। কিমিদং মুখমুতাহো চন্দ্র ইতি সন্দেহঃ। চন্দ্র ইতি চকোরাস্তম্মুখমনুধাবন্তীতি ভ্রান্তিমান্। চন্দ্র ইতি চকোরাঃ কমলমিতি চঞ্চরীকাস্তন্মুখে রজ্যন্তীত্যুল্লেখঃ। চন্দ্রোঽয়ং ন মুখমিত্যপহ্নবঃ। নূনং চন্দ্র ইত্যুৎপ্রেক্ষা। চন্দ্রোঽয়মিত্যতিশয়োক্তিঃ। মুখেন চন্দ্রকমলে নির্জ্জিতে ইতি তুল্যযোগিতা। নিশি চন্দ্রস্তন্মুখং চ হৃষ্যতীতি দীপকম্। ত্বন্মুখমেবাহং রজ্যামি চন্দ্র এব চকোরো রজ্যত ইতি প্রতিবস্তূপমা। দিবি চন্দ্রো ভুবি তন্মুখমিতি দৃষ্টান্তঃ। মুখং চন্দ্রশ্রিয়ং বিভর্তীতি নিদর্শনা। নিষ্কলঙ্কং মুখং চন্দ্রাদতিরিচ্যতে ইতি ব্যতিরেকঃ। ত্বন্মুখেন সমং চন্দ্রো নিশাসু হৃষ্যতীতি সহোক্তিঃ। মুখং নেত্রাঙ্করুচিরং স্মিতজ্যোৎস্নোপশোভিতমিতি সমাসোক্তিঃ। অব্জেন সদৃশং বক্ত্রং হরিণাহিতশক্তিনা ইতি শ্লেষঃ। মুখস্য পুরতশ্চন্দ্রো নিষ্প্রভ ইত্যপ্রস্তুত প্রশংসা। এবমুক্তানেকালঙ্কারবিবর্তবতীয়মুপমা।

প্রথমতঃ দেখিতে পাই, 'চন্দ্রের মত মুখ' এই কথা বলিলে চন্দ্র এবং মুখের মধ্যে সৌন্দর্য ও

মাধুর্যের যে সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহার বর্ণনে উপমা অলঙ্কার হইল। 'চন্দ্রের মত মুখ' এই কথাটিকেই বলিবার বিচিত্রভঙ্গিভেদে উপমা স্থলে অন্যান্য নানারূপ অলঙ্কার সম্ভব হইয়া উঠে। যেমন—যদি বলা যায়, 'চন্দ্রের মত মুখ, মুখের মত চন্দ্র' তাহা হইলে পূর্ববাক্যের উপমান (চন্দ্র) এবং উপমেয় মুখ পরবাক্যে বিপরীতভাবে বর্ণিত হইল বলিয়া এখানে 'উপমেয়োপমা' হইল। 'মুখ মুখের ন্যায়' এরূপ বলিলে একই বস্তুতে উপমান ও উপমেয় উভয় ধর্ম পর্যবসিত হইল বলিয়া 'অনন্বয়োপমা' হইল। যদি বলা যায়, 'মুখের মত চন্দ্র' তাহা হইলে প্রসিদ্ধ উপমান চন্দ্রকে উপমেয় (মুখ) রূপে নির্দেশ করাতে 'প্রতীপ' অলঙ্কার হইল। 'চন্দ্রকে দেখিয়া মুখকে স্মরণ করিতেছি' এরূপ করিয়া বলিলে 'স্মরণ' অলঙ্কার হইল। 'মুখই চন্দ্র' এইরূপ বলিলে উপমান উপমেয়ের অভেদ-সিদ্ধান্তহেতু 'রূপক' হইল। 'মুখচন্দ্রের দ্বারা তাপের উপশম হইতেছে' এরূপ বলিলে 'পরিণাম' অলঙ্কার হইল। 'ইহা কি মুখ না চন্দ্র ?'—এরূপক্ষেত্রে 'সন্দেহ' অলঙ্কার। 'চন্দ্র মনে করিয়া চকোরগণ তাহার মুখের দিকে ধাবিত হইতেছে'—এরূপ ক্ষেত্রে ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার। 'চন্দ্র মনে করিয়া চকোরগণ এবং কমল মনে করিয়া অলিসমূহ তাহার মুখের সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হইতেছে'—এরূপক্ষেত্রে উল্লেখ অলঙ্কার হইল। 'ইহা চন্দ্র, মুখ নয়'—এক্ষেত্রে 'অপহ্নুতি'। 'যেন চন্দ্র'—এখানে 'উৎপ্রেক্ষা'। 'ঐ যে একটি চন্দ্র'—এক্ষেত্রে উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয় রূপে নির্দেশ করাতে 'অতিশয়োক্তি' অলঙ্কার হইল। 'মুখ দ্বারা চন্দ্র ও কমল উভয়ই নির্জিত হইল'—এখানে 'তুল্যযোগিতা'। 'রাত্রিতে চন্দ্র এবং তোমার মুখ হর্ষযুক্ত হয়'—এখানে 'দীপক'। 'তোমার মুখই—এই বলিয়া আমি আনন্দিত হই—আর চন্দ্রই—এই বলিয়া চকোর আনন্দিত হয়'—এখানে 'প্রতিবস্তূপমা' অলঙ্কার হইল। 'আকাশে চন্দ্র, পৃথিবীতে তোমার মুখ'—এখানে 'দৃষ্টান্ত' অলঙ্কার। 'মুখ চন্দ্রশ্রী ধারণ করিতেছে'—এখানে নিদর্শনা। 'নিষ্কলঙ্ক মুখ চন্দ্র হইতেও অধিক হইয়া উঠিয়াছে',—এখানে 'ব্যতিরেক'। 'তোমার মুখের সহিত চন্দ্র সমভাবে রাত্রিতে আমাকে হর্ষদান করে'—এখানে 'সহোক্তি'। 'নেত্রাঙ্করুচির মুখ স্মিতজ্যোৎস্নায় উপশোভিত'; চন্দ্রই এখানে মুখ, চন্দ্রের অন্তর্গত কালো চিহ্নসমূহ যেন নেত্রাঙ্ক, জ্যোৎস্না যেন স্মিত হাস্যচ্ছটা; এখানে 'সমাসোক্তি' অলঙ্কার হইল। 'অব্জেন সদৃশং বক্ত্রং হরিণাহিতশক্তিনা' বাক্যটিতে 'অব্জ' শব্দের অর্থ চন্দ্রও করা যায় (অপ্ হইতে জাত অর্থাৎ সমুদ্র হইতে জাত), কমলও করা যায়; 'হরিণাহিতশক্তিনা' শব্দের অন্বয় হরিণ+আহিত+শক্তিনা, অথবা হরিণা (হরি কর্তৃক বা চন্দ্রকর কর্তৃক) উভয় রূপেই করা যায়; সুতরাং এখানে শ্লেষ অলঙ্কার হইল। 'মুখের সামনে চন্দ্র নিষ্প্রভ'—এখানে অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার হইল।

এখানে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি যে, এক মুখ এবং চন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া বাইশটি অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, এই বাইশটি অলঙ্কারের মূলে যে রহিয়াছে শুধুমাত্র মুখ এবং চন্দ্রের ভিতরকার সাদৃশ্যকে অবলম্বন করিয়া একটি তুলনা—অর্থাৎ একটি উপমা-অলঙ্কার এ বিষয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশ নাই। লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, অপ্পয় দীক্ষিত এই বাইশটি অলঙ্কারকে বলিয়াছেন উপমারই বিবর্তমাত্র। এখানে উপমার 'বিবর্ত' কথাটি বলিবার তাৎপর্য এই যে, মূলে সবই উপমা—উক্তিভেদে পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে মাত্র।

সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, কালিদাসের উপমার বিচার-বিশ্লেষণ বা আস্বাদন অর্থ কালিদাসের কাব্য-নাটকাদি হইতে বাছিয়া বাছিয়া শুধুমাত্র কালিদাসের উপমাগুলির বিচার বিশ্লেষণ

বা আস্বাদন নয়; আসলে ইহা কালিদাসের ব্যবহৃত সকল অলঙ্কারেরই বিচার বিশ্লেষণ এবং আস্বাদন। এই কাজ করিতে হইলে আমাদের আরও একটি জিনিস সম্বন্ধে একটি পরিচ্ছন্ন ধারণার প্রয়োজন, তাহা হইল সংস্কৃত-সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে 'অলঙ্কার' কথাটির তাৎপর্য। এই অলঙ্কার কথাটি সংস্কৃতসাহিত্য-সমালোচকগণ কর্তৃক দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; একটি হইল ভাসা-ভাসা অর্থ, অপরটি হইল একটি গভীর অর্থ। ভাসা-ভাসা অর্থে অলঙ্কার কথাটিকে তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগ ও মূল্যের মানেই ব্যবহৃত হইতে দেখি। একটি সুপুরুষের যেমন একটি শরীর রহিয়াছে, সেই শরীরের ভিতরে আত্মা রহিয়াছে, শৌর্যবীর্য রহিয়াছে, কাণত্বাদির ন্যায় যেমন কিছু কিছু দোষও থাকিতে পারে, তাহার যেমন অবয়ব সংস্থানের একটি বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে,—তেমনই এই সকলের সহিত তাহার বিবিধ ভূষণও থাকিতে পারে যাহা তাহার শোভাকে বর্ধিত করিয়া দেয়। শব্দার্থের শরীর এবং রসের আত্মা লইয়া যে কাব্য-পুরুষ অলঙ্কার তাহার ভূষণ। অলঙ্কার সম্বন্ধে এই জাতীয় একটি ধারণা-পোষণ করিয়াই বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁহার 'সাহিত্য-দর্পণে' অলঙ্কারের স্থান নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—'কাব্যস্য শব্দার্থৌ শরীরম্, রসাদিশ্চাত্মা, গুণাঃ শৌর্যাদিবৎ, দোষাঃ কাণত্বাদিবৎ, রীতয়োঽবয়ব-সংস্থান-বিশেষবৎ, অলঙ্কারাশ্চ কটক-কুণ্ডলাদিবৎ।' অলঙ্কার সম্বন্ধে এই মতবাদ কাব্য-সৃষ্টির ভিতরে অলঙ্কারের স্থান অনেকখানি গৌণ করিয়া দেয়, তাহা হইলে ভাল, না হইলেও যে কাব্য অচল এমন কথা বলা চলে না।

কিন্তু প্রাচীন আলঙ্কারিকেরাও অলঙ্কার কথাটিকে একটি গভীর অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং অলঙ্কার শব্দের সেই গভীর অর্থকে অবলম্বন করিয়াই সংস্কৃত কাব্য-সমালোচন-শাস্ত্র অলঙ্কার-শাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই ব্যাপক এবং গভীর অর্থে অলঙ্কার শব্দের লক্ষ্য হইল মানুষের চিত্তের অনির্বচনীয় রসানুভূতিসমূহকে পরচিত্তে সংক্রামিত করিয়া দিবার সমগ্র কৌশলটি। আমাদের জীবনের রসানুভূতিগুলি শুধু যে সূক্ষ্ম, সুকুমার এবং অনন্তবৈচিত্র্যশীল তাহা নহে, হৃদয়ের গহনে বহুস্থলেই তাহা অনির্বচনীয় চিৎ-স্পন্দন; এই অনির্বচনীয়কে বচনীয় করিয়া তুলিবার চেষ্টাই হইল আমাদের সকল সাহিত্যচেষ্টা—এমনকি সকল শিল্পচেষ্টা। সাধারণ বচনের দ্বারা প্রকাশ্য নয় বলিয়াই আমাদের রসোদ্দীপ্ত বা রসাপ্লুত চিৎ-স্পন্দন অনির্বচনীয়; সেই অনির্বচনীয়কে বচনীয় করিয়া তুলিবার জন্য তাই প্রয়োজন অসাধারণ ভাষার। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করিতে হইবে, ভাষা শব্দেরও তাৎপর্য হইল চিৎ-স্পন্দনের বহিঃপ্রকাশ-বাহনত্ব। আমাদের অনুভূতির একটি বিশেষ ধর্ম এবং স্বরূপধর্মই হইল এই, তাহাকে জানাইতে হয়,—পরের কাছে জানাইতে হয়, না হয় অন্ততঃ নিজের কাছেও জানাইতে হয়—এই জানানোর কাজেই যেন অনুভূতির পরিপূর্ণতা। এই অনুভূতির প্রকাশই হইল ভাষা-সৃষ্টির মূল-কারণ, অথবা এ-কথা বলা যাইতে পারে যে ভাষা সাধারণতঃ অনুভূতিরই প্রকাশমাননতা — চিৎ - স্পন্দনের শব্দ - প্রতীক। আজিকার যুগে এ-কথা কেহই মনে করে না যে, জগতে আমরা যে অসংখ্য ভাষা প্রচলিত দেখিতে পাইতেছি, তাহারা চারিপাশের বায়ুমণ্ডলের ভিতরেই ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, মানুষ তাহার প্রয়োজন অনুসারে তাহাকে বাছিয়া লইয়াছে। মানুষ সেই আদিম যুগ হইতে নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য নিত্যই ভাষা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। পশুপক্ষীর ন্যায় মানুষও হয়ত কোনদিন শুধুমাত্র ধ্বনির পরিমাণ-বৈচিত্র্য এবং প্রকার-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়াই নিজের অন্তরের ভাব প্রকাশ করিত; অন্তরের ভাবের ভিতরে যত আসিতে লাগিল সূক্ষ্মতা, জটিলতা এবং গভীরতা—ধ্বনির পরিমাণ-বৈচিত্র্য

এবং প্রকার-বৈচিত্র্যের মধ্যেও আসিতে লাগিল ততই সূক্ষ্মতা, জটিলতা ও গভীরতা, ক্রমেই সৃষ্টি হইতে লাগিল সুসমৃদ্ধ বিশেষ বিশেষ ভাষার। কোনও কোনও বৈয়াকরণ মনে করেন যে আদিতে ভাষ্ ধাতু (কথা বলা) ভাস্ ধাতুর (প্রকাশ পাওয়া) সহিতই যুক্ত ছিল।

কিন্তু একজন কবিকে এই ভাষার ভিতর দিয়া যে অন্তর্লোকের পরিচয় দিতে হয় তাহা তাঁহার একটি বিশেষ অন্তর্লোক,—এই অন্তর্লোকের স্পন্দন সর্বসাধারণের হৃৎ-স্পন্দন হইতে অনেকখানি স্বতন্ত্র,—সাধারণ ভাষার ভিতরে তাই তাহাকে বহন করিবারও শক্তি থাকে না। কবির সেই বিশেষ হৃৎ-স্পন্দন তখন তাই গড়িয়া লয় তাহার বাহন একটি বিশেষ ভাষাকে,—সেই 'বিশেষ' ভাষাকেই আমরা নাম দিয়াছি 'সালঙ্কার' ভাষা। আমরা কবির কাব্যের যে সকল ধর্মকে সাধারণতঃ অলঙ্কার নাম দিয়া থাকি, একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব, সেই অলঙ্কার কবির সেই বিশেষ ভাষারই ধর্ম। কবির কাব্যানুভূতি ঐরূপ চিত্র, ঐরূপ বর্ণ, ঐরূপ ঝঙ্কার লইয়াই বাহিরে আত্ম-প্রকাশ করে। যেখানেই কবির বিশেষ কাব্য-রসানুভূতি বাহিরে এই বিশেষ ভাষার ভিতরে মূর্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই, সেইখানেই আর সত্যকার কাব্য রচনা হইতে পারে নাই।

রস-সমাহিত চিত্তের এই স্পন্দনকে প্রকাশ করিবার জন্য কবির যে এই 'বিশেষ' বা অসাধারণ ভাষা তাহার পরিচয় বিভিন্ন সাহিত্য-সমালোচক বিভিন্নকালে বিভিন্নভাবে দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভামহ ইহাকে বলিয়াছেন বক্রোক্তি—'সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিঃ'। ভামহের আলোচনা পড়িলে বেশ বোঝা যায়,—এই বক্রোক্তি বলিতে তিনি সোজা ভাবে কথা না বলিয়া তাহাকে খানিকটা ঘুরাইয়া বাঁকাভাবে কথা বলিবার চাতুর্যকে মনে করেন নাই,—বক্রোক্তির এখানে অর্থ হইল, কাব্যোচিত বিশেষোক্তি। অলঙ্কারাদি এই বিশেষোক্তিরই পর্যায় মাত্র। ভামহই আরও একটি সূক্ষ্ম কথার ইঙ্গিত করিলেন, তাহা হইল এই যে 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'—শব্দ ও অর্থের যে সহিতত্বই হইল কাব্যত্ব। এখানকার এই 'সহিত' কথাটি হইতে কাব্যের পরিবর্তে ব্যাপকার্থে সাহিত্য কথাটির ব্যবহার পরবর্তীকালে দেখিতে পাই। এখানে 'সহিত' শব্দের তাৎপর্য কি? ভাবগূঢ় অর্থের মধ্যে যে সম্ভাবনা ও শক্তি নিহিত আছে তাহা যদি শব্দশক্তি দ্বারা যথাযথভাবে প্রকাশিত বা প্রতিফলিত হইয়া থাকে তবেই বলা যাইতে পারে যে শব্দ ও অর্থের সহিতত্ব সাধিত হইয়াছে। অর্থশক্তি সম্পূর্ণরূপে যদি শব্দশক্তির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হইয়া 'চিৎ' যদি অনুরূপ 'তনু' লাভ না করিল তবে উভয়ের অ-সাহিত্যে কাব্যত্বেরই অসদ্ভাব ঘটিল।

এই প্রসঙ্গে ভামহ আরও একটি সূক্ষ্ম কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে কাব্যোক্তি সর্বক্ষেত্রেই অতিশয়োক্তি। কথাটির মধ্যে একটি গভীর সত্য নিহিত আছে। এক দিক হইতে দেখিতে গেলে শিল্পকৃতি মাত্রই হইল 'বাড়াইয়া বলা'। সর্ববিধ শিল্পের প্রধান কাজই হইল একজনের ভাবকে সর্বজনের করিয়া তোলা, মুহূর্তের ভাবকে সর্বকালের করিয়া তোলা। অনেকখানি না বাড়াইয়া তুলিয়া আমরা তাহা কখনই করিতে পারি না। তাহা ছাড়া, শিল্পীর নিজের নিকটে যে রসানুভূতি প্রত্যক্ষ, পাঠক, শ্রোতা বা দর্শকের নিকট তাহা পরোক্ষ; তাই চিদ্‌গত রসানুভূতিকে প্রকাশভঙ্গির ভিতর দিয়া অনেকখানি বাড়াইয়া তুলিতে না পারিলে পাঠক, শ্রোতা বা দর্শক রসের সমগ্রতা লাভ করিতে পারে না। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

"আমার সুখদুঃখ আমার কাছে অব্যবহিত, তোমার কাছে তাহা অব্যবহিত নয়। আমি হইতে

তুমি দূরে আছ। সেই দূরত্বটুকু হিসাব করিয়া আমার কথা তোমার কাছে কিছু বড় করিয়াই বলিতে হয়।

"সত্য রক্ষণপূর্বক এই বড় করিয়া তুলিবার ক্ষমতায় সাহিত্যকারের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। যেমনটি ঠিক তেমনটি লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে; কারণ, প্রকৃতিতে যাহা দেখি, তাহা আমার কাছে প্রত্যক্ষ, আমার ইন্দ্রিয় তাহার সাক্ষ্য দেয়। সাহিত্যে যাহা দেখায়, তাহা প্রাকৃতিক হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং সাহিত্যে সেই প্রত্যক্ষতার অভাব পূরণ করিতে হয়।"

এই বড় করিয়া বলিবার প্রয়োজন শুধু মাত্র প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষতার জন্ম নহে; শিল্পে আমাকে নিরবধি-কাল ও বিপুলা পৃথ্বীকে যে কয়েকটি মুহূর্ত এবং স্বল্প আয়তনের ভিতরে বিধৃত করিতে হইবে। দেশ-দেশ-ব্যাপ্ত একটি সুদীর্ঘ জীবনের সকল সুখদুঃখ, হাসি-অশ্রুভরা বহুজীবনের জীবন-মহিমাকে আমাকে এক প্রহরে অভিনীত একখানি নাটকের ভিতরে প্রকাশ করিতে হইবে; কলাকৃতি দ্বারা তাই একটি রঙ্গমঞ্চের পরিধিকে বাড়াইয়া বিপুলা পৃথ্বীর প্রতিভূ করিয়া তুলিতে হইবে, এক প্রহর কালকে শুধু বহুবর্ষের নয়—নিরবধি কালেরই প্রতিভূ করিয়া তুলিতে হইবে। একজন অভিনেতার অভিনয় নৈপুণ্যই বা কি? অনেক যুগের অনেক দেশের অনেক কথাকে নির্দিষ্ট দেশ-কালের সীমার মধ্যেই যতখানি সম্ভব আভাসিত করিয়া তোলা। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আমরা কথায় যে সুর লাগাই তাহা সীমাবদ্ধ এতটুকু কথাকে সীমাহীন ব্যাপ্তি এবং অতল রহস্যমহিমা দান করিবার জন্যই। অনন্ত দিগ্‌বলয়বিস্তৃত উদয়াচলে নিত্যকালের সূর্যোদয়ের মহিমাকে কেন্দ্রীভূত করিতে হয় একটি শিল্পীকে এক টুকরা কাগজের উপরে—কয়েকটি রেখা এবং কিছু রঙের সাহায্যেই; সেই রঙ-রেখার মধ্যে আনিতে হয় তাই ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎকে আভাসিত করিবার শক্তি—তাহাই ত যথার্থ চিত্রকলা।

আমার মনে হয় ভামহের 'সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিঃ' কথার মধ্যে এবং বক্রোক্তিকে অতি-শয়োক্তি বলিয়া বর্ণনা করিবার ভিতরে শিল্পক্ষেত্রে এই বড় করিয়া বলিবার আভাস রহিয়াছে। শিল্পের ভাষাকে পাশ্চাত্যেও তাই বলা হইয়াছে 'The hightened language'। ভামহের মতে অলঙ্কার প্রভৃতি আসলে আর কিছুই নয়—কাব্যার্থকে যথাসম্ভব 'অতিশয়' বা বড় করিয়া তুলিবার চেষ্টা। অতিশয়োক্তিকেই তাই ভামহ সর্বপ্রকার অলঙ্কারের মূল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আলঙ্কারিক দণ্ডীর মধ্যেও ভামহের এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়। তাহার মতেও প্রায় সমস্ত অলঙ্কারের কাজই লইল অর্থকে অনেকখানি বাড়াইয়া দেওয়া এবং সেইজন্যই তিনি করেন, সমস্ত অলঙ্কারেই অতিশয়োক্তির বীজ নিহিত আছে। পরবর্তী কালে 'কাব্য-প্রকাশ'কার মম্মটভট্টও অতিশয়োক্তিকে সমস্ত অলঙ্কারের প্রাণস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

ভামহ-কথিত এই 'বক্রোক্তি' কথাটিকে নানা ভাবে বিস্তার করিয়া পরবর্তী কালে (দশম বা একাদশ শতাব্দীতে) রাজানক কুন্তক তাঁহার প্রসিদ্ধ 'বক্রোক্তি-কাব্য-জীবিত' বাদ, অর্থাৎ বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণ-স্বরূপ এই মত প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভেই কুন্তক বলিয়াছেন,—সাধারণতঃ পণ্ডিতগণ ত্রিভুবনের ভাব-সকলকে যথাতত্ত্ব বিবেচনা করিবার চেষ্টা করেন; অর্থাৎ ভাব যে-রূপের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং যে-রূপের সহিত সে প্রায় অন্বয়যোগে যুক্ত হইয়া আছে তাহাকে বাদ দিয়া তত্ত্বমাত্ররূপে তাঁহারা ভাবকে বিবেচনা করিতে এবং বুঝিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু এ চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ চেষ্টা; কারণ এ চেষ্টা দ্বারা আমরা ভাবকে যে তত্ত্বমাত্রে

লাভ করি তাহার ভিতরে ভাবের বিস্ময়কর রহস্য অনেকখানিই হয়ত আমরা হারাইয়া ফেলি। কিংশুকপুষ্পকে তাহার সকল রূপকে বাদ দিয়া যদি কেবল রক্তমাত্র করিয়া গ্রহণ করা যায়, ভাবকেও শুধু যথাতত্ত্বে অবস্থিত বলিয়া গ্রহণ করিতে গেলেও সেইরূপ হইবে। এই চেষ্টা দ্বারা মানুষ স্ব স্ব মনীষাবলেই ভাবসমূহের কতগুলি তত্ত্ব যথারুচি আবিষ্কার করিয়া লয়; এই জাতীয় যথাভিমত তত্ত্ব দর্শনের ফলে জ্ঞানদার্ঢ্যই প্রকাশিত হয়, ভাবের পরমার্থ বা যথার্থ স্বরূপ হয়ত ইহাতে লাভ হয় না; পরমার্থ হয়ত আমরা এইরূপে যেমন করিয়া কল্পনা করি মোটেই তাদৃশ নয়। সুতরাং ভাবের এই জাতীয় স্বতন্ত্র তত্ত্ব—অর্থাৎ সৃষ্টির ভিতর দিয়া—রূপের ভিতর দিয়া তাহার যে প্রকাশময় সত্তা তাহাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া ভাবের একটি 'অসঙ্গ' 'কেবল' তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা ভুল। এই জন্য ভাব এবং রূপের ভিতরকার যে সাহিত্য তাহার সার-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার মানসে কুন্তক এই সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন।—

যথাতত্ত্বং বিবেচ্যন্তে ভাবাস্ত্রৈলোক্যবর্তিনঃ।
যদি তন্নাদ্ভুতং ন স্যাদেব রক্তা হি কিংশুকাঃ॥
স্বমনীষকয়ৈবাথ তত্ত্বং তেষাং যথারুচি।
স্থাপ্যতে প্রৌঢ়িমাত্রং তৎ পরমার্থো ন তাদৃশঃ॥
ইত্যসত্তর্কসন্দর্ভে স্বতন্ত্রে হপ্যকৃতাদরঃ।
সাহিত্যার্থসুধাসিন্ধোঃ সারমুন্মীলয়াম্যহম্॥

কুন্তকের মতে কাব্য বা সাহিত্যের যে 'অদ্ভুতামোদ-চমৎকার' সারবস্তু তাহা দ্বিতয়—অর্থাৎ দ্বিবিধ-লক্ষণযুক্ত; তাহার একদিকে রহিয়াছে তত্ত্ব অন্যদিকে রহিয়াছে নির্মিতি—'যেন দ্বিতয়মিত্যেতত্তত্ত্বনির্মিতি-লক্ষণম্।'

কুন্তকের উপরি-উক্ত মতগুলি আলোচনা করিলে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, কুন্তক কাব্যের 'সাহিত্য'-লক্ষণের উপরেই খুব জোর দিয়াছেন। এই সাহিত্যতত্ত্ব ফুটিয়া উঠিবে কিসের ভিতর দিয়া? তাহা ফুটিবে 'তত্ত্ব' ও নির্মিতি'র সুষ্ঠু মিলনের মধ্য দিয়া—অর্থ ও শব্দের অটুট সংস্পৃক্তির ভিতর দিয়া। ইহার কোনও দিককে বাদ দিয়া কোনও দিক্ সার্থক নয়। কুন্তক বলিয়াছেন, স্পন্দিতচিত্তে যে কবি-বিবক্ষা তাহার একটি বিশেষ ধর্ম রহিয়াছে। কাব্যের ভাষা বলিব কাহাকে? কবিচিত্তের তৎ-কালধৃত যে এই চিত্তস্পন্দনজাত বিশেষ-বিবক্ষা তাহাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করিবার যে ক্ষমতা তাহাই হইল তাহার বিশেষবাচকত্বলক্ষণ, —'কবিবিবক্ষিতবিশেষাভিধানক্ষমত্বমেব বাচকত্ব-লক্ষণম্'। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন,—'যস্মাৎ প্রতিভায়াং তৎকালোল্লিখিতেন কেনচিৎ পরিস্পন্দেন পরিস্ফুরন্তঃ পদার্থাঃ প্রকৃতপ্রস্তাব-সমুচিতেন কেনচিদুৎকর্ষেণ বা সমাচ্ছাদিতস্বভাবাঃ সন্তো বিবক্ষাবিধেয়ত্বেনাভিধেয়তাপদবীমবতরন্তঃ তথাবিধ বিশেষপ্রতিপাদনসমর্থেন অভিধানেন অভি-ধীয়মানাশ্চেতনচমৎকারিতামাপদ্যন্তে।' যথার্থ-প্রতিভাশীল ব্যক্তির হৃদয়ে যখন বাহিরের কোনও পদার্থ ধরা দেয় তখন তাহা তাহার বাহিরের রূপ লইয়াই আসিয়া দেখা দেয় না, তাহা একটা সমাচ্ছাদিতস্বভাব লইয়াই দেখা দেয়—অর্থাৎ বহির্বস্তুর উপরে কবির তৎকালোচিত একটি বিশেষ চিৎস্পন্দনের অলৌকিক মায়াস্পর্শ পতিত হইয়া তাহাকে একটি বিশেষ অলৌকিক মহিমায় উদ্ভাসিত করিয়া তোলে; এই যে নবোদ্ভাস তাহার ভিতরে বহির্বস্তু তাহার প্রকৃতরূপেও মহিমান্বিত হইতে পারে—প্রকৃতরূপকে অতিক্রম করিয়া একটি উৎকর্ষবিশেষের মধ্যেও মহিমান্বিত হইয়া উঠিতে পারে; এই নবোদ্ভাসিত বিষয়বস্তু তখন তাহার বস্তুরূপ পরিত্যাগ করিয়া কবিচিত্তে একটি চিন্ময়রূপ ধারণ করে,—এই চিন্ময়রূপের পরিণতিই একটি কবিবিবক্ষায়; ইহাই কবির আত্ম-প্রকাশ বা আত্মসৃষ্টির তাগিদ; এই বিবক্ষাই তখন একটি

বিশেষ অভিধেয় বা বিশেষ বাচ্য হইয়া উঠিল। এই বিশেষ বাচ্যকে ঠিক ঠিক তদনুরূপ বিশেষ বাচকের দ্বারা—অর্থাৎ একটি বিশেষ নির্মিতির দ্বারা যখন বাহিরে স্থাপন করা গেল সেই শিল্পকৃতিই তখন রসিকজনের চেতনচমৎকারিতার কারণ হয়। এই যে 'বিশেষাভিধানক্ষমত্ব' ইহাকেই কুন্তক বলিয়াছেন বক্রোক্তি। কাব্যের অলঙ্কারাদি হইল নিরন্তর এই বক্রোক্তির সাহায্যে অনুরূপ তত্ত্বরূপ বাচ্যের অনুরূপ নির্মিতি বা বাচকের সম্ভব করিয়া তুলিবার চেষ্টা। বক্রোক্তি-সাধিত এই নির্মিতি ব্যতীত জগতের কোনও সত্যের মহিমাই যথার্থ প্রকাশ লাভ করিতে পারে না।

অভিনব গুপ্ত প্রভৃতি যাঁহারা রসধ্বনিকেই কাব্যের আত্মা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহারাও কাব্য-সৃষ্টির ভিতরে অলঙ্কারকে মুখ্য স্থান দান করিয়াছেন। প্রতিভাশালী কবির পক্ষে কাব্যের নির্মিতি কোনও পৃথক্ যত্নকৃত বস্তু নহে। যেমন জলধারা কোনও কুম্ভে পতিত হইয়া কুম্ভটি কানায় কানায় ভরিয়া গেলে আপনিই আপনার নিজের ছন্দে ও ভঙ্গিতে উচ্ছলিত হইয়া বাহিরে উপছাইয়া পড়ে, তেমনই রসের আবেদনে চিত্ত যখন কানায় কানায় ভরিয়া যায় তখন আপনি তাহা তাহার প্রকাশের পথ সৃষ্টি করিয়া একই বেগে বাহিরে প্রকাশ-মূর্তি লাভ করে। আদি-কবি বাল্মীকি মুনি কি করিয়া প্রথম কাব্যসৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই প্রসঙ্গে অভিনব গুপ্ত ভারী চমৎকার করিয়া বলিয়াছেন,—"সহচরীহননোদ্ভূতেন সাহচর্যধ্বংসনে-নোত্থিতো যঃ শোকঃ……স এব…আস্বাদ্যমানতাং প্রতিপন্নঃ করুণরসরূপতাং লৌকিকলোকব্যতিরিক্তাং স্বচিত্তবৃত্তিসমাস্বাদ্যসারাং প্রতিপন্নো রসঃ পরিপূর্ণ-কুম্ভোচ্ছলনবৎ………সমুচিতছন্দোবৃত্তাদিনিয়ন্ত্রিত-শ্লোকরূপতাং প্রাপ্তঃ।" ক্রৌঞ্চের যে শোক তাহা লৌকিকশোকরূপতা পরিত্যাগ করিয়া কবিচিত্তের ভিতরে পরমাস্বাদ্যরূপ একটি অলৌকিক করুণরসের রূপ ধারণ করিল; সেই করুণরসই কবিগুরুর চিত্তকুম্ভকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া বাহিরে উচ্ছলিত হইয়া পড়িল—সেই উচ্ছলনই সমুচিত ছন্দ, বৃত্তি প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া শ্লোকরূপতা প্রাপ্ত হইল। অভিনব গুপ্ত তাঁহার আলঙ্কারিক ভাষায় যে-কথা বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবির ভাষায় বাল্মীকির প্রথম কবিকর্ম সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বলিয়াছেন। হিমালয়ের উচ্চশিখরস্থ কন্দরে যেদিন আষাঢ়ের 'দুর্দাম দুর্বার' বেগ নামিয়া আসে তখন সে সহসা নিজেই নিজের খাত কাটিয়া নিজের ভঙ্গিতে স্বচ্ছন্দধারায় নামিয়া আসে; কবিগুরু বাল্মীকির হৃদ্‌গত ভাব-সম্বেগও তেমনই স্বচ্ছন্দধারায় শ্লোকরূপ প্রাপ্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল। পার্বত্য ঝর্ণা কোন্ বিচিত্র নৃত্যভঙ্গিতে উপলবন্ধুর পথে খাত কাটিয়া কোথায় কলস্বনে—কোথায় উচ্ছ্রিয়মাণ গর্জনে কোথায় কূলে কূলে কোন্ পুষ্পাভরণে ভূষিতা হইয়া বাহিয়া চলিবে তাহা যেমন তাহার ভাব-সম্বেগ এবং রস-সম্পদ্ ব্যতীত আর কেহ বলিতে পারে না,—এক জন যথার্থ শিল্পীর ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই ঘটিয়া থাকে; সেখানেও

এ যে সঙ্গীত কোথা হ'তে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হ'তে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হ'তে টুটে
অন্তর-বিদারণ।

অলঙ্কারের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া ধ্বনিবাদিগণ বলিয়াছেন,—

রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্যঃ সোঽলঙ্কারো ধ্বনৌ মতঃ॥

অর্থাৎ রসের দ্বারা আক্ষিপ্ত হইবার জন্যই যাহার বন্ধ বা সৃষ্টি সম্ভব এবং যাহা অপৃথক্-যত্ন দ্বারাই সাধিত হয়—তাহাই হইল অলঙ্কার; ইহাই হইল ধ্বনিবাদিগণের মত। ইহাকেই ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে,—'নিষ্পত্তৌ আশ্চর্যভূতোঽপি যস্য

অলঙ্কারস্থ রসাক্ষিপ্ততয়া এব বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ'—যে অলঙ্কারের সৃষ্টি আশ্চর্যভূত হইলেও রসের আক্ষেপে অতি সহজেই যেন সম্ভব হইয়া ওঠে—এই জাতীয় অলঙ্কারই যথার্থ অলঙ্কার বলিয়া গ্রাহ্য। এখানে এই রসের আক্ষেপ এবং 'অপৃথগ্-যত্ন-নির্বত্য' এই কথা দুইটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। আসলে এই দুইটি কথা একই কথা।

প্রাত্যহিক জীবনে বেদান্ত*

স্বামী মাধবানন্দ

বেদান্তের জন্ম সুদূর অতীতকালে হইলেও ইহা এখনও পর্যন্ত একটি প্রাণবন্ত দর্শন ও ধর্ম রূপে বর্তমান। ইহার দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক বলিয়া আজিকার নরনারীর হৃদয়কে ইহা প্রখরভাবে স্পর্শ করিতে সক্ষম। এই যুগে বেদান্ত যে একটি বিপুল প্রভাব বিস্তার করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

যুগে যুগে নানা মহাপুরুষ কর্তৃক প্রাচীন বেদান্ত শাস্ত্রের আপাতবিরুদ্ধ বাক্যগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য আনিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রের সত্যরাশির প্রতি একটি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিপাতের মধ্যেই ঐ বিরোধ-সমাধানের রহস্য নিহিত। ঋগ্বেদ যেমন বলিয়াছেন, ঋষিগণ বহুনামে সংজ্ঞিত করিলেও সত্য এক। মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকৃতির লোক এই সত্যের সম্মুখীন হইতে পারেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রত্যেকটি উচ্চতর স্তর সাধককে চরম একত্বানুভূতির অধিকতর নিকটে লইয়া যায় বটে, কিন্তু উহা নিম্নতর স্তরের উপলব্ধি সমূহকে খণ্ডিত করে না, বরং পরিপূর্ণ করে। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা দেখিতে পাই। তাঁহার সমগ্র জীবন ছিল বেদান্তের মূর্ত অভিব্যক্তি। অসংখ্য দিক দিয়া তিনি শ্রীভগবানকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, প্রত্যেকটি উপলব্ধিই তাঁহার নিকট ছিল সত্য ও বাস্তব। প্রকৃতির প্রত্যেকটি বস্তুই প্রগতি এবং বিকাশের পথে চলিতেছে। অতএব সত্যলাভের পথ হইল আত্মার যন্ত্রস্বরূপ যে মন উহাকে নিজ সামর্থ্যের উপযোগী পথে গড়িয়া তোলা। এইরূপেই মানুষের অভিজ্ঞতা তাহাকে লইয়া যায় সত্যের উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমিতে।

বেদান্তের শিক্ষা—আত্মা অসীম, শাশ্বত এবং ঈশ্বরের সহিত এক। কিন্তু আমরা আত্মাকে অভিব্যক্ত দেখি প্রকৃতি-রূপ আবরণ—মায়া বা ঈশ্বরের ঐন্দ্রজালিক শক্তির মধ্য দিয়া। ইহার ফলে মানুষকে আমরা সান্ত ও সীমাবদ্ধ বলিয়া ভুল করি এবং ঈশ্বরও এই বিচিত্র বিশ্বরূপে প্রতিভাত হন। স্বপ্নে যেমন আমরা আমাদের সত্য পরিচয় ভুলিয়া যাই এবং বাস্তব জগতের সহিত সংস্পর্শ হারাইয়া ফেলি কিন্তু জাগিয়া উঠিলে স্বপ্নজগৎ যেমন অদৃশ্য হয় ঠিক সেইরূপ ঈশ্বরের সহিত তাদাত্ম্যের অনুভূতিতে আমাদের অজ্ঞান-স্বপ্ন ভাঙিয়া যায় এবং আপেক্ষিক জীবনের সমুদায় কল্পনারও অবসান ঘটে। * * *

প্রশ্ন এই যে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সহিত বেদান্তকে সংযুক্ত করা যায় কিনা। বেদান্তীরা বলেন, নিশ্চিতই যায়। পদ্মপত্র যেমন জলে ভাসে কিন্তু উহার গায়ে জল লাগে না সেইরূপ মানুষ এই জীবন হইতে ঊর্ধ্বে থাকিয়া এখানে জীবন

* সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতিতে গত ৪ঠা মার্চ (১৯৫৬) তারিখে প্রদত্ত ইংরেজী ভাষণ হইতে সঙ্কলিত। —উঃ সঃ

যাপন করিতে পারে। ভারতে সনাতন ধারণা ছিল ঘর বাড়ী ছাড়িয়া জীবনের কিছু সময় বনে কাটানো। আজকাল ইহা সম্ভবপর নয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, তিনি বনের বেদান্তকে ঘরে আনিয়াছেন। তিনি বেদান্তের একটি কর্মপরিণত প্রণালী দিয়া গিয়াছেন। ইহা শুধু মানুষকে তাহার নিজস্ব স্বাভাবিক অধিকার যে মুক্তি সেই সম্বন্ধে সচেতন করা—অজ্ঞানের গণ্ডীর উর্ধ্বে উঠিয়া আমাদের স্বকীয় মহাশক্তিকে অনুভব করা। ইহাই আমাদের লক্ষ্য। যে অজ্ঞান আমাদিগকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে উহা দূর করিবার সাধনার মধ্য দিয়া আমাদিগের প্রত্যেককেই যাইতে হইবে। আমরা নিজদিগকে যে সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছি ঐ আবেশ কাটাইতে হইবে।

যদি আমাদের ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা থাকে এবং স্মরণাতীত কাল হইতে সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণ যে সকল সাধারণ সাধন-প্রণালী রাখিয়া গিয়াছেন উহা যদি আমরা অনুসরণ করি তাহা হইলে আমরা নিজেদের যথার্থ স্বরূপ কি তাহা জানিতে পারিব। ঐ প্রণালীগুলি কি? আত্মসংযম, একাগ্রতা, বিশ্বাস, এবং নিজদিগকে মুক্ত করিবার জন্য সুতীব্র ব্যাকুলতা। জাগতিক জীবনের যে অবস্থায় রহিয়াছি উহাতে যদি আমরা তৃপ্ত থাকিতে না পারি, সত্য লাভের জন্য যদি আমরা মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকি এবং পর্যাপ্ত সংযম এবং তন্ময়তার সহিত অনবরত যদি অগ্রসর হইয়া চলি তাহা হইলে নিশ্চিতই আমরা লক্ষ্যে পৌঁছিব।

পৃথিবীর সর্ব দেশেই শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ একই ভাষায় কথা বলিয়া গিয়াছেন কিন্তু আমরা তাঁহাদের উপদেশের মর্মদেশে প্রবেশ করি না বলিয়া উহা বুঝিতে পারি না, তাঁহাদের বাণীর একত্বকে ধরিতে পারি না। এমনকি বুদ্ধও বেদান্তেরই শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন, যদিও উহার নাম করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, সৎকর্ম কর। এখানে তিনি বেদান্তের সক্রিয় দিকটি অর্থাৎ কর্মযোগের পন্থার উপর জোর দিতেছেন। যীশুখ্রীষ্ট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন বেদান্তের ভক্তির দিকটি। ভক্তেরা হৃদয়াবেগের মাধ্যমে ভগবানের সন্নিধানে যাইতে চান। যেহেতু আমরা মানুষ, সেইজন্য আমরা চাই ভালবাসিতে এবং ভালবাসা পাইতে, আর ভক্তি-শাস্ত্রানুযায়ী ঈশ্বরই হইলেন পরম প্রিয়। তাঁহাকে যদি আমরা হৃদয়ের প্রেম অর্পণ করিতে পারি তিনিও নিশ্চিতই আকৃষ্ট হইবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, আমরা যদি ঈশ্বরের অভিমুখে এক পা অগ্রসর হই তিনি আমাদের দিকে দশ পা আগাইয়া আসেন। সাধারণতঃ আমাদের এই আধ্যাত্মিক তথ্যটি জানা নাই যে, বিষয়-সুখলালসায় না মজিয়া আমরা যদি সামান্য একটু ত্যাগ করি তাহা হইলে আমরা ভগবানকে দশ পা'রও অনেক বেশী টানিয়া আনিতে পারি। আত্মসংযম এবং একাগ্রতা সকল বিশিষ্ট ধর্মেরই সার কথা—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের সন্ধানে যেন মন ছুটিয়া না যায় এই জন্য উহাকে খানিকটা বশে রাখা এবং আদর্শের প্রতি অভিনিবেশ। ঈশ্বরকে কেহ ব্যক্তি বলিয়া কিংবা নৈর্ব্যক্তিক ভাবেও গ্রহণ করিতে পারেন ফল একই। যাহা দরকারী তাহা হইল এই: আমরা অকপট তো? আমরা এই জীবনেই ভগবানকে পাইতে চাই তো? তাহার পর পথ চলিতে যদি আমরা প্রস্তুত থাকি তাহা হইলে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবই।

প্রাত্যহিক জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রবল বাধা এই নয় যে আমাদিগকে সংসারে থাকিতে হইতেছে, বাধা হইল আমরা যাহা করি তাহাতে আমাদিগের আসক্ত হইয়া পড়িবার প্রবণতা। কর্ম বন্ধন আনে না, বন্ধন আসে আসক্তি হইতে। আমরা কাজ করি আমাদের পরিবারের জন্য, নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য। কিন্তু এই স্বার্থবুদ্ধি যদি ছাড়িতে পারি তাহা হইলে আমাদের

মন নির্মল হয় আর সেই বিশুদ্ধ মনে ঘটে সত্যের প্রকাশ। * * * পরিবার প্রতিপালনের জন্য কর্তব্য কর্ম করিয়া যাইতে হইবে কিন্তু একথা যদি মনে থাকে যে পরিবারবর্গের মধ্য দিয়া ভগবানেরই সেবা করা হইতেছে তাহা হইলে আমাদের সমস্ত কাজের ধারাটিই বদলাইয়া যায়। * * * প্রত্যেক মানুষকে ঈশ্বরেরই মূর্তি বলিয়া দেখিতে পারিলে এবং এই ভাবে নানা মূর্তিধারী ভগবানের যথাযোগ্য সেবা করিবার চেষ্টা করিলে কর্ম এখনকার মত আর বন্ধন সৃষ্টি করিবে না—বর্তমান অজ্ঞানাবস্থা হইতে মুক্তির সহজতম রাস্তা হইয়া দাঁড়াইবে। * * * বেদান্তদর্শনের একটি মস্তবড় বাঁচোয়া জিনিস এই শিক্ষাটি যে, আমরা যাহা খুঁজিতেছি তাহা আমাদের ভিতর আগে হইতেই আছে। * * * যেমন করিয়াই হউক ঐ অনুভূতি আমাদিগকে লাভ করিতে হইবে। কোন সময়ে উহা হয় তো আড়ালে থাকিতে পারে কিন্তু একদিন উহা প্রকাশ পাবেই। এখানে আমরা যাহা কিছু চাই সকলই আমরা পাইতে পারি বরং আরও অনেক বেশী।

বেদান্ত বলেন, আমরা যাহা কিছু করি আমাদিগকে জ্ঞানপুরঃসর করিতে হইবে, উহার ফল জানিয়া। অকিঞ্চিৎকর সামান্য জিনিসেরও জন্য যদি ছুটি তো তাহার মূল্য জানিয়াই যেন উহাকে চাই। আমাদের না-জানার যাহা ফল হইবে তাহার জন্য যেন অপরকে দোষী না করি। কর্মযোগীরা বলেন তুমি বর্তমানে যাহা তাহা তোমার অতীত কর্মের ফল। অতএব আমরা যদি এখন বদ্ধ হইয়া থাকি তবে আমাদের উচিত কিছু সৎকর্ম করিয়া আমাদের হারানো সাম্যকে ফিরিয়া পাওয়া। কর্মযোগ সকলেরই সহায়ক। যাঁহারা ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না তাঁহারাও প্রতিদানের দাবী না করিয়া অপরের সেবা করিতে পারেন। এই দর্শন সারা বিশ্বের উপকার সাধন করিবে।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অত্যদ্ভুত প্রসার হইয়াছে সন্দেহ নাই। বৈষয়িক উন্নতির দিকে মার্কিন প্রতিভা যাহা সংসাধন করিয়াছে সেজন্য তাহাকে অবশ্যই অভিনন্দন করিতে হইবে—কিন্তু উহার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকানরা যদি হৃদয়েরও বিস্তার করেন তাহা হইলে শুধু তাঁহারাই নয় সমগ্র মানবজাতি উপকৃত হইবে, কেননা বেদান্তের মূল বাণী এই যে সব কিছু মানুষেরই ভিতরে। মানুষকে শুধু উহা প্রকাশ করিতে হইবে। মার্কিন জাতির বুদ্ধি আছে, কর্মশক্তি আছে—বৈদান্তিক সত্যের বিকাশে অপর লোকদের অপেক্ষা তাঁহারা উত্তম ফল লাভ করিতে পারিবেন। * * * উচ্চতর বস্তুর অনুশীলনের জন্য শুভদিন সমাগত। কর্মোন্মত্ততার ভাব হইতে এখন আত্মানুভূতির ভাবের দিকে যাইতে হইবে। প্রগতির পথে সেই অবস্থা যে আসিবে ইহাতে সন্দেহ নাই—বেদান্তের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চলিলে প্রভূত সহায়তা পাওয়া যাইবে।

ভারতবাসী আমরা একটি জাতি, মার্কিনবাসী অপর একটি জাতি। কিন্তু আমরা যদি বেদান্তকে সামান্যও বুঝিবার চেষ্টা করি তো আমরা উভয়েই দেখিতে পাইব প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একই আত্মা প্রতিবিম্বিত। এই উচ্চতর চিন্তা চিত্তে জাগরূক থাকিলে যে কোন ক্ষেত্রে যাবতীয় কাজই অনেক বেশী কল্যাণপ্রসূ হইবে।

শেষ কথা এই যে, অদ্বৈতে বা দ্বৈতে যাহাতেই বিশ্বাস থাকুক, আদর্শ বাছিয়া লইয়া উহা অনুসরণ করিয়া যাইতে হইবে। আমাদের আচার্যেরা বলিয়াছেন, বেশ কিছু কাল ধরিয়া একটি সাধনে লাগিয়া থাকা চাই, তাহার পর যদি কোন ফল না পাও বরং ছাড়িয়া দিও, কিন্তু যথেষ্ট অভ্যাসের আগে নয়। এই উপদেশটি যেন আমরা মনে রাখি। বেদান্তের অনুশীলন আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর আগাইয়া যাইতে হইবে। যাহা কিছু বাধা আসুক না কেন গ্রাহ্য না করিয়া সত্যোপলব্ধির

জন্য ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। কিছু হারাইবার তো ভয় নাই। পরমাত্মাকে যাহা কিছু অর্পণ করা যায় সহস্রগুণে উহা ফিরিয়া আসে। অতএব স্বীয় অমৃত-স্বভাবের অভিমুখে সাগ্রহ যাত্রার জন্য আত্ম-সচেতন চেষ্টা উদ্দীপিত হউক। * * * কবে কখন বর্তমান অজ্ঞানাবস্থা আরম্ভ হইয়াছে তাহা তো জানা নাই, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, যে শুভ মুহূর্তে সত্যের সাক্ষাৎকার হইবে তৎক্ষণাৎ ঐ দুঃখকর অবস্থা কাটিয়া যাইবে—আমরা জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌছিব।

ভগবান সেই লক্ষ্যে পৌছিতে আমাদিগের সহায় হউন!

অনাদ্যন্ত

শ্রীনরেন্দ্র দেব

যদি কিছু তোর খোয়া গিয়ে থাকে, দুঃখ কেনরে করিস মিছে?
যাবার সময় যত সঞ্চয় ফেলে যেতে তোকে হবেই পিছে।
এসেছিলি যবে এই ধরণীতে সেদিন কিছু কি ছিলরে হাতে?
আজ যদি তোর নাই থাকে কিছু—দুঃখ কি আর এমন তাতে?
থাকা-খাওয়া—সেতো কলের মতন চলেছে এখানে জীবন ভোর.
যতদিন পারি জের টানি তারই; চাইনি কাটাতে ঘুমের ঘোর।
কুয়াসা ঘনায়ে আসে চারিদিকে, ঝাপসা দেখি যে দিনের আলো!
ধোঁয়ার পর্দা ঢাকে যে আকাশ, দেখাতো যায় না কিছুই ভালো।
সূর্য-কিরণ মুছে দেয় শুধু রাতের জমাট আঁধার যত;
দিনের দীপ্তি ঝল্ মল্ করে ঊষার সোনালী শাড়ীর মতো!

ফিরে পায় যেন জগৎ আবার অন্ধ আঁখির হারানো দ্যুতি,
খুঁজে খুঁজে কত লুপ্ত রতন, দেখে শেষে সবই নকল পুঁতি!
অধর প্রান্তে ফোটে কি সেদিন নির্বুদ্ধির বিমূঢ় হাসি?
মনে কি হয়না,—এই পৃথিবীতে শুধু নিজেকেই ভাল যে বাসি!
হারায় না কিছু জগতে কখনো, জীবনে কিছুই যায় না খোয়া।
ভুল করে ভাবি—কাকে নিয়ে গেছে ছেলের হাতের মুড়কী-মোয়া!
মৃত্যু বলে না শেষ কথা, সে তো নবজন্মের বাজায় শাঁখ!
জীবনের পথ জটিল ভেবনা; আমরাই গড়ি যা-কিছু বাঁক।
তবু যেতে পারে আপন লক্ষ্যে হুঁসিয়ার যত পথিক জেনো,
যে ছিল অচেনা এতদিন, তারে দেখে মনে হবে সেজনে চেনো!

কত অজানারে জানিবি তখন আপন মনের দৃষ্টিবলে,—
জীবনের কত রহস্য আছে—নিহিত গোপনে সৃষ্টি তলে!

চেতনার মাঝে অবচেতনার অদৃশ্য ভেলা লুকায়ে ভাসে,
আকাশের তারা ঘোমটা খসায়ে কেন যে সহসা অট্টহাসে ?
ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়—একদা আবার পূর্ণ হ'তে,
মানুষ মরেনা ; ফিরে ফিরে আসে নিত্য নবীন জীবন স্রোতে।
তুচ্ছ নহে এ পৃথিবীতে কিছু। কে বলে জগৎ মায়ার খেলা ?
সংসার নয় হপ্তার হাট—দুদিনের শুধু রথের মেলা !
আপাত দৃষ্টি দেখে কতটুকু ? দূর দৃষ্টির প্রসার চাই।
প্রতি ধূলিকণা—অণু পরমাণু—অনন্তরূপ কোথায় নাই ?

এখানেই রোজ লেখা হয় ভায়া ভবিষ্যতের নতুন খাতা,
তুমিই তোমার কাজের হিসেবে ভাগ্য-লিপির ভরাও পাতা !
নহ ক্ষণিকের খেলার পুতুল—কুমোরের হাতে মাটিতে গড়া ;
রাশিচক্রের ঘূর্ণাবর্ত—আদি ও অন্ত যায়না পড়া !
যা কিছু করিস, কর্মসচিব প্রতিদিন তার হিসাব রাখে ;
তোর ভাবী কাল শুভাশুভ সবই—তোরইতো মুঠোয় বন্ধ থাকে।
দীপ জ্বলে ওঠা, নিভে যাওয়া, আর—মৃদু হয়ে আসা স্তিমিত শিখা,
স্বয়ংক্রিয় সে কেরামতি তব, ভেবনা সে সব বিধির লিখা।
ভুল চুক্ যদি হয় ক্ষতি নেই, ওঠা পড়া সেতো আছেই ভাই,
আনন্দ মনে মেনে নিও সব ; নচেৎ জীবনে শান্তি নাই !

শিক্ষা

শ্রীমতী লীলা মজুমদার, এম্-এ

সাধারণ লোকে সংসারে সুখী হতে চায়, অথচ কি করলে যে সুখী হওয়া যায় তাই ভেবে পায় না। সুখ যেন সর্বদাই আশে পাশে ঘোরাঘুরি করে, কিন্তু সর্বদাই ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে।

প্রায়ই শোনা যায় আমাদের দেশটি বড়ই দুঃখী। খাওয়া পরার কষ্ট, থাকবার ভালো বাড়ি নেই, লোকে চাকরিবাকরি পায় না, স্বাস্থ্য অতিশয় মন্দ। এখানকার তুলনায় অন্য দেশ কত সুখী। এখানে গুণের আদর নেই, ক্ষমতা-বিকাশের সুযোগ নেই, মনুষ্যত্বের সম্মান নেই। লোকে দুঃখ করে যে স্বাধীনতার কাছ থেকে যা আশা করা গিয়েছিল তার কিছুই পাওয়া যায় নি। আমাদের মত দুঃখী আর কোথায় আছে। তাই শুনে সারা পৃথিবীময় খুঁজে দেখি, কোথায় সেই সুখী দেশ, যার মত হ'তে পারলে আমরাও সুখী হব। কিন্তু তাকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। সুখ পাওয়া না গেলেও, যদি মনের শান্তিও পাওয়া যেত তা হলেও অনেকটা হত। কিন্তু বোধ হয় এর আগে কখনো এমন

পৃথিবী-জোড়া অসন্তোষ দেখা যায় নি। মানুষের পারিবারিক জীবনেও সুখ শান্তি নেই, ছেলে-মেয়েদেরও মনের মত করে মানুষ করা কঠিন।

অথচ বেঁচে থাকার উপকরণ এবং ভালো করে বাঁচার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সমস্তই কত বেড়ে গেছে। আজকাল মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের পরামর্শ মতে আমরা ছেলেমেয়ে মানুষ করবার চেষ্টা করি। আগেকার সেই মারধোর কড়া শাসন একরকম উঠেই গেছে। কড়া কথা বলা, বা টিটকিরি দেওয়া, বা ছোটছেলের আত্মসম্মানে আঘাত করার যে কি সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সে বিষয় আমরা সচেতন হয়েছি। কঠিন কিছু ওদের করতে দেওয়া হয় না, বিদ্যালয়গুলিকে আনন্দের নিকেতন করে তোলবার চেষ্টা করা হয়। সবই করা হয়, তবু ঘরে ঘরে অসন্তুষ্ট, উদ্ধত, স্বার্থপর, অসুখী উচ্ছৃঙ্খল ছেলেমেয়ে কেন দেখা যায়?

আমাদের আধুনিকতম শিক্ষা-পদ্ধতিতে কোথায় গলদ্‌ থেকে যাচ্ছে? পদ্ধতি হাজার সুচিন্তিত এবং আপাত দৃষ্টিতে হাজার নিখুঁৎ হোক্‌, সেই ছাঁচে ঢালাই হয়ে যে ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসবে তারা যদি তেমন ভালো না হয় তা হলে পদ্ধতিটার কোথাও একটা বড় গলদ আছে নিশ্চয়।

সাধারণ শীলতা-জ্ঞান, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অভিভাবকদের প্রতি বাধ্যতা, ধৈর্য্য, গুণের আদর, নীতিজ্ঞান, এগুলিকে সেকেলে বলে শুধু উড়িয়ে দিলে চলবে না। যে সব গুণকে আবহমানকাল ধরে লোকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করেছিল, সেগুলিকে কেবল তখনি বর্জন করা চলে, যখন তার চাইতেও উত্তম কিছু লাভ করা যায়। আমাদের আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদের হাতে কোন উত্তম জিনিস এনে দিতে পেরেছে? এবং যদি না পেরে থাকে, তা হলে এত সুচিন্তা ও যত্ন সত্ত্বেও কেন পারে নি সে বিষয় চিন্তা করা দরকার।

এই সূত্রে কতকগুলি কথা মনে পড়ছে। প্রথম হল, আমাদের ছেলেমেয়েদের পাঠ্যতালিকা থেকে সর্ব প্রকার ধর্মশিক্ষা আমরা তুলে দিয়েছি। সেই কি কারণ? ধর্মশিক্ষা বলতে আনুষ্ঠানিক ধর্ম বোঝায় না। যেখানে নানান সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে সেখানে আনুষ্ঠানিক ধর্ম শেখানো সম্ভব বা উচিত নয়। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ধর্মের চেয়েও যে বড় ধর্ম আছে, যা দিয়ে আমরা ভালোমন্দ, উচিত অনুচিত, সত্যাসত্য বিচার করি, তাকে বাদ দিলে কি চলে? অনেকে বলে থাকেন, সে শিক্ষার স্থান নিজেদের ঘরে, স্কুলে নয়। কিন্তু এখানে আরেকটি কথাও আছে, শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করতে হলে তার কোনো অঙ্গই বাদ দেওয়া উচিত নয়, এবং সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে একটা ঐকতান থাকা দরকার। যাতে স্কুলে যা শেখে এবং বাড়িতে যা শেখে তার মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্য না থাকে।

সত্যি কথা বলতে কি বাড়িতেও কেউ আজকাল ছেলেমেয়েদের নীতি-শিক্ষা দেয় না। সেকালের মত নীরস নীতি-শিক্ষাকে আজকাল কখনই গ্রহণযোগ্য বলা যাবেও না। নীতি-শিক্ষা আলাদা করে দেওয়া যায় না, প্রতিজনের প্রতি-দিনের আচরণের মধ্যে দিয়ে একটা সুনীতির সুর বাজা উচিত। সেই হল নীতি-শিক্ষার একমাত্র উপায়, কি বিদ্যালয়ে, কি ঘরে। ছোট ছোট প্রতারণা, ছোট ছোট প্রবঞ্চনা, ছোট ছোট স্বার্থ-পরতা, নিষ্ঠুরতা দিয়ে তিলে তিলে মনুষ্যত্ব ভেঙ্গে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তার আর কিছুই থাকে না। নীতি-বিদ্যালয় কি নীতি-শিক্ষার ক্লাশের চাইতেও এই নীতি-শিক্ষা অনেক বেশী কঠিন। কিন্তু নীতি শেখানো যায় একমাত্র নৈতিক জীবন যাপন করে, অন্য কোনো উপায় নয়।

আরো কারণ থাকতে পারে। হয়তো বা আমাদের পারিবারিক জীবনের শৈথিল্যও একটা

কারণ। যৌথ-পরিবার আর চলবে না, বর্তমান অর্থনীতি আর তাকে বহন করতেও পারবে না। কিন্তু যৌথ-পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে যদি পারিবারিক দায়িত্ববোধ ও স্নেহের বন্ধনও শিথিল হয়ে যায়, তা হলে তার ফল কখনো ভালো হবে না। যেদিন পরিবার বলতে পাশ্চাত্ত্যদেশের মত আমরাও বুঝব শুধুমাত্র স্বামী স্ত্রী ও পুত্রকন্যা, সেদিন আমাদের দেশের পুরাতন একটা শক্তির ভিত্তিও ধ্বংস হয়ে যাবে। ছোটবেলায় যারা মাসিপিসি খুড়ো জ্যাঠার দাবী অস্বীকার করতে শেখে, বড় হয়ে তারা যে ভাইবোন কিংবা বুড়ো বাবামার দাবীও অস্বীকার করবে তাতে আর সন্দেহ কি ? পারিবারিক জীবনের পরিবারটাকে ছোট হ'তে হ'তে শেষে একটা আত্মকেন্দ্রিক বিন্দুতে এসে না পরিসমাপ্ত হয়।

তৃতীয় একটা কারণও থাকতে পারে। তার গোড়াতেই আছে আমাদের বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির মূলমন্ত্রটি, এবং সম্ভবতঃ এরই প্রভাব সব চাইতে বেশী। লোকে বলে যে প্রত্যেকটি মহৎ অনুষ্ঠানের মধ্যে আপনার ধ্বংসের কারণ নিহিত থাকে। শেষ পর্যন্ত নিজেই নিজের সর্বনাশ সাধন করে। এখানেও হয় তো তাই।

ঐ যে সব কিছু সহজ করে দাও, সুখের করে দাও, ঐ হয়তো সর্বনাশের কারণ। যা কিছু কঠিন, যা কিছু অপ্রিয় ছেলেমেয়েরা তাকেই অস্বীকার করতে চায়। অথচ দুনিয়াতে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার কোনটাই সহজলভ্য নয়। এই-খানেই বোধ হয় আমাদের সমুদয় শিক্ষা-পদ্ধতির গলদ্।

বাংলার তন্ত্রসাধনা*

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

আজ বঙ্গদেশে ঘনতমিস্রার অবলেপ। দেশ ছিন্ন ভিন্ন, দিকে দিকে মরণাতুরের আর্তনাদ, দুর্ভাগ্যের এই মহাশ্মশানে বসে বাঙালী শবসাধনায় নিমগ্ন। এই শবের মধ্যেই মহাশক্তির অবতরণ ঘটবে। এর জন্য প্রয়োজন বীর সাধকের :

'সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে।
কালনৃত্য করে উপভোগ
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।।'

(বিবেকানন্দ)

এই কথাই তন্ত্রের মর্মকথা। করালিনীর উপাসনা, ভীমার পূজা, রুদ্রাণীর আবাহন—দুর্বলের নতিস্বীকার নয়, শক্তিমানের সেই অমোঘবীর্যে প্রতিষ্ঠা যা হৃদয়ের সকল বাসনা-কামনাকে নির্মূল করে হৃদয়কে শ্মশান করে তুলবে এবং সেই হৃদয়ে শ্যামাসুন্দরীর নৃত্য হবে।

তন্ত্রের তত্ত্ব আলোচনা করার পূর্বে তন্ত্রের সংজ্ঞা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। কাশিকাবৃত্তিতে 'তন্ত্র' শব্দ তন্ ধাতুর উত্তর উনাদি প্রত্যয় ষ্ট্রন্ প্রয়োগ করে ব্যুৎপন্ন হয়েছে। তন্ ধাতুর অর্থ বিস্তার। বাচস্পতি, আনন্দগিরি এবং গোবিন্দানন্দের মতে তন্ত্রি ধাতু থেকে তন্ত্র শব্দ ব্যুৎপন্ন। তন্ত্রি ধাতুর অর্থ ব্যুৎপাদন বা জ্ঞান। কিন্তু গণপাঠে দেখা যায় যে তন্ত্রি ধাতুরও অর্থ বিস্তার হতে পারে। সুতরাং তন্ত্র শব্দের দ্বারা যে কোন বিস্তারিত আলোচনা বুঝানো যায়। সেইজন্য দেখা যায় প্রাচীনকালে যাগ, যজ্ঞ, ক্রিয়া, মতবাদ, তত্ত্ব, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় বুঝানোর জন্য তন্ত্র শব্দের

* কলিকাতা বঙ্গীয় সংস্কৃতি সম্মিলনের ১০।৩.৫৬ তারিখের অধিবেশনে পঠিত।

প্রয়োগ করা হয়েছে। সাংখ্য দর্শনের গ্রন্থাদির নাম ছিল ষষ্টিতন্ত্রশাস্ত্র। সেইভাবে, ন্যায়তন্ত্র, ধর্মতন্ত্র, ব্রহ্মতন্ত্র, যোগতন্ত্র, আয়ুর্বেদতন্ত্র প্রভৃতির উল্লেখও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়।

কিন্তু কালক্রমে তন্ত্র শব্দের সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে প্রয়োগ দেখা যায়। বারাহীতন্ত্রের মতে:

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ মন্ত্রনির্ণয় এব চ।
দেবতানাঞ্চ সংস্থানং তীর্থানাঞ্চৈব বর্ণনম্॥
তথৈবাশ্রমধর্মশ্চ বিপ্রসংস্থানমেব চ।
সংস্থানঞ্চৈব ভূতানাং যন্ত্রাণাঞ্চৈব নির্ণয়ঃ॥
উৎপত্তির্বিবুধানাঞ্চ তরূণাং কল্পসংজ্ঞিতম্।
সংস্থানং জ্যোতিষাঞ্চৈব পুরাণাখ্যানমেব চ॥
কোষস্য কথনঞ্চৈব ব্রতানাং পরিভাষণম্।
শৌচাশৌচস্য চাখ্যানং নরকাণাঞ্চ বর্ণনম্॥
হরচক্রস্য চাখ্যানং স্ত্রীপুংসোশ্চৈব লক্ষণম্।
রাজধর্মো দানধর্মো যুগধর্মস্তথৈব চ॥
ব্যবহারঃ কথ্যতে চ তথা চাধ্যাত্মবর্ণনম্।
ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তং তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥"

"সৃষ্টি, লয়, মন্ত্রনির্ণয়, দেবতাদের সংস্থান, তীর্থবর্ণন, আশ্রমধর্ম, বিপ্রসংস্থান, ভূতাদির সংস্থান, যন্ত্রনির্ণয়, বিবুধদের উৎপত্তি, তরু উৎপত্তি, কল্পবর্ণন, জ্যোতিষসংস্থান, পুরাণাখ্যান, কোষবর্ণন, ব্রতকথা, শৌচাশৌচাখ্যান, শিবচক্রবর্ণন, স্ত্রীপুরুষের লক্ষণ, রাজধর্ম, দানধর্ম, যুগধর্ম, ব্যবহার ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের বর্ণন ইত্যাদি লক্ষণ যাতে থাকে তাকেই তন্ত্র বলা যায়।"

সংক্ষেপে বলতে গেলে তন্ত্রের চারটি অংশ: (১) জ্ঞান অর্থাৎ দার্শনিক মতবাদ, বীজাদির শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান, মন্ত্রশাস্ত্র, ও যন্ত্রশাস্ত্র (২) যোগ—ধ্যানধারণাদির বর্ণনা ও বিবিধ সিদ্ধিলাভের জন্য মায়াযোগ (৩) ক্রিয়া—মূর্তি-মন্দিরাদির নির্মাণবিষয়ক আলোচনা এবং (৪) চর্যা—আচার-ব্যবহার, উৎসব ব্রত প্রভৃতির আলোচনা।

এই আলোচনা থেকে সহজেই এই প্রতীতি হয় যে তন্ত্রশাস্ত্র একটি বিরাট সমন্বয়-প্রচেষ্টা। বহু ভাবধারার প্রবাহ ভারতের জীবনে বিভিন্ন অববাহিকাকে অবলম্বন করে এসেছিল। তারই সমীকরণের ফল তন্ত্রশাস্ত্র। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত একস্থানে বলেছেন—"বেদের কর্মকাণ্ড, মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, বৈষ্ণব মতবাদ, চরক ও সুশ্রুতের চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি সব কিছুই তন্ত্রের মতবাদের অঙ্গরূপে তন্ত্রের মধ্যে বর্তমান।" শুধু তাই নয়, তন্ত্রশাস্ত্রের একটি বিশেষ অংশ যা বামাচার নামে প্রখ্যাত তা আর্য ও অনার্য ভাবধারার সংমিশ্রণ।

এর পর আমরা তন্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব। স্বামী বিবেকানন্দপ্রমুখ বহু মনীষীর মতে বৌদ্ধরাই তন্ত্রের স্রষ্টা। হিন্দু সমাজ চিরদিনই বহিঃসংস্পর্শব্যাবর্তক। কাজেই হিন্দুধর্মের বা সমাজের মধ্যে আর্যেতর মতের অনুপ্রবেশ সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু নবীন বৌদ্ধধর্ম ছিল প্রচারধর্মী। বহু নব নব জাতি তাদের আচার ব্যবহার সংস্কৃতি পরিবহন করে বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রবিষ্ট লাভ করে। এই সুযোগে তাতার মঙ্গল প্রভৃতি জাতিও বৌদ্ধধর্মের কুক্ষিগত হয়। নবদীক্ষিত এই সব অনার্যজাতির বহু আচারব্যবহার এইভাবেই বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ লাভ করে।

বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা নৈতিকতার দৃঢ়ভূমির উপর। সর্বপ্রকার গুহ্যসাধন বা বিভূতি লাভাদির বিরোধী ছিল এই ধর্ম। কিন্তু বহির্ভাবধারার অনুপ্রবেশের ফলে নানা ক্রিয়াকলাপ, বিভূতি প্রভৃতির অনুপ্রবেশ বৌদ্ধধর্মে ঘটে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর গ্রন্থ মঞ্জুশ্রীমূলকল্প পাঠে দেখা যায় কি ভাবে ক্রিয়াকলাপাদি ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করছিল।

ইহা ব্যতীত খ্রীঃ পূর্ব তৃতীয় শতকে বৌদ্ধসংঘের ভিতর 'একাভিপ্রায়ী' বলে একটি মতবাদের অভ্যুত্থান হয়। আনন্দের করুণ আবেদনে ভগবান্ তথাগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে সঙ্ঘে নারীজাতির স্থান

দিয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কঠিন বিধিনিষেধের দ্বারা সভ্যস্থ স্ত্রীপুরুষের মেলামেশাকে নিয়ন্ত্রিতও করেছিলেন। তৎসত্ত্বেও প্রকৃতির সহজপ্রবণতা বিধিনিষেধের দ্বারা অবদমিত হয়নি। এরই ফলে এবং নবদীক্ষিত জাতিসমূহের অনৈতিক প্রথার সংমিশ্রণে একাভিপ্রায়ী প্রভৃতি মতের উদ্ভব। এই মতবাদে স্ত্রীপুরুষের সাহচর্যে নিশাকালে নানারূপ গুহ্য সাধনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের বৌদ্ধগ্রন্থ গুহ্য সমাজতন্ত্রে বামাচার তন্ত্রের সকল লক্ষণই দেখতে পাওয়া যায়। এর অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রজ্ঞাভিষেকের উল্লেখ আছে। এই প্রজ্ঞাভিষেকের মূলকথা শক্তিগ্রহণ। গুরু, শিষ্যের অভিলষিতা, সুন্দরী, যোগপারদর্শিনী শক্তির সঙ্গে শিষ্যকে মিলিত করবেন। এই বিদ্যাগ্রহণ বা শক্তিগ্রহণ ব্যতিরেকে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই। এই শক্তি অপরিত্যাজ্যা। এই শক্তিগ্রহণের নাম বিদ্যাব্রত।

যখন বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তখন পূর্বোক্ত বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান হিন্দুধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে হিন্দুতন্ত্রের সৃষ্টি করেছিল। হিন্দুতন্ত্র যে বৌদ্ধোত্তর এবং বৌদ্ধতন্ত্র থেকে উদ্ভূত তা বহু মনীষীই স্বীকার করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "আমার বিশ্বাস আমাদের মধ্যে প্রচলিত তন্ত্রের সৃষ্টি বৌদ্ধরাই করেছে।" পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও এই কথাই বলেছেন যে তন্ত্রের ব্যাপারে "বোধ হয় আমরাই ঋণী এবং বৌদ্ধেরা মহাজন।" শ্রীযুক্ত বিনয় ভট্টাচার্যও অনুরূপ মতের পোষক। তিনি বলেন, "হিন্দুগণ বৌদ্ধতন্ত্র হতে উপাদান গ্রহণ করেছিল এবং তাদের বহু প্রথা নিজেদের ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। এই ভাবেই তন্ত্রানুশীলন চরমাবস্থা লাভ করে।"

অনেকে বলে থাকেন যে হিন্দুতন্ত্র অতি প্রাচীন। নারায়ণীয় তন্ত্রে বলা হয়েছে তন্ত্রের যামল গ্রন্থ থেকেই চতুর্বেদের উৎপত্তি। এই সকল মতবাদের মধ্যে প্রাচীনতার প্রক্ষেপ দিয়ে এবং বেদের সঙ্গে সংযোগসূত্র স্থাপন করে তন্ত্রের মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা ব্যতীত অপর কোন সত্য নেই। এ পর্যন্ত যত হিন্দু তন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে পণ্ডিত Winternitz এর মতে তার মধ্যে কোনটিই ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতকের পূর্বে রচিত নয়। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "তন্ত্রসাহিত্যের কোন গ্রন্থই বোধ হয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের আগে রচিত হয় নাই।" কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখেছি যে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের রচিত 'গুহ্যসমাজ তন্ত্র' একখানি বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ। সুতরাং বৌদ্ধতন্ত্র যে হিন্দুতন্ত্র থেকে প্রাচীনতর এবং হিন্দুতন্ত্র যে বৌদ্ধতন্ত্র থেকে উদ্ভূত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এ তো গেল তন্ত্রশাস্ত্রের কালিক পরিচ্ছেদের কথা। কিন্তু এর উদ্ভবস্থান কোথায়? একটি প্রবাদবাক্য আছে:

"গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা মৈথিলে প্রকটীকৃতা।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা॥

"এই বিদ্যা গৌড়দেশে প্রাদুর্ভূত, মিথিলায় প্রকটীকৃত, মহারাষ্ট্রে কোন কোন স্থানে প্রকাশিত এবং গুর্জরে বিলয়প্রাপ্ত।" মনে হয় এই প্রবাদবাক্যের অন্তরালে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। কেননা, বাংলার ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে বাংলাদেশে আর্যদের আগমনের পূর্বেই একটি বিশিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতি বর্তমান ছিল। ডাক্তার রমেশ মজুমদার বলেন, "মোটের উপর আর্যজাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই যে বর্তমান বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব হয়েছিল এবং তাহারা একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়।" আর্য সভ্যতার অভিঘাত খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে বাঙলা দেশে আপতিত হয়। প্রাক্তন বিরাট সভ্যতার উৎসাদন সম্ভব ছিল না বলেই দুই সংস্কৃতির একটা মিলন

প্রচেষ্টাও গুপ্তযুগে আরম্ভ হয় এবং এই প্রচেষ্টা পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে পালবংশের সময়। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "এই সচেতন যোগসাধন আরম্ভ হইয়াছিল গুপ্ত-আমলেই, কিন্তু পূর্ণরূপ গ্রহণ করিল পাল-আমলে; এবং বাংলাদেশে তাহা এক বৃহত্তর সমন্বয়ের আশ্রয় হইল আর্যেতর এবং মহাযান-বজ্রযান-তন্ত্রযান-বৌদ্ধধর্মের সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় যুক্ত হইয়া। এই সমন্বিত এবং সমীকৃত সংস্কৃতিই বাঙালীর সংস্কৃতির ভিত্তি, এবং ইহা পাল-আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। সমন্বয় ও সমীকরণের এই রূপ ও প্রকৃতি অন্যত্র আর কোথাও দেখা যায় না।" বাংলার এই বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করেই বৌদ্ধতন্ত্র, হিন্দুতন্ত্র, সহজিয়া মতবাদ প্রভৃতির উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে বঙ্গদেশেই তন্ত্রের উদ্ভব। অধ্যাপক Winternitzও বলেন, "তন্ত্রের আদিম জন্মভূমি বঙ্গদেশ বলিয়াই মনে হয়।" ডাঃ রায়ও বলেন, "আগমশাস্ত্রের ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং তাহা সর্বভারতীয়; কিন্তু তন্ত্র বলিতে পরবর্তী কালে আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহা বোধ হয় পূর্ব ভারতে, বিশেষভাবে বাংলাদেশেই সৃষ্টি ও পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।"

এই জন্যই বাংলা তন্ত্রপ্রাণ। তন্ত্রের প্রাদুর্ভাব যুগ থেকেই বাংলায় তন্ত্রসাধনা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত। সেই জন্যই গৌড়পাদাচার্য এবং মধুসূদন সরস্বতীর ন্যায় বেদান্তের মহাপণ্ডিতের আবির্ভাব বাংলাদেশে হওয়া সত্ত্বেও এদেশে বেদান্তের বিশুদ্ধরূপের প্রচার কোন সময়েই হয় নি। এর জন্য দায়ী বাংলার সমাজ-সংস্থান এবং বাঙালীর প্রকৃতি।

অবশ্য পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে তন্ত্র সমন্বয়-শাস্ত্র এবং এর যা পরমতত্ত্ব তা অদ্বৈত বেদান্তের তত্ত্ব থেকেই গৃহীত। তন্ত্রমতে নির্গুণ ব্রহ্মই মায়াসংযুক্ত হয়ে জগতের সৃষ্টি করেন। কিন্তু বেদান্তের মায়া সদসদ্‌ভ্যামনির্বচনীয়া। আর তন্ত্রের মায়া ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন এবং সদ্রূপা। সুতরাং বেদান্তের জগৎ যে অর্থে মিথ্যা তন্ত্রের জগৎ সেই অর্থে মিথ্যা নয়।

তন্ত্র এই সঙ্গে সাংখ্যযোগের চতুর্বিংশতি তত্ত্বও গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সাংখ্যযোগের সঙ্গে এই খানেই সাদৃশ্যের অভাব যে তন্ত্রমতে প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বর একই প্রকারের সত্তা এবং বহির্জগতে যা যথার্থ পরিণাম বলে মনে হয় তা ঈশ্বর-তত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্য পরিণামমাত্র।

তন্ত্রের দার্শনিক মত সম্যক্ আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে তন্ত্রের চরম তত্ত্ব পরাসম্বিৎ বা নিষ্কল শিব বা নির্গুণ ব্রহ্ম। এঁকে চরম তত্ত্ব বললেও ইনি কোন তত্ত্বের অন্তর্গত নন—ইনি তত্ত্বাতীত। আমাদের দ্বৈতাত্মক জগতে 'অহম্' আর 'ইদম্' এই বোধ রয়েছে। পরা সম্বিতে এই বোধ দুইটির সমবদ্ধাবস্থা। এই পরাসম্বিত্তের স্পন্দ-প্রথম শিবতত্ত্ব। আর এরই বিপরীত দিক্ শক্তিতত্ত্ব। এই তত্ত্বদ্বয় নিত্যযুক্ত সন্তত-সমবায়িনী। এই তত্ত্বদ্বয় উৎপন্ন বস্তু নয়। প্রলয়েও এরা একই অবস্থায় থাকে। শক্তিতত্ত্ব—'নিষেধব্যাপাররূপা'—পূর্ণজ্ঞানের অভাব এতে হয়। আর শিবতত্ত্ব—প্রকাশমাত্র—অহম্ বোধমাত্র। শক্তিতত্ত্ব—বিমর্শ—অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি। এতে 'ইদম্' বীজ রয়েছে—এই 'ইদম্' বীজই জগৎরূপে পরে পরিবর্তিত হয়। শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব বস্তুগত্যা পৃথক্ নয়। সেইজন্যই শিবতত্ত্বকে বলা হয় উন্মনী শক্তি—'যত্রগত্বা তু মনসো মনস্ত্বং নৈব বিদ্যতে'—যেখানে গিয়ে মনের মনত্ব থাকে না। যেখানে অহম্ বোধমাত্র থাকে। আর শক্তিতত্ত্বের নাম সমনীশক্তি—'মনঃসহিতত্বাৎ সমনা'—মনের সঙ্গে যা থাকে। 'সমনা নাম সা শক্তিঃ সর্বকারণকারণম্'। সমনা নামক সেই শক্তি সর্বকারণেরও কারণ। এই শিবশক্তি তত্ত্বদ্বয় থেকে উদ্ভূত হয় সদাশিব বা সদাখ্য তত্ত্ব। এই তত্ত্বে

'অহম্-ইদম্'এর একত্রানুভূতি। এখানে ইদম্—অহম্এরই অঙ্গ—পৃথক্ নয়।

সদাখ্যতত্ত্ব থেকে উৎপন্ন হয় ঈশ্বরতত্ত্ব—এতে ইদম্ এবং অহম্ এর সহাবস্থান হলেও ইদম্ অহম্ এর প্রত্যয়ের বিষয়। ঈশ্বরতত্ত্ব থেকে উৎপন্ন হয় সদ্বিদ্যাতত্ত্ব বা শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব। এখানে অহম্-ইদম্ সমপ্রভাবসম্পন্ন এবং বিশ্লেষণোন্মুখ। এর পরেই মায়াশক্তি এবং মায়াশক্তির কঞ্চুকের সাহায্যে অহম্—ইদম্ এর বিশ্লেষ ঘটে। মায়াশক্তি তাকেই বলে যার দ্বারা ব্রহ্ম থেকে জগৎকে পৃথক্ করে দেখা হয়। কঞ্চুকের অর্থ আবরণ। এর সংখ্যা ৫টি। ১। কাল—পরিচ্ছেদকারী শক্তি ২। নিয়তি—যা স্বতন্ত্রতা আনায় ৩। রাগ—যা আসক্তি আনে পূর্ণস্বরূপেরও মনে। ৪। বিদ্যা—যা সর্বজ্ঞকে অল্পজ্ঞ করে। ৫। কলা—যা সর্বময় কর্তাকে কিঞ্চিৎ কর্তৃত্ব দেয়। এই মায়া এবং কঞ্চুক-সকলের জন্যই সদ্বিদ্যাতত্ত্ব থেকে উদ্ভূত হয় পুরুষতত্ত্ব এবং প্রকৃতিতত্ত্ব। এখানে অহম্, ইদম্ সম্যক বিশ্লিষ্ট। পুরুষতত্ত্ব অহম্—প্রকৃতি তত্ত্ব ইদম্। পুরুষ বহু। প্রকৃতি সকল-সঙ্কুচদ্রূপা শক্তির সামান্য রূপ। প্রকৃতি তিন গুণের সাম্যাবস্থা। পুরুষের সাহচর্যে ত্রিগুণের বিক্ষোভে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি ও জগৎ সৃষ্টি ঘটে।

তন্ত্রের এই তাত্ত্বিক বিচারে এই কথাই মনে হয় যে অদ্বৈত বেদান্তে যুষ্মদস্মৎ-প্রত্যয়ের যে মিথুনীকরণকে 'নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ' বলা হয়েছে এবং যুষ্মৎ বা ইদম্‌কে মিথ্যা বা অধ্যাস বলে অস্বীকার করা হয়েছে সেইখানে তন্ত্র জগতের দিক্ থেকে একটি ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছে। এই ব্যাখ্যা কতটা যুক্তিসহ সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও সাধারণ মানুষের কাছে এর উপযোগিতা খুবই আছে।

উপরে যে শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে তাই অবলম্বন করে শাক্তমতবাদ এবং শক্তির পূজা প্রতিষ্ঠিত। কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।' "সাধকের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হয়।" বাংলার তন্ত্রসাধক কালীকুলের সাধক। কালীর উপাসনা বাঙালীর প্রাণের উপাসনা। এই মূর্তিকল্পনায় শবরূপ মহাদেব—শিবতত্ত্ব—তিনি অহম্ বোধে মগ্ন। আর কালী—শক্তিতত্ত্ব—তিনি ক্রিয়াশক্তি—সৃষ্ট্যুন্মুখী। তাঁর মধ্যে সৃষ্টির বীজ রয়েছে। অন্যান্য দেবীমূর্তির কল্পনাতেও এই শিব-শক্তিতত্ত্বেরই প্রকাশ।

এই যে শক্তিতত্ত্ব—এর মূল কিন্তু বেদে। ঋগ্বেদের দশম-মণ্ডলের দেবী-সূক্তে আছে :

'ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষীয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥'

"আমার দ্বারাই লোক জীবিত আছে। অন্ন-গ্রহণ ও শ্রবণাদিও করছে। আমাকে যে অবহেলা করে সে বিনষ্ট হয়। তুমি শ্রদ্ধাবান্। এইজন্য তোমাকে বলছি।"

এই শক্তিই মানুষকে বদ্ধ করে। চণ্ডীতে আছে :

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥

"সেই দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানীদের চিত্তও বলপূর্বক আকর্ষণ করে মোহে নিক্ষেপ করেন।' কিন্তু 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে'—"তিনিই প্রসন্না হয়ে বরদ হলে মানুষের মুক্তিবিধান করেন।"

সেইজন্য দেবীর পূজা করতে হয়। এই সাধন বাহ্যিক পূজাও হতে পারে বা আন্তর ধ্যানজপাদিও হতে পারে। দেবীপূজার গূঢ় রহস্যের আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে করা সম্ভব নয় এবং মন্ত্রাদির যে তত্ত্ব তাও এখানে ব্যাখ্যা করার সময় নাই। শুধু এইটুকুই জানাতে চাই যে বাহ্যপূজার অন্তরালে এবং মন্ত্রাদির ব্যবহারে পরাবাক্, বিন্দু, নাদ ও বীজাদিকে অবলম্বন করে একটি বিরাট দার্শনিক পটভূমিকা

আছে। মন্ত্রাদি নিরর্থক শব্দমাত্রই নয়। যাঁরা জ্ঞানপিপাসু তাঁরা Sir John Woodroffe এর পুস্তকাদি এবং তন্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করলে বহু তথ্য অবগত হবেন।

তন্ত্র বলেন যে, মানবের দেহভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডেরই প্রতিরূপ। এই দেহে শিব-শক্তি আছেন। পরম শিব সহস্রারে এবং শক্তি কুণ্ডলিনীরূপে মূলাধারে। অবরোহক্রমে এই জগতের সৃষ্টি। আরোহক্রমে সাধক কুণ্ডলিনীর সঙ্গে পরম শিবকে মিলিত করতে পারলেই মোক্ষ লাভ হবে। এই মিলনসাধনের জন্য তন্ত্রে পূজা, ধ্যান, মন্ত্রজপ, হোম, দীক্ষা প্রভৃতি নির্দিষ্ট হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের অবতারণা করছি। পূর্বেই বলেছি যে তন্ত্র আর্য ও আর্যেতর ভাবধারার সংমিশ্রণ। এর ফলে তন্ত্রের মধ্যে বৈদিক ও অবৈদিক আচার মিশ্রিতভাবে আছে। তন্ত্রে সাধকদের জন্য যে সকল আচার নির্দিষ্ট হয়েছে তা কুলার্ণবতন্ত্রের মতে সাতটি—(১) বেদাচার (২) বৈষ্ণবাচার (৩) শৈবাচার (৪) দক্ষিণাচার (৫) বামাচার (৬) সিদ্ধান্তাচার (৭) কৌলাচার। এগুলির মধ্যে প্রথম চারটি বেদপর এবং শেষ তিনটি আচার অবৈদিক ভাবপূর্ণ। সাধারণতঃ প্রথম চারটি আচার হিন্দুধর্মের—বিশেষ করে বাংলা দেশের মর্মে মর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বাঙ্গালীর ধর্মসাধনাকে প্রাণবন্ত করেছে। তন্ত্রের সঙ্গে ক্রিয়ার সহযোগে একটি সাধনার সহজ পথের আবিষ্কার করেছে। বাঙ্গালী জাতির পূজা, দীক্ষা, ব্রত, নিয়ম প্রভৃতি সকল বিষয়ই তন্ত্রের এই সকল আচারের দ্বারা পরিচালিত।

কিন্তু বামাচার প্রভৃতি—যা গোপনে অনুষ্ঠিত প্রক্রিয়াদির সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়—তা অনৈতিক ভিত্তিভূমির উপর আস্তৃত। এই সকল আচারে পঞ্চমকারের অনুষ্ঠানে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা এবং স্বকীয়া বা পরকীয়া স্ত্রীগ্রহণ করা হয়।

অবশ্য তন্ত্রে অধিকারভেদে তিনটি ভাবকে আশ্রয় করার কথা আছে। দিব্যভাব, বীরভাব, পশুভাব। দিব্যভাবের যাঁরা মানুষ তাঁরা উচ্চস্তরের লোক। তাঁদের পক্ষে মদ্য অর্থে সহস্রার ক্ষরিত সুধাধারা কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুকে ছেদন পূর্বক নির্বিষয়তালাভই মাংসগ্রহণ, অহংকার দম্ভ প্রভৃতিকে বশীভূত করাই মৎস্য ভক্ষণ, আশা তৃষ্ণা প্রভৃতি অষ্টমুদ্রাকে দমন করাই মুদ্রা গ্রহণ এবং ইড়া-পিঙ্গলা-বাহিত বায়ুর সুষুম্নাতে সংযোগই স্ত্রী গ্রহণ। যাঁরা পশুভাবে স্থিত তাঁদের পক্ষে সম্বিদা, গুড়ার্দ্রক প্রভৃতি মদ্যের অনুকল্প, লবণার্দ্রক মাংসানুকল্প, লবণতৈলাক্ত দগ্ধকুষ্মাণ্ড মৎস্যানুকল্প, ঘৃতে ভর্জিত মুগ প্রভৃতি বীজ মুদ্রানুকল্প এবং রক্তচন্দনানুলিপ্ত অপরাজিতা এবং করবী পুষ্পের সংযোগই পঞ্চম মকারানুকল্প।

বীরভাবে কিন্তু মুখ্য পঞ্চতত্ত্বের ব্যবহার আবশ্যিক এবং বামাচারীদের মতে কলিযুগে পশুভাব প্রতিষিদ্ধ। কাজেই যেহেতু দিব্যভাবের সাধক দুষ্প্রাপ্য সেইজন্য অধিকাংশ তান্ত্রিকেরই বীরভাবে মুখ্য পঞ্চতত্ত্ব গ্রহণ করেই সাধন করা উচিত—বামাচারীদের মতে। এই ভাবে বামাচার বাঙলার সমাজে গভীরভাবে প্রবেশ করেছে।

বামাচার বা বীরভাবের সাধনের অবশ্য একটি মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি আছে। যে সকল লোক সহজাত প্রবৃত্তির অবদমনহেতু মানসিক-অপচার সম্পন্ন (psycho-pathological) তাদের মানস গ্রন্থির মোচনের জন্য বা সংস্কারের উদ্ঘাতির জন্য বীরভাবের সাধনা ফলদায়ক হতে পারে। ভোগের পথে মানুষের মনকে ধীরে ধীরে কি ভাবে ঈশ্বরাভিমুখী করা যায় সেই অসাধ্য সাধনেই বীরভাবের প্রচেষ্টা। রূপরসমুগ্ধ অস্বাভাবিক মনোবিশিষ্ট মানুষকে সাহায্য করাই বীরভাবের উদ্দেশ্য। সুস্থ মনঃসম্পন্ন স্বাভাবিকবৃত্তিবিশিষ্ট মানবের জন্য কিন্তু এ পথ নয়। এ পথ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়

'পায়খানার পথ'। স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন, "যে জঘন্য বামাচার তোমাদের দেশকে নষ্ট করে ফেলছে অবিলম্বে তা ত্যাগ কর। তোমরা ভারত-বর্ষের অন্যান্য স্থান দেখ নি। দেশের পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের যতই বড়াই কর না কেন, যখন আমি দেখি আমাদের সমাজে বামাচার কি ভয়ানকরূপে প্রবেশ করেছে, তখন উহা আমার অতি ঘৃণিত নরকতুল্য স্থান বলে বোধ হয়। এই বামাচার সম্প্রদায় আমাদের বাংলা দেশের সমাজকে ছেয়ে ফেলেছে আর যারা রাত্রে বীভৎস ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে তারাই আবার দিনের বেলা উচ্চকণ্ঠে আচারের কথা বলে।"

সুতরাং এই বামাচার প্রভৃতি কুৎসিত ব্যাপার সযত্নে পরিহার করে তন্ত্রের মধ্যে যা কিছু ভাল জিনিস আছে তা গ্রহণ করতে হবে।

তন্ত্রের সবচেয়ে বড় কথা মাতৃভাবে দেবীর উপাসনা এবং এই উপাসনা করতে হবে নির্ভয় হয়ে। অভয়প্রতিষ্ঠ সাধকই যথার্থ বীর সাধক। মদ্য-মাংসাদিসেবী তথাকথিত বীরভাবাবলম্বী বীর-সাধক নয়। এই বীরসাধক ছিলেন বীরেশ্বর বিবেকানন্দ যিনি ভীষণকে ভীষণতার জন্যই পূজা করতে চেয়েছিলেন, যিনি উপদেশ করেছিলেন তাঁর শিষ্যকে যে, যখন মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাবে তখন 'মনে রেখো তিনি যেন তোমার প্রার্থনা শুনতে বাধ্য হন। মায়ের কাছে কোন আর্তভাব যেন প্রকাশ না পায়। স্মরণ রেখো।' এই তো যথার্থ বীরভাবের কথা।

আমাদের দেশের এই দারুণ দুর্দিনে আমরা তো বহুস্থানে দেবীর পূজা বহুভাবে করছি। কিন্তু ফল কোথায়? অঙ্গহীন হলে বা শ্রদ্ধার অভাব হলে পূজার ফললাভ হয় না—বিপরীত ফলও ঘটে। কাজেই পূজা ঠিক ভাবে করতে হলে অভয়প্রতিষ্ঠ হয়েই করতে হবে। তখনই মায়ের অমোঘ আশীর্বাদ আমাদের শিরে বর্ষিত হবে।

স্বামী সারদানন্দের 'ভারতে শক্তিপূজা' থেকে এই বিষয়ে একটি উদ্ধৃতি উপহার দিয়ে আমার বক্তব্যের উপসংহার করছি।

"অন্য দেশে মা শত হস্তে ধনধান্য ঢালিয়া দিতেছেন। দেখিয়া ঈর্ষায় তোমার অন্তস্তল জ্বলিয়া উঠে। তাহাদের হৃষ্টপুষ্ট সন্তানসকলের প্রফুল্ল মুখকমলের সহিত ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ, আচ্ছাদনবিরহিত, রোগে জর্জরিত তোমার সন্তানসকলের তুলনা করিয়া তুমি জগদম্বাকেই শত দোষে দোষী কর। অন্যের পদাঘাতপীড়িত হইয়া তুমি অদৃষ্টকে শতবার ধিক্কার দিতে থাক—কিন্তু দোষ কার? দেখিতেছে ন, তাহারা অজ্ঞান সমরে সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াই বড় হইয়াছে—আর তুমি সহস্র বৎসরের অজ্ঞানকে হৃদয়ে অতি যত্নে পোষণ করিয়া নীরব, নিশ্চিন্ত আছ? উহারা বিদ্যারূপিণী শক্তির পূজায় অদম্য উৎসাহে অশেষ কষ্ট সহিয়াছে, অজস্র হৃদয়ের রুধির ব্যয় করিয়াছে, দশের কল্যাণের জন্য আত্ম-বলি দিয়া দেবীকে প্রসন্না করিয়াছে—আর তুমি অবিদ্যাসেবায় যথাসর্বস্ব পণ করিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থসুখ লইয়া বসিয়া আছ। জগন্মাতা তোমায় দিবেন কেন? শাস্ত্র যে তোমায় বার বার বলিতেছেন, তিনি বলি-প্রিয়া, রুধিরপ্রিয়া। দেবীর ঐ ভাব যে তাঁহার ধ্যানমন্ত্রই রহিয়াছে। ঐ শুন, ভারতের তন্ত্রকার তোমায় কি ভাবে শক্তির ধ্যান করিতে বলিতেছেন—

শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্।
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্তৃকাকরাম্।
মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ।
চতুর্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ॥

প্রতিকার্যে মহাশ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া স্বার্থসুখ ত্যাগে, আত্মবলিদানে তাঁহার তর্পণ কর। তাঁহাকে প্রসন্না কর, দেখিবে শক্তিরূপিণী জগদম্বা তোমারও প্রতি ফিরিয়া চাহিবেন! তোমার নয়নে দীপ্তি, বাহুতে বল, হৃদয়ে তেজ, অন্তরে অদম্য উৎসাহরূপে প্রকাশিত হইবেন। দেখিবে জগন্মাতার নিত্য সহচরীদল—বুদ্ধি, লজ্জা, ধৃতি, মেধা প্রভৃতি—আবার তোমার উপর প্রসন্না হইয়া প্রতি কার্যে তোমার সহায়তা করিবেন।"

আরতি

কথা—ইন্দিরা দেবী　　　　সুর—শ্রীদিলীপকুমার রায়

জয় জয় সুন্দর নন্দকিশোর!
জয় পরমেশ্বর, জয় যোগেশ্বর, জয় মধুসূদন, জয় চিতচোর!
জয় চিতনন্দন, জয় দুঃখভঞ্জন, জয় চিরসজ্জন, জয় সুখধাম!
জয় গিরিধারী, হৃদয়বিহারী, কৃষ্ণ মুরারি সুধাময়নাম!
জয় নারায়ণ, জয় কমলাসন, নিত্য নিরঞ্জন জয় ঘনশ্যাম!
জয় শিবশঙ্কর, উমা-মনোহর, সীতাবল্লভ, রঘুপতি রাম!
জয় নারায়ণি, জয় তারা, জয় জয় মা দুর্গা, জয় কালী!
জয় ভাগীরথি, জননী গঙ্গা, জয় রাধা, জয় বনমালী!
দেবদেব জয়, ভকতবছল জয়, সন্তনকী ভক্তনকী জয়!
জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় হরি,
হরিচরণনকী জয়!
জয় গুরু নানক, মহাপ্রভো জয়, রামকৃষ্ণ অমরণকী জয়!
জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় হরি,
হরিচরণনকী জয়!

শেষ স্তবকটি "জয়গুরু নানক……" গাওয়া হবে "দেবদেব জয়……" সুরে।

সা সা পা পা । জ্ঞা জ্ঞা রসা রা I সণ্ সা রা মা I পা সা -া -া I
জ য় জ য় সুন্ — দ র নন্ — দ কি শো — — র

সা রা সনা সা । ণধা ণা ধপা ধা I পমা পা মগা মা । জ্ঞরা জ্ঞা রসা রা I
জ য় প র মে — শ্ব র জ য় যো — গে — শ্ব র

ণ্ সা রা জ্ঞা । মা পা ধা ণা I সা রা জ্ঞা জ্ঞা । সা -া -া -া II
জ য় ম ধু সূ — দ ন জ য় চি ত চো — — র

না না না সা । নধা না ধপা ধা I গা পা ধা না । রা -া সা সা I
জ য় চি ত নন্ — দ ন জ য় দু খ ভ ন্ জ ন
জ য় না — রা — য় ণি জ য় জা — রা — জ য়

না সা রা জ্ঞা । রা জ্ঞা রা রা I সনা সা রা জ্ঞা । সা -া -া -া I
জ য় চি র স জ্ জ ন জ য় সু খ ধা — — ম
জ য় মা — দু র্ গা — জ য় কা — লী — — —

না রা রা সা । সা -া সরা সনা I না রা রা সা । সা -া সরা সনা I
জ য় গি রি ধা — রী — হৃ দ য় বি হা — রী —
জ য় ভা — গী — র থি জ ন নী — গ ং গা —

গা মা পা ধা । না না ধা পা I গা -া রা রা । সা -া -া -া I
কৃ ষ্ ণ মু রা — রি সু ধা — ম য় না — — ম
জ য় রা — ধা — জ য় ব ন মা — লী — — —

সা মা মা মা । রা পা পা পা I গা ধা ধা ধা । জ্ঞা না না না I
জ য় না — রা — য় ণ জ য় ক ম লা — স ন
দে — ব দে — ব জ য় ভ ক ত ব ৎ স ল জ য়

পা সা সা সা । ধা রা রা রা I না গা রা না । সা -া -া -া I
নি — ত্য নি র ন্ জ ন জ য় ঘ ন শ্যা — — ম
স ন্ ত ন কী — ভ ক ত ন কী — জ — — য়

গা রা সা না । ধা না পা ধা I রা সা না ধা । পা ধা গা পা I
জ য় শি ব শ ং ক র উ মা — ম নো — হ র
জ য় গু রু জ য় গু রু জ য় গু রু জ য় গু রু

সা রা গা মা । পা ধা না সা I রা গা মগা রগা । সা -া -া -া II
সী — তা — ব ল্ ল ভ র ঘু প তি রা — — ম
জ য় হ রি হ রি চ র ণ ন কী — জ — — য়

আমি ও আমার

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

"আজ আপনি এ অফিসের এমন বোলবোলাও দেখেছেন—" গণেশবাবু নিজের বুকে নিজে একটি থাবড়া বসিয়ে উদাত্তস্বরে বলেন, "এ আফিস দাঁড় করিয়েছে কে? এই আমি! বুঝলেন মশাই এই আমি। প্রথম যখন ঢুকেছি, কী ছিলো এদের? কিছু না! যে ক'টা কেরাণী ছিল মাথাগুনতি একটা চেয়ার ছিল না তাদের! বিশ্বাস করছেন না? হাসছেন? আমিইতো এসে দশদিন শুধু এর টেবিলে ওর টেবিলে উঁকি মেরে মেরে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি! কাজ করতে বসেতো মশাই চক্ষু ছানাবড়া! চেয়ার নেই, টেবিল নেই, ঘড়ি নেই, কলিংবেল নেই, গরমে সেদ্ধ হও একখানা পাখা নেই, সে এক হরি ঘোষের গোয়াল। থাকার মধ্যে ছিলো খালি ফাইল! বুনো এক ইহুদী সাহেব হচ্ছে ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সে ব্যাটা বুঝতো খালি কাজ, আর চিনতো শুধু ফাইল। কমপ্লেন করলে হাসতো, বলতো 'কাজ হচ্ছে কি না তাই বলো বাবু।' তবু দমিনি, ব্যাটার মাথায় পেরেক ঠুকে ঠুকে বুঝিয়ে ছেড়েছি—শুধু কাজ হলেই হয়না সাহেব, সাজও চাই। যুগটাই সাজের। যখন যে অফিসে অর্ডার প্লেস করতে গেছি, এসে তা'দের জাঁকজমকের কথা শুনিয়ে শুনিয়ে সাহেবের মন ভিজিয়েছি। এখন আমাদের অফিসের কায়দা কানুন দেখুন? দেখে অপরে শিখছে।

সাহেব লোকটা ছিলো ভালো। মারা গেলো। এখন যে ব্যাটা এসেছে, সে একেবারে 'র'। বুঝলেন কি না? কাজের 'ক' জানে না। যা করি সব এই আমি। গণেশবাবু যদি একদিন রোগে পড়লো তো অফিস অন্ধকার! রাগ করে বলি গণেশবাবু কি অমর বর নিয়ে এসেছে? সত্যি মশাই ভাবি এক একদিন, আমি মরলে এদের কী হবে!"

কথার মাঝখানে বার পাঁচ ছয় বুকে থাবড়া বসিয়েছেন গণেশবাবু।

কিন্তু ভাবছি বুকে থাবড়া কি একা গণেশবাবুই মারেন? যেদিকে তাকাই, সেদিকেই তো ওই একই দৃশ্য। ওই বুকে থাবড়া। ওই আমি! সে 'আমি' কখনো আ য়ে আকার আ—মি, কখনো ময়ে দীর্ঘঈ আমী! আমিকে বিকশিত করবার জন্যে চেষ্টার আর অন্ত নেই। সঙ্কোচ কুণ্ঠার বালাই-ই কি আছে ছাই?

মাথায় টাক, কোলকুঁজো, 'খোনা' গলা কবরেজ মশাই, তিনিও তাঁর জরাজীর্ণ বুকের খাঁচা খানার উপরও থাবড়া মেরে বলেন,—"বুঝলে হে, সায়েব ডাক্তার জবাব দিয়ে গিয়েছিলো, কান্না-কাটি পড়ে গিছলো বাড়ীতে, সেই লোক এখন বিশ মাইল পথ হাঁটছে। মোমিনপুরের সাহা মশাইয়ের কথা বলছি। চিরকেলে রুগীর ঘর আমার; জরবিকারে পড়েছিলো। টাকার গরমে বুঝলে কিনা—'টাইফাড' হয়েছে বলে বিলেতফেরৎ ডাক্তার আনলো। শুনে গ্যাঁট্ হয়ে বসে থাকলাম, বলি ডাক বাবা ডাক! পয়সা হয়েছে, ছড়া চারটি। নিদেনকালে তো এই হরিহর কবরেজের স্বর্ণ-সিন্দুর? হলোও তাই সাহা মহাশয়ের বড়ো মেয়ে গাড়ী চড়ে এসে কেঁদে পড়লো। আমিও বাবা তেমনি খোটেল, খোট ধরে বসে রইলাম। যাবো কেন রে বেটি যাবো কেন? বিলেতফেরৎকে ডাক? বলি এলোপাথি ডাক্তার এলোপাথাড়ি চিকিচ্ছে করে বুঝি সেরে ফেলেছে তোর বাপটাকে? মেয়েটা কেঁদে অস্থির! শেষ পর্যন্ত যেতেই হলো।

'গিয়ে দেখি রুগীর নাভিশ্বাস উঠেছে। সেই রুগীকে টেনে তুললাম বুঝলে হে? এই আমি! এই হরিহর কবরেজ! সে ব্যাটা এখন বিশ মাইল হাঁটছে—।"

নিবারণ উকিল বঙ্কিম হাস্যে বলেন,—"কতো বড়ো বড়ো জজ ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘাল করে এলাম হে, এতো একটা ছোকরা ব্যারিষ্টার! 'কালাচাঁদ খুনে'র কেস্‌টা জানো তো? সাত বছর চলেছিলো! সে কেস্ জেতালো কে? এই আমি! কালাচাঁদের জ্ঞাতি কাকা তারাচাঁদের পক্ষে ছিলাম আমি। সাক্ষীসাবুদের জোরে প্রমাণ হয়ে গেছলো ভাইপোকে বিষ খাইয়ে খুন করেছিলো হতভাগা! ফাঁসি হয় হয়—নিদেন পক্ষে যাবজ্জীবন, খপ করে এমন একটি মোক্ষম্ প্যাঁচ কসলাম। সঙ্গে সঙ্গে ও পক্ষের কেস্ গেলো ভেস্তে। ব্যস্ ফাঁসির বদলে—একেবারে বেকসুর খালাস! বুক বাজিয়ে বলি ব্যাটা আমি তোর জীবনদাতা!"

ক্লাসে দাঁড়িয়ে লেকচার দিতে দিতে প্রফেসর অমুক ছাত্রছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে কোমল হাসি হেসে বলেন,—"পড়ানোটা পছন্দ হচ্ছে তো? আমার ক্লাশে পিন পড়লে শব্দ পাওয়া যায়—এমনি একটা বদনাম তো আছে আমার। আর পছন্দর কথা! সে বলতে গেলে—হাসির ব্যাপার। এক এক সময় এমন হয়, হয়তো জুলিয়াস সীজার পড়াচ্ছি, কী হ্যামলেট! অন্য ক্লাস ভেঙে সমস্ত স্টুডেন্টরা এসে দরজায় ভীড় করে দাঁড়িয়ে থাকবে!"

সাদা কাপড়ের তালি মারা শিক-বারকরা ছাতাটা বগলে চেপে ঘটক মশাই সদর্পে বলেন,—"কালো মেয়ে? ভাবনাটা কি? কালোকোলো কানা খোঁড়া, এই সব মালের জন্যেই তো কেশব ঘটক আছে। আমি এই কেশব ঘটক বুঝলেন মশাই, কালোকে সাদা, বেঁটেকে লম্বা, কানাকে পদ্মলোচন করে তুলতেপারি।"

মেয়ের বিয়ে চুকলে ভাগ্নে ভুরু নাচিয়ে বলে, "আমি না থাকলে এতোবড়ো কাণ্ডটি মামা উদ্ধার করতো কি করে দেখতাম! বাজার করেছি আমি, স্যাকরা বাড়ী দরজী বাড়ী ছুটোছুটি করেছি আমি, ডেকরেটর জোগাড় করেছি আমি, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ আগাগোড়া ম্যানেজমেন্টের ভার নিয়েছি এই আ—মী ঈ—ঈ!

ঘরের গৃহিণী দিনান্তে দুশোবার শোনান, "আমি যাই মেয়ে তাই এখনো এ সংসার করছি। অন্য মেয়ে হলে কোন্‌কালে সংসার ফেলে ধেই ধেই করে বেরিয়ে যেতো! তোমার সংসার দেখছি আমি, তোমার ছেলেপুলে সামলাচ্ছি আমি, তোমার আত্মীয়-কুটুমের মানমর্য্যেদা দেখেছি আমি, যে দিকে জল পড়ছে, সেদিকে ছাতি ধরছি আমি।"

আট টাকা মাইনের ঠিকে ঝি, সেও মুখ ঘুরিয়ে বলে,—"আমি যাই তাই এই পোড়া কড়া ফরসা করে তুলনু মা! আর কেউ পারুক দিকি? আপনার বাড়ীর কাজ আমি ছাড়া আর কাউকে করতে হবেনি- হুঁ।"

বিপিন খুড়ো হাতের ইলিশটা নাকের সামনে দুলিয়ে বলেন,—"মাছ কিনলাম! আড়াই টাকা সের! পীওর গঙ্গার ইলিশ! পারবে আনতে আড়াই টাকায় গঙ্গার ইলিশ? হোল্ ক্যালকাটার সমস্ত মার্কেট ঘুরে এসো হে, পারবে না! আমি ভিন্ন সাধ্য নেই কারো।"

নীনা মাসীমা চোখ টেনে টেনে বলেন,—"আমি গিয়ে না পড়লে ওদের ফাংশন সেদিন মাথায় উঠতো! কী অব্যবস্থা, কী অব্যবস্থা! আমিই তখন নিজের বাড়ী থেকে কার্পেট নিয়ে যাই, পর্দা নিয়ে যাই। মেয়েদের সাজাবার জন্যে শাড়ী গহনা স্নো পাউডার। তারপর একে ধ'রে তাকে ধ'রে মাইক আনানো, ফুলের মালা আনানো! সত্যি, আমি ঠিক সময়ে গিয়ে না পড়লে কি যে হতো ওনাদের। অথচ আমি তো যাবো না ব'লেই ঠিক

করেছিলাম, নেহাৎ ওরা এসে ধরে পড়লো 'নীনা মাসি, তুমি না গেলে চলবে না।' তাই শেষ অবধি—সত্যি আমাকে যে কেন সব্বাই চায়!"

লবঙ্গ পিসিমা ঘুরন্ত পাখার নীচে ধপ করে বসে পড়ে বলেন,—"পাঁচজনের দলে মিশে হেঁটে কালীঘাট গিয়ে, হার্টফেল করতে করতে রয়ে গেছি। বাবা আমি পারি ওই দু মাইল রাস্তা হাঁটতে? অন্য মাগীরা পারে, চরণে দণ্ডবৎ তাদের। বলে আপন সংসারে একসঙ্গে একসের ময়দা কখনো মাখতে পারলাম না। আমি বাবা, হাঁটতে, খাটতে মোটে পারিনে! দু' পা যাই তো রিশ্‌কো চড়ি।"

ছোট বোন মুখ ঘুরিয়ে বলে,—"ফ্যাসানই বলো, আর যাই বলো, পাট ভাঙা লাটু হয়ে যাওয়া শাড়ী পরে পথে বেরোতে 'আমি' পারবো না! সস্তার সাবান, সস্তার স্নো, এসব যে ব্যবহার করে করুক, আমি করছি না।"

বড়ো বোন ঠোঁট বাঁকিয়ে বলেন,—"দিনরাত ফ্যাসান! দিনরাত সাজগোজ! মেম সাহেব নাকি। আমি বাবা সার বুঝি মোটা সেমিজ মোটা শাড়ী!"

এ সবের সঙ্গে ব্যাখ্যা ব্যাখ্যানা, বিচার বিশ্লেষণ, অনেক কিছুই থাকে, যার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'আমি'।

শুধু যে সাবালকরাই অপরাধী, তাও নয়। নাবালক বালক শিশু, এদের জগতে উঁকি মেরে দেখুন ওই আমি!

"আবার আমার সঙ্গে খেলতে এসেছিস? সে দিন কেমন গো হারান হারিয়ে দিয়েছিলাম? ইচ্ছে করলে আমি তোকে দশবার গেম্ খাওয়াতে পারি বুঝলি?"

"মাষ্টার? মাষ্টার আমার করবে কি? আমি এমন চালাকি খেলতে পারি যে, মাষ্টার 'থ' হয়ে যাবে।"

"কেমন হয়েছে? বেশ হয়েছে! বড়ো যে আমার সঙ্গে লাগতে এসেছিলি? আমি ওসব মায়া দয়া বুঝি না এমন ল্যাং মেরে দেবো—যা এখন নাকে আইডিন লাগাগে যা!"

"দুয়ো! দুয়ো! কেটে গেলো, কেটে গেলো! পচা সুতো নিয়ে প্যাঁচ লড়তে আসে! আমার বাবা ডবল মাঞ্জা দেওয়া সুতো!"

"মাঞ্জা দিয়েছিস তো রাজা হয়েছিস! এই পচা সুতোতেই ঘুড়িটাকে কি রকম তুলি দেখ! উ—ই আকাশে চলে যাবে।"

বাগ্‌যুদ্ধে খাটো নয় কেউ।

আমিকে খাটো করতেও রাজী নয় কেউ।

ঘুড়ির মতো করেই 'আমি'কেও আকাশে তুলতে চায়, কথার লাটাই থেকে সুতো ছাড়তে ছাড়তে।

শিশুদের সরল ভেবে নিশ্চিন্ত থাকা যায় ওদের রাজ্যে উঁকি মারলে দেখা যাবে, সেখানে মিথ্যা অহঙ্কারেরই বেসাতি। অর্থাৎ এ 'আমি' জন্মগত আমি, পৃথিবীর থেকে কুশিক্ষা পাওয়া জিনিস নয়।

এ এক প্রকার আমি।

বলা চলে অহং আমি।

আর একপ্রকার আমি আছে, তাকে 'মোহন আমি' আখ্যা দেওয়া চলে। এ আমির মধ্যে সত্যই অহংভাব নেই, আছে একটি নির্দোষ গলেপড়া ভাব।

যথা—

"মিষ্টি? মিষ্টি খাবো আমি? খেপেছো? না ভাই না, আধখানি, সিকিখানি, কিছুনা! ঝাল ঝাল কিছু দিতে বরং খেতাম, কিন্তু সন্দেশ? অসম্ভব। আমাকে সন্দেশ খেতে বলা আর ফাঁসির হুকুম দেওয়া এক!"

অতঃপর হয়তো—কবে কখন এবং কোথায় উক্ত ভদ্রমহিলাকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন নিয়ে সাধ্য সাধনা করা হয়েছিল, এবং তিনি তা'র থেকে একটুকরোও দাঁতে কাটেননি, তারই ইতিবৃত্ত শুনতে হবে ঘণ্টাখানেক ধরে। তার সঙ্গে ফাউস্বরূপ

আরো শুনতে হবে তেতো দেখে তাঁর গায়ে ক-ডিগ্রী জ্বর আসে, আর ঝাল দেখলে কি পরিমাণে প্রসন্ন হয়ে ওঠেন তিনি। তিনি ঠাণ্ডাজলে নাইতে ভালোবাসেন কি গরম জলে। শীতকালে তিনি পশমী পোষাক ব্যবহার না ক'রে রেশমী পোষাক ব্যবহার করেন কেন, ইত্যাদি।

আবার ধরুন—

"ধর্মপুস্তক? ও আমি পড়তে পারিনে বাবা! কী করে যে লোকে ওই সব নীরস জিনিস সহ্য করে! চোখবুজে বসে ধ্যান জপ, গীতা ভাগবত নিয়ে বসে থাকা ও সব দেখলেই আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।"

"গান শুনতে ভালোবাসি কি না জিজ্ঞেসা করছেন? ভীষণ ভালোবাসি, সাংঘাতিক ভালো-বাসি। আমার মতেতো যে গান শুনতে ভালো-বাসেনা, সে মানুষ খুন করতে পারে। কিন্তু হলে হবে কি? শোনবার তো উপায় নেই। কেন নেই, তাই বলছেন? অসম্ভব মাথা ধরে যে! গান শুনলাম কি, মাথা ছিঁড়ে পড়তে থাকবে। নাঃ, গান শোনা আমার হয় না। অথচ কী ভালো যে বাসি!"

"ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা! ও আমাকে কাটলেও হবে না। ঘুমের জন্যে আমি বিখ্যাত। জীবনে একবার সূর্যোদয় দেখেছি, কবে জানো? যে দিন আমি পৃথিবীতে জন্মালাম। শুনেছি —ভোরবেলা ভূমিষ্ঠ হয়ে ছিলাম আমি।"

মোহন আমির স্বরূপ হচ্ছে—অপরকে ডেকে ডেকে শোনানো যেটা সবাই করে সেটাই আমি করিনা। যে আচরণটা সচরাচর শোভন নয়, সেইটাই আমি করে থাকি! সেইটাই আমার বৈশিষ্ট্য। অন্তত সেই পথেও তো আমিকে বিকশিত করা যাবে!···আমাকে নিয়ে সমালোচনা তো হবে!

এর প্রতিবাদ করতে যাওয়াও বিপদ! চুপকরে শোনা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কারণ আপনিও জানেন, আমিও জানি; এ প্রসঙ্গের প্রতিবাদ তুললে ওনাদের সুবিধাই করে দেওয়া হয়। আরো বিশদ বর্ণনায় পঞ্চমুখ হয়ে উনি তখন বলতে শুরু করবেন—"তা কি করবো বাপু? আমি মোটেই—"

আমি! আমি! আমি!

ধারে কাছে, আশে পাশে, জলে স্থলে, আকাশে অন্তরীক্ষে, নর নারী শিশু বৃদ্ধ পণ্ডিত মূর্খ, উঁচুতলা নীচুতলা সর্বকণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে আমি! আমী! আ—মি!

আবার শুধু যে 'আমি'কে সহস্র বর্ণে বিকশিত করেই শান্তি আছে তাও নয়। যতোক্ষণ না আমার 'আমি'কে দিয়ে তাড়া দিয়ে তোমার 'আমি'কে ধূলিসাৎ করতে পারছি, ততোক্ষণ পর্যন্ত ক্ষান্তি নেই।

কাজেই আপনি যখন বলেন, "ক'দিন খুব সর্দিকাসি? আমি তো ব্রঙ্কোনিমোনিয়া থেকে মরে বাঁচলাম! এখনো ডাক্তার সেনের ট্রীটমেণ্টে আছি—"

আপনি যদি বলেন, "সে দিন হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে যা বিপদে পড়েছিলাম—"আমি সঙ্গে সঙ্গে বলতে শুরু করবো "সেবার এলাহাবাদ ষ্টেশনে আমার যা কাণ্ড হয়েছিলো—"

আপনার গিন্নী যেই মাত্র বলেন,—"আমার নাতনীটা যে কী দুষ্টু হয়েছে—" তদ্দণ্ডে আমার আমার গিন্নী বলে উঠবেন "আর বোলোনা ভাই আমার নাতীটার কথা যদি শোনো—"

অতঃপর আপনাদের শুনতেও হবে। অষ্টাদশ-পর্ব মহাভারত না হোক্ সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। যতোক্ষণ না আপনার গিন্নী নিরস্ত হয়ে নীরব হবেন, ততোক্ষণ ধরে চালিয়ে যাবেন আমার ইনি!

প্রাধান্য চাই, এই হচ্ছে কথা!

আপনার বাড়ীর চাকর-বাকররা যদি চোর হয়, তো আমার বাড়ীর চাকর-বাকররা অবশ্যই

ডাকাত! আপনার বৌমাটি 'লক্ষ্মী' হলে, আমার বৌমাটি সাক্ষাৎ ভগবতী!

আপনার সংসারে চায়ের খরচা মাসে পঞ্চাশ টাকা?

কোথায় আছেন আপনি? আমার সংসারে পানসুপুরির খরচাই তো মাসে একশো।

আপনি রাত জেগে বই পড়েন?

হরেকেষ্ট! আমার তো অর্ধেক দিনই পড়তে পড়তে রাত কাবার হয়ে যায়।

আমার কণ্ঠ থেকে যদি হতাশ সুর ওঠে, "সংসার চালানোতো দায় হয়ে উঠলো মশাই—"সঙ্গে সঙ্গে আপনার নাসিকা থেকে দীর্ঘশ্বাস উঠবে "আমি তো মশাই আজ ছ'মাস ধরে ধারের ওপরেই আছি।"

উদাহরণের শেষ নেই, কিন্তু পুঁথির শেষ আছে। শেষ আছে পাঠকের ধৈর্যের। অতএব উদাহরণে ইতি। মোটকথা আমরা একে অপরকে কোনো কিছুতেই বাড়তে দিতে রাজী নই। আপনার ভালো না লাগলেও আমি আমার 'আমি'কে নিয়ে আপনার কানের কাছে অহরহ ঢাক পিটোবো। আর—তালে বে-তালে, চালে বে-চালে, বিপদে সম্পদে, স্বভাবে অভাবে, কোনো বিষয়েই আমার থেকে আপনাকে ছাড়িয়ে উঠতে দেবোনা। বাড়তে না পারি চাড় দিয়ে তুলে ধরবো নিজেকে।

বাস্তবক্ষেত্রে অপরকে ছাড়িয়ে বাড়তে গেলে ঝামেলা ঢের। তা'তে অর্থের আবশ্যক, সমর্থ্যের আবশ্যক, বুদ্ধির আবশ্যক, শক্তির আবশ্যক, বিশেষ কোনো গুণ থাকা আবশ্যক, বিশেষ প্রতিভা থাকা আবশ্যক, হ্যানো ত্যানো অনেক ফিরিস্তি। কিন্তু দেখুন, বাক্যের ক্ষেত্রে বাড়তে, ওসবের বালাই মাত্র নেই। আবশ্যক শুধু কথার লাটাইতে ভালো মাঞ্জা দেওয়া, কিছু সুতোর ষ্টক্! সে সুতো তাক মাফিক ছাড়তে পারলেই হলো! অনায়াসে অমিকে আকাশে চড়িয়ে দেওয়া যাবে।

একে ওকে তাকে আর আপনাকে, খর্ব করতে পারলেই যদি আমাকে নিয়ে গর্ব করা চলে, তবে আর অন্য পরিশ্রমের প্রয়োজন কি?

তাই সমগ্র জগতে 'আমি'র গতি অপ্রতিহত, 'আমার' স্রোত স্বচ্ছন্দপ্রবাহিত।

মহাজনরা যে এই 'আমি' কে বিনষ্ট করতে বলেন, সেটা কি একটা বাস্তব কথা? সম্পূর্ণ অবাস্তব। ও হয় না! স্বয়ং ভগবানই যখন অহরহ বোঝাতে চাইছেন "দেখো আমি কতো সুন্দর, আমার সৃষ্টি কতো মনোহর!" তখন মানুষ তো কোন ছার!

বিচার ও বিশ্বাস

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কথামৃত পড়তে পড়তে দেখছি এক জায়গায় ঠাকুর বলছেন:

'আমি কাঁদতাম আর বলতাম, মা বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক।'

কথামৃতের প্রথম ভাগে ঠাকুর শ্যামবসুকে বলছেন:

'কি তোমার সোনার বেনে বুদ্ধি!'

শ্যামবসু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন:

'মহাশয়! পাপের শাস্তি আছে অথচ ঈশ্বর সব ক'রেছেন, এ কি রকম কথা?'

সোনার বেণে বুদ্ধি অর্থাৎ merely logical intellect তো কোনখানে পৌঁছে দেবে না! কেন তিনি একজনকে সুখে রেখেছেন, আর একজনকে দুঃখে রেখেছেন—মগজের বুদ্ধির

আলোয় কোন কালেই তো এ সমস্যার সমাধান হবার নয়।

বুদ্ধির দ্বারা যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করা সম্ভব না হয় তবে তাঁকে মান্‌তে যাবো কেন; মান্‌বো আনন্দের জন্যে। তাঁকে মেনে, তাঁকে ডেকে, তাঁর কাছে নিজেকে অবারিত ক'রে দিয়ে যদি শাশ্বত সুখের অধিকারী হওয়া যায় তবে ফিলজফী নিয়ে এত বিচার করবার দরকার কি? ঠাকুর বললেন:

'ফিলজফী লয়ে বিচার ক'রে তোমার কি হবে? দেখ, আধপো মদে তুমি মাতাল হ'তে পার। শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে তোমার কি দরকার?'

আমাদের প্রয়োজন ফল নিয়ে। শুধু দেখা দরকার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে, তাঁর কাছে নিজেকে তুলে ধরলে আশায়, আনন্দে, শক্তিতে জীবন ফুলেফলে পূর্ণ হয়ে ওঠে কি না। আজ পর্যন্ত অসংখ্য মানুষের জীবনে দেখা গেছে: ঈশ্বরের সঙ্গে যোগে ব্যক্তিত্ব ফলে ফুলে ভরে উঠেছে, চরিত্রে আশ্চর্য এবং আকস্মিক পরিবর্তন ঘটেছে, দস্যু মহাকবিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আমাদের দরকার মানব-জন্মকে সফল করা নিয়ে। ঠাকুর বলতেন:

'ওরে পোদো, তুই আম খেয়ে নে! বাগানে কত শত গাছ আছে, কত হাজার ডাল আছে, কত কোটী পাতা আছে, এ সব হিসাবে তোর কাজ কি?'

যাঁকে ডেকে, যাঁর কাছে প্রার্থনা করে সমস্ত জড়তা এবং অবসাদ ঘুচে গিয়ে জীবন নিমেষে রূপান্তরিত হয়ে যায় তাঁকে সোনার বেণে বুদ্ধি দিয়ে বোঝা গেল না ব'লেই কি তিনি মিথ্যা হ'য়ে গেলেন? প্রার্থনার শক্তিতে জীবনের রূপান্তর যদি মিথ্যা না হয় তবে প্রার্থনাই বা মিথ্যা হ'তে যাবে কেন?

ঠাকুর তাই বিচারবুদ্ধির প্রাবল্যকে ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথে অন্তরায় বলেই মনে করতেন। শুঁড়ির দোকানে মদের পরিমাণ নিয়ে মাথা ঘামানোকে তিনি শক্তির অপব্যয় বলেই ভাবতেন। তার দ্বারা তো কিছুতেই মাতাল হওয়া যাবে না। আম গাছের ডাল আর পাতা গুণতেই যদি সময় চলে যায় তবে পোদো আর আম খাবে কখন? মগজের বুদ্ধি কসরতকে নয়, হৃদয়ের ভক্তি এবং বিশ্বাসকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন বালকের মতো হতে। বালকের অহঙ্কার থাকে না। বাইবেলে খ্রীষ্টও কি একই কথা বলেন নি? Verily I say unto you: Except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the Kingdom of Heaven.

কিন্তু এর থেকে যেন মনে না করি ঠাকুর বিচারকে ঈশ্বরের শত্রু মনে করতেন। হৃদয়ের ভক্তি এবং বিশ্বাস যাঁর সৃষ্টি, বিচার করবার শক্তিও কি তাঁরই সৃষ্টি নয়? বিচার (Reason) এবং বিশ্বাস—এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয় করে গেছেন ঠাকুর। ঠাকুর এবং স্বামীজী তো আত্মার সমস্ত শক্তিকে মেলাইতেই এসেছিলেন; অতীতের এবং বর্তমানের সমস্ত ধর্মমতকে এক মিলনসূত্রে গাঁথবার জন্যই তাঁদের আবির্ভাব। রাজা রামমোহন রায় এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁদের তফাৎ এইখানেই। যারা সাকারবাদী তাদের পৌত্তলিক বলে এঁরা নাক সিঁটকালেন না। ঠাকুর বললেন:

'যদি মাটীরই হয় সে পূজাতে প্রয়োজন আছে। নানারকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন। যাঁর জগৎ তিনিই এ সব করেছেন—অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয় মা সেইরূপ খাবার ব্যবস্থা করেন।'

পশ্চিম বলেছে প্রতিমা-পূজা পাপ—অতএব প্রতিমা-পূজা পাপ—এই দাসমনোভাব প্রথম ধাক্কা

পেলো রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ঐক্যের বাণী থেকে। এসিয়া আপন বৈশিষ্ট্যের উপরে দাঁড়িয়ে ইউরোপের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো।

কিন্তু যে কথা বলতে গিয়ে কথাপ্রসঙ্গে এতদূর চলে এসেছি। সমন্বয়ের কথা। আমাদের মধ্যে দুটো শক্তির সংগ্রাম চলছিল কোন্ আদিকাল থেকে। বিচারের এবং বিশ্বাসের শক্তির মধ্যে সন্ধি স্থাপন করলেন ঐক্যমন্ত্রের উদ্গাতা যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। যিনি বললেন বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক, বললেন বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই, তিনিই আবার বললেন :—

'সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়, এই পর্যন্ত। ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর নাম বিচার ; বুঝেছ?'

জীবনে বিচারের যেমন প্রয়োজন আছে বিশ্বাসের এবং ভক্তিরও তেমনি প্রয়োজন আছে। দু'য়ের ক্ষেত্র কেবল আলাদা অন্তরের কোন শক্তিকেই বর্জন করা মূঢ়তা। ঠাকুর সমস্ত শক্তিকেই স্বীকার করেছেন, সব শক্তিকেই কাজে লাগাবার কথা বলেছেন।

পরমপুরুষ

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মন-মর্মর ধ্বনির ভিতরে জেগেছে প্রণবরূপ
ধ্যানের তুরীয় স্তরে।
তোমারে দেবতা করি অর্চনা জ্বালায়ে গন্ধধূপ
তব করুণার তরে।
পরম পুরুষ এসেছিলে হেথা পরা প্রকৃতিরে সঙ্গে লয়ে,
মহা জীবনের লীলা করে গেলে সকল রকমে
কাঙাল হয়ে।

মনন-মহিমা করেছ প্রকাশ বহুভাব সাধনায়,
মায়া হোলো মহামায়া।
কাতর হয়েছ লীলা-সুন্দর জগতের যাতনায়,
নিখিল বেদনা বুকে করে নিয়ে রেখে গেলে পদছায়া
তপ্ত আণব গেহে!
কত না বিভূতি বিকশিত হোলো তব পার্থিব দেহে!

তোমার পূজার পুণ্য মাধুরী বিশ্বভুবনময়,
স্পন্দিত প্রাণে প্রাণে।
দেখায়ে গিয়েছ সকলধর্ম-সাধন-সমন্বয়
সত্যের সন্ধানে।
মরু-অন্তর শ্যামল করিয়া রোপণ করেছ স্বর্ণলতা,
এবার তোমার নরলীলা শুধু পূর্ণ করিতে অপূর্ণতা।

কণ্ঠে তোমার প্রথম ধ্বনিত যতমত ততপথ,
ভেদাভেদ হোলো দূর।
তুমিতো সারথি, শিবশক্তির চালনা করিছ রথ!
নানা যন্ত্রের ঝঙ্কার লয়ে তুলিছ একটি সুর
সীমাহীন লোকে লোকে ;
তোমার আলোক পাথেয় আমার চির-বিচ্ছেদ
শোকে।

তোমারি মাঝারে মিশে আছে যত জীবন মালার
মন্ত্রজপ,
তোমারে প্রণাম পুরুষোত্তম! আধার আধেয়
তোমাতে সব।

আত্মাশক্তি

স্বামী জীবানন্দ

কাল অনন্ত। দিন যায়, রাত্রি আসে। আলোকের পরে অন্ধকার। অন্তহীন কাল মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিতে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারযুগে সীমায়িত। মানুষের চারযুগে দেবতাদের এক যুগ। একাত্তর দিব্য যুগে এক মন্বন্তর। ব্রহ্মার এক দিন হয় ১৪ মন্বন্তরে। ব্রহ্মার দিবা*-অবসানে প্রলয়। তারপর আবার সৃষ্টি আবার লয়। এই হল কালচক্র। দুর্বার এর গতি।

দেবী ভাগবতের বর্ণনা—

প্রলয় কাল। কল্পান্ত। চারিদিক জলে জলময়। দিগন্ত-প্রসারিত কারণ-সমুদ্র। লীলায়িত তরঙ্গ-ভঙ্গ নেই—আছে কেবল অনন্ত নিস্তব্ধতা। শান্তির পারাবার! এই একার্ণবে বটপত্রের উপরে ভগবান বিষ্ণু শুয়ে আছেন। ভাবতে লাগলেন, "কে আমাকে এই বৈচিত্র্যহীন নিস্তরঙ্গ মহাবারিধিবক্ষে ক্ষুদ্র শিশুরূপে সৃষ্টি করলেন? কি উদ্দেশ্যেই বা এই সৃজন? কোন্ উপাদানে এই দেহ নির্মিত হল? কিরূপে এই রহস্য উদ্ঘাটিত হবে?" ইত্যাদি একটানা চিন্তাস্রোত চলেছে—হঠাৎ ঊর্ধ্বে অন্তরিক্ষে দৈববাণী হয়ে চতুর্দিক প্রকম্পিত করে তুলল: "কল্পের আরম্ভে যা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত হয় এবং প্রলয়সময়ে যে সব অতি সূক্ষ্মবীজরূপে প্রকৃতিগর্ভে নিহিত থাকে সে সমস্ত আমিই। আমিই একমাত্র চিরন্তন নিত্য—আমি ছাড়া সত্য, শাশ্বত, সনাতন দ্বিতীয় কিছু নেই। 'সর্বং খল্বিদমেবাহং নান্যদস্তি সনাতনম্।' আমি ব্যতীত সংসারের যা কিছু সবই অস্থির—ক্ষণভঙ্গুর।"

'সর্বং খল্বিদমেবাহং নান্যদস্তি সনাতনম্'—এই অর্ধশ্লোকের উপদেশটি বিষ্ণুর হৃদয়ে গেঁথে গেল। আবার চিন্তা! "কে আমাকে এই অমৃতময়ী বাণী শোনালেন? তিনি পুরুষ না স্ত্রী?" বিষ্ণু শ্লোকার্ধটি চিন্তা করতে করতে তন্ময়ভাবে ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন—তাঁর নয়নকমল দুটি ধীরে ধীরে নিমীলিত হল।

তখন সর্বমঙ্গলময়ী গুণাতীতা আত্মাশক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বগণের দ্বারা মহালক্ষ্মীরূপে আবির্ভূতা হলেন। তাঁর পাশে আছেন রতি, ভূতি, বুদ্ধি, মতি, কীর্তি, স্মৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, স্বধা, স্বাহা, ক্ষুধা, নিদ্রা, দয়া, গতি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, লজ্জা প্রভৃতি শক্তি-সকল দিব্য অলংকার ও অস্ত্রে ভূষিতা হয়ে।

কিছুক্ষণ পরে বিষ্ণু চক্ষু উন্মীলন করলেন। দেখলেন সম্মুখে সহচরী-পরিবৃতা সালংকরা অপূর্ব দেবী-মূর্তি। তাঁর বিস্ময়ের পরিসীমা নেই। ভাবলেন—

"এই দেবী কে? ইনিই কি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া?"

মহালক্ষ্মী বললেন, "কেন তুমি বিস্মিত হচ্ছ? অনাদিকাল থেকে এই জগতের সৃষ্টি ও লয় কতবার যে হয়েছে তার ঠিকানা নেই। তখন তুমি যেমন যেমন আবির্ভূত হয়েছ, আমিও তোমার সঙ্গে মিলিত হয়েছি। পরব্রহ্মরূপিণী মহাশক্তি মায়ার আবরণ-শক্তিতে তোমার স্মৃতি আচ্ছন্ন তাই আমায় চিনতে পারছ না। সেই পরাশক্তি চৈতন্যস্বরূপা, ত্রিগুণাতীতা। তুমি আমি উভয়েই সগুণ। আমিই বিশ্বসংসারে সত্ত্বগুণের আশ্রয়—বৈষ্ণবী শক্তি। তোমার নাভিকমল থেকে রজোগুণের অধিপতি প্রজাপতি ব্রহ্মার আবির্ভাব হবে, তিনি কঠোর তপস্যায় রজঃশক্তিতে বিশ্বসৃষ্টি ক'রে স্রষ্টা আখ্যা

* চতুর্যুগসহস্রং তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে।

—বিষ্ণুপুরাণ

লাভ করবেন। প্রথমে সৃষ্টি হবে পঞ্চ মহাভূতের। তারপরে উৎপাদন করবেন মন প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয় ও তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকলকে। প্রজাপতির সৃষ্ট অখিল ব্রহ্মাণ্ডে তুমিই পালনকর্তা। ব্রহ্মা তাঁর মানস-পুত্রগণের আচরণে ক্রুদ্ধ হবেন। তখন হবে তাঁর ভ্রূ-মধ্য থেকে মহাতেজোময় রুদ্রদেবের আবির্ভাব। সেই রুদ্রদেব ঘোরতর তপস্যায় তমোগুণের অধিষ্ঠাত্রী সংহাররূপা মহাশক্তি কালীকে লাভ করবেন। কল্পান্তে সংহার-শক্তির বলেই রুদ্র সমস্ত জগৎকে ধ্বংস করেন। পরব্রহ্মরূপিণী চৈতন্যরূপা পরাশক্তির ইচ্ছাতেই আমি এসেছি তোমার কাছে। আমি যে তোমার চিরসঙ্গিনী।"

বিষ্ণুর বিস্ময় কিন্তু দূর হল না। তিনি সতৃষ্ণনেত্রে চেয়ে রইলেন—যেন আরও কিছু জানতে চান।

মহালক্ষ্মীর মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠল। বললেন, "আকাশমার্গে অলক্ষ্যে থেকে যিনি দৈববাণী করেছেন তিনিই হলেন পরাশক্তি—আদ্যাশক্তি। তাঁর উচ্চারিত দুই চরণের শ্লোকটি সমস্ত বেদের সার, পরম পবিত্র, সর্বশাস্ত্রের বীজস্বরূপ। তুমি প্রতি কল্পে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন কর ব'লে তোমার উপর সদয় হয়ে এই উপদেশ দিয়েছেন। এটি হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণা কর। ত্রিলোকে এর চেয়ে জানার যোগ্য আর কিছুই নেই।" এই উক্তির পর মহালক্ষ্মী অন্তর্হিতা হলেন।

বিষ্ণুর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল। তিনি শ্লোকার্ধটিকে অনির্বচনীয় মহিমাপূর্ণ মন্ত্র ব'লে বুঝতে পারলেন, হৃদয়ে নিরন্তর ধ্যান করতে করতে যোগনিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। বিষ্ণু এখন নিষ্ক্রিয়, প্রলয়ে তাঁর সাত্ত্বিকী পালনী শক্তিও নিষ্ক্রিয়।

এইভাবে কিছুকাল কেটে গেল। প্রজাপতি ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে আবির্ভূত হলেন। প্রাদুর্ভূত হয়ে নিজের উৎপত্তির কারণ কে, তিনিই বা কে—যখন এইরূপ চিন্তারত তখন সহসা বিষ্ণুর কর্ণমলোদ্ভূত মধু ও কৈটভ নামে দৈত্যদ্বয় তাঁকে সংহারের উপক্রম করল। তাই দেখে তিনি ভয়ে ভীত ও বিব্রত হয়ে সেই বটপত্রে শয়ান ভগবান বিষ্ণুর শরণাগত হলেন। ব্রহ্মা বহুভাবে যোগনিদ্রার স্তব করলেন। বিষ্ণু যোগনিদ্রা থেকে উত্থিত হয়ে দুর্দান্ত মধু-কৈটভের সঙ্গে বহুকাল সংগ্রামের পর তাদের নিহত করে সেই শ্লোকার্ধ মন্ত্র জপ করতে লাগলেন।

পদ্মযোনি ব্রহ্মা বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি সমস্ত লোকের ঈশ্বর হয়েও কি জপ করছেন?" এই বিশ্বে আপনার চেয়ে কেউ পূজ্যতম আছে কি? কিং ত্বং জপসি দেবেশ! ত্বত্তঃ কোঽপ্যধিকোঽস্তি বৈ?"

বিষ্ণু বললেন, "প্রজাপতি, তুমি তো নিজেই জ্ঞানবান্ তবে এই জিজ্ঞাসা কেন? তোমাতে এবং আমাতে কার্যকারণরূপা যে শক্তি বর্তমান তিনি কে? একবার স্থিরচিত্তে নিজের মনেই বিচার করে দেখ না কেন? আসল ব্যাপার এই—আমি যাঁকে জপ এবং ধ্যান করে আনন্দে বিভোর, তিনি ব্রহ্মময়ী আদ্যাশক্তি—নিত্য-চৈতন্যরূপিণী—অপরিমেয়া মহাশক্তি। যেখানে যত শক্তির বিকাশ, যত শক্তির খেলা সব তাঁরই। তিনি মহাসত্ত্ব, মহাপূজ্যা, মহারতি। সমস্ত আনন্দও তাঁরই। নামরূপাত্মক জগতের প্রসূতি পালয়িত্রী সংহর্ত্রী তিনিই, আমরা শুধু তাঁর হাতের যন্ত্রপুত্তলী মাত্র!

> ময়ি ত্বয়ি চ যা শক্তিঃ ক্রিয়াকারকলক্ষণা।
> বিচারয় মহাভাগ! যা সা ভগবতী শিবা॥

কল্পে কল্পে জগৎসৃষ্টি ও সংহার তাঁরই লীলা। অতুলনীয়া জগজ্জননীর মহিমার সীমা কোথায়?

> জগৎসঞ্জননে শক্তিস্ত্বয়ি তিষ্ঠতি রাজসী।
> সাত্ত্বিকী ময়ি রুদ্রে চ তামসী পরিকীর্তিতা॥
> তয়া বিরহিতস্ত্বং ন তৎকর্মকরণে প্রভুঃ।
> নাহং পালয়িতুং শক্তঃ সংহর্তুং নাপি শংকরঃ॥

দেবী ভাগবত ১।১।৪৭,৪৮

(অবশিষ্টাংশ ৫৩৩ পৃষ্ঠায়)

চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতি

আচার্য শ্রীনন্দলাল বসু

পঞ্চবটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

"বন্দ সেই গঙ্গাতট যেথা রাজে পঞ্চবট
জপ-তপ যাহার তলায়।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃঃ ৫৬০

দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে

"তক্তাপোষের উপর তিনি উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। ভক্তেরা মেজের উপর কেহ মাদুরে, কেহ আসনে উপবিষ্ট। সকলেই মহাপুরুষের আনন্দমূর্তি একদৃষ্টে দেখিতেছেন। ঘরের অনতিদূরে পোস্তার পশ্চিম গা দিয়া পূতসলিলা গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হইয়া প্রবাহিতা।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ১।৬।১

গঙ্গাতটে দাঁড়াইয়া

"আমরা আজীবন ঠাকুরকে গঙ্গার প্রতি গভীর ভক্তি করিতে দেখিয়াছি। বলিতেন—নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্মই জীবকে পবিত্র করিবার জন্য বারিরূপে গঙ্গার আকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন। গঙ্গা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবারি।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, (সাধকভাব, ৪র্থ অধ্যায়)

ঘোড়ার গাড়ীতে কলিকাতার পথে

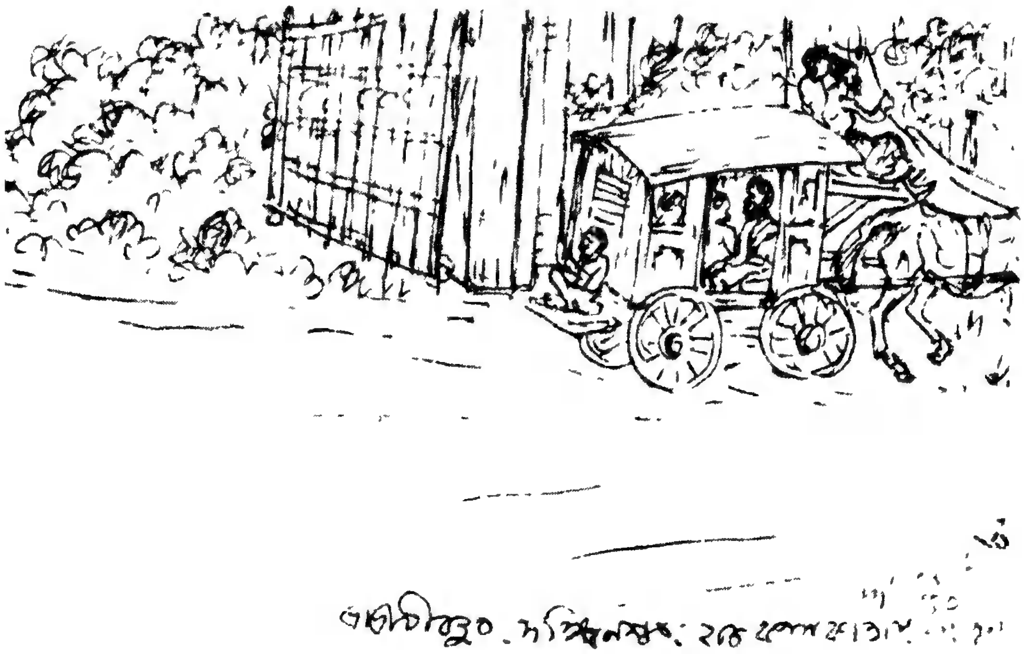

দিব্যভাবে নৃত্য

"ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে যখন তিনি দ্রুতপদে তালে তালে কখন অগ্রসর এবং কখন পশ্চাতে পিছাইয়া আসিতে লাগিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল তিনি যেন 'সুখময় সায়রে' মীনের ন্যায় মহানন্দে সন্তরণ ও ছুটাছুটি করিতেছেন। প্রতি অঙ্গের গতি ও চালনাতে ঐ ভাব পরিস্ফুট হইয়া তাঁহাতে যে অদৃষ্টপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্যমিশ্রিত উদ্দাম উল্লাসময় শক্তির প্রকাশ উপস্থিত করিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। • • • প্রবল ভাবোল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া তাঁহার দেহ যখন হেলিতে দুলিতে ছুটিতে থাকিত, তখন ভ্রম হইত উহা বুঝি কঠিন জড়-উপাদানে নির্মিত নহে, বুঝি আনন্দ-সাগরে উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়া প্রচণ্ডবেগে সম্মুখস্থ সকল পদার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইতেছে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, (দিব্যভাব, ১০ম অধ্যায়)

ঢেঁকিতে মন রেখে চিঁড়ে কোটা

"তাঁকে লাভ করার পর সংসার করা যেতে পারে। তখন নির্লিপ্ত হতে পাবে। ও দেশে ছুতোরদের মেয়েদের দেখেছি—ঢেঁকি নিয়ে চিঁড়ে কোটে। এক হাতে ধান নাড়ে, একহাতে ছেলেকে মাই দ্যায়—আবার খরিদ্দারের সঙ্গে কথাও কচ্চে,—'তোমার কাছে দু আনা পাওনা আছে—দাম দিয়ে যেও।' কিন্তু তার বারো আনা মন হাতের উপর—পাছে হাতে ঢেঁকি পড়ে যায়।

বারো আনা মন ঈশ্বরেতে রেখে চার আনা লয়ে কাজকর্ম কর।।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ৪।১৯।১

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিনী সারদা দেবীর দুটি চিত্র

"বাবা, আবার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গেছে তুমি যদি সঙ্গে করে আমাকে পৌঁছিয়ে দাও · · "

"মেয়েদের চারিজন তাঁহার আগে, চারিজন তাঁহার পিছনে হইয়া তাঁহাকে লইয়া হালদারপুকুরের ঘাটে চলিল। মা স্নান করিলেন, তাহারাও করিল। পরে আবার সেই ভাবে বাড়ি পর্যন্ত আসিল।"

—শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৪১

বাৎসল্যভাবসিদ্ধা শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত 'গোপালের মা'

"অবাক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধা যেমন সাহস করিয়া স্বীয় বামহস্তে ঠাকুরের বামহস্তটি ধরিলেন অমনি সে মূর্তি অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল, আর তৎস্থলে দর্শন দিল দশ মাসের শিশু সত্যকার গোপাল। * * * বলিল, 'মা, ননী দাও।' ব্রাহ্মণী তো দেখিয়া শুনিয়া স্তম্ভিত। * * * চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, 'বাবা, আমি দুঃখিনী কাঙ্গালিনী, আমি তোমায় কি খাওয়াব, ননী ক্ষীর কোথা পাব বাবা?' সে অদ্ভুত গোপালের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই—সে খাইবেই।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, (২য় ভাগ—'গোপালের মা')

গোপালকে বুকে লইয়া গোপালের মা

"তারপর জপ সেদিন আর কে করে? গোপাল এসে কোলে বসে, মালা কেড়ে নেয়, কাঁধে চড়ে, ঘরময় ঘু'রে বেড়ায়! যেমন সকাল হলো অমনি পাগলিনীর মত ছুটে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পড়লুম। গোপালও কোলে উঠে চলল—কাঁধে মাথা রেখে।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'লীলাপ্রসঙ্গ, (গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

ব্যথাহারী গোপাল ও গোপালের মা

৪ গোপালের মা।

"বাবা গোপাল, তোমার দুঃখিনী মা এ জন্মে বড় কষ্টে কাল কাটিয়েছে, টেকো ঘুরিয়ে সুতো কেটে পৈতে করে বেচে দিন কাটিয়েছে, তাই বুঝি এত যত্ন আজ করচো!"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, (গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

গোপালের মা ও সুখদুঃখের সাথী গোপাল

"সকাল সকাল রন্ধন করিয়া সাক্ষাৎ গোপালকে খাওয়াইবার জন্য বাগান হইতে শুষ্ক কাঠ কুড়াইতে গেলেন। দেখেন, গোপালও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া কাঠ কুড়াইতেছে ও রান্নাঘরে আনিয়া জমা করিয়া রাখিতেছে। * * * ব্রাহ্মণী এই অপূর্ব ভাবতরঙ্গে পড়িয়া অবধি বুঝিয়াছিলেন যে, উহা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই খেলা এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবই তাঁহার 'নবীন-নীরদশ্যাম, নীলেন্দীবরলোচন গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণ!'"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, (গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে

ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ

স্বামী সাধনানন্দের নিমন্ত্রণে এ বছর কাশীপুর উদ্যানবাটী ১লা জানুয়ারী (১৯৫৬) কল্পতরু উৎসবে যোগদান করার সৌভাগ্য হয়। পরমহংসদেবের জন্ম ১৮৩৬ সালে; ১৯৩৬এ গঙ্গা-বিধৌত বেলুড়ে তাঁর শতবার্ষিকীর প্রথম অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলাম; তাঁর এ বছর ১২০ বর্ষপূর্তি।

কাশীপুরের সঙ্গে তাঁর শেষ জন্মোৎসব ও তিরোধানের শেষস্মৃতি জড়িত। ৺নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয়ের কাছে সে কাহিনী কিছু শুনেছি। তিনি কাশীপুর শ্মশানঘাট পর্যন্ত অনুসরণ করেছিলেন, সে কথা তিনি লিপিবদ্ধও করে গেছেন। কিন্তু ১৮৮৫র গোড়া থেকে ১৬ই আগস্ট নির্বাণক্ষণ পর্যন্ত কত নরনারী তাঁর শেষ দর্শন করতে এসেছিল ভাল করে আমরা জানি না। নরেন্দ্র অগ্রণী হয়ে ১১জন ভক্ত শিষ্য যাঁরা পরমহংসদেবের সেবা করে ধন্য হয়েছিলেন তাঁদের ফটোও পাওয়া যায়। আর শুধু ইসারায় মেলে সারদাদেবীর সাবিত্রীর মতই যমের সঙ্গে নীরব সংগ্রামের করুণ কাহিনী। সেদিন কাশীপুরে বারবার এসব কথাই মনে এসেছিল, তাই অভিভাষণ ও অতিভাষণ ভুলে শুধু চুপ করে থাকতে ইচ্ছা হয়েছিল। অথচ প্রায় ৮।১০ হাজার নরনারী জমা হয়েছে সেই বিরাট কল্পতরু উৎসবে। তাই তাদের বলতে হল শুধু মন দিয়ে অনুভব করতে যে, এই কাশীপুর বাগানে ৭০ বছর আগে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘাসের উপর পায়চারী করেছেন, শিষ্যদের সন্ন্যাস-বস্ত্র দিয়েছেন আরও কত দুঃখী আতুরদের শেষ সান্ত্বনাবাণী শুনিয়েছেন। "কথামৃতে" তার স্পষ্ট কিছু বিবরণ নেই, এমনকি সারদানন্দজী তাঁর "লীলাপ্রসঙ্গতে"ও যেন ইচ্ছাপূর্বক তাঁদের এই বিষম বিচ্ছেদের অধ্যায় অলিখিত রেখে গেছেন।

ঘটনাক্রমে এবার আগস্টমাসের মাঝামাঝি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণে কাশীতে যাই। ৭ই আগস্ট রবীন্দ্রনাথের নির্বাণ আর ১৬ই আগষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোধান। সেই দিনটি কাটাই কাশীর সুপ্রসিদ্ধ আর্তসেবায়তনে (R. K. Misson Home of Service)। সেখানে স্বামী ভাস্বরানন্দ আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। এখানকার কর্মীদের একনিষ্ঠ সেবা দেখে মুগ্ধ হয়েছি; তাঁরা প্রেরণা পান স্বামী বিবেকানন্দের কাছে। তিনি ৩৯ বৎসর বয়সেই স্বর্গারোহণ করেন আর ১৯০২ সালে তাঁর শেষ তীর্থযাত্রা এই কাশী। এখানে রামকৃষ্ণ মিশন যে আরোগ্যশালা গড়ে তুলেছেন সেটি সারা ভারতের গৌরব-স্থান। এইটিকে কেন্দ্র করেই নিখিল ভারতীয় "সেবা-মন্দির" গড়ে তোলা উচিত। "জীব-শিব" তত্ত্ব শুধু আলোচনার নয় জীবনে প্রয়োগ করার অপেক্ষা রাখে, একথা পরমহংসদেব বহু স্থানে ইঙ্গিত করে গেছেন, সে ইঙ্গিত পরে বিবেকানন্দের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। ১৮৯৩-৯৭ এই চার বৎসর পাশ্চাত্ত্য দেশে বেদান্ত প্রচার করে স্বামীজী দেশে ফিরেছেন আর ভারতে তখন প্রথম প্লেগ-মহামারী (plague) দেখা দিয়েছে তার ভয়ঙ্কর রূপে। জপতপ ফেলে স্বামীজী ঝাঁপিয়ে পড়েন প্লেগরোগীর সেবায়, তাঁর উপযুক্ত শিষ্যা নিবেদিতার কোলেও আশ্রয় নেয় প্লেগগ্রস্ত শিশু। মাত্র ৬০ বছর আগেকার এই উদার সেবাযজ্ঞের কাহিনীও আমরা ভুলতে বসেছি। কাশীতে এবার সেকথা বারবার মনে এসেছিল; খ্রীষ্টান মিশন ছাড়া এদেশের কেউ কেউ যে জীবন বিপন্ন করে রোগীর সেবা করে গেছেন তার তথ্যপূর্ণ বিবরণী কেন এখনও লেখা হল না?

মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল (১৭৫২—১৮২১)

রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ও "প্রিন্স্" দ্বারকানাথ ঠাকুরের যুগ থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্র দত্ত ও মহেন্দ্র সরকার পর্যন্ত দুঃস্থদের সেবার উদার ইতিহাস রচনা করে গেছেন। রামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) সমাজসেবার একজন অগ্রণী ছিলেন; প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে ১৮৫৭ সালে অর্থোপার্জনের আশা বর্জন করে কেশব সমাজ-সেবাব্রত গ্রহণ করেন এবং কত বিচিত্র সেবার কাহিনী তাঁর জীবনী অবলম্বনে পড়েছি।

আধুনিক কেশব সেন সড়কের (street) খুব কাছেই কামারপুকুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায় ঝামাপুকুরের দিগম্বর মিত্র ও গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়দের বাড়ীতে প্রথম গ্রাম থেকে এসে থাকেন (১৮৫২-৫৩); তাঁর বড় দাদা রামকুমার কিছু আগে গ্রাম থেকে এসে এখানেই টোল খুলেছিলেন। সেই স্মৃতিরক্ষার্থে আবার সেখানে ভক্তিশাস্ত্র পাঠের একটি টোল খোলা উচিত। এখানে থেকেই ১৮৫৫ সালে দুই ভাইয়ের প্রথম দক্ষিণেশ্বর যাত্রা, সেখানে রাণী রাসমণি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মন্দিরে কিছুকাল পূজারীর কাজ করে রামকুমার দেহত্যাগ করেন। এবং রামকৃষ্ণ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে ১৮৮৫ পর্যন্ত প্রধানতঃ দক্ষিণেশ্বরেই ছিলেন। এই দীর্ঘ ৩০ বছরের ইতিহাস—শেষ দশ বছর (১৮৭৫-৮৫) ছাড়া—এখনও অস্পষ্ট। কলিকাতার মত শহরে সেকালের সব কথা কাগজে ছাপা না হলেও "জনশ্রুতি" যেটুকু মেলে এখনি বিধিবদ্ধভাবে সংগ্রহ করা উচিত। ১৮৫২-৫৫ ঝামাপুকুরে এবং ১৮৫৫ থেকে ১৮৭৫ পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে এই আদি-পর্বের কথা কিছুই কি মিলবে না? কারো কী এদিকে দৃষ্টি পড়েছে? উদ্বোধনের মারফতে এ প্রশ্ন তুলতে চাই।

১৮৫৫ দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির মন্দির-প্রতিষ্ঠা থেকে ১৮৬১ সাল রাসমণির দেহত্যাগ-কাল পর্যন্ত যে সব ঘটনা আলোচিত হয়েছে সেগুলি সমসাময়িক পত্রিকাদির সাহায্যে যাচাই করাও দরকার। কারণ নাটক-সিনেমা চিত্তাকর্ষক হলেও নির্ভরযোগ্য নয়। ১৮৬১ থেকে ১৮৭২ এই দশ বছরের অনেক কথা স্পষ্টতর হলেও প্রধান ঘটনা অষ্টাদশ-বর্ষীয়া সারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন। কাহিনী ও মানব-সমাগম এখান থেকে ঘনীভূত হয়েছে কিন্তু মানুষদের ও ঘটনাবলীর বিন্যাসে অনেক অস্পষ্টতা আছে, সেগুলি পরিষ্কার করা বিশেষ প্রয়োজন।

১৮৭৫ সালে কেশবচন্দ্র সবান্ধবে যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে আবিষ্কার করেন তখন থেকে শেষ দশ বৎসর বহু তথ্য পাওয়া গেছে। কিন্তু কেশব অকালে দেহত্যাগ করেন ১৮৮৪তে আর রামকৃষ্ণদেব তার দুই বৎসর পরে (১৮৮৬)। ভক্ত রাম দত্ত, শ্রীম এবং বলরাম বোস প্রভৃতির জীবনী প্রকাশিত হলে হয়তো কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যাবে; কিন্তু সেই সংগ্রহাদির কাজে বেশী কর্মী তো দেখি না। কলিকাতার অনেক প্রাচীন ইমারত ও রাস্তা পর্যন্ত বিলুপ্ত হতে বসেছে! তাই অনুরোধ জানাই "শ্রীরামকৃষ্ণের কলিকাতা" নামে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হোক্ আর তার সঙ্গে অধুনা দুষ্প্রাপ্য ছবি ফটো ইত্যাদিও ছাপা হোক্।

পরমহংসদেব সাধারণ নরনারীর গুরু, বন্ধু ও সাথী ছিলেন একথা কল্পতরু উৎসবে জনতাকে স্মরণ করিয়ে অনুরোধ জানাই যে কাশীপুর উদ্যান-সংলগ্ন জমিতে রামকৃষ্ণ গণ-বিশ্ববিদ্যালয় শীঘ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করা হোক। তিনি যেমন তাঁর অমৃতভাষণে মানুষকে সুখে দুঃখে প্রেরণা দিয়েছিলেন তাঁর কথামৃতের সেই ধারা অনুসরণে একটি জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের কলিকাতায় স্থায়ী স্মৃতিমন্দিররূপে গড়ে উঠুক। তাঁর প্রিয়তম শিষ্য বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী আগতপ্রায় (১৮৬৩-১৯৬৩)। তার পূর্বেই কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতিমন্দির গঠিত হওয়া উচিত।

আদ্যাশক্তি

(৫২০ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্বের সৃষ্টির জন্যে তোমাতে রাজসী শক্তি, পালনের জন্যে আমাতে সাত্ত্বিকী এবং সংহারের জন্যে রুদ্রে তামসী শক্তি বর্তমান। এই শক্তি তিনিই দিয়েছেন। শক্তিবিহীন হলে তুমি, আমি বা রুদ্র কেহই স্বকার্য-সাধনে সমর্থ হই না। প্রলয়-কালে আমি সেই শক্তির অধীন হয়েই অনন্ত শয্যায় শয়ন করি এবং সৃষ্টিকালে কালধর্মবশে আবার সেই শক্তির অধীন হয়েই উত্থিত হই। আমি সর্বদাই শক্তির অধীন। আমি সেই আদ্যাশক্তির ইচ্ছাতেই যুগে যুগে মৎস্য কূর্ম-বরাহ-নৃসিংহ বামন-রাম-কৃষ্ণ ইত্যাদি রূপে অবতীর্ণ হই। মূল কথা চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম আর চিদ্রূপা পরাশক্তি দুই পদার্থ নয়। যেমন দাহিকাশক্তি আর প্রকাশশক্তি অগ্নি বা সূর্যেরই নামান্তর মাত্র। আলো ছাড়া সূর্যকে চিন্তা করাই যায় না, উত্তাপ ছাড়া অগ্নিকে ভাবাও অসম্ভব। সেইরূপ ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন।"

সৃষ্ট হল জীবজগৎ। দেব মনুষ্য তির্যক্ অসুর। চুরাশি লক্ষ জীব। নদনদী-পাহাড়পর্বত-সমুদ্র-বৃক্ষলতা-সমন্বিত সুন্দর ধরিত্রী। কত গ্রহ নক্ষত্র —কে ঠিকানা রাখে? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। আর আদ্যাশক্তি হয়ে রইলেন সকলের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে। অণু পরমাণু থেকে অতি বৃহতের মধ্যেও। তাঁরই ছায়া—তাঁরই অংশ সব নারীমূর্তি। ঘরে ঘরে তিনিই গর্ভধারিণী স্নেহময়ীরূপে সন্তানকে সুখে-দুঃখে ব্যথা-বেদনায় বাৎসল্যরসের অজস্র ধারায় সিঞ্চিত করছেন। সমস্ত বিদ্যার আধার হয়ে ছড়িয়ে রয়েছেন তিনিই। যে একান্তভাবে তাঁর দর্শনপ্রয়াসী সেই তাঁর কৃপা পায়, তার মায়ামোহ দূর করে গুণাতীতা দেবী গুণময়ী হয়ে দর্শন দেন, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।' যুগে যুগে তিনি অসুর সংহার করেছেন—মানুষের অন্তরে কাম-ক্রোধ-লোভরূপী যে সব অসুর রয়েছে তাদেরও তিনি নাশ করেন। দুঃখীর দুঃখ, আর্তের আর্তি, সন্তপ্তের সন্তাপ তাঁর কৃপাকটাক্ষে দূরীভূত হয়। সাধকদের অন্তরে জননী রয়েছেন চিন্ময়ীরূপে। মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, মহাকালী, দশমহাবিদ্যা, নবদুর্গা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ রূপ তিনি উপাসকের কাছে প্রকাশ করে থাকেন মৃন্ময়ী, প্রস্তরময়ী, দারুময়ী মূর্তিতেও চিন্ময়ীভাবে পূজিতা হয়ে। ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমে ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজিতা হয়েও কখনও কখনও মানুষের বিদ্যা বুদ্ধি তেজ শক্তি বীর্যের মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

নদী কলতানে বয়ে যাচ্ছে—মনে হয় যেন তাঁরই বন্দনারত। ফুল ফুটছে যেন নিজেকে তাঁর চরণে নিবেদন করবে ব'লে। সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষও জগজ্জননীর উপাসনা করছে—দিকে দিকে তাই উল্লাস, আনন্দমুখরতা—সার্বজনীন পূজার আড়ম্বর। কিন্তু বহির্মুখীনতা ও বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যে তাঁর কৃপার উপলব্ধি হয় কি? তাই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ দুঃখের অবসানের জন্যে চাই প্রাণের ঐকান্তিকতা, ভক্তি ও শরণাগতি।

"সেই জগদম্বার এক কণা—এক বিন্দু হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর এক কণা বুদ্ধ, আর এক কণা খ্রীষ্ট। * * * যদি পরমজ্ঞান ও আনন্দ চাও, তবে সেই জগজ্জননীর উপাসনা কর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

মাতৃ-আহ্বান

শ্রীহৃদয়রঞ্জন প্রামাণিক, কাব্যতীর্থ

একি মাগো মায়া মধুকৈটভ হয়নিতো আজও হত
লোভরূপে থাকি চিত্ত-বিধিরে বধিতে সে উদ্যত।
মহিষাসুরও মা অন্তরে রাজে ঘটায় যে অঘটন
ক্রোধ-মূর্তিতে হৃদি-অমরায় পেতেছে সিংহাসন।
শুম্ভ-নিশুম্ভ তারাও মরেনি কামবেশে প্রাণে স্থিতি
সংযম কোথা, জরাব্যাধি তাই গ্রাসিছে মোদের নিতি।
মোহ-মদরূপে চণ্ড-মুণ্ড করে যে আস্ফালন
ত্যজিয়া স্বার্থ দেশকল্যাণে কেমনে দেব মা মন ?

রক্তবীজেরও যায়নিকো বীজ হিংসারূপেতে ফিরে
দাবানল তাই জ্বলিছে নিত্য সুখের শান্তি নীড়ে।
ষড়রিপু এই অসুর নিবহে মোরা যে উৎপীড়িত
অশুভ বুদ্ধি আসি হিয়া মাঝে সদা করে প্রলোভিত।
যুগে যুগে নাশ দেবসঙ্কট চণ্ডী পুরাণে জানি
'তথেতি' বলিয়া চেয়েছ দূরিতে মর্ত্যের ব্যথা গ্লানি।
সংস্মৃতা সংস্মৃতা হয়ে তবে বুদ্ধিরে কর পূত
ধৈর্য সাহস প্রেম জাগাইতে হও মা আবির্ভূত।

লীলাময়ী

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

নয়নে তোমার কখনো বহ্নি জ্বলে
সৃষ্টিরে তব কর মাগো ছারখার,
মরে সন্তান শাণিত কৃপাণ-তলে
দিকে দিকে শুনি আর্তের হাহাকার।

এখানে বন্যা কোথাও অগ্নিদাহ,
মানবে মানবে দানবের হানাহানি,
নগরের বুকে শ্মশানের গান গাহ
তাথৈ নৃত্যে নাচো তুমি রুদ্রাণী,

কখনো বা হেরি সুন্দরী ধরণীরে—
পরশে তোমার মধুর মূরতি তার,
মানুষ মিলেছে মিলনতীর্থ-তীরে
বহে চারিদিকে আনন্দ-পারাবার।

কভু করে বর—কভু বা খড়্গপাণি
কভু অশান্তি, শান্তিরূপিণি অয়ি !
ভাবি তাই মনে নহ তুমি রুদ্রাণী
নহ কল্যাণী—তুমি শুধু লীলাময়ী।

শ্রীপতির "বিশেষাদ্বৈতবাদ"

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

দশ-বেদান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত "বিশেষাদ্বৈত-বাদ"-প্রবর্তক শ্রীপতির জীবনী ও বংশপরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি তেলেগু-ভাষাভাষী, কৃষ্ণা-গোদাবরী অঞ্চলস্থ 'আরাধ্য ব্রাহ্মণ' ছিলেন। তিনি নিজেকে 'শ্রীপতি পাণ্ডিতাচার্য' বা 'শ্রীপতি-পণ্ডিত-ভগবৎপাদাচার্য' নামে অভিহিত করেছেন তাঁর 'ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের' প্রত্যেক পাদের শেষে। তা ছাড়া, তিনি নিজের

নামের সঙ্গে কয়েকটি বিশেষণও ব্যবহার করেছেন —যেমন, তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক পাদের শেষে নিজের নামের পূর্বে 'যতিব্রজ-পরিবৃঢ়' এই কথা দুটি এবং প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের শেষে 'নিরাভার-বীরশৈব' বলে নিজেকে বর্ণনা। এই থেকে তিনি যে একজন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ছিলেন, তা' বোঝা যায়। তাঁর বীরশৈব মতও সর্বত্র প্রকটিত। সামান্ত ও মিশ্রশৈবেরা শিব ও বিষ্ণু উভয়েরই উপাসক। কিন্তু শুদ্ধ ও বীর-শৈবেরা কেবলমাত্র শিবেরই উপাসক। বীরশৈবেরা শরীরে, মাথায় বা গলায়, লিঙ্গচিহ্ন ধারণ করেন, শুদ্ধ শৈবেরা নয়।

শ্রীপতির সময় সম্বন্ধেও নিশ্চয় কিছু জানা যায় না। তবে তিনি যে সব দার্শনিকদের মতবাদ স্বীয় ভাষ্যে খণ্ডন করেছেন, তাঁদের মধ্যে ভেদবাদী বৈদান্তিক মধ্ব অন্যতম। মধ্ব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। সেজন্ত শ্রীপতি যে, সেই সময়ের পরবর্তী, তা বলাই বাহুল্য।

শ্রীপতির প্রখ্যাততম গ্রন্থ তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্য। এই ভাষ্যের নাম 'শ্রীকরভাষ্য'। শ্রীপতি তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক পাদের শেষে এই নামের উল্লেখ করে বলেছেন—"ইতি শ্রীমদ্‌যতিব্রজ-পরিবৃঢ়-শ্রীপতি-পণ্ডিত-ভগবৎপাদাচার্য-ভেদ-ভেদাত্মক-বিশেষাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত-ব্যবস্থাপক-বৈয়াসিকব্রহ্ম-মীমাংসা-সূত্রার্থ-প্রকাশকে শ্রীকর-ভাষ্যে" ইত্যাদি। 'শ্রীকর' শব্দের অর্থ 'শিবকর' বা 'শিব'। গ্রন্থের প্রারম্ভেও শ্রীপতি স্বীয় ভাষ্যকে 'শিবংকর' বলেও উল্লেখ করে বল্‌ছেন—

"অগস্ত্যমুনিচন্দ্রেণ কৃতবৈয়াসিকাং শুভাম্।
সূত্রবৃত্তিং সমালোচ্য কৃতং ভাষ্যং শিবংকরম্॥" (১৬)

সেজন্ত, শিবের পরব্রহ্মত্ব প্রচারকারী এই ভাষ্যকে যে শ্রীপতি শিবের নামেই নামকরণ করেছিলেন, তা নিঃসন্দেহ। বীরশৈব-মতবাদের দুটি প্রধান স্তম্ভ 'অষ্টাবরণ' ও 'ষট্‌স্থলতত্ত্ব'। শ্রীপতি যে কেবল নিজেকে 'বীরশৈব' বলে বর্ণনা করেছেন, তা নয়—কিন্তু সেই সঙ্গে, বিশেষ করে ষট্‌স্থলবাদেরও বারংবার উল্লেখ করেছেন তাঁর ভাষ্যে, এবং ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ নিরূপণের সময়ে, এই তত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। সেজন্ত 'শ্রীকরভাষ্য' যে বীরশৈব-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক বেদান্তভাষ্য, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

শ্রীকররচিত অন্য কোনো গ্রন্থের বিষয় জানা যায় নি। তবে জনশ্রুতি অনুসারে, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকণ্ঠ দশোপনিষদ্-ভাষ্য, গীতা-ভাষ্য প্রভৃতিও রচনা করেছিলেন।

সাধারণতঃ, 'শ্রীকর-ভাষ্যের' ভাষা সহজ সরল, প্রাঞ্জল মধুর হলেও, স্থানে স্থানে তাঁর রচনা কাঠিন্য-দোষ দুষ্ট ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। গ্রন্থের প্রতি ছত্রে গ্রন্থকারের অগাধ পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ন্যায়ানুগ তর্কপ্রণালী ও বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর ভাষ্যে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইতিহাস প্রমুখ থেকে অসংখ্য বাক্য উদ্ধৃত করে-ছেন; এবং বহু মনীষীদের নাম করে' উল্লেখ করে' তাঁদের মতবাদ গ্রহণ অথবা খণ্ডন করেছেন। এর থেকে, তাঁর অপূর্ব বিদ্যাবত্তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

'শ্রীকর-ভাষ্যের' প্রারম্ভিক শ্লোকে শ্রীপতি এই ভাষ্যরচনার মূল উদ্দেশ্য বিবৃত করে বলেছেন—

"বেদাগম-তত্ত্বজ্ঞ-শৈবানাং মোক্ষকাংক্ষিণাম্।
বৈদিকানাং বিশুদ্ধানামেতদ্ ভাষ্যং হি কল্পকম্॥
শ্রুত্যৈকদেশপ্রামাণ্যং দ্বৈতাদ্বৈতমতাদিষু।
দ্বৈতাদ্বৈতমতে শুদ্ধে বিশেষাদ্বৈতসংজ্ঞিকে॥
বীরশৈবকসিদ্ধান্তে সর্বশ্রুতিসমন্বয়ঃ।" ইত্যাদি
(১৩—১৪)

অর্থাৎ বেদজ্ঞ, মোক্ষকামী, বিশুদ্ধ, বৈদিক শৈবদের জন্য এই ভাষ্য রচিত হয়েছে। দ্বৈতাদ্বৈত-মতই প্রামাণিক; পুনরায়, সমস্ত দ্বৈতাদ্বৈত-মতের মধ্যে

একমাত্র 'বিশেষাদ্বৈত'-মতই শুদ্ধ বা যুক্তিসঙ্গত। একমাত্র বীরশৈব-সিদ্ধান্তই সর্বশাস্ত্রসম্মত।

এই প্রারম্ভিক শ্লোকাবলীতে শ্রীপতি স্বীয় ভাষ্যকে 'ভবহরম্' 'দুর্বাদিগর্বাপহম্' 'সর্বানর্থ-বিনাশকম্' 'বুধস্তুতম্' 'তত্ত্বার্থবোধাকরম্' 'অশেষো-পনিষৎসারম্' 'বিশেষাদ্বৈতমণ্ডনম্' 'শিবজ্ঞানপ্রদম্' প্রমুখ নানারূপ বিশেষণে বিভূষিত করেছেন।

শ্রীপতির প্রগাঢ় ন্যায়-জ্ঞানের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, আরেকটি জিনিস থেকে। সেটি হল যে, 'শ্রীকরভাষ্যে' তিনি বীজাঙ্কুর-ন্যায়, অরুন্ধতী-ন্যায়, অন্ধ-পরম্পরা-ন্যায়, গো-বলীবর্দ-ন্যায় প্রমুখ ৬৯টি ন্যায়ের উল্লেখ করেছেন, যে ক্ষেত্রে স্বয়ং শঙ্করও করেছেন মাত্র ২৫টির।

শ্রীপতির মতে, পরম শিবই ব্রহ্ম। ব্রহ্মসূত্রের প্রখ্যাত চতুঃসূত্রীতে তিনি এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে, ১-১-১ সূত্রে 'শিবস্য পরব্রহ্মকথনম্' এই বলে আরম্ভ করে, তিনি নানাভাবে পূর্বপক্ষাদি খণ্ডন করে প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন যে, একমাত্র শিবই পরব্রহ্মপদবাচ্য হতে পারেন।

ব্রহ্ম বা শিব, সগুণ ও সবিশেষ, নির্গুণ বা নির্বিশেষ নন। এই প্রসঙ্গে, শ্রীপতি অদ্বৈতবেদান্ত-সম্মত নির্বিশেষবাদ ও নির্গুণবাদের বিস্তৃত সমালোচনা করে খণ্ডনের প্রচেষ্টা করেছেন। ব্রহ্ম অনন্ত কল্যাণগুণমণ্ডিত ও সমস্ত হেয়গুণবর্জিত। পরব্রহ্ম শিবের দুটি রূপ : ভীষণ ও মধুর, ঘোরা ও অঘোরা। প্রথম রূপে তিনি 'রুদ্র', দ্বিতীয় রূপে তিনি 'সোম'।

শ্রুতিতে অবশ্য কোনো কোনো স্থলে ব্রহ্মকে 'নির্গুণ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে ব্রহ্মের অমূর্তরূপের কথাই কেবল বলা হচ্ছে। বস্তুতঃ ব্রহ্মের দুই অবস্থা বা রূপ : অমূর্ত ও মূর্ত। সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম অমূর্তরূপেই স্থিতি করেন, এই অবস্থাতেই তাঁকে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্য ৬-২-১), 'কেবলো, নির্গুণো' (শ্বেতাশ্বতর ৬-১১) প্রভৃতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই অপরিণত, অনভিব্যক্ত অবস্থায় ব্রহ্ম সমগ্র জীবজগৎ, সমস্ত নানাত্ব, সমস্ত গুণ ও শক্তিকে সংহতরূপে স্বীয় সত্তায় ধারণ করে রাখেন ; পরে সৃষ্টিকালে সে সব বিকশিত করেন,—এই হল তাঁর মূর্তরূপ। সেজন্য 'নির্গুণ' শব্দের অর্থ 'গুণবিহীন' নয়। এর প্রকৃত অর্থ তিনটি : (১) প্রথমে কেবল ব্রহ্মই বর্তমান ছিলেন অমূর্তরূপে। সেজন্য সেই সময়ে তাঁর জগৎ কর্তৃত্বাদি গুণশক্তি প্রকটিত হয়নি। (২) ব্রহ্ম সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ প্রমুখ প্রাকৃতিক ত্রিগুণবিহীন—'গুণশব্দপ্রয়োগাভাবেন সত্ত্বাদিগুণত্রয়াভাবপরত্বাৎ' (১-১-১)। (৩) ব্রহ্ম সমস্ত হেয়গুণবর্জিত। সেজন্য, কোনো অবস্থাতেই ব্রহ্মের নির্গুণত্ব হয় না—'ব্রহ্মধর্মাণাম্ অনিষিদ্ধত্বাৎ'। প্রকৃতকল্পে, অমূর্ত, মূর্ত উভয়রূপেই ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ। 'মূর্ত' অবস্থায় ত এসম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। 'অমূর্ত' অবস্থায় হয়ত অনবধান ব্যক্তির নিকট ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সেই সময়েও তিনি সর্বগুণশক্তি বিমণ্ডিতরূপেই স্থিতি করেন। যেমন, চুম্বকের লৌহাকর্ষণশক্তি, অগ্নির দাহিকাশক্তি নিত্য, ঈশ্বরের গুণ ও শক্তিও ঠিক তাই।

যদি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, সর্বাধিষ্ঠান, সর্বব্যাপক পরমেশ্বর কিরূপে মূর্ত ও অমূর্তরূপে অবস্থান করতে পারেন—তার উত্তর এই যে প্রকৃতি যেমন মহৎ (অনভিব্যক্ত) ও জগৎ (অভিব্যক্ত) উভয়রূপেই বর্তমান, ঠিক তেমনি সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম ও বায়ুপ্রমুখ মূর্ত ও দৃশ্যরূপে, পুনরায় সর্বব্যাপী অমূর্ত ও অদৃশ্যরূপেও স্থিতি করতে পারেন।

ব্রহ্মই জগতের একমাত্র নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ১-১-২ সূত্রে শ্রীপতি সমস্ত পূর্বপক্ষ খণ্ডন করে প্রমাণিত করছেন যে, জগতের জন্মাদি একমাত্র পরব্রহ্মেরই কার্য, অন্য কারো নয়। এস্থলে

শ্রীপতি একটি নূতন উপমাও দিয়েছেন: 'কুসূলধান্যবৎ' (১-১-২)। অর্থাৎ একটি ধানের গোলায় যেমন অসংখ্য ধান প্রথম থেকেই সঞ্চিত থাকে, পরে তা' কেবল সময়ে সময়ে উপ্টিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়, তেমনি ব্রহ্মে শাশ্বতকাল অসংখ্য জীব লীন হয়ে থাকে, সৃষ্টিকালে কারণরূপে ব্রহ্ম তা' প্রকাশিত করেন। 'জন্মাদি' শব্দের অর্থ, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, তিরোধান (বন্ধ) ও অনুগ্রহ (মুক্তি)।

সিদ্ধান্তস্ত সর্বাধিষ্ঠান—সচ্চিদানন্দ-ষট্স্থল-পরশিব-ব্রহ্মণ এব জগজ্জন্মাদিকারণত্বং যুক্তম্।' (১-১-২) এরূপে ব্রহ্মের কৃত্যপঞ্চক, বা পাঁচটি কাজ জগতের সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস, এবং কর্মানুসারে জীবের বন্ধ ও মুক্তিসাধন। সেজন্য, ব্রহ্ম সক্রিয়, অদ্বৈতবেদান্তমতানুযায়ী নিষ্ক্রিয় নন।

প্রলয়কালে সৃষ্টির পূর্বে জীবজগৎ ব্রহ্মেরই চিৎ ও অচিৎ শক্তিরূপে ব্রহ্মেই বিলীন হয়ে থাকে, সৃষ্টিকালে স্থূল জগৎপ্রপঞ্চও জীবরূপে পরিণত হয়। সেজন্য জীবজগৎও ব্রহ্মেরই ন্যায় নিত্য, এবং সৃষ্টির অর্থ, ঈশ্বরের অনভিব্যক্ত স্বরূপের অভিব্যক্তিই মাত্র। তন্তু ঊর্ণনাভের পরিণতি হলেও যেমন যে স্বয়ং অপরিণতই থাকে, তেমনি জীবজগৎ ব্রহ্মের পরিণাম হলেও, স্বয়ং ব্রহ্ম অপরিণতই ও অপরিবর্তিতই থাকেন।

এই ভাবে, শ্রীপতি অন্যান্য একেশ্বরবাদী বৈদান্তিকদের প্রণালী অনুসারেই ঈশ্বরের স্বরূপ ও গুণাবলী বিবৃত করেছেন। ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সর্বব্যাপী, স্বতন্ত্র জগল্লীন হয়েও জগদ্বহির্ভূত, সর্বান্তর্যামী, সর্বাত্মক, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, পরম করুণাময়, ইত্যাদি।

১-১-২ সূত্রের অন্তে তিনি বলছেন: 'সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্মাণাং শিবস্যৈব সম্ভবাৎ।'

এস্থলে কেবল সাম্প্রদায়িক বা বীরশৈব মতানুসারে, তিনি ব্রহ্ম বা শিবকে 'ষট্স্থল' এই বিশেষণে বারংবার বিভূষিত করেছেন। যেমন, আমরা দেখেছি যে, ১-১-২ সূত্র ভাষ্যে তিনি 'ষট্স্থলপরমশিবকে' জন্মাদিকর্তা বলে অভিহিত করেছেন। অন্যান্য স্থলেও তিনি 'ষট্স্থল শিবের' উল্লেখ করেছেন।

ষট্স্থলবাদ যে বীরশৈব-সম্প্রদায়ের একটি প্রধান তত্ত্ব, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। বীরশৈব মতে, ব্রহ্ম বা পরমশিবের অপর নাম 'স্থল'। কারণ, শিব 'স্থ' বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও স্থিতির কারণ; এবং 'ল' বা তার লয়েরও কারণ। শিবই জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল বা মোক্ষস্থল, সেজন্যও তাঁর নাম 'স্থল'। অন্তর্নিহিত শক্তি বলে, এই 'স্থল' লিঙ্গস্থল বা উপাস্য শিব, এবং অঙ্গস্থল বা উপাসক জীবে বিভক্ত হয়। পুনরায়, লিঙ্গস্থল তিন ভাগে বিভক্ত হয়—ভাবলিঙ্গ, প্রাণলিঙ্গ ও ইষ্টলিঙ্গ। প্রথমটি শিবের নিষ্কল, নিরংশ, দেশকালাতীত, চক্ষু ও মনের দ্বারা অপ্রাপ্য সৎরূপ; দ্বিতীয়টি তাঁর সাংশ, সূক্ষ্ম, মনের দ্বারা প্রাপ্য চিৎরূপ; তৃতীয়টি তাঁর সাংশ, স্থূল, চক্ষুর দ্বারা দৃশ্য, আনন্দরূপ। প্রথমটি তাঁর মহত্তম কেবল রূপ, দ্বিতীয়টি সূক্ষ্মরূপ, তৃতীয়টি স্থূলরূপ। প্রয়োগ, মন্ত্র ও কর্মসমন্বিত এই তিনটি বিভাগের নামই কলা (চিৎ-কলা), নাদ, বিন্দু। প্রত্যেকটির দুটি বিভাগ, যথাক্রমে: মহালিঙ্গ ও প্রসাদলিঙ্গ; চারলিঙ্গ ও শিবলিঙ্গ; গুরুলিঙ্গ ও আচারলিঙ্গ।, ছয়টি শক্তি সমন্বিত, এই ছয়টি লিঙ্গ হল 'ষট্স্থল' বা শিবের ছয়টি রূপ—

(১) মহালিঙ্গ—এটি শিবের চিৎশক্তি-সমন্বিত, নিত্য, জন্মমরণরহিত, পূর্ণতম, মহত্তম, এক ও অদ্বিতীয় রূপ, বা চৈতন্যরূপ। শ্রদ্ধা ও ভক্তি বা ঈশ্বরপ্রেম দ্বারাই এই রূপ লাভ হয়।

(২) প্রসাদলিঙ্গ—এটি শিবের পরাশক্তি-সমন্বিত, সদাখ্যরূপ। এটি বুদ্ধিগম্য।

(৩) চারলিঙ্গ—এটি শিবের আদিশক্তি-সমন্বিত, মনোগম্য, পুরুষরূপ।

(৪) শিবলিঙ্গ—এটি শিবের ইচ্ছাশক্তি-সমন্বিত, অহংকাররূপ।

(৫) গুরুলিঙ্গ—এটি শিবের জ্ঞানশক্তি-সমন্বিত রূপ।

(৬) আচার লিঙ্গ—এটি শিবের ক্রিয়াশক্তি-সমন্বিত রূপ।

প্রথম রূপে, শিব বা ব্রহ্ম জগৎপ্রপঞ্চ-বহির্ভূত, শুদ্ধচিৎ। দ্বিতীয় রূপে, তিনি জগৎস্রষ্টা। তৃতীয় রূপে তিনি জড়প্রধান ভিন্ন পুরুষ। চতুর্থ রূপে তিনি অপার্থিব দেহধারী। পঞ্চম রূপে তিনি জীবের জ্ঞানগুরু। ষষ্ঠরূপে তিনি জীবের মুক্তিদাতা।

সাধারণভাবে এই 'ষট্স্থলবাদ' গ্রহণ করে, শ্রীপতি তাঁর ভাষ্যে সাধনতত্ত্বের দিক্ থেকেও, 'ষট্স্থল' তত্ত্ব প্রপঞ্চিত করে, শ্রবণ, মনন, জ্ঞান, নিধি, ধ্যান এবং আসন—এই ষষ্ঠ সাধনানুসারে, আত্মলিঙ্গ, ভাবলিঙ্গ, জ্যোতির্লিঙ্গ, প্রাণলিঙ্গ, উপাসনালিঙ্গ ও ধ্যানলিঙ্গের কথা যথাক্রমে বলেছেন।

পূর্ণিমা-শর্বরী

শ্রীরবি গুপ্ত

আজি পূর্ণিমা-শর্বরী সিন্ধু মাঝে
কোন বাঞ্ছিত স্বপ্নের স্বর্ণে সাজে।
চির সম্মিলনে
আলো বিচ্ছুরণে
কার ঊর্মিল-ছন্দ আনন্দে বাজে,
আজি পূর্ণিমা-শর্বরী সিন্ধু মাঝে।

মোর ঈপ্সিত অমরার মর্মলোভা,—
জাগে জ্যোৎস্না-বিনন্দিত শঙ্খ-শোভা।
ছায়া-তন্দ্রাতলে
কায়া-চন্দ্র জলে,
নামে নির্মল নির্ঝর দীপ্ত-প্রভা,
মোর ঈপ্সিত অমরার মর্ম-লোভা।

মোর নিঃসীম নিস্তল রাত্রি কালো,
হয় কোন সে মায়ার কার মন্ত্রে আলো।
কে গো স্বর্গময়ী
এলে স্বপ্নময়ী
ঢালো অমৃত-উল্লাস বহ্নি ঢালো,
জ্বলে নিঃসীম নিস্তল রাত্রি কালো।

আলো অম্বুধি-উল্লাস প্রান্তহারা,
সাথে মরত্তের অমলীন জীবন-ধারা।
তার মন্ত্র-ভাষা
আনে স্বপ্ন-আশা,
ভাঙে তরঙ্গ-সংঘাতে কালের কারা,
আলো অম্বুধি-উল্লাস প্রান্তহারা।

করে প্রোল্লাস-বৈভবে পূর্ণ হিয়া,
লভে এ-ধূলির বন্ধন স্বর্গ-প্রিয়া
তারি রত্ন-রাগে
চির লগ্ন জাগে,
ওঠে শশাঙ্ক-সুধা-লোক উচ্ছলিয়া,
করে প্রোল্লাস-বৈভবে পূর্ণ হিয়া।

আজি পূর্ণিমা-শর্বরী চন্দ্রালোকে,—
চলে অনন্ত-অম্বুধি রঙ্গি' ও কে!
নাচে সিন্ধু নাচে
মোর বিন্দু মাঝে,
জাগে চির-স্বপনী কে স্বপ্ন চোখে,
আজি পূর্ণিমা-শর্বরী চন্দ্রালোকে।

হিমালয়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ

স্বামী নিরাময়ানন্দ

১৮৮৬ খ্রীঃ ১৬ই আগষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ মানবলীলা সম্বরণ করিলে নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে শ্রীরামকৃষ্ণের যে কয়েকজন যুবক ভক্ত সংসার ত্যাগের সংকল্প লইয়া বরাহনগরমঠে সমবেত হন গঙ্গাধর তাঁহাদের অন্যতম। ১৮৯০ খ্রীঃ জুন মাসে হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্তনের পর যথাবিহিত সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাঁহার নাম হয় স্বামী অখণ্ডানন্দ। এই প্রবন্ধে আমরা তাঁহার গঙ্গাধর নাম ব্যবহার করিব।

১৮৮৬ খ্রীঃ ডিসেম্বরে খ্রীষ্টমাসের রাত্রে হুগলি জেলার আঁটপুর গ্রামে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে নরেন্দ্রনেতৃত্বে অন্যান্য গুরুভ্রাতৃগণের সহিত গঙ্গাধরও সংসারের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিবার সংকল্প গ্রহণ করিলেন এবং ইহারই দেড় মাস মধ্যে (১৮৮৭ ফেব্রুআরি) কাহাকেও কিছু না বলিয়া, বরানগর মঠ হইতে পরিব্রাজকের বেশে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ, বারাণসী, অযোধ্যা নৈমিষারণ্য হইয়া বৈশাখের প্রথমেই তিনি হিমালয়ের প্রবেশদ্বার হরিদ্বারে উপনীত হইলেন।

পথিমধ্যে গয়ায় ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের নীচে তিনি বিখ্যাত যোগী গম্ভীরনাথকে দর্শন করেন। যোগী তাঁহাকে যোগ সাধনার উত্তম আধারজ্ঞানে নিজ গুহার নিকট একটি গুহায় থাকিয়া যোগসাধন করিতে পরামর্শ দেন। তদুত্তরে গঙ্গাধর বলেন, "আমার গুরুদেব বলতেন—হিমালয় বা সমুদ্র না দেখলে অনন্তের ধারণা হয় না, তাই হিমালয় দর্শনের জন্য আমার মন ব্যাকুল।"

কাশীতে প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের সাহচর্যে গঙ্গাধর অতি অল্পকাল মধ্যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ আয়ত্ত করেন এবং তাঁহার সহিত ভাস্করানন্দ স্বামীকে দেখিতে গেলে, তিনি এই বাল সন্ন্যাসীকে বেদ পড়াইতে চাহেন; কিন্তু গঙ্গাধর বলেন,—"যে দৃষ্টিশক্তি দ্বারা পুস্তক পড়ে জ্ঞানলাভ করব আপনি আমার সেই চাক্ষুষীবৃত্তি অন্তর্মুখীন করে দিন, যাতে আত্মারামের দর্শন লাভ করতে পারি।" বারাণসীতে ত্রৈলিঙ্গ স্বামী এবং বিশুদ্ধানন্দ স্বামীকেও দর্শন করিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অযোধ্যায় জানকীবর শরণ নামক এক উচ্চাঙ্গের সাধক দর্শন করিয়া তিনি হরিদ্বার পৌছেন।

এখানেও তিনি চণ্ডী পাহাড়ে বিখ্যাত সিদ্ধ-মহাপুরুষ কামরাজকে দেখিতে যান। এই মাতৃগত প্রাণ বালকস্বভাব সাধু কিশোর পরিব্রাজককে দেখিয়া আকৃষ্ট হন ও জিজ্ঞাসা করেন, "জীবনে কি চাও?"

গঙ্গাধর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "গীতার সেই অনুভূত—ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি।"

দেবীভক্ত কামরাজ কাতরভাবে বলেন, "তবে তুমি আমার অম্বাকে চাও না? আত্মজ্ঞান চাও?" জগজ্জননীর প্রতি তাঁহার এই মধুর মমত্ববোধ গঙ্গাধরের মর্মকেন্দ্র স্পর্শ করে; পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার মুখে এই বিবরণ শুনিয়া সানন্দে বলেন, "কী সুন্দর কথা, আমার অম্বাকে চাও না?"

হৃষীকেশে 'বিরক্ত'দের ঝাড়ীতে কিছুদিন থাকিয়া গঙ্গাধর উত্তরাখণ্ডের তপঃপ্রভাব অনুভব করিতে থাকেন, এই সময় তিনি গভীর ধ্যানধারণায় মগ্ন থাকিতেন। ছত্রের ঘণ্টা অনুযায়ী তাঁহার ভিক্ষায় যাওয়া হইয়া উঠিত না। পবিত্র মাধুকরী দ্বারাই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। হৃষীকেশেই তিনি সাধু হীরাদাস, মায়ারাম অবধূত ও তাঁহার শিষ্য ব্রহ্মচারী স্বরূপজ্যোতিকেও দর্শন করেন। বিখ্যাত মায়ারাম অবধূত চারবার চারি ধাম ঘুরিয়াছেন,

গঙ্গাধর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কোন্ পথ দিয়ে হিমালয় যাব?" তিনি সামনের হাঁটাপথ দেখাইয়া দিতে গঙ্গাধর বলেন, "আমি ত ভেবেছিলাম শৃঙ্গ থেকে শৃঙ্গে লাফিয়ে যাব।" মায়ারাম তাঁর সঙ্গের সাধুদের ডেকে বলেন, "আরে দেখো দেখো—বাঙ্গালী ক্যা বোল্‌তা। গুরু মেহেরবান ত চেলা পহলবান্।"

হৃষীকেশ হইতে সে বৎসর এক পাঞ্জাবী সাধু বহু অর্থ ও সেবক লইয়া বদরীনাথ যাইতেছিলেন; তিনি গঙ্গাধরকেও সাথী করিয়া লইতে চান, কিন্তু গঙ্গাধর তাঁহার নিঃসঙ্গ ভ্রমণ-বাসনা ব্যক্ত করিয়া পদব্রজে দেরাদুন যাত্রা করেন। মুসৌরীর পথে রাজপুরে নিঃসম্বল ভ্রমণের ব্রত গ্রহণ করিয়া আরও সংকল্প করিলেন অযাচিত পথের সাথী ভিন্ন একাকীই পথ চলিবেন।

লণ্ডৌরের শিবালয়ে একটি সাধু তাঁহার উত্তরাখণ্ড যাত্রার কথা শুনিয়া মুসৌরির এক শেঠের নিকট হইতে কম্বল ও টাকা সংগ্রহের পরামর্শ দিলেন; গঙ্গাধর তাঁহার দৃঢ় সংকল্পের কথা বলায় তিনি আবার বলেন, উত্তরাখণ্ড বড় কঠিন স্থান—উপযুক্ত শীতবস্ত্র একান্ত প্রয়োজন। গঙ্গাধর কিছুই লইবেন না দেখিয়া তিনি তাঁহার পার্বত্য যষ্টিখানি তাঁহার হাতে গুঁজিয়া দিলেন; গঙ্গাধরও তাঁহার সম্মান রক্ষার্থে উহা গ্রহণ করিলেন। মুসৌরি পাহাড় হইতে টিহরির পথে হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত শিখরশ্রেণী দর্শন করিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ পরিব্রাজক বসিয়া পড়িলেন এবং রোমাঞ্চিত শরীরে হিমালয়ের গম্ভীর সৌন্দর্যরাশি দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলেন—"এই কি সেই পুণ্যদর্শন হিমালয়—শ্রীরামকৃষ্ণ সকলকে যাহা দেখিতে বলিতেন!"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি টিহরি পৌঁছিলেন, তথা হইতে গঙ্গোত্রীর পথে ধরাসু উপনীত হইয়া শীঘ্র যমুনোত্রী পৌঁছিবার জন্য সেখান হইতে পাকদণ্ডীর পথ ধরিলেন। এই পথ জনবিরল, হিংস্রজন্তুসমাকুল ও লোকালয়হীন; ভাগ্যক্রমে কয়েকজন পাহাড়ী সাথী জুটিয়া গেল, তাঁহাদের সহিত জামদগ্নজী মোকাম পৌঁছিলে পর এক স্বতঃপ্রাপ্ত বৈষ্ণব ও এক নাগা সাধুর সহিত যমুনার তীরে তীরে,—মাত্র বন্যশাক ও তৃণধান্যসিদ্ধ দ্বারা উদর পূরণ করতঃ—তাঁহারা পথ চলিতে লাগিলেন।

যমুনোত্রীর পথে শেষ গ্রাম খরসালী হইতে তাঁহারা পাণ্ডা লইয়া কঠিন পার্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিলেন। যমুনোত্রীর উষ্ণ-গহ্বরে এক রাত্রি বাস করিয়া শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া গঙ্গাধর একাকী উত্তরকাশী আসিয়া পৌঁছিলেন। এইখানেই এক তিব্বতী ব্যবসায়ীর মুখে জানিতে পারিলেন, বদরীনারায়ণ দর্শনের পর নিতিপাস দিয়া তিব্বতে গেলে কৈলাস মানসসরোবর নিকট হইবে।

উত্তরকাশী হইতে গঙ্গোত্রীর পথে ভটোয়ারী গ্রামের প্রান্তে একটি মরণোন্মুখ সন্ন্যাসীর সেবার জন্য গঙ্গাধর থামিয়া গেলেন। নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, নাগাদের বহু গঞ্জনা সহ্য করিয়া তিনি সাধুটির শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সন্ন্যাসীটির শেষকৃত্য সারিয়া গঙ্গাধর গঙ্গোত্রীর পথে চলিলেন।

নির্জন এই দুর্গম পথে ভৈরবঝোলায় তিনি পথহারা হইয়া পড়েন, পরে ভাগীরথীর তীর ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গঙ্গার সেই অপূর্ব অবতরণ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে গঙ্গাধর আত্মহারা হইয়া স্থির হইয়া গেলেন; স্তব্ধ মুগ্ধচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, মর্ত্যলোকের ঊর্ধ্বে আমি এ কোন্ দেবলোকে!

সন্ধ্যা সমাগত; এমন সময় এক সাধু ঐ স্থানে পৌঁছিয়া তাঁহাকে তন্ময় অবস্থায় দেখিয়া, ডাকিয়া সঙ্গে করিয়া গঙ্গোত্রী লইয়া গেলেন। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্র গঙ্গোত্রী দর্শন স্পর্শন করিয়া গঙ্গাধর বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেলেন।

গঙ্গোত্রী হইতে অদূরে গোমুখীর পথে এক গুহায় গঙ্গাধর গায়ত্রী-পুরশ্চরণে রত এক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পান। কিন্তু যেই জানিলেন তাঁহার খাদ্য প্রায় নিঃশেষিত, অমনি গঙ্গোত্রী ফিরিয়া এক যাত্রী শেঠের নিকট খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে অনশন হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহার পুরশ্চারণ নির্বিঘ্ন করিলেন।

প্রায় সপ্তাহকাল নিভৃত গঙ্গোত্রীর দিব্যভূমিতে কাটাইয়া গঙ্গাধর উত্তরকাশীর পথ ধরিলেন। এবার সেখানে ফিরিয়া নিজেই ভীষণ উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলেন। কাহাকেও বিব্রত না করিয়া গ্রামের কিছু দূরে নির্জনে ভাগীরথী তীরে একটি প্রশস্ত শিলার উপর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নীরবে রোগভোগ করিতে লাগিলেন। দুইদিন ঐরূপে কাটিলে তৃতীয় দিনে কথঞ্চিৎ সুস্থবোধ করিতেছেন—এমন সময় একটি সুন্দর পাহাড়ী যুবক তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া সযত্নে নিজ কুটিরে লইয়া গেল, উপযুক্ত পথ্যদ্বারা তাঁহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়া কয়েকদিন থাকিতে অনুরোধ করিল। গঙ্গাধর অতিকষ্টে ঐ সেবাপরায়ণ যুবকটির আকর্ষণ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া উত্তরকাশী হইতে টিহরি পৌছিলেন। সেখানে আসিয়াই গঙ্গোত্রী হইতে আনীত একশিশি গঙ্গাজল তিনি ডাকযোগে বরাহনগর মঠে পাঠাইলেন। মঠের ভ্রাতৃবৃন্দ এতদিনে জানিতে পারিলেন গঙ্গাধর হিমালয়ে।

টিহরি হইতে 'চন্দ্রবদনী' পীঠস্থান দর্শন-মানসে গঙ্গাধর জনমানবশূন্য অরণ্যপথে চলিলেন। উচ্চ গিরিচূড়ায় দেবীর মন্দিরটি হিমালয়ের এক অপূর্ব সৌন্দর্যকেন্দ্র। এই দুরারোহ পর্বতে নির্জন গিরি-মন্দিরে আনন্দ উল্লাসে দুটি রাত্রি কাটাইয়া, মাতৃচরণে পুনরাগমন বাসনা জানাইয়া গঙ্গাধর নামিতে লাগিলেন, কিন্তু পথহারা হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। উর্ধ্বে বা নিম্নে কোন দিকেই গতি অসম্ভব, গঙ্গাধর নির্ভীক নিশ্চিন্ত চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন এই পর্বত দেবীস্থান, যেখানেই থাকি মায়ের কোলেই আছি।

কিছু পরে 'জয় মা' বলিয়া আপনমনে একদিকে নামিতে লাগিলেন, একরকম গড়াইতে গড়াইতে পর্বতের পাদদেশে নিরাপদ সমতলে পৌছিয়া দেখেন কৃষকেরা গম দগ্ধ করিয়া খাইতেছে, তাঁহাকে ঐরূপে আসিতে দেখিয়া তাহারা বিস্মিত ভাবে বলিল, "তুমি কোথা হইতে আসিলে? এ পথে কেহ কোন দিন আসে নাই। নিশ্চয়ই চন্দ্রবদনী মায়ী হাত ধরিয়া তোমাকে লইয়া আসিয়াছেন।"

কিছু দূর বনপথের পর সরকারী পথে চলিয়া সন্ধ্যা-সমাগমে গঙ্গাধর শ্রীনগর পৌছিলেন, এবং অলকানন্দায় অবগাহন করিয়া কমলেশ্বর মঠ দর্শন করিলেন। সেখান হইতে রুদ্রপ্রয়াগ হইয়া ৺কেদারের পথ ধরিলেন। আজ পর্যন্ত হিমালয়ে উচ্চঅনুভূতি-সম্পন্ন সাধু দর্শন হইল না,—একদিন এইরূপ ভাবিতেছেন,—সেইদিনই অগস্ত্যমুনির মন্দিরে একটি প্রসন্নবদন সাধু তাঁহাকে তাঁহার কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে বলে; যাত্রাপথে উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। এই সাধুটি গুপ্ত কাশীতেই ৺কেদারনাথের দর্শনলাভ করিয়া ধন্য হন। একদিন ধ্যানকালে—তাঁহার আনন্দাশ্রু প্রবাহিত দেখিয়া গঙ্গাধর মুগ্ধ হন; কিন্তু শীতে তাঁহার অনাবৃত শরীর দেখিয়া গঙ্গাধর নিজের একমাত্র কম্বলখানি তাঁহার গায়ে জড়াইয়া দিয়া চলিয়া যান।

গুপ্তকাশীর নিকট ফাটাচটিতে একটি বাঙ্গালী সন্ন্যাসী থাকিতেন, তিনি কৈলাস ও মানস-সরোবর গিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি গুপ্তকাশীর অপর পারে ওখি মঠে আছেন শুনিয়া গঙ্গাধর কৈলাস ও তিব্বতের পথের সংবাদ জানিতে তাঁহার কাছে গেলেন, এবং প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ওখিমঠের মোহন্তকে দেখিতে যান। মাত্র একটি আলখাল্লা সম্বলে উত্তর হিমালয়ে আর অগ্রসর হওয়া দুঃসাহসের কাজ বুঝিয়া মোহন্তকে

পরিভেট দিয়া তিনি একটি কম্বল সংগ্রহ করেন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই ৺কেদারের পথে পূর্ব-পরিচিত এক উদাসী সাধুর সহিত তাঁহার দর্শন হইয়া যায়। সাধুটিকে নিজের নূতন কম্বল দিয়া তাঁহার ছিন্ন কম্বলটি বদল করিয়া লন। প্রথমবার তিব্বত গমন পর্যন্ত এটি আর তাঁহার হাতছাড়া হয় নাই।

ত্রিযুগীনারায়ণের পর গৌরীকুণ্ডে পৌঁছিয়া তিনি স্থানমাহাত্ম্যে অভিভূত হইয়া পড়েন ; কিন্তু কেদারনাথ দর্শনব্যাকুলতায় সেখানে মাত্র একরাত্রি কাটাইয়া শিবপার্বতীর তপোভূমি কেদারশৈলের অনুপম মাধুর্য ও অদ্ভুত গাম্ভীর্য অনুভব করিতে করিতে তিনি তাঁহার বহুদিনের বাঞ্ছিত ধাম কেদারনাথের অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। দূর হইতে সূর্যকরোজ্জ্বল কেদারশৃঙ্গে তিনি রজতগিরিনিভ ধ্যানমগ্ন মহাদেবমূর্তিই প্রত্যক্ষ করিয়া দিব্যভাবাবেশে বসিয়া পড়িলেন—অনুভব করিলেন, হিমালয় ভূমানন্দেরই স্থূলপ্রতিমা।

হিমালয়ের এই চিন্ময়রূপ দর্শন করিতে করিতে তিনি ৺কেদারনাথের পদপ্রান্তে উপনীত হইলেন। এইখানে আসিয়াই ৺কেদারনাথকে দর্শন করিয়াই তিনি লিখিয়াছেন, 'এই দেখাতেই আমার সকল দেখার অবসান হইল।' এইখানেই তিনি পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া অহরহ অন্তরে বাহিরে আরাধ্য দেবতাকে অনুভব করিতে লাগিলেন।

শ্রীকেদারনাথে কিছুদিন বাস করিয়া প্রশান্ত চিত্তে গঙ্গাধর পূর্বসংকল্পিত বদরীনারায়ণের পথে যাত্রা করিলেন। নরনারায়ণের তপঃক্ষেত্র পুণ্য বদরীকাশ্রমে পৌঁছিয়া তপস্যার অনুকূল স্থান দেখিয়া সেইখানেই তপস্যায় কাল কাটাইবার জন্য তাঁহার অন্তরের বাসনা বলবতী হইল।

কিন্তু তিব্বত যাইবার সময় চলিয়া যাইতেছে বুঝিয়া বদরীর নিকটবর্তী মানা গ্রামে গিয়া তিনি ব্যবসায়ীদের সহিত তিব্বত প্রবেশ করিবার সহজ পথের সন্ধানে রহিলেন। কয়েকদিন পরেই এক দল ব্যবসায়ীর সহিত যাত্রা করিলেন, কিন্তু যাত্রার প্রথম দিনেই তাহাদের প্রমত্ত আচার-ব্যবহার বিশেষত কাঠের ভগ্ন সেতুর উপরেও তাহাদের অসংযত ভাবগতিকের দরুণ দু'একটি ভারবাহী পশুর উল্লম্ফন ও মৃত্যু দেখিয়া তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া তিনি মানাগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন—এবং পরদিন ঐ গ্রামের প্রধানের সহিত পুনরায় যাত্রা করিলেন। এবার প্রাকৃতিক পাষাণ-সেতুর উপর দিয়া প্রবল স্রোতস্বতী সরস্বতী পার হইয়া ধীর পদবিক্ষেপে উভয়ে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে লাগিলেন—মাঝে মাঝে মেঘমণ্ডলের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের অদৃশ্য থাকিয়া শব্দমাত্র সহায়ে পথ নিরূপণ করিয়া অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই পথেই পার্বতীর জন্মস্থান হিমালয়পুরী দেখিয়া তিনি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেন।

এইভাবে মানা-পাস দিয়া হিমালয়ের প্রথম তুষারশ্রেণী লংঘনপূর্বক গঙ্গাধর তিব্বতের তুষারাচ্ছন্ন মালভূমিতে প্রবেশ করিলেন। নগ্নপদে সামান্যমাত্র শীতবস্ত্র সহায়ে তুষারভূমি অতিক্রম করিতে করিতে একদিন সন্ধ্যাগমে কোন আশ্রয় না পাইয়া তরুণ পরিব্রাজক আচ্ছন্নভাবে তুষারেরই উপর নিদ্রিত হইয়া পড়েন।

সৌভাগ্যক্রমে পরদিন সকলে নিকটবর্তী একটি বৌদ্ধমঠের সন্ন্যাসী জ্বালানি গুল্ম সংগ্রহে সেদিকে আসিয়া তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া সযত্নে তুলিয়া মঠে লইয়া যান, এবং অগ্নিসেকাদি দ্বারা সুস্থ করেন। প্রায়নগ্ন গঙ্গাধরের শারীরিক লক্ষণসকল দেখিয়া মঠের লামারা তাঁহাকে অখণ্ড ব্রহ্মচারী বলিয়া বুঝিতে পারেন, 'গেলাং' বলিয়া খুব সম্মান করেন এবং মঠে থাকিতে বলেন।

এইভাবে গঙ্গাধর থুলিং মঠে থাকিয়া পনের দিনের মধ্যেই তিব্বতী ভাষা শিখিয়া লন, এবং তিব্বতের ধর্ম ও রীতি-নীতি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান

সংগ্রহ করেন, এমন কি মঠে ধর্মালোচনায়ও অংশ গ্রহণ করিতে থাকেন।

তিব্বতে যাহা কিছু সব মঠে ও মন্দিরে। মন্দির-গুলিতে নানা দেবতার বড় বড় মূর্তি: মঠগুলি লামায় পরিপূর্ণ, কোন কোন মঠে তিন হাজার চার হাজার, কোন মঠে সাত হাজার পর্যন্ত লামা থাকিয়া পূজা পাঠ জপ ধ্যানাদি অভ্যাস করিতেছেন।

মঠের মধ্যস্থলে একটি চৈত্য—তাহাকে ঘিরিয়া লামাদের বাসস্থান, সাধনার আসন, দেওয়ালেরই গায়ে খোদাই-করা সিংহাসন বা চেয়ারের মত বসিবার স্থান। শীত নিবারণের জন্য অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে—কোথাও বা তাহার উপর জল ফুটিতেছে; প্রয়োজনমত কেহ তাহাতে বটিকা সাহায্যে চা প্রস্তুত করিয়া পান করিতেছেন, আবার ধ্যানে বসিতেছেন।

লামারা কেহ পূজায়, কেহ পাঠে রত; কেহ জপ করিতেছেন—'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ', কাহারও বা ধ্যানের বিষয় 'সর্বশূন্য আমি', সকলেরই প্রথম মন্তব্য—'আমার ইষ্ট বুদ্ধ—আমার সব কিছু সর্ব-হিতের জন্য'। এই মহাভাব তিব্বতের সকল সাধনার সাধারণ ভিত্তিভূমি। 'আমার সব কিছু সকলের কল্যাণের জন্য'—এই ভাবটি গঙ্গাধরের তরুণ মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং কাল-ক্রমে উহা তাঁহার জীবনাদর্শের অন্যতম প্রধান উপাদানে পরিণত হয়।

মঠে চার পাঁচ শ্রেণীর লোক আছেন—তন্মধ্যে লামারাই শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ; বলিতে গেলে তাঁহারাই রাজকার্য চালান, তিব্বতের আয়-ব্যয় সকলই মঠের। বাহিরের কাজ ডাবা বা প্রবর্তকেরাই চালায়—এমন কি ব্যবসাবাণিজ্য পর্যন্ত; তাই লামারা বহির্বিষয়ে নিশ্চিন্ত। তাঁহাদের কয়েকটি বৌদ্ধ-নিয়মের অধীনে চলিতে হয়, ব্যতিক্রম হইলেই মঠ হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়। লামার সংখ্যা কম। ডাবাই অধিক—তাহারা লামা হইতে না পারিলে গৃহস্থ হইতে পারে।

মঠগুলি গ্রামবসতি হইতে দূরে, উচ্চ স্থানে অবস্থিত, গৃহস্থের সহিত সংস্রব নাই, বিশেষ আবশ্যক না হইলে স্ত্রীজাতির মঠে আসিবার অধিকার নাই।

প্রধান প্রধান বুদ্ধানুশাসনগুলি মঠে আছে, মঠের ভাল আচার-ব্যবহার, পবিত্র ভাব, সুন্দর নিয়ম গঙ্গাধরকে মুগ্ধ করিল, দেবদেবী শাস্ত্র সব ভারতীয়, পূজাবিধিও প্রাচীন কৌলতান্ত্রিক মতে। পরবর্তী-কালের তন্ত্রোক্ত ভয়ঙ্কর আচারগুলি মঠে অজ্ঞাত।

দেবীর পূজা বলিমাংসরহিত; তবে ভস্মাসুরের পূজায় তিব্বতীসুরা-দান বিধেয়, কিন্তু পূজক বা মঠের লোকদের পক্ষে উহা নিষিদ্ধ। নৃত্যগীতও নিষেধ। গঙ্গাধর অনুভব করিলেন মঠগুলি পবিত্র-ভাবের আধার এবং আধ্যাত্মিকতার শক্তিকেন্দ্র, এখনও সেখানে জাতিস্মরের আবির্ভাব হয়—এমনই পুণ্যভূমি। একজন প্রধান লামা গঙ্গাধরের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিখানি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "এ ছবি কোথায় পেলে, এমন মুখ, চোখ, কান ত সাধারণ মানুষের নয়—এ ভগবান তথাগতের।" এই বলিয়া ছবিটি তাঁহারা বেদীর উপর রাখিয়া ধূপ দীপ দিয়া আরতি করেন।

তিব্বতের শান্ত সুন্দর গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে গঙ্গাধর সাধনার অনুকূল স্থান দেখিয়া আনন্দিত হন, ধ্যানধারণার উপযুক্ত গুফা, পথে পথে ঢিবির মত পাথরে মন্ত্র লেখা, লামাদের হাতে হাতে ধাতুর ডিবাতে 'ওঁ' লেখা—সব কিছু মিলিয়া তিব্বতের আকাশে বাতাসে ধর্মের একটা ঘনীভূত ভাব তিনি অনুভব করিতেন।

তিব্বতীরা যথার্থ ধর্মান্বেষীকে প্রীতির চক্ষে দেখে ও সযত্নে সৎকার করে, তবে ইংরেজের সহিত মেলামেশা বলিয়া ভারতীয়দের প্রথমটা একটু সন্দেহ করে।

মঠ ও মন্দিরের বাহিরে অধিকাংশ লোক দরিদ্র,

কারণ দেশে শস্য উৎপাদন অতি কম, সাধারণ লোকেরা ছাগ-মেষ পালন করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করে, এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় ছোট ছোট তাঁবুতে কাটায়।

তিব্বতের ভাষা জানা থাকায় একদিকে যেমন তাঁহার ঐ দেশের ধর্ম রীতি-নীতি জানিবার সুবিধা হইল, আর একদিকে আবার জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া অভাব-অভিযোগ স্বকর্ণে শুনিয়া তাহাদের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক ভাবে সহানুভূতির উদয় হইত, এবং অনেক সময় তিনি উহা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন, লোকেরা তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়া বলে লামারা জানিতে পারিলে বিপদ হইবে।

কয়েকদিন পরে লামাদের কানে সব কথা উঠিল। তাঁহারা গঙ্গাধরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং বলিলেন, 'গাল বাড়াও'—অর্থাৎ গাল কাটিয়া দিব, তাহা হইলে কথা বলা বন্ধ হইয়া যাইবে। থুলিং মঠে খাপশুদ্ধ তরোয়াল তাঁহার কাঁধের উপর বসাইয়া তাহারা তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিল। গঙ্গাধর সুযোগ বুঝিয়া পলায়ন করেন। (ক্রমশঃ)

তুমি কি আমার

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

তুমি কি আমার সেই ?
গোপনে স্বপনে বাজাও বাঁশরী,
ঘুমের ঘোরেতে থাকো দেহ ধরি,
গগন-নীলিমা মন্থন করি
লীলা কর নিমেষেই ?

তুমি কি রয়েছ গন্ধে ও রূপে,
ফুলের মাঝারে—বাসনায় চুপে,
তুমি কি রয়েছ ছিন্নসূতায়
ধরাইয়া দিতে খেই ?

তুমি কী ডাকিছ সবাকার মাঝে
আমারে—তোমার পথে সদা কাজে,
বিপদে আমায় ধরিয়া হস্তে
কহিছ—শঙ্কা নেই।
তুমি কি আমার সেই ?

তুমি কী সে-গুণী, যাহারে লভিতে
নানান ধর্ম, নানান কবিতে
গাহিতেছে জয় তব স্তবময়
বিচ্ছেদ-মিলনেই ?
তুমি কি আমার সেই ?

জাতকের উপকরণ

শ্রীজয়দেব রায় এম-এ, বি-কম্

জাতকের কাহিনীগুলি প্রধানত বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি ও অনুশাসন প্রচারের জন্যই রচিত হয়। সেগুলির সাহিত্যিক ধর্মগত ও নৈতিক উপযোগিতা ছাড়া অন্য মূল্যও আছে। সুখপাঠ্য গল্প ও গাথার ছলে সে যুগের সামাজিক ও আর্থনীতিক ইতিহাস জাতক-কথাগুলিতে বিবৃত হইয়াছে। কাহিনীর বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যুগের পরিবেশ ও পরিবেষ্টনীর একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ এই-গুলিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

জাতকের পটভূমিকা পর্যালোচনা করিলে দেখা

যায়, তাহাতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, ঘর-সংসার, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি গল্পগুলিতে রূপলাভ করিয়াছে। গল্পগুলিতে বলা হইয়াছে, ভগবান বুদ্ধ বারবার জন্মগ্রহণ করিতেছেন; প্রত্যেক জন্মে একটি বিচিত্র অনুষ্ঠানের দ্বারা জীবনের কোন উচ্চ-আদর্শ দেখাইতেছেন।

কেবল মানব-জন্ম নয়, পশুরূপে, পাখীরূপে, আরও কতরূপেই তিনি জন্মপরিগ্রহ করিতেছেন, ইতর জীবরূপেও সৎকর্ম ও সদাচারের দ্বারা ধর্ম-নীতির নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।

জাতকের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে তৎকালীন সমাজ ও পরিবারের নানা ঘটনাবলী হইতে। তাহা ছাড়া, তখনকার বহুলপ্রচারিত সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত প্রচলিত কাহিনীগুলি জাতকে নবরূপ পাইয়াছে। অবশ্য এমন অনেক গল্প আছে, যেগুলি নিছক গল্পই মাত্র, বোধিসত্ত্ব তাহাতে একটি চরিত্র মাত্র।

জাতককথার জনসমাদর এই রূপান্তর হইতেই অনুমান করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কবি কালিদাস যে কাহিনী লইয়া তাঁহার অমর নাটক 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' লিখিয়াছিলেন, সেই দুষ্মন্ত-শকুন্তলার গল্প আছে মূল মহাভারতের আদি পর্বে। বৌদ্ধ জাতকের 'কট্‌ঠহারি জাতক' কাহিনীতে সে গল্পটি রূপায়িত হইয়াছে। মহাভারতের কাহিনীর হুবহু অনুসরণ অবশ্য জাতকে করা হয় নাই। 'কট্‌ঠহারি জাতক' গল্পটি এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হইল—

বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত একবার বনে মৃগয়া করিতে গিয়া বনবাসিনী এক অপরিচিতা রমণীকে গোপনে বিবাহ করেন। রমণী গর্ভবতী হইলে তিনি তাহাকে একটি অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় দিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বোধিসত্ত্ব স্বয়ং রমণীর গর্ভে সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।

বালক তাহার পিতৃপরিচয় জানিত না। সত্যকাম-জাবালির কাহিনীর ন্যায় বোধিসত্ত্ব লাঞ্ছিত হইলে রমণী তাঁহার সত্য পরিচয় দান করিয়া তাঁহাকে রাজসমীপে লইয়া গেলেন।

রমণী অঙ্গুরীয় প্রদর্শন করা সত্ত্বেও লোকলজ্জার ভয়ে রাজা তাঁহাকে পত্নীরূপে স্বীকার করিতে চাহিলেন না। রমণী তখন সত্যক্রিয়া করিলেন, শিশুটিকে উর্ধ্বে বেগে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"এ যদি আপনার সন্তান না হয়, তবে এর পতনের ফলে মৃত্যু হ'ক!"

বালক আকাশে উঠিয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিল—"রাজা আমি আপনারই পুত্র, আমাকে সর্বজনসমক্ষে পুত্র ব'লে স্বীকার ক'রে আমার ও আমার মাতার মর্যাদা রাখুন।"

ব্রহ্মদত্ত বিস্মিত এবং সে সঙ্গে লজ্জিত হইয়া পুত্রকে কোলে লইলেন এবং সেই সঙ্গে রমণীকেও রাণীর মর্যাদা দান করিলেন।

মূল দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কাহিনীর ন্যায় জাতকে নাটকীয়তা নাই। তবে উভয় কাহিনীর সৌসাদৃশ্য লক্ষণীয়। উভয় গল্পেই বর্ণিত রাজার মৃগয়া, অপরিচিতা কন্যার সঙ্গে পরিচয়, গান্ধর্ব বিবাহ, অঙ্গুরীয়-দান, রাজসভায় প্রত্যাখ্যান, শেষে স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে পুনর্মিলন লক্ষণীয়।

কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে দুর্বাসার অভিশাপ ও তাহার ফলে রাজার স্মৃতিভ্রংশ, অঙ্গুরীয়কের রোহিত মৎস্যের উদরে বাস প্রভৃতি যে ভাবে নাটকীয়তার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার অনুকৃতি জাতকে নাই। রাজসভায় রমণীর পরীক্ষা-দান রামায়ণে সীতার অগ্নিপরীক্ষার সঙ্গে তুলনীয়। কবি কালিদাসের পূর্বেই হয়ত জাতকটির সৃষ্টি হইয়াছিল।

মূল রামায়ণের কোন-কোন কাহিনীও জাতকে রূপান্তরিত হইয়াছে। 'দশরথ জাতক' কাহিনী রামায়ণের সীতা-রামের গল্পেরই অভিনব রূপ। জাতক-রচকরা সে কালের সকল গল্পকেই আপনাদের মনোমত করিয়া বোধিসত্ত্বের কল্পিত গল্প

জীবনে আরোপ করিয়াছিলেন। গল্পটি সংক্ষেপে এই—

বারাণসীতে দশরথ নামক একরাজার পাট রাণীর গর্ভে রাম ও লক্ষ্মণ ও সীতার জন্ম হয়। পাটরাণীর মৃত্যুর পরে দশরথ বৃদ্ধবয়সে আর একটি পরমা সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহারই আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িলেন। সে রাণীর গর্ভে রাজার ভরত নামে একটি পুত্র জন্মিল।

দশরথ রাণীর অনুরোধে রাণীর সপত্নী-সন্তান রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে বনে পাঠাইয়া ভরতকে যৌবরাজ্য দিলেন। রাম-লক্ষ্মণ বনে গেলে ভরত পিতৃবিয়োগের পর তাঁহাদের ফিরাইয়া আনিতে গেলেন। দশরথ রামকে দ্বাদশ বৎসর পরে রাজ্যে ফিরিতে বলিয়াছিলেন, তখনও কাল পূর্ণ হয় নাই বলিয়া তিনি ভরতকে ফিরাইয়া দিলেন। ভরতও তাঁহার পাদুকা দুইটি সিংহাসনে রাখিয়া রামের প্রতিনিধি হইয়া রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। তারপর যথাসময়ে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বনবাস হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলে ভরত তাঁহার হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন।

মূল রামায়ণের কেন্দ্রীয় ঘটনা 'সীতাহরণ ও রাবণবধ'কেই জাতক কথা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া জাতকে সীতা রামের সহোদরা, সহধর্মিণী নয়! রামের নাম জাতকে 'রামপণ্ডিত'—রামচন্দ্র নয়। রামায়ণের পিতৃআজ্ঞা পালনের জন্য রামের বনগমন এবং ভরতের ঐকান্তিক ভ্রাতৃবাৎসল্যই জাতককারকে অধিকতর প্রভাবান্বিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। দশরথ-জাতক উক্ত দুইটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত।

রামায়ণ-মহাভারতের বহু উপাখ্যানই এইভাবে জাতকে রূপান্তর লাভ করিয়াছে;—শিবি ও উশীনরের গল্প, অণিমাণ্ডব্যের উপাখ্যান প্রভৃতি সে প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মহাভারতের একটি গল্প আছে যে, মাণ্ডব্য নামক এক ঋষিকে চোর অপবাদে শূলে দেওয়া হয়—এই গল্পটি 'কন্হদীপায়ন জাতকে' গৃহীত হইয়াছে।

গল্পটি হইল—মাণ্ডব্য ও দ্বৈপায়ন দুই ঋষি ছিলেন। একবার মাণ্ডব্য শ্মশানের প্রান্তে বাস করিতে ছিলেন, সে সময়ে পশ্চাদ্ধাবিত এক চোর চুরির জিনিস তাঁহার কুটিরে ফেলিয়া পলাইল। নগর-রক্ষীরা মাণ্ডব্যকেই চোর ভাবিয়া রাজসমীপে লইয়া গেল, রাজা তাঁহার শূলদণ্ডের আদেশ দিলেন। কিন্তু শূলবিদ্ধ হইলেও তাঁহার মৃত্যু হইল না, তিনি যন্ত্রণাভোগ করিতে লাগিলেন।

দ্বৈপায়ন খোঁজ করিতে করিতে আসিয়া তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিলেন। প্রশ্ন করিলে জাতিস্মর মাণ্ডব্য তাঁহার পূর্বজন্মের এক দুষ্কৃতির কথা বর্ণনা করিলেন, সেবার খেলার ছলে একটি মাছিকে তিনি অনুরূপ কষ্ট দিয়াছিলেন, সেই পাপে এ জন্মে তাঁহার এই শাস্তি ভোগ করিতে হইতেছে।

ভাগবতের মূলকাহিনীও জাতকের 'ঘটজাতক' আখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে। জাতকে কৃষ্ণ ও বলরাম সহোদর ভ্রাতা। কংস তাঁহার ভগিনী দেবগর্ভার গর্ভজাত সন্তানের হস্তে প্রাণ হারাইবেন জানিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখেন।

পরে কংস বাধ্য হইয়া দেবগর্ভার সঙ্গে উপসাগর নামক এক রাজকুমারের বিবাহ দিলেন। তাঁহাদের পুত্রসন্তান জন্মিবামাত্র দেবগর্ভা নন্দগোপা নামিকা একটি নারীর রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহাদের প্রেরণ করিতেন। দশটি পুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ হইলেন বাসুদেব, এবং নবম পুত্রের নাম হইল ঘটপণ্ডিত।

ঘটপণ্ডিতের সহায়তায় ক্রমে ক্রমে বাসুদেব কংসকে বধ করিয়া সারা পৃথিবীতে রাজ্য বিস্তার করিয়া অমিতপরাক্রমে রাজত্ব করিয়া জরা নামক এক ব্যাধের হাতে পরিণত বয়সে প্রাণ হারাইলেন। তার পূর্বেই নিজেদের পাপে তাঁহার বংশ সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়াছিল।

ভাগবতের কাহিনীর চুম্বক এই জাতকে আছে। তবে নানা স্থানেই উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়—বৌদ্ধজাতকে ঘটপণ্ডিত একটি বিশিষ্ট চরিত্র, ভাগবতে তাঁহার অনুরূপ কোন চরিত্রের উল্লেখ নাই। কংস এখানে অত্যাচারী রাজা মোটেই নন, পরন্তু বাসুদেব ও তাঁহার ভ্রাতারাই দুর্জন বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

জাতকে বলদেব বাসুদেবের অনুজ, অগ্রজ নহেন; বৌদ্ধ জাতকে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের অভিশাপেই যদুকুল ধ্বংস হইয়াছে, মহাভারতে দুর্বাসার। জাতকের বাসুদেব তাঁহার সহোদর ভ্রাতাদের সাহায্যে রাজ্য বিস্তার করিতেছেন, মহাভারত ও ভাগবতের ন্যায় কেবলমাত্র নিজের বিক্রমেই নয়।

কথাসরিৎসাগর ও পঞ্চতন্ত্রের বহু গল্পও জাতক-কথার রূপ ধরিয়াছে। অনুমান করা যায়, বৌদ্ধ জাতকের মধ্য দিয়াই আমাদের দেশের বহু গল্প দূর দূর দেশে এককালে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দেশ-বিদেশের সঙ্গে তখন ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল, বণিক পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে অন্য বহু বস্তুই বিদেশে লইয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে এ দেশের গল্প-ভাণ্ডারও ছিল। সেইরূপ বিদেশ হইতেও বহু গল্প আসিয়া এ দেশে নবকলেবর লাভ করিয়াছে।

পশুপাখীর জবানীতে কথা বলাইয়া হিতোপদেশ দেওয়ার কথা সুপ্রাচীন, ঈসপের গল্পের মত জাতকেও সে প্রথার অনুবর্তন হইয়াছে।

ঈসপের The Tortoise and the Eagle ও পঞ্চতন্ত্রের 'হংস ও কূর্ম' গল্পের অভিনবরূপ দেখা যায় 'কচ্ছপ জাতকে'। এক কচ্ছপের সঙ্গে দুইটি হংসের ঘনিষ্ঠ মৈত্রী হয়। 'কচ্ছপ জাতকে'র কচ্ছপের আকাশে উড়িবার সখ হইলে একটি দণ্ডের সাহায্যে তাহাকে লইয়া হংসযুগল ঊর্ধ্বে উঠে, পথে বাচালতার দোষে নিচে পড়িয়া মারা যায়।

এইভাবে জাতক নানাসূত্র হইতে গল্পের কাহিনী আহরণ করিয়াছিল।

বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রেমের রূপ

বেলা দে

বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা কাব্য-সাহিত্যের এক গৌরবময় অধ্যায়। শুধু বাংলা কেন এ কাব্যরস বিশ্বসাহিত্যেও একান্ত দুর্লভ, বাংলা সাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ হিসাবেই এই পদাবলী আমাদের মধ্যে জীবন্ত হয়ে রয়েছে! জগৎ ও জীবনের, স্রষ্টার ও সৃষ্টির বিচিত্র রহস্যের সন্ধান পাই বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে—এই বিশ্বজগতের সর্বক্ষেত্রে রূপে রসে গন্ধে শব্দে স্পর্শে যে বিচিত্র শক্তির প্রাণ-প্রবাহের সমারোহ চলেছে, তারই আরতি করে গেছেন বৈষ্ণব কবিরা! কত কাল অতীত হয়ে গেছে, কত কাল চলে যাবে, কত শতাব্দীর পরিবর্তন হবে, তবুও বৈষ্ণব কবির পদাবলী চিরকাল মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকবে, চিরসুন্দর হয়ে থাকবে প্রকৃতির মত, দেহের ভেতর আত্মার মত; তাই আজো এই যান্ত্রিকতার যুগেও বর্ষণমুখর রাত্রে মনে পড়ে বৈষ্ণব কবির পদাবলী—

> "এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
> কেমনে আইল বাটে!
> আঙ্গিনার কোণে বঁধুয়া ভিজিছে
> দেখিয়া পরাণ ফাটে।"

প্রেমময় কৃষ্ণ ও প্রেমময়ী রাধিকা বৈষ্ণব কবির নিজস্ব সৃষ্টি—শ্রুতির "রসো বৈ সঃ" বৈষ্ণব ধর্মের কৃষ্ণ, তাঁর প্রেম ও আনন্দের পরিপূর্ণ বিষয় ও অবলম্বন হলো শ্রীরাধিকা। আর এই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে বৈষ্ণব পদাবলী। এমন পরিবেশ, এমন উন্মাদনা, প্রাণের

এমন উচ্ছলপ্রবাহ বাংলা সাহিত্যে আর দেখা যায় না। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, আবেগের গভীরতা ও প্রবলতায়, রূপসৃষ্টির স্বাধীনতায় বৈষ্ণব গীতি-কবিতা সাহিত্যের ক্ষেত্রের একটি নতুন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করলো। পঞ্চদশ শতাব্দীর মৈথিল কবি বিদ্যাপতি থেকেই এই পদাবলীর ধারা আরম্ভ হয়। বিদ্যাপতি বাঙালী বৈষ্ণব কবিদের গুরুস্থানীয়—তার পদাবলী মধুচক্রের মত, এর কুহরে কুহরে মাধুর্য ! কবি ভাষার ভাণ্ডারে, ভাবলোকে, বিশ্বপ্রকৃতিতে, ধ্বনিজগতে যেখানে যত মাধুর্য পেয়েছেন, সমস্তই তাঁর রচনায় চাতুর্যের বন্ধনীতে একত্র করেছেন সৌন্দর্য-বর্ণনায়, উপমা-প্রয়োগে, শব্দ-সংযোজনায় ও চিত্র-অঙ্কনে বিদ্যাপতি অতুলনীয়! বিদ্যাপতির রচনা তাই আজও শুনতে ভালবাসি—

"তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া,
বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।"

এ গান আজও অমর হয়ে আছে। এই পদটিকে উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"এই জীবন-ব্যাপী বিরহের যেখানে আরম্ভ সেখানে যিনি, যেখানে অবসান সেখানে যিনি এবং তারই মাঝখানে গভীরভাবে প্রচ্ছন্ন থেকে যিনি করুণসুরের বাঁশী বাজাচ্ছেন সেই 'হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিন রাতিয়া,' মনের সে উদাস ভাব থাকলে মানবাত্মা দেশে দেশে যুগে যুগে বসে পরম কাম্য ধনের সাক্ষাৎ বিনা কি করে জীবন ধারণ করবো, বিদ্যাপতির পদাবলী ঠিক সেই মনোভাব জাগায়।"

কবি চণ্ডীদাসও ছিলেন বিদ্যাপতির সমসাময়িক! চণ্ডীদাস সহজ সরল ভাষায় মর্মস্পর্শী আবেগ, ভাবের বিহ্বলতা, প্রেমের উন্মাদনা প্রকাশ করে অমর হয়ে রয়েছেন। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে প্রেমের মর্যাদা যে ভাবে ফুটে উঠেছে তা সত্যিই অপূর্ব! প্রেমের আত্মবলিদানে প্রেমের সার্থকতা, প্রেমের প্রকাশ ও বিস্মৃতি হচ্ছে অন্তরের বেদনার মধ্যে দিয়ে। তাই চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছেন—তাঁর পায়ে আত্মনিবেদন করে ধন্য হয়েছেন—"বঁধু কি আর বলিব আমি

মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি।"

ব্যাকুলহৃদয় এখানে বাঞ্ছিতের সন্ধান পেয়েছে, তাই কথা গেছে হারিয়ে। শ্রীরাধার মত কবিও চিরাকাঙ্ক্ষিতের পায়ে সর্বস্ব সমর্পণ করে আপনিও গিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়াতে চান। তাই তাঁর গানে শুনি—

"কী কহবরে সখি আনন্দ ওর
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।"

বৈষ্ণব পদাবলী মূলতঃ ধর্মমূলক হইলেও 'কবির কলানৈপুণ্যে তা শ্রেষ্ঠ কাব্যরসের উৎস হয়ে রয়েছে'। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিজের সঙ্গে দেহাতীতের ও রূপাতীতের সম্বন্ধ স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে উঠেছে তারই অপূর্ব ছাপ পড়লো জ্ঞানদাসের পদাবলীর মধ্যে—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর!
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।

(জ্ঞানদাস)

এ যুগের কবিদের মধ্যে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও বলরামদাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দদাসের গীতি-কবিতা সঙ্গীতধর্মী। বিদ্যাপতি যেমন শব্দের সাহায্যে অনুকরণীয় সৌন্দর্যের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, গোবিন্দদাস তেমনি শব্দের সাহায্যে মনোরম মাধুর্যের সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ফিরে এসে শ্রীরাধিকাকে দেখতে পাবেন না। বর্ষাকাল—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—ময়ূর উতলা হয়ে নাচছে—বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি! কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নেই—

"ঈ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"

যমুনার তীরে তীরে রাধা নামের সাধা বাঁশী আর বাজে না, কৃষ্ণবিরহে সমস্ত বৃন্দাবন আজ শূন্য—

"শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী।"

শ্রীরাধার এই বিরহ-বেদনাতে জগতের চিরন্তন বিরহদুঃখের কথা ফুটে উঠেছে। এখানে নেই কোনো অনুযোগ—শ্রীরাধা বলছেন—কানু তো আমার গুণনিধি, আমার দুঃখ আমার কপাল দোষে হয়েছে—

আমি "মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব,
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।"

এখানে প্রেমের মর্যাদা যে ভাবে ফুটেছে প্রেম-সাহিত্যে তা অপূর্ব! গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ধরনে, এবং জ্ঞানদাস বলরামদাস চণ্ডীদাসের প্রভাবে পদাবলী রচনা করেন। বৈষ্ণবগীতি-কবিতার ক্ষেত্রে এই তিনজনের দানই অতুলনীয়! জ্ঞানদাসের সেই "তোমার অঙ্গের পরশে আমার চিরজীবি হউ তনু" পদটি ভাবের পূর্ণতায় যেন নিজেই একটি অনবদ্য কবিতা!

পদাবলী-সাহিত্যে বৈষ্ণব প্রেমগীতি স্বর্গীয় প্রেমরাগিণীযোগে অপূর্ব আধ্যাত্মিক সুরে ভক্ত সাধকের চরম আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে, পৃথিবীর ফুলে স্বর্গের পারিজাতশোভা-সৌরভ বিকশিত হয়ে উঠেছে। সহজ সুন্দর মর্মস্পর্শী দিব্য প্রেম-মণ্ডিত এই সব কবিতা বা গানগুলি আজো সকলের প্রাণ স্পর্শ করে।

দান

শান্তশীল দাশ

দুঃখ দাও আরো তুমি—সুতীব্র দহনে
চিত্ত মোর দগ্ধ কর; আমার ভুবনে
আসুক দুর্যোগ-ঘন ভয়ার্ত রজনী,
শংকিত হব না আমি অসার্থক গণি
এ-জীবন; নৈরাশ্যের তীব্র বেদনায়
আপনারে মানি রিক্ত নিঃস্ব অসহায়,
মৃত্যুর দুয়ারে এসে নেব না আশ্রয়।

তোমার দুঃখের দান কী কল্যাণময়,
জানি আমি; সেই দুঃখ-দহনের মাঝে
তোমার নিবিড় স্পর্শ একান্তে বিরাজে।
সে-স্পর্শ দুঃখের বেশে আসে বারে বারে,
আসে ছদ্ম দুর্যোগের ঘন অন্ধকারে।
তারই সাথে আস তুমি হে চিরসুন্দর,
তোমার দুঃখের দানে ভরুক অন্তর।

মাহেশের রথ

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

মাহেশের রথের কথা বাঙ্গালী মাত্রেই জানেন, বিশেষতঃ ইহা কলিকাতার সন্নিকট। ৺পুরীধামের পর মাহেশের খ্যাতি আছে। বাংলা ১২২৬ সালের সমাচার-দর্পণে মাহেশের রথযাত্রা সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য আছে,—

"অনেক অনেক স্থানে রথযাত্রা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার মধ্যে জগন্নাথক্ষেত্রে রথযাত্রাতে যেরূপ সমারোহ ও লোকযাত্রা হয় মোং মাহেশের রথযাত্রাতে তাহার বিস্তর ন্যূন নহে।" এখানে প্রথম দিনে অনুমান এক দুই লক্ষ লোক দর্শনার্থে আইসে এবং প্রথম রথ অবধি শেষ রথ পর্যন্ত নয়দিন জগন্নাথদেব মোং বল্লভপুরে রাধাবল্লভদেবের ঘরে থাকেন; তাহার নাম গুণ্ডাবাড়ী– ঐ নয়দিনে মাহেশ গ্রামাবধি বল্লভপুর পর্যন্ত নানা-প্রকার দোকান-পসার বসে এবং সেখানে বিস্তর বিস্তর ক্রয় বিক্রয় হয়। এমত সমারোহ জগন্নাথ ব্যতিরিক্ত অন্যত্র কুত্রাপি নাই।"

ইহা প্রায় ১৩৭ বৎসর পূর্বের কথা।

বাংলা ১২২৬ সমাচার-দর্পণে মাহেশের স্নান-যাত্রার মহাসমারোহের কথা এইরূপ বর্ণিত আছে—

পূর্বদিন রাত্রিতে কলিকাতা চুঁচুড়া ও ফরাসডাঙ্গা সহর ও তন্নিকটবর্তী গ্রাম হইতে বজরা ও পিনিস ও ভাউলে এবং আর আর নৌকাতে অনেক ধনবান লোকেরা নানাপ্রকার গান ও বাদ্য ও নাচ ও অন্য অন্য প্রকার সুখসাধন সামগ্রীতে বেষ্টিত হইয়া আসেন—পরদিন দুইপ্রহরের মধ্যে জগন্নাথের স্নান হয়। যে স্থানে জগন্নাথের স্নান হয় সেখানে প্রায় তিন চার লক্ষ লোক একত্র দাঁড়াইয়া স্নান দর্শন করে। পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ব্যতিরেকে এই যাত্রায় এমন সমারোহ অন্যত্র কোথাও হয় না" ইহা ইংরেজী ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ ১৩৭ বছরের পূর্বের সংবাদ।

মাহেশের রথ কতদিনের পুরাতন তাহা ঠিক নির্ণয় করা কঠিন। প্রচলিত প্রবাদ এই—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্রীক্ষেত্র হইতে আসিয়া এইখানে স্নান করিয়া বিশ্রাম করিতেন। স্নানযাত্রার তিথিতে মাহেশে মহাসমারোহে যে স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় উহা জগন্নাথদেবের গঙ্গাস্নানের স্মরণোৎসব।

হুগলী জেলার গেজেটিয়ারে ওমালী সাহেব বলেন, মহেশের রথখানি সর্বপ্রথমে একজন স্থানীয় মোদক নির্মাণ করিয়া দেন। পুরাতন সরকারী কাগজপত্র দলিলে দেখা যায় যে, সেওড়াফুলির রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা মনোহর রায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবার জন্য জগন্নাথপুর গ্রাম দান করেন। স্বর্গীয় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র নাথ বসু তাঁহার 'জাতীয় ইতিহাসের' তৃতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন যে রাজা মনোহর রায়ই শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের প্রথম মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে List of Ancient Monuments in Bengal নামক যে সরকারী বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে নিম্নলিখিত তথ্য বিবৃত হইয়াছে :—

"It is said that the Jagannath of Mahesh is about the same date with the Radhaballalbh of Vallabhpur i. e. more than 350 years old." অর্থাৎ বর্তমান সময় হইতে চারিশত দশ বর্ষের পূর্বে। প্রচলিত কিম্বদন্তী এইরূপ যে ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী স্বপ্নাদেশে গঙ্গাতীরে বালুকায় প্রোথিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীসুভদ্রা ও শ্রীশ্রীবলরামের নিম্বকাষ্ঠনির্মিত বিগ্রহ তিনটি উদ্ধার করেন এবং তিনিই শ্রীশ্রীজগন্নাথের আদেশমত মাহেশে প্রতিষ্ঠা করেন। হাণ্টার সাহেব হুগলী জেলার Statistical Account বইতে প্রমাণ করিয়াছেন মাহেশের শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল।

'হুগলী জেলার ইতিহাস' প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্র মহাশয় এই সম্বন্ধে আনুপূর্বিক তথ্য সঙ্কলন করিয়াছেন। সেওড়াফুলির রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা মনোহর

রায় জগন্নাথ-পল্লী মাহেশের শ্রীশ্রীজগন্নাথ-সেবার জন্য দান করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই উক্ত আছে। হুগলী জেলার ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে :—

"১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে নবাব গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিবার সময় হঠাৎ ভীষণ ঝড়ে আক্রান্ত হইয়া জগন্নাথদেবের মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মন্দিরের সেবায়েত রাজীব অধিকারী নবাবকে আদর আপ্যায়ন করায় তিনি বিশেষ প্রীত হন এবং সেবায়েতগণকে 'অধিকারী' উপাধি দেন।"

ইহা ছাড়া "নবাব বাহাদুর সপ্তগ্রামের শাসনকর্তাকে জগন্নাথপুরের রাজস্ব রহিত করিয়া উক্ত মহাল নিষ্কর দেবোত্তর করিয়া দিবার নির্দেশ দেন।" সুধীর বাবু তাঁহার হুগলী জেলার ইতিহাসে ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত উক্ত প্রাচীন দলিলের প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় তাঁহার প্রণীত 'সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন—

"পুরীর জগন্নাথমন্দিরের অনুকরণে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নিমাই চরণ (মল্লিক) হুগলী জেলার মাহেশে জগন্নাথের মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। মন্দিরের উচ্চতা ৭০ ফিট। মন্দিরের বিগ্রহ জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। মন্দির ও সেবাইতদিগের বাসগৃহ লইয়া জমির পরিমাণ প্রায় তিন বিঘা। বিগ্রহের বেদীতে নিম্নলিখিত লেখা উৎকীর্ণ আছে—রামতনু মল্লিক ও শ্রীমতী পার্বতী দাসী।"

ঠাকুরের নিত্যভোগের জন্য সাড়ে বার সের চাউলের অন্ন দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন খিচুড়ী ভোগও হয়। নিত্যভোগের জন্য নিমাই মল্লিকের দান বার্ষিক ১৯২৲ ও রামমোহন মল্লিকের ট্রাষ্ট ফণ্ডের দান ১৫০৲ টাকা। খিচুড়ী ভোগের জন্য নিমাই মল্লিকের স্বতন্ত্র দান বার্ষিক ৪৩৬৲ টাকা। রামতনু ছিলেন নিমাই মল্লিকের তৃতীয় পুত্র। তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ছিলেন। তিনিই স্বামীর মৃত্যুর সাত বৎসর পরে মন্দিরের সংস্কার করিয়া বেদীতে তাঁহার পরলোকগত স্বামী ও তাঁহার নাম উৎকীর্ণ করেন। শত বৎসর পূর্বে নিমাইচরণ যে বিরাট মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন—তাহারই সংস্কার সাধন করেন রামতনু মল্লিকের পুণ্যবতী দানশীলা সহধর্মিণী। নিমাই মল্লিকের নির্মিত কলিকাতার জগন্নাথ ঘাট ও অট্টালিকা ভগ্নাবস্থায় দেখিয়া এই পরদুঃখকাতরা মহিলা পুনর্নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা ১২৫৭ সালের "সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়" সংবাদ-পত্র পাঠ করিলে জানা যায়। অট্টালিকাটি মুমূর্ষু গঙ্গাযাত্রার রোগীদের জন্য নির্মিত হইয়াছিল। রাজা মনোহর রায়ের নির্মিত জগন্নাথের মন্দির জীর্ণ পুরাতন ও ভগ্নদশায় পতিত হইলে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নিমাই মল্লিক পুনর্নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং উহারও শতবর্ষ পরে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পার্বতী দাসী সংস্কার করিয়াছিলেন। 'প্রেমানন্দ-জীবনচরিত' নামক গ্রন্থে (স্বামী ওঙ্কারেশ্বরানন্দ প্রণীত) আছে—

"আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, মাহেশের বসতবাটী, কাষ্ঠনির্মিত রথ, মাহেশ হইতে বল্লভপুর পর্যন্ত রাস্তা তাঁহারই (শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণরাম বসু) অর্থে প্রস্তুত। কৃষ্ণরাম বাবুর প্রপৌত্র হরিবল্লভ বাবুর জীবদ্দশায় কাষ্ঠনির্মিত ঐ রথ দগ্ধ হইয়া যাওয়ায় হরিবল্লভ বাবু উহা নিজব্যয়ে লৌহনির্মিত করাইয়া বংশের কীর্তি রক্ষা করেন। তদবধি ঐ লৌহরথ মাহেশে এখনও চলিতেছে।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে দেখিতে পাই—

"মাহেশ নামেতে গ্রাম গঙ্গাকূলে স্থিতি।
অনেক লোকের বাস নানাবিধ জাতি ॥
এই মহাভাগবত বসু বলরাম।
তাঁর পূর্ব পুরুষদিগের কীর্তিধাম ॥
সুন্দর মন্দিরে জগন্নাথের মুরতি।
ভোগরাগ সহ হয় সেবা নিতি নিতি।
বিশেষে আষাঢ়ে মহাসমারোহ হয়।
বৃহৎ কাঠের রথ উচ্চ অতিশয়।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের পরমভক্ত বলরাম বসুর বংশের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণরাম বাবুর আমল হইতে মাহেশের জগন্নাথমন্দিরের সেবাপূজার প্রভৃতি বিষয়ে একটা সম্বন্ধ প্রচলিত আছে তাহা তাঁহাদের জ্ঞাতিবংশ স্বধর্মনিষ্ঠ ৺কৃষ্ণ বসু ও ৺শ্যামবাবুর নিকট শুনিয়াছি। তাঁহারা প্রতিবর্ষ মাহেশে রথের সময়

উপস্থিত থাকিতেন। ইহাও বিশেষ করিয়া জানি যে সেওড়াফুলির রাজবংশের অনুমতি ব্যতীত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান হয় না। শ্রীযুত সুধীর কুমার মিত্র 'হুগলী জেলার ইতিহাসে' ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিতে 'প্রভুর মাহেশের রথে আগমন' একটি অধ্যায় আছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে এই বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। রামকৃষ্ণ-পুঁথির বর্ণনায় বোঝা যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের রোগের তখন সূত্রপাত হইয়াছে। কথামৃতে ১৮৮৫, ১৪ই জুলাই রথযাত্রা উপলক্ষে বলরাম মন্দিরে রথোৎসবে শ্রীশ্রীঠাকুর দুইদিন ধরিয়া আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত হরিপদবাবুর মুখে মাহেশে রথের সময় ঠাকুরের গমন ও তাঁহার দিব্যভাবের আনুপূর্বিক বর্ণনা শুনিয়াছি—পরে বীরভক্ত গিরিশবাবুর সম্মুখে হরিপদবাবু যে বর্ণনা করিয়াছিলেন—তাহাও শুনিয়াছি। সেই এক বর্ণনা—কোন গরমিল নাই। গিরিশবাবুর বাড়ীতে ৪।৫ দিন হরিপদবাবুর মুখে মাহেশের রথে শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব ভাবের কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। গিরিশবাবুও অতি ভক্তি সহকারে শুনিতেন। আবার বহু পরে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ীতে হরিপদবাবুর মুখে মাহেশে ঠাকুরের গমন ও তাঁর মহাভাবের কথা শুনিয়াছি। বর্ণনা ঠিক একরকম। গিরিশ বলিতেন, "হরিপদ যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য একটুও অতিরঞ্জিত করে নাই বা মিথ্যা বলে নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে হরিপদ যেরূপ খুঁটিনাটি বর্ণনা করে—সেরূপ আর কাহারও কাছে বড় শোনা যায় না। হরিপদ সত্যবাদী—ঠাকুর বা তাঁর অন্তরঙ্গদের কথা আমি তাহার নিকট অনেকবার শুনি। ভক্তির সঙ্গে বড় মধুরভাবে বলে। তার কথায় কখনও সংশয় এনো না। জান—ঠাকুরের সেবা করেছে কাছে থেকে—তাঁর শ্রীপাদপদ্ম নিয়ে ও কত সেবা করেছে।" পুঁথিতে আছে—

> মাহেশে চলিল ভক্ত কয়জন
> কৃষ্ণবর্ণ হরিপদ হরিণ-নয়ন॥
> ফকির ব্রাহ্মণ এক পরম আচারী।
> মূল নাম যজ্ঞেশ্বর নিষ্ঠাবান ভারি।
> ভক্তিমতী "ভক্ত মা" গোলাপ ঠাকুরাণী।
> আর আর ছিল কেবা নাম নাহি জানি॥

কিন্তু মনের ধাঁধাঁ—১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই জুলাই কথামৃতে বলরামমন্দিরে রথোৎসবের কথা আছে—তবে মাহেশের ঘটনা কিরূপে সম্ভব হয়? কিন্তু "লীলাপ্রসঙ্গ" পাঠ করিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। *"লীলাপ্রসঙ্গে"* পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ লিখিতেছেন—"লেখকের এই আনন্দসম্ভোগ জীবনে একবার মাত্রই হইয়াছিল—ঐ বারেই গোপালের মাকে এই বাটীতে (অর্থাৎ বলরামমন্দিরে) ঠাকুরের কথায় আনিতে পাঠান হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে উল্টা রথের কথাই আমরা এখানে বলিতেছি। ঠাকুর এই বৎসর দুইদিন দুইরাত থাকিয়া তৃতীয় দিনে বেলা আটটা নয়টার সময় নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করেন।" এই বর্ণনাটি কথামৃতের ১৪ই জুলাই-এর রথোৎসবের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যায়।

হরিপদবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন: "রথের পূর্বে আমি দক্ষিণেশ্বরে ছিলাম। হঠাৎ ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে বললেন, 'মাহেশে রথে জগন্নাথদর্শনে যাব'। বলার সঙ্গে সঙ্গে তা করা চাই। নৌকা ঠিক করা হইলে আমরা কয়েকজন আর গোলাপ-মা ঠাকুরের সঙ্গে গেলাম। ভাবগম্ভীর অবস্থায় ঠাকুর ছিলেন। আমরা মাহেশের রথের মেলা নিয়ে কত কথা বলছি। ঠাকুরের মুখখানি হাসি হাসি কিন্তু কোন কথাবার্তা নেই। মাহেশে লোকের ভিড় দেখে তাঁকে দোতলায় রাখা হল। বাড়ীটি ত্রিতল; তেতলায় গোলাপ-মা খিচুড়ী রান্না করলেন। কিন্তু ঠাকুর

ভাবমুখে কিছুই খেতে পারলেন না। গলায় বেদনার সূত্রপাত হয়েছে আমরা সবাই মনে করলাম বুঝি তার জন্য খেতে পারছেন না। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি রথ দেখছেন। বলরাম, সুভদ্রা, জগন্নাথ তিন ঠাকুর রথে উঠলেন—শাঁখ কাঁসর ঘণ্টা বাজনা সঙ্গে সঙ্গে বাজতে লাগলো—চারিদিকে হরিধ্বনি। ঠাকুর একেবারে নীচে নেমে ফটকের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভিড় আগলাবার জন্য আমরা সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলাম। রথ টানবার জন্য গৌড়গয়লারা এসে রথের দড়ি ধরেছে—টান পড়বে—যাত্রীরাও দড়ি ধরেছে এমন সময় ঠাকুর আমাদের ঠেলে ছিটকে তীরের মত রথের দিকে ছুটে গেলেন। আমরা পেছনে ছুটে চললাম। এদিকে ঠাকুর একেবারে ভিতরে রথের চাকার কাছে জোড় হাতে জগন্নাথ দর্শন করে চোখের জলে ভাসছেন। আমরা কাছে গিয়েও ভিড় ঠেলে ভিতরে যেতে পারছি না। প্রায় জন পঞ্চাশ গৌড়গোয়ালারা যারা রথ টানে একেবারে ভিতরে ঠাকুরকে ঘিরে দাঁড়াল। রথটানা স্থগিত হল। আমরা নিকটেই দেখছি—ঠাকুর যুক্তকরে বলছেন 'তুঁহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি। জগবাহির নহি মুঞি ছার॥ প্রভু তুমি জগন্নাথ—জগতের নাথ, আমি কি জগৎ ছাড়া।' সে অপূর্ব ভাব! নিমেষ মধ্যে রটে গেল দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস ঠাকুর এসেছেন। তাঁকে দর্শন করতে আবার লোকের ভিড় জমে গেল। ঠাকুর দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ—একেবারে বাহ্যসংজ্ঞা নাই। আমরা তাঁর সঙ্গে এসেছি বলে জনতায় ভিড় ঠেলে গয়লাদের কাছে বললাম। তারা ঠাকুরকে এমন করে ঘিরে রয়েছে যে একটি লোকও তাদের বেষ্টনী ভেজে যেতে পারে না। আমাদের পরিচয় শুনে অতি সন্তর্পণে যেতে দিলে তাঁকে নিয়ে যেতে। চারদিকে 'জয় জগন্নাথ'—'হরিবোল হরিবোল' তুমুল ধ্বনি উঠছে। কিন্তু ঠাকুরকে বাহিরে নিয়ে আসা কঠিন। একে মহাভাবে বাহ্যসংজ্ঞা শূন্য—মুখে আনন্দের হাসি, চক্ষুতে অশ্রুর প্রবাহ, কম্প রোমাঞ্চ আবার স্থাণুর মত স্থির। আবার তাঁকে দেখার জন্য লোকের ভিড়। গোয়ালাদের সাহায্যে কোন রকমে তাঁকে ধরে বাইরে নিয়ে এলাম। চারিদিকে হরিধ্বনি, লোক জমায়েত হতে লাগলো—গৌড়দের সাহায্যে কোন রকমে বাড়ীতে আনা গেল। কিন্তু ঠাকুর দুপা যান টলে টলে চলেন আবার স্থির গম্ভীর ভাবে দাঁড়ান। রথ চলতে আরম্ভ হল—চারিদিকে কাঁসর ঘণ্টা বাজনা বেজে উঠলো—জনতা রথের সঙ্গে চললো স্থানটি নীরব নিঝুম হল কিন্তু আশ্চর্য ঠাকুরের ভাব ভঙ্গ হয় না। সূর্য অস্ত গেলে প্রায় গোধূলির সময় ঠাকুর ধীরে ধীরে সহজ অবস্থায় এলেন। আমরা তাঁকে ধরে ধীরে ধীরে নৌকায় বসালাম। দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসিতে রাত হয়েছিল।" মাহেশের রথে শ্রীরামকৃষ্ণের এই অপূর্ব দিব্যভাব স্মরণ করিলে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কথাই মনে উদয় হয়।

"আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই; অথচ ইহা বেদ, বাইবেল ও কোরানের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। মানবকে শিখাইতে হইবে যে, ধর্মসকল কেবল একত্বরূপ সেই একমাত্র ধর্মেরই বিবিধ প্রকাশ মাত্র, সুতরাং প্রত্যেকেই যাঁহার যেটি সর্বাপেক্ষা উপযোগী তিনি সেইটিকেই বাছিয়া লইতে পারেন।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

জ্যোতির্গময়

শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী

এ যে দুর্গম শংকিল ঘন অরণ্য সুগহন,
এখানে বেঁধেছে হিংস্র শ্বাপদ বাসা—
তবুও তো করি শত সাধনায় জীবনের আবাহন,
পদে পদে লভি অহল্যা সর্বনাশা।
এলে পরমের শত সাধনার বোধন ক্ষণ,
বেদনার বিষধরের চুমায় ঘুমায় মন।

হিংস্র পশুর নখর-দর্পে দেবতা তোমারো ভয় ?
উগারি গরল কুৎসিত তবে রবে ?
কালো কলুষের কালীদহে আজো কালীয় লুকায়ে রয়—
বিষেরই বন্যা ডুবাবে কি আজ সবে ?
যুগ-জঞ্জাল ভোলা মহাকাল নাচের তালে—
শূন্যে শূন্যে উড়াবেনা রচি ঘূর্ণজালে ?

মহাপ্রলয়ের লগ্ন বিলয়ে দগ্ধ বসুন্ধরা—
শ্যামায়িত কর মরু-ভূ পুনর্বার।
শাণিত নখর দন্ত উপাড়ি—দ্বন্দ্ব-কলুষ ভরা
প্রেতপুরী মুছি আঁকো ছবি অমরার।
তমসা দুরিয়া—জ্যোতির্লোক হে জ্যোতির্ময়,
রচি দাও এই আঁধার গুহায়—হে নির্ভয়।

নমোনমঃ

আনোয়ার হোসেন

এসো প্রাণ-নাথ, এসো হে বিধাতঃ
মন-মন্দিরে মম,
জুড়াতে যাতনা পুরাতে বাসনা
এসো এসো, প্রিয়তম !
জীবন জাগায়ে এসো চিরসুন্দর,
হৃদয় রাঙায়ে এসো এসো মনোহর,
চিরভাস্বর রূপেতে তোমার
ঘুচাও মনের তমঃ !
ভুবনমোহন, হৃদিরঞ্জন,
নমোনমঃ নমোনমঃ !

*　　*　　*

তব প্রেম-রসে ওঠে ধরা কল্লোলি,
তব প্রেমালোকে ফোটে ফুল উচ্ছলি,
তব রূপরাগে চরাচর জাগে
জাগে প্রেম মনোরম !
জাগো জাগো মম চিত্তমাঝারে
জাগো ওহে নিরুপম !
তুমি হে অনাদি, অনন্ত, অব্যয়,
তুমি হে সত্য, তুমি শিব চিন্ময় ;—
তোমার জ্যোতিতে অন্তর মম
ফুটাও কমলসম !
চিরবাঞ্ছিত, ওহে অনুপম,
নমোনমঃ নমোনমঃ !

সমর্পণ

অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম্-এ

সব যদি ব্রহ্ম তবে 'সমর্পণ' কথাটির অর্থ কি ? 'এক' তিনিই অনন্ত 'বহু' হয়েছেন। তবে সর্বস্ব তাঁতে সমর্পণ করার উপদেশের সার্থকতা কোথায় ? 'বাসুদেবঃ সর্বম্'……তবে কে আর কাকে সমর্পণ করবে ? ···· সমর্পণ করবার পূর্বেই তো সব চির-সমর্পিত হয়েই আছে ! এই বহুর খেলার সবটুকু তো তাঁর ! নিজের ভালোতেও অহংকার করবার নেই, মন্দেতেও নিরাশ হবার কিছুই নেই (নৈরাশ্যও

একপ্রকার অহংকারই)......তথাকথিত ভাল ও মন্দ সম্পূর্ণভাবে তাঁর ইচ্ছারি খেলা, তিনিই অনন্ত ভাল-মন্দ রূপে মুহূর্তের খেলায় আত্মপ্রকাশ করছেন, তাঁরি রঙ্গমঞ্চে একা তাঁরি অনন্ত অভিনয়...... 'সদসচ্চাহং তৎপরং যৎ'......সৎ, অসৎ এবং দ্বয়ের অতীত সবই তিনি। 'ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া'—এই এক কথাতেই ত তাঁর ইচ্ছার সর্বময় কর্তৃত্ব স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা হয়েছে।

সব যদি তিনিই করছেন, সব যদি তাঁরি আত্ম-প্রকাশ তবে আর আমাকে সর্বস্ব সমর্পণ করার উপদেশ দেওয়ার অর্থ কি হতে পারে? 'সমর্পণ' কথাটিকে আমরা সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহার করি এ সমর্পণ সে অর্থে হতে পারে না, কারণ তাতে তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব এবং স্থূল সূক্ষ্ম সব কিছুতে তাঁরি স্বপ্রকাশের যে তত্ত্ব তাহারি বিরোধিতা করা হয়।

তাই আমার মনে হয় সমর্পণ করার উপদেশের প্রকৃত বক্তব্য একমাত্র এই হতে পারে যে, সব কিছু যে তাঁরি এবং তিনিই, সবই যে তাঁর চরণে চির-সমর্পিত হয়েই আছে, এই সত্য অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্মরণ রাখা, দেখা এবং এই সত্যের পূর্ণ স্বীকৃতিতে চলা,—মনে রাখা এই দেহ তাঁর, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, চিত্ত, অস্মিতা, এই বিশ্ব সবই তাঁর এবং তিনিই—প্রতি ব্যষ্টি এবং সমষ্টি তাঁরই এবং পূর্ণভাবে তিনিই।

এই সত্যের স্মৃতিতে স্বতন্ত্র আমি বা আমার বলতে কিছুই নেই। এই দৃষ্টিতে কাম, ক্রোধ... ... ইত্যাদি কিছুই নেই, সব লয় পেয়ে যায়, কারণ এরা সব স্বাতন্ত্র্য-বোধের সঙ্গেই জড়িত। যাকে কাম বলতাম তাতে যদি তাঁর ইচ্ছাকেই আন্তরিক ভাবে এবং পূর্ণ বিশ্বাসে দেখি, তবে আর কাম থাকে কোথায়, তাঁর ইচ্ছাই তো থাকে! যেটিকে 'সর্প' বলে ভ্রম করেছিলাম সেটিকেই যদি 'রজ্জু' বলে বুঝি, বিশ্বাস করি ও স্মরণ রাখি তবে আর সেটিকেই পুনরায় 'সর্প' বলার অর্থ হয় না। যা স্বতন্ত্র 'আমি'র কল্পিত তাই কাম-ক্রোধাদি রূপ ধারণ করতে পারে। অবিদ্যা-প্রসূত স্বতন্ত্র আমিই যেখানে নেই সেখানে আর কাম-ক্রোধাদি কোথায়? —সেখানে শুধু এক তাঁরি ইচ্ছা রয়েছে।

আমাদের প্রার্থনাও তাঁরি ইচ্ছা। যে অবিদ্যা বা মায়ায় স্বতন্ত্র 'আমি'র কল্পনা আসছে তাও তাঁরি ইচ্ছা। আবার এই অবিদ্যা দূর করে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা তাহাও তাঁরি ইচ্ছা, তিনিই যদি 'সব' তবে ঐ অবিদ্যারূপেও তিনি, আবার জ্ঞানরূপেও তিনিই।

তাই বলি 'সমর্পণ' অর্থ, আমার কিছু তাঁকে দেওয়া নয়; সমর্পণ অর্থ, সব যে তিনিই, সব যে তাঁরি ইচ্ছা, এই সত্যের অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্মরণ ও গ্রহণ। তাই সমর্পণ ও জ্ঞান একই কথা, যে জ্ঞানে সব ব্রহ্মময়!—

'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।'

সত্যের এই অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি আমরা কি করে জাগিয়ে রাখতে পারি? একমাত্র তাঁরি কৃপায়। 'মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ'—তাঁর ইচ্ছাতেই স্মৃতি ও বিস্মৃতি। তাই মিথ্যা অহমিকা এই সত্যের স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখতে পারে না—তাঁর কাছে প্রার্থনা, তাঁর শরণাগতিই সত্যস্মৃতিকে চিরজাগরূক রাখবার উপায়, আর এই সত্য-স্মৃতিই সমর্পণ

'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'।

সমালোচনা

অহল্যা (উপন্যাস)—শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। কথামৃত-ভবন, ১৩।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ২॥•

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন আগন্তুক নন। সাহিত্যিক-সাংবাদিক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে এবং একদা ইনি 'অমৃত শর্মা'র ছদ্মবেশে অনেক অমৃত বিতরণ করেছেন। তবে 'অহল্যা' এঁর উপন্যাসের প্রথম নমুনা। কিন্তু এই প্রথম নমুনাটিই পাঠককে এই প্রশ্নে মুখর ক'রে তুলেছে, "এতোদিন ইনি উপন্যাসে হাত দেননি কেন?" এ প্রশ্নের উত্তর অবশ্য স্বয়ং লেখকের কাছে; তবে 'অহল্যা' লেখকের পরিণত চিন্তার ফসল। আর সেই ভরসাতেই বইটি হাতে পড়া মাত্রই পড়তে বসেছিলাম এবং এক নিশ্বাসেই প'ড়ে ফেলেছিলাম।

যে বই এই বয়সে একাসনে ব'সে প'ড়ে শেষ ক'রে ফেলা যায় তার সম্বন্ধে এক কথায় বলা চলে "বইটি ভালো লাগলো"; কিন্তু 'অহল্যা' সম্বন্ধে এক কথায় মন্তব্য প্রকাশ ক'রে লেখকের পাওনা শোধ ক'রে ফেলা যায় না। 'অহল্যা' এমন একখানি বই যে প'ড়ে "ভালো লাগা"টাই তা'র পক্ষে শেষ কথা নয়।

যদিও আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি ক্ষুদ্রকায় প্রণয়-কাহিনীমাত্র; কিন্তু সেটি হচ্ছে আধার। এই কাহিনীর অন্তঃস্থলে প্রচ্ছন্ন রয়েছে লেখকের একটি গভীর বক্তব্য। সে বক্তব্য মেঘবিদ্যুতের লুকোচুরির মতো স্থানে স্থানে ঝলসে উঠেছে, পাত্রপাত্রীর তীক্ষ্ণ ও বলিষ্ঠ সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে।

আসলে প্রায় সমগ্র গল্পটিই গ্রহণ করতে হচ্ছে পাত্রপাত্রীর সংলাপের মাধ্যমে, কারণ এ গ্রন্থে লেখক আশ্চর্যভাবে নিজেকে রেখেছেন অনুপস্থিত। নিজেকে নেপথ্যে রেখে গল্পকে ব্যক্ত করা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। তবে এই কারণেই 'অহল্যা'র জন্য চাই চিন্তাশীল বুদ্ধিমান পাঠক। কেবলমাত্র গল্প গলাধঃকরণে পটু সাধারণ পাঠক 'অহল্যা'র অন্তর্নিহিত উচ্চ আদর্শ ও আধ্যাত্মিক জীবন-ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে ব'লে মনে হয় না। বোধ করি এই ব্যাখ্যা আর একটু বিস্তৃত হ'লে পাঠক সাধারণের সুবিধা হ'তো।

মানব-সভ্যতার ইতিহাস এই কথাই ঘোষণা করছে, সহস্র উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মানুষ এগিয়েই চলেছে। মাটির মানুষ উঠছে মাটি ছাড়িয়ে। সে প্রতিনিয়ত ভুল করছে, বারে বারে পথভ্রষ্ট হচ্ছে, তবু নিজেকে হারিয়ে ফেলছে না। সত্যের অনুসন্ধানে তার অনন্ত পরিক্রমা।

এই পরিক্রমার কক্ষপথে ক্ষণে ক্ষণে নতুন তথ্যের উদ্‌ঘাটন। গ্রহণ-বর্জনের অবিরাম সংঘর্ষে চেতনার ক্রমবিকাশ। 'অহল্যা'র একটি বিশিষ্ট চরিত্রের মুখ দিয়ে লেখক বলেছেন, "মানুষের মধ্যে দেবতা এসেছেন, আসছেন, আসবেনও।"

লেখকের এই প্রত্যয় পাঠকের উপলব্ধির জগতে পৌঁছে দেওয়াই সাহিত্য-কর্ম! আমরা আশা করবো, অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর চিন্তাশীল মনের এই প্রত্যয় আর বলিষ্ঠ লেখনী নিয়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবিচল উপস্থিতি দান করবেন।

—আশাপূর্ণা দেবী

নিঃসঙ্গ—শ্রীসতীশচন্দ্র দে প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসলিলকুমার দে, ১৩ ডি, ফরডাইস লেন, কলিকাতা-১৪; পৃষ্ঠা—২৫৪; মূল্য ৩৲ টাকা।

একখানি ক্ষুদ্র আত্মচরিত-বর্ণনা। বইখানির ভাষা যেমন সহজ ও সরল তেমনি মধুর লালিত্যময় এবং স্বচ্ছন্দ এর গতি। "নিঃসঙ্গ" শব্দটির ভেতরেই এমন একটি ইঙ্গিত লুকোনো রয়েছে যা একমাত্র

"আত্মচরিত" শব্দের দ্বারা সুপ্রকাশিত হতে পারে না। এর ভেতরে রয়েছে বিশ্বকবির সেই অগ্নিগর্ভ উদ্দীপনাময়ী বাণী,—"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল্ রে!"

বাংলার তথা সমগ্র ভারতের পরাধীনতা থেকে মুক্তিলাভের ব্রতে মরণ-পণ করেছিলেন যে তরুণের দল, লেখক সতীশচন্দ্র তাঁদেরি অন্যতম। এঁরা জীবনপণে এগিয়ে এসেছিলেন মৃত্যু-আহবের পথযাত্রী সবাই একাকী,—সঙ্গীহীন হয়েই। কিন্তু যুদ্ধবন্দী শিবির ঐ ভয়াবহ নিঃসঙ্গ কারাক্ষেত্রে মিলন হয়েছিল, বাংলার ও বিভিন্ন ভারতীয় যুবক শহিদদের শত সহস্রে। সে দিনকার সেই সব নির্ভীক সর্বত্যাগী শহিদদের অশ্রুসিক্ত এবং মৃত্যুপূত কারাকক্ষগুলিই আজ হয়েছে স্বদেশপ্রেমিকের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত। এই সব শহিদের জীবনে, নিঃসঙ্গের ভাষায়, ফুটে উঠেছে যে বীরত্বপূর্ণ স্বদেশপ্রেম, যে অতুলনীয় আত্মত্যাগ, মৃত্যুমুখেও যে স্বদেশকল্যাণের দৃঢ়তা, যে অপূর্ব ঈশ্বরানুরাগ, বিশ্বাস ও নির্ভরতা, আজ তাই সুস্পষ্টভাবে, দুর্গত বাংলার যুব-সমাজের সামনে তুলে ধরবার আবশ্যকতা অনুভূত হচ্ছে—অতি মাত্রায়। সেই হিসেবে "নিঃসঙ্গ" স্কুলের অতিরিক্ত পাঠ্য তালিকায় স্থান পাবার অধিকারী বলেই মনে হয়। নিঃসঙ্গ, একদিকে যেমন লেখকের ও সমসাময়িকদের জীবনালেখ্য, তেমনি ইতিহাসেরও একখানি সুস্পষ্ট প্রামাণ্য পুস্তিকা। শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীসুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বইটি পড়ে লেখককে যে অভিনন্দন জানিয়েছেন সেই চিঠিগুলি প্রারম্ভে সন্নিবদ্ধ হয়েছে।

—স্বামী পূর্ণানন্দ

আত্মদর্শননিবৃতিঃ—শ্রীআত্মানন্দ গুরু প্রণীত। মালয়ল হইতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীরবিবর্মা তাম্পন্ কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত। প্রকাশক—পি গোবিন্দন্ নায়ার, বেদান্ত পাবলিকেশন্স্, সস্ট-মঙ্গলম্, ত্রিবেন্দ্রাম। পৃষ্ঠা—৭৮; মূল্য—অনুল্লিখিত।

আলোচ্য গ্রন্থ 'আত্মদর্শন' এবং 'আত্ম-নিবৃতি' নামক দুইখানা মালয়লম্ ভাষায় রচিত গ্রন্থের সংস্কৃতে অনুবাদ। পূর্বে সংস্কৃতই ভারতীয় পণ্ডিত-গণের দর্শনালোচনার ভাষা ছিল। বর্তমানে সংস্কৃত ভাষা অবহেলিত। হিন্দী রাষ্ট্র ভাষা বলিয়া ভারতীয় লোকসভা কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দীর ভাবপ্রকাশ-ক্ষমতা সংকীর্ণ বলিয়া মৌলিক বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক প্রবন্ধ ইংরেজীতেই লিখিত হয়, ইহার ফলে তাহা ভারতের সর্ব প্রদেশের এবং ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের দৃষ্টিলাভে সক্ষম হয়। বর্তমান গ্রন্থ সহজ সংস্কৃতে রচিত। ইহাতে অবলম্বিত যুক্তিপ্রণালীও সুবোধ্য। সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট ইহা সমাদর লাভ করিবার উপযুক্ত।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য অদ্বৈত বেদান্ত। গ্রন্থের প্রথমেই আছে—"সমুদ্রে তরঙ্গসকল উৎপন্ন হয়, উৎক্ষিপ্ত হয়, পরস্পরের উপর পতিত হয়, পরিশেষে বিস্তীর্ণ হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়। জীবগণ তাদৃশ তরঙ্গদিগের সমানধর্মা!" "অভয়স্থানের অন্বেষণ করিতে করিতে তরঙ্গ যেমন তীর পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রের অভিমুখে গমন করে, তেমনি জীবও বিভিন্ন মার্গে পরমাত্মার অন্বেষণ করে।" "বস্তুতঃ তরঙ্গ যেমন জলমাত্র, তরঙ্গবান্ সমুদ্রও যেমন জলের অতিরিক্ত কিছু নহে, তেমনি জীব ও ঈশ্বরও সচ্চিদানন্দ হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে।" নানা ভাবে এই তত্ত্বই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার বলিয়াছেন, জগতের কারণের অন্বেষণ যুক্তিহীন। প্রপঞ্চের মধ্যে কারণত্ব এবং কার্যত্ব আছে, কিন্তু প্রপঞ্চের কারণ অন্বেষণ অযৌক্তিক। দেশ, কাল, কার্য-ও কারণ-ভাব জগতের মধ্যেই বর্তমান, তাহার বাইরে নাই। কেবল জড়ের নহে,

চেতন জীবেরও কারণান্বেষণ যুক্তিহীন। জীবভাবের উৎপত্তি ও জীবোৎপত্তি একই। জীবভাবের অর্থ জ্ঞাতৃত্বাদিরূপ কর্তৃত্ব। জীবের কারণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা কর্তার স্বরূপ যে কর্তৃত্ব তাহার কারণ অর্থাৎ কর্তা কে তাহাই জানিতে ইচ্ছুক। "স্বয়ং স্ব-স্কন্ধারোহী পুরুষের অন্বেষণ"ও ইহা অপেক্ষা মূঢ়তর নহে।

জড় ও অজড়ের 'সমুদায়'ই জীব। জীবের যে অজড়াংশ আছে তাহা অদৃশ্য। কালাদি জড়পদার্থ সেই অজড়াংশের দৃশ্য। এই দৃশ্যতার অতিরিক্ত তাহাদের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। বরং তাহাদের অস্তিত্বের (দৃশ্যতার অতিরিক্ত অস্তিত্বের) অভাবের প্রমাণ আছে। আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন—

"দ্রষ্টা চ দৃশ্যঞ্চ তথা চ দর্শনম্,
ভ্রমস্ত্ব সর্বত্তব কল্পিতো হি সঃ।
দৃশেশ্চ ভিন্নং ন হি দৃশ্যমীক্ষ্যতে
স্বপন্ প্রবোধেন তথা ন ভিদ্যতে॥"

গ্রন্থকার বলিয়াছেন, বিষয়োন্মুখী যে বোধ তাহাই মন এবং আত্মাভিমুখী বোধ শুদ্ধসত্ত্ব। দৃশ্য ও আত্মা একই "বোধ"বস্তু, এই অনুভূতিকে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার বলে। বোধের সকল বিষয়ই বোধে উত্থিত হয়, তাহাদের তিরোভাবের পরে বোধ বর্তমান থাকে, শূন্য নহে। শব্দাদি বিষয় যৎ-কর্তৃক জ্ঞাত হয়, তিনিই সর্বব্যাপক নিশ্চল কেবলাত্মা। যখন আত্মবুদ্ধি দেহকে ছাড়িয়া আত্মায় স্থাপিত হয়, তখনই বন্ধমুক্তি, তখনই শান্তি-সুখ।

জ্ঞানের যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে "সত্তা" বস্তু বর্তমান। জড়পদার্থের স্বরূপ যে জাড্য, সত্তাই তাহার ভিত্তি। এই সত্তা অ-জড়। কার্যত্ব ও কারণত্বও "সত্তা"র উপর প্রতিষ্ঠিত। এই "সত্তা" স্বতঃসিদ্ধ। কারণের অপেক্ষা ইহার নাই। "তদপূর্বম্ অনপরম্" এই শ্রুতিতে উক্ত "তৎ" শব্দ ব্রহ্ম বুঝাইতে প্রযুক্ত। 'সত্তা' ব্রহ্মেরই নামান্তর। তাহার পূর্বভূত কোনও কারণ, অথবা পরভূত কার্য নাই। যোগবাশিষ্ঠও সৎস্বরূপ ব্রহ্মে কারণত্বাদির নিষেধ করিয়াছেন। এই সত্তায় যে কারণত্বের অনুভব হয়, তাহা আগন্তুক, তাহা উপাধিমাত্র। তাহা সত্তার স্বাভাবিক নহে। কারণত্বরহিত সত্তার মধ্যে যে কারণতার আবির্ভাব হয়, তাহাই কার্য-প্রপঞ্চের আবির্ভাব।

বোধের বিষয়সকল—বোধে যাহাদের প্রতীতি হয় তাহারা বোধ হইতে ভিন্ন নহে, এই তত্ত্ব যখন দৃঢ়মূল হয়, তখন নিদ্রা তাহার তত্ত্বাবরণরূপ বর্জন করিয়া নির্বিকল্প সমাধিতে পরিণত হয়। বিষয়-সকল বোধের অতিরিক্ত নহে, এই অনুভব দৃঢ় হইলে স্বরূপ-স্থিতিলাভ হয়। তাহাতে আর অবস্থা-ভেদ থাকে না।

বোধের অতিরিক্ত কোনও বস্তুর অস্তিত্ব যখন নাই, তখন বোধে ইহাদের উদ্ভব হয় কেন? তাহারা উপাধিমাত্র, কিন্তু এই উপাধি আসে কোথা হইতে? ইহা কি মায়া বা অবিদ্যা-জাত? গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, "যথাবিষয়ং প্রত্যয়াঃ উৎপদ্যন্তে" (বিষয়ের অনুরূপ প্রত্যয় উৎপন্ন হয়) ইহা সত্য নহে, "যথাপ্রত্যয়ং বিষয়াঃ উৎপদ্যন্তে" (প্রত্যয়ের অনুরূপ বিষয়সকল উৎপন্ন হয়) ইহাই সত্য। এই প্রত্যয়সকলের উৎপত্তি হয় কেন? গ্রন্থকার বলেন, আচার্য শঙ্করের মতে মায়া আত্মায় তত্ত্বরূপে অবস্থান করে না, তাহা আগন্তুক উপাধিমাত্র। এই প্রত্যয়সকলের উৎপত্তিই মায়া। বাহ্য প্রপঞ্চ কেবল প্রতীতিমাত্র। এই প্রতীতিই মায়া। ভেদ-বিহীন বোধস্বরূপ সত্তায় এই আগন্তুক মায়ার আবির্ভাবের কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা গ্রন্থে নাই। ব্যাখ্যা হয়তো অসম্ভব, কেননা মায়া অনির্বচনীয়।

বিষয় সাকার, বোধ নিরাকার। নিরাকার বোধে বিষয়ের উৎপত্তিকালে উপাধিবশে বোধ সাকার প্রতীয়মান হয়। এতাদৃশ বোধ (গ্রন্থকার বলেন) ভ্রম। ভ্রমাতিরিক্ত সাকার-বোধের অস্তিত্ব

নাই। সাকার-বোধাতিরিক্ত কোনও ভ্রমও নাই। সকল বিষয়-দৃষ্টিই ভ্রম। নিরাকার বোধে যে সাকার দৃষ্ট হয়, তাহার অতিরিক্ত "দৃশ্য" অন্য কিছুই নাই।

গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা-প্রণালী সুন্দর, বচন-বিন্যাস-প্রণালী সুন্দর। এই গ্রন্থ সুধীগণের সমাদর লাভ করিবে আশা করা যায়।

—শ্রীতারকচন্দ্র রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বাত্যা-, বন্যা- ও ভূমিকম্প - সেবা—তমলুকের সুতাহাটা থানায় বাত্যা-পীড়িতগণের যে সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছিল তাহা মোট ১০৯/।।৮ সের চাউল বিতরণান্তে ১৩ই আগস্ট শেষ হইয়াছে। মিশনের শিলচর শাখাকেন্দ্র বন্যার্তদের জন্য কাটলিচরা এলাকায় ৬১টি নূতন গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। করিমগঞ্জ শাখাকেন্দ্র 'টেস্ট-রিলিফ' চালাইয়া যাইতেছেন। দক্ষিণ ভারতে মিশন রামনাদ ও তাঞ্জোর জেলায় বাত্যা-পীড়িতগণের জন্য যে সেবাকার্য ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরে আরম্ভ করেন তাহা এখনও শেষ হয় নাই। গৃহহীনগণের পুনর্বসতির কাজ চলিতেছে। কচ্ছের সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে গৃহহারাগণের জন্য অঞ্জার শহরে মিশন সেবাকার্য চালাইতেছেন। এ পর্যন্ত ৬০টি পরিবারকে নূতন গৃহ তৈরী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মিশনের শিলং শাখাকেন্দ্র আসামের নওগাঁ জেলায় হোজাই এলাকায় বন্যাসেবা-কার্য আরম্ভ করিয়াছেন।

কলম্বো শাখাকেন্দ্রে বুদ্ধজয়ন্তী—ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ২৫০০তম জয়ন্তী কলম্বো শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ২৩শে হইতে ২৭শে মে (১৯৫৬) সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সিংহলের প্রধান মন্ত্রী প্রথম দিন এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। পরবর্তী চারদিনের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে সিংহল সুপ্রীম কোর্টের জনৈক ভূতপূর্ব বিচারপতি, সিংহলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সিংহলস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনার এবং সিংহলের ব্রহ্মদেশীয় রাষ্ট্রদূত। দিল্লী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ পাঁচ দিনই এই সম্মেলনগুলিতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সিংহল সরকার কর্তৃক স্থানীয় ইন্‌ডিপেণ্ডেন্স্ হলে আয়োজিত একটি বৃহৎ সভাতেও মিশনের পক্ষ হইতে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ভগবান তথাগতের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে সর্বজনহৃদয়স্পর্শী একটি ভাষণ দান করিয়াছিলেন। এই সভায় সিংহলের প্রধান মন্ত্রী এবং বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্ট্‌স্ হোম—ঠিকানা: পোঃ বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা); ফোন—পানিহাটি, ২৪৪। এই প্রতিষ্ঠানের সপ্তত্রিংশ বার্ষিক (১৯৫৫) কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কলেজের ছাত্রগণকে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বলাভের সহায়তা দিবার জন্য ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের আদর্শে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। দরিদ্র মেধাবী ছাত্রগণের সমস্ত খরচ আশ্রমই বহন করেন। আশ্রমের শিক্ষার সুযোগ লইতে ইচ্ছুক কতিপয় ছাত্র নিজের খরচ দিয়া থাকিতে পারে। আলোচ্য বর্ষের শেষে মোট ৬৯টি বিদ্যার্থীর মধ্যে ৩৮ জন ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক; ১১ জন ছাত্র আংশিক খরচে এবং ২০ জন সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়া ছিল। প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় সমবেত ছাত্রেরা আশ্রমের উপাসনা-মন্দিরে প্রার্থনা করে। সন্ন্যাসি-অভিভাবকগণ তাহাদিগকে লইয়া নিয়মিত গীতা ও উপনিষদ্ পাঠ এবং ধর্মীয় ও সমাজ-নীতি-

বিষয়ক আলোচনা-ক্লাস নির্বাহ করেন। ছাত্রেরা আশ্রমে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি এবং মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজীর জন্মদিনও সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করে। এতদ্ব্যতীত স্বাধীনতা- ও প্রজাতন্ত্র দিবস, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও সরস্বতীপূজাও মনোরম-ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। নববর্ষ ও বিজয়া-সম্মেলনে বহু প্রাক্তন বিদ্যার্থীর সহিত আশ্রমবাসিগণের মিলন একটি আনন্দপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহাতে বর্তমান বিদ্যার্থিগণ প্রাক্তনদের সহিত মিশিবার সুযোগ পায়। ভানু দাশগুপ্ত স্মৃতি-তহবিল হইতে কলিকাতা ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন কলেজের ৩৫টি দরিদ্র ছাত্রকে পরীক্ষা-ফির সাহায্য হিসাবে ৪৮৫৲ টাকা এবং কৃষ্ণচন্দ্র মেমোরিয়াল ফাণ্ড হইতে ৯০৲ টাকা তিনজন ইন্‌টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থীর ফি বাবদ দেওয়া হয়। আশ্রম-লাইব্রেরীর ১৮৫০ খানি সুনির্বাচিত পুস্তকের মধ্যে ছাত্রেরা ৪৪১ খানি পড়িবার জন্য লইয়াছিল এবং পাঠ্য পুস্তক হিসাবে তাহাদিগকে পড়িতে দেওয়া হয় ৫০৬ খানি গ্রন্থ।

সমসাময়িক ঘটনাবলী ও পরিস্থিতির জ্ঞান রাখার জন্য ৫টি প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকা এবং ১৩টি সাময়িকী বিদ্যার্থিদিগকে নিয়মিতভাবে দেওয়া হইয়াছে। খ্যাতনামা পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতিগণের মাসিক বক্তৃতাবলীও তাহাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে। আশ্রমে একটি ব্যায়ামাগার এবং দুইটি খেলাধূলার মাঠ আছে। একটি দীর্ঘ ঝিল, এবং বৃহৎ পুষ্করিণীতে বিদ্যার্থিগণ সন্তরণ অভ্যাস করে। আশ্রমে জাতিভেদের কোন প্রশ্নই নাই, অবৈতনিক ও বৈতনিক ছাত্রের মধ্যেও কোন ব্যবধান কেহ বুঝিতে পারে না। আলোচ্য বর্ষে বিদ্যার্থিআশ্রমের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-ফল যথা :—বি-এস্-সি পরীক্ষার্থী ৪ জনের মধ্যে ১ জন প্রথম শ্রেণীর ও ২ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ ৪ জনই উত্তীর্ণ। বি-এ পরীক্ষার্থী ২ জনের ১ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স লাভ করিয়াছে। ১৫ জন আই-এস্-সি পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ১৩টি ছাত্র পাশ করে; ৯টি প্রথম বিভাগে (১টি সরকারী বৃত্তিসহ)। আই-এ পরীক্ষার্থী একজন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নব প্রকাশিত পুস্তক

Thus Spake The Buddha—Compiled by Swami Suddhasatwananda, Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras-4. Pocket size ; pages—100 ; Price—Six annas. ভগবান বুদ্ধের সুনির্বাচিত বাণীসংগ্রহ। অগাধ বৌদ্ধ-শাস্ত্র হইতে তথাগতের নিজমুখ-কথিত কতকগুলি শ্রেষ্ঠ উপদেশ বিভিন্ন বিষয় বিভাগ করিয়া এই পুস্তিকায় সঙ্কলিত হইয়াছে। বুদ্ধ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের কতকগুলি উক্তিও একটি অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট। ভগবান বুদ্ধের প্রাণস্পর্শী বাণী এত সংক্ষেপে এবং এমন সুন্দরভাবে সাজাইয়া সঙ্কলয়িতা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

উদ্বোধন

মহাদৃষ্টি

স্বল্পেয়ং মঠিকা ব্রাহ্মী জগন্নাম্নী সুসঙ্কটা।
গজো বিল্ব ইব স্বাঙ্গে ন মাতি বিপুলং বপুঃ॥

বিরিঞ্চিভবনাৎ পারে তত্ত্বান্তেপ্যাহরৎ পদম্।
প্রসরত্যেব মে রূপমদ্যাপি ন নিবর্ততে॥

ক্বেয়ং কিল মহাদৃষ্টির্ভরিতা ব্রহ্মবৃংহিতা।
ক্ব সরীসৃপভীমাশা ভীমা রাজ্যবিভূতিভিঃ॥

অনন্তানন্দসম্ভোগা পরোপশমশালিনী।
শুদ্ধেয়ং চিন্ময়ী দৃষ্টির্জয়ত্যখিলদৃষ্টিষু॥

—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, উপশমপ্রকরণ, ৩৪।৬২-৬৩, ৬৭-৬৮

আত্মসত্যকে যখন চিনি নাই তখন এই ব্রহ্মাণ্ড-সংস্থানকে মনে হইত কী বৃহৎ! আজ নিজের চৈতন্যসত্তাকে আবিষ্কার করিয়া দেখিতেছি যে উহার তুলনায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একান্তই ক্ষুদ্র, চরাচর অখিল জগৎ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। একটি বিল্বফলের মধ্যে যেমন হস্তীর স্থান হয় না, তেমনই জগৎ নামক সীমাবদ্ধ আধারটি আমার সীমাহীন বিপুল স্বরূপকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

বিরিঞ্চি-নিকেতন বা ব্রহ্মলোকেরও পারে এবং সাংখ্য-বৈষ্ণবাদিতন্ত্রপ্রসিদ্ধ অথবা শৈব-পাশুপত প্রভৃতি আগমনির্দিষ্ট তত্ত্বসমূহকে অতিক্রম করিয়া আমার 'ভূমা' স্বরূপ প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে, অদ্যাপি তাহার প্রত্যাবর্তন ঘটে নাই। কে উহার ইয়ত্তা করিবে, কিসে উহার সীমা টানা যাইবে?

কোথায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনিত এই পরিপূর্ণ মহাদৃষ্টি, আর কোথায় সর্পের ন্যায় ক্রূর, দুরন্ত আশাসমূহে বেষ্টিত ভয়াবহ সংসার-বিভব!

জগৎ ও জীবনকে আত্মজ্ঞানহীন নরনারী কত দৃষ্টিতেই দেখে, কিন্তু কোন দৃষ্টিই নির্মল নয়, নির্ভয় নয়, পরমসুখাবহ নয়। আত্মোপলব্ধির উপর যে দৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত সেই বিশুদ্ধা চিন্ময়ী মহাদৃষ্টিই মানুষকে অনন্ত আনন্দসম্ভোগের অধিকারী করে, পরাশান্তি দানে ধন্য করে। উহাই সকল দৃষ্টির শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি।

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং হিতৈষী বন্ধুবর্গকে আমরা ৺বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রতীকার কি?

কাশীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও মনীষী ডক্টর শ্রীভগবান দাস 'প্রতীকার কি?'—এই নামে কলিকাতার 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় একটি খোলা চিঠি প্রকাশ করিয়াছেন (চিঠির তারিখ—২২-৯-৫৬)। একটি আমেরিকান পুস্তকের ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ লইয়া সম্প্রতি দেশের নানাস্থানে যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও গোলমালের পরিচয় পাওয়া গেল উহার প্রতীকার কি—ইহাই তাঁহার প্রশ্ন। এই প্রবীণ চিন্তানায়কের মতে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে আরবদেশীয় মুসলমানগণের ভারতের পশ্চিম উপকূলে সিন্ধুরাজ্যের রাজা দাহিরের বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীদের ষড়যন্ত্রের সহায়তা লইয়া বর্তমান করাচীর চতুষ্পার্শ্বে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সময় হইতেই এই সাম্প্রদায়িকতার সূত্রপাত। তাহার পর আজ ১২০০ বৎসর ধরিয়া হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক যুদ্ধ লাগিয়াই রহিয়াছে। সমাজ-দেহে এই বিদ্বেষ গভীর হইতে গভীরতর শিকড় গাড়িয়া চলিয়াছে। ব্রিটিশ আমলে শাসকবর্গের 'ভেদনীতি'র ফলে বিদ্বেষ বিষ আরও বেশী করিয়া সংক্রামিত হয়। উহার চূড়ান্ত ফল ভারত-বিভাগ ও ভারতের দুই প্রান্তে দুটি পাকিস্তান-সৃষ্টি। আশা করা গিয়াছিল দেশ বিভাগের পর শান্তি আসিবে। কিন্তু কই, আদৌ তো তাহা হইল না। বিদ্বেষের কারণ যে রহিয়া গিয়াছে, কারণ দূরীভূত না হইলে কার্য তিরোহিত হইবে কিরূপে? দ্বাদশ শতাব্দীর কলহের ফলে পারস্পরিক অপ্রীতি, অবিশ্বাস, ভয় এবং ঘৃণা কদাকাররূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের সকল মুসলমানের পাকিস্তানে চলিয়া যাওয়া সম্ভবপর নয়, তাঁহাদের প্রায় চার কোটি হিন্দুস্থানে রহিয়া গিয়াছেন এবং হিন্দুদের পাশাপাশি বাস করিতেছেন। কিন্তু মানসিক ব্যাধি অর্থাৎ পারস্পরিক বিদ্বেষের আগুন ধিকিধিকি করিয়া নীচে জ্বলিতেছেই, সামান্য সুযোগেই উহা যখন তখন উপরে লেলিহান শিখায় আত্মপ্রকাশ করে।

মনীষী ডক্টর ভগবান দাস প্রশ্ন তুলিয়াছেন, এই ব্যাধির স্থায়ী প্রতীকার কি? তাঁহার উত্তর—ব্যাধি অর্থাৎ পারস্পরিক বিদ্বেষ যখন মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) তখন প্রতীকারও মনস্তাত্ত্বিক হওয়া উচিত অর্থাৎ পারস্পরিক প্রীতি। অপ্রীতির স্থানে প্রীতি আসিবে কিরূপে? একটি মাত্র পথ আছে। মুসলমান এবং হিন্দু উভয়ের কাছেই প্রমাণ করিয়া দিতে হইবে যে উভয় ধর্মের মূল তত্ত্ব এক। মোল্লা এবং পণ্ডিতগণ অবশ্য কখনই এই কাজে রাজী হইবেন না বরং জোর গলায় এই ধরনের চেষ্টার নিন্দা করিতে থাকিবেন। কিন্তু ডক্টর ভগবানদাসের মতে, প্রজাকল্যাণকামী এবং দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক গভর্ণমেণ্টের ইহা অবশ্যকর্তব্য। ভগবানদাসজী একটি সহজ উপায় নির্দেশ করিতেছেন: হিন্দী এবং উর্দু অনেকগুলি (ধর্মসংক্রান্ত) শব্দের প্রতিশব্দ রচনা করা হউক এবং ভারতের প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীগণের উহা আবশ্যিক শিক্ষার বিষয় করা হউক (স্কুলের নিম্নশ্রেণীয়গণের জন্য ৭৫ জোড়া শব্দ, উচ্চশ্রেণীয়গণের জন্য ২০০ এবং কলেজের জন্য ৫০০ জোড়া এইরূপ শব্দ)। আমাদের রাষ্ট্র 'লৌকিক' বলিয়া ঘোষিত হইলেও এই বিষয়টির জ্ঞান তথ্যহিসাবে ছাত্রছাত্রীগণকে দিতে কোন বাধা নাই। শুধু 'জানিয়া রাখিতে' বলা হইবে, 'বিশ্বাস করিতে' নয়।

ডক্টর ভগবানদাস এইরূপ শব্দযুগলের কতকগুলি নমুনা দিয়াছেন।

হিন্দী	উর্দু	ইংরেজী
ওম্	আমিন	Amen
দেব, ঈশ্বর	আল্লা	God
মহা, পরম	আকবর	Greatest
পরম-ঈশ্বর, মহা-দেব	আল্লা হো আকবর	
ব্রহ্মা	আল্ বাদি, আল্ খালিক্	Creator
বিষ্ণু	আল্ রাব্	
	আল্ মুহেমিন্	Preserver
রুদ্র	আল্ মুমিত.	God of Death, Destroyer
সরস্বতী	আল্ আলিম্	Goddess of Learning, Science, Wisdom
লক্ষ্মী	আল্ মালিক	Goddess of Wealth and Splendour
গৌরী	আল্ জামিল্	Goddess of Beauty, 'Jamal'.
দুর্গা	আল্ কাহার	Goddess of Punishment
শক্তি	আল্ জালিল্	Goddess of Compelling Might and Majesty
অন্নপূর্ণা	আর্ রাজ্জাক্	Giver of food.
শিব	আর রহিম্	The Auspicious, Merciful, Benevolent God of 'rahm', mercy
শঙ্কর	আল্ মুজিল্	The actively Beneficent
শান্তি	সলম্	Peace
ঈশ্বরপ্রণিধান	ইস্লাম	Submission to God

ডক্টর ভগবানদাসের মতে এইরূপ শত শত শব্দের তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তিনি বিশ্বাস করেন যে বালক-বালিকা এবং তরুণ-তরুণীগণের মনে এই সামর্থবোধক শব্দগুলির জ্ঞান বসাইয়া দিতে পারিলে তাহাদের উত্তরজীবনে ধর্মীয় বিবাদের নিবৃত্তির অনেকটা সহায়তা হইবে।

হিন্দুমুসলমানের সম্প্রীতি যে পারস্পরিক একটা মনস্তাত্ত্বিক বোঝাপড়ার উপর নির্ভর করে তাহাতে সন্দেহ নাই। ডক্টর ভগবানদাসের বাস্তব পথনির্দেশ সরকারের দৃষ্টিতে পড়া বাঞ্ছনীয়। তিনি তাঁহার চিঠির শেষে বলিয়াছেন—"ধর্মীয় ঘৃণা উপশমিত করিবার জন্য এই প্রতীকার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। * * কার্যকরী না হইলেও কোন ক্ষতি তো হইবার আশঙ্কা নাই।" খাঁটি কথা। তবে ডক্টর ভগবানদাস গত দ্বাদশ শতাব্দী ধরিয়া হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট অতিরঞ্জিত মনে হইল। হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরকে যে আদৌ কখনও বুঝে নাই এবং উভয়ের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ কখনও স্থাপিত হয় নাই তাহা মোটেই বলা চলে না। মুসলমান রাজত্বের সময়, বিশেষতঃ মোগল সম্রাট আকবরের শাসনকালে, হিন্দুমুসলমানের সম্পর্ক এখনকার অপেক্ষা যে অনেক ক্ষেত্রে বহুতর সদ্ভাব-পূর্ণ ছিল ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্য আছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গ্রামে গ্রামে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি সুখদুঃখের সাথী হইয়া আত্মীয়ের মতো বাস করিয়াছে। বাংলা দেশের কথা আমরা বিশেষ করিয়া জানি। বাংলার গ্রামে মুসলমানরা হিন্দুর উৎসবে যোগ দিয়াছে, হিন্দুরা মুসলমানদের উৎসবে। বাংলার লোকসঙ্গীতে হিন্দু

মুসলমানের সম্প্রীতি, এমনকি ধর্মীয় সামঞ্জস্যেরও বহুতর প্রমাণ পাওয়া যায়।

হিন্দুমুসলমানের পারস্পরিক উৎকট বিদ্বেষের ইতিহাস আমাদের বিচারে পঞ্চাশ বৎসরের অধিক নয়—ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রগতির পর হইতে। রাজনৈতিক দিক দিয়া এই সমস্যার সমাধানের নানা চেষ্টা হইয়াছে, এখনও হইতেছে। কিন্তু এই পথে সমাধান হইবার নয়। হৃদয়ের মিলনের দিকেই বেশী চেষ্টা করিতে হইবে।

আমাদের ইহাও মনে হয় যে, মুসলমানসমাজের মধ্যে যাঁহারা উদার এবং ভারতীয় জাতির বৃহৎ কল্যাণে বিশ্বাসী তাঁহাদের এই দিকে একটি বিরাট দায়িত্ব আছে। হিন্দুদের পক্ষে সাম্প্রদায়িক সমন্বয় খুব কঠিন কথা নয়, কেননা ধর্মসাধনার অসংখ্য পথ থাকিলেও লক্ষ্য যে সকলেরই এক এই বিশ্বাস হিন্দুর একটি সহজাত সংস্কার। মুসলমান জনগণকে পরধর্মসহিষ্ণুতা একটু কষ্ট করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। না দিলে তাঁহাদের নিজদেরই কল্যাণ ব্যাহত হইবে, সন্দেহ নাই।

সুপ্ত বিবেক

জার্মান দার্শনিক মহামনীষী কাণ্ট বলিয়াছিলেন, মানুষের নৈতিক বিবেক একটি সার্বজনীন অবশ্যম্ভাবী স্বতঃসিদ্ধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক বুদ্ধিবিচারসম্পন্ন প্রাণী (যেমন মানুষ) ঐ সত্যকে নিজের অন্তঃকরণে 'ইহা তোমার কর্তব্য'—এই একটি অভ্রান্ত আদেশ (Categorical Imperative) রূপে অনুভব করিতে বাধ্য। ঐ আদেশ অপরিবর্তনীয়, অপ্রত্যাখ্যেয়, নিঃসন্দিগ্ধ। মানুষ যতদিন মানুষ ততদিন স্বকীয় বিবেকের স্বতঃস্ফূর্ত নির্দেশ তাহার কানে বাজিবেই। মানব-প্রকৃতির এই বিশ্বজনীন অনতিক্রমণীয় নৈতিকবোধের উপর অটল আস্থা রাখিয়া কাণ্ট তাঁহার আস্তিক্য-দর্শন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

কাণ্টের চিন্তাধারা ভারতীয় ধর্মদৃষ্টির পূর্ণ সমর্থন লাভ করে, যদিও নৈতিকতার ভিত্তি সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিদের দিগ্‌দর্শন আরও ব্যাপক এবং গভীর। বেদান্ত বলেন, নৈতিকবোধের স্বতঃসিদ্ধতার পশ্চাতে রহিয়াছে মানুষের আত্মস্বরূপ। চিরশুদ্ধ, চিরবুদ্ধ, নিত্যানন্দ আত্মা আছেন বলিয়াই মানুষের অন্তঃকরণে শুভেচ্ছা (কাণ্টের good will) উঠে, ঐ শুভেচ্ছাকে সে কল্যাণকর কার্যে রূপায়িত করে।

সে যাহা হউক, ভারতীয় ঋষিরাই বলুন অথবা কাণ্টপ্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষিগণই বলুন, নৈতিক বিবেক আজ আর অপরিবর্তনীয় স্বতঃসিদ্ধ 'আদেশ' বলিয়া সম্মানিত নয়। আজ আর মানুষ সেই 'আদেশে'র অপেক্ষা রাখিয়া কাজ করিতে চায় না—কাজ করা নির্বুদ্ধিতা মনে করে। মানুষ আজ তাহার অন্তরে অহরহ অপর এক আদেশ (Imperative) শুনিতে পাইয়াছে, উহাই তাহার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা-ব্যাপৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ঐ 'আদেশ' হইল মানুষের স্বার্থবুদ্ধির আদেশ। বিবেক আজ লজ্জা পাইয়া ঘুমাইতেছে।

সুপ্ত বিবেকের উদাহরণ খুঁজিতে আজ আর অন্ধকারে আনাচে কানাচে টর্চ বাতি ফেলিয়া ঘুরিতে হয় না। প্রকাশ্য দিবালোকে—রাজপথে, হাটে বাজারে, আফিসে আদালতে, পবিত্র বিদ্যায়তনে, পবিত্রতর ধর্মাধিকরণে, গৃহে, পরিবারে, সমাজে—সর্বত্র আজ মানুষের বিবেক নিদ্রিত। বড় দুঃখে শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু রাখিয়া ঢাকিয়া দুটি উদাহরণ তাঁহার Decline of Decency নামক সাম্প্রতিক প্রবন্ধে (Free Lance পত্রিকায় প্রকাশিত) উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রখ্যাত একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর'। বিপুল তাঁহার বৈদগ্ধ্য ও গবেষণাকীর্তি; বিদ্যার্থী-বিদ্যার্থিনী শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁহার নামে রোমাঞ্চ অনুভব করেন। ইনি—হাঁ ইনিই কিছু পার্থিব রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে কাণ্টের অপার্থিব 'ইম্‌পারেটিভ'কে

বিক্রয় করিয়াছেন। যে দরিদ্র লেখকটি ডক্টরের নামে প্রকাশিত পুস্তকটি লিখিয়া দিয়াছেন তিনি বইএর সমগ্র শর্তের মূল্য হিসাবে পাইয়াছেন দুই শত টাকা। ডক্টর শুধু তাঁহার নামটি দিয়া প্রতি সংস্করণে প্রকাশকের নিকট এক হাজার টাকা পাইবেন। ডক্টর মহোদয়ের টাকার অভাব নাই, পোষ্যসংখ্যাও খুব কম। তবুও বিবেককে ঘুম না পাড়াইয়া তাঁহার চলিল না!

একটি বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, শিক্ষকগণের চেহারা ও বেশভূষাতেই তাঁহাদের স্বল্প-উপার্জনের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী একজন বিত্তবান ব্যক্তি। চমকদার পরিচ্ছদ পরিয়া, আঙ্গুলে গোটাকয়েক আংটি পরিয়া অনুষ্ঠানের, তথা শিক্ষক ও বিদ্যার্থিগণের অভিভাবকত্ব করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃতি :—

"আপনারা শিক্ষক, বলিতে গেলে—যীশুখ্রীষ্টের ভাষায় 'পৃথিবীর লবণ'। লবণ যদি খারাপ হইয়া যায় তাহা হইলে ভোজন এবং তজ্জনিত পুষ্টি হইবে কি করিয়া? আপনাদের আদর্শ যদি অক্ষুণ্ণ না থাকে তাহা হইলে মানুষ গড়িয়া উঠিবে কোন্ শক্তিতে? আপনাদের কাজ অতি মহান্; আমার বলিতে ইচ্ছা হয়, উহা একটি ব্রত-বিশেষ। আমাদের বড় আদরের মাতৃভূমির ভবিষ্যৎ নাগরিকগণকে শিক্ষাদান কাজে আপনারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। দেশের ভবিষ্যতের অনেকটা তো আপনাদের কাঁধেই ন্যস্ত। (এইখানে বক্তার গলা শুকাইয়া আসিয়াছিল, সম্ভবতঃ বিশেষ কোন পানীয়ের এক চুমুকের জন্য)। ত্যাগ, ত্যাগ—ত্যাগই হইল আপনাদের আদর্শ। বিলাসিতা এবং আরামও বর্জন করিয়া আপনারা ভারতের সনাতন 'সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তা'র আদর্শে ছাত্রগণকে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন। আপনারা জাতির জনক আমাদের সর্বজন অতিপ্রিয় বাপুজীর পদচিহ্ন ধরিয়া চলিতেছেন..."

আরও কিছু এইরূপ বাগ্মী উদ্দীপনা পরিবেশন করিয়া সেক্রেটারী মহোদয় শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে ক্ষমা চাহিলেন—তাঁহাকে স্যর অমুকচন্দ্র অমুকের আলয়ে একটি বিশেষ ভোজে যোগ দিতে যাইতে হইবে—আর থাকিতে পারেন না। যেরূপ আভিজাত্য ও আড়ম্বর সহ সভায় ঢুকিয়াছিলেন সেইরূপই ভঙ্গীতে বাহির হইয়া গেলেন। প্রবন্ধলেখক অজিতবাবু অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, জীবনসংগ্রামে জর্জরিত দুঃস্থ দরিদ্র শিক্ষকগণের নিকট ঐরূপ আভিজাত্যিক ধনী যে ঐশ্বর্য-বিভব এবং ভণ্ডামি দেখাইয়া গেলেন বিবেকবুদ্ধি কতটা ঘুমাইয়া পড়িলে ঐরূপ নির্লজ্জতা সম্ভবপর!

সর্বজননিন্দিত অন্যায় ও পাপকার্য যাহারা করে তাহাদের বিবেক যে নিদ্রিত তাহা সকলেই জানে। সমাজ এক কথায় তাহাদের বিচার ঘোষণা করিতে পারে। তাহাদের নিন্দিত কার্য দ্বারা তাহারা নিজেরা কলঙ্কিত হয় এবং নিজের পরিবারবর্গকেও কমবেশী লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। কিন্তু এই পর্যন্তই। 'দাগী' বলিয়া তাহাদিগকে সজ্জনেরা পরিহার করিয়া চলেন। এই ব্যক্তিগণের সুপ্ত বিবেক বৃহৎ সমাজের ভারসাম্যকে আন্দোলিত করিতে পারে না। কিন্তু ঐ ডক্টরের এবং সেক্রেটারীর দল? পাণ্ডিত্য, যশ, আভিজাত্য এবং সমাজ-প্রতিপত্তির আবরণে তাঁহাদের বিবেক-নিদ্রা সমাজদেহে মারাত্মক ব্যাধি সংক্রামিত করিতে বাধ্য। স্কুলের ছেলেমেয়েরাও আজ খবরের কাগজে দেখিতে পায় কোন বিশিষ্ট রাজকর্মচারী, অধ্যাপক বা নেতার বিবেক-বিগর্হিত অপকীর্তির তথ্যসম্বলিত বিবরণ—জাতীয় কাজে নির্দিষ্ট তহবিলের তছরুপ, উৎকোচ গ্রহণ করিয়া জাতীয় স্বার্থের বলিদান, ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সত্য ও ন্যায়ের বিসর্জন ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাঁহাদের বিবেক-বোধের উপর শত সহস্র নরনারীর কল্যাণ নির্ভর করিতেছে তাঁহাদের বিবেকের এই ক্রমবর্ধমান সুপ্তি দেখিয়া বুড়া কাণ্ট আর এদেশের 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'-বাণীর প্রণেতা ভারতের পুরাতন ঋষিরা পৃথিবীর পরপারে বসিয়া স্বরচিত গ্রন্থগুলির উপর আস্থা হারাইতেছেন কি?

ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ

আষাঢ় মাসের ‘প্রবর্তক’ মাসিক পত্রিকায় শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে ভুল ধারণা’—এই শিরোনামায় একটি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ সুচিন্তিত আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের মতে ‘ব্রাহ্ম’ কোন জাতি বা সম্প্রদায় নহে। ‘ব্রাহ্মত্ব’ জন্মের ফলে লাভ করা যায় না, কিন্তু শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা অর্জন করিতে হয়।

"ব্রাহ্মবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—ব্রাহ্ম-পিতামাতার সন্তান, অথচ অব্রাহ্ম এরূপ ব্যক্তি বিরল নহেন। * * * ব্রাহ্মধর্ম জীবনে পালন না করিয়া ‘আমি ব্রাহ্ম’ মাত্র এই দাবীর দ্বারা কেহ ব্রাহ্ম হইতে পারে না।"

ক্ষেমেনবাবু বলিতেছেন, অসাম্প্রদায়িক সত্য-ধর্মেরই সংক্ষিপ্ত নাম হইল ব্রাহ্মধর্ম।

"এই ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষা দিবার জন্যই উপনিষদের উৎপত্তি, বাইবেলের উৎপত্তি, কোরাণের উৎপত্তি, যাবতীয় ধর্মশাস্ত্রের উৎপত্তি। যুগে যুগে, দেশে দেশে অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্মের যে সমস্ত বাণী পাওয়া যায়, যে সমস্ত সত্য আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ—উপনিষদ্ যাহাকে বলেন ‘একাত্মপ্রত্যয়সারং’ আত্মপ্রত্যয়ই প্রমাণ, সেই সমস্ত বাণী ও সত্যকে যে নামেতেই অভিহিত করা হউক না কেন, সেই সমস্তই হইল ব্রাহ্মধর্ম ও সেই সমস্তই হইল ব্রাহ্ম-ধর্মের বাণী ও সত্য। * * * ব্রাহ্মধর্মকে সংক্ষেপে বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় যে, সমস্ত ধর্মের মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট, সমস্ত ধর্মের মধ্যে যাহা সার, তাহাকেই ব্রাহ্মধর্ম বলে।"

লেখকের মতে ব্রাহ্মধর্ম অন্ধভাবে কোন একটি মতবাদ অনুসরণ করিতে বলে না, যুক্তিদ্বারা বিচার-পূর্বক সত্যকে গ্রহণ করিবার উপদেশ দেয়। "অন্ধের মত গ্রহণ করিলে তাহা স্থায়ী হইবে না, ফুৎকার মাত্রই উড়িয়া যাইবে।" ব্রাহ্মধর্ম গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়েরই ধর্ম। সংসারে থাকিয়া ব্রাহ্ম-ধর্মপরায়ণ গৃহী কিভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবেন তাহার নির্ণায়করূপে ক্ষেমেন্দ্রবাবু দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

(১) প্রাতঃপ্রভৃত্য সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্

"প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্যন্ত, আমি যাহা কিছু করি, হে জগজ্জননি, তাহা তোমারই পূজা।"

(২) তুলসী অ্যায়সা ধ্যান ধর্ জ্যায়সা বিয়ানকা গাই।
মুখে তৃণ চনা টুটে অওর চেৎ রাখয়ে বাদই॥

"হে তুলসী, নবপ্রসূতা গাভী যেমন মুখে ঘাস ও ছোলা খায় কিন্তু তাহার সমস্ত মন যেমন বাছুরের দিকে পড়িয়া থাকে সেইরূপ তোমার মন সংসারের সব কর্মের ভিতর যেন ভগবানের ধ্যানে নিযুক্ত থাকে।"

লেখক রাজর্ষি জনক এবং রাণী অহল্যাবাঈএর জীবনী হইতে দুটি শিক্ষাপ্রদ উপাখ্যান উদাহৃত করিয়াছেন। ইঁহারা সংসারে থাকিয়া যথার্থ ভগবদ্ভক্ত ‘ব্রাহ্ম’ ছিলেন। লেখকের মতে উপাস্যের নাম লইয়া কলহ করা ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ নয়।

"তুমি তোমার উপাস্যকে পরব্রহ্ম নাম দিতে পার, ভগবান নাম দিতে পার, বিষ্ণু নাম দিতে পার বা অন্য যে কোনও নাম তোমার হৃদয়গ্রাহী মনে হয় দিতে পার—তাহাতে ব্রাহ্মধর্মের বিধানও নাই, নিষেধও নাই। নামের উপরে ব্রাহ্মধর্ম নির্ভর করে না, যেমন অন্য কোনরূপ বাহ্যিক আড়ম্বরের উপরে ব্রাহ্মধর্ম নির্ভর করে না।"

ইহার প্রমাণস্বরূপ লেখক বেদের ব্রহ্মবাচক বিবিধ নামের উদাহরণ দিয়াছেন,—যেমন রুদ্র, বামন, বিষ্ণু, আকাশ, শিব, অগ্নি, মাতরিশ্বা ইত্যাদি।

লেখকের সিদ্ধান্তে ব্রাহ্মত্বের কষ্টিপাথর হইল ইহা—আমি ব্রহ্মকে প্রকৃতই প্রীতি করিতেছি অথবা মুখে প্রীতি দেখাইতেছি। এই কষ্টিপাথরে যিনি উত্তীর্ণ হইতে পারেন তিনিই ব্রাহ্ম। অতএব যে কোনও সম্প্রদায়ের যে কোনও সাধু ব্যক্তিকেই ব্রাহ্ম বলা চলে। এইরূপ সাধু ব্যক্তিদের গঠিত সমাজকেই ব্রাহ্মসমাজ বলিতে হইবে।

"অতএব আমরা সমস্ত ধর্মের সমস্ত সম্প্রদায়ের সর্বদেশীয় সাধকগণকে আহ্বানপূর্বক বলি যে, হে সাধক, তোমার ও আমার সাধনায় কোন ভেদ নাই। * * * যিনি তোমার

হৃদয়ের উপাস্য 'তিনি' আমারও উপাস্য। তোমার ও আমার হৃদয় একই তন্ত্রীতে বাঁধা। * * * দেখ, আজ শুধু ধর্মে ধর্মে নহে, দেশে দেশে নহে, এমন কি একই দেশের প্রদেশে প্রদেশে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইতেছে। আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল ছেলেদের অনেকে প্রকৃত ধর্মশিক্ষার অভাবে কোথায় তলাইয়া যাইতেছে। এই সব ক্ষেত্রে কি আমাদের করণীয় কিছুই নাই? কেবল মতবাদের গহন অরণ্যের মধ্যে ঘুরিলেই কি ধর্মসমাজের কর্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে করিবে? * * * এস সমস্ত ধর্মসমাজ সম্মিলিত হইয়া দেশকে, দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থলদিগকে, গৃহ পরিবারকে এই সকল বিপদ হইতে রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করি।"

লেখকের উদার দৃষ্টিভঙ্গী সকলেরই অনুকরণীয়। তবে একটি বিষয়ের আলোচনা এই প্রবন্ধে বাদ পড়িয়াছে মনে হইল, জানিনা উহা লেখকের স্বেচ্ছাকৃত কিনা। সাকার উপাসনা সম্বন্ধে লেখক একেবারেই নীরব রহিয়াছেন। মূর্তিপূজার মাধ্যমেও যে 'সত্যধর্ম'কে উপলব্ধি করা যায়, ভারতবর্ষে এবং অন্যদেশেও যে বহু নরনারী ঐ পন্থায় ঈশ্বরে পরামুরক্তি লাভ করিয়াছেন ইহা উদারদৃষ্টিসম্পন্ন লেখকের মুখে শুনিলে আমরা আরও আনন্দিত হইতাম।

কামাখ্যা তীর্থপথে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মহান্ মনের মহাসন্ধানী পথ গেছে এঁকে বেঁকে
স্নিগ্ধ বাতাস মেখে।
অরণ্যছায়ে নুয়ে নুয়ে পড়ে সবুজ পাদপলতা,
শুনি চারিভিতে প্রাচীন দিনের তন্ত্রাচারের কথা।
শৈলশৃঙ্গে নগ্নচরণে করি আরোহণ ধীরে,
জীবনের নদী চায় ফিরে ফিরে—
ব্রহ্মপুত্র-তীরে।

নীল পর্বত কত যুগ আগে নব দিগন্তপানে
কি যেন মায়ার টানে
দেখেছে প্রথম রূপালি চাঁদেরে, ছায়া যার দুলে দুলে
পড়েছে লোহিত নদের বুকেতে
ঢেউ ওঠে ফুলে ফুলে—
কামরূপ ধরি কে এলো হেথায় শিখরের ছায়া মাঝে
দেখায়ে বিভূতি যেথা ভৈরব রাজে,
কালের ঘণ্টা বাজে!

হেথা একদিন হোলো তপস্যা পরশুরামেরো আগে,
প্রথম উষার রাগে।
হেথা বশিষ্ঠ আশ্রম শোভে কামাখ্যা-তীর্থবুকে
অশ্বাক্রান্তা হোলো কি লুপ্ত দুর্গম দরী-মুখে?

নরকাসুরের সাধনভূমিতে প্রাগ্‌জ্যোতিষের দেশে
রেখেছি প্রণাম বিমানে উড়িয়া এসে,
ভরা ভাদরের শেষে।

কোথা হোতে এক পার্বতী মেয়ে অরণ্যপথ বেয়ে
এসে মোর সনে চলে আর কেন
দেখে মোরে চেয়ে চেয়ে?
ভয় হয় অকারণে,
মোর স্বতন্ত্র মনে!

আর্য দ্রাবিড় অনার্য হেথা মিলেছে পূজার তরে
আশা নিয়ে অন্তরে।
এক হয়ে গেছে বেদ ও আগম ভুলি সব ভেদাভেদ
বহু ঊর্ধ্বেতে দেউলে আসিয়া রহিল না কোন খেদ।
অতল গুহায় দেবী-যোনিমুখে বহিতেছে বারিধারা
কোথা হ'তে আসি কোথা সে আপন হারা—
কহিবে আমারে কারা?
পঞ্চমুণ্ডী আসন হেরিয়া বসিনু পুলকে একা,
গুহা-দেউলের পাষাণের মাঝে
দিবে কি পাষাণী দেখা?

বন্যাসেবাকার্য

রামকৃষ্ণ মিশনের আবেদন

পশ্চিমবঙ্গে বন্যার ভীষণ ধ্বংসলীলার কথা জনসাধারণ অবগত আছেন। অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া রামকৃষ্ণ মিশন তাঁহাদের স্থায়ী কাজের গুরুভার ও অর্থের অপ্রাচুর্য সত্ত্বেও ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর থানা, হাওড়া জেলার ডোমজুর থানা, মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানা এবং বর্ধমান জেলার কালনা ও কাটোয়া মহকুমায় সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছেন।

সোনারপুরে ২৬শে সেপ্টেম্বর হইতে ৯ই অক্টোবর পর্যন্ত ১৪খানি গ্রামে ৯৯ মণ ২১½ সের চাউল, ২২ মণ ১৫ সের ডাল, ১০৫০ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ, ১৫½ মণ চিড়া, ৬ মণ ./৫ সের গুড়, আধ মণ মিশ্রী, ৪½ সের বালি, ২½ সের চিনি এবং আধ মণ সাগু বিতরণ করা হইয়াছে।

ডোমজুর থানায় ৫খানি গ্রামের ২২০টি পরিবারের মধ্যে সাময়িকভাবে ১১/ মণ চাউল এবং ৬০০ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ বিতরণ করার পর, সরকার হইতে সাহায্য দান আরম্ভ হওয়ায় উক্ত কেন্দ্রে সেবাকার্য বন্ধ করা হইয়াছে।

বেলডাঙ্গা থানার রামনগর ইউনিয়নে ১০খানি গ্রামে ৫৫০টি পরিবারের মধ্যে এক সপ্তাহে ১০০/০ মণ চাউল বিতরণ করার পর, সরকার হইতেই ব্যাপক সাহায্য করা হইবে, এস, ডি, ও, এইরূপ বলায় এই অঞ্চলে আমাদের সেবাকার্য বন্ধ করিতে হইল।

কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম, বিলেশ্বর ও নবগ্রাম ইউনিয়নের ১১টি গ্রামে সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী থানায় সেবাকার্য চালাইবার জন্য সেবক প্রেরণ করা হইয়াছে। লোকমুখে সংবাদ পাওয়া গেল সেখানে প্রথম বিতরণ হইয়া গিয়াছে।

কালনা-কাটোয়ার বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল হইতে সংবাদ আদানপ্রদানে বিলম্বহেতু কার্যের বিশেষ বিবরণ এইসঙ্গে দেওয়া সম্ভব হইল না।

সেবাকার্যের জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। আমরা সহৃদয় দেশবাসীর নিকট মুক্তহস্তে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানাইতেছি। এই উদ্দেশ্যে যিনি যাহা দান করিবেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে এবং তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে :—

(১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া
(২) কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা—৩
(৩) কার্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, ৫নং ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা—১৩

(স্বাঃ) স্বামী মাধবানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

পরলোকে মহেন্দ্রনাথ দত্ত

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম অনুজ বহুজনশ্রদ্ধেয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত (মহিম বাবু) গত ২৮শে আশ্বিন (১৪ই অক্টোবর, ১৯৫৬) রবিবার রাত্রি ১২-৪০ মিনিটে কলিকাতা সিমলা পল্লীর ৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটস্থ তাঁহাদের পৈতৃক বাসভবনে ৮৮ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। পাঞ্চভৌতিক দেহ চিরদিন পৃথিবীতে থাকে না, অতএব অতি পরিণত বয়সে এই মনীষীর দৈহিক মৃত্যুর জন্য শোকপ্রকাশ অপ্রাসঙ্গিক—তথাপি এই ঋষিকল্প আপনভোলা জ্ঞানতপস্বীকে যাঁহারা চাক্ষুষ দেখিয়াছেন এবং তাঁহার পুণ্যসঙ্গ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা হৃদয়ের গভীরে একটি অপূরণীয় অভাব বোধ করিবেন, সন্দেহ নাই।

চিরকুমার মহেন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন একনিষ্ঠ জ্ঞানচর্চা, আধ্যাত্মিক সাধনা এবং লোককল্যাণ-কামনায় পরিপূর্ণ। বালককালে তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের, স্বামীজীর এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের জীবন তাঁহাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

পূজ্যপাদ গৃহী-সন্ন্যাসীর দেহমুক্ত আত্মা শাশ্বত-সত্যে চিরবিশ্রাম লাভ করুক ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ধর্ম

স্বামী বিরজানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শাস্ত্র বলিয়াছেন,—ধর্মের পথ অতি দুর্গম, ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, সাধারণ বুদ্ধির অতীত। "ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্"—ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত রহিয়াছে, অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা উহার তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না। কঠোপনিষদের উক্তি—

> উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
> ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
> দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

"অজ্ঞান নিদ্রা হইতে উত্থান কর, জাগ্রত হও, উৎকৃষ্ট আচার্যগণের নিকট যাইয়া তত্ত্ব জ্ঞাত হও। ক্ষুরের শাণিত ধারা যেমন দুরতিক্রমণীয় তেমনি সেই তত্ত্বজ্ঞানরূপ পথকেও পণ্ডিতগণ দুর্গম বলিয়াছেন।" মানবের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি অনুসারে ধর্মের অনন্ত শাখা, অনন্ত পথ পড়িয়া রহিয়াছে। কোন্ পথে গমন করিলে আমরা পরম সত্যে উপনীত হইব, কোন্ পথে অগ্রসর হইলে আমাদের ভগবান লাভ হইবে, কোন্ পথ আমাদের সংসারের সুখদুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দান করিবে, কোন্ সাধনে আমরা সিদ্ধিলাভ করিব, ইহা নির্ণয় করা এবং নির্ণয় করিয়াও নির্বিঘ্নে একাকী সেই পথে পরিভ্রমণ করিয়া চরমসীমায় উপনীত হওয়া অপেক্ষা কঠিন ও অসম্ভব কার্য আর কিছু নাই। কারণ ইহা আমাদের নিকট একটি সম্পূর্ণ নূতন ও অজ্ঞাত রাজ্য। পরমার্থপথে কত বাধাবিঘ্ন আছে, কত দস্যু আমাদিগকে সর্বস্বান্ত করিবার মানসে লুক্কায়িতভাবে বিচরণ করিতেছে, কত হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ দুর্গম অরণ্য রহিয়াছে, কত বিপথ আছে যে-পথে গমন করিলে আর পথ পাইবার কোন ভরসা নাই, কোথাও বা ঘোর অন্ধকার, কোথাও শূন্য মরুভূমি! কখন মায়ামরীচিকা পথিককে বৃথা আশায় প্রলুব্ধ করিয়া কোথায় যে লইয়া যাইবে তাহা কে বলিতে পারে? সাধকের নিজের জ্ঞানবুদ্ধির ক্ষীণ আলোক সে অন্ধকার ভেদ করিতে পারে না। অনেকেই তাহাদের অসম্যক্ ভাবে পরিচালিত বৃথা চেষ্টার দ্বারা বিফলমনোরথ হইয়াছেন; পথপ্রদর্শক কেহ না থাকিলে সে পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। অনেকে তাহাদের উদ্ধত মস্তিষ্কের উত্তেজনায় অসংযত হইয়া ধাবিত হন কিন্তু শেষে দেখা যায় যে তাঁহারা নিজেদের চক্রের মধ্যেই পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, ধর্মরাজ্যে একপদও অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

গুরুকরণ নাম শুনিলেই অনেকে আজকাল "কি ভয়ানক" বলিয়া কানে আঙুল দিয়া মুখ ফিরাইয়া লন। তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা তাঁহাদের জীবনে আজ পর্যন্ত কোন শিক্ষা গুরুকরণ ব্যতীত পাইয়াছেন কি? সামান্য ক, খ শিক্ষাও তো তাঁহারা মাতৃগর্ভ হইতে আনয়ন করেন নাই, গুরুর কাছ হইতেই তাহা শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। আমরা যে-সকল জ্ঞানার্জন করিতেছি তাহার প্রত্যেকটির বীজ প্রথমাবস্থায় কি কাহারও আনুকূল্য ব্যতীত বর্ধিত হইয়াছে? কখনই নয়। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তেই যে আমাদের গুরুকরণ হইতেছে ইহা স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। যাহার কাছ হইতে যাহা শিক্ষালাভ করা যায়, তিনিই সেই বিষয়ের গুরু। গুরুকরণের নামে যে অনেকে দুই পা হটিয়া দাঁড়ান তাহার কারণ হইল ধর্মরাজ্যে তথাকথিত গুরুগিরির অনুপ্রবেশ। গুরু বলিলে

এক বিকট চিত্র স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে। নিজের জীবন গঠন না করিয়া, নিজে উন্নতির পথে বিশেষ অগ্রসর না হইয়া, নিজেকে মহাধার্মিকাভি-মানী, পণ্ডিতাভিমানী ও জ্ঞানী ধারণা করিয়া যে ব্যক্তি পরের উপর আধিপত্য করিতে যায়, যে নিজের স্বার্থকামনা পূর্ণ করিবার আশায়, অন্যের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিবার জন্য কপটাচারেও ক্ষান্ত হয় না, যে অহংকারে বিমূঢ় হইয়া নিজেকে ধর্মরাজ্যের নেতা বলিয়া বিবেচনা করে, যাহার শুধু গুরু অভিমানই আছে তাহার নিজের পথই রুদ্ধ, তাহার নিজের পথেই কণ্টক, সে আবার অন্যের পথপ্রদর্শক হইবে কিরূপে? শাস্ত্র আমাদের এইরূপ অসদ্‌গুরু হইতে সতর্ক হইতে বলিয়াছেন।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ, স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়াঃ, অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

"যাহারা নিজে অজ্ঞানতায় অবস্থিত, অথচ আপনাদিগকে বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি অন্যকে পথ দেখাইতে গিয়া দন্দ্রম্যমান অর্থাৎ অতিশয় কুটিলভাবে নানাপথে চালিত হইয়া অন্ধ কর্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায় পরিভ্রমণ করে।" এক অন্ধ অন্য অন্ধকে পথ দেখাইতে গিয়া যেমন উভয়েই পতিত হয় সেইরূপ জ্ঞানহীন ব্যক্তি অন্য জ্ঞানহীনকে জ্ঞানপথে আনয়ন করিতে গিয়া উভয়েই অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত হয়। অসদ্‌গুরু হইতে শিষ্যের উপকার সাধিত না হইয়া বরং সমূহ অনিষ্ট সাধনই হইয়া থাকে, কারণ তাহাতে গুরুর অসৎ রোগসকল শিষ্যে সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনাই অত্যধিক। সদ্‌গুরু লাভ করা অনেক সুকৃতির ফল। বিবেকচূড়ামণি বলিতেছেন :—

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দৈবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥

"এই তিনটি লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ এবং দেবতা-দিগের অনুগ্রহেই লাভ হইয়া থাকে—মনুষ্যত্ব অর্থাৎ মানবজন্ম লাভ করা, মুমুক্ষুত্ব—মানবজীবন লাভ করিয়া মুক্তির জন্য ইচ্ছা এবং মহাপুরুষসংশ্রয় অর্থাৎ মহাপুরুষের আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়া।" যিনি মহাপুরুষ অর্থাৎ সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ করিতে সমর্থ হন তাঁহার জীবনই ধন্য। উপদেশ তো বইতে অনেক আছে, তাহা পাঠ করিলেই তো চলে, তাহা শুনিবার জন্য মহাপুরুষের কাছে নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া ও অত্যধিক সময় নষ্ট করিয়া অবস্থান করিবার কি সার্থকতা? সাধুর কাছে যদি কিছু বিশেষত্ব না থাকে তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গ করিবার ফল কি?

মহাপুরুষ হইতে শাস্ত্রের এই প্রভেদ যে তিনি শাস্ত্রীয় উপদেশসকল নিজের জীবনে প্রতিফলিত করিয়াছেন, তিনি মুখে যাহা উপদেশ দেন কার্যেও তাহা করেন, তিনি সেইসকল উপদেশের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁহার পবিত্র আত্মাই অন্য আত্মাকে উন্নত করিতে পারে, তাঁহার উপদেশের জ্বলন্ত শিখা অন্যের উপর পতিত হইয়া তাহার কুপ্রবৃত্তিরাশি দগ্ধ করিয়া দেয়, তাঁহার অনুকম্পায় জীব মুহূর্তের মধ্যে পবিত্র ও কৃতকৃত্য হইয়া যায়, যেমন অগ্নিবর্ণ অয়ঃপিণ্ড সংস্পর্শে শীতল লৌহখণ্ডও তৎস্বরূপ কান্তি ধারণ করে। তাঁহার হৃদয়ে তো স্বার্থ নাই, তিনি যে নিজের অহং একেবারে বলি দিয়াছেন, তাঁহার জীবন যে পরেরই জন্য। কিসে জীবকে ধর্মপথে লইয়া যাইবেন, কিসে জীব যন্ত্রণাময় সুখদুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, কিসে সে পরমানন্দের অধিকারী হইবে, ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া জীবন অমৃতময় করিবে এই তাঁহার চেষ্টা, এই তাঁহার চিন্তা। শাস্ত্রে তাঁহাকে অহেতুক-দয়াসিন্ধু যে বলিয়াছেন তাহা ঠিকই বলা হইয়াছে। পরিবর্তে কিছু পাইবেন এ আশা করিয়া তো তিনি তত্ত্বজ্ঞান দান করেন না। যাঁহারা ভবিষ্যতে ফল পাইবার আশায় দান করেন, তাহা তাঁহাদের যথার্থ দান

নহে, তাহা ব্যবসায়মাত্র। সদ্‌গুরুর পবিত্র জীবনের নিঃস্বার্থ প্রেমই তাঁহাকে জীবহিতকর কার্যে দীক্ষিত করে। তিনি প্রেমের দ্বারা জীবগণকে তাঁহার নিকট আকর্ষণ করেন।

যেমন সদ্‌গুরুর প্রয়োজন, শিষ্যেরও সেইরূপ সদ্‌গুণসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, কারণ উর্বর ক্ষেত্রে বীজ বপন করা হইলেই পর্যাপ্ত ফল উৎপন্ন হয়। শিষ্যের দেখিতে হইবে তাহার হৃদয়ে ধর্মজীবন লাভ করিবার জন্য যথার্থ পিপাসা জন্মিয়াছে কি না। দেখিতে পাই—অনেক সময় মনের কোন উচ্ছ্বাসকে আমরা প্রকৃত সৎ পদার্থ বলিয়া মনে করি। দেখিতে পাই—কোন আত্মীয়-স্বজন বা পিতামাতা বা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে সংসার অনিত্য বোধ হয়, মনে বৈরাগ্যভাবের সঞ্চার হয়, কিন্তু তাহা কতক্ষণ থাকে? সেইজন্য মনে মনে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে আমরা যথার্থ ধর্ম চাহিতেছি কি না, দেখিতে হইবে আমরা ধর্মের জন্য একটা তীব্র অভাব হৃদয়ে অনুভব করিতেছি কি না, আমরা বাস্তবিক ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে কোন্ উপায় অবলম্বন করিব এই ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেছি কি না? যখন মনে এইরূপ শুভ ইচ্ছার উদয় হয়, যখন ভগবান লাভ না হইলে এই বৃথা জীবনে প্রয়োজন কি এইরূপ ভাব মনে ধারণা হয় তখন ভগবানই গুরু প্রেরণ করিয়া থাকেন। গুরুর জন্য সাধকের ভাবনা করিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, তিনি যখনই যে সাধন করিবার মনস্থ করিতেন তখনই কোথা হইতে সেই ধর্মের গুরু আসিয়া তাঁহাকে দীক্ষা দান করিয়া যাইতেন। এইরূপ গুরুলাভ হইলে ধর্মপথ অতি সুগম হইয়া থাকে।

গুরুবাক্য অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া না চলিলে ধর্মরাজ্যে কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারা যায় না, গুরুবাক্যে বিশ্বাসই আমাদের পরম বস্তু লাভ করাইয়া দেয়। কায়মনোবাক্যে তাঁহার উপদেশ কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কিছুদিন চেষ্টা করিয়া কিছু হইল না বলিয়া তাহা পরিত্যাগ অপেক্ষা ধৃষ্টতা আর কিছু হইতে পারে না। ধর্মলাভ একদিনে হয় না; এক জীবনেই যে হইবে তাহা কে বলিতে পারে? সমস্ত বাধাবিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া যে ব্যক্তি অবিচলিত ধৈর্য ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত অগ্রসর হন তিনিই সিদ্ধমনোরথ হন।

কর্মসকল ক্রিয়া-বিশেষে পাপপুণ্য, সৎঅসৎ, ধর্ম অধর্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু এই পাপপুণ্য সৎঅসৎ সমুদায়ই আপেক্ষিক। অবস্থাবিশেষে যাহা পাপ অবস্থান্তরে তাহা পুণ্য, আবার অবস্থা-বিশেষে যাহা পুণ্য অবস্থান্তরে তাহা পাপ; কেহ বলিতে পারিবেন না যে, কোন কার্য দেশ-কাল-পাত্র দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন হইয়া পাপ বা পুণ্য। ফলভোগেই পাপপুণ্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে। কর্ম দ্বারাই মনুষ্য অভিজ্ঞতালাভ করে। কোন পাপকার্য সম্পাদন করিবার সময় যদি কাহারও বিবেকে আঘাত না লাগে বুঝিতে হইবে কর্মের দ্বারা তাহার তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয় নাই; সুতরাং যে পর্যন্ত জ্ঞানলাভ না হইবে সে পর্যন্ত তাহার সেই কার্য হইতে নিবৃত্তি হইবে না। কর্মের ফলভোগ না হইলে জ্ঞানের উদয় হয় না। যে পর্যন্ত অগ্নি হইতে বালকের গাত্রে উত্তাপ না লাগে সে পর্যন্ত অগ্নিতে তাহার কোনও ভয় থাকে না, কিন্তু যদি একবার সে অগ্নিতে দগ্ধাঙ্গুলি হয় তাহা হইলে পুনরায় সে আর অগ্নিস্পর্শ করিতে চাহিবে না। যে ব্যক্তির বর্তমান জ্ঞানের অবস্থা যেরূপ, সেই অবস্থায় যে কর্ম দ্বারা তাহার আত্মবিকাশের বিঘ্ন হয় তাহাই তাহার পক্ষে পাপ বা অধর্ম এবং যাহা আত্মবিকাশের অনুকূল তাহাই পুণ্য বা ধর্ম। যাহার জ্ঞানের যে অবস্থা ঐ অবস্থা হইতে উর্ধ্বে আরোহণ করিতে হইলে যে কার্য করা আবশ্যক তাহাই পুণ্য বা ধর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং ঐ অবস্থা হইতে যে কার্য দ্বারা নিম্নাভিমুখে

গতি হয় তাহাই পাপ বা অধর্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিম্নতর স্তর হইতে উর্ধ্বতর স্তরে আরোহণ করিতে করিতে জীব যখন সোপানের চরমসীমা অতিক্রম করিয়া সেই স্থানে পৌঁছিতে পারে যেখানে সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, সৎঅসৎ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসকল তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তখনই সে মুক্ত হইয়া যায়। এই মুক্তিই মানবজীবনের উদ্দেশ্য এবং প্রত্যেক জীবের অবস্থানুসারে যে সমুদয় কার্যে তাহার মুক্তির অন্তরায় ঘটে, তাহাই তাহার পক্ষে পাপ এবং যাহাতে মুক্তির অনুকূলতা হয় তাহাই তাহার পক্ষে ধর্ম বলা যায়। যদি প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ অনুষ্ঠিত কর্মলব্ধ জ্ঞান দ্বারা প্রবুদ্ধ বিবেকের শাসনাধীন হইয়া ভবসাগরে স্বীয় জীবন-তরী পরিচালিত করে তাঁহা হইলে সে প্রতিকূল বায়ু ও স্রোত প্রভৃতি সহস্র সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া স্বীয় গন্তব্যস্থানে উপনীত হইবেই হইবে। জীবের গন্তব্যস্থান এক, যে যতটুকু অগ্রসর হইয়া রহিয়াছে সেই স্থান হইতে ঐ গন্তব্যস্থান লক্ষ্য করিয়া তাহাকে যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু সকল যাত্রীরই তিনটি ঘোর শত্রুর কথা সর্বদা স্মৃতিপটে জাগরূক রাখিতে হইবে। এই তিনটি শত্রু: কাম, ক্রোধ, লোভ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন:—

> ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
> কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥

"জীবের অধোগতির কারণ কাম ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ, সেই হেতু এই তিনটি পরিত্যাগ করিবে।" ঐ শত্রুত্রয়ের মধ্যে প্রথম ও সর্বপ্রধান শত্রুই কাম। বাসনাই মানবের পরম শত্রু; বাসনাই মানবকে বিপথে লইয়া গিয়া নানাবিধ যাতনা দেয়। ভোজন দেহরক্ষার জন্য প্রয়োজন, কিন্তু যখন আমরা ভোজনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া ভোজনকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া জীবন পরিচালিত করি, তখনই বাসনা-বাগুরায় আবদ্ধ হই। আত্মার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যখন ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তির জন্য চিত্তে বাসনা হয় তখনই আমরা কাম বা বাসনারাজ্যের প্রকৃতিত্ব স্বীকার করি। এই ইন্দ্রিয়গণ সদাসর্বদাই বহির্বিষয়ে আসক্ত হইয়া ধাবিত হয় এবং অনিত্য পদার্থে কাম্যবস্তুর অনুসরণ করিয়া সর্বতোব্যাপ্ত মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয় কিন্তু যাঁহারা তত্ত্বপিপাসু তাঁহারা তাহাদিগকে বহির্বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া অন্তর্মুখী করিবেন।

> পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্
> পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
> কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

"স্বয়ম্ভূ ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহকে বহির্মুখ করিয়া বিধান করিয়াছেন, সেই জন্যই মনুষ্য সম্মুখ দিকে (অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি) দৃষ্টিপাত করে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয় হইতে নিবৃত্ত-চক্ষু এবং অমৃতত্ব লাভে ইচ্ছুক হইয়া প্রত্যক্ (অর্থাৎ প্রত্যক্ষীভূত) আত্মাকে দেখিয়া থাকেন।" এই অন্তর্মুখী বৃত্তি যাহার নাই তাহার অন্তররাজ্যে প্রবেশের অধিকার নাই। ইন্দ্রিয়গণের মুখ ফিরাইতে পারিলে তাহাই ধ্যান ও জ্ঞান, আর সমস্ত পুস্তকের রাশিমাত্র। ইন্দ্রিয়গণের সম্যক্ নাশ করিতে কেহই সমর্থ হন না। কোন শক্তি বা কোন গতিরই আত্যন্তিক নাশ নাই। তবে শক্তির গতি ফিরাইতে পারা যায়। যে শক্তির প্রভাবে ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে ধাবমান হইতেছে সেই শক্তির গতি বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া অন্যদিকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। মন বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবানকে বিস্মৃত হয়, সেই মনকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া যদি ভগবদভিমুখী করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারই মনন দ্বারা জীব কৃতার্থ হয়। মন অসৎ বিষয়ে ধাবিত হইতেছে, তাহাকে ফিরাইয়া

সৎপথে নিযুক্ত করিতে হইবে। যজুর্বেদীয় কঠোপনিষদে উদাহরণ দ্বারা ইহা সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা :—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে॥
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

"কর্মফল ভোক্তা জীবকে রথস্বামী জানিবে এবং শরীরকে রথ বলিয়া জানিবে, অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিকে সারথিস্বরূপ জানিবে, কারণ এই শরীরের সম্বন্ধে বুদ্ধিই প্রধান নেত্রী আর সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনকে প্রগ্রহ (লাগাম)-স্থানীয় জানিবে, কারণ অশ্বগণ যেমন রজ্জুদ্বারা নিগৃহীত হইয়া স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হয় শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণও তেমনি মনের দ্বারা গৃহীত হইয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। মনীষিগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্বস্থানীয় বলেন, কারণ অশ্ব যেমন রথকে আকর্ষণ করে তেমনি ইন্দ্রিয়গণই শরীরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে; রূপাদি-বিষয়ই এই ইন্দ্রিয়-অশ্বের পন্থা-স্থানীয়। অশ্ব যেমন পথে গমনশীল হয় তেমনি ইন্দ্রিয়গণও বিষয়পথে সর্বদা বিচরণ করিয়া থাকে। যাঁহারা বিবেকী তাঁহারা শরীর ইন্দ্রিয় ও মনঃসংযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা বলিয়া থাকেন। বুদ্ধিরূপ সারথি যদি অনিপুণ অর্থাৎ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বিষয়ে অবিবেকী হয় এবং প্রগ্রহ-স্থানীয় মন যদি সর্বদা অপ্রগৃহীত থাকে অর্থাৎ অসমাহিত থাকে, তবে সেই অকুশল বুদ্ধিসারথির ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় অবশ্য হইয়া থাকে। যে বুদ্ধিরূপ সারথি নিপুণ অর্থাৎ বিবেকী এবং প্রগ্রহস্থানীয় মন যাঁহার প্রগৃহীত অর্থাৎ সমাহিত, সেই কুশলবুদ্ধি সারথির ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ সাধু অশ্বের ন্যায় বশীভূত থাকে। যে আত্মরথীর বুদ্ধিরূপ সারথি অবিবেকী, মনরূপ প্রগ্রহ অগৃহীত অর্থাৎ অসমাহিত ও সর্বদাই অশুচি-ভাব সেই রথী অক্ষয় পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে না, পরন্তু জন্মমৃত্যুসঙ্কুল এই সংসারেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। যে আত্মরথী বিজ্ঞানবান্ বুদ্ধিরূপ সারথিসম্পন্ন এবং সমনস্ক অর্থাৎ প্রগৃহীতমনা ও সর্বদা শুচিভাবযুক্ত, সেই রথী অক্ষয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। এই পদ প্রাপ্ত হইতে পারিলে আর সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যে বিদ্বান ব্যক্তি তপস্যা ও বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধিসারথি-যুক্ত এবং মন যাঁহার প্রগ্রহস্থানীয় অর্থাৎ যিনি সমাহিতমনা সেই ব্যক্তি সংসারগতির পরপারে গমন করিতে পারেন অর্থাৎ সমস্ত সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি পরিব্যাপক পরমাত্মা বাসুদেবের পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযম ব্যতীত মুক্তিলাভের প্রত্যাশা সুদূর পরাহত। অন্তরেন্দ্রিয় মনকে লইয়া ইন্দ্রিয়ের একাদশ সংখ্যা পূর্ণ হয়। এই মন স্বীয় সঙ্কল্পের দ্বারা পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এই উভয়কেই প্রবর্তিত করে। অতএব মনকে জয় করিতে পারিলেই দশ ইন্দ্রিয়কে জয় করিতে পারা যায়। এই মন স্বভাবতঃ চঞ্চল আবার তাহার উপদ্রবে ইন্দ্রিয় ও শরীর পর্যন্ত সদাই ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে মনের যাহাতে আগ্রহ হইবে সে তাহাই করিতে যাইবে। সে এমনই বলবান যে, কেহই তাহাকে সে দিক হইতে ফিরাইতে পারে না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম

জন্মান্তরের সংস্কার-রাশি মনকে এত দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে যে তাহাকে নিরোধ করা অতিশয় কঠিন বলিয়া বোধ হয়। যখন অত্যন্ত ঝড় বহিয়া যায় তখন সেই প্রবল বায়ুকে ধরিয়া রাখা যেমন কঠিন, অব্যাহতগতি চঞ্চল মনকে নিরুদ্ধ করাও সেইরূপ দুষ্কর মনে হয়—মহামতি অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের নিকট এইভাব ব্যক্ত করিলেন তখন ভগবান তদুত্তরে তাহাকে বলিলেন :—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥

"হে মহাবাহো, মন যে দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ; কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা ইহা নিগৃহীত হইয়া থাকে।" ভগবান দুর্জয় মনকে নিগৃহীত করিবার বহুল সদুপায়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা না করিয়া কেবলমাত্র অভ্যাস ও বৈরাগ্যকেই মনরূপ মত্তমাতঙ্গ-শাসনের অঙ্কুশ-স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, কারণ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের যথাযথ সাধন করিলেই সুকঠিন সকল সাধনের কার্যই হইয়া যায়। ভগবান পতঞ্জলিও তাঁহার যোগসূত্রে "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই মনকে নিরোধ করিতে হয় বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। অভ্যাস কাহাকে বলে ?

"তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ"

শুদ্ধ চিদাত্মাতে প্রশান্তভাবে চিত্তবৃত্তিকে স্থির রাখিবার জন্য, মানসিক উৎসাহরূপ যত্নদৃঢ় করিবার জন্য বারংবার চেষ্টার নাম অভ্যাস! অসৎ সঙ্কল্প হৃদয়ে উদিত হইবামাত্র তাহার পরিত্যাগ ও প্রলোভনের পদার্থ সম্মুখীন হইলে তাহা হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহৃত করিবার অবিশ্রান্ত চেষ্টার নাম অভ্যাস। এই অভ্যাসকে বিষয়-বাসনা বিচলিত বা অভিভূত করিতে পারে না। এই অভ্যাস প্রবল থাকিলে সিদ্ধির বিঘ্ন হইবার ভয় থাকে না।

"দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্"

স্ত্রী, অন্ন, পান, ঐশ্বর্যাদিজনিত দৃষ্ট বিষয়সুখ এবং শাস্ত্রমুখে বিশ্রুত স্বর্গাদি ভোগসুখ এই উভয়-প্রকার সুখে বিতৃষ্ণাকেই বশীকার নামক পরম বৈরাগ্য কহে। কাম্য প্রভৃতি বস্তুতে অনিত্যত্বাদি দোষের অনুসন্ধান এবং ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহে পুনঃ পুনঃ নশ্বরত্বাদি দোষদর্শন দ্বারা তত্তৎসুখে বিতৃষ্ণার সঞ্চার হওয়াতে ত্রিগুণাত্মক কোন বিষয় ব্যবহারে চিত্তের তৃষ্ণা বা আসক্তির উদয় হয় না।

কিন্তু সকল অপেক্ষা প্রীতিপ্রদ, সুখলভ্য ও সহজ উপায়, যাহা সকল সাধনের শেষ, যাহা আশ্রয় করিলে অন্য কঠোর ও দুষ্কর সাধনের আবশ্যক হয় না, সেই সাধন হইল অনাথশরণ পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ। যে সাধক ভগবচ্চরণারবিন্দের শরণ গ্রহণ করেন তাঁহাকে বিঘ্নসকলের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না। শরণাগতির লক্ষণ কি তাহা বলিতেছেন :—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিসর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্ববরণং তথা॥
তৎক্রিয়াত্মবিনিক্ষেপঃ ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ।

"যে সকল বিষয় ঈশ্বরলাভ-পক্ষে অনুকূল সেই সকলের গ্রহণ এবং তৎপ্রতিকূল বিষয়সকলের পরিত্যাগ, পরমেশ্বর সকল অবস্থাতেই আমার সহায় থাকিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন এই সুদৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ, তাঁহার কৃপা হইবার পক্ষে কালক্ষেপ করত আশায় আশ্রিত হইয়া থাকা এবং কামনাবিহীন হইয়া তাঁহার সাধনে আপনাকে নিক্ষেপ করা—এই ছয় প্রকার শরণাগত-লক্ষণ।"

ভগবচ্চরণাশ্রিত ব্যক্তির নিকট হইতে কার্য-সহিত অবিদ্যা চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করেন। মনোনিবৃত্তিরূপ পরমা শান্তি ভগবদ্ভক্তের চিরানুগত হইয়া থাকে। গীতাশাস্ত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে

নিষ্কাম কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সম্যক্ উপদেশ প্রদান করিয়া সর্বশেষে ভগবানের শ্রীচরণে শরণগ্রহণ করিবার জন্য নিয়োগ করিতেছেন :—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

"হে ভারত, তুমি সর্বতোভাবে তাঁহার শরণ গ্রহণ কর, তাঁহারই প্রসাদে পরাশান্তি এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।"

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

"তুমি সমুদয় ধর্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্বক কেবল মাত্র আমারই শরণাগত হও, আমি তোমাকে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত করিব।"

বর্ণ ও আশ্রমভেদে যত প্রকার ধর্ম আছে সকল ধর্মের অধিষ্ঠানভূমি একমাত্র ভগবান। তাই ভগবান বলিতেছেন,—সর্ব ধর্মের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সেবা না করিয়া একমাত্র আমাকে সর্বধর্মস্বরূপ বলিয়া বিদিত হও এবং আমাকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া জানিয়া অনাত্মবিষয়চিন্তা-মাত্রকেই চিত্ত হইতে দূর করিয়া দাও এবং অনবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় আমাকেই নিরন্তর চিন্তা কর। "সর্বধর্মান্" পদদ্বারা ধর্ম ও অধর্ম অর্থাৎ সৎ ও অসৎ, সাধারণ ও অসাধারণ—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন আদির সর্বপ্রকার ধর্মই উপলক্ষিত হইয়াছে। "হে অর্জুন, তুমি পাপের জন্য আশঙ্কা করিয়া চিন্তিত হইও না, আমি তোমাকে সর্বপাপ-বিমুক্ত করিব।" শ্রুতি বলিয়াছেন: "ধর্মেণ পাপমপনুদতি" ধর্মের দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়। ভগবান স্বয়ং সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ, তিনি পাপ বিনষ্ট করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? ভগবান পূর্বোক্ত শ্লোকে শরণাগতি ভিন্ন কোন ধর্ম-কর্মই যে শ্রেষ্ঠ নহে তাহা বুঝাইলেন। ভগবচ্চরণে শরণাগত হওয়াই সমস্ত শাস্ত্রের গুহ্য রহস্য এবং সমস্ত সাধনের চরম ফল।

ধর্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হইল। এই ধর্মের বল অপরিমেয়। বিশ্বে যত প্রকার শক্তি আছে, যত প্রকার শক্তির খেলা হইতেছে, যত প্রকার শক্তির বিকাশ হইতেছে, যত প্রকার শক্তির শক্তি আছে, সকল শক্তিই ধর্মের শক্তি—ধর্মের বলের কাছে শির অবনত করে। বিশ্বের সমস্ত তেজ, সমস্ত জ্যোতি ধর্মের পবিত্র নির্মল জ্যোতির সম্মুখে ক্ষীণপ্রভ হইয়া যায়।

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

"সেই পরমাত্মতত্ত্বভূত ব্রহ্মপদার্থকে সূর্য প্রকাশিত করিতে পারে না এবং চন্দ্র, তারা ও বিদ্যুৎও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নি কি প্রকারে পারিবে? সেই আত্মা স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন বলিয়া সমস্ত জগৎ প্রকাশ পায়, তাঁহার প্রকাশ দ্বারাই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হয়।" এই আত্মতেজ যাঁহার ভিতর হইতে যত উদ্ভাসিত হইয়াছে, তিনিই মানবজাতির মধ্যে তত পূজনীয় হইয়াছেন। এই তেজ, এই ধর্মের বল আর্যঋষিদের মধ্যে ছিল বলিয়া তাঁহারা একদিন উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জ্ঞানের জ্যোতিতে আজ জগৎ উদ্ভাসিত হইতেছে, তাঁহাদের অনন্ত পবিত্র জীবনের এক কণিকা যেখানে পতিত হইয়াছে সেই স্থানের আলোক কত শত হৃদয়ান্ধকার নাশ করিয়া ধর্মের বিমল জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছে। এই ধর্মই হিন্দুজাতির সম্বল, হিন্দুজাতির জীবন, হিন্দুজাতির জাতীয় আদর্শ। অন্য অন্য জাতির জাতীয় আদর্শ অন্য অন্য প্রকার। প্রত্যেক জাতির জীবনের একটি উচ্চ আদর্শ, একটি লক্ষ্য আছে যাহা তাহাদের জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ, তাহাদের মেরুদণ্ডস্বরূপ, যাহার দ্বারা তাহাদের জাতীয় জীবন গঠিত ও পরিপুষ্ট হয়,

যাহার উপর তাহাদের জাতীয় জীবন নির্ভর করে। কান কোন জাতির মধ্যে রাজনীতি, অপরের মধ্যে বা সমাজনীতি এবং কাহারও কাহারও বা মানসিক জ্ঞানার্জন প্রভৃতি জীবনের সর্বস্বস্থানীয় হয় এবং তাহার মূলে আঘাত করিতে পারিলে তাহাদের জাতীয় বৃক্ষ ভূমিশায়িত হয়। কিন্তু হিন্দুজাতির একমাত্র ধর্মই ভিত্তি, ধর্মই জীবন, ধর্মই বল, ধর্মই সর্বস্ব। (সমাপ্ত)

কবীর

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

কবে তব আবির্ভাব কবে তব হলো তিরোধান,
কোন খোঁজ নাহি রাখি, গণিতের অঙ্ক পরিমাণ
তোমারে বাঁধিতে নারে—কোন ইতিহাসের পাতায়
তব জাত-পত্রখানি নাহি মিলে কালের খাতায়।
তুমি চিরদিনকার, নহ তুমি কোন শতাব্দীর
গোষ্ঠীহারা কোষ্ঠীহারা গোত্রহীন হে সাধু কবীর।

কাল-সিন্ধু মাঝে তব জীবনের—নাহি পাই সীমা,
মহাসিন্ধুময় হ'য়ে আছে তার বিরাট মহিমা।
কেবা তব পিতামাতা তার মোরা পাইনি সন্ধান,
তুমি নারদের মত বিধাতার মানস-সন্তান।
সংসার সন্ন্যাস ভেদ যার মাঝে পাইল বিলয়,
গৃহী কি বৈরাগী তিনি কেমনে তা' হইবে নির্ণয়?

জানি না কি ছিলে তুমি ধর্মরাজ্যে, সহজী, মরমী,
রামাৎবৈষ্ণব, সুফী, বৌদ্ধ, জৈন, কিংবা বর্ণাশ্রমী?
কতটা মোস্লেম ছিলে কতটা বা হিন্দু নাহি বুঝি,
কুড়ানো ছেলের আর কোথা পাব পিতৃধর্ম খুঁজি?
কোন সম্প্রদায় তোমা, জাতিহারা, ভাবেনি আপন,
মহামানবের ছিলে তারি ধর্ম করেছ পালন।
জানি না জীবন-কথা,—কি কি ভাবে করিলে সাধনা,
জানি না করিলে কারে কি প্রথায় পূজা, আরাধনা,
গড়েছিলে সম্প্রদায় জানি নাক কি বিধি-বিধানে,
আহার, বিহার, বেশ, জীবযাত্রা কি ছিল কে জানে?

কোন্ শাস্ত্র পড়েছিলে, কোন্ মন্ত্র জপিতে ধীমান,
কত কত বার? কি আসনে কতক্ষণ করিতে ধেয়ান?
তব দীর্ঘ জীবনের বহিরঙ্গ কোন পরিচয়
রাখেনিক করি যত্ন ইতিহাস অমর অক্ষয়।
সমস্ত জীবনখানি নিঙাড়িয়া দিয়াছ যে বাণী,
তার এক বর্ণ মোরা হারাইনি—এই শুধু জানি,
ব্যাপ্ত তাহা দিগ্বিদিকে তৈলবিন্দু সম খরস্রোতে,
বঞ্চিত হইনি তব জীবনের সার ধন হ'তে,
ভারতের জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হয়ে অনুস্যূত
তব ব্রত তব মন্ত্র চিরদিন তার অঙ্গীভূত।
কলামূর্ত করি তারে পুরাবৃত্ত গম্বুজে মিনারে,
নমস্য করিয়া রাখি আপনার দায়িত্ব না সারে।
তাহি তাহে কোন ক্ষোভ! এ ভারত বিরাট্ জীবনে
কোন সীমা-বেষ্টনীতে রুদ্ধ করি হেরে না নয়নে।
নাহি চাই বহিরঙ্গ, ভুলে যাই অনিত্য অসারে
জীবনের অঙ্গীভূত হয় না যা চাইনাক তারে।
ব্রত চাই, বাণী চাই– চাই অন্তরাত্মার সন্ধান,
আমরা মরাল-ধর্মা নীর ফেলি' ক্ষীর করি পান।

সাধক রামপ্রসাদ

সাহিত্য-শ্রী উষা বসু, এম্-এ, সাহিত্য--সরস্বতী

হালিসহরের অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে ১৭১৮-১৭৩৩ খ্রীঃ মধ্যে রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামরাম সেন। সাধককবি রামপ্রসাদ রামরাম সেনের দ্বিতীয় পত্নীর পুত্র। রামপ্রসাদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। *রাজা কবির গুণ উপলব্ধি করে তাঁকে একশত* বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন ও "কবিরঞ্জন" উপাধিতে অলংকৃত করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে রাজসভায় যেতে বহুবার অনুরোধ করেছেন, কিন্তু রাজসভার বিলাসিতা তাঁকে আকর্ষণ করতে পারে নাই। পল্লীজননীর শ্যামল কোলে অনাবিল সৌন্দর্যের মাঝে তিনি "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে" শ্যামা-সঙ্গীত রচনা করতেন ও গান করতেন। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের মধুর সুরের ঝঙ্কার *পল্লীর আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলতো।*

কথিত আছে যে কবি এক ধনীর সেরেস্তা'য় মুহুরীগিরি করতেন। কিন্তু তিনি যখন এই একঘেয়ে কাজ করতে করতে ক্লান্তি অনুভব

করতেন, তিনি তখন শ্যামা-সংগীত রচনা করে ক্লান্তি দূর করতেন। একদিন জমিদার সেরেস্তা দর্শনের সময় হিসাবের খাতায় গান দেখতে পেয়ে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলেন। গানটি এইরূপ—"আমায় দেয়া তবিলদারী। আমি নেমকহারাম নই শংকরী॥" এই রচনাটি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পরে তিনি জানতে পারলেন যে ইহা রামপ্রসাদের রচনা। তিনি কবিকে মাসিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করে শ্যামা-সংগীত রচনা করতে আদেশ দিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মীয় শ্রীযুক্ত রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে রামপ্রসাদ "কালীকীর্তন" রচনা করেন। রামপ্রসাদের শ্যামা-সংগীত পল্লীতে পল্লীতে বিস্তৃত হয়ে ভক্ত-হৃদয়ে ভক্তির প্লাবন প্রবাহিত করেছে। রামপ্রসাদের রচনায় কোন চেষ্টা বা কৃত্রিমতা নেই। এই সংগীতগুলি সরলতায় ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক হয়েও তিনি ছন্দের বৈচিত্র্যে ও অলংকারের প্রাচুর্যে তাঁর রচনা ভারাক্রান্ত করে তোলেন নাই। সোজা কথার মালা গেঁথে সরল ভাষায় মায়ের কাছে নিজের প্রাণের কথা নিবেদন করেছেন—

"চাকি কেবল ফাঁকিমাত্র,
শ্যামা মা তোর হেমের ঘড়া।
তুই কাচমূল্যে কাঞ্চন বিকালি,
ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া॥
কর্মসূত্রে যা আছে মন,
কেবা পাবে তাহার বাড়া।
মিছে এদেশ সেদেশ করে বেড়াও,
বিধির লিপি কপাল যোড়া॥
* * *
প্রসাদ বলে ভাবছ কি মন
পাঁচ শোয়ারের তুমি জোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচাপাচি
তোমায় করবে তোলাপাড়া॥"

রামপ্রসাদ সহজ ভাবে নিজের কথা বলেছেন। আড়ম্বর নেই—আতিশয্য নেই—শুধু সরল শিশুর মত "মা মা" রব। তিনি কোন সমস্যার সমাধান করেন নাই, কোন তর্ককেও অবহেলা করেন নাই শুধু তাঁর হৃদয়ের আরাধ্যা দেবীর কৃপায় এক রূপাতীত লোকের সন্ধান পেয়েছিলেন, তাইতো তাঁর সংগীতে প্রেম ও নির্ভরতার সন্ধান পাই। মায়ের উন্মাদিনী রূপকে তিনি অস্বীকার করেন নাই—পরন্তু এই রূপের মধ্যেই এক পূর্ণতর সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। এই ধ্বংসের মধ্যেই সৃষ্টি সার্থক হয়ে ওঠে। এই করালী কালীমূর্তিই আবার ভক্তের কাছে আবির্ভূতা হন কল্যাণী মূর্তিতে। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন—"Kali appears to be a Symbol to him—a Symbol of divine punishment, of divine grace and divine motherhood." ডাঃ সুশীলকুমার দে বলেছেন যে এই দেবী মূর্তি "Is not an abstract Symbol but it becomes the means and end of a definite realisation."

মৃত্যুর পরে আমাদের অবস্থা বর্ণনা করে কবি গেয়ে উঠলেন—

"বল দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি,
কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি,
কেহ বলে সাযুজ্য মেলে।
* * *
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই,
তাই হবিরে নিদানকালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়,
জল হয়ে সে মিশায় জলে॥"

একদিন আমাদের দেশে বৃদ্ধ জনের কণ্ঠে এই

সমস্ত শ্যামা-সংগীত ধ্বনিত হতো। এই সংগীতের জন্য সুর লয় প্রভৃতির কণ্ঠ-সাধনা করতে হতো না। স্বতঃস্ফূর্ত প্রসাদী সুরের লহরী পল্লীর মাঠে ঘাটে রণিত হয়ে উঠতো; এই সংগীত শিক্ষিতের কণ্ঠে যেমন অশিক্ষিতের কণ্ঠেও তদ্রূপ উৎসারিত হতো। লোকে ভক্তিরসে আপ্লুত হ'তো। এই সংগীত এক সময়ে বাংলাদেশে লোকশিক্ষার অন্যতম পথ ছিল।

রামপ্রসাদ আগমনী গানেরও প্রথম কবি। উমা ও মেনকাকে নিয়ে তিনি যে বাৎসল্যরসের সৃষ্টি করেছেন তাহা সত্যই মাধুর্যে অনবদ্য। শারদীয়া পূজার পূর্বে আগমনী গানের করুণ সুর বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে—সেই করুণ অথচ মধুর সুরটির সঙ্গে আমরা সুপরিচিত।

রামপ্রসাদের অনুভূতি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অথচ এই গানের ভিতরে সার্বজনীনতার সুর অপূর্ব ঝংকারে বেজে উঠছে। "তান্ত্রিক উপাসনার ভয়ংকর ও সুন্দর দু'টি দিক আছে—রামপ্রসাদ ও অন্যান্য পদকর্তাদের রচনায় মানব-প্রকৃতির ভাবোন্মাদ ও মাধুর্য অপরূপ প্রকাশলাভ করেছে। এই নূতন ধারার প্রবর্তন বাংলার মানসলোকের ইতিহাসে একটা নবযুগের সূত্রপাত করেছিল। এই মাতৃভাবের সাধনা বাংলার নিজস্ব।"

রামপ্রসাদ লিখেছেন—"গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি, গানে হব ব্যক্ত।" সত্যিই কালের প্রভাবে আমরা তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলির কথা বিস্মৃত হয়েছি, কিন্তু তাঁর শ্যামা-সংগীত কোনদিনই আমরা ভুলতে পারবো না।

কালী-কীর্তনে রামপ্রসাদ কালীকে বৃন্দাবনের অনুরূপ করে অংকিত করেছেন। তিনি কালীকে দিয়ে গোষ্ঠ, রাস ও মিলনলীলা দেখিয়েছেন। সেই জন্য তাঁকে বিরুদ্ধপক্ষ আজু গোঁসাঞির বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে—"না জানে পরমতত্ত্ব, কাঁঠালের আমসত্ত্ব, মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায়রে। তা যদি হইত, যশোদা যাইত, গোপালে কি পাঠায়রে॥"

এই অনুকরণ তিনি সজ্ঞানতা অথবা অজ্ঞানতা বশতঃ করেছেন। অজ্ঞানতা বশতঃ করা খুবই স্বাভাবিক। আর সজ্ঞানকৃত হ'লে মনে হয় সাধক রামপ্রসাদ শাক্ত ও বৈষ্ণব এই উভয় সম্প্রদায়কে মিলিত করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর রচিত অনেক পদে কৃষ্ণ ও কালীর অভেদরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এই ভক্ত কবি মিলনের গান গেয়েছেন।

সাধনা*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

(সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,
মন তুই দ্যাখ্ আর আমি দেখি
আর যেন কেউ নাহি দেখে।"

কমলাকান্ত মা'র একজন ভক্ত সন্তান, সিদ্ধপুরুষ; এই গানটির মধ্যে তিনি সাধনার সব কথা বলেছেন। এর ভেতর কোনো লুকোচুরি নেই—সহজ ভক্তি।

এই গানটিতে আমরা তিনটি জিনিস পাই—(১) আদরিণী শ্যামা মা, (২) কমলাকান্ত, (৩) কমলাকান্তের মন। কমলাকান্ত মনকে বলছেন আদরিণী শ্যামা মাকে হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা কর। হৃদয়মন্দির শ্রেষ্ঠ মন্দির। দেহ-মন্দিরের দেবতাই শ্রেষ্ঠ দেবতা। তাই বলেছে—"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" অর্থাৎ রথে বামনকে দর্শন করলে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। এ

* কাটিহার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে প্রদত্ত পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজের ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে শ্রীমাধুর্যময় মিত্র কর্তৃক সঙ্কলিত।

কোন্ রথ ? হৃদয়-রথ। হৃদয়-রথে তাঁকে দেখতে হবে। তাই কমলাকান্ত বলেছেন, "যতনে হৃদয়ে রেখো" ; আহা ! আবার কি বিশেষণ দিয়েছেন—আদরিণী শ্যামা মাকে !

ঐ তিনটি জিনিস, আমি, মন, ও শ্যামা—এই তিনটি জিনিসের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। অন্য কোথাও যেতে হবে না, কোনো তীর্থে যেতে হবে না। কিন্তু এটা আমরা বুঝি কখন ? সাধনা করে, ধ্যান জপ তীর্থ করে তারপর বুঝি।

ঠাকুর একটি ছোট্ট কথা বলতেন। মন্দির অপরিষ্কার থাকলে দেবতা আসবেন কেন ? মন্দিরকে শুদ্ধ পবিত্র করতে হবে। আমরা মন্দিরকে ময়লা অপবিত্র করে রেখেছি। ঠাকুরের সেই উপদেশ স্মরণ কর। কোন গ্রামে পদ্মলোচন বলে একজন ছিল। সে হঠাৎ একদিন এক পোড়ো মন্দিরে শাঁখ বাজাতে লাগলো। গ্রামের লোকেরা ভাবলে মন্দিরে হয়তো বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। সকলে দৌড়ে এসে দেখে মন্দিরে বিগ্রহ নেই, চারিদিক অপরিষ্কার। চামচিকে ও চামচিকের বিষ্ঠায় মন্দির ভরতি। তখন গ্রামের লোকেরা বললে—

"মন্দিরে তোর নেইকো মাধব
শাঁখ ফুঁকে তুই করলি গোল।"

মন্দিরে মাধব কৈ ? তারপর চামচিকে এগার জনা সেখানে হানা দিচ্ছে। এই এগার জনা চামচিকে কারা ? পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আর মন। এই এগার জনা আবর্জনা আনছে। আমাদের বাহ্যানুষ্ঠান খুবই রয়েছে—আড়ম্বর শাঁখ ঘণ্টা রয়েছে কিন্তু মন্দিরে মাধব কই ? মাধবকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তখন শুধু "মন তুই দ্যাখ্ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে।"

"কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি"—কামনা, আসক্তি, বাসনা ওদেরকে ফাঁকি দিতে হবে। ওরই পেছনে জগৎ ছুটছে। ওর থেকে ক্রোধ প্রভৃতি সব আসছে। এই কামনা-বাসনাই মোক্ষমার্গের শত্রু। এরা আসক্তি আনে, বন্ধন করে রাখে। এদের কি করে ত্যাগ করা যাবে ? ঠাকুর বলছেন সহজ উপায় আছে—মোড় ফিরিয়ে দাও। তাঁকে কামনা করো, তাঁকে চাও। "অকামো বিষ্ণুকামো বা"—তাঁকে কামনা কামনার মধ্যে নয় যেমন মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। তাই তাঁকে কামনা করো। তাঁকে পেলে কি হয় ? সব কামনার তৃপ্তি হয়ে যায়। জাগতিক কামনাতে কি হয় ? কিছুতেই তৃপ্তি হয় না—যত ভোগ করবে ততো বাসনা বাড়বে। ফলে অশান্তি জ্বালা যন্ত্রণা। যতো রাজা রাজরা, বাইরে থেকে দেখতে বেশ কিন্তু ভেতরে অতৃপ্তি। এর অন্ত নেই।

এই কামনা সম্বন্ধে ঠাকুর একটি সুন্দর উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন। ঠাকুর যা দেখতেন তাই দিয়ে উপমা দিতেন। একটা চিল ছোঁ মেরে মাছ ধরেছে। যত কাক তাকে তাড়া করেছে। চিল উড়ে চলেছে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে, তবু কাক পিছু ছাড়ে না। শেষে চিলটা হয়রান হয়ে মাছটা ফেলে দিয়ে হাঁপ ছাড়তে লাগলো নিশ্চিন্ত হয়ে। কাকগুলো তখন ঐ মাছটা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিলে। কাকগুলো কামনা, মাছটা ভোগ। কি সুন্দর উপমা। এমনটি কোথাও পাওয়া যায় না। গীতা-শাস্ত্রাদি পাঠ করে যা পাওয়া যায়, তাই আছে এই ছোট্ট উপদেশে।

মাধবকে হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করার অন্তরায় হ'ল কামনা-বাসনা। ইন্দ্রিয়গুলো সর্বদা এই সব নিয়ে ছুটোছুটি করছে। মানুষ ভাবে কামনার পূর্তি হলেই শান্তি পাবে কিন্তু তা হয় না। অশান্তি অতৃপ্তি আরও বেড়ে যাচ্ছে তবু ইন্দ্রিয়গুলোর পেছনে ছুটে চলেছে, তারা নাকে দড়ি দিয়ে যেন মনকে ছোটাচ্ছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বার বার অর্জুনকে বলছেন—মনকে, ইন্দ্রিয়কে সংযত কর।

"তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥"

মাধব কি অমনি হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন? ঠাকুর বলতেন,—আর্শিতে ময়লা পড়লে মুখ দেখা যায় না। মন যতো শুদ্ধ পবিত্র হবে ততো তাঁকে স্পষ্ট দেখা যাবে। হৃদয় শুদ্ধ পবিত্র করতে হবে। একি কম কঠিন? এইই সাধনা। সাত্ত্বিক বুদ্ধি সর্বদা সজাগ থেকে মনকে ভেতরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, অন্তর্মুখী করছে। সাত্ত্বিক বুদ্ধি খুব বিচারশীল। রাজসিক বুদ্ধি বহির্মুখ। বাইরের বিক্ষিপ্ত মনকে ভেতরে আনতে হলে সাধন চাই। তাই কমলাকান্ত বলছেন মনেতে মাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সাধনা করতে হবে। অর্থাৎ কামাদিকে ফাঁকি দিতে হবে। এই ভাবে হৃদয়ে মাকে প্রতিষ্ঠা করে মাকে ডাক। "কুরুচি কুমন্ত্রী যতো, নিকট হতে দিও নাকো" কুরুচি কুমন্ত্রীর কথা শুনো না। কুরুচি যেন তোমাকে আশ্রয় না করে।

বিবেককে মন্ত্রী করতে হবে, সাত্ত্বিক বুদ্ধির কথা শুনতে হবে। আপনাতে আপনি থাকাই আসল কথা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে সেই উপদেশই দিচ্ছেন, ভিতরে চল। ধর্ম জিনিসটাই ভেতরের, বাইরের নয়।

সাধনা করতে করতে, ডাকতে ডাকতে মন পরিষ্কার হয়। কোটি জন্মের অর্জিত আবর্জনা সংস্কার চলে যায়। ঐ চামচিকের ময়লা টয়লা চলে যাবে। জ্ঞান-নয়নকে প্রহরী রাখতে হবে যাতে আর যেন কেউ না ঢোকে। উপনিষদে বলেছেন,—সৃষ্টিকর্তা ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখ করে সৃষ্টি করেছেন। এরা এই ভাবে সৃষ্ট তাই অন্তর্মুখ হতে চায় না। কিন্তু এসত্ত্বেও কোন শান্ত ঋষি সেই আত্মাকে দর্শন করেন। চক্ষু আবৃত করে অন্তর্মুখী করে অমৃতত্ব লাভের অভিলাষী হয়ে সেই আত্মাকে দর্শন করেন।

ঠাকুর ঐ একটি মাত্র কামনা নিয়ে চলেছিলেন। সংসারে কত কামনা, কিন্তু ঠাকুরের ঐ একটি মাত্র কামনা—'মা দেখা দাও।' রামনামের প্রার্থনাতে এই কামনার প্রার্থনা আছে।

"নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে
সত্যং বদামি চ ভবান্ অখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ।"

হে রঘুপতি! আমার বিষয়ের প্রতি কোন স্পৃহা নেই, বাসনা নেই। হৃদয়ের অন্তরতম স্থল থেকে বলছেন—সত্য করে মন মুখ এক করে বলছি আমার কোনও স্পৃহা নেই। আমাকে ভক্তি দাও—শুধু এই স্পৃহা এই কামনা আছে। আমায় শুদ্ধ অমলা নিষ্কাম ভক্তি দাও। আর দাও পূর্ণ নির্ভরতা যাতে তোমাকে আশ্রয় করে চলতে পারি। সাধনার শেষ আত্মসমর্পণ। ছোট ছেলে যেমন মাকে নির্ভর করে চলে, এ সেই নির্ভরতা। এখানে অন্য কোন স্পৃহা নেই শুধু একটি মাত্র স্পৃহা আছে। কামাদি-দোষেতে আমার মন দুষ্ট হয়েছে। আমাকে পবিত্র কর। নির্মল শুদ্ধা ভক্তি দাও। শ্রীশ্রীমা একটি সাদা বেল ফুল নিয়ে বলতেন,—"আমার মন এই ফুলের মতো শুভ্র পবিত্র কর।" বিষয়ের কামনা থাকবে না, শুধু থাকবে একটি কামনা—ভগবানকে চাই। সংসারের কামনা-বাসনার মূলে আছে তৃষ্ণা—এর থেকে আসে আসক্তি। এই সংসারের কামনার মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। বিল্বমঙ্গল কি করলেন? কত ভোগের মধ্যে ছিলেন—একটা ধাক্কা খেয়ে মোড় ফিরিয়ে দিলেন। লালাবাবু একটা কথায় সব ছেড়ে দিলেন।

তিন রকম ভাবে শেখা যায়—দেখে শেখা, শুনে শেখা, ঠেকে শেখা। লালাবাবুর শুনে শেখা, কানে যেই গেল—"বেলা যায়" অমনি শিক্ষা হয়ে গেল। অতো ঐশ্বর্য সব ছেড়ে বৃন্দাবনে গিয়ে নাম জপ করতে লাগলেন। বুদ্ধদেবের কি হল? দেখে শিখলেন। রাজার ছেলে, যুবতী স্ত্রী, আবার

একটি ছেলে হয়েছে। বাবা তাঁকে বাইরে যেতে দিতেন না।

গৌতম বাইরে এসে জরা মৃত্যু ব্যাধি দেখে ভাবলেন এসব কি! আমারও জরা আসবে, মৃত্যু আসবে,—তাই দেখে শিক্ষা হল। এদের হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায় জগৎকে দিয়ে গেলেন।

নচিকেতা যমের কাছে তিনটি প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলেন। একটি হ'ল, মানুষ মৃত্যুর পর থাকে কি থাকে না? যম আশ্চর্য হয়ে গেলেন প্রশ্ন শুনে। যম তাকে দীর্ঘ জীবন, ভোগের উপকরণ, রথ, অপ্সরী, বিস্তীর্ণ রাজ্য দিয়ে প্রলুব্ধ করতে চাইলেন। নচিকেতা বললেন—সবই দিচ্ছ কিন্তু তুমি (অর্থাৎ মৃত্যু) মাথার ওপরে রয়েছ। ভোগ করব' কি করে?

যাজ্ঞবল্ক্য গার্হস্থ্য-ধর্ম শেষ করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করবেন। দুই স্ত্রী, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে বিষয় ভাগ করে দিচ্ছেন। মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করলেন—"এর ভেতর দিয়ে কি অমৃতত্ব লাভ হবে? তা যদি না হয় তবে এ বিষয়-সম্পদের কি প্রয়োজন?" এই হ'ল আমাদের হিন্দুধর্মের আদর্শের কথা। এই ত্যাগের উপরেই হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত।

ঠাকুর এসেছিলেন ঠিক ঠিক ত্যাগের ভাব দেবার জন্যে। ঠাকুর এক হাতে মাটি আর এক হাতে টাকা নিয়ে বিচার করছেন—এ দিয়ে ভগবান লাভ হয় না। ঠিক অতীতের মুনিঋষিদের ভাবটি বজায় রেখেছেন—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' ত্যাগের দ্বারা ভোগ করতে হবে। ত্যাগ অবলম্বন করতে হবে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে—একটা গ্রহণ না করলে ত্যাগ হয় না। পূবের দিকে গেলে তবে তো পশ্চিম ত্যাগ হবে। কাকে গ্রহণ করতে হবে? নিবৃত্তি-মার্গ গ্রহণ করতে হবে। রামপ্রসাদের গানে আছে—

"প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি,
বিবেক নামে তার ব্যাটারে তত্ত্বকথা
তায় শুধাবি।"

প্রবৃত্তি ত্যাগ করে নিবৃত্তি অবলম্বন করতে হবে। বিবেককে সারথি করে তাঁর দিকে এগুতে হবে। তাঁকে পেলে সব অভাব চলে যায়। তিনি এমনই জিনিস, তাঁকে পেলে সাধক পরিতৃপ্ত হয়ে যায়।

"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।"

ভগবান লাভের চেয়ে শ্রেষ্ঠ লাভ আর কিছু নেই। তাই ঠাকুর বলেছেন,—সংসারে থাকবে তাঁর ওপর মন ফেলে রেখে। থাকো ছুতোরনীর মতো। সে যখন চিঁড়ে কোটে তখন হাত দিয়ে ত্যাখে ঠিক হচ্ছে কি না, এদিকে মুষল পড়ে যাচ্ছে, ছেলেকেও মাই দিচ্ছে। খদ্দেরের সঙ্গে দরদস্তুর করছে, সংসারের দিকেও মন দিচ্ছে, কিন্তু বার আনা মন মুষলে ফেলে রেখেছে। চার আনা মন দিয়ে বাকী কাজগুলি করছে। আমাদেরও তাই করতে হবে। এর জন্যে অভ্যাস করতে হবে। অভ্যাসই হচ্ছে যোগ। এই অভ্যাস ক্রমে ক্রমে চিত্ত শুদ্ধ ও পবিত্র করে তাঁর দিকে এগিয়ে দেবে। গঙ্গার দিকে যতো এগুবে ততো শীতল হাওয়া পাবে। সাধনভজন যতো করবে ক্রমশঃ ততো অনুভব হবে। তারপর গঙ্গায় স্নান করলে শরীর শীতল হয়ে যাবে, পবিত্র হয়ে যাবে। মাধবকে হৃদয়মন্দিরে বসাতে হবে। সাধন ভজন করতে হবে। গীতাতে ভগবান বলছেন—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"

অর্থাৎ, সেই সব ভক্তদের আমি বুদ্ধিযোগ দিই যারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে, এবং সেই শুভবুদ্ধিতে তারা আমাকে লাভ করে। মনে রাখতে হবে, এ যন্ত্রের মতো নিষ্প্রাণ ভজনা নয়, প্রীতিপূর্বক ভজনার কথা বলছেন। এত করুণা তাঁর! তিনি বলছেন, যারা আমার শরণাগত হয় তাদের অনুকম্পা করে তাদের অজ্ঞান-তমঃ নাশ করি; তাদের জ্ঞান দিই, জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিই তাদের অন্তরে।

ঠাকুর বলছেন, হাজার বছরের অন্ধকার তিনি কৃপা করলে এক নিমেষে দূর করে দেন।

তিনি চান প্রীতি কিন্তু আমরা তা দিই না।

আমাদের অনুরাগ ভালবাসা নেই। তাই তিনি বলছেন, "বকলমা দে। ঠিক ঠিক রাজার বেটা হ। মাসোহারা নে।" তাঁর উপর নির্ভর করে এগিয়ে পড়, ডুব দাও। একবার একজন পণ্ডিত এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। বেদান্তের জ্ঞান জ্ঞেয় ইত্যাদি নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। তারপর ঠাকুর বললেন, "কিন্তু আমি কি জানি—মা আছেন আর আমি আছি।" ঘরের হাওয়া বদলে গেল।

বেদান্ত সবই সত্য। তবে অবতার-পূজারও একটা প্রয়োজন আছে। তাঁরা আসেন সকলকে কৃপা করে উদ্ধার করতে। তাই যীশুখ্রীষ্ট বলছেন, 'Come ye all to me, I will give you rest." দুই হাজার বছর আগে, যারা শ্রান্ত, ক্লান্ত, জীবনের ভার বহনে যারা অক্ষম, তাদের তিনি কৃপা করেছেন, বলেছেন "আমার কাছে এস, তোমরা শান্তি পাবে।" কত সাধক তাঁর উপাসনায় সিদ্ধ হলেন।

তারও আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "আমার শরণাগত হও। আমি তোমায় সর্ব পাপ থেকে, সকল কালিমা থেকে মুক্ত করব। ধুয়ে পুঁছে সাফ করে দেব।" কে করে দেবে? এখানে স্বয়ং ভগবান বলছেন, "আমি করে দেব।" তবু আমাদের বিশ্বাস কোথায়? বিশ্বাস কাকে বলে জান? একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। পথে তাঁর পিপাসা পেয়েছে। দেখেন একটি কূপে একজন জল তুলছে। তার কাছে জল চাইলেন। সে বললে, "বাবা, আমি জাতে মুচি।" ব্রাহ্মণ বললেন, "বল শিব।" সে বললে, "শিব"। ব্রাহ্মণ বললেন, "এবার জল দাও। এখন ত' তুমি শুদ্ধ।" এর নাম বিশ্বাস। এই বিশ্বাস আমাদের নেই—আমরা হারিয়েছি। এস না অশুচি হয়ে। তাঁর শরণাগত হও, তিনি শুচি করে নেবেন। এস না গু মুত মেখে। মা বলতেন, "আমার ছেলেরা যদি গু মুত মেখে আসে, নোংরা হয়ে আমার কাছে আসে, আমি তাদের ধুয়ে পুঁছে সাফ করে নেব।" এত করুণা!

এবার সবই একাধারে কৃপা। গিরিশবাবুকে কি করলেন। আমরা দেখাদেখি করে শুনেছি। এখন সকলকে শোনাই। প্রথম দর্শনে আমাদের বললেন, "আয়, এসেছিস্। আমি কি ছিলুম, কি হয়েছি! একেবারে দেবতা করে দিয়েছে। ধমকে নয়—ভালবেসে।" গিরিশ বাবুর বিশ্বাস হ'ল—পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস। ঠাকুর যুগে যুগে ডাকছেন, "এস, ধুয়ে পুঁছে সাফ করে দেব।"

কি অহেতুকী কৃপা! জান কেশব বাবুর বাড়ী গিয়েছেন বিনা নিমন্ত্রণে। সেখানে তিনি ছিলেন না। গেলেন বেলঘরিয়া। তাঁকে পূর্ণ করে দিতেন কিন্তু কেশব বাবু নিতে পারলেন না।

এত বিদ্যা নিয়ে কি হবে? কি চাই? ডুব দিতে হবে। লোকে শান্তি খোঁজে। অভাব গেলে শান্তি হয়। অভাবে অশান্তি। এই অভাব দূর হয় কিসে? দূর হয় তাঁকে পেলে। তিনি সকলের ভিতরেই আছেন। সাধনের ভেতর দিয়ে তাঁকে জানতে হবে।

হিন্দু বিশ্বাস করে গীতা অর্জুনকে উপলক্ষ্য ক'রে বলা। রামকৃষ্ণ কথামৃতও ঐ রকম। অর্জুনকে ভগবান নিজের থেকে সব কথা বললেন—সব উপদেশ দিলেন। এর নাম অহেতুকী ভালবাসা। গুহ্যতম তত্ত্বকথা ভগবান স্বয়ং তাঁকে বলছেন—"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।" সকলের হৃদয়ে ভগবান আছেন।

তাঁর শরণাগত হও। জপধ্যানের মধ্য দিয়ে তাঁর শরণ প্রার্থনা কর। বেড়ালছানার মত হও। মায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর। তবে হবে।

তাঁকে ধরতে পারলে—তাঁর শরণ নিতে পারলে—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সব হয়। ঠাকুর এসেছেন আমাদের উদ্ধার করতে। "অবতার-বরিষ্ঠায়" কেন? সাধনা হয়ে গেছে। অপেক্ষা করছেন। ডাকছেন। শুধু ডাক নয়—কেঁদে কেঁদে ডাকছেন ব্যাকুল হয়ে—"ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্, ছুটে আয়।" যার শেষ জন্ম সে এসেছে। ভাবের ঘরে চুরি না করে চরণে পড়, যা চাইবে পাবে। কি চাই? ভিতরে আনন্দ শান্তি সব পাবে।

তিনি কেঁদে কেঁদে ডাকছেন, "তোরা আয়।" আমাদের কি উচিত নয় যে কেঁদে ছুটে যাই। এক পা গেলে তিনি একশ' পা এগিয়ে আসেন—এ অবতারের এই মজা।

তুমি লীলাময়

শ্রীকৃষ্ণধন দে

রামকৃষ্ণ, তব মাঝে ত্রেতা আর দ্বাপর মিলন,
তব আবির্ভাব লাগি' সমুৎসুক ছিল আর্তজন
আকুল প্রার্থনা বুকে। যখন ঘটিল ধর্মগ্লানি,
তোমার সহাস্য মুখে বাহিরিল বরাভয়বাণী
মানব-কল্যাণ তরে। গীতা-বেদ-বেদান্তের সার
তুমিই আখ্যানছলে প্রচারিলে মুখে আপনার
সংশয়ব্যাকুল বিশ্বে। চিনাইলে জগৎ-ধারিণী
ভক্তির প্রদীপ জ্বালি'। বাক্য তব সুধা-নিষ্যন্দিনী
দেখাল মুক্তির পথ। জীবনের যত তাপক্লেশ
তোমার প্রেমের মন্ত্রে হয়ে গেল নিমেষে নিঃশেষ।
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি, শুনেছিলে মানব-ক্রন্দন
তব জ্যোতির্ময় লোকে, তাই তুমি করিলে ধারণ
নশ্বর মানবদেহ। কে বলিবে তুমি নিরক্ষর?
—সর্বশাস্ত্রপারংগম দেব, লীলাময় পুরুষপ্রবর!

"অন্য জীবজন্তুর ভিতরে, গাছপালার ভিতরে, আবার সর্বভূতে তিনি আছেন; কিন্তু মানুষে বেশী প্রকাশ।"

"এখন দেখছি, তিনিই এক এক রূপে বেড়াচ্ছেন। কখনও সাধুরূপে, কখনও ছলরূপে,—কোথাও বা খলরূপে। তাই বলি সাধুরূপ নারায়ণ, ছলরূপ নারায়ণ, খলরূপ নারায়ণ, লুচ্চরূপ নারায়ণ।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

পাঞ্চরাত্র আগমে শক্তিতত্ত্ব

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী, এম্‌-এ, পুরাণরত্ন, বিদ্যাবিনোদ

উপাস্য দেবতার নামভেদানুসারে আগম শাস্ত্র প্রধানতঃ বৈষ্ণবাগম, শৈবাগম ও শাক্তাগম--এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। বিষ্ণু, শিব ও শক্তি যথাক্রমে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ আগমে ইষ্টদেবতারূপে প্রতিপাদিত ও উপাসিত। দার্শনিক সিদ্ধান্তের বিভেদানুসারে আগমত্রয় দ্বৈতপ্রধান, অদ্বৈতপ্রধান বা দ্বৈতাদ্বৈতপ্রধান। আচার্য রামানুজের ব্যাখ্যানুযায়ী পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণব আগম বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করে, শৈবাগম ত্রিবিধ সিদ্ধান্তেরই প্রতিপাদক, পরন্তু শাক্তাগম সর্বথা অদ্বৈত সিদ্ধান্তই প্রতিপাদন করিয়া থাকে।

বৈষ্ণবাগম সাহিত্যের দুইটি শাখা—পাঞ্চরাত্র ও বৈখানস। বৈখানস আগমের গ্রন্থাদি খুব সামান্যই উপলব্ধ হয়। মরীচি-প্রোক্ত "বৈখানস আগম" অনন্তশয়ন সংস্কৃত গ্রন্থমালায় (নং ১২১) প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিস্তৃত গ্রন্থে ৭০টি পটল; ইহার অনুশীলনের দ্বারা লুপ্তপ্রায় বৈখানস সম্প্রদায়ের প্রাচীন সিদ্ধান্তসমূহের সহিত পরিচয় লাভ করা যায়। পাঞ্চরাত্র আগমের বিশাল সাহিত্যের কিয়দংশ আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কপিঞ্জল সংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন পাঞ্চরাত্র গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, পাঞ্চরাত্র সংহিতার মোট সংখ্যা ২১৫।

পাঞ্চরাত্র মত সুপ্রাচীন। মহাভারতের শান্তিপর্বে ইহার সুস্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়,—

সাংখ্যং যোগং পঞ্চরাত্রং বেদারণ্যকমেব চ।
জ্ঞানান্যেতানি ব্রহ্মর্ষে লোকেষু প্রচরন্তি হি॥
(৩৪৯।১)

মহাভারতের নারায়ণীয় উপাখ্যানে (শান্তিপর্ব, অধ্যায় ৩৩৫—৩৫৩) পাঞ্চরাত্র আগমের সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে।

'পাঞ্চরাত্র' নামের বিভিন্ন প্রকার নিরুক্তি দৃষ্ট হয়। ঈশ্বর সংহিতার মতে (অধ্যায় ২১) শাণ্ডিল্য, ঔপগায়ন, মৌঞ্জায়ন, কৌশিক ও ভারদ্বাজ—এই পঞ্চ ঋষি মিলিত হইয়া পাঁচ রাত্রিতে এই ধর্মের উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম "পাঞ্চরাত্র"। পাদ্ম সংহিতায় উক্ত হইয়াছে, এই মতের সমক্ষে অপর পঞ্চ শাস্ত্র রাত্রির মত মলিন হইয়া যায়, এই কারণে ইহা 'পাঞ্চরাত্র' নামে আখ্যাত (জ্ঞানপাদ—অধ্যায় ১)। নারদ পাঞ্চরাত্রের মতে, 'রাত্র' শব্দের অর্থ জ্ঞান। এই শাস্ত্রে পরমতত্ত্ব, মুক্তি, ভুক্তি, যোগ ও বিষয় (সংসার) এই পঞ্চ বিষয় নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম "পাঞ্চরাত্র"।

রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।
(নারদ পাঞ্চরাত্র, ১।৪৪)

অহির্বুধ্ন্য-সংহিতাতেও এই মত স্বীকৃত।

পাঞ্চরাত্র সংহিতাগুলিতে প্রধানতঃ চারিটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে দৃষ্ট হয়, যথা জ্ঞান, যোগ, ক্রিয়া এবং চর্যা। (১) জ্ঞান-পাদে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎতত্ত্বের রহস্য এবং সৃষ্টিতত্ত্ব নিরূপণ; (২) যোগপাদে মুক্তির সাধনভূত যোগ ও প্রক্রিয়াসমূহের বর্ণনা; (৩) ক্রিয়া-পাদে দেবালয় নির্মাণ, মূর্তি স্থাপন ইত্যাদি বিবরণ এবং (৪) চর্যা-পাদে আহ্নিককৃত্য, মূর্তি ও যন্ত্রপূজার পদ্ধতি, বর্ণাশ্রম ধর্ম, পর্ব ও উৎসবাদির বিধান আলোচিত হইয়াছে। চর্যা ও ক্রিয়ার ব্যবহারিক বিবেচনাই পাঞ্চরাত্র সংহিতার মুখ্য প্রয়োজন। প্রমেয়ের মীমাংসা গৌণ ও প্রাসঙ্গিক। তন্ত্রশাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী ইহাতে সৃষ্টি ও অধ্যাত্মতত্ত্বের বর্ণনা এক সঙ্গে মিশ্রিতরূপে পাওয়া যায়।

পাঞ্চরাত্র আগমে শক্তিবাদ সম্বন্ধে অনেক

মূল্যবান্ তথ্য নিহিত আছে। 'জয়াখ্যসংহিতা' (গায়কোয়াড় ওরিয়েণ্টেল সিরিজ, নং ৫৪) পাঞ্চরাত্র আগমের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাতে শক্তিতত্ত্ব সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। অহির্বুধ্ন্য-সংহিতাতে (আদিয়ার লাইব্রেরী, মাদ্রাজ) শক্তিতত্ত্বের নানাদিক্ বিশদ ও গভীরভাবে আলোচিত হইয়াছে।

জয়াখ্যসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে,—

শক্ত্যাত্মকঃ স ভগবান্ সর্বশক্ত্যুপবৃংহিতঃ।
(৬।২২৩)

ভগবান্ শক্ত্যাত্মক এবং সর্বশক্তিতে সমৃদ্ধ। ভগবান্ তাঁহার এই সর্বশক্তিমত্তা দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

জয়াখ্যসংহিতাতে ঈশ্বরের চতুর্বিধা শক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে যথা লক্ষ্মী, কীর্তি, জয়া এবং মায়া। ইঁহারা সতত তাঁহাতে আশ্রিতা।

লক্ষ্মীঃ কীর্তির্জয়া মায়া দেব্যস্তস্যাশ্রিতাঃ সদা।
(৬।৭৭)

ঈশ্বরের ঐশ্বর্যাদি ষাড়্‌গুণ্যের মধ্যে (জ্ঞান, শক্তি, ঐশ্বর্য, বল, বীর্য ও তেজ) লক্ষ্মী ঐশ্বর্য-স্বরূপিণী। ঈশ্বরের সহিত লক্ষ্মীর অবিনাভাব সম্বন্ধ যেমন সূর্যের সহিত রশ্মির, সমুদ্রের সহিত তরঙ্গের।

সূর্যস্য রশ্ময়ো যদ্বদ্ ঊর্মযশ্চাম্বুধেরিব।
সর্বৈশ্বর্যপ্রভাবেণ কমলা শ্রীপতেস্তথা॥ (৬।৭৮)

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে,—

পরমাত্মা হরির্দেবস্তচ্ছক্তিঃ শ্রীরিহোদিতা।
শ্রীর্দেবী প্রকৃতিঃ প্রোক্তা কেশবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন হরিঃ পদ্মজাং বিনা॥

হরিই পরমাত্মা, আর তদীয় শক্তি শ্রী-নামে অভিহিতা। শ্রীদেবী প্রকৃতি এবং কেশব পুরুষ বলিয়া কথিত হন। শ্রীদেবী বিষ্ণুকে ছাড়া এবং বিষ্ণু শ্রী:কে ছাড়া কখনও থাকিতে পারেন না।

পাঞ্চরাত্র আগমের অন্তর্ভুক্ত "অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা"তে শক্তিতত্ত্ব তথা শ্রীদেবীর স্বরূপ বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে 'ইন্দুশেখরা পঞ্চকৃত্যকরী' হরির শক্তিকে বন্দনা করা হইয়াছে। সর্গ (সৃষ্টি), স্থিতি, সংহার, তিরোভাব ও অনুগ্রহ এই পঞ্চকৃত্য। হরির শক্তি শ্রীদেবী উক্ত পঞ্চকৃত্য সম্পাদন করিয়া থাকেন (১।২)।

পরব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়, দুঃখরহিত, নিঃসীম সুখানুভবস্বরূপ, অনাদি ও অনন্ত। তিনি সর্বভূতে নিবাসকারী, সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া স্থিতিকারী, নিরবদ্য ও নির্বিকার। পরব্রহ্মের সমতার উপমা-স্থল নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত সমুদ্র—"অবিক্ষিপ্তম্ অতরঙ্গার্ণবোপমম্" (২।২৩)। ইনি প্রাকৃত গুণস্পর্শহীন অথচ অপ্রাকৃত গুণরাশির আস্পদ; আকার, দেশ ও কাল দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হওয়াতে পূর্ণ, নিত্য ও ব্যাপক। ইনি হেয় উপাদেয় বর্জিত এবং ইদন্তা (স্বরূপ), ঈদৃক্‌তা ও ইয়ত্তা (পরিমাণ) এই তিনের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন (অহি'সং' ২।২২-২৫)। পরব্রহ্ম ষাড়্‌গুণ্য যোগে "ভগবান্", সমস্ত ভূতবাসী হওয়াতে "বাসুদেব" এবং সকল আত্মার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়াতে "পরমাত্মা" নামে কীর্তিত। এই প্রকারে গুণ-সমূহের বিশেষতার কারণে ইনি অব্যক্ত, প্রধান, অনন্ত, অপরিমিত, অচিন্ত্য, ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ, শিব ইত্যাদি বিবিধ নামে প্রখ্যাত। পাঞ্চরাত্র মতে পরব্রহ্মের নির্গুণ ও সগুণ উভয় ভাবই স্বীকৃত। প্রাকৃত গুণরহিত বলিয়া ইনি নির্গুণ, আবার জগৎ ব্যাপার নির্বাহার্থ অপ্রাকৃত ষড়্‌গুণযুক্ত হওয়াতে সগুণ। উক্ত ষড়্‌গুণ যথা (১) জ্ঞান (২) শক্তি, (৩) ঐশ্বর্য, (৪) বল, (৫) বীর্য এবং (৬) তেজ। এতদ্দ্বারা ভগবানের অনন্ত ও বহুধা বিচিত্র শক্তিমত্তা প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিষয়ে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ষাড়্‌গুণ্য পৃথক্‌ভাবে বর্ণিত হইলেও ইহারা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের শক্তির বিভিন্ন দিক্ মাত্র। পরব্রহ্ম শক্তিযোগেই নিজকে বহুভাবে

প্রকাশিত করিয়া থাকেন "ষাড়্‌গুণ্যং তৎ পরং ব্রহ্ম স্বশক্তি-পরিবৃংহিতম্" (২।৩২)।

(১) জ্ঞান—অজড়, স্বাত্মসংবোধী (স্বপ্রকাশ) নিত্য সর্বাবগাহী গুণকে 'জ্ঞান' বলে। জ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপও বটে, গুণও বটে। (২) শক্তি—এতদ্দ্বারা জগতের উপাদান-কারণত্ব বুঝায়। (৩) ঐশ্বর্য—ইহার অর্থ স্বাতন্ত্র্যমূলক জগৎকর্তৃত্ব। (৪) বল—জগৎ নির্মাণ ব্যাপারে ঈশ্বরের কিছুমাত্র শ্রম হয় না। এই শ্রমহানিই 'বল' নামে অভিহিত। (৫) বীর্য—জগতের উপাদান হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মের যে বিকাররাহিত্য ইহারই শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা 'বীর্য'। জগতের সমস্ত উপাদান-কারণসমূহ মধ্যে কার্যাবস্থায় বিবিধ বিকার দৃষ্টিগোচর হয়, পরন্তু নির্বিকার ভগবানে জগতের উপাদান-কারণ হওয়া সত্ত্বেও কোনও প্রকার বিকার উদিত হয় না; ইহারই নাম 'বীর্য'। (৬) তেজ—জগৎসৃষ্টিতে ঈশ্বরের যে অনপেক্ষতা তাহাকে 'তেজ' বলে। এই প্রকারে ব্রহ্মে জগতের উভয়বিধ কারণতা—উপাদান এবং নিমিত্ত কারণতা বর্তমান। ব্রহ্ম অন্য কাহারও সহায়তা ব্যতিরেকেই স্বতন্ত্রতা পূর্বক নিজ হইতেই এই সৃষ্টির উৎপাদক। 'সর্বকারণ-কারণ' বিশেষণ ব্রহ্মের এই সর্বশক্তিমত্তা ও স্বাতন্ত্র্যকেই প্রকাশিত করিতেছে। পূর্বোক্ত ষাড়্‌গুণ্যের মধ্যে "জ্ঞানই" পরব্রহ্মের উৎকৃষ্টরূপ, শক্ত্যাদি অন্য পাঁচটি গুণ জ্ঞানেরই গুণ হওয়াতে সর্বদা তৎসম্বদ্ধ থাকে।

> এতে শক্ত্যাদয়ঃ পঞ্চগুণা জ্ঞানস্য কীর্তিতাঃ।
> জ্ঞানমেব পরং রূপং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ॥
> (অহি সং, ২।৬১)

শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা বলেন,—

> শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যা অপৃথক্‌স্থিতাঃ।
> স্বরূপে নৈব দৃশ্যন্তে দৃশ্যন্তে কার্যতস্তু তাঃ।
> সূক্ষ্মাবস্থা হি সা তেষাং সর্বভাবানুগামিনী॥

সর্ববস্তুর শক্তি অচিন্তনীয় এবং তাহা বস্তু হইতে অপৃথক্ ভাবে অবস্থিত। শক্তির স্বরূপ কখনও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, কার্য দ্বারা আমরা তাহার অস্তিত্ব জানিয়া থাকি। শক্তি পদার্থের সূক্ষ্ম অবস্থা, ইহা সর্বপদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে।

ব্রহ্ম ও শক্তির সম্বন্ধ বুঝাইতে গিয়া চন্দ্র ও জ্যোৎস্নার দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হইয়াছে। ইহারা অপৃথক্, শক্তি ব্রহ্মের আত্মভূতা।

> এবং ভগবতস্তস্য পরস্য ব্রহ্মণো মুনে।
> সর্বভাবানুগা শক্তির্জ্যোৎস্নেব হিম-দীধিতেঃ॥
> (৩।৪)

ব্রহ্মের এই আত্মভূতা শক্তি নানা শাস্ত্রে নানা নামে অভিহিতা হইয়াছেন, যথা আনন্দা, স্বতন্ত্রা, নিত্যা, ব্যাপিনী, পূর্ণা, লক্ষ্মী, শ্রী, পদ্মা, কমলা, বৈষ্ণবী, কুণ্ডলিনী, অনাহতা, গায়ত্রী ইত্যাদি। এই সমস্ত নাম পরাশক্তির অনন্ত বিভব খ্যাপন করিতেছে।

> নামধেয়ৈরিয়ং তৈস্তৈঃ নানাশাস্ত্রসমাশ্রয়ৈঃ।
> অন্বর্থৈর্দর্শিতাশেষবিভবা বৈষ্ণবী পরা॥ (৩।২২)

পাঞ্চরাত্র আগমে ব্রহ্মের পরা শক্তি সাধারণতঃ "লক্ষ্মী" নামে অভিহিতা।

লক্ষ্মী শক্তি, ভগবান বিষ্ণু শক্তিমান্। ধর্ম ও ধর্মী, অহন্তা ও অহং, চন্দ্রিকা ও চন্দ্রমা, আতপ ও সূর্যের মতই শক্তি ও শক্তিমানে অবিনাভাব সম্বন্ধ স্বীকৃত হইলেও বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর মধ্যে অদ্বৈতভাব সত্ত্বেও একটা দ্বৈতভাব নিত্য বর্তমান। প্রলয়-কালেও তাঁহারা সর্বতোভাবে একীভূত হইয়া যান না, তাঁহারা যেন একটি তত্ত্বরূপে অবস্থান করেন মাত্র—"ব্যাপকাবত্তিসংশ্লেষাদেকং তত্ত্বমিব স্থিতৌ" (৪।৭৮)। অহির্বুধ্ন্যসংহিতা বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর অদ্বৈত ভাবের মধ্যেও একটা দ্বৈতভাব স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন,—

> দেবাচ্ছক্তিমতো ভিন্না ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
> এব চৈষা চ শাস্ত্রেষু ধর্ম-ধর্মিত্বভাবতঃ॥ (৩।২৫)

এই বিষ্ণুশক্তির স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—

উদধেরিব চ স্থৈর্যং মহত্ত্বেব বিহায়সঃ।
প্রভেব দিবসেশস্য জ্যোৎস্নেব হিমদীধিতেঃ ॥
বিষ্ণোঃ সর্বাঙ্গসম্ভূতা ভাবাভাবানুগামিনী।
শক্তির্নারায়ণী দিব্যা সর্বসিদ্ধান্তসম্মতা ॥
(৩।২৩-২৪)

বৈষ্ণবী শক্তির স্থৈর্য সমুদ্রের মত, মহত্ত্ব আকাশের মত, প্রভা সূর্যতুল্য এবং জ্যোৎস্না চন্দ্রতুল্য। বিষ্ণুর সর্বাঙ্গ হইতে সমুদ্ভূতা এই দিব্যা নারায়ণী শক্তি সমস্ত ভাব ও অভাব পদার্থে অর্থাৎ জড় ও অজড়ে অনুপ্রবিষ্টা, ইনি সকল সিদ্ধান্ত কর্তৃক প্রতিপাদিতা।

প্রলয়াবস্থায় আদিকারণ পরব্রহ্ম নারায়ণই বর্তমান থাকেন। বিশ্বজগৎ বীজাকারে তাঁহাতে লীন থাকে। জ্ঞানাদি ষাড়্গুণ্য তখন স্তিমিত, বায়ুবিক্ষোভহীন নিথর নিষ্কম্প আকাশবৎ ব্রহ্ম অবস্থান করিয়া থাকেন।

প্রসুপ্তাখিলকার্যং যৎ সর্বতঃ সমতাং গতম্।
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম সর্বাবাসম্ অনাহতম্ ॥
পূর্ণস্তিমিত-ষাড়্গুণ্যম্ অসমীরাম্বরোপমম্।
(৫।২-৩)

ব্রহ্মের এই যে স্তিমিতরূপ—এই মহাশূন্যতা—ইহা শক্তিরই অবস্থা-বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে "তস্য স্তৈমিত্যরূপা যা শক্তিঃ শূন্যত্বরূপিণী" (৫।৩)। প্রলয়কালে শক্তি ব্রহ্মের সহিত যেন একীভূতা হইয়া তাঁহাতে অব্যক্তভাবে অবস্থান করেন।

ভগবান্ বিষ্ণুর আত্মভূতা, স্বাতন্ত্র্যশক্তিরূপিণী লক্ষ্মী প্রলয়ান্তে কোনও অচিন্ত্যকারণে 'উন্মেষ' প্রাপ্ত হইয়া জগৎরচনা-ব্যাপারে প্রবৃত্তা হইয়া থাকেন।

স্বাতন্ত্র্যাদেব কস্মাচ্চিৎ কচিৎ সোন্মেষমৃচ্ছতি।
আত্মভূতা হি যা শক্তিঃ পরস্য ব্রহ্মণো হরেঃ ॥
(৫।৪)

পৌরুষী রাত্রির (Cosmic Night) অষ্টম বা শেষভাগে ভগবানের পরাশক্তি যেন তাঁহারই অভিপ্রায়মত জাগ্রতা হইয়া চক্ষু উন্মীলন করেন। লক্ষ্মীর এই যে উন্মেষ বা চক্ষুর উন্মীলন, ইহাকে অনন্ত বিস্তীর্ণ মহাকাশে অকস্মাৎ বিদ্যুৎস্ফুরণবৎ বর্ণনা করা হইয়াছে।

দেবী বিদ্যুদিব ব্যোম্নি কচিদ্দ্যোততে তু সা।
শক্তির্বিদ্যোতমানা সা শক্তিরিত্যুচ্যতেঽম্বরে ॥
(৫।৫)

পরাশক্তি লক্ষ্মী সৃষ্টিকালে "ক্রিয়াশক্তি" ও "ভূতিশক্তি"—এই দ্বিবিধরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি "ভূতিশক্তি"রূপে জগৎ আকারে প্রকাশিতা হন এবং "ক্রিয়াশক্তি"রূপে জগৎকে প্রাণবন্ত করেন এবং ইহাকে পরিচালনা করিয়া থাকেন।

অভেদ

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

বুদ্বুদ কহে সাগরে ডাকিয়া
"আমি কি তোমা বিহীন?
তোমার বুকেতে জনম লভিয়া
তোমাতেই হই লীন।"

"তোমা বিনা আমি শুধু বায়ু বয়ে
ভেসে যাই সমীরণে,
কভু নীলাকাশে কভু প্রান্তরে
কভু বা গহন বনে।"

* * *

ভক্ত কহিল "ওগো ভগবান্
তুমি আমি ভিন্ন নই,
তোমারই খেলার সাথী তবু সদা
মায়ার অধীনে রই।"

"তোমায় আমায় ভেদ ভেঙে দিয়ে
কর মোরে মহীয়ান্,
শরণ তোমার লই যেন প্রভু
যতদিন থাকে প্রাণ।"

*　　*　　*

অষ্ট্রিয়ার পথে

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

আবার গর্জন করে উঠলো আমাদের গাড়ি।

অনুমতি পেয়ে গেছি আমরা অষ্ট্রিয়ায় ঢোকবার।

আমরা অর্থে সবশুদ্ধ তেরো জন। ছ'জন পুরুষ, সাত জন স্ত্রীলোক।

পুরুষদের মধ্যে কয়েকজনের নাম—পি এস সাণ্টার, ই বেথেল, এ রবার্টসন, এফ জি মিচেল। আর মেয়েদের মধ্যে: মিস এম এ কটন, মিস বি সি জোন্স্, মিসেস জে আর জেবসন, মিসেস জে ক্যানাডি, মিসেস এ রবার্টসন ইত্যাদি ইত্যাদি। সকলেই ইংরেজ। সকলেই লাল টকটকে। তার মধ্যে আমি শুধু এক ভারতীয়। এক কালো। আমাদের দলটির পরিচালনার ভার নিয়েছে যে কোম্পানী তার নাম সুপারওয়েস। (Superways). ৫৩৬ সারউড্ ষ্ট্রীট, লণ্ডন।

যে তুলনায় বাসটা বড়, সে তুলনায় মানুষ খুবই কম। গদিমোড়া সুন্দর সুখাসন। হেসে-খেলে যে যেখানে ইচ্ছে বসতে পারে। আর এমন ভাবে এ দেশের বাসগুলো তৈরি যে চট্ করে ভিতরে ঠাণ্ডা আসে না। চারিধার বন্ধ কাঁচ দিয়ে। অথচ আলো আসায় বাধা নেই।

আমাদের দেশে বিধবা মেয়েরা যেমন একজনের নেতৃত্বে তীর্থযাত্রা করে, আমরাও ঠিক সেই ধরনের তীর্থযাত্রী। আলফ্রেড বাস'টিন (Tour Manager and interpreter) হচ্ছেন আমাদের কর্ণধার, আমাদের নেতা। এ দেশে তীর্থযাত্রা হচ্ছে এইটেই। চলো জার্মানি, চলো নরওয়ে, চলো চেকোশ্লাভিয়া। একবার গরম কাল এলে আর রক্ষে নেই। তীর্থযাত্রার হিড়িক পড়ে যায়। আত্মার মোক্ষ এদের কাম্য নয়। চক্ষুর চরিতার্থতাই এদের বিলাস। কোথাও কোনো দেবতার পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়া নয়। অনৈসর্গিক সৌন্দর্যের পথে এসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানো। প্রাণ ভরে নিশ্বাস নেওয়ার আত্মচেতনা। মিসেস জে ক্যানাডি যুবতী নয়। একটি বৃদ্ধা রমণী। নাক দিয়ে তার সময় সময় রক্ত পড়ে। অথচ তাকেও আসতে হয়েছে তীর্থদেবতার এই একান্ত এষণায়। দেখে আশ্চর্য হয়েছি।

এই কদিনে ভ্রমণটা কি কম হল? বাস সোঁ সোঁ শব্দে এগিয়ে গেছে। আলফ্রেড বাসটিন দাঁড়িয়ে উঠে চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছেন। বেথেল সিগারেট বিতরণ করেছে। ক্যানাডি চকোলেট খেতে দিয়েছে। মিস কটন জলন্ত দুপুরে ফ্লাস্ক থেকে জল ঢেলে খাইয়েছে। পাইনি কি? যা আমার আত্মীয় স্বজন করে থাকে, যা আমার বন্ধুবান্ধব করতে দ্বিধা করে না, এরা আমার জন্য তাই করেছে। একটা মধুর সম্পর্ক ঘনীভূত হয়েছে, সুস্পষ্ট হয়েছে এদের সঙ্গ পেয়ে। কে বলে আমি বিদেশী? দেশে-দেশে যে আমার ঘর আছে, আমার আত্মীয় আছে, তার সন্ধান যদি না রেখে থাকি—সেকি অপরের দোষ? কদিনে কী

কম জায়গা দেখা হল? লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া কোচ স্টেশন থেকে শুরু করে—উঁচু-নিচু পথে দোল খেতে খেতে বাস এসে দাঁড়িয়েছে ডোভারে। তারপর ডোভার প্রণালী পার হতে হয় স্টীমারে। এল অস্টেণ্ড, ব্রুগেস, ঘেণ্ট, বেলজিয়াম।··

তারপর বেলজিয়াম ছাড়িয়ে জার্মানির পথ। এড্‌লফ্‌ হের হিটলারের দেশ···

কোলন, সেন, বপার্ড, রাইন, বিন্‌গেন্‌, মাইনৎস্‌ ডার্মস্টাট্‌, আসফেন্‌বুর্গ, ভুৎর্সবুর্গ, ফ্র্যাঙ্কফার্ট, নুর্ণ্‌বার্গ, মুানিক···

তবু ভরেনি ত চিত্ত!···

এখনো কতো দেশ সম্মুখে সুপ্রসারিত। কতো দেশ হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কতো দ্বীপ, কতো দুর্গ, কতো প্রান্তর···কতো পরিখা···

সুইটজারল্যাণ্ড, জুরিখ, জেনেভা, ফ্রান্স, ল্যাক্সেমবার্গ, লিচটেনস্টাইন···

একে একে সবগুলো ঘুরে তবে তো আবার লণ্ডন! শেষ কোথায়? এই তো শুরু···

কিন্তু যা বলছিলাম···

একটি অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে বাস চলতে লাগলো। যতোক্ষণ না সুড়ঙ্গ শেষ হল, রুদ্ধ-নিশ্বাসে বসে থাকতে হল প্রাণটি হাতে করে। একটা ভারী, বিশমনি পাথরের চাঁই ধ্বসে পড়লেই নিশ্চিন্ত। এই সুড়ঙ্গটিকে বলা হয় ফার্ণপাশ (Fern pass)। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। চারিধার অন্ধকার। কানে শুধু অনুভব করছিলাম—বসে বসে গাড়ি চলার শব্দ। এই অন্ধকারে কি ইংরেজ, কি ভারতীয়—সবাই সমান। সকলকারই গায়ের রঙ তখন এক। সকলকারই মনের ভাবা তখন অভিন্ন।

সুড়ঙ্গ যখন পার হলাম, বাইরে এসে দেখি আকাশ অন্ধকার। আর চারপাশে কি পাহাড়ের সৃষ্টি।

যেখানে অধিক পাহাড়ের প্রাবল্য, সেখানে আলোর আশ্বাস নিরর্থক। গাছে বৃষ্টি পড়ছে, আগাছায় বৃষ্টি পড়ছে। অরণ্যে বৃষ্টি পড়ছে। ড্রাইভারের চোখের সামনে যে কাঁচের শার্সি—তার উপরও বৃষ্টি পড়ছে। আবছা হয়ে যাচ্ছে তার দৃষ্টিপথ। উইণ্ডস্ক্রীন ওয়াইপার (Windscreen wiper) চলতে লাগলো। ঘন ঘন মুছে দিতে লাগলো কাঁচের উপর থেকে জলবিন্দু। বড়-বড় ফোঁটা ফোঁটা পানবসন্তের গুটির মতো। রাস্তা ভিজে উঠলো বারিবর্ষণে।

গলফ্‌ ক্লাব পার হলাম।

পার্বত্য প্রদেশের কয়েকটি বাড়ি যেন হাত বাড়িয়ে ধরে নিতে চাইল। কোনো বাড়ির জানালা বন্ধ করছে কোনো গৃহিণী। কোনো স্ত্রীলোক হাতলওয়ালা বুরুস দিয়ে ঘর পরিষ্কার করছে।

ঝাউগাছের মতো একরকমের গাছ। বৃষ্টিতে তার পাতাগুলি কাঁপছে।···

আছাড় খেয়ে পড়ছে নবান আঙুরলতার সবুজ শাখা-প্রশাখা।

এ পর্যন্ত বেশ সহ্য করা যাচ্ছিল; আর বোধ হয় পারা গেল না। ছিঁড়ে পড়তে চাইল শিরা-অনুশিরা ভয়ে, আশঙ্কায়।—নূতন পরিবেশ, নূতন পৃথিবীর ভীতিকর পার্শ্বপরিবর্ত্তনে। মনে হল আজকের জন্যই বোধ হয় জীবনধারণ করেছিলাম। কাল আর থাকব না। শচীনদার কথা বার বার মনে আসছিল।—

শ্রীশচীন্দ্রকুমার মাইতি আমার লণ্ডনের রুমমেট। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'টো সাবজেক্টে এম-এ পাশ করে তিনি এখন লণ্ডনে এসে রিসার্চ করছেন প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে।···

সেদিন ৯ই আগষ্ট, ১৯৫৫ সন।

আমাকে সুপারওয়েসের বাসে তুলে দিতে এসে কতো প্রার্থনাই জানিয়ে গেছলেন শচীনদা। আমি আমার মা-বাবার একটি মাত্র ছেলে। বাবা বছর পাঁচেক হল মারা গেছেন। কলকাতায়

বাসায় আজ আমার অসহায়, বিধবা মা বসে বসে দিন গুনছেন। কবে আমি সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে আবার দেশে ফিরবো!…অকূল সমুদ্রে আমাদের জাহাজখানাকে দেখাবে মোচার খোলার মতো! আমার চাঁদমুখ (?) দেখে মায়ের দেহে প্রাণ ফিরে আসবে! কতো ঠাকুর-দেবতার কাছে মা মানত করে রেখেছেন। আমি ফিরলে মা পুজো দেবেন! যেন আমি শিশু। একান্ত অসহায়। তাই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী শচীনদা বলেছিলেন, ভগবানের নাম নিয়ে চলাফেরা কোরো। ঈশ্বরই তোমায় রক্ষে করবেন। আবার দেখা হবে।

বাস ছেড়ে দেবার সময় শচীনদার চোখদুটি ছলছল করে উঠেছিল।

শচীনদার অভয় বাণীতে কী ইঙ্গিত ছিল সেদিন, জানি না। কিন্তু ভয় পেতে লাগলাম বারবার। কোন্ এক অখ্যাত-অজ্ঞাত স্থানে না জীবন শেষ হয়ে যায়!

আকাশে ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো। মুহুর্মুহু বজ্রপাতের শব্দ হতে লাগলো। পাহাড় ফাটানো বজ্রের শব্দ কী নিদারুণ! লণ্ডনে বজ্রকে চিনেছি। বাংলাদেশের বজ্র আর বিলেতের বজ্র—এক নয়। দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। বাংলা দেশের মানুষ—মাটি—সবই যেমন নরম, বজ্রও তেমনি নিস্তেজ। বাংলাদেশের কৃষক, মজুর বজ্রপাতের সময় মাঠে কাজ করে, জমিতে লাঙল দেয়, চালে উঠে গোলপাতার ছাউনি বাঁধে। ছেলেমেয়ের হাত ধরে এ-গ্রাম থেকে সে-গ্রামে যায়। পুকুরের আল বাঁধে। য়ুরোপের বজ্র কিন্তু মারাত্মক। তার মনের মধ্যে কোথাও কোমলতার লেশমাত্র নেই। সে দুর্ধর্ষ, সে দুরন্ত, সে উদ্ধত। কদিন আগেই তো একটা বিলাতি দৈনিকে দেখেছি, বজ্রপাতের ফলে অনেক লোক মারা গেছে। রেসকোর্সের মঠে বজ্র আর বিদ্যুতের ফলে বহুলোক জখম হয়েছে। এরকম একটা নয়—বহু ঘটনাই ঘটে। বিলেতের মতো বিরলপর্বত স্থানে যদি এই ঘটনা ঘটে, তবে না জানি এই ঘন পাহাড়ের এক্তিয়ারে—ঘন পাহাড়ের শাসনযুক্ত এলাকায় আমাদের কি হাল হবে! এই দুর্যোগ কী শুধু আমাদের জন্যই? এই দুর্যোগের মধ্য দিয়েই কী আজ পাহাড় এগিয়ে আসছে তার অতিথিদের বরণ করতে? তার অতিথিদের সঙ্গে করমর্দন করতে?

ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠতে লাগলাম।

বাসের ছাদের খানিকটা অংশ কাঁচের। অন্য সময় সেটা একটু আলগা থাকে হাওয়াবাতাস খেলবার জন্য। এখন সেটাকে ভালো করে এঁটে—চেপে বসিয়ে দেওয়া হল।

আকাশ যেন বন্দুক দাগতে লাগলো। বিকট শব্দ উঠতে লাগলো পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে। কড়াক · কড়াক…যেন কেউ গুলী ছুড়ছে একদল নিরীহ পক্ষিশাবকের উদ্দেশ্যে।

পাহাড়ের উপর শাদা ধোঁয়া। ধোঁয়া নয়। এটাকেই বলে তুষার। মেঘের সঙ্গে তুষার এক হয়ে যেতে লাগলো। আমার জীবনে এই প্রথম তুষার দেখলাম!

জার্মান-বর্ডার পার হলাম।

অষ্ট্রিয়াতে ঢুকবো। পাশপোর্ট বার করতে হল। গাড়ি কিছুক্ষণ দাঁড়ালো। রাস্তার পাশ দিয়ে কুল-কুল করে তখন জল গড়িয়ে চলেছে। অন্য দু'একখানা গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে। তাদের—আমাদেরই মতো অবস্থা। ড্রাইভার নেমে গেল সেই বৃষ্টি ও বিদ্যুতের মধ্যেই গায়ে বর্ষাতি জড়িয়ে। অষ্ট্রিয়াপুলিশ একবার আমাদের বাসের গা ঘেঁসে চলে গেল। সকলের গতিই দ্রুত। মোটর সাইকেলের গর্জন, মেঘের গর্জন, বৃষ্টির শব্দ—সবগুলো মিলিয়ে একটা অপরূপ সংঘটন!

আবার গর্জন করে উঠলো আমাদের গাড়ি।

আমরা অনুমতি পেয়ে গেছি অষ্ট্রিয়ায় ঢোকবার।

এদিকে আকাশের অবস্থা তো সাংঘাতিক।

কখন যে বৃষ্টি আর বজ্রপাতের ঘনঘটা থামবে, তারই অপেক্ষায় দুর্গানাম জপ করছিলাম।

দেখতে দেখতে বাস্ এগিয়ে চলল।

দু'পাশে বিজন বন। কোথাও পাহাড় থেকে ঢল নামছে ঝির ঝির শব্দে। একটা পোষ্টার দেখলাম। তাতে লেখা : NOCH 19/5. KLM.

আর একটা পোষ্টার। তাতে লেখা : GOLF HOTEL. GARMISCH.

মনে হল একটু এগোলেই পাহাড়। কিন্তু দূর ছিল।……

দু'পাশে দুসারি উত্তুঙ্গ পর্বতমালা। মাঝখানে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ।…

তার মধ্য দিয়ে আমরা এগোতে লাগলাম অস্থিরায়। আবার সেই অন্ধকার, বিজন মৃত্যুর মতো। আমরা মৃত্যু থেকে মহাজীবনের পানে এগিয়ে চললাম।

গিরিপথ যখন পার হলাম, দেখি, বরফে চারি ধার কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

বিরাট দৈত্যের মতো পাহাড়। তারই সম্মুখীন হলাম। কোথায় যে এর শুরু, আর কোথায় যে এর শেষ, বোঝা কঠিন। শুনলাম, জার্মানির সব চেয়ে বড় পাহাড় বলতে যেটাকে বোঝায়, এই হচ্ছে সেই পাহাড়।" "Zngspitze"-এর দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত।

১৯৫১ সালে—দলপতি আলফ্রেড মাইক নিয়ে চীৎকার করে উঠলেন : ১৯৫১ সালে একজন ভারতীয় ছাত্র এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে সক্ষম হয়।

এসেছিল ইংরেজ ছাত্র। জার্মান ছাত্র। আমেরিকান ছাত্র। কেউ পারলো না। কেউ না। সক্ষম হল একজন ভারতীয় ছাত্র!

সঙ্গে-সঙ্গে হাততালি! আমার সঙ্গীরা স্মিত মুখে আমার দিকে চাইল।

গর্বে আমার বুক ভরে উঠলো। যেন ভারতবর্ষের সমস্ত ছাত্রের আমিই আজ একমাত্র প্রতিনিধি! তাদের প্রতিনিধিত্ব করবার দায়িত্ব আমারই স্বপক্ষে সমুপস্থিত।

বজ্রপাত বন্ধ হল।

অন্ধকার কেটে গিয়ে আকাশের একটা দিকে আলো ফুটে উঠেছে। বৃষ্টি তখন ধরে গেছল। একরকমের গাছ দেখলাম যার ডালপালাগুলিকে ঊর্ধ্ববাহু বলা চলে। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে সেই গাছের প্রাচুর্য লক্ষণীয়! তাতে তখনো বৃষ্টির চুম্বন লেগে আছে।

নেমে একটা হোটেলে কফি খেলাম। বেলা তখন চারটে।

হোটেলের কর্ত্রী—দুটি মেয়ে। ঠোঁটে রঙ নেই। অথচ কী লাবণ্যময়ী। আর তেমনি সরল। ইংরেজি তেমন জানে না। জার্মান ভাষায় কথা বলে।

হোটেল থেকে বেরোবার সময় একটা কাগজ পেলাম। তাতে লেখা : HOTEL LOWEN. FELDKIRCH. VORARLBERG. 'O'STERREICH.

ফের গাড়িতে চড়লাম।

গাড়ি এগোতে লাগলো। এবার কিন্তু আমাদের যাত্রা আরো জটিলতার পথে।

গাড়ি উঠতে লাগল পাহাড়ের গগনস্পর্শী চূড়ার ওপর। এ সেই দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত নয়। তার একটি ছোট সংস্করণ। সেখানে আঁকা-বাঁকা, পেঁচানো-পেঁচানো পথ। পথের ধারে অসমতল মাঠ। সেই মাঠ থেকে গরু তাড়িয়ে রাখাল বাড়ি ফিরছে। আমাদের দেশের রাখালের মতো এ রাখাল রিক্ত-বেশ নয়। এ রাখালের সাজ সাহেবের মতোই। উপায় কি? যে দেশের যা সাজপোষাক। শীত প্রধান দেশের এই হচ্ছে উপযুক্ত পোষাক। রাখালের হাতে ছোট একটা লাঠি।

গাড়ি ধীরে ধীরে উঁচুতে এগোতে লাগল। আর

আমরা শঙ্কিত হৃদয়ে বসে রইলাম। মাঝে মাঝে পথ এত সঙ্কীর্ণ যে সেখান দিয়ে দুটো গাড়ি যেতে পারে না স্বচ্ছন্দে। একটাকে থামতে হয়। Keep to the right চলেছে গাড়ি। আর, একখানা পাস করলে তবে অপরটিকে চালানো সম্ভব। যখন মোড় ফেরে তখন খুব সতর্ক থাকতে হয় ড্রাইভারকে। একটু অন্যমনস্ক হলেই কোথায় গিয়ে যে গাড়ি গুঁড়িয়ে যাবে, তার ঠিক নেই। আমাদের ড্রাইভার অদ্ভুত সুদক্ষ ব্যক্তি। কোথাও কারো সঙ্গে ধাক্কা না লাগিয়ে ঠিক টেনে তুলতে লাগলো গাড়িখানাকে। আলফ্রেড চেঁচিয়ে যেতে লাগলেন, এগারো শো ফুট উঁচুতে উঠলাম আমরা।

এবার পনেরো শো ফুট উঁচু দিয়ে যাচ্ছি···

এবার দু'হাজার ফুট উঁচুতে···

আর আমরা দাঁড়িয়ে উঠে এক একবার নিচের দিকে চাইছি।

ভয়ে মাথা ঘুরে যায়। নিচের খাদ এত নিচে যে দেখলে অন্তরাত্মা শিউরে উঠে।

কোথাও দু' পাশে সুনীল সরোবর। কোথাও বা একেবারে নিচে নীল হ্রদ।

একটা ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্টের প্রতিমূর্তি পথের পাশে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এ রকম একটা নয়। একাধিক প্রতিমূর্তি দেখলাম পাহাড়ের উপর উঠতে গিয়ে। প্রথমে দেখলে চমকে উঠতে হয়। যেন সত্যিকারের মানুষ। শিল্পীর দক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করবার কোনো কারণই থাকে না।

উঠে চললাম একেবারে উঁচুতে।

আলফ্রেড বললেন, তিন হাজার পাঁচশো ফুট···

একেবারে মেঘের গায়ে গিয়ে ঠেকলাম। উপর থেকে নিচের দিকে চাইলে আর কিছু থাকে না।

পাহাড়টাকে কুঁদে কুঁদে পথ করা হয়েছে। মানুষের অসাধ্য আর কী রইলো?

এবার নামার পালা।

নিচের দিকে আস্তে আস্তে নামতে লাগল বাস।

বহু কাঠের বাড়ী নজরে পড়লো। নজরে পড়লো কাঠগোলা।

হিন্দুরাই মন্দির করে দেখেছি। এবার দেখলাম ক্রীশ্চানদের মন্দির। অবিকল গ্রামের পঞ্চাননের মন্দিরের মতো। এক চিলতে। ছাদ ঢালু। দরজা নেই। সে ঘরে রয়েছে মেরী মার মূর্তি। পায়ের গোড়ায় চারটি ফুল।

পথের ধারে কেউ বা কারা তাঁবু ফেলেছে। এ তাঁবু ফেলার রেওয়াজ এখানে আকছার। তাঁবু ফেলে ছেলেমেয়েরা থাকে। গ্রামোফোন বাজায়। ছুটির দিনগুলোকে অপূর্ব মাধুর্যে শ্রীমণ্ডিত করে তোলে। অদূরে বনালয়ের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁসে একটা ট্রেন যাচ্ছে। ট্রেনের কামরার বাতিগুলো চিক্ চিক্ করে উঠছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। ট্রেনটাকে মনে হচ্ছে যেন শুঁয়া পোকা। আর বাতিগুলোকে মনে হচ্ছে—চকমকির স্ফুলিঙ্গ।

ইনস্ব্রুকে তখনো আসিনি। আবার একটা মন্দির পড়লো পথের পাশে। অদূরেই জলের কল।

ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে জল খেতে নামলো।

এই অবসরে আমিও আর পারলাম না। নেমে পড়লাম।

জুতাটা খুলেই সহসা মন্দিরে ঢুকে পড়লাম। আর ঢুকে যেন অভিভূত হয়ে গেলাম। যীশুখ্রীষ্ট বসে আছেন স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের রূপ ধরে। এক আকাশ থেকে এ যেন আর এক আকাশ। ঠিক ঠাকুরের মতোই তাঁর সৌম্য মূর্তি। মুখমণ্ডল শ্মশ্রুল। চোখের দৃষ্টি স্নিগ্ধ। এ কি দেখলাম? পায়ের গোড়ায় শ্বেত করবীর মতো কয়েকটি ফুল! দুটি জলন্ত মোমবাতি। কে এই পটুয়া যিনি এই যীশুখ্রীষ্টের মূর্তি তৈরি করেছেন? তাঁর মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হয়েছেন? কাকে স্মরণ করবো? কার ধ্যান করবো?

ইতিপূর্বে কয়েকদিন গির্জায় গেছি। ইংলণ্ডের গির্জায় উপাসনা-সঙ্গীত শুনেছি।

"Show me the way O Lord,
And make it plain ;
I would obey Thy Word,
Speak yet again ;
I will not take one step untill I know
Which way it is that Thou wouldst have me go."

ভাবার্থ যার :

আমারে দেখাও তোমার পথ প্রভু,
যে পথ সোজা—নয়কো বন্ধুর।
তোমার কথা ঠেলিনি নাথ কভু,
আবার বলো—শুনি সে প্রিয়-স্বর॥
একটি পা-ও ফেলবো না ক' বৃথা
যে পথে তুমি না ফেলাবে মিতা,
যে পথ মোর করোনি মঞ্জুর!

সঙ্গীতের রসগ্রহণ করে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু সময় সময় মন হতাশায় মুষড়ে পড়েছে। মুষড়ে পড়েছে যখন (সব নয়) কয়েকটি মুষ্টিমেয় ধূর্ত ধর্মযাজক বোঝাতে চেয়েছে, ক্রীশ্চানের ঈশ্বর অন্য জাতের নয়। অন্য জাতের ঈশ্বরকে আমরা মানি না। অথচ আমরা হিন্দু তো ক্রীশ্চানের ঈশ্বরকেও মানি। ঈশ্বর আবার দুটো হয় নাকি? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও যেমন আমাদের উপাস্য, যীশুখ্রীষ্টও তেমনি যে আমাদের ঈশ্বরের অবতার!

হিন্দু হয়ে তাঁকে প্রণাম জানালাম নতজানু অবস্থায়—সেই বিজন মন্দিরের মধ্যে!

ভগিনী নিবেদিতা

শ্রীমতী বাসনা দেবী

'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে'......

পুড়ে ছাই হয়ে যায় কিন্তু রেখে যায় অনুপম সৌরভ, যে সৌরভ বিমোহিত করে বিশ্ববাসীকে। এ সৌরভ কেবল পবনাশ্রিত নয়, বায়ুবেগে হিল্লোলিত নয় এর সত্তা—এ সুরভি পঞ্চভূতে তৈরী; কঠিন বাস্তবতার সাথে এর যোগ, সম্পূর্ণ আত্মবিলোপের দ্বারা ধূপ রূপায়িত হয় সৌরভে। ঠিক এমনিভাবে ভারতভূমিতে নিজেকে আহুতি দিয়ে তুমি হয়েছিলে 'নিবেদিতা।'

মাতৃগর্ভেই আত্মবলিদানের অদম্য সঙ্কল্প যেন জেগে উঠেছিল। মহাকালের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে জন্মালেন প্রতীচীতে। কিন্তু প্রাচ্যের সাথে যে জন্মান্তরের সম্বন্ধ! তা কি এড়ানো যায়? মুকুলিকা অপেক্ষা করছিল শুভ অরুণোদয়ের। এলো সময়, দীর্ঘ বিভাবরীর ঘটলো অবসান। শরতের সন্ধ্যায় যখন মহাযোগীবরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হলো তখন সুপ্ত হৃদয়তন্ত্রী বেজে উঠলো। ভারতের মহতী শাশ্বতী বাণী হৃদয়ে তাঁর আনলো এক অভিনব হিল্লোল। যুগাচার্যের উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান জাগালো প্রাণে এক অপূর্ব আত্মত্যাগের উদ্দীপনা। কোন্ পরশমণির স্পর্শে সম্পূর্ণ জীবনধারায় এলো এক অলৌকিক পরিবর্তন। যে ব্রতে ব্রতী হলেন তার সঙ্গে আপনাকে মুছে ফেলে রেখে গেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে মহিমময়ী কীর্তি।

যে পবিত্র যজ্ঞের বোধন করে গেলেন যুগাবতার, স্বয়ং যাকে প্রজ্বলিত করে রাখলেন যুগাবতার-সহধর্মিণী রামকৃষ্ণগতপ্রাণা সারদা, সে পবিত্র হোমাগ্নির আহুতির জন্য এগিয়ে এলেন সুদূর পাশ্চাত্য থেকে আইরিশ কন্যা শ্রীমতী নোবেল। প্রতীচীর সাথে যোগ সারা হোল। জানালেন

মাকে তাঁর অন্তরের অভিলাষ। প্রাচ্যের উদ্দেশে পাড়ি দেওয়ার জন্য সঙ্গী হতে চাইলেন মহাপুরুষের। ভারতের মহান হতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিধিব্যবস্থার সঙ্গে যিনি পরিচিত সেই স্বামীজী বোঝালেন কত ক্লেশ হবে তাঁর এই ব্রত সাধনে, কত দুঃখ বরণ করে নিতে হবে এই আদর্শগ্রহণে, কারণে অকারণে হতে হবে লাঞ্ছিত প্রাচ্যবাসীর কাছে। প্রস্তুত হলেন মহীয়সী তাপসী সকল বাধা বরণ করে নিতে। ভারতীয় রক্তই কি প্রবাহিত হচ্ছে তাঁর ধমনীতে—ভারতের সেবায় নিবেদিত প্রাণ কি কখনও প্রতীচীতে থাকতে পারে। গ্রহণ করতে পারে কি পাশ্চাত্যের ভোগলোলুপ জীবনাদর্শ? ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিতা নারী এলেন ভারতে। ভারতভূমিতে আপন সত্তা বিলিয়ে দিলেন চিরতরে, শত দুঃখ, শত গ্লানি, কত বাধা, কত বেদনা সে ব্রতে আনলো না কোন ছেদ, জাগালো না কোন বিদ্বেষ। 'ভারত' 'ভারত' মন্ত্র জপে কাটলো তাঁর অগণিত দিনগুলি। ভারতীয় আদর্শে সঞ্জীবিত জীবনের শতধারা মিশে গেল ভারতে, প্রস্ফুটিত শতদল ভারতমাতার পদতলে করলো আপনাকে উৎসর্গ।

অনাঘ্রাত, অনবদ্য জীবনকুসুম চয়ন করা হল ভারতমাতার আরাধনায়। চিত্তের মণিকোঠায় সোনার বীণাতে যে একটি তন্ত্রী অবাদিত ছিল সেই অবাদিত তন্ত্রীতে এলো সুরের রেশ। ভারতের অভিনব উদাত্ত মন্ত্রে সে হৃদয় তন্ত্রী বেজে উঠলো। যে ত্যাগের মন্ত্র প্রতীচীর কাছে চিরনূতন, সেই ত্যাগের ধ্বনি ভারতে নিত্য সনাতন এই পুণ্যভূমির চিত্তবীণায় যুগে যুগে ধ্বনিত হয়েছে সেই মহতী শাশ্বতী বেদবাণী "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।"

নূতন সুর জীবনে ধ্বনিত হলো, অতীত জীবনের সব বিসর্জন দিয়ে চলে এলেন নিবেদিতা; কঠোর ব্রত হাসিমুখে তুলে নিলেন আপন শিরে। অশিক্ষায়, অজ্ঞতায়, কুসংস্কারে জর্জরিত ভারতভূমি, বিশেষ করে ভারতীয় নারী আপন গৌরব বিস্মৃত হয়েছে, স্বমর্যাদা থেকে সে হয়েছে স্খলিত, মহিমময় ঐতিহ্য বহুকাল ধরে কেউ তুলে ধরেনি তাদের সামনে, কেউ জানায়নি তাদের আপন সংস্কৃতির রত্নপেটিকার সন্ধান।

যে ব্রত গ্রহণ করবেন তাপসী মহীয়সী, তার পূর্বে যে চাই ব্রত উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি—গুরুর বজ্রনির্ঘোষিত কণ্ঠে উচ্চারিত হলো—"ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহিনী প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না তাই অন্য জাতি হতে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক্ রক্তই তোমাকে সর্বথা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করেছে।" (ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত পত্র, আলমোড়া, ২৯।৭।১৮৯৭)।

গুরুর সতর্কবাণী ও আশিস অন্তরের অন্তস্তলে অতি সংগোপনে রক্ষা করে ব্রতী হলেন আপনার সাধনায়।

সাধনার পূর্বে চাই সাধনোপযোগী শিক্ষা ও দীক্ষা। কর্মকলরবে যে চিত্ত ক্লান্ত হবে তাকেই আগে দিতে হবে অনন্ত প্রশান্তির আহ্বান; এ নীরবতার ইঙ্গিত কোথা হতে আসবে? কে আনবে এ প্রশান্তির বাণী? 'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন'—সেই ইহ-পরকালের সহায়সম্পদ গুরুই দেবেন তার সন্ধান। সরবতায় মধ্যে নীরবতার বাণী এনে দিলেন তিনি—কর্মমুখর, কীর্তিবহুল জীবনেও যে অন্তরের আহ্বান ধ্বনিত হয়, সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনাতে আপনি বিভোর হয়ে থাকা যায় তার পথ দেখিয়ে দিলেন।

পুণ্যতোয়া জাহ্নবীকূলে, পূতপ্রশান্ত প্রকৃতির মাঝে, কর্মকোলাহল হতে অতি দূরে নির্জন তপোবনে ভারতের আদর্শভূতা মহিমময়ী নারী ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিতা হলেন। গুরু শিষ্যার অপূর্ব মিলন সংঘটিত

হলো। এরই সাথে জড়িয়ে রয়েছে ভারতের আর্যঋষির আশ্রমপ্রাঙ্গণের অতীত স্মৃতি—যেখানে সুমধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হতো বেদের জয়গাথা—শিষ্য-শিষ্যা প্রবুদ্ধ সব দিয়ে সব পাওয়ার মন্ত্র লাভ করতো। গুরুর কাছে ভগিনী লাভ করলেন সেই সব দিয়ে সব পাওয়ার মন্ত্র। বেদান্তরবির প্রভায় নিবেদিতা-কমলকলি শতদলরূপে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো। কমলের পেলব স্পর্শ অনুভূত হোলো কর্মবৈচিত্র্যে আর বেদান্ত-সূর্যের প্রভাব আপন প্রখরতার পরিচয় দিয়ে গেল অপূর্ব তেজস্বিতায়। গুরুর এই হলো অভিনব দান, অনুপম আশীর্বাণী ঐহিক সম্পদের সাথে নাহি তার যোগ, নাহি তার তুলনা, সে যে চিরন্তনী।

অতি বিচিত্র পুণ্যভূমি এ ভারতবর্ষ—সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা। অগণিত স্রোতস্বিনী বিধৌতা ভারতভূমি। অনাদিকাল থেকে কত বিচিত্রতা নিয়ে এ ভারত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। যে মাতৃমূর্তি এ ভারতের বুকে আলিঙ্গিত রয়েছে, তারই গাম্ভীর্য অটুট রাখার জন্য দুই অনন্তস্বরূপ যেন বদ্ধপরিকর। দেবীদেহে পূতা এই ভারতমাতার চরণতল ধৌত করার জন্য বীচিবিক্ষুব্ধ অসীম জলধি অধীর আবেগে যুগযুগান্তর ধরে প্রবাহিত হচ্ছে, আর যোগাসনে রত ধ্যানগম্ভীর শুভ্রতুষারাবৃত হিমগিরি কি এক মহান তত্ত্ববিকাশের জন্য চিরবিরাজিত।

"পদে পৃথ্বী শিরে ব্যোম
তুচ্ছ তারা সূর্য সোম।
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন গনিবারে পারে।"

কবির ভাষা মুখরিত হয়ে উঠেছে এ মহান উদার সৃষ্টির অপরূপ বর্ণনায়। কত ছন্দে, কত বন্দে, কত নব ভঙ্গিমায় গেয়ে গেছে কত প্রেমিক কত ভাবুক এই অনন্তের জয়গান। একাধারে সৃজন নাশনের অপূর্ব লীলাময় মহাদেব যেন সতীদেহরূপ ভারতভূমিকে আপন ক্রোড়ে সযত্নে রক্ষা করছেন। প্রেমিকের কণ্ঠে লীলায়িত ছন্দে ধ্বনিত হয়—

অম্ভোধরশ্যামলকুন্তলায়ৈ বিভূতিভূষাঙ্গজটাধরায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে, নমঃ শিবায়ৈ চ
নমঃ শিবায়॥

এই অপূর্ব লীলাময় স্থানে আপন সত্তায় অনন্তের মহিমা যথাযথ অনুভব করবার জন্য এলেন নিবেদিতা। প্রশান্ত গম্ভীর হিমালয়ের পরিবেশে শ্রীগুরুর মুখে শুনলেন এ ভারতের পুণ্যগাথা, কত বিচিত্র ভাবরসে রঞ্জিত সে কথা। যে অনন্ত প্রতি জীবে বিরাজিত তারই স্ফুরণ হয় মহীয়ান বস্তুর সাহচর্যে কিন্তু এই স্ফুরণের কোন বাহ্যপ্রকাশ নেই, আছে আন্তর বিকাশ, তা রূপায়িত হয় অনির্বচনীয় আনন্দে। মহিমময়ী ভারতমাতার যথার্থ স্বরূপ অনুভব করলেন নিবেদিতা হিমগিরির তুহিন-স্পর্শে। বুঝলেন কেন স্বামীজী এনেছেন এখানে—কবির কণ্ঠ যেন প্রতিক্ষণে ধ্বনিত হলো।

'কর্মের কলরব ক্লান্ত,
কর তব অন্তর শান্ত'

এই অন্তর্মুখীনতাই ভারতের সম্পদ, অনন্তের সাথে অনন্তের মহামিলনই পরম পুরুষার্থ কিন্তু মিলন-সেতু কি? অন্তর্মুখীনতা।

নিবেদিতা জানতে পারলেন স্বামীজীর ইঙ্গিত—চিত্ত সমাহিত করলে তবেই কর্মে অধিকার। অন্তরের সাথে প্রকৃত যোগ আনয়নের অনুকূল স্থান যেখানে পুণ্যতোয়া তরঙ্গরাজিকল্লোলিতা জাহ্নবী এক অনন্তের উপর আপন হিল্লোল জাগিয়ে আর এক অনন্তের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য অভিনব প্রয়াসে ব্যাপৃতা। কত যোগীন্দ্র, ঋষিমুনীন্দ্র এই অনুকূল পরিবেশে স্বস্বরূপের উপলব্ধি করে গেছেন। কত তপস্বী এখনও গিরিরাজের গহ্বরে অধিষ্ঠিত থেকে স্বানুভূতির চেষ্টায় রত রয়েছেন। নিবেদিতার মানস-চিত্রপটে সেই পবিত্র ধ্যানমূর্তিসকল উদ্ভিত হলো। মহীয়সী যে সাধনায় রতা হবেন তারই অনুকূল চিত্রদর্শনে আনতশিরে তাঁদেরই উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন।

প্রকৃতির অপরূপ লীলাক্ষেত্র উত্তরাখণ্ড পরিভ্রমণ করে নিবেদিতা ফিরে এলেন—সঙ্গে করে নিয়ে এলেন চিত্তসমাহিত করার অতুলনীয় সম্পদ—অন্তর্মুখীনতা, কর্মমুখর দিনগুলোর মাঝে এই অন্তর্মুখীনতাই দেবে চিত্তের প্রসাদ, আনবে অনির্বচনীয় প্রশান্তি।

জগতে অতি সামান্য বস্তুর মধ্যে বিরাট ও মহৎ কার্যের সম্ভাবনা আত্মগোপন করে থাকে। আপাতঃ দৃষ্টিতে সেই সামান্যের বিচার করলে অনেক সময় অভ্রান্ত উত্তর পাওয়া যায় না। অতি দীনতম কার্যের শুরু যেখানে মহত্ত্বরূপে তারই সারা—অনাড়ম্বরতার মাঝে যার জন্ম তারই ঐশ্বর্যের আভায় জগৎ উদ্ভাসিত। এই নিয়মের ব্যতিক্রম খুব কমই পরিলক্ষিত হয়।

অজ্ঞাত, অখ্যাত পল্লীর মধ্যে ভগিনী নির্বাচন করলেন আপন কর্মক্ষেত্র। কলকাতার সুপ্রশস্ত রাজপথে সুরম্য অট্টালিকার অভাব তখন ছিল না। স্বীয় কর্মের অনুকূল বোধ করলে তাই বেছে নিতে পারতেন। কিন্তু অনাড়ম্বরের মাঝেই যে প্রকৃত প্রাণস্পর্শ লুকিয়ে থাকে, ঐশ্বর্যের সুদীপ্ত ছটায় সে আন্তরিকতার সাবলীল গতি ব্যাহত হয়ে যায়। মাটির বাড়ীর বেল, জুঁই, মল্লিকা ফুলের স্নিগ্ধ পরিবেশ কি কখনও সমান হতে পারে ইঁট কাঠে ঘেরা প্রাসাদের সাথে? যে দেশে ভগিনী এসেছেন আপন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে, সে দেশ যে চিরকাল বহুমূল্য সম্পদও ছেঁড়া কাঁথায় জড়িয়ে রাখতে শিখেছে। অমূল্য রত্ন রক্ষা করার জন্য অমূল্য আধারও সংগ্রহ করতে হবে তার কোন প্রয়োজন বোধ করে নি। তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে ভগিনী নিবেদিতা এ রহস্য বুঝে নিয়েছিলেন। তাই তো অবহেলিত নরনারীর মাঝে খুঁজে পেলেন তাঁর উপাস্যকে। অজ্ঞতা, মূর্খতা, দীনতা, হীনতার মাঝে লুকিয়ে আছে সেই "শান্তম্ শিবম্ সুন্দরম্। দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত সংস্কারে সেই আনন্দময়ের সত্তা যেন লুপ্তপ্রায়, বিস্মৃতির অন্তরালে বিরাজিতা শক্তিকে জাগাবার প্রয়াস করলেন ভগিনী, তার জন্য উদ্ভাবন করলেন এক অভিনব পন্থা। ভারতের গৌরবময় অতীতের ইতিহাস বলে যেতে লাগলেন মেয়েদের কাছে—ভারতীয় নারীর অপূর্ব তেজস্বিতার কাহিনী শুনতে শুনতে শ্রোতার প্রাণ হিল্লোলিত হলো। গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী পদ্মিনী, রাণী ভবানী, গান্ধারী, অহল্যা, সংঘমিত্রার অপূর্ব পুণ্যগাথা যেন মৃতসঞ্জীবনী সুধার কাজ করলো। অন্তরের নিবিড় স্পর্শে সঞ্জীবিত কাহিনী বলতে বলতে নিবেদিতা বিভোর হয়ে যেতেন। হৃদয়ের সব অনুভূতি দিয়ে যে ভারতীয় আদর্শ গ্রহণ করেছেন সেই আদর্শের সম্মোহিনী শক্তি যে সব নারী-চরিত্রে অপরূপ ভাবে ফুটে উঠেছে সে সকল শ্রবণে হতচেতন ভারতললনার অন্তরাত্মা যে জাগরিত হবে তা'তে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

নিদাঘের তপ্ত দ্বিপ্রহরে কোটি কোটি প্রাণ মুমূর্ষু—নিদাঘের শ্রেষ্ঠ অবদান ক্লান্তি ও অবসাদ। কিন্তু সাধনায় রত প্রাণ, তার না আছে শ্রান্তি না আছে কর্ম অবসান। অপ্রশস্ত পল্লীর মধ্যে আরামবিহীন নির্জন কক্ষে কর্মবহুল অগণিত দিনগুলো কেটে গেছে। যে বিদ্যালয় গড়ে তুলেছেন তার অর্থাভাব। অর্থভিক্ষা সহজ নয় কারণ তখন তথাকথিত শিক্ষিত ধনী সম্প্রদায় এ আদর্শে বিশ্বাসহীন। সামান্য অতি ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের মধ্যে ভগিনী যে মহান পরিকল্পনার স্বপ্ন দেখছেন তখনকার দেশবাসীর পক্ষে বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজের পক্ষে সে চিন্তা করা সম্ভব নয়। প্রতীচীর ভাববন্যা তখন দেশকে প্লাবিত করেছে। বিদেশীয় সাংস্কৃতিক প্রভাব তখন জয়যুক্ত হয়েছে। সুতরাং অর্থোপার্জনের উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। গ্রন্থরচনার অপূর্ব কৌশল জানা ছিল নিবেদিতার। ভাষার সাবলীল ভঙ্গিমায় ও ভাবের অনবদ্য বিকাশে অগণিত গ্রন্থ রচিত হলো। তার দেশীয় ভাগই

ভারতীয় ভাবধারা, ভারতীয় জীবনযাত্রা, ভারতের শিল্পকলার অপরূপ নিদর্শন। ভগিনীর শিল্পী মন অলৌকিক ভাবে প্রকাশিত হলো তাঁর রচনার মধ্যে। শিল্পকলায় ভারতের উৎকর্ষ অনস্বীকার্য। ভারতীয় শিল্পকলায় যে গূঢ় তাৎপর্য নিহিত রয়েছে সুদূরপ্রসারী শিল্পী মনের কাছে তা যথাযথ ভাবে ধরা পড়লো। শিল্পের অতি সূক্ষ্ম রহস্যও সে সূক্ষ্ম দৃষ্টির কাছে এড়ালো না।

এক অভিনব তথ্য উদ্ঘাটিত হলো শিল্পী মনের কাছে। ধর্মই যে জাতির প্রাণ সে জাতির শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতির মধ্যে তারই ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হবে।

ভারতের প্রথিতযশা শিল্পিগণ এই শিল্পরসিকের কাছে যে কত অংশে ঋণী তার তুলনা নেই। বিদ্যালয়ের অর্থসঙ্কট দূর করবার জন্য গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হলেন কিন্তু অর্থসঙ্কট যেন গৌণ, মুখ্যরূপে প্রকাশ পেল, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বৈচিত্র্য—শিক্ষা সাহিত্য, শিল্প সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল তাতে এক বৈপ্লবিক চিন্তাধারা। জাতির মধ্যে নব প্রাণ সঞ্জীবিত করবার অভিনব প্রেরণা যোগালেন তাঁর রচনাশৈলীর মাধ্যমে।

নীরবতার শক্তিই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—চিন্তার নৈপুণ্যে ও ব্যাখ্যার বিচিত্রতায় তাঁর অতুলনীয় অবদান ভারতবাসী তখন বুঝতে পারেনি। দৈহিক মানসিক কত ক্লেশ সহ্য করে দিনের পর দিন ব্যাপৃতা রয়েছেন গ্রন্থরচনায়। যে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছেন ভারতবাসীকে সেই প্রাণস্পর্শ আবেগভরে ফুটে উঠেছে লেখনীর মূর্ছনায়। জীবনবীণায় যে সুর ঝঙ্কৃত হয়েছে সে সুরঝঙ্কারে গ্রন্থরাশিও অলঙ্কৃত হয়েছে।

শতদলে প্রস্ফুটিতা নিবেদিতা-মুকুলিকা বেদান্তরবির অভীমন্ত্রে জাগরিতা দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে প্রবৃত্ত নরনারীর সহায়তায় আপন সামর্থ্য প্রয়োগ করলেন। দাসত্বের বন্ধন যে দেশবাসীর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল—পরবশতার গ্লানি দূর করবার জন্য যখন দেশের তরুণবৃন্দের প্রাণে বৈপ্লবিক সুর বেজে উঠেছিল—ভগিনীর দেশাত্মবোধ তাদেরই সঙ্গে ঐক্যতান ধরেছিল। ভারতমাতৃকার বন্ধনমুক্তি যেন তাঁরই দেশমাতার অভিশাপ দূর করার জন্য আত্মাহুতি। সব ঝঞ্ঝা অবলীলাক্রমে সহ্য করে তরুণদের চিত্তে অসীম সাহস ও অভিনব উদ্দীপনার সঞ্চার করলেন ভগিনী নিবেদিতা। বহু তরুণপ্রাণ আহুতি দিল দেশমাতার যজ্ঞবেদীমূলে। এদিকে ভগিনীর সুকুমার তনু ক্ষীণ হয়ে এলো। মহাকালের ইঙ্গিতে পঞ্চভূত ছেড়ে যাওয়ার আহ্বান এলো। মনে হয় শৈলসুতার এ স্বস্বরূপের স্মৃতি না স্বস্বরূপে স্থিতি? গিরিরাজের দর্শনে যে তনয়ার স্বরূপ প্রবুদ্ধ হয়েছিল তাকে তো ফিরে যেতেই হবে গিরিরাজের ক্রোড়ে চিরবিশ্রান্তির প্রশান্ত নীড়ে।

তপঃক্লেশে ক্ষীণকায়া ভগিনী নিবেদিতা এলেন শৈলশিখরে। কর্মক্লান্ত দেহকে বিশ্রাম দেওয়াই ছিল আপাতদৃষ্টিতে তাঁর এ আগমনের উদ্দেশ্য, কিন্তু মহাকালের ইঙ্গিত ছিল অন্যরূপ। তপস্যা সাঙ্গ হয়েছে—শিবসাধনায় ব্রতী উমা সাধনার ফল অপূর্ব প্রেমানুভূতি লাভ করে ফিরে এসেছেন। আধিভৌতিক সম্বন্ধের এখানেই পূর্ণ বিরতি। অন্তরে অনন্ত প্রশান্তি নিয়ে শুভ্র তুষার-ক্রোড়ে বিলীন হলেন নিবেদিতা কিন্তু মানব স্মৃতিপটে হয়ে রইলেন চিরজাগরিতা।*

* আগামী ২৮শে অক্টোবর, '৫৬ (১১ই কার্তিক) ভগিনী নিবেদিতার ঊননবতিতম জন্মদিন। উহার স্মরণে আমরা বর্তমান প্রবন্ধটি এবং পরবর্তী কবিতাটি ভগিনীর অমরস্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ প্রকাশ করিলাম। —উঃ সঃ

নিবেদিতা

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

বাঙ্গালার দিগ্বিজয়ী বীরপুত্র বিবেকানন্দের
পুণ্য অভিযান-জিতা সেবা-লক্ষ্মী :—মহাভারতের
আত্মার আত্মীয় তুমি। পশ্চিমের রাজসাদ্রি-চূড়ে
জন্মিয়াও তুমি তাই ছুটে এলে এই এত দূরে
হিন্দুভারতের পূতসিন্ধু মাঝে আত্মসমর্পণ
করিতে, গঙ্গোত্রী-গুহা-নিঃসারিত গঙ্গার মতন
মহীয়সী ভগ্নী নিবেদিতা,
বাঙ্গালী ভ্রাতার প্রীতি শ্রদ্ধাঞ্জলি লহ সুচরিতা।

সাগরপারের জ্ঞাতি, শুভক্ষণে শ্রবণে তোমার
পশিল উদাত্তবাণী ভারতীয় হিন্দুসভ্যতার।
আনন্দে বিস্ময়ে হলো বিকশিত চিত্তশতদল—
বিবেক-অরুণরাগে : ভোগসুখ-সম্ভোগ সকল
ধূলিসম ত্যাগ করি অকাতরে ছেড়ে পিতৃভূমি
আসিলে প্রাচীর বুকে, সুপবিত্র ত্যাগমূর্ত্তি তুমি।
আত্মভোলা উপচিকীর্ষার
জীবন্ত প্রতিমাখানি—স্নেহ, দয়া, মমতা-আধার।

রুগ্নবিপন্নের বন্ধু, ক'রে নিলে পরকে আপন,
পরার্থে সঁপিলে নিজ চিত্ত, দেহ, জীবন, যৌবন।
দুঃসময়ে দুর্ভিক্ষে মারীতে
নগ্নপদে পথ চলি, পীড়িতের ব্যথা নিবারিতে
যোগালে ঔষধ পথ্য,—নিত্য আত্ম-ভাবনারহিতা,
মানব-মঙ্গলরতা হে মঙ্গলময়ী নিবেদিতা।

নারীত্বের পূজারিণী,—এদেশের নারীশক্তি যবে
অজ্ঞতার অন্ধকারে মুখ ঢেকে কাঁদিত নীরবে,
তোমারি দরদী চিত্ত সমদুঃখে সমবেদনায়
উঠিল অধীর হয়ে : হে বিদুষী, মায়ের মায়ায়
বসুপাড়া নিভালয়ে বিত্তালয় করিয়া স্থাপন
মূকমুখে ভাষা দিয়া জ্ঞানালোক ঢালিয়া আপন
পরের নিরাশ প্রাণে করিলে গো আশার সঞ্চার,
"নারী বিশ্বজননীর প্রতিচ্ছবি"—বুঝে নিলে সার।
"ধর্ম শুধু কথা নয়,—কাজ"
এ তত্ত্ব তোমারি মাঝে মূর্ত্ত হয়ে করিত বিরাজ।
তত্ত্বজ্ঞানময়ী তুমি, ধার্মিকের তুমি শিরোমণি,
কল্যাণ-কর্মীর সেরা, প্রেমসিদ্ধা আদর্শ জননী।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের
সেবাধর্মরূপায়িত হলো তব পুণ্য জীবনের
প্রতিকর্মে : মর্মে মর্মে বুঝে নিলে বেদান্তের বাণী ;
"যত জীব তত শিব।"—গীতাপাঠে তুমিই কল্যাণি,
জানিতে পারিলে শুধু ত্যাগী আর ত্যাগের মহিমা,
ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মসাধনার কি যে মধুরিমা!
পরতরে মরিতে যে শিখে
মৃত্যু তারে দিয়ে যায় নিজহাতে জয়পত্র লিখে।
কালের কুটিল দৃষ্টি এড়াইয়া সে-ই হয়ে রয়
মহামৃত্যুঞ্জয়!

তুমিও মরোনি দেবি, বহুকাল চরণধূলার
পরশে সরস তব হয়নি এ কলিকাতা আর
হাওড়ার রাজপথ, তবু তুমি রয়েছ বাঁচিয়া
নিত্যকাল এদেশের জনগণ-চিত্ত আলোকিয়া
নিবেদিতা, হে ব্রহ্মবাদিনি ;
অমৃত-আস্বাদ-ধন্যা অমরাত্মা মৃত্যুবিজয়িনী।
তোমারে স্মরণ ক'রে আজো সারা ভারতবাসীর
অন্তর পবিত্র হয়, শ্রদ্ধাভরে নত হয় শির।

হিমালয়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ

(আশ্বিনসংখ্যার পর)

স্বামী নিরাময়ানন্দ

এইরূপে তিন চার মাস তিব্বতের মাত্র একটি অঞ্চলে কাটাইয়া মঠমন্দির, তিব্বতীয় রীতিনীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া খ্রীঃ ১৮৮৭ অক্টোবরের শেষাশেষি গঙ্গাধর নিতিপাস দিয়া বদরী অঞ্চলে ফিরিয়া আসিলেন। পর বৎসর আবার তিব্বত গিয়া কৈলাস মানসসরোবর ও লাসা দর্শন করিবেন ভাবিয়া তিব্বতী ব্যবসায়ীদের সঙ্গ ছাড়িলেন না।

শীতকালে হরিদ্বারে নামিয়া আসিয়া মাত্র ৩।৪ দিন সেখানে থাকিয়া পুনরায় তিনি উত্তরাখণ্ডের অন্যান্য তীর্থরাজি দর্শনমানসে উপরে উঠিতে লাগিলেন। মনোমত নির্জনস্থান পাইলে সেখানে ধ্যানধারণায় কিছুকাল কাটাইয়া হিমালয়ের ধ্যান-গম্ভীর ভাবটি স্বীয় সত্তায় মিশাইয়া লইতেন। সর্বত্র ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও নির্ভরতা সর্বদা তাঁহাকে রক্ষা করিত।

খ্রীঃ ১৮৮৮ সালের মে মাসে বদরীনাথের 'পট' খুলিতেই গঙ্গাধর সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তপোভূমি হিমালয়ের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ প্রিয় বদরিকাশ্রম তাঁহাকে বার বার আকর্ষণ করিয়াছে। মানবকল্যাণ-কামনায় এইখানেই যে ভগবান স্বয়ং তপস্যা করিয়াছিলেন এবং প্রাণের ভক্তগণকে তপস্যার জন্য এইখানেই পাঠাইতেছেন। গঙ্গাধর দেখিলেন, নরনারায়ণ পর্বত রহিয়াছে, অলকানন্দাও রহিয়াছে—নাই সে বাদরায়ণি, নাই সে উদ্ধব! এই সুন্দর সুভিক্ষ পুণ্যক্ষেত্রে তিনটি মাস তপস্যায় কাটাইয়া কৈলাসদর্শনাকাঙ্ক্ষায় গঙ্গাধর এবার শিপছিলাম পাস দিয়া তিব্বতের দাবা জেলায় উপনীত হইলেন। সেখান হইতে প্রথমত তিনি পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত লাসা যাইবার চেষ্টা করেন কিন্তু স্থানীয় পুলিশ তাঁহাকে বৃটিশের চর মনে করিয়া আটক করে, ব্যবসায়ী বন্ধুরা জামিন হইয়া তাঁহাকে ছাড়াইয়া লয়। পুলিশ তাঁহাকে লাসা যাইতে নিষেধ করিয়াছিল, তবে কৈলাস ও মানসসরোবর দর্শনের অনুমতি দেয়। ঐ পথেও বিপদ তাঁহাকে অনুসরণ করে, তিনি একদল ডাকাতের হাতে পড়েন, তবে বুদ্ধিপূর্বক তাহাদের গুড় ছোলা কোনও প্রকারে খাওয়াইয়া পরিত্রাণ পান।

কৈলাস ও মানসসরোবর তিব্বতের পশ্চিমাঞ্চলে, তুষারাচ্ছন্ন মালভূমিতে অবস্থিত। কৈলাসপ্রদেশে বসতি অত্যন্ত কম। মাঝে মাঝে তুষার-ঝটিকার শৈত্যের সীমা থাকে না। কিন্তু দেশ অত্যন্ত গম্ভীর! শান্ত নিস্তব্ধ—জনলোকের ঊর্ধ্বে এ যেন তপোলোক!

মানসসরোবর তিব্বতের উচ্চ মালভূমিতে তুষার গলা জলের একটি বৃহৎ স্বচ্ছ সুন্দর সরোবর, পরিধি প্রায় ৫০ মাইল, চারিপার্শ্বে ৮টি বৌদ্ধমঠ, মঠে লামাদের ও নানা দেবতার বড় বড় মূর্তি। শুভ্র তুষারমণ্ডিত স্বয়ম্ভুলিঙ্গমূর্তি কৈলাস পর্বত, যেন সত্যলোকের প্রতিচ্ছবি মর্ত্যের বুকে! গঙ্গাধরের মন নিস্তব্ধ, নির্জন এই ঊর্ধ্বলোকে আরাধ্য দেবতার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া গেল—এতদিন যে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া, এত ক্লেশ সহ্য করিয়া এই দুর্গম গিরিপথে আসিয়াছেন আজ তাহার শেষ, আজ তাহার সার্থকতা।

কৈলাস পর্বতেরও চারিপার্শ্বে ৬টি মঠ। একটি মঠের সাধু গঙ্গাধরকে বুদ্ধের একটি আসন শিখাইয়া দেন, তাহা অতি চমৎকার। সেরূপ করিয়া বসিলে প্রথমেই শরীরে এত গরম বোধ হইবে যে গায়ে কোন আবরণ স হইবে না। গঙ্গাধর

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এরূপ আসনে বসিয়া কি করিব?' সেই সাধক উত্তর দেন, 'কিছু না, মন শূন্য কর'—যাই হোক ওই শীতপ্রধান দেশে ঐরূপ আসন শরীর রক্ষার জন্যও একান্ত প্রয়োজন।

এই দিব্যভূমিতে কিছুদিন সাধনতপস্যায় কাটাইবার জন্য এবার আর কোন মঠে না থাকিয়া কৈলাসের সন্নিকট ছেকরা নামক স্থানে তিনি লাসার এক ধনী খাম্বা (যাযাবর)-র আতিথ্য স্বীকার করিলেন। এখানে একদিন তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিখানি দেখিয়া ঐ খাম্বা বুদ্ধজ্ঞানে ভক্তিভরে উহা লইয়া যায় ও ভগবান তথাগতের সিংহাসনে রাখিয়া নিত্য পূজারতি করে।

ফিরিবার সময় গঙ্গাধর তাহাকে না বলিয়াই ছবিখানি লইয়া চলিয়া আসেন। এবারও নিতিপাস দিয়া নভেম্বরের প্রথমে তিনি আবার বদরী-নারায়ণ ফিরিলেন। পট বন্ধ হইলে এবার কুমায়ুন, আলমোড়া, রাণীখেত প্রভৃতি হইয়া কর্ণপ্রয়াগে আসিলেন এবং ঐ অঞ্চলেই শীতকাল কাটাইলেন। তুষারশ্রেণী অতিক্রম করিয়া বারংবার হিমালয়ের এপার ওপার যাওয়ার দরুণ তিব্বতী ও পাহাড়ীদের মধ্যে তিনি বরফানী বাবা নামে পরিচিত হন।

এই দুই বৎসর হিমালয়ে বাসকালে বিভিন্ন সময় তিনি পঞ্চকেদার পঞ্চবদরীর যেগুলি সাধারণ যাত্রীপথের বাহিরে—সেগুলিও দর্শন করেন এবং হিমালয়ের নির্জন দুর্গম স্থানে তপস্যায় কাল কাটান। দশরথকী ডাণ্ডা নামক এইরূপ একস্থানে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যদর্শন লাভে ধন্য হন, চন্দ্রালোকিত রজনীতে একটি গান গাহিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন, হিমালয় পুরুষপ্রকৃতির আদিম অকৃত্রিম লীলাস্থান, শিবপার্বতীর চিরমিলনভূমি।

১৮৮৯ শীতকাল এই ভাবে কাটাইয়া দশহরায় দেবপ্রয়াগে স্নানমানসে গঙ্গাধর নামিতেছেন, এমন সময় (গড়োয়াল) শ্রীনগরের নীচে স্বামী শিবানন্দের সহিত তাঁহার অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়। তিব্বতী পোষাকপরিহিত শীতে ঝলসানো-মুখ গঙ্গাধরকে দেখিয়া দূর হইতে তিনি প্রথমে চিনিতে পারেন নাই। গঙ্গাধরই 'দাদা, দাদা' বলিয়া ডাকিতে, শিবানন্দ বলিয়া উঠেন, "গঙ্গা, গঙ্গা, তুই বেঁচে আছিস?—তোর জন্যে যে মঠে কান্নাকাটি পড়ে গেছে।" তারপর দুই ভ্রাতা পরস্পরকে জড়াইয়া কাঁদিতে থাকেন। শিবানন্দ গঙ্গাধরকে নিজেদের সন্ন্যাসগ্রহণের কথা বলিয়া তাঁহাকেও তদুদ্দেশ্যে অবিলম্বে মঠে ফিরিয়া সকলকে নিশ্চিন্ত করিতে বলিলেন।

শেষ পর্যন্ত উভয়ে কেদারের পথেই চলিলেন। কেদারের পর বদরীনাথ দর্শন করিয়া শিবানন্দ গঙ্গাধরকে আবার বরানগর মঠে ফিরিতে বলিলেন। গঙ্গাধর লাসাদর্শন জন্য পুনরায় তিব্বত গমনের কথা ব্যক্ত করিলে তিনি নিষেধ করিয়া আলমোড়া চলিয়া গেলেন, ও বরানগরে গঙ্গাধরের বিস্তারিত সংবাদ লিখিয়া দিলেন।

বদরিকাশ্রমে দুই মাস তপস্যায় কাটাইয়া গঙ্গাধর নিতিপাস দিয়া পুনরায় তিব্বতে প্রবেশ করেন। এবার কিন্তু তিব্বতীয়েরা তাঁহাকে চর মনে করিয়া সাহায্য করিতে নারাজ হয় এবং পূর্বের বন্ধুরাও শত্রুর মত আচরণ করিতে থাকে।

তিব্বতী পোষাক পরিলে এবং তিব্বতীয় ভাষায় কথা বলিলে তাঁহাকে তিব্বতী বলিয়াই মনে হইত। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ নাসিকা দেখিয়া একদল ইরানী ব্যবসায়ীর দলপতি তাঁহাকে বলে, "ইরানী ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচয় দিয়া যদি আমাদের দলের সঙ্গে যাও—তো আমরা তোমায় লাসা পৌঁছাইয়া দিব।" গঙ্গাধর বলিলেন "আমি ভারতীয় সাধু,—এই মিথ্যার আশ্রয় লইয়া লাসা যাইতে চাহি না।" এতবার লাসা যাইবার চেষ্টা করিয়া, বারংবার ব্যর্থ হইয়া—শেষ মুহূর্তে মিথ্যার প্রলোভনে সাফল্যের ছায়া দেখিয়াও গঙ্গাধর সত্যের প্রতি স্বাভাবিক নিষ্ঠাবশতঃ লাসা যাইবার দৃঢ় বাসনা মন হইতে

নির্মূল করিয়া কাশ্মীরের পথে লাদাকের অভিমুখে চলিলেন।

লাদাকে পৌছিয়া তিনি গভর্ণরের অতিথি হন; তখন তাঁহার টকটকে রং, লামার মত পোষাক, লামার মত চেহারা দেখিয়া গভর্ণর তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন, কিন্তু কমিশনারের গৃহশিক্ষক তাঁহাকে চর বলিয়া সন্দেহ করে এবং কমিশনারকে এ বিষয়ে পরামর্শ দেয়। শেষ পর্যন্ত কমিশনার কাশ্মীর যাইবার ছাড়পত্র দিয়া তাঁহাকে শ্রীনগর থানায় পাঠাইয়া দেন। সেখানে বৃটিশ রেসিডেণ্ট তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে পাঁচদিন জেলে আটক রাখেন; এ কয়দিন তিনি জেলের খাবার কিছু খান নাই। নিজের সঙ্গে তিব্বতী চা ছিল, তাহা দিয়া দুগ্ধবিহীন চা প্রস্তুত করিয়া পান করিতেন, আর জেলে রক্ষীর বালকপুত্র তাঁহাকে তাহার নিজের ভাগ হইতে আপেল দিয়া যাইত। তাঁহার পরিচয় শুনিয়া পুলিশ বরানগর মঠে পত্র লেখে ও বলে, "আপনি কে ঠিক ঠিক নির্ণীত হইলেই আপনাকে ছাড়িয়া দিব।"

জেল হইতে মুক্তি দিয়াও তাঁহাকে কিছুদিন একটি পৃথক বাটীতে নজরবন্দী-রূপে রাখা হয় ও প্রশ্ন করা হয়, "কেন তিব্বত গিয়াছিলে?—কতদিন ছিলে? তিব্বতীভাষা কিরূপে শিখিলে? লামারা তোমায় এত শ্রদ্ধা করে কেন?" সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া শেষ প্রশ্নের উত্তরে গঙ্গাধর বলেন, "সে কথা লামাদের জিজ্ঞাসা করিও।" জেলে থাকা কালে চাহিয়াও গঙ্গাধর কাগজ কলম পান নাই, বাহিরে আসিয়াই তিনি বরানগর মঠ, কলিকাতায় গিরিশবাবু ও কাশীর প্রমদাবাবুকে নিজ অবস্থিতির কথা জানাইয়া পত্র লিখেন।

যথাসময়ে সব উত্তর আসিতে লাগিল। পরিচয় নির্ণীত হইলে কাশ্মীর রাজার মন্ত্রী শ্রীআশুতোষ মিত্র ও জজ শ্রীঋষিবর মুখোপাধ্যায় তাঁহার সত্বর মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কাশ্মীরের বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁহার তিব্বত ভ্রমণের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া মুক্তির প্রাক্কালে জায়গীর দিবার লোভ দেখাইয়া তাঁহাকে রাজদূতরূপে তিব্বতে পাঠাইতে চায়। গঙ্গাধর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে তাহারা তাঁহাকে তিব্বতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া দিতে অনুরোধ করে। তাহাতে অসম্মত হইয়া গঙ্গাধর বলেন, "একটি নিরীহ নিরুপদ্রব স্বাধীন জাতির সর্বনাশ করিবার জন্য আমি লেখনী ধারণ করিব না।" অবশেষে তাহারা তাঁহার ভ্রমণকাহিনী শুনিতে চায় এবং তাহারই কিছু অংশ তাহারা লিখিয়া লইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়।

কাশ্মীরে থাকাকালেই প্রমদাবাবু ও স্বামীজীকে লেখা অনেক পত্রের মধ্যেই তাঁহার হিমালয় ও তিব্বত ভ্রমণের নানা কথা লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়।

১৮৯০ জানুআরির শেষভাগে মুক্ত হইয়াই গঙ্গাধরের মনে কারাকোরম পর্বত অতিক্রম করিয়া প্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমি মধ্যএসিয়া যাইবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু মঠের প্রতি চিঠিতে ফিরিবার আহ্বান তাঁহার প্রাণে ধ্বনিত হইতে থাকে।

স্বামীজীর পত্রে জানিলেন, তিনি গাজীপুরে পওহারীবাবার দর্শনে আসিয়াছেন। কখন শাসনের সুরে, স্বামীজী তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে লিখিতেছেন, কখন অনুরোধের সুরে তাঁহাকে তাঁহার হিমালয় ভ্রমণের সাথী হইতে ডাকিতেছেন। অবশেষে গঙ্গাধর ফিরিবার জন্যই প্রস্তুত হইলেন।

এদিকে আর কখনও আসা হইবে কিনা ঠিক নাই, এই ভাবিয়া তিনি কাশ্মীরের তীর্থগুলি একে একে দেখিতে লাগিলেন, ক্ষীরভবানী, মার্তণ্ড, বেরিনাগ, অনন্তনাগ প্রভৃতি দর্শন করিলেন, কিন্তু অমরনাথদর্শনের সময় এখন নয় বলিয়া উহা আর হইল না। এপ্রিলের শেষভাগে রাওলপিণ্ডি ও লাহোর হইয়া তিনি বারাণসী পৌছিলেন।

বহুদিন পরে প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া উভয়ে পরমানন্দে বিভোর হইলেন। প্রমদাবাবু শুনিলেন তাঁহার অপূর্ব হিমালয় ভ্রমণ কাহিনী আর গঙ্গাধর শুনিলেন বরানগর মঠের ক্রমোন্নতির কথা।

স্বামীজীর দর্শনাশায় গাজীপুর গিয়া শুনিলেন তিনি সুরেশ মিত্র মহাশয়ের অসুখের সংবাদ পাইয়া কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। যাই হোক সেখানে উপর্য্যুপরি কয়েকবার পওহারী বাবাকে দর্শন করিয়া তিনি তাঁহার সাধুজনোচিত ত্যাগ তপস্যা ও বিনয়নম্র ভাব দেখিয়া ও কথাবার্তা শুনিয়া মুগ্ধ হন। শীতের দেশ হইতে সহসা গরমের মধ্যে আসিয়া এইখানে গঙ্গাধর সপ্তাহখানেক একজ্বরী হন। একটু সুস্থবোধ করিয়াই তিনি বরানগর মঠ অভিমুখে যাত্রা করেন।

গঙ্গাধর ভাবিয়াছিলেন বালিতে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া বরানগর যাইবেন। ট্রেন হইতে বালি ষ্টেশনে নামিবামাত্র পুলিশ আবার তাঁহার সঙ্গ লয় এবং হাওড়া লইয়া যায়। সেখানে তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীর কিছু লিখিয়া লইয়া বরানগর মঠ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া যায়। জুনের মাঝামাঝি—প্রায় সাড়ে তিন বৎসর অনুপস্থিতির পর অধিকাংশ কাল হিমালয় অঞ্চলে কাটাইয়া গঙ্গাধর বরানগর মঠে গুরুভ্রাতৃগণ মধ্যে উপস্থিত হইয়া আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলেন।

এই সময়েই বিরজাহোম করিয়া বরানগর মঠে তিনি যথাবিহিত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং স্বামীজী অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের জন্য লামা-প্রদত্ত গেলাং উপাধির কথা মনে করিয়া তাঁহাকে অখণ্ডানন্দ নামে অভিহিত করেন।

কিছুদিন তিব্বত ও হিমালয়ের ভ্রমণকথায় বরানগর মঠ মুখরিত করিয়া ১৮৯০ জুলাই মাসে স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া স্বামী অখণ্ডানন্দ আবার হিমালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

শোনাও সে অগ্নিমন্ত্র

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

পতিত ভারতবর্ষে, নারায়ণ, তুমি এসো আজ
পাঞ্চজন্য-গর্জনে দিকে দিকে তুলিয়া আওয়াজ।
মুক্ত করো, মুক্ত করো ক্লৈব্য হ'তে দুর্ভাগা জাতিরে;
মৃত্যু হ'তে, হে দেবতা, লও তারে অমৃতের তীরে;
ঢেকেছে আত্মারে তার অজ্ঞানের মেঘ-আবরণ!
জ্ঞানের আলোকতীর্থে হোক তার মহাজাগরণ।

তোমার এ ধরিত্রীরে করোনি তো কুসুম-পেলব
সুন্দরের লীলাভূমি! হেথা আছে রক্তাক্ত বিপ্লব
উৎসবের পাশাপাশি। হেথা স্নিগ্ধ কাকলি শিশুর
ঝড়ের গর্জন সাথে মিলাইছে আপনার সুর!
সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প আর মহামারী
তারা আর পুষ্প নিয়ে এ বিচিত্র সংসার তোমারই!
জীবন নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর আহব।
হেথা শুধু বিনাশের পথে আসে সৃষ্টির গৌরব।

সংগ্রামের পথে আসে সফলতা সত্যোপলব্ধির
বোধিদ্রুমমূলে। হেথা ভূমানন্দ ভাবসমাধির
জয় ক'রে নিতে হয় বীর্য দিয়ে তীব্র তপস্যায়।
হেথা দুঃখজয়ী যারা যুগে যুগে তরণী ভাসায়
অজানা সিন্ধুর বক্ষে, অকম্পিত কণ্ঠে যারা বলে:
সমুদ্রে ডুবুক তরী, সব কিছু যাক রসাতলে,
তবু ফিরিব না তীরে, হয় জয়, নয় সর্বনাশ—
তারাই মরিয়া গড়ে মানব-সভ্যতার ইতিহাস
রক্ত আর ঘর্ম দিয়ে। জ্যোতির্ময় নবজীবনের
তারাই পতাকাবাহী। তাহাদের বলিষ্ঠ দলের

শক্তির প্রাচুর্য আনে অন্ধকারে প্লাবন জ্যোতির।
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা ; দুর্বলেরা বোঝা ধরিত্রীর।
হীনবীর্য যে অভাগা—তার ধ্বংস কে ঠেকাতে পারে?
চরম দুর্গতি তার জীবনের এপারে ওপারে
সুনিশ্চিত। সংসারের চিরন্তন নিয়ম সংগ্রাম ;
সময়ে শৈথিল্য যার—অনিবার্য তার পরিণাম
অধোগতি আর মৃত্যু। নাহি পাপ দুর্বলতাসম ;
বীর্যের আগুন নাই যে সাধুত্বে তার নাম তমঃ—
ভীরুর ভীরুত্ব-মাখা। নাই, নাই কোন মূল্য তার।
তার চেয়ে ঢের ভালো উগ্রমূর্তি রাজসিকতার
শক্তিতে গরিমাময়ী। নারায়ণ, পতিত ভারতে
শোনাও সে অগ্নিমন্ত্র যাহা তুমি কপিধ্বজ-রথে
শুনাইলে অর্জুনেরে। পাঞ্চজন্যে আবার বাজাও :
ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে, ধনঞ্জয়, যুদ্ধ ক'রে যাও
সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়াজয় করি সমজ্ঞান ;
যুদ্ধ করো, সব্যসাচি, বর্জিয়া সমস্ত অভিমান
আপনারে যন্ত্র মানি সর্বব্যাপী ঈশ্বরের করে।
মাভৈঃ গাণ্ডীবধন্বা ; এ বিশ্বের কল্যাণ যে করে
দুর্গতি হয় না তার ; আমি তার সহায় শাশ্বত।
অর্জুন, গাণ্ডীব ধরো—যুদ্ধ করে যাও অবিরত।

শিব ও শক্তি

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

(এক)

"জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ।" হিমালয় পর্বতমালা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে উচ্চতায় সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ। কত দেশ, কত তীর্থ, নদনদী, বন উপবন তার মধ্যে—একটি বিশাল রাজ্যবিশেষ। হিমালয়ের প্রাণপুরুষকে বলত গিরিরাজ। তাঁর রাণীর নাম ছিল মেনকা। কন্যা উমা স্নেহের দুলালী, বাপ-মার চোখের আড়াল হতে জানে না। শুনলেন তিনি শিবের কথা—রূপে গুণে অপরূপ, কৈলাস-বাসী যোগী। উমা মুগ্ধ হলেন। বাসনা হল তাঁকে স্বামীরূপে পাবার। বাপ-মাকে রাজী করে, বেরুলেন তপস্যায়। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে ফিরবেন, মনে এই সঙ্কল্প।

কভু অর্ধাশনে, কভু অনশনে, কভু পর্ণকুটীরে, কভু বৃক্ষতলে, আবার কভু বা মুক্ত আকাশতলে, উন্মুক্ত প্রান্তরে, কভু গঙ্গা, কভু অলকানন্দা, কভু মন্দাকিনী-তটে—রাজকুমারী করেন তপস্যা। অহর্নিশি শিবনাম, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে। শিবধ্যান, শিবচিন্তা, হল সার। সোনার বরণ কালী হয়েছে, রুক্ষ কেশপাশ, শীর্ণকায়। শিববিরহে অপলক আঁখি বেয়ে অবিরাম অশ্রু ঝরে পড়ছে। প্রবাহিনীর রূপ ধারণ করে সে অশ্রুধারার নাম হল "বিরহী গঙ্গা"।

তুষ্ট হলেন শিব, ভোলা মহেশ্বর উমার তপস্যায়। বর দিলেন, বিবাহ করবেন। সংবাদ গেল হিমালয়ে। গিরিরাজের কাছে নেমে এলেন মহেশ কৈলাস থেকে। বিবাহ হল, নারায়ণ হলেন সাক্ষী সে বিবাহে। তিন যুগ ধরে দিচ্ছেন তিনি সাক্ষী, সেখানে থেকে। তাই নাম সে শিববিবাহ-ক্ষেত্রের 'ত্রিযুগী নারায়ণ।' ক্ষেত্র হল তীর্থ, নারায়ণ দেবতা, বিবাহ-অগ্নি আজও প্রজ্বলিত। আজও সেই তীর্থ দর্শনে যায় অসংখ্য নরনারী 'কেদারে'র পথে, পূজা ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে।

বিবাহশেষে শিবের সাথে উমা গেলেন কৈলাস। স্বামিগৃহে গৌরীকুণ্ডের পথে কেদার হয়ে। বিশাল নিস্তব্ধ কৈলাসপুরী, চারিদিকে তুষারশৃঙ্গ, যতদূর চোখ যায়। সামনে দিগন্তপ্রসারী মানসসরোবর। ভূতপ্রেত, দানাদৈত্য নন্দী ভৃঙ্গী

যে যেখানে আছে শিবের সাহচর্যে শান্ত হয়ে ধ্যানমগ্ন রয়েছে। ধ্যানমগ্ন পর্বতমালা, ধ্যানমগ্ন সরোবর, ধ্যানমগ্ন আকাশ, ধ্যানমগ্ন চন্দ্রমা, নক্ষত্র তারকাবলী যা কিছু বর্তমান সে জগতে। দেখলেন উমা সেথায় শিব সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, আর তিনি পরমেশ্বরী।

উমা আরও দেখলেন শিব জগতের দুঃখরূপ গরল পান করে নীলকণ্ঠ। আর তিনি স্নেহ করুণা কৃপা দান করে জগজ্জননী দুর্গা। তাই আজও তাঁকে পূজা করে 'মা দুর্গা' বলে জগতের লোক। শুধু তাই নয়, শিব হলেন যত পুরুষের আদর্শ, আর উমা যত নারীর আদর্শ। বিবাহের মন্ত্রেও এই কথাই বলে। পতি শিব, পত্নী দুর্গা। আবার শিব ভিখারী, দুর্গা অন্নপূর্ণা। শিব ভিক্ষা করছেন, অন্নপূর্ণা ভিক্ষা দিচ্ছেন। স্নেহ, কৃপা, করুণা, অন্নবস্ত্রের তো কথাই নেই, সবই দেন অন্নপূর্ণা। সংসারে কিছুই নেই অদেয় তাঁর। শিবের সতী অন্নপূর্ণা। শিবের ভিখারীর ভাণ্ডার হলেও অন্নপূর্ণা নিজ ভাণ্ডার সদা পূর্ণ রাখেন। জগৎসংসারকে এদৃশ্য দেখাচ্ছেন ভাঙড় বিভোলা মহেশ্বর।

এই হ'ল আদর্শ। স্বামীর সংসারে স্ত্রী স্নেহ-কৃপা-করুণা, অন্নবস্ত্র, আশ্রয় যা যা দরকার, অন্নপূর্ণার মত মুক্ত হস্তে দান করবেন। অভাব হ'লে মা অন্নপূর্ণা সে ভাণ্ডার পূর্ণ করে দেবেন। এই আদর্শ, শিবদুর্গার আদর্শ লাভ করার জন্য, জীবনকে সার্থক করার জন্য পুরুষ ও নারীর স্বামী-স্ত্রী-রূপে বিবাহ-বরণ। আর সে আদর্শ লাভ হলে গৃহ, সমাজ, দেশ স্নেহধারায় প্লাবিত হ'য়ে আনন্দে ভরপুর হয়ে যায়। বিবাহের মন্ত্র যে শুধু এই আদর্শ স্মরণ করিয়ে দেয় তা নয়, স্ত্রীর এই 'দুর্গা', 'অন্নপূর্ণা' 'জগন্মাতা'র ভাব মনে গেঁথে দেয়। 'মা দুর্গা'র ন্যায় আসনে বসিয়ে, যথাবিধি শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি সহকারে মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা, ষোড়শাদি উপচার দানে পূজা, ভোগ আরতি, স্তবস্তুতি ইত্যাদি সমন্বিত অনুষ্ঠান সহ পত্নীর পূজা করবার বিধান দিচ্ছে পতিকে তন্ত্রশাস্ত্র।

শিবকে স্বামীরূপে পেয়ে হিমালয়-কন্যা উমা হলেন জগন্মাতা দুর্গা। নিজ পরমেশ্বরস্বরূপ অনুভব করেন শিব, আবার উমার জগন্মাতার স্বরূপ জানিয়ে দেন সেই মহেশ্বর শিবই। পতিকে শিবরূপে দর্শন করার সঙ্গেসঙ্গেই অনুভব করেন পত্নী নিজেকে জগন্মাতার শক্তিরূপে।

শিব জগৎপিতা, দুর্গা জগন্মাতা। সন্তান জন্ম না হলেও পিতা ও মাতা, তাই সকলে বলে 'বাবা ভোলানাথ শিব' 'মা দয়াময়ী দুর্গা'। সারা জগতের জীব যে তাঁদের সন্তান তাই বলে 'বাবা', বলে 'মা'। তাঁদের ছেলেমেয়ে হয়ে তারা পেয়েছে দুজনের স্বরূপ। সব পুরুষই শিব, সব স্ত্রীই দুর্গা—দেবতা, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব, কিন্নর, মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যায় গাছপালা পর্যন্ত।

এই শিব-শক্তি সারা বিশ্বব্যাপী। কখন ভিন্ন শরীর কখন মিলিত শরীর। ভিন্ন শরীরে শিব আলাদা, শক্তি আলাদা। আবার মিলিত হন একই শরীরে। কিছুকাল পুরুষ, কিছুকাল নারীরূপে আবার করেন আত্মপ্রকাশ, বলছে বিজ্ঞান। শরীর দ্ব-নিরপেক্ষ হয়েও থাকেন একীভূত—সারা বিশ্বময়। যেথায় শিব সেথায় শক্তি, যেথায় শক্তি সেথায় শিব। যিনি শিব তিনিই শক্তি। বলে দিচ্ছেন ব্রহ্মজ্ঞ, সমাধিবান্ পুরুষ নিজ অনুভূতির পর।

তাই শ্রুতি বলছেন, "ত্বং স্ত্রী, ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥" "হে পরমেশ্বর তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমি কুমার ও কুমারী, তুমি বার্ধক্যে দণ্ডের সহায়তায় ভ্রমণ কর। হে সর্বব্যাপী, তুমিই সংসারে জন্মগ্রহণ কর।"

দেবতারাও তাই বলছেন, "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।" "যে দেবী মাতৃরূপে সর্বভূতে বিরাজিতা তাঁকে প্রণাম করি, তাঁকে প্রণাম করি, তাঁকে প্রণাম করি।

(দুই)

কিন্তু এ তো হল আদর্শ। শাস্ত্রের কথা, পুরাণের কথা সেই আদর্শকে বলে দিচ্ছে। কোন্ যুগের কথা সে সব। আজও কি খাটে? জানা নেই কোন যুগে মানুষ এ আদর্শ প্রত্যক্ষ করেছে কিনা। যদিই বা করে থাকে এ যুগে, এ জড়বাদী সভ্যতার যুগে, যান্ত্রিক যুগে যে যুগে বিজ্ঞান বলছে, "আমিই সব, জীব ও জগৎ, ভাঙা গড়া, পরিচালনা করা সবই আমার হাতে", আর মানুষও তাই বিশ্বাস করছে—সে যুগে এ আদর্শ কারো জীবনে কি প্রত্যক্ষ হতে পারে?

পশ্চিম বাঙলার বাঁকুড়া জেলার ইঁদেশ বা ইন্দাশ গ্রাম, নানা কারণে, বিশেষ করে "খাজা" নামক একরকম মিষ্টান্নের জন্য, নানা স্থানে প্রসিদ্ধ। গ্রামটি বর্ধিষ্ণু, কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের বাস সেখানে। যজন-যাজনশীল বলে তাঁদের খ্যাতি। পাণ্ডিত্যও ছিল কয়েকজনের। একজনের আবার বিশেষ করে। নাম গৌরী পণ্ডিত। তন্ত্রশাস্ত্রে দখল যথেষ্ট। আবার সাধক লোক। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে পড়লেন দেবতাদের স্তব একদিন—

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ, স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।"

চিন্তাশীল মন ভাবলে এখানে ত রয়েছে "হে দেবি, যত রকমের বিদ্যা আছে, সে সব তুমিই আর যত স্ত্রী মূর্তি রয়েছেন জগতে সে সবও তুমি।" কিন্তু সামনে দেখছেন জগৎ, যাকে বলে বাস্তব জগৎ। সেখানে কি? কতক স্বেচ্ছায়, কতক সমাজবন্ধনে, আবার কতক ভয়ে নারী ও পুরুষ খাটছে খুটছে, চলছে ফিরছে, উঠছে বসছে, আবার পশুর মত শরীরকে করে দিচ্ছে ভোগের সামগ্রী। কই সেখানে হংস্—নারী ভগবতীর স্বরূপ? পশুত্ব ঢেকে দিয়েছে দৃষ্টি, জড় হয়েছে বুদ্ধি, নষ্ট করেছে জ্ঞান, নিবেছে হৃদয়ের আলো। মল-মূত্র ভরা রক্তমাংসের শরীরকে দেখছে ভোগের দৃষ্টিতে। বড়ই চিন্তিত গৌরী পণ্ডিত। এমন সময় মনে এল তন্ত্রশাস্ত্রের কথা। নারীকে এমনকি সহধর্মিণীকেও ভগবতীজ্ঞানে পূজা করার বিধি দিয়েছে সে শাস্ত্র।

সামনে শরৎকাল। ধানের ক্ষেতে, গাছের পাতায় নদীর জলে, পাখীর ডাকে, আকাশের মাঝে, চারিদিকে তার পরিচয়। গ্রামের মাঝে বাজছে ঢাক এক আধটা। কুমোর ব্যস্ত ঠাকুর গড়ার আয়োজনে। সকলেই চেয়ে আছে আগমনীর আগমনপথ। গৌরী সঙ্কল্প করলেন শাস্ত্রীয় বিধির অনুষ্ঠান করবেন আগামী শারদীয়া দুর্গাপূজায়। যোগাড় হল শুরু দ্রব্যসামগ্রীর, বিধিমত, যতরকম প্রয়োজন সে অনুষ্ঠানে। বিস্তারিত আয়োজন, এক দিনের নয়, তিন দিনের পূজার। শুধু বাকী প্রতিমা। কোন ব্যবস্থাই তার হয়নি কোথাও। বুঝলে না কেউ কিসের জন্য এত আয়োজন?

শারদীয়া দুর্গাপূজার মহাসপ্তমী। আগের দিন সাজান হয়েছে দ্রব্যসামগ্রী একটি ঝক্‌ঝকে তক-তকে মেরামত করা ল্যাপাপোঁছা ঘরে। পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত ঘরের দ্বারে মাঙ্গলিক ঘট। গৌরীগৃহিণী স্বামীর ইচ্ছামত সুস্নাত, সুপরিস্কৃত, সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কারে সুসজ্জিত। পায়ে আলতা, সীমন্তে সিন্দূর, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। ধীর মন্থর পদবিক্ষেপে পতিচালিতা সীমন্তিনী চললেন পূজার ঘরে। আলপনা দেওয়া মেঝের উত্তর ভাগ, সে অংশে মাঝখানে পাতা একখানি পদ্ম আঁকা আলপনার পিঁড়ে। বসলেন তার ওপর দক্ষিণমুখী হয়ে। সামনে রাখা হল পূজার আসন, ঘটা পুষ্প ইত্যাদি।

উত্তর মুখ হয়ে বসলেন গৌরী পূজায়, সামনে জীবন্ত প্রতিমা। দ্রব্যশুদ্ধি ইত্যাদি করে আরম্ভ হল ন্যাস নিজ অঙ্গে, শেষে প্রতিমা অঙ্গে। ভুললেন গৌরী নিজ মানবদেহ, দেখলেন শিব বর্তমান সেথা। গৃহিণীরও চলে গেল মানবী শরীর দৃষ্টিপট থেকে, আবির্ভূতা দেবী মূর্তি। সাক্ষাৎ আনন্দময়ী সে শরীরে। গৌরীরও হল অনুভব তাই। শিবের সামনে দুর্গা, অন্নপূর্ণা। গৌরী পণ্ডিত শিব, সহধর্মিণী অন্নপূর্ণা, দুর্গা। পূজা হলো ভক্তিভরে যথারীতি, যথাশাস্ত্র। নিজের হাতে ধুইয়ে দিলেন পূজক মায়ের পা, পরিয়ে দিলেন সুগ্রথিত সুগন্ধি ফুলের মালা। খাইয়ে দিলেন ভক্তিশ্রদ্ধা ভরে নানা রকমের ফল মিষ্টি জল, স্বহস্তে। দিলেন আচমন, দিলেন পান। অন্তে অঞ্জলি দিলেন, ফুল বেলপাতা, দূর্বা চন্দন দিয়ে মায়ের পায়ে। একবার নয়, কয়েকবার। আরতি, ভোগ, স্তবস্তুতি, প্রণাম সবই হোল করা। শেষে বন্দনা। গৌরী সাক্ষাৎ ভগবতী দেখছেন সামনে, তাঁর কাছে করছেন প্রার্থনা। জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস যত কিছু আসছে মনে আবেগভরে। আসন থেকে উঠে হোল চরণামৃত পান, প্রসাদ-ধারণ ও অপরকে বিতরণ। মৃত্তিকা দারু ধাতু দিয়ে গড়া প্রতিমায় যেমন হয় ভগবতীর দর্শন, জীবন্ত মানবী প্রতিমায়ও হয় আনন্দময়ীর সাক্ষাৎকার, করলেন বেশ স্পষ্ট অনুভব। বড়ই আনন্দ গৌরীর, বড়ই আনন্দ সতী-লক্ষ্মী সীমন্তিনীর। এইভাবে হোল পূজা তিন দিন, শারদীয়া মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী।

বদলে গেল জগৎ। এই যুগেও যত স্ত্রী মূর্তি হোলেন সাক্ষাৎ জগদম্বার মূর্তি। শুধু মূর্তি নয়, জগন্মাতার জগৎপালিনী আনন্দদায়িনী শক্তি সকলের মধ্যে বিশেষ ভাবে। যত পুরুষ মূর্তিতে সাক্ষাৎ শিবের প্রকাশ। হয়ে গেল কর্তব্য স্থির। পবিত্র স্ত্রী শরীর—পবিত্র পুরুষ শরীর। পূজা করতে হবে ভক্তি অর্ঘ্য দিয়ে স্ত্রীমূর্তিকে জগজ্জননী শক্তি দুর্গা উমা অন্নপূর্ণা ইত্যাদি জ্ঞানে। পুরুষমূর্তিকে সর্বংসহ, দুঃখহর, শান্ত, শান্তিদায়ক শিব ভোলানাথ মহেশ্বর জ্ঞানে। তন্ত্রের শিক্ষা ও সাধনা হোল সত্য। সাধক গৌরী ও তাঁর সাধ্বী গৃহিণীর কাছে দৈহিক সম্পর্ক, জড়ভাব সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি শেষ হল। এই স্মরণীয় দিনের, স্মরণীয় অনুষ্ঠান প্রতিফলিত হত শারদীয়া পূজার সময় প্রতি বছর। গৌরী করতেন পূজা সহধর্মিণীর এই ভাবে তিন দিন। যখন গৌরী পণ্ডিত দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা শুনে আনন্দ করেছিলেন। গৌরী পণ্ডিতের কত প্রশংসা উত্তরকালে ভক্তদের কাছে তিনি করতেন।

সায়াহ্নে

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার

(Henry Francis Lyte রচিত 'Abide with me' নামক প্রসিদ্ধ গীতি-কবিতার অনুবাদ

উতলা সন্ধ্যা আসিছে নামিয়া
রহিও প্রভু সাথে,
তিমির রজনী হতেছে গভীর
রহিও সাথে সাথে !
সখারা যখন ভুলিল আমারে
মিলাল সব সুখ,

সহায়হীনের সহায় তুমি যে
ঢেক না তব মুখ !
এ জীবন-স্রোত বহিছে দ্রুত
ঘনায়ে আসে বেলা,
হেথাকার সুখ মিলায়ে যায়
মিলায় সব খেলা।

সবারে ঘিরিয়া জরা ও মরণ
চপল নৃত্যে মাতে,
অজর অমর চিরদিন তুমি
রহিও প্রভু সাথে!
সত্তা তোমার প্রভু হে আমার
চাহি যে ক্ষণে ক্ষণে,
তব দয়া বিনা পাপ অরি তারে
নাশিবে কোন জনে!
গুরু তব সম নির্ভর মম
কে আছে মোর নাথ,
রবির কিরণে মেঘের আঁধারে
রহিও সাথে সাথ!
তুমি কাছে আছ এ কথা স্মরিলে
অরিরে নাহি ডরি,
রোগ শোক মোরে ব্যথিতে না পারে
সুধা সে অশ্রু-বারি!

মরণের ভয় কোথা আর রয়
মৃত্যুর কোথা জয়?
তুমি যদি মোর রহ সাথে সাথে
নাহি আর পরাজয়।
নয়ন আমার আসিছে মুদিয়া
দেখাও তব রূপ,
আঁধারের মাঝে দীপ্তি তোমার
ভাতিবে অপরূপ!
সুদূর গগনে নয়ন আমার
করিও প্রসার স্বামী,
ছায়া সম যত মিলাইবে সুখ
ভুলিব সকলি আমি।
হেরিব নবীন ঊষার উদয়
কিরণ ঝরিবে মাথে,
জীবনে মরণে হে প্রভু আমার
রহিও সাথে সাথে!

"নাচুক তাহাতে শ্যামা"*

স্বামী জীবানন্দ

ভাল লাগে প্রস্ফুটিত ফুলের সৌন্দর্য ও সৌরভ, অম্লান জ্যোৎস্নাভরা পৃথিবী, মলয় বাতাস, পাহাড়-পর্বত-নদনদীর প্রাকৃতিক শোভা, কলস্বনা ঝরনা, ভ্রমরের গুঞ্জরণ, পাখীর গান, আকাশে রঙের খেলা, নৃত্যগীত-কবিতা, হাসির ফোয়ারা—এক কথায় যা কিছু চিত্ত-সুখকর তাই-ই। ভাল তো লাগে না ঝরা ফুল, অমানিশার ঘন আঁধার, দুর্যোগময়ী রজনী, উদ্দাম ঝঞ্ঝাবাত, যুদ্ধ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প, মৃত্যুর নির্মম আঘাত—এক কথায় যা কিছু ভয়াবহ ও দুঃখকর সবই।

"দেহ চায় সুখের সঙ্গম, চিত্ত-বিহঙ্গম
সঙ্গীত সুধার ধার।
মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল,
যাইতে দুঃখের পার॥"

মনের স্বাভাবিক গতিই এই।

কিন্তু জগতে অবিমিশ্র সুখও নেই, দুঃখও নেই। কারুর জীবনে কেবল সুখের আস্বাদ তা কেউ বলতে পারেন না বা শুধু যে একটানা দুঃখ তাও নয়। সুখের পশ্চাতে দুঃখ যেন আলো-আঁধারের লুকোচুরি!

মানুষের জীবনে সুখ থেকে দুঃখের ভাগই বরঞ্চ বেশি। স্বাস্থ্যহীনতার দুঃখ, মূর্খতার দুঃখ! অভাব অনটন রোগ শোক জরা মৃত্যু—জ্বালা যন্ত্রণা বিবাদ বিসম্বাদ—এ ছাড়া আর তো কিছুই যেন চোখে পড়ে না। যে দিকে তাকাই এই চিত্র। এই তো জীবন! জন্মগ্রহণে দুঃখ, জীবনধারণে দুঃখ, মরণেও দুঃখ। জীবন যেন দুঃখে গড়া!

জীবন দুঃখময় হ'লেও সবাই দুঃখকে এড়িয়ে

* স্বামী বিবেকানন্দের সুপ্রসিদ্ধ কবিতা।

চলে, কেউ চায় না তাকে। যদিও জানে ভাল-ভাবেই যে সুখ শুধু মরীচিকার মত প্রলোভন দেখায় তথাপি সুখের পিছনেই মানুষ ছুটে চলেছে বিরাম-বিহীন গতিতে।

"সুখ তরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর
দুখে যার ভালবাসা।
সুখে দুঃখ, অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু
নাহি ছাড়ে আশা॥"

শাস্ত্রকারেরা সমস্ত সুখদুঃখকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন: আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক। নিজের শরীর-মনকে কেন্দ্র ক'রে যে সুখদুঃখের অনুভূতি তা আধ্যাত্মিক। অপরের কাছ থেকে যে সুখদুঃখ আসে তা হ'ল আধিভৌতিক। আর যে সুখদুঃখ দৈবাধীন তা আধিদৈবিক। সুখের রয়েছে সম্মোহিনী শক্তি, সুখকে বরণ ক'রে তাই মুগ্ধ হয়ে পড়ি। দুঃখকে ভয় ক'রে দূরে সরে যাই। সুখ বাড়ায় ভোগস্পৃহা, কখনও দেয় শান্তি, কখনও বা আনে চিত্তচাঞ্চল্য, ভুলিয়ে দেয় স্বরূপকে। দুঃখকে বরণ করতে পারলে মানুষ নির্ভীক হয়—অভীষ্টের আস্বাদলাভ করে। দুঃখরূপ কষ্টিপাথরে হয় মনুষ্যত্বের পরীক্ষা, দুঃখের হোমানলে জেগে ওঠে আত্মসম্বিৎ। মহত্ত্বের বীজ যেন দুঃখের মধ্যেই নিহিত!

হিমাচলের উত্তুঙ্গ শিখর আর অতলস্পর্শ গভীর সমুদ্র—মনের তো কোন অগম্য স্থান নেই। কিন্তু যা কিছু নয়নরঞ্জন ও শ্রুতিসুখকর শুধু সেই দিকেই যে মন ছুটবে তার তো কিছু মানে নেই। সেখানে দুর্ধর্ষতা, বহ্নিজ্বালা, ব্যথাবেদনা সেখানেই বা মনের গতিরোধ ক'রবে কে? তবে কেবল সুখের কামনা—যা পাওয়া বাস্তব ক্ষেত্রে একরূপ অসম্ভব তার জন্যে এ অন্তহীন প্রচেষ্টা কেন? সুখ তো শুধু আলেয়ার মতো দুঃখের আঁধারকে গভীরতর ক'রেই দেবে।

তবে দুঃখের প্রতীকার না ক'রে নিশ্চেষ্টতার তাকে বরণ করাই কি ভাল? না তা নয়—দুঃখকে ভয় না ক'রে তার প্রতীকারের জন্যে যে সাহস যে বীর্যবত্তা প্রয়োজন তা সকল সময়েই কাম্য। যখন দুঃখকে দূর করবার প্রয়াস কৃতকার্যতায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে তখন ঈপ্সিত সুখ আর দূরে থেকে তার ছলনাময়ী আশা দিয়ে ভোলায় না, কাছে এসে ধরা দেয়। তাই স্বামীজী দারিদ্র্য ও ব্যথায় অভিভূত চিত্তের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে চলতে বলছেন:

"আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজলপান,
প্রাণপণ যাক্ কায়া॥"

কিন্তু আসল শান্তি তো সুখদুঃখের পারে। আত্মজ্ঞান লাভ না হলে সুখদুঃখের পারে যাওয়া যায় না। আত্মজ্ঞান বা অক্ষর ব্রহ্মের উপলব্ধি অতি দুর্লভ জিনিস। চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিষ্কল, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার অধিকারী অতি বিরল। তাই উপাসকদের ধ্যান-পূজাদির নিমিত্ত ব্রহ্ম নিজেই স্থূলরূপ গ্রহণ করেন।* ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইত্যাদি পুরুষ-দেবতার মূর্তিতে নির্গুণ ব্রহ্ম যেমন গুণযুক্ত হন সেইরূপ নানা দেবী-মূর্তিতেও তিনি গুণময়ী হন। শ্যামা কালী[১] ব্রহ্মের একটি সগুণ দেবী-মূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "কালী ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়—কোন কাজ করছেন না এই কথা যখন ভাবি তখন তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি।[২]"

অনন্ত রূপে ব্রহ্মের বিকাশ এবং বিভিন্ন মতে পরমার্থলাভের পন্থা নির্দিষ্ট হ'লেও শক্তির আরাধনা

*। চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।

১। কলয়তি (বিনাশয়তি) সর্বমেতৎ (জগৎ) ইতি কালী।

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ১।২।৩,৩৯

আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্যতম সহজ উপায়। অন্নগত-প্রাণ কলিযুগে শক্তির উপাসনায় ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ চতুর্বর্গলাভ অল্প আয়াসেই হয়। কলিযুগে মাতৃভাবই সর্বসাধারণের উপযোগী এবং শ্রেষ্ঠ ভাব।

শ্যামা মায়ের মূর্তিতে সারল্য ও কাঠিন্যের অপূর্ব সমাবেশ। মা বরাভয়করা, করুণাময়ী অথচ ভয়ঙ্করা। মায়ের ভীমা ভৈরবী মূর্তি—তাই রুদ্র ভাবটিই তো বেশী প্রকট। বাহিরে ভীষণা, ভিতরে কিন্তু অন্তঃসলিলা করুণার ফল্গুধারা! যে সাধক মায়ের রুদ্রমূর্তিকে ভয় না করে এগিয়ে যায় সেই-ই মায়ের আশীর্বাদ-লাভে ধন্য হয়। মায়ের বাহিরের রুদ্ররূপটি এইরূপ—

"বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা॥[১]"

দেবী বিচিত্রনরকঙ্কালধারিণী নৃমুণ্ডমালিনী ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা শুষ্কমাংসময়দেহা অতিভীষণা বিশালবদনা লোলজিহ্বা কোটরগত-আরক্তচক্ষুবিশিষ্টা এবং বিকটশব্দে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণকারিণী। কী ভয়ঙ্কর এই মূর্তি!

আবার মায়ের কালো রূপ। কিন্তু সাধক গেয়েছেন—"মা কি আমার কালো রে!" সত্যিই তো আমাদের মনে কালিমা রয়েছে ব'লেই আমরা মাকে কালো দেখি। চিত্ত শুদ্ধ হ'লে, মনের মলিনতা দূর হ'লে সাধক অতি আছে পায় মাকে, মায়ের ভীষণ রূপকে ভয় না ক'রে মাকে একান্ত আপনার ব'লে ভেবে ঠিক ঠিক জানতে পারে তাঁকে—আর মায়ের রূপের আলোকচ্ছটায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। ঠাকুর বলেছেন: "কালী কি কালো? দূরে তাই কালো, জানতে পারলে কালো নয়। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে ছাখো কোন রং নেই! সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে ছাখো—রং নেই।"

সাধারণতঃ মায়ের কঠোর ভাবটি না নিয়ে শুধু কোমল ভাবটি গ্রহণ করা হয়, তাই কাপুরুষত্ব এসে যায়।

"মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়,
নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিক্‌বাস,
বলে মা দানবজয়ী॥"

সুখময় ভাব প্রচ্ছন্ন দুর্বলতা—কাপুরুষতারই নামান্তর। সেখানে প্রেম নেই—সেখানে ভক্তি নেই। লোকে মায়ের মূর্তি ভীষণ ক'রে নির্মাণ করে, মুণ্ডমালা পরিয়ে দেয় কিন্তু তাঁকে দিগম্বরা অট্টহাস্যময়ীরূপে ভাবতে পারে মনের এমন বল নেই, তাই বলে দয়াময়ী—ভয়ে ভয়ে বলে দানবজয়ী মা। যথার্থ প্রেম মানুষকে নির্ভীক করে। এ যেন শুধু স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই পূজার আয়োজন!

"রে উন্মাদ, আপনা ভুলাও, ফিরে নাহি চাও,
পাছে দেখ ভয়ঙ্করা।
দুখ চাও, সুখ হবে ব'লে, ভক্তিপূজাছলে
স্বার্থ-সিদ্ধি মনে ভরা॥"

অভয়া মা তাঁর করুণাধারা তখনই বর্ষণ করেন যখন সন্তান নির্ভয়ে সমস্ত বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয়। শক্তিময়ী তাঁর সন্তানের মধ্যেও শক্তির বিকাশ দেখতে ভালবাসেন। সন্তানের নির্ভীকতা দেখে মায়ের কী আনন্দ! বীরত্ব ও মনুষ্যত্বসম্পন্ন কঠোর ভাবুকের হৃদয়েই শ্যামা মা নৃত্য করেন—সেখানেই যে তাঁর নিত্যবিলাস। তিনি রক্তবীজবধ করেছেন, কত অসুর বধ ক'রে থাকেন। আমাদের মনের মধ্যে যে আসুরিক প্রবৃত্তি রয়েছে, কাম-ক্রোধ-লোভরূপী যে মহাশত্রুগুলি আমাদের সদাই ধ্বংস করতে প্রস্তুত তিনি তাদেরও বিনাশ ক'রে আমাদের তাঁর দিকে টেনে নেন। দুর্বল

১। শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৭।৭,৮

সন্তানের শত অপরাধ ক্ষমা ক'রে তাঁর স্নেহশীতল হস্ত তার শিরে বুলিয়ে দেন। তিনি যে মা—জগজ্জননী পালয়িত্রী!

মা শ্মশানবাসিনী। শ্মশানই তাঁর প্রিয়। মনের কামনা-বাসনা পুড়ে ছাই হয়ে গেলে হৃদয় শ্মশানে পরিণত হবে। বাসনাই যে সংসার! বাসনা গেলেই সংসার উড়ে যায়। শ্মশানে সংসার নেই। তাই সংসারনাশেই হৃদয় শ্মশানে পরিণত হয়। আমাদের অন্তরে যে বাসনা সে-ই তো রক্তবীজ! সে যেন অমর বর লাভ ক'রে বেড়েই চলেছে। এই বাসনারূপী রক্তবীজকে মারা মায়ের কৃপা দ্বারাই সম্ভব।

স্বামী বিবেকানন্দ সকলকে মাতৃকৃপা-লাভের জন্যে উদ্বুদ্ধ করছেন তাঁর প্রাণস্পর্শী আকুল আহ্বানে—

"জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার
প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়
তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান,
নাচুক তাহাতে শ্যামা॥"

প্রার্থনা

কাজি মোঃ হাশমৎউল্লাহ, এম-এ, বি-এল

(ছায়া : কোরাণ, ১ম পরিচ্ছেদ)

গুপ্ত-প্রকট বিশ্বপালক
নামেতে তোমার শরণ লই,
স্তুতি-কীর্তন তোমার প্রাপ্য
কে পাইবে তা তোমা' বই?
অদৃশ্য-দৃশ্য সকল জগতে
পরম দয়াল, দয়াময়
তুমি ধর্মের মহাবিচারের অধিপতি
তুমি সদাশয়।

নিশ্চয় নাই উপাস্য কেহ
তোমা' বিনা আর আমাদের
নির্ভর করি তব সাহায্যে
আছে কেবা আর স্রষ্টদের!
চালায়ো মোদের সরল পথেতে
যে পথে আশিস্ অশেষ হে
যে পথে তোমার অভিশাপ আসে
সে পথে প্রভু হে, কভু নহে।

শ্রীশ্রীরাস

শ্রীমতী সরোজবালা দেবী

জটিলার[১] জ্বালা, কুটিলার[২] কুটিল শাসন, আয়ানের[৩] কঠিন প্রতিপত্তি এবং সমাজ-বন্ধন[৪] ধ্বংস করিয়াও যখন শ্রীরাধার[৫] মন একমাত্র কদমতলার[৬] শ্রীকৃষ্ণের[৭] দিকে একান্ত ভাবে ছুটিয়া যাইতে চাহিল, তখনই আসিয়া জুটিল বৃন্দাদূতী,[৮] এবং বৃন্দার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আসিল একে একে বিশাখাদি অষ্টসখী[৯]।

সেই বৃন্দা সহ সখীদের সাহায্যে এবং বহুক্ষণ যোগাযোগের পর, বহুবার মিলন-বিচ্ছেদের পর

১। মায়া ২। মোহ ৩। অহং ৪। মায়ার বন্ধন ৫। জীবাত্মা ৬। 'বিষ্ণুর পরমধাম' বা মোক্ষাবস্থা ৭। ব্রহ্ম, পরমাত্মা

৮। চৈতন্য ৯। অষ্ট ভক্তি

শ্রীরাধা যখন পূর্ণ মিলন[১০] চাহিতে লাগিলেন, তখনই তাঁহার বিরহজ্বালা[১১] আরও শতগুণে বাড়িয়া চলিল। সেই সীমাহীন অনন্ত বিরহজ্বালায় জ্বলিয়া, কত আশানিরাশার মধ্য দিয়া বহুদিন বহুরকম সঙ্কেত পাইয়া, নানা প্রকারে খুঁজিয়া ও নানা রূপে বুঝিয়া একদিন ঘোর রাত্রে তিনি সেই প্রিয় কদমতলার পথের সন্ধান পাইলেন।

একে বনের পথ, তাহাতে ঘোর রাত্রি, ঝড়-বৃষ্টির পরে পথ বড়ই পিচ্ছিল; কঙ্কর এবং কণ্টকই বা কত! চলা আর যায় না; আর শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন হইল না ভাবিয়া রাধা ও বৃন্দা-সহ সখীরা সকলেই "ত্রাহি মাং মধুসূদন! ভগবন্ নন্দনন্দন! আমাদের এই বাধা বিপদ হইতে উদ্ধার কর"—বলিয়া কাতরস্বরে প্রার্থনা করিলেন। তাহার পরেই মোহন বাঁশীর[১২] সুর শুনিতে পাইলেন। শ্রীরাধা ও বৃন্দাদূতী সহ সকলেই একে একে সেই প্রিয়তমের বাঁশীর সুর লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিলেন। কত কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া, কতই না হোঁচট ও আছাড় খাইয়া শ্রীরাধার সহিত সকলে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন পাইলেন। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণও আনন্দে উৎসাহে সখীদের বলিয়া উঠিলেন, "হে সখীগণ! এই ঘোর ভয়ঙ্কর রাত্রে কি জন্য আগমন হইয়াছে? আর কাহার জন্যই বা তোমরা আসিয়াছ বল, কি চাই তাহাও বল; আজ আমি তোমাদের সবই দিতে প্রস্তুত আছি।" সকলেই মৃদু হাসিলেন এবং বৃন্দাদূতী বলিয়া উঠিলেন, "হে কৃষ্ণ! তোমার নিজের বলিতে তোমার কি আছে যে তুমি তাহা আমাদিগকে দান করিবে, বল? তোমার যাহা কিছু ছিল, সবই তো সকলে চাহিয়া চাহিয়া তোমাকে একেবারে নিঃস্ব[১৩] করিয়া দিয়াছে; তুমি তো কাঙ্গাল, ভক্তের কাঙ্গাল। এমনকি যে কেহ ডাকুক তুমি তাহার[১৪] কাছেই সর্বদা হাজির থাক; এতই পরাধীন তুমি।" পরে গর্বের সহিত তিনি বলিলেন, "তবে হ্যাঁ, দিতে পারি কিছু আমরা; কারণ আমাদের কিছু[১৫] আছে; কিন্তু তোমার কি আছে যে দিবে, বল? হে কৃষ্ণ! আমরা কিছুই নিতে আসি নাই, আমরা আমাদের সব কিছু দিতেই আসিয়াছি।"

যাহা হউক সকলেই সমান সম্মান পাইলেন, কিন্তু সকলকে ছাড়িয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া সেই বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে[১৬] লুকাইয়া গেলেন। আর সকলে খুঁজিতে লাগিলেন, কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও আর রাধা-কৃষ্ণের দেখা পাইতেছেন না। এদিকে শ্রীরাধার মনে কিন্তু ক্রমশ অহঙ্কার আসিয়া জুটিল; ধীরে ধীরে তাঁহার মনে হইতে লাগিল—"সব চাইতে আমিই বড়, তাহা না হইলে সকলকে ছাড়িয়া দিয়া একা আমাকে লইয়া বৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে সানন্দে বিহার করিবেন কেন, কেনই বা আমার এত অনুগত হইবেন? আমি নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ হইয়াছি, কৃষ্ণ আমারই অনুগত দাসানুদাস।" এই ভাবিয়া তিনি কতই না কৃষ্ণকে আদেশ করেন; "'ঐ ফুল লইব', 'এ ফল লইব' 'তুলিয়া দাও'"—এই রূপ বলিতে বলিতে শেষে বলিয়া ফেলিলেন, "আর চলিতে পারি না, বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি; তোমার যদি সঙ্গে লইতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে কাঁধে করিয়া বহন কর।" কৃষ্ণ কাঁধ পাতিয়া দিয়া বলিলেন, 'আইস'। রাধা যেই কাঁধে চড়িতে যাইবেন, দেখেন কৃষ্ণ নাই। কৃষ্ণ কোথায়? কৃষ্ণ কোথায় কাহার মধ্যে লুকাইলেন,—রাধা তাহা ঘুনাক্ষরেও বুঝিতে পারিলেন না। চারিধার শূন্য দেখিয়া পুনরায় সেই বিরহজ্বালায় জ্বলিতে লাগিলেন সেই জ্বালায় নিজেকে ধিক্কার দিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া শ্রীরাধা আর্তনাদে কাঁদিয়া উঠিলেন; উঠিবার আর তাঁহার শক্তি নাই। ঠিক সেই সময় সখীরাও

১০। পরমাত্মায় লীন, ব্রহ্মময় হইতে চাওয়া ১১। সংসার যাতনা ১২। ব্রহ্মপ্রেম ১৩। নিরাকার, সর্বময় ১৪। সকলের মধ্যেই, সর্বময়

১৫। আমিত্ব ও অহংকার ১৬। হৃদয়

কৃষ্ণকে খুঁজিতেছিলেন; তাঁহারা সেইখানে আসিয়া রাধার দুরবস্থা দেখিলেন। রাধাকে দেখিয়া সকলেই দুঃখিত হইলেন ও রাধাকে ধরিয়া উঠাইলেন। রাধাসহ সকলে মিলিয়া আবার খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্গম বন; ঘন অন্ধকার রাত্রে অবলা নারীসকলে কোনও ভয় করেন নাই, কোনও দ্বিধা বা চিন্তা করেন নাই। শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ—সেই রাধাবল্লভ, সেই গোপীবল্লভকে না পাইয়া সকলে কাতরস্বরে ডাকিয়া উঠিলেন, "নন্দনন্দন, কোথায় তুমি?" গোপীদের ব্যাকুল আহ্বানে পুরুষোত্তম নন্দনন্দন আবার আসিয়া দেখা দিলেন; সকলেই আবার মহানন্দে নাচিয়া উঠিলেন। কত মান-অভিমানের কথা চলিল, কত ন্যায়-অন্যায়ের বিচার হইল; পরে বৃন্দাদূতী বলিয়া উঠিলেন,—"হে নন্দরাজনন্দন! বৃন্দাবনরাজ! রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণ! আজ সত্যই বিচার করিয়া বল দেখি, কিরূপ লোক একজন অপরকে ভজনা করিলে সেও ভজনা করে? আর তাহার বিপরীতই বা কিরূপ লোক করে? আর কেহ কাহাকেও ভজনা করিলেও কোন্ জন ভজনা করে না,—তাহাও বল।"

বৃন্দাদূতীর প্রশ্নে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সখি! পরস্পর স্বার্থ থাকিলেই পরস্পর ভজনা করিয়া থাকে। ইহাতে ধর্ম বা সৌহার্দ্য থাকে না; স্বার্থই একমাত্র উদ্দেশ্য। তাহাদের এই ভজনাও দুই প্রকার;—যেমন পিতা মাতা; প্রথমতঃ দয়ালু, দ্বিতীয়তঃ স্নেহময়। উক্ত প্রথম দ্বারা দয়ালু ব্যক্তিগণ নিষ্কৃতি ধর্মলাভ করেন,—স্নেহময় ব্যক্তিগণ সৌহার্দ্য পান। এই ভজনার ফলে আনন্দধর্ম ও সৌহার্দ্যধর্ম দুইই আছে। আর যাহারা আত্মারাম ও আত্মকাম এবং গুরুদ্রোহী, তাহারা কাহাকেও ভজনা করে না। তাহাদের কথা দূরে থাকুক। হে সখি! যাহারা সর্বদা ভজনা করিলেও ভজনা করে না, তাহার কথা বলি;—তাহাদের মধ্যে একজন আমি[17]। আমি ভজনা করিলেও ভজনা করি না। ইহার কারণ এই যে, সে আমার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া যাইবে; আর অন্য কোন চিন্তাই তাহার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। যেমন তোমরা ধর্মাধর্ম, লোক, সমাজ, জাতি, স্বামী ও সন্তান—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র আমাকেই লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছ। হে প্রিয়সখি! আমি লুকাইয়া[18] ছিলাম সত্য; কিন্তু তোমাদের ডাকে আর লুকাইয়াও থাকিতে পারিলাম না। আর তোমরা সেজন্য আমার প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করিও না। আজ হইতে তোমাদের চারিধার আমি ঘিরিয়া থাকিব; তোমরা যখনই যেধারে তাকাইবে সব দিক, সব কিছুই আমাময় দেখিবে। আর ইহাও আমি বলিতেছি যে, তোমরা যে সুদৃঢ় গৃহশৃঙ্খল[19] ভাঙ্গিয়া আজ আমার সহিত মিলিত হইয়াছ, ইহাতে দোষ বা নিন্দার কিছুই নাই। আমি দেবতার পরমায়ু পাইলেও তোমাদের এই আগমনের প্রত্যুপকার করিতে পারিব না। আমি যুগে যুগে তোমাদের কাছে ঋণী হইয়া থাকিলাম। এ ঋণ আমার আর শোধ হইবার নয়।"

শ্রীনন্দনন্দনের ঐরূপ সান্ত্বনাবাক্য শুনিয়া শ্রীরাধা-সহ সখীগণ বিরহজন্য সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণকামা হইয়া রাসমঞ্চে[20] দাঁড়াইলেন। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, সাদর সাগ্রহে, অনন্ত অপরূপ আনন্দে অবর্ণনীয় রাসলীলা আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেক গোপীনীর নিকট শ্রীকৃষ্ণ, বিরাট জ্যোতির্ময়, প্রেমময় মূর্তিতে দেখা দিলেন। "গোপ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমার কাছেই"—ইহাই গোপীনীরা দেখিতে লাগিলেন; রাসের উৎসব আরম্ভ হইল। সস্ত্রীক দেবগণে আকাশ পূর্ণ হইল, দুন্দুভি[21] ডঙ্কা

১৭। একমাত্র পুরুষ ১৮। নিরাকার ১৯। বিষ্ণুমায়ার বন্ধন ২০। সংসারের ঊর্ধ্বে, পরমশান্তিময় ও আনন্দময় মিলনমঞ্চে ২১। সত্য

বাজিয়া উঠিল; পুষ্প[২২] বরষিত হইল; সস্ত্রীক গন্ধর্বগণ করযোড়ে যশোগান করিতে লাগিলেন। সখীদের কিঙ্কিনী, বলয় আর নূপুরে তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে আনন্দিত হইয়া সখীরা উঃচৈস্বরে গান আরম্ভ করিয়াছিলেন।

সেই রাসনৃত্যে গোপিনীরা ক্লান্ত হইলেন। এজন্য তাঁহারা নিজের আভরণাদি[২৩] ধারণ করিতে অক্ষম হইলেন। ঘর্মবিন্দুতে[২৪] সকলের মুখ অপূর্ব শোভা ধারণ করিল; সকলের কেশকলাপ[২৫] ও মালা[২৬] খুলিয়া পড়িল; উদ্দাম বিলাস-হাস্যাদি দ্বারা শ্রীনন্দনন্দনও সকলের সহিত ক্রীড়া করিলেন এবং আপন অধরচবিত তাম্বুল[২৭] শ্রীরাধার অধরে অর্পিত করিলেন। এই রাস দর্শন করিতে করিতে চন্দ্রমা[২৮]সহ তারকাপুঞ্জ[২৯] নিজের গতি ভুলিয়া গেলেন; তাহাতে রাত্রিও[৩০] বৃদ্ধি পাইল।

শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলময় হস্তে রাসক্রীড়ায় ক্লান্ত[৩১] গোপিনীগণের বদন[৩২] মুছাইয়া দিয়া, কল্যাণময় শ্রীপাদপদ্ম সকলের বক্ষস্থলে[৩৩] স্থাপন করিলেন। সেই স্পর্শে গোপিনীরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ সকলকে লইয়া যমুনার জলে[৩৫] ক্রীড়া করিলেন। স্নানের[৩৬] পর সত্য-সঙ্কল্পা অনুরাগিণী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণেই আত্মাঞ্জলি দান করিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দা-বনের শ্রীকৃষ্ণ-কামা পবিত্র রমণীমণ্ডলীও[৩৭] সেই শ্রীকৃষ্ণ চরণেই আত্মাঞ্জলি দান করিয়া পূজা করিলেন।

শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ,—চৈতন্য-পুরুষ, চৈতন্যেই স্থির[৩৮] থাকিয়া সকলকেই প্রেমমিলন যোগানন্দ[৩৯] দান করিলেন। সেই শুভমিলন চৈতন্য আনন্দ লাভ করিয়া শ্রীরাধাসহ সখী গোপিনীগণ প্রেম-সাধনায়[৪০] সিদ্ধির স্রোতে চিরতরে ভাসিয়া[৪১] গেলেন।

জুটিলা, কুটিলা, আয়ান-গোপ বা অন্যান্য কোনও গোপগোপীরা কেহই সেই সত্যসঙ্কল্পা শ্রীরাধাসহ গোপিনীগণের তত্ত্ব পাইলেন না। সেই প্রেমময়ী শ্রীরাধার তত্ত্ব একমাত্র শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই জানিতে পারেন। কৃষ্ণভক্ত বা কালীভক্ত বহু পাওয়া যায়, কিন্তু শ্রীরাধার ভক্ত একমাত্র শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।

২২। ভক্তি ২৩। ধৈর্যাদি ২৪। ভগবৎভাবে ২৫। সংসার-বন্ধন ২৬। সংসার-মায়া ২৭। ব্রহ্মজ্ঞানকে স্মরণ করিয়া ২৮। ভগবৎশক্তিশালী মন ২৯। ক্ষয়কারী শরীর-ধর্মসকল ৩০। পরমায়ুও বৃদ্ধি পাইল ৩১। শুদ্ধ ৩২। অন্তর্দৃষ্টি ৩৩। অন্তর্হৃদয়ে ৩৪। লাভে ৩৫। জ্ঞান-স্রোতে ৩৬। আত্মশুদ্ধির পর ৩৭। পবিত্র ইন্দ্রিয়মণ্ডলী ৩৮। পূর্ণ থাকিয়া ৩৯। ব্রহ্মজ্ঞান ৪০। আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন-সাধনায় ৪১। মুক্তি বা সিদ্ধি লাভ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কনখল (হরিদ্বার) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৫ সালের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ইহার অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে রোগিসংখ্যা ছিল মোট ১,৪৩৭, তন্মধ্যে নূতন ভরতি রোগীর সংখ্যা ১,৪১৭ (প্রাপ্ত বয়স্ক—১৩৭৬, শিশু—৪১)। গড়ে দৈনিক ৩২টি শয্যা রোগীদের দ্বারা অধিকৃত ছিল। বহির্বিভাগে চিকিৎসিত হন ৭৩,৮৪৪ জন (নূতন—২২,৯৬৩ এবং পুরাতন—৫০,৮৮১) তন্মধ্যে পুরুষ ৩১,৭৯৬, স্ত্রীলোক—১৭,৮৮৯, শিশু—২৪,১৫৯। বহি-র্বিভাগে দৈনিক উপস্থিতির হার ২০২। সাধারণভাবে অস্ত্রচিকিৎসা করা হয় ৬৫২ (বহির্বিভাগে—৫১১) জনের এবং বিশেষভাবে অস্ত্রচিকিৎসা প্রাপ্ত

হন ১৮ জন অন্তর্বিভাগে। ইন্জেক্‌শন দেওয়া হয় ৪,৮৬৭টি (বহির্বিভাগে—৩,৯৩৪)। পরীক্ষাগারে থুথুরক্তমলমূত্রাদির ২,৩৯৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগিগণ ভারতের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ দিকের বিভিন্ন প্রদেশের এবং ভারত-সংলগ্ন অঞ্চলগুলির হইলেও উত্তর প্রদেশ এবং নেপালের (যথাক্রমে ২৪,৫৫ ও ১১৬টি) রোগীই বেশি।

সেবাশ্রম লাইব্রেরীর (যাহা হইতে রোগীরা মানসিক স্বস্থতালাভের জন্ম পুস্তকপত্রিকাদি পাঠের সুযোগ পান) পুস্তক-সংখ্যা ৪,২৩৫ (নূতন ক্রীত ও প্রাপ্ত—৪৪)। গ্রন্থাগারে ১৮টি সাময়িকী ও ৮টি পত্রিকা নিয়মিতভাবে লওয়া হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে প্রায় ৩০০০ দরিদ্র নারায়ণের পরিতৃপ্তি সহকারে সেবা করা হয়। দুগ্ধ ও খাদ্যদ্রব্য বিতরণের মাধ্যমে রিলিফ কার্যও সেবাশ্রমের অন্যতম কাজ। সর্বশ্রেণীর দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরিত দুগ্ধের পরিমাণ ৭,২৪৫ পাউণ্ড। সহৃদয় উত্তর প্রদেশ গবর্ণমেণ্টের এবং সেবানুরাগী জনগণের সক্রিয় লক্ষ্য ও সহযোগিতা এই সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠানটিকে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও পূর্ণতার পথে আগাইয়া দিতেছে।

রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—(২৬৭, মারচেণ্ট স্ট্রীট, রেঙ্গুন) ব্রহ্মদেশে ভারতীয়, বর্মী, পাকিস্থানী ও অন্যদেশীয় মানব-সাধারণের সেবারত এই অবৈতনিক প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৪-৫৫ সালের কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বিভিন্ন দিক দিয়া আলোচ্য বর্ষের কার্যাবলী উল্লেখযোগ্য। অন্তর্বিভাগে গতবৎসরের শয্যা-সংখ্যা বাড়াইয়া ১৪৮ (৪৮টি স্ত্রীলোকদিগের জন্ম সংরক্ষিত) করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া কর্কট-রোগ (Cancer), চক্ষু ও যৌনরোগ চিকিৎসার জন্ম পৃথক পৃথক ওয়ার্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। অন্তর্বিভাগে মোট চিকিৎসালাভ করেন ৪,০৩২ জন (গত বৎসরের সংখ্যা ছিল ৩,৯৮০) তন্মধ্যে পুরুষ—২৪৫১, নারী—১২৫৮ এবং শিশু—৩২৩।

বিশেষ কর্মব্যাপৃতিপূর্ণ ছয়টি শাখা-সমন্বিত বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ২২,৩২৯৪ (পুরুষ—১০,৩৯৬০, স্ত্রীলোক ৭,৫০৫৪, শিশু ২২,৩২৯৪)। আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামে সুসজ্জিত ফিজিওথেরাপি বিভাগে বিভিন্ন প্রণালীতে বৈদ্যুতিক চিকিৎসা করা হয় ৬,১৩১ জনের। রেডিয়াম চিকিৎসা বিভাগে ক্যানসার প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা লাভ করেন ১৮৮ জন রোগী। ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে থুথুরক্তাদির ১১,৩২৮টি নমুনা এবং এক্স-রে বিভাগে ১,৫২২টি রোগী পরীক্ষা হয়। Deep—X'Ray Therapy বিভাগে চিকিৎসিত হন ৩৫ জন। সেবাশ্রমে কম্পাউণ্ডিং ও সেবাকার্য (Nursing) শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে ৩৮ জনকে নারসিং শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্রহ্মদেশে এই প্রতিষ্ঠানের আর্তসেবা-কার্য বহুখ্যাত ও সর্বজন সমাদৃত।

পরলোকে স্বামী বিকাশানন্দ—গভীর দুঃখের সহিত আমরা বেলুড় মঠের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি। তাঁহার নাম স্বামী বিকাশানন্দ (গদাই মহারাজ নামে সুপরিচিত)। গত ১৭ই আশ্বিন (৩।১০।৫৬) আলমোড়া স্থানীয় আশ্রম 'শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীরে' ৫৮ বৎসর বয়সে তিনি যকৃৎ ও পিত্তাশয়ের পীড়ায় পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগ করিয়াছেন। খ্রীঃ ১৯১৪ সালে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, ভজনানুরাগ এবং সপ্রেম সেবা-পরায়ণতা সকলকেই মুগ্ধ করিত। উদ্বোধন কার্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে তিনি বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শাশ্বত পাদপদ্মে নির্মায়িক সন্ন্যাসীর দেহমুক্ত আত্মা চিরবিশ্রাম লাভ করুন ইহাই আমাদের হৃদয়ের আন্তরিক প্রার্থনা।

বিবিধ সংবাদ

লণ্ডনে 'ইয়াংহাসবেণ্ড হাউস'-এর উদ্বোধন—সার ফ্রান্সিস ইয়াংহাসবেণ্ডের স্মৃতি-রক্ষার্থে লণ্ডনে একটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে, এই কেন্দ্রে বিশ্বের সকল ধর্মের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইতে পারিবেন। কেন্দ্রের নাম হইয়াছে 'ইয়াংহাসবেণ্ড হাউস', কেন্দ্রটি কেবল যে সভা অনুষ্ঠানের স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারিবে তাহা নয়, বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষার স্থল হইয়াও থাকিবে। এখানে লণ্ডনে উপস্থিত পণ্ডিতগণও সাময়িক ভাবে বসবাসের সুযোগ পাইতে পারিবেন। কেন্দ্রের একটি বৈশিষ্ট্য হইল তাহার ৪,০০০-এর অধিক পুস্তক সম্বলিত একটি লাইব্রেরী, তুলনামূলক ধর্ম সম্বন্ধে যাঁহারা আগ্রহী তাঁহারা এখানে পাঠের সুযোগ পাইবেন। বিশ্ব ধর্ম কংগ্রেসের সভাপতি লর্ড স্যামুয়েল সম্প্রতি ইহার উদ্বোধন-কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে খ্রীষ্টীয়, বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান এবং ইহুদী সকল ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন। সার ফ্রান্সিস ইয়াংহাসবেণ্ড ১৯৪২ সালে ৭৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন, তিনি বৃটিশ পর্যটক এবং সৈনিক হিসাবে খ্যাত।

(ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস হইতে)

কবিসম্বর্ধনা—গত ৩রা ভাদ্র (১৩৬৮৫৬) গোবরডাঙ্গা প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটির কর্তৃপক্ষ একটি বৃহৎ জনসভায় প্রখ্যাত আদর্শবাদী কবি শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এবং অপর দুইজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক—শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্যকে মানপত্রের দ্বারা সম্বর্ধনা করিয়াছেন। ইঁহাদের তিনজনেরই জন্মভূমি গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে। শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ছিলেন এই সম্মেলনের সভানেত্রী। পল্লীবাসীরা পল্লীর কৃতী-সন্তানগণকে তাঁহাদের মধ্যে ডাকিয়া এবং তাঁহাদিগকে নিকটে পাইয়া যে গৌরব ও আনন্দ-বোধ করিয়াছেন ইহা খুবই উৎসাহজনক।

রাণাঘাট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ—বিগত ১৩৬২ সালের বৈশাখ হইতে প্রতি রবিবার পূর্বাহ্ণে রাণাঘাট নাসরাপাড়ায় শ্রীশঙ্করনাথ মিত্রের বহির্বাটীস্থ প্রকোষ্ঠে রাণাঘাট, আনুলিয়া, নাসরা প্রভৃতি পল্লীর ভক্তগণকে লইয়া নিয়মিত ভাবে ধর্মালোচনা ও ভজনাদি চলিতেছে। 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে' কথিত কলাইঘাট এখান হইতে প্রায় দু'মাইল পশ্চিম দক্ষিণে চূর্ণিনদীর অপর তীরে অবস্থিত। ইহা একদা ভাগ্যবতী রাণী রাসমণির জমিদারী-ভুক্ত ছিল। মথুরবাবু ঠাকুরকে কিছু দিনের জন্য এখানে লইয়া আসেন, ঠাকুরের আদেশে তিনি এখানকার দরিদ্র অধিবাসীদিগকে একদিন পরিতোষপূর্বক ভোজন করান, এক মাথা করিয়া তৈল এবং একখানা করিয়া নূতন বস্ত্র দান করেন।

গত ১৩ই ফাল্গুন (১৩৬২) ঠাকুরের পুণ্যস্মৃতি রক্ষা করে এই চূর্ণিতীরে অতীতের সাক্ষী বটবৃক্ষ-তলে সঙ্ঘের উদ্যোগে চারিধারের ভক্তগণকে লইয়া মহোৎসব করা হয়। বেলুড় মঠের স্বামী শান্তিনাথানন্দ ঠাকুরের আবির্ভাবের সহিত বর্তমান যুগের সম্বন্ধ বিষয়ে একটি সুন্দর ভাষণ দেন।

কলাইঘাটার অপর তীরে বিখ্যাত আনুলিয়া গ্রামের দক্ষিণাংশে পূর্ববঙ্গ হইতে বহু বাস্তুহারা ভক্ত আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদেরই অভিপ্রায় অনুসারে শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিরক্ষার্থ এই বসতির নাম 'সারদা পল্লী' রাখা হইয়াছে। গত ২রা বৈশাখ শ্রীশ্রীঠাকুরের ১২১তম জন্মোৎসব এই স্থানে শান্ত পরিবেশের মধ্যে উদ্‌যাপিত হয়। বেলুড় মঠের স্বামী দেবানন্দ ইহাতে যোগ দিয়া সকলের আনন্দবর্ধন করেন।

গত ৩রা ভাদ্র সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীশঙ্করনাথ মিত্রের ভবনে সমস্ত ভক্ত যথানিয়মে সম্মিলিত হন। উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহারাজ এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাবে সাধনা সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ ভাষণ দেন।

উদ্বোধন

আশ্চর্য !

চিত্রমেষোঽস্মি লব্ধাত্মা জাতঃ কালেন কার্যবান্।
এষ সোঽহমনন্তাত্মা নান্তোঽস্য পরমাত্মনঃ॥
ব্রহ্মণীন্দ্রে যমে বায়ৌ সর্বভূতগণে তথা।
স এষ ভগবানাত্মা তন্তুর্মুক্তাস্বিব স্থিতঃ॥
অহো ত্বহং প্রবুদ্ধোঽস্মি গতং দুর্দর্শনং মম।
দৃষ্টং দ্রষ্টব্যমখিলং প্রাপ্তং প্রাপ্যমিদং ময়া॥
সর্বং কিঞ্চিদিদং দৃশ্যং দৃশ্যতে যজ্জগদ্‌গতম্।
চিন্নিস্পন্দাংশমাত্রাংশান্নান্যৎ কিঞ্চন শাশ্বতম্॥

—যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ, উপশম প্রঃ, ৫৯।১৮, ১৯, ৩১, ৩২

অহো কী আশ্চর্য! আমি এতকাল ধরিয়া যে যত্ন করিয়া আসিয়াছি উহার ফল আজ করতলগত। আত্মাকে আবিষ্কার করিয়া আমি কৃতার্থ। পরম পুরুষার্থ আজ আমার সংসিদ্ধ। বুঝিয়াছি সেই অসীম আত্মাই আমি। পরমাত্মস্বরূপ আমার অন্ত কোথাও নাই। যেমন মুক্তামালার সূত্র প্রত্যেক মুক্তার সহিত সম্বদ্ধ সেইরূপ এই ভগবান আত্মাও কি ব্রহ্মা, কি ইন্দ্র, কি যম, কি পবন বা অপর ভূতবৃন্দ—সর্বত্রই অবস্থান করিতেছেন।

মোহনিদ্রা কাটিয়া গিয়াছে, আজ আমি প্রবুদ্ধ। সকল দুঃস্বপ্নের অবসান হইয়াছে। যাহা কিছু দ্রষ্টব্য আত্মাতেই সব দেখিতেছি, যাহা কিছু প্রাপ্তব্য আত্মার ভিতরই পাইয়াছি।

জগতে ইন্দ্রিয়বেদ্য সমস্ত পদার্থসমূহ অদ্বয়, চৈতন্যস্বরূপ, পরব্রহ্মে মায়ার স্পন্দন ব্যতীত আর কিছু নয়। চৈতন্যের যে নিস্পন্দ অর্থাৎ ভ্রান্তিতে জীবভাব—উহা হইতেই সপ্তদশাবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গদেহের ভ্রম। এই ভ্রম হইতে আসে বাহ্য ও অন্তঃকরণের ভেদ—অতঃপর উপস্থিত হয় জাগ্রৎস্বপ্নে অনুভূত অখিল দৃশ্যপ্রপঞ্চ। কিন্তু সেই আদি চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুই শাশ্বত নয়—শুধুই ভ্রান্তির পরম্পরা মাত্র। আশ্চর্য!

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রেয় ও প্রেয়

যাহা ভাল লাগে তাহা সব সময়ে আমার কল্যাণকর হয় না। ভাল লাগার পশ্চাতে আমার প্রচ্ছন্ন আসক্তি, লোভ, স্বার্থপরতা থাকিতে পারে। শুধু ভাল লাগাকেই যদি আমার কর্মের নিয়ামক করিয়া বসি, তাহা হইলে হয় তো কোন অসতর্ক মুহূর্তে আমি মোহের কবলে পড়িয়া যাইতে পারি। সেইজন্য বিবেকী ব্যক্তি প্রথমেই 'কেন ভাল লাগে' —ইহা বিচার করিয়া দেখেন। যখন বুঝেন কোন কিছুতে চিত্ত যে আকৃষ্ট হইয়াছে উহার ভিতর ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি নিহিত নাই তখনই তিনি সেই আকর্ষণকে বরণ করেন, তৎপূর্বে নয়। নির্বিচারে ভাল লাগিবার বিষয়ের নাম প্রেয়। উহার প্রেরণা ভোগ।

প্রেয়ের প্রতি টান জীব-জীবনের দুরতিক্রমণীয় প্রাথমিক বিধান। জন্মিয়া অবধি আমরা ভাল লাগার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া যাই। অবশ্য পশুত্বের স্তরে সে বন্ধন কিছু নিন্দনীয় নয়। আহার নিদ্রা প্রভৃতি জৈবিক প্রবৃত্তিগুলি সারাজীবন ধরিয়া পশু চরিতার্থ করিয়া যায়; তাহার বিবেক নাই, এই চরিতার্থতার শুভাশুভ বিচারের তাই কোন প্রশ্নই উঠে না। মনুষ্যত্বের স্তরে কিন্তু ভাল লাগিলেও জৈবিক তৃষ্ণাগুলির নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, কেননা মানুষের জীবন শুধু রক্তমাংসের দেহে সীমাবদ্ধ নয়; তাহার মন আছে, আত্মা আছে, পরিবার আছে, সমাজ, সভ্যতা আছে। অবাধ ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি প্রিয় হইলেও তাই বরণীয় নয়, কেননা উহা তাহার বৃহত্তর জীবনের অর্থাৎ তাহার মানসিক, আত্মিক, পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির পরিপোষক নাও হইতে পারে। বৃহত্তর জীবনের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের নাম শ্রেয়ঃপথ। উহার দ্বিতীয় সংজ্ঞা—ত্যাগ। শ্রেয় জীব-জীবনের স্বাভাবিক বিধান নয়, বহুসাধনলভ্য শক্তি। পশু এ শক্তি লাভ করিতে পারে না, মানুষই পারে, সকল মানুষ নয়—বিশ্বপ্রকৃতির আপাত রীতির উপর যাহার প্রাণে বিদ্রোহ জাগিয়াছে সেই মানুষ।

এই বিদ্রোহের প্রয়োজন আছে—মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সামঞ্জস্য ও পরিপূর্ণতার জন্যই। জন্মাবধি যে শৃঙ্খল দিয়া প্রকৃতি আমাদিগকে বাঁধিয়াছেন তাহা অন্ধভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া জীবত্ব—কিন্তু মনুষ্যত্ব নয়। মানুষ প্রকৃতিকে বশ করিবে ইহাও যে সৃষ্টির এক উচ্চতর বিধান। অতএব জৈবপ্রকৃতিকে জয় করিবার আকাঙ্ক্ষাও মানুষের স্বভাব—উন্নততর ধর্ম—তাহার আধ্যাত্মিক সত্তার অভিব্যক্তি। শ্রেয়ের পথ হাজারটি ব্যক্তির নিকট অত্যদ্ভুত ও নিষ্ফল লাগে বলিয়া উহার মূল্য কমিয়া যায় না। একজনও যদি ঐ পথে চলিতে সাহসী হয়, চলিয়া মহত্তর কল্যাণ লাভ করে, তাহা হইলেও শ্রেয়ের মহিমা প্রমাণিত হইয়া যায়। সুখের বিষয় মানুষের ইতিহাসের প্রথম হইতেই পৃথিবীতে শ্রেয়কামীর অভাব কখনও হয় নাই।

ইন্দ্রিয়ের সংযোগ দ্বারা যে ভাল লাগা—রজ ও তম গুণে আচ্ছন্ন মন দিয়া যে প্রিয়ত্ব-বোধ, উহা মানুষের উচ্চতর প্রকৃতিকে বিকশিত হইতে দেয় না। উহা মানুষকে সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখে, স্বার্থপর করে, পরিবার ও সমাজের কল্যাণের চিন্তা করিতে দেয় না। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'সখার প্রতি' কবিতায় লিখিয়াছেন—"ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন।"

জীবনের পরম লক্ষ্য সত্য; —সুখও নয়, দুঃখও নয়। যে চিন্তা, আশা, আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা সত্য-লাভের অনুকূল তাহাই শ্রেয়। শ্রেয়ের পটভূমি হইল ক্ষুদ্র আমিত্বের বিসর্জন, সঙ্কীর্ণ স্বার্থের বলিদান। উহা কঠিন কথা সন্দেহ নাই কিন্তু

পরিপূর্ণতার স্বপ্ন যাঁহাকে পাগল করিয়াছে, সত্যের আহ্বান যিনি শুনিতে পাইয়াছেন তিনি ঐ কষ্টকে গ্রাহ্য করেন না। ঐ কষ্ট তাঁহার তপস্যা, তপস্যায় তাঁহার আনন্দ। বৃহত্তম লাভের জন্য আপাত-রমণীয়ের ত্যাগে তাঁহার শ্রেষ্ঠ মনীষার পরিচয়।

এই কষ্টও কিন্তু চিরদিনের জন্য নয়, প্রেয়ের বিচ্ছেদ বরাবরের জন্য নয়। আন্তরিকতা থাকিলে তপস্যায় সিদ্ধি সুনিশ্চিত। শ্রেয়ের পথে চলিয়া লক্ষ্যে যে পৌঁছানো যায়, সত্যকে যে লাভ করা যায় ইহা সুনিশ্চিত। তখন? তখন সুখ-দুঃখের পারে সর্বাবগাহী জ্ঞান ও আনন্দ জীবনে নামিয়া আসে, সমস্ত জীবনকে ছাইয়া থাকে, জীবনকে ছাপাইয়া জগতে ছড়াইয়া পড়ে। অভূতপূর্ব কল্যাণ দিকে দিকে বিকীর্ণ হয়—পরিবারে, সমাজে, সমগ্র মানবগোষ্ঠীতে। সে কল্যাণ বর্তমানেই ফুরাইয়া যায় না, ভবিষ্যতের জন্যও সঞ্চিত থাকে। প্রেয়ও ফিরিয়া আসে—সীমাবদ্ধ সাময়িক ক্ষয়িষ্ণু মূর্তিতে নয়, অসীম চিরন্তন অপরিবর্তনীয় রূপ লইয়া। 'প্রিয়' তখন সম্মুখে পশ্চাতে উর্ধ্বে নিম্নে ক্ষুদ্রে বৃহতে—সব কিছুতেই প্রিয়ের ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়, কিছুই বাদ পড়ে না, ভাল লাগার এলাকা তখন সারা বিশ্ব জুড়িয়া। প্রেয়-শ্রেয়ের পার্থক্য তখন মুছিয়া গিয়াছে।

আজিকার পৃথিবীতে শ্রেয়ের কথা বলিবার লোক কম, শুনিবার ও শ্রেয়োমার্গে চলিবার নরনারী আরও অল্প। তথাপি শ্রেয়োদৃষ্টি ব্যতীত বিশ্বের বিক্ষোভ ও অশান্তি দূর হইবার নয়। জৈবপ্রকৃতিকে বেড়িয়া যে সুখপিপাসা বর্তমান, উহার অবাধ বিলাসের জন্যই তো মানুষ আজ কাম, লোভ, হিংসা ও দম্ভে উন্মত্ত পিশাচ। বাহিরে তাহার সভ্যতার মুখোস, ভিতরে সে নির্লজ্জ বর্বর।

ফিরিয়া চল মানুষ জৈবস্বভাব হইতে আত্মিক স্বভাবে, পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে, দেবত্বে। সুখ অপেক্ষা সত্যকে সম্মান করিতে শিখ, ভাল লাগাকে ছাড়িয়া কল্যাণকে বরণ করিতে প্রস্তুত হও, ভোগ হইতে ত্যাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। ইহা দ্বারাই তোমার স্বকীয় মহিমার অভিব্যক্তি—তোমার পরিপূর্ণতার রূপায়ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের জাগরণ

শ্রীরামকৃষ্ণ জাগিতেছেন না। জাগিতে আসিয়াছিলেন কিন্তু জাগিবার ঠাঁই না পাইয়া অর্ধনিমীলিত নেত্রে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি বলিয়াছিলেন, সম্মানিত অতিথিকে আনিতে গেলে বৈঠকখানা পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হয়, অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার ঘর দারিদ্র্যের লক্ষণ। কিন্তু আমরা যে গৃহ পরিষ্কার করি নাই, স্তূপাকার জঞ্জাল জমাইয়া রাখিয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণ আসিবেন কেন, জাগিবেন কেন? আমাদের রামকৃষ্ণ-নাম, রামকৃষ্ণ-জয়ধ্বনি তাই রামকৃষ্ণের অপমান।

শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যথা মর্মে অনুভব না করিয়া তাঁহাকে চাওয়া যায় কি? তাঁহার দায় আমাদের নিজের দায় বলিয়া স্বীকার না করিয়া তাঁহার পূজা করা যায় কি? উদগ্র ধনলালসা পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়া রামকৃষ্ণকে কুর্নিশ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাকে জাগানো যায় না। সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের পেটিকাটি সযত্নে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহার জীবন্ত স্পর্শ পাওয়া যায় না। অথচ তিনি তো আসিয়াছিলেন আমাদের ঘুমন্ত চেতনার জাগৃতিরূপে প্রকাশ পাইতে, নিজেকে উজাড় করিয়া বিতরণ করিতে, আমাদের দারিদ্র্য ঘুচাইয়া আমাদিগকে সম্রাট করিতে। আমরা সেই প্রকাশ-সম্ভাবনায় ভয় পাইয়া গেলাম, তাঁহার বিত্ত চাহিলাম না। মূঢ়তা আমাদেরই। শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় কুঠীর ছাদ হইতে নামিয়া পঞ্চবটীতে ধ্যানে বসিয়াছেন। কে তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গাইবে?

হয় তো কেহ নাই, হয় তো বা কেহ কেহ আছে নাম-না-জানা সহস্রদের ভিড়ে আত্মগোপন করিয়া, গোপন থাকিয়াই হয় তো তাহারা পৃথিবী হইতে বিদায় লইবে, কিন্তু রামকৃষ্ণের অর্ধমুদিত চক্ষের

দাক্ষিণ্যদৃষ্টি তাহারা নিশ্চিন্তই লাভ করিয়া যাইবে না কি? সেদিন দেখিয়াছিলাম একজনকে। অবসর-প্রাপ্ত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শুঁড়ার দরিদ্রপল্লীর এক সঙ্কীর্ণ গলিতে একটি জীর্ণ গৃহে বাস করেন। অনেক কষ্টে ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছেন, সম্প্রতি সে চাকরিতে ঢুকিয়াছে। বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন,—ব্রজবল্লভ বাবু, এইবার ছেলের বিবাহ দিন, যৌতুকের দু'পাঁচহাজারে ভাঙ্গা বাড়ীটি ভাল করিয়া মেরামত করিয়ে নিন। বন্ধুদের পরামর্শ পর্যালোচনা করিতে করিতে ব্রজবল্লভ বাবু কখন শুইয়া পড়িয়াছিলেন মনে নাই। নিস্তব্ধ মধ্যরাত্রিতে রামকৃষ্ণ জাগিয়া উঠিয়াছেন। ব্রজবল্লভ বাবু রোমাঞ্চিত। শয্যা ছাড়িয়া ঘরে উন্মত্তের মতো পায়চারি করিতে লাগিলেন। নিজে নিজে বলিতেছেন,—আমি রামকৃষ্ণের ভক্ত, তিনি না সেখেছিলেন টাকা মাটি—মাটি টাকা? ছেলে বেচে টাকা আনবো আমি? না—না—না। কিছুদিন পরে অত্যন্ত দরিদ্র একটি উদ্বাস্তু সুশীলা কন্যাকে একেবারেই কিছু না লইয়া পুত্রবধূরূপে তিনি গৃহে আনিলেন। বন্ধুরা তাঁহাকে নির্বুদ্ধি বলিয়া ধিক্কার দিল—কিন্তু ব্রজবল্লভ বাবুর বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তরূপে তাঁহার অন্যরূপ করিবার উপায় ছিল না।

কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তরবঙ্গস্থিত একটি কারখানার প্রৌঢ় ম্যানেজারের কথা মনে পড়ে। পরিকল্পনার প্রারম্ভ হইতে তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে কারখানাটি গড়িয়া উঠিয়াছে। দিল্লীর একজন বড় কর্তাব্যক্তি কারখানা পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। কাজকর্ম দেখিয়া খুশী হইয়াছেন। ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তুমি যাহা করিয়াছ এবং করিতেছ তাহাতে এত অল্প মাহিনাতে কি করিয়া এতদিন সন্তুষ্ট রহিলে? আমি দিল্লীতে গিয়া শীঘ্রই তোমার বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছি। ম্যানেজার শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। কহিলেন, না, আমার প্রয়োজন নাই। তবে আপনি ঐ টাকাটা যদি আমার অধস্তন স্বল্প বেতনের কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধিতে ভাগ করিয়া দেন তো বড়ই অনুগৃহীত হইব।

ডক্টর আম্বেদকরের ধর্মান্তর গ্রহণ

ডক্টর বি আর আম্বেদকর সস্ত্রীক গত ১৪ই অক্টোবর নাগপুরে প্রায় দুই লক্ষ তপশীলী সম্প্রদায়-ভুক্ত নরনারীর সহিত বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের প্রবীণতম বৌদ্ধসন্ন্যাসী কুশীনারের মহাথেরো চন্দ্রমণি ঐ দীক্ষাদানকার্য সম্পন্ন করেন। আম্বেদকর বলিয়াছেন,—"যে প্রাচীন ধর্মকে আমি ত্যাগ করিলাম উহা অসাম্য এবং অত্যাচারের প্রতীক। আজ আমি নবজন্ম লাভ করিয়াছি। অবতারবাদে আমি বিশ্বাস করি না। বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলা আমি অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিয়া মনে করি। আমার ধারণা যে, সকল হিন্দুই একদিন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিবে এবং খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিগণেরও অধিকাংশ উহা অনুসরণ করিবে। ভারতবর্ষকে একদিন বৌদ্ধ দেশ হইতেই হইবে।"

ডক্টর আম্বেদকর স্বীকার করেন যে—যাহারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিল তাহাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত কিন্তু তিনি তাহাদিগকে ক্রমশঃ এই ধর্মান্তর গ্রহণের তাৎপর্য বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন।

পরদিন একটি জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ডক্টর আম্বেদকর বলেন যে, হিন্দুধর্ম ত্যাগের সঙ্কল্প তিনি ১৯৩৫ সাল হইতেই পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তখন হইতই তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যদিও তিনি হিন্দু হইয়া জন্মাইয়াছেন তবুও মৃত্যুর সময় তাঁহাকে যেন হিন্দু থাকিয়া না মরিতে হয়। তাড়াহুড়া করিয়া কোন কাজে তিনি বিশ্বাস করেন না বলিয়া ধর্মত্যাগের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসিতে তাঁহার কুড়ি বৎসর লাগিয়াছে। তিনি বলেন,—"ধর্মের নামে অস্পৃশ্যরা অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ করিয়াছে। জাতিভেদ এবং সামাজিক বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্ম অচ্ছুতগণের উন্নতির জন্য কোন সুযোগই দেয় নাই। বৌদ্ধধর্ম জাতিভেদ

হইতে মুক্ত এবং ন্যায় ও সাম্যের উপর গঠিত। অতএব অস্পৃশ্যগণের একমাত্র ভরসা বৌদ্ধধর্মই।"

স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতারূপ জাতীয় কলঙ্কের জন্য ডক্টর আম্বেদকরের অপেক্ষা কম মর্মপীড়া ভোগ করেন নাই—কিন্তু তাঁহারা উহার প্রতীকারের জন্য ডক্টর আম্বেদকরের পন্থা অবলম্বনের কথা ভাবিতে পারেন নাই। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ সামাজিক ব্যাধি—হিন্দুধর্মকে উহার জন্য দায়ী করা সঙ্গত নয়। ডক্টর আম্বেদকরের ন্যায় একজন প্রতিভাশালী পণ্ডিত হিন্দুধর্মকে কি করিয়া "অসাম্য ও অত্যাচারের প্রতীক" বলিয়া ঘোষণা করিলেন ইহা আশ্চর্য। ডক্টর আম্বেদকর যে অধ্যবসায় ও সংগঠনীশক্তি লইয়া কুড়ি বৎসর ধরিয়া দুই লক্ষ অনুগামীকে স্বধর্মত্যাগে প্ররোচিত করিলেন উহা দ্বারা তিনি যদি স্বামী বিবেকানন্দ-নির্দিষ্ট প্রণালীতে এই বিরাট জনসঙ্ঘকে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুগণের শিক্ষাদীক্ষাদানে নিয়োগ করিতেন তাহা হইলে তাহাদের অনেক বেশী কল্যাণ হইত। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ সম্বন্ধে স্বাধীন ভারত উত্তরোত্তরই সচেতন হইতেছে। এই সামাজিক কলঙ্ক ধীরে ধীরে যে কমিয়া আসিতেছে তাহা সুস্পষ্ট। রাষ্ট্রকর্ণধারগণও ইহা লইয়া ভাবিতেছেন এবং এক এক করিয়া সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। ডক্টর আম্বেদকরের চমকদার সাম্প্রতিক কাজটি সময়ের সহিত মোটেই খাপ খাইল না। বরং সন্দেহ বাড়িয়া গেল এই ধর্মান্তরগ্রহণ কি ধর্মভাবের প্রেরণা হইতে না রাজনৈতিক সুবিধাবাদের প্ররোচনা হইতে?

এই প্রসঙ্গে শ্রীগোপাল দত্ত কৌশল লিখিয়াছেন (হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ১৯শে অক্টোবর, ১৯৫৬)—

"মজার ব্যাপার এই যে, ডক্টর আম্বেদকর জাতিপ্রথা এবং তপশীলীসম্প্রদায়ের অবাঞ্ছনীয় চিহ্নের সবগুলিই বৌদ্ধধর্মের মধ্যেও বজায় রাখিতে চান, কেননা ধর্মান্তরিত অচ্ছুৎভ্রাতাদের জন্য যাবতীয় (রাষ্ট্রীয়) সুযোগসুবিধাগুলি তাঁহার চাই। * * * অস্পৃশ্যতার সমস্যা নূতন ধরণের তপশীলী সম্প্রদায় বা অচ্ছুৎ সৃষ্টি করিয়া মিটিবার নয়। অস্পৃশ্যতারীতির পশ্চাতে যে মনস্তত্ত্ব ও চিন্তাপ্রণালী রহিয়াছে উহার পরিবর্তন সাধন না করিলে তথাকথিত একজন অচ্ছুৎ হিন্দু বা বৌদ্ধ কিংবা অপর কোন ধর্মাবলম্বী হইল ইহাতে বিশেষ কিছু পার্থক্য ঘটিবে না। * * * ভারতীয় সমাজের অস্পৃশ্যতারূপ দোষ—যাহা ইতিমধ্যে অপসৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে—উহা নিমেষে দূর করিবার কোন নূতন সমাধান ডক্টর আম্বেদকর দিতে পারেন নাই। আজ কম হিন্দুই পাওয়া যাইবে যাহারা অস্পৃশ্যতা বজায় রাখিতে চায়। * * * হিন্দুধর্ম হইতে অস্পৃশ্যতা দূর হইতেছে, কিন্তু ডক্টর আম্বেদকর বৌদ্ধধর্মে তপশীলী জাতি বা অচ্ছুৎ শব্দটি প্রচলিত রাখিতে চাহিতেছেন।"

ধর্মান্তর গ্রহণ করিবার পর ১৫ই অক্টোবর নাগপুরে একটি জনসভায় ডক্টর আম্বেদকর বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "মানুষ শুধু ভাত রুটি খাইয়া বাঁচে না, তাহার মনের খোরাকও চাই। ধর্ম মানুষের মনে আশা উদ্বুদ্ধ এবং তাহাকে কর্মে প্ররোচিত করে। হিন্দুধর্ম নিপীড়িতগণের সকল আশা-উৎসাহ নষ্ট করিয়াছে; সেই জন্যই আমার ধর্মান্তর গ্রহণের প্রয়োজন হইয়াছিল, আমি বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়াছি।" জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, সহস্রশাখ হিন্দুধর্মের বিপুল শাস্ত্রসম্ভার ও অগণিত সাধুসন্তের জীবন্তবাণী হইতে মনের খোরাক যিনি খুঁজিয়া পাইলেন না, নবগৃহীত ধর্মের সত্য দেখিবার মত চোখের শক্তি তাঁহার আছে কি? বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ কি আশমান হইতে আসিয়াছিল, না সনাতন ধর্মের শিক্ষা ও ঐতিহ্যই তিনি তাঁহার জীবনে ও বাক্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন? আজ যে শাস্তার ২৫০০তম মহাপরিনির্বাণের জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেশের সর্বত্র সর্বস্তরের সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী হৃদয়ের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও পূজা নিবেদন করিতেছে ইহার প্রেরণা কোথায়? তথাগতের জীবন ও উপদেশ হিন্দু-ধর্মেরই শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি—এই বিশ্বাসই নয় কি?

ডক্টর আম্বেদকরের চিন্তাধারা আদৌ পরিচ্ছন্ন নয়, তাঁহার কর্মও সুসমঞ্জস নয়। অশিক্ষিত দুই লক্ষ (এই সংখ্যা সম্ভবত অতিরঞ্জিত) ভারতবাসীকে 'বৌদ্ধ' ছাপ মারিয়া তিনি তাহাদের কোন কল্যাণ করেন নাই, বরং তাহাদের মধ্যে ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতার বীজ উপ্ত করিয়া জাতীয় ঐক্যের মহৎ ক্ষতিসাধন করিয়াছেন।

শ্রমের পরিবেশ

সুধীর বাবু তিনটি বাঙ্গালী যুবকের জবানবন্দী শুনিতেছেন। তিনজনই বেকার, লেখাপড়া যাহা জানে তাহা দ্বারা অফিসের চাকরি সংগ্রহ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, বিশেষতঃ পাড়াগাঁ হইতে এই বিপুল কলিকাতা শহরে আসিয়া। রাজেশ্বর রায় বৈদ্যের ছেলে, ষণ্ডামার্কা চেহারা, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু; অন্য কোন উপায় না দেখিয়া সে রিকসা টানিতে গিয়াছিল। রিকসার বাঙ্গালী মালিক স্বজাতিপ্রীতিতে রাজেশ্বরকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। দশদিন যুবকটি আন্তরিকতার সহিত অচিন্তিতপূর্ব এই নূতন কর্মে লাগিয়াছিল, রোজগারও মন্দ করে নাই। বাঙ্গালীর ছেলেরা শ্রমসাধ্য কাজে আজকাল আর পূর্বের মত অপমান বোধ করে না, রাজেশ্বরও করে নাই। তথাপি রাজেশ্বরকে একাদশ দিনে এই কাজটি ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে।

সুধীর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন? রাজেশ্বর বলিল, যদিও তাহার বাপ ঠাকুরদাদা স্বপ্নেও কখনো ভাবেন নাই তাঁহাদের বংশধরকে পেটের ভাত রাজধানীর পথে রিকসা টানিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে তবুও সে এই জীবিকা-পথ সানন্দে বরণ করিয়াছিল। পরিশ্রম হইলেও সে ঐ পরিশ্রমকে অস্বীকার করে নাই, কিন্তু বাধা হইল কাজের পরিবেশ। যাহারা বেশীর ভাগ রিকসা টানে তাহাদের দলের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ অপরিহার্য, কিন্তু তাহাদের কথাবার্তা, জীবনরীতি রাজেশ্বরের পক্ষে দুঃসহ। দশদিনে সে অনুভব করেছে তাহার ভিতরের মানুষটি অর্ধমৃত হইয়া গেছে।

নীলকমল মজুমদারের বিবৃতিও একই প্রকার। উনিশ বৎসর বয়সের কায়স্থ যুবক খবরের কাগজ ফিরি করিতে গিয়াছিল। বাঙ্গালী বাবুকে তাহাদের রুটীতে ভাগ বসাইতে আসিতে দেখিয়া ঐ কাজের অবাঙ্গালী ফিরিওয়ালারা জোট করিয়া নীলকমলের পক্ষে এমন পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল যে সাত-দিন পরেই তাহাকে প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসিতে হইয়াছে।

ধনঞ্জয় প্রধান মেদিনীপুরের ছেলে। জোড়া-বাগানের ফুটপাথে সে একটি পুরী-তরকারী তেলে-ভাজার দোকান খুলিয়াছিল। বৃহৎ শ্রমিক বস্তি এই অঞ্চলে—শ্রমিকরাই খরিদ্দার। বিশ ত্রিশ পঞ্চাশ জন খাবারওয়ালা ফুটপাথে ঐরূপ অস্থায়ী দোকান চালাইয়া দিনগুজরান করে। তাহারা অধিকাংশই অবাঙ্গালী। ধনঞ্জয় ভাবিয়াছিল বাংলা-দেশের রাজধানীতে বেকার বাঙ্গালী যুবকের, যে কোন জীবিকা-পন্থা অবলম্বনের দাবী নিশ্চিতই প্রথম-গ্রাহ্য। তাই বড় আশা লইয়া সে দোকান দিয়াছিল। ক্রেতাও জুটিতেছিল কিন্তু তথাপি তিনমাস তেরো দিন পরে তাহাকে দোকানটি বন্ধ করিতে হইয়াছে। পুলিশ এমন অবস্থা সৃষ্টি করিল যে তাহার উপায়ান্তর ছিল না। তাহাদের 'হল্লার' শিকার অন্নহীন অন্নসংস্থানকামী বেকার দুর্বল বাঙ্গালী যুবকরা। অপর যাহারা ফুটপাথে ভিয়ান বসায় তাহারা কলিকাতার সিপাহীদের স্বজাতি। সিপাহীদের স্বজাতিপ্রীতি অবশ্যই দূষণীয় নয়, কিন্তু সুধীর বাবু ভাবিতে লাগিলেন বাঙ্গালীর এমন স্বজাতি-প্রীতি কোন্ আশমান হইতে কবে নামিয়া আসিবে যাহাতে শত শত সহস্র সহস্র উৎসাহী বেকার বাঙ্গালী যুবককে শারীর শ্রম দ্বারা অন্নসংস্থান করিতে গিয়া শুধু পরিবেশের অযথতা ও নিষ্ঠুরতার জন্যই কাজ বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে না হয়?

ভাবের ভুবন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

ভাব দিয়ে এই ভুবন গড়া।
ভেবে ভেবে তাই, খেই নাহি পাই,
কেন এ মৃত্যু জন্ম জরা ?
কি ভাবে যে তিনি কোথায় থাকেন,
কি ভাবে কাহাকে কোথায় রাখেন,
ভাব-সাগরেতে জাল ফেলে দেখি—
বড়ই কঠিন এ মাছ-ধরা।

২

বস্তু তো দেখি যে দিকে চাহি,
এত রূপ, এত গন্ধ ও রস
ছেঁকে দেখি তার কিছুই নাহি।
ভাবের পিণ্ড খায় ঘুরপাক,
দেখো—ভাবো—থাকো হইয়া অবাক,
কিংবা কেবল ঝিলিমিলি হেরি—
চলে যাও তনু-তরণী বাহি।

৩

ভাবে ভাবে এই ভুবন গাঁথা—
ভাবগ্রাহীর ইচ্ছা ব্যতীত
গাছ থেকে ঝরে' পড়ে না পাতা।
সবেই জড়িত, সবে সমাসীন,
তবু তিনি যেন কত উদাসীন,
সৃষ্টি স্থিতি লয় কিছু নয়
এ উৎসবের সেই বিধাতা।

৪

কাছে থেকে সে যে সরেই রবে—
ভাব করে সাথে, ভেবে দিনে রাতে,
ভাব দিয়ে তাকে ধরিতে হবে।
কেঁদে কেঁদে হতে হবে বুঝি রাই,
ডেকে ডেকে উই-ঢিপি হওয়া চাই,
সদা পথ চাও, তবে যদি পাও
বহু-বল্লভ সে দুর্লভে।

পরলোকে সি রামানুজাচারী

দক্ষিণ ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীনতম বৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্ট্‌স্‌ হোমের কর্মসচিব, পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য শ্রী সি রামানুজাচারী গত ১৮ই কার্তিক (৪ঠা নভেম্বর, ১৯৫৬) বেলা ১২-৫৫ মিনিটে ৮১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। গত কয়েক মাস যাবৎ তিনি পীড়িত ছিলেন।

শ্রীরামানুজাচারীর ন্যায় ভগবন্নিষ্ঠ অক্লান্ত কর্মযোগী সংসারে বিরল। তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (সহোদর নন) রামস্বামী আয়াঙ্গার যৌবনের প্রারম্ভে মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের (শশী মহারাজ) ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত উপরোক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি তাঁহাদেরই প্রাণপাতী পরিশ্রমের ফল। দুই ভ্রাতার নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতা ও উন্নত চরিত্র তাঁহাদিগকে মাদ্রাজের আপামর জনসাধারণের নিকট শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র করিয়া রাখিয়াছিল। 'রামু' ও 'রামানুজ' বলিয়া তাঁহারা সর্বত্র সুপরিচিত ছিলেন। ১৩৩২ সালে 'রামু'র দেহত্যাগের পর 'রামানুজ' উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানটির কর্মসচিব হন এবং তাঁহার অনলস উদ্যম ও প্রতিভা দ্বারা উহার প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। শ্রীরামানুজাচারী মাদ্রাজ সরকারের আওতার

সেক্রেটারী ছিলেন; ১৯৩২ সালে অবসর লইবার পর তাঁহার সমস্ত শক্তি ও সময় মিশনের উক্ত প্রতিষ্ঠানটির জন্যই ব্যয়িত হইত। তিনি একজন কৃতী সঙ্গীতগুণী ও অভিনেতাও ছিলেন। 'সেক্রেটারিয়েট পার্টি' সংগঠন করিয়া নানাস্থানে গীতাভিনয় দ্বারা প্রতিষ্ঠানটির জন্য ৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'রামকৃষ্ণ-কৃপা অভিনেতৃ-সংসদ' তাঁহার গঠিত অপর একটি প্রতিষ্ঠান। ইহার মাধ্যমেও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেণ্ট্‌স্ হোমের জন্য এ পর্যন্ত ২½ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

সাংসারিক দায়িত্ব বহন করিয়াও নিঃস্বার্থ জনসেবার যে জ্বলন্ত আদর্শ শ্রীরামানুজাচারী দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা সকলেরই অনুকরণযোগ্য। তাঁহার সাধ্বী পত্নী কয়েক বৎসর পূর্বে পরলোকগতা হন। দুই কন্যা ও তিন পুত্র বর্তমান রহিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এই কৃতী ভক্ত এবং স্বামীজীর একনিষ্ঠ অনুগামীর বিদেহ আত্মা ভগবৎপদে চিরশান্তি লাভ করুন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

হরি ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যাসেবাকার্য

পশ্চিমবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত বিভিন্ন জেলায় রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য-বিবরণী ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। ২৬শে অক্টোবর পর্যন্ত তিন সপ্তাহে ২৪ পরগনা জেলায় সোনারপুর থানার উখিলা-পাইকপাড়া কেন্দ্র হইতে ১৬ খানি গ্রামের ৩৪০টি পরিবারের মধ্যে ৮১ মণ ২১½ সের চাউল, ১৬ মণ ডাল এবং ২ মণ লবণ বিতরণ করা হইয়াছে।

হাওড়ার ডোমজুর থানার রাজাপুর কেন্দ্র হইতে ৮ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ৫ খানি গ্রামের ৪১৭টি পরিবারের মধ্যে ২০ মণ ৪ সের চাউল ও ৩৫০ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ বিতরণ করার পর উক্ত কেন্দ্র বন্ধ করা হইয়াছে।

বর্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম কেন্দ্র হইতে ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত তিন সপ্তাহে ১৩টি গ্রামের ৬১৩টি পরিবারের মধ্যে ৩৫১ মণ ২৩ সের চাউল, ৩২ মণ ২০ সের ডাল, ১৪ মণ লবণ এবং ২০৪ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ, বার্লি ইত্যাদি বিতরণ করা হইয়াছে।

কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী থানার নন্দনঘাট কেন্দ্র হইতে ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত তিন সপ্তাহে ১৩ খানি গ্রামের ২৯০টি পরিবারের মধ্যে ১৮৭ মণ ৩৬ সের চাউল এবং ৩৩ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। তৎপরে উক্ত কেন্দ্র বন্ধ করা হইয়াছে।

৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত আসানসোল কেন্দ্র হইতে বন্যাবিধ্বস্ত অংশের আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে এবং পাণ্ডবেশ্বর কেন্দ্র হইতে বর্ধমান জেলায় ৬ খানি ও বীরভূম জেলায় ৯ খানি গ্রামে ২০ মণ ৩২½ সের চাউল, ১২০০ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ, ১০৩ খানা নূতন কম্বল, ১২০ খানা নূতন ধুতি ও শাড়ী, ৬০টি নূতন প্যাণ্ট, ফ্রক ইত্যাদি, ২০টি পুরাতন জামা এবং সামান্য টাকা নগদ বিতরণ করা হইয়াছে।

সেবাকার্যের জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। আমরা সহৃদয় দেশবাসীর নিকট উপযুক্ত সাহায্য ভিক্ষা জানাইতেছি। এই উদ্দেশ্যে যিনি যাহা দান করিবেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে এবং তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে:

(১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া।

(২) কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন; কলিকাতা-৩।

(৩) কার্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, ৪নং ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা-১৩।

(স্বাঃ) স্বামী মাধবানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন
৭।১১।৫৬

ঈশ্বর কেমন ?

স্বামী নিখিলানন্দ

রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শংকর, চৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতির দেশ ভারতবর্ষে ভগবানের সত্যতা সম্বন্ধে কদাচিৎ কোন প্রশ্ন উঠে। ভগবানের বাস্তবতার জীবন্ত প্রতীক, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের দেখা মেলে ভারতের সর্বত্র। আজও ৺কাশীধামে শত শত লোককে অধ্যাত্ম সাধনায় জীবনের অন্তিমকাল ব্যয়িত করিতে দেখা যায়। হিন্দুর নিকট ধর্মই প্রকৃত বন্ধু, তাই সে কর্মজীবনের পর নিশ্চেষ্টভাবে সময় না কাটাইয়া ধর্মানুশীলনে আত্মনিয়োগ করে। মৃত্যুকালে সকলকেই পুত্র-কলত্র, জাগতিক সম্পদ ও সেই সঙ্গে এই জড়দেহকেও ছাড়িয়া যাইতে হইবে। এই জীবন হইতে জীবনান্তরে যাইবার সময় একমাত্র ধর্মই প্রকৃত মিত্রের মত অনুগামী হয়। হিন্দুশাস্ত্র বলে মানুষের উচিত পরিবারের জন্য নিজেকে, স্বদেশের জন্য পরিবারকে, বিশ্বের জন্য স্বদেশকে, এবং ভগবানের জন্য সব কিছুকে পরিত্যাগ করা।

ভূয়োদর্শন-লব্ধ জ্ঞানকেই হিন্দু ঈশ্বরাস্তিত্বের সুনিশ্চিত প্রমাণ বলিয়া জানে। ঈশ্বর আছেন কারণ বহু সন্ত মহাপুরুষ তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন। তাঁহারাই তো ঈশ্বরাস্তিত্বের অতি উদ্দীপক প্রমাণ। তাঁহাদের সমক্ষে কোন অকপট লোকের পক্ষে সংশয় পুষিয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারা যায়, এই সে দিনও কলিকাতার যে কোন লোক সন্দিগ্ধমনে, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট গিয়া তাঁহার সকল সন্দেহের নিরসন করিতে পারিত। এই সকল স্মৃতি আজও উজ্জ্বল ও অম্লান হইয়া আছে। কেহ যদি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরটিতে বা যেখানে বসিয়া তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন সেই পঞ্চবটীমূলে গিয়া কিছুক্ষণ নিবিষ্ট হইয়া বসে তাহা হইলে অতিচেতন অনুভূতির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে তাহার আর সন্দেহ থাকিবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিত কালে বহু অজ্ঞেয়বাদী তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। তাঁহারা হয়ত শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক তন্ময়তা বুঝিতেন না, কিন্তু তাঁহার উপস্থিতি তাঁহাদের মনকে যে উর্ধ্বে উঠাইয়া রাখিয়াছে তাহা সকলেই অনুভব করিতেন। মানুষের নিম্নপ্রকৃতিকে—লোভ ও লালসাকে দমন করা যায় ও এই জীবনেই যে মৃত্যুঞ্জয় হওয়া সম্ভব, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাই তাহার প্রমাণ। আর প্রতিটি মানুষই এই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে।

জগতের অশুভ ও দুঃখকষ্ট সময়ে সময়ে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আনিয়া দেয়। ভগবান যদি ন্যায়বান ও করুণাময় কেন তবে দ্বেষ হিংসা, অন্যায় ও যুদ্ধবিগ্রহ ? মানুষের ব্যাপারে তিনি কি একেবারেই উদাসীন ? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে—যিনি অনন্ত তাঁহার বাস্তবতাকে জগতে আমাদের এই দু'মিনিটের কার্যকলাপ দিয়া বিচার করা যায় না। ভগবান তো আর পৌরসভার ঝাড়ুদার নন যে তাঁহার মুখ্য কাজই হইবে দুঃখ দারিদ্র্য ও দৈহিক পীড়াদি দূর করা। গীতা বলেন, ভগবান মানুষের শুভাশুভের জন্য দায়ী নন, দায়ী মানুষ নিজে। মানুষের মায়া-ভ্রান্ত অবস্থায় এইগুলি উপস্থিত হয়। অন্তরাত্মা অজ্ঞানের আবরণে আবৃত হইলেই স্বার্থপরতা আসে আর মানুষ ভালবাসা ও ঘৃণা অনুভব করে। ইহাদের প্ররোচনাতেই সে ভালমন্দ কর্ম এবং সুখদুঃখ ভোগ করে। সাংসারিক জীবন কর্মনীতিতে চালিত। কিন্তু ঈশ্বর চুম্বকের মত সকলকে আকর্ষণ করেন। সৎকর্ম-ফলে স্বার্থপরতা দূর হইলে ও ঈশ্বরচিন্তা দ্বারা অন্তর শুদ্ধ হইলে, মানুষ তাঁহার অদম্য আকর্ষণ

শক্তি অনুভব করে। ঠিক ঠিক ভগবৎপ্রেমিক দৈহিক যাতনায় পীড়িত হয় না। ক্যান্সারের অসহ্য যাতনা অনুভব করার কালেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই গাহিতেন—"দুঃখ জানে আর শরীর জানে। মন তুমি আনন্দে থেকো।" যেমন ব্যক্তিগত তেমন সমষ্টিগত কর্মও জাতির উন্নতি বা অবনতির জন্য দায়ী। জাতীয় স্বার্থপরতা, লোভ ও শক্তি-লাভের কামনা যুদ্ধ ডাকিয়া আনে। কিন্তু শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরা সর্বকালেই ভগবদাকর্ষণ অনুভব করেন।

ঈশ্বরের স্বভাব কিরূপ? হিন্দু ঐতিহ্যানুযায়ী তিনি অনন্ত। হিন্দুর মতুয়ার বুদ্ধি নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, আমরা যতটুকু জানিয়াছি ঈশ্বর ততটুকুই এবং উহা ব্যতীত আর কিছুই নন ইহা ভ্রান্ত ধারণা। ঈশ্বরকে তিনি প্রায়ই পুষ্করিণীর সহিত তুলনা করিতেন। লোক বিভিন্ন আকারের পাত্র সহযোগে পুষ্করিণী হইতে জল ভর্তি করিয়া লয়। নিজের মাপানুযায়ী প্রতিটি পাত্র একই জল দ্বারা পূর্ণ হয়। ঈশ্বর তাঁহার অনন্ত ভাব হইতে ভক্ত যাহা অনুভব করিতে পারিবে কেবল সেইটুকুই প্রকাশ করেন এবং তাহাকে সেই বিশেষ ভাবের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তিও দিয়া থাকেন। উহাকে অবলম্বন করিয়াই সে চরমে সম্পূর্ণ ঈশ্বর-চেতনা লাভ করে। ঈশ্বরকে প্রায়ই দ্রষ্টার চিন্তা-প্রতিফলন-ক্ষম 'চিন্তামণি' নামক কাল্পনিক পাথরের সহিত তুলনা করা হয়; কারণ তাঁহাতে প্রতিটি চিন্তায় প্রতিফলন হয়। হিন্দুধর্মে তাঁহাকে সাধারণত সৎ-চিৎ-আনন্দঘন বলা হয়; তিনি অমর, অভী ও অনন্ত সৎগুণের আধার; তিনিই আমাদের স্রষ্টা ও রক্ষক।

হিন্দুদার্শনিকগণ ঈশ্বরের বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত—আপেক্ষিক ও তুরীয় এই দুইটি ভাবের কথা বলিয়া থাকেন। আপেক্ষিকটিকে আবার সর্বব্যাপী এবং 'ব্যক্তি' উভয়রূপেই ধারণা করা যায়। ঈশ্বরের বিশ্বাতীত ও তুরীয়ভাব গভীর ও উচ্চতম। ইহার অনুধ্যানকালে মানুষ সংসার ও নিজের ব্যক্তিত্ব এই দু'য়ের কোনটিকেই দেখে না। উপনিষদ্ বলে, প্রিয়তম পত্নীকে আলিঙ্গনকালে মানুষের যেরূপ বাহির ও ভিতর বিশ্বের কোন জ্ঞান থাকে না সেইরূপ পরমেশ্বরে অভিনিবিষ্ট আত্মাও নিজেকে বা অপর কাহাকেও দেখিতে পায় না। সৌন্দর্য-ধ্যানেও এই প্রকার একত্বানুভূতির স্ফুরণ হয়। তুরীয় সত্তা নির্গুণ। উহা মন ও ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞাত। উপনিষদ্ এই বিশ্বাতীত সত্তাকে "পুরুষ" বা "স্ত্রী" না বলিয়া, সর্বনাম পদ "ইহা" দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন। এই সত্তাকে জ্ঞাতা বলা যায় না কারণ ইহার পর জ্ঞাতব্য বলিয়া কিছু থাকে না। ইহাকে ভাবুকও বলা যায় না কারণ চিন্তার ইন্দ্রিয় মন সেখানে নাই। ইহাকে স্রষ্টাও বলা যায় না কারণ সাধারণতঃ যে সকল প্রেরণার বশে মানুষ কাজ করে, সেগুলির একটিও ইহার নাই। বেদান্তে যাহাকে ব্রহ্ম বলা হয় সেই বিশ্বাতীত সত্তাকে একও বলা যায় না কারণ উহা দু'য়েরই অনুবন্ধীরূপে ব্যবহৃত হয়। সেইজন্য ব্রহ্ম বিষয়ে "একমেবা-দ্বিতীয়ম্" বা "নেতি", "নেতি" বলা হয়। বিশ্বাতীত সত্তার অনুভূতি অবর্ণনীয়। তুরীয় ব্রহ্মানুভূতির পর শ্রীরামকৃষ্ণকে ওঁ শব্দটি উচ্চারণ করিবার পূর্বে যেন তিনটি স্তর নামিয়া আসিতে হইত। অহং ও সংসারের বিন্দুমাত্র সচেতনতা থাকিলে সাধকের এরূপ নির্বিকল্প অবস্থা লাভ হয় না।

বিশ্বাতীত বা তুরীয় ভাবের নিম্নে বিশ্বময় বা আপেক্ষিক ভাব। সর্বব্যাপী ঈশ্বর ব্যক্তি নন কিন্তু প্রেম, দয়া ও করুণা প্রভৃতি মানবসুলভ গুণ-সম্পন্ন। ইনি বিশ্বাত্মা, সকলের সারবস্তু। উপনিষদ্ বলে, জগতে থাকিয়াও ইনি জগদতীত এবং জগতের মধ্যে থাকিয়া উহাকে চালনা করেন। উপনিষদে আছে পা না থাকিলেও ইনি সর্বত্রগ, হাত না থাকিলেও ইনি সব কিছুকে ধরেন এবং কান না থাকিলেও সব শোনেন। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়

ইহার প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ। ইনি এক সঙ্গে সব কিছু দেখেন ও অনন্তের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে প্রত্যেকটি জিনিসের ধারণা করেন। সেইজন্য ইনি সদসদতীত। আংশিক দৃষ্টি দিয়া বস্তুবিচার করা সৎ নহে। আপন ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন যিনি, তাঁহার নিকট আত্মাভিব্যক্তির যাহা সহায়ক তাহাই সৎ, কিন্তু স্বার্থপরতাতেই পাপের চরম প্রকাশ। ব্রহ্মাণ্ডের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা যায়, বিশ্বমনে যাহাই প্রতিভাসিত হয় তাহার একটি বিশ্বাত্মক অর্থ আছে। বিশ্বপরিস্থিতি হইতে কোন ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখিলে মানুষ দুঃখভোগ করে। ব্যক্তিত্ব এক-প্রকার ভ্রান্তিবিশেষ; উপযুক্ত বিচারশক্তি উহাকে দূর করে। আত্মবিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিলে বিশ্ব হইতে একেবারে ঠিক পৃথক কোন ব্যক্তিত্ব মানুষ আবিষ্কার করিতে পারে না। পিঁয়াজের খোসা একটি একটি করিয়া ছাড়াইলে ভিতরে কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ব্যক্তিত্বের প্রতি মমত্বেই দুঃখকষ্টযাতনা-বোধ জাগে। বিশ্বের সহিত নিজেকে এক করিয়া ফেলিলে দুঃখকষ্ট থাকে না, এমনকি মৃত্যুও তুচ্ছ হইয়া যায়।

গীতার একাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের এই সর্বব্যাপী বিশ্বরূপের বর্ণনা আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য প্রিয়জনের আসন্ন মৃত্যুর চিন্তায় অর্জুন ব্যথিত হইলেন। যুদ্ধ করিলে তিনিই তাহাদের মৃত্যুর কারণ হইবেন এই চিন্তা তাঁহাকে পাইয়া বসিল। বিশ্বমনে সৃষ্টি স্থিতি ও লয় পর্যায়ক্রমে হইতে থাকে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকট এই তত্ত্ব প্রকাশিত করিলেন। তথায় সব কিছুর প্রথম উদ্ভব হয় ও মানবকে নিমিত্ত করিয়া দৃশ্য জগতে উহার সমাধান হয়। পৃথিবীতে ভগবদিচ্ছা-পূরণে তাঁহারই যন্ত্র হইয়া কাজ করিবার কথা অর্জুনকে বলা হইল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, যুদ্ধার্থে সমবেত বিপক্ষের এই সব বিবদমান যোদ্ধারা তুমি না মারিলেও বাঁচিবে না। অতএব উঠ, যশ লাভ কর! শত্রু জয় কর ও ঐশ্বর্যশালী রাজ্য ভোগ কর।

দেহ-চেতনার সহিত জড়িত মানুষের পক্ষে শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ ধ্যান করা অতীব দুঃসাধ্য। এককালে জন্ম-মৃত্যু, প্রেম ও ঘৃণা, যুদ্ধ ও শান্তি, সৃষ্টি ও লয় সবই সর্বত্র ঘটিতে দেখা বড় বেদনাময় অভিজ্ঞতা। সামান্য সাংসারিক চিন্তায় মানুষ প্রায়ই বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে; বিশ্বের যাবতীয় ঘটনাকে এক দৃষ্টিতে দেখিয়া লওয়া কতই না কঠিন! আবার পৃথিবী তো বিশ্বের একটি কণা মাত্র—অনন্ত সৃষ্টি সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ মাত্র। শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জুন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। পরমেশ্বরকে তিনি ব্যক্তিরূপে, তাঁহার প্রার্থিত দেবতা শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারীবিষ্ণুরূপে দেখিতে চাহিলেন।

ব্রহ্মাণ্ডের দিক হইতে ঈশ্বরের ব্যক্তিসত্তা বাস্তবতার অন্যতম বিকাশ। বাস্তবতাকে ব্যক্তি-ঈশ্বরের মধ্য দিয়া দেখা ঠিক যেন মধ্যাহ্ন তপনকে রঞ্জিত কাঁচখণ্ডের মধ্য দিয়া দেখার মত; উগ্র সুগন্ধিকে বস্ত্রখণ্ডে ছিটাইয়া উপভোগ করার মত। মানুষ ব্যক্তি-ঈশ্বরের স্রষ্টা নয়। ভক্তের মঙ্গলার্থে ঈশ্বর স্বয়ং ব্যক্তিরূপ গ্রহণ করেন। আরও অনেকভাবে তিনি ব্যক্তিরূপ ধরিয়া আসেন। আদিম বীজ হইতে বিশ্ব যখন বিবর্তিত হইতে থাকে তখন সেগুলির আবির্ভাব হয়। উহারা স্বর্গস্থ পিতা, জিহোভা, আল্লা, শিব, কালী, বিষ্ণু ইত্যাদি নামে পরিচিত এবং বিশ্ব যতখানি সত্য উহারাও ততখানি সত্য। এই ব্যক্তি-আকারই প্রথম স্তর। ইহার উপরই নির্ভর করিয়া আমরা নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতি লাভ করিতে পারি। খ্রীষ্ট এই ব্যক্তি-ভগবানকে "স্বর্গস্থ-পিতা" আখ্যা দিয়াছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। ক্রুশ, অর্ধচন্দ্র, প্রতিমা বা শব্দ-প্রতীক ওঁ উচ্চারণ করিয়া যাঁহার সহিত অন্তরের সংযোগ স্থাপন করি, তিনিই

আমাদের প্রার্থনা ও পূজার লক্ষ্য। মানুষ যে আকারেই ভগবদরাধনা করুক না কেন, ঈশ্বর তাহা গ্রহণ করেন। অবিচলিত প্রেমের সহিত তাঁহার ধ্যান করা উচিত, কারণ এই প্রেমেই তাঁহার প্রকৃতস্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। তিনি ভক্তের প্রীতির অর্ঘ্য গ্রহণ করেন, উহা পত্র পুষ্প বা এক অঞ্জলি জল, যাহাই হউক না কেন। লক্ষ্য তিনি, নির্ভর তিনি ; প্রভু, সাক্ষী, আশ্রয়, বন্ধু, ত্রাতা ও মুক্তিদাতা তিনিই। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রতীক ভগবান নহে। হিন্দু প্রতিমাকে ঈশ্বররূপে পূজা না করিয়া প্রতিমার সাহায্যে পূজা করে। প্রতিমাকে ঈশ্বররূপে পূজা করা পৌত্তলিকতা, কিন্তু প্রতিমার সাহায্যে ঈশ্বরের পূজা করা এক সার্থক পূজাপদ্ধতি। অসীমের চক্রবালে প্রতীক গবাক্ষস্বরূপ। চন্দ্রকে দেখাইতে মানুষ অঙ্গুলি নির্দেশ করে কিন্তু অঙ্গুলি চন্দ্র নহে। ব্যক্তি-ঈশ্বর শেষে বিশ্বাত্মায় লীন হইয়া গিয়া চরমে তুরীয় সত্তাপ্রাপ্ত হন।

ঈশ্বর সম্বন্ধে আরও একটি ধারণা আছে। প্রেমই মানুষের আধ্যাত্মিক গভীরতার পরিমাপক। যথার্থ পূজা, পূজক ও ইষ্টের মধ্যে এক নিবিড় সম্বন্ধ পাতাইতে চায়। মানবসুলভ গুণবিশিষ্ট ভগবানকে চিন্তা করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া হিন্দুধর্ম ঈশ্বরের অবতারত্ব, ভগবানের নররূপ ধারণ স্বীকার করে। ঈশ্বর মানুষের ত্রাণকর্তা হইলে মানুষের সঙ্কটকালে তাঁহাকে আসিতে হয়। গীতা বলেন যে, ধর্মের নাশ ও পাপের প্রাধান্য কালে ধার্মিকদের রক্ষণার্থে ও পাপীদের শাসনার্থে ভগবান অবতীর্ণ হন। সসীম মন ভগবানের অবতারত্ব বুঝিতে অক্ষম। ঈশ্বর কেমন করিয়া একইকালে নরদেহধারণ, মানবোচিত বাধাবিপত্তিস্বীকার ও নিজস্ব দৈবী সত্তার সংরক্ষণ করেন, বিচারদ্বারা তাহা অনুধাবন করা কঠিন। আচার্য শংকর তাঁহার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভূমিকায় বলিয়াছেন নিজের দৈবীশক্তি সংবরণ করিয়া, মনুষ্যদেহে বাস, মানুষের মত চলাফেরা ও মানুষকে করুণা করিতে শ্রীভগবান যেন নরজন্ম গ্রহণ করেন। ভগবানের অবতারত্ব অধ্যাত্মজগতের এক বাস্তব ঘটনা। জনৈক খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী মরমী সাধক তো বলিয়াছেন,—"মানুষ ঈশ্বর হইতে পারিবে বলিয়া ঈশ্বর মানুষ হইয়া আসেন।" কিন্তু হিন্দুধর্ম, বিশেষ কোন কাল বা ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বরাবতারত্বকে সীমায়িত করিয়া রাখে নাই। পৃথিবীতে জীবনবিবর্তনের নানা স্তরের সঙ্গে যুক্ত দশাবতারের কথা হিন্দুপুরাণে আছে। ভগবান কেবল মানুষের নহে সমগ্র জীবজগতের রক্ষক। বিবর্তনের বিভিন্ন কালে জীবন যখন বিপদাপন্ন হইয়াছিল তখন পৃথিবীতে ঈশ্বরাবতারের আবির্ভাবের কথা স্বীকার করা কঠিন নহে।

যীশুখ্রীষ্টও বলিয়াছেন, "কেবল সন্তানের মধ্য দিয়াই পিতাকে দেখা সম্ভব।" মানবীয় প্রতীকের সাহায্যেই মানুষ উচ্চতর অধ্যাত্মতত্ত্বসমূহ ভালভাবে অধিগত করিতে পারে। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট বা রামকৃষ্ণের মত মানবরাই ঈশ্বরকে স্পষ্ট ও বাস্তব করিয়া তোলেন।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান যতই গভীর হউক না কেন অবতার ও মহাত্মার মধ্যে পার্থক্য এই যে অবতার আজন্ম অধ্যাত্মজ্ঞানী। জন্মকালে তাঁহার দেবত্ব যেন একটি সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত থাকে কিন্তু অধ্যাত্ম সাধনায় এই আবরণ দ্রুত অপসৃত হয়। এমনকি বাল্যকালেও অবতার তাঁহার দৈবীপ্রকৃতির আভাস পান, যেমন বাইবেলে মন্দিরস্থ পণ্ডিতদের সহিত যীশুর আলোচনার মধ্যে দৃষ্ট হয়। কিন্তু মহাত্মাকে প্রবল প্রচেষ্টা সহকারে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অর্জন করিতে হয় ; অবতারে ইহা প্রায়ই স্বতঃস্ফূর্ত। মহাত্মা, সাধককে সাহায্য করিতে পারেন, তাহাকে মুক্তি দিতে পারেন না। অবতার মুক্তি দিতে পারেন। কোন প্রকারে সমুদ্র পার হইতে পারে এইরূপ একটি ক্ষুদ্র তরণীর সহিত মহাত্মার তুলনা

হইতে পারে কিন্তু অবতার হইলেন যাত্রীদিগকে অনায়াসে পার করিতে সক্ষম বড় জাহাজের মত। মহাত্মা যেন এক বিন্দু মধুবিশিষ্ট ক্ষুদ্র পুষ্প আর অবতার মৌচাক—তাঁহার সবই মধুর। মহাত্মাকে, কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের সহিত তুলনা করা যায়। তিনি প্রাচীন শহরে খনন করিতে করিতে আবর্জনাবৃত ফোয়ারা আবিষ্কার করেন। আবর্জনা দূর হইলে, তত্রস্থ পূর্বাবস্থিত জলরাশি সবেগে বাহির হইয়া আসে। অবতার ইঞ্জিনিয়ারের মত, তিনি মরুভূমি হইতেও কূপ খনন করিয়া জল বাহির করিতে পারেন।

ঈশ্বরের বহু অবতারত্ব সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। ভক্ত তাহার রুচি ও প্রকৃতি অনুযায়ী যে কোন একটিকে বাছিয়া লইয়া তাঁহাকেই নিজ ইষ্টরূপে গ্রহণ করিতে পারে। একনিষ্ঠ ভক্তি-সহকারে তাঁহার পূজা করা উচিত কিন্তু অপর সকলকেও অসীম শ্রদ্ধা করা প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সকল ধর্মই দেবতার নরত্ব-ভাব স্বীকার করেন। কোন হিন্দু বা খ্রীষ্টান কর্তৃক অবতার যে ভাবে পূজা পান, মহম্মদ, বুদ্ধ, মসীহ ও অন্যান্য অবতারগণও স্ব-স্ব অনুগামিগণ কর্তৃক সেইরূপ সমান ভক্তি সহকারে পূজিত হন।

সাধারণ মানবমনের অজ্ঞতাতেও ঈশ্বরের আরও অবভাস আছে। সৃষ্টি যেমন বিশাল, ঈশ্বরের রূপও তেমন অনন্ত। ধ্যানের গভীরতায় উহারা আত্ম-প্রকাশ করে। ঈশ্বরের বিশেষ কোন আবির্ভাবে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয় বরং পরমেশ্বরে সম্পূর্ণ আত্ম-নিমজ্জন না হওয়া পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া উচিত।

হিন্দু ঐতিহ্য সকলপ্রকার পূজা-পদ্ধতি মানিয়া লয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, মানুষ অসত্য হইতে সত্যে যায় না বরং সত্য হইতেই সত্যে যায়। স্থূল কৃত্য ও উৎসবাদি বা নিঃস্বার্থ ভালবাসা বা দার্শনিক বিচার বা নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে ভক্ত ঈশ্বরের সহিত অন্তরের যোগ স্থাপন করিতে পারে। সব ধর্ম বিভিন্ন প্রকৃতির উপযোগী ও ঈশ্বর চেতনার উচ্চ শিখরে আরূঢ় করাইতে সমর্থ বলিয়া সত্য। নানা পথে নানা ধর্মের সাধন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখিলেন যে চরমে সবই সেই একই তত্ত্বে লইয়া গেল। ঈশ্বরের সেই চরম সত্যে কোন ভেদ নাই।

আত্মার প্রকাশ-ক্ষেত্রে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

অজানা রহস্যপথে সীমা হোতে অসীমের স্তরে,
  অব্যক্ত এষণা তরে
অণু পরমাণু লয়ে বাহিরে ও ঘরে,
  চিরদিন খেলা মোর বহুরূপে আনন্দের সাথে।

এ সংসারে অনাবিল সত্য যাহা, তারে আমি দুঃখ বলে জানি,
  মায়াচ্ছন্ন মনোভূমে চৈত্যমাঝে চলে নিত্য লীলা মম।
প্রাণময় কামনায় ভ্রমিতেছি কেন উন্মাদের সম?
  মন ব্রহ্মে সমাহিত কবে হবে!—ভাবরসে স্তব্ধ হবে বাণী?

আত্মার প্রকাশ-ক্ষেত্রে ক্রমিক প্রগতি,
নব নব অভিজ্ঞতা ব্যষ্টিসত্তা লভিতেছে জন্ম আবর্তনে।
জীবন-বাসনাবীজ ছড়ায়েছি যুগে যুগে আশার স্পন্দনে,
বিচিত্র ফসল লয়ে কারে আজ জানাবো প্রণতি ?

আত্মচৈতন্যের পরাজ্ঞানে ভূমাবোধ ক্ষণে ক্ষণে দেয় দোলা,
অতীন্দ্রিয় পরিশ্লেষে অনন্তের গূঢ় অভিপ্রায়ে ;
অশ্রুত বাঁশরী যেন বেজে ওঠে হৃদয় প্রচ্ছায়ে
না-দেখা আলোকরশ্মি স্বুরে ঝরে' কেন মোরে করে আত্মভোলা ?

মহাপ্রভুর নীলাচল

শ্রীমতী সুধা সেন, এম্-এ

দীর্ঘ আড়াই মাস মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার পরে যেদিন ডাক্তারেরা হাসিমুখে ঘর হইতে বাহির হইলেন, সেদিন বাড়ীতেও সকলের মুখে হাসি ফুটিল।

স্বামী আসিয়া বলিলেন,—"শীগ্‌গির সেরে ওঠ তো এবার—তারপর পুজোয় কোথায় যাবো আমরা বলতো ?" রোগ-দুর্বল মস্তিষ্কে কিছুই ধারণা করিতে পারিলাম না—আমি সারিয়া উঠিব, আমি বাঁচিয়া উঠিব আবার ?

স্বামী বলিলেন—"পুরী গো পুরী !"

বহুদিবসের আকাঙ্ক্ষা এবারে মিটিবে ? আনন্দ-উজ্জ্বল স্মিতমুখে গভীর ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িলাম।

বাস্তবিক ইহার পরে শয্যাত্যাগ করিতে আর বেশী দিন লাগে নাই।

পূজার সময় কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে কয়েক-দিন কাটাইলাম। পরমপূজ্য সহাধ্যক্ষ মহারাজের পায়ের কাছে বসিয়া একদিকে যেমন পরমানন্দে মন পূর্ণ হইয়া গেল—আর একদিকে তাঁহার সস্নেহ তত্ত্বাবধান এবং অন্যান্য সকলের যত্নে কয়দিনেই দেহও সুস্থ হইয়া উঠিল।

তারপরে একদিন আসিয়া দাঁড়াইলাম পুরীর সমুদ্রতীরে, স্বাস্থ্যকামীদের পরমতীর্থ—ভিক্টোরিয়া ক্লাব—সি-ভিউ হোটেল প্রভৃতির অনতিদূরেই—আমাদের বাড়ী—হ্যাপি ভিলা। সমুদ্রের কাছে, অথচ নির্জনে। বাড়ীতে পা দিয়াই যেন মন পুলকিত হইয়া উঠিল।

দেহের স্বাস্থ্য ভালো হইয়া উঠিল কয়েকদিনেই, এবারে মনকেও কিছু খোরাক দিতে হয় যে ? যে জন্যে আসা !

যে পাড়ায় আছি—সে পাড়ার নাম 'গৌরবাড়-শাহী—' শ্রীগৌরাঙ্গের বাট (পথ) ও শাহী—। কাছেই যমেশ্বরতোটা শিবের মন্দির ও তোটা গোপীনাথ। এই তোটাতেই প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত গদাধর থাকিতেন—তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শুনিবার জন্য প্রায়ই প্রভু এখানে আসিতেন।

কথিত আছে—একদিন প্রভু গদাধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গদাধর ! আজ যদি তোমাকে আমি কিছু দিই, তুমি গ্রহণ করিবে কি ?"

গদাধর বলিলেন,—"তোমার দান যে আমার মাথার ভূষণ প্রভু !"

প্রভু নখে মাটি খুঁড়িতে লাগিলেন—দীর্ঘদেহ কালো পাথরের গোপীনাথের চূড়াগ্রভাগ দেখা দিল —মাটির নীচ হইতে উঠাইয়া গদাধর এখানেই তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই বিগ্রহের অঙ্গেই প্রভু লীন হইয়া যান বলিয়া একটি প্রবাদ আছে—

"কি করিব কোথা যাবো বাক্য নাহি সরে,
গোরাচাঁদে হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে।"

এই কথা মন্দিরের দরজায় লেখা।

একদিন এই তোটা গোপীনাথের নিকটবর্তী চটক-পর্বত দর্শনে গোবর্ধন ভ্রম হইল—সুনীল সমুদ্রকে ভাবিলেন যমুনা, প্রভু ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন —উঠিলেন বুঝি আঠারো ঘণ্টা পরে এক জেলের জালে চক্রতীর্থের কাছে।

এই তো বাড়ীর কাছেই সেই চটক-পর্বত, সেই সমুদ্র, বাড়ীর ধার ঘেঁষিয়া চলিয়াছে গৌর বাট —গৌর-পদধূলিলিপ্ত দীর্ঘ পথ—কিন্তু কোথায় সে দীর্ঘদেহ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ নবীন সন্ন্যাসীর পদচিহ্ন?

এই যমেশ্বর তোটার পথ বাহিয়াই প্রভু আসিতেছেন একদিন—পশ্চাতে গোবিন্দ। দূর হইতে মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি কানে আসিল। গুর্জরী রাগিণীতে গান করিতেছেন এক দেবদাসী। প্রভু উন্মত্ত আবেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন—সঙ্গীতকারীকে আলিঙ্গনের আশায়। পথে মনসিজের ঘন কাঁটার বেড়া—কিন্তু প্রেমের পথে কিসের বন্ধন? কাঁটার আঘাতে সে সোনার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল —কিন্তু ভ্রুক্ষেপহীন গৌর চলিয়াছেন দ্রুত পদ-বিক্ষেপে। গোবিন্দ ছুটিয়া আসিয়াও নাগাল পাইতেছেন না—চীৎকার করিয়া বলিলেন—"প্রভু! স্ত্রীলোকের গান।" বাহ্য চেতনা ফিরিয়া আসিল—প্রভু বলিলেন,—

"গোবিন্দ আজি রাখিলা জীবন,
স্ত্রীপরশ হইলে আমার হইত মরণ।"

শ্রীজগন্নাথের মন্দির—বিরাট গৃহতল—বিরাট প্রাঙ্গণ —সহস্র ভক্তের মেলা। দাঁড়াই গিয়া সেই গরুড় স্তম্ভের কাছে—যেখানে দাঁড়াইয়া দিনের পর দিন দর্শন করিতেন—হস্ত-পদ-বিহীন দারু জগন্নাথকে নহে—বংশীধারী শ্যামসুন্দরকে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। স্তম্ভের নীচের 'খাল'টি অশ্রুজলে ভরিয়া যাইত। যে পাথরটির উপরে দাঁড়াইয়া দীর্ঘকাল দর্শন করিয়াছেন—তাহাতে দীঘল চরণ দুইটির ছাপ অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। মন্দির-প্রাঙ্গণেই একটি ছোট মন্দিরে সেই চরণচিহ্ন নিত্য পূজিত হইতেছে।

প্রবেশ করিবার পথে—মন্দিরের সিংহদরজার পরেই 'বাইশ পাহাচ'—বাইশটি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া মন্দিরে পৌঁছিতে হয়। সেই বাইশ পাহাচের নীচেই আছে এক 'নিয়গাড়ে' তাহাতে পাদপ্রক্ষালন করিয়া প্রভু নিত্য ঈশ্বরদর্শনে যান। খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই 'নিয়গাড়ে' আবিষ্কার করিলাম।

সিংহদরজার কাছেই অনেকগুলি তেলেঙ্গা গরু ঘোরাফিরা করে দেখা যায়। পাঁচশত বৎসর পূর্বেও এইখানেই তেলেঙ্গা গাভীগুলি থাকিত। অর্ধরাত্রি পর্যন্ত স্বরূপ ও রায় রামানন্দের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ-রসাস্বাদন করিবার পর বহু মিনতি করিয়া স্বরূপ প্রভুকে শয়ন করাইয়া আসিয়াছেন—তিন দ্বারে কপাট আর গম্ভীরার দরজায় শুইয়া গোবিন্দ! স্বরূপের ভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন প্রভু! জানেন না স্বরূপ দরজায় কান পাতিয়া—কিন্তু কতক্ষণ? বিরহিণী রাধিকার নিদ্রা কি ছিল? করুণ কাতর কণ্ঠে প্রভু আস্তে আস্তে কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন। স্বরূপ আবার ভিতরে গেলেন —"প্রভু, তোমার না হয় নিদ্রা নাই, ক্লান্তি নাই, দেহবোধ নাই! কিন্তু আমরা তো সাধারণ জীব! আমরা যে আর পারি না প্রভু।"

লজ্জায় করুণায় অভিভূত হইয়া প্রভু বলিলেন,— "থাক্ স্বরূপ ক্ষমা দাও, এই যে নিদ্রা যাইতেছি।"

কিন্তু কোথায় নিদ্রা? এমনি এক রজনীর গভীর যামে প্রভুকে শয়ন করাইয়া স্বরূপ রামানন্দ

ঘরে গিয়াছেন—তিন দ্বার রুদ্ধ, প্রভুর দরজার প্রহরী গোবিন্দ আজ নিদ্রিত! প্রভু অনুচ্চকণ্ঠে ঘরের ভিতরে নাম জপ করিতেছেন। অনেকক্ষণ সাড়া না পাইয়া স্বরূপ উঠিলেন—গোবিন্দ উঠিলেন—গৃহ শূন্য—প্রভু নাই। গৃহ, গৃহপ্রাঙ্গণ সমস্ত খুঁজিয়াও যখন দেখা মিলিল না, দীপ জ্বালাইয়া গভীর নিশীথে তিন চার জনে 'প্রভু! প্রভু!' বলিয়া পথে বাহির হইলেন।

"ইতি-উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা,
গাবীগণ মধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা—
পেটের ভিতর হস্তপদ কূর্মের আকার,
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার,
গাবীগণ চৌদিকে শুঙ্খে (ঘ্রাণ লয়) প্রভুর অঙ্গ,
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ।"

প্রভুর অঙ্গের গন্ধ গ্রহণ করিতেছে, গাভীগণ ছাড়াইলেও ছাড়িতে চাহে না—গৌর তাহাদেরও প্রভু যে!

সিংহদরজার সম্মুখ দিয়াই রাজপথ, রথযাত্রার পথ! কিছুদূরে সৌভাগ্যবান গজপতি প্রতাপরুদ্রের প্রসাদ। রাজা প্রতাপরুদ্র শুনিলেন—তাঁহার রাজ্যে এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, লোকে তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া বলিতেছেন। এমনকি অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা—ভারতবিখ্যাত অদ্বৈত বৈদান্তিক, পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমও নাকি তাঁহার চরণাশ্রিত হইয়া ভক্ত হইয়াছেন।

সার্বভৌমকে রাজা ডাকাইয়া আনিলেন—জিজ্ঞাসা করিয়া এবং দেখিয়া শুনিয়া বুঝিলেন—সার্বভৌম একেবারে দ্রব হইয়াছেন। একাদিক্রমে সাতদিন ধরিয়া বেদান্ত পড়াইয়া যাঁহাকে জ্ঞানের আলোকে আনিবার আশায় সার্বভৌম অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন—সাতদিনের মধ্যে একটি দিনও তো কই তাঁহার মুখের ভাবে এতটুকু ব্যতিক্রম দেখা গেল না?

সার্বভৌম ভাবিলেন—বাতুল না মূর্খ? জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার এই অধ্যাপনা—তুমি বুঝ কি না বুঝ—কিছুই তো বল না তুমি? আমি কেমন করিয়া বুঝিব- তুমি কি বুঝিতেছ?"

তরুণ সন্ন্যাসী বলিলেন,—"আপনার আদেশ শ্রবণ করা—তাই শ্রবণমাত্র করি—আপনার ব্যাখ্যা আমি কিছুই বুঝি না!"

"কি বলিলে?"—বৃদ্ধ নৈয়ায়িক শাস্ত্রজ্ঞ পরম পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন—"আমার ব্যাখ্যা বুঝ না তুমি?"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্যের কিরণ,
কল্পিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন।"

বেদ পুরাণ উপনিষদ্ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রমথিত করিয়া সন্ন্যাসী অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব স্থাপিত করিলেন। ভক্তির জয় হইল। সার্বভৌম ভট্টাচার্য স্তম্ভিত মুগ্ধ হইয়া পায়ে পড়িলেন—শুষ্ক পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার ধূলায় লুটাইল। ষড়ভুজ দর্শন করিয়া অচৈতন্য হইলেন, যখন চেতনা পাইয়া উঠিলেন—তখন দুই চোখ ভরা অশ্রু লইয়া যুক্তকরে দাঁড়াইলেন ভক্ত! শ্লোক লিখিয়া উৎসর্গ করিলেন প্রভুর পায়ে—

"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ।"

কালপ্রভাবে বিনষ্টপ্রায় স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ প্রচার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করিয়া যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহার (শ্রীচৈতন্যের) পদারবিন্দে আমার চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হোক্।

মহারাজা প্রতাপরুদ্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে ভক্ত সার্বভৌম যখন প্রভুর ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিলেন—তখন মহারাজ আকুল হইয়া কহিলেন,—"পণ্ডিত! তাঁহাকে আমার একবার দর্শন করাও।" প্রভু তখন দক্ষিণে, তাই সার্বভৌম তাঁহার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত রাজাকে প্রতীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন।

এদিকে দক্ষিণ যাত্রার পথে গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে প্রভু রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হইলেন। রস ও রসিকের, আস্বাদ্য ও আস্বাদকের সে মিলনে যে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব, যে অনাস্বাদিত-পূর্ব রসতত্ত্ব প্রকাশিত হইল তাহা আর বর্ণনা করিলাম না। প্রতিদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে রাজ-প্রতিনিধি রায় গোপনে আসিয়া প্রভুর সঙ্গে মিলিত হন—গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলে রসাস্বাদন।

শেষে একদিন রায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভু আমার চিত্তে এক সংশয় দেখা দিয়াছে—তোমারই সম্বন্ধে—তবুও তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি!"

"পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ,
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ!
তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন পঞ্চালিকা
তার গৌর কান্ত্যে তোমার সর্ব অঙ্গ ঢাকা!"

প্রভু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"রায় তুমি কৃষ্ণপ্রেমিক এবং ভক্ত—আর ভক্তের লক্ষণই এই—সর্বত্রই তাঁহার কৃষ্ণদর্শন হয়।"

"রায় কহে তুমি প্রভু ছাড় ভারি ভুরি
মোর আগে নিজ রূপ না করিহ চুরি—"

প্রভু ধরা পড়িয়াছেন এবং যাঁহার কাছে ধরা পড়িয়াছেন তিনি ভক্তোত্তম রসিকশেখর সাড়ে তিনজন পাত্রের একজন—তাই—

"তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ,
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।"

সে অপরূপ রূপমাধুরী দর্শনে রায় মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেইদিন জগতে রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব মহারাস-তত্ত্ব প্রকটিত হইল এবং সেই তত্ত্বের প্রথম দ্রষ্টা হইলেন রায় রামানন্দ।

বিষয়-ঐশ্বর্যে কোনও দিনই আসক্তি ছিল না, এখন একেবারেই তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য রায় রাজা প্রতাপরুদ্রের শরণ লইলেন। বাসুদেব সার্বভৌমের পরিবর্তনেই রাজার বিস্ময়ের ও ভক্তির সীমা ছিল না—এখন রায়ের গৌরপ্রেম দেখিয়া রাজা একেবারে অভিভূত হইয়া গেলেন—বলিলেন—"রায়! আমাকে একবার তাঁহার সহিত মিলন করাও।"

দীর্ঘ দুই বৎসর পরে প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। সার্বভৌম শ্রীনিত্যানন্দ ও সকল ভক্তের অনুরোধ ব্যর্থ হইল—প্রভু রাজদর্শনে সম্মত হইলেন না—অধিকন্তু পুরী ছাড়িয়া যাইবার ভয় দেখাইলেন।

রাজা কাঁদিয়া উঠিলেন—"ভগবান কি এক প্রতাপরুদ্র ব্যতীত সকলকে কৃপা করিবেন এই পণ করিয়াছেন।" দর্শন বিনা রাজা প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

রায় রামানন্দ নীলাচলে আসিলে রাজা তাঁহার সংকল্পের কথা জানাইলেন। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ রায় এবার স্বয়ং দৌত্যের ভার লইলেন। ধীরে ধীরে প্রভুর মন দ্রব হইয়া আসিল।

রথযাত্রা! গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ আসিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাস—মুকুন্দ প্রভৃতি পরম বৈষ্ণবকে অগ্রণী করিয়া প্রভু সাতটি কীর্তনসম্প্রদায় গঠন করিলেন। সচল গৌরবর্ণ জগন্নাথকে অগ্রবর্তী করিয়া অচল নীল দারু জগন্নাথ রথে চলিয়াছেন!—প্রভু দ্রুতগতিতে সাত সম্প্রদায়েই ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন। অজস্র নয়নধারায় বক্ষ ভিজিয়া যাইতেছে, স্বেদ কম্প স্তম্ভ পুলকের উদ্গম হইয়া ক্ষণে ক্ষণে বাহ্য হারাইতেছেন—তবুও সুমধুর কণ্ঠে গাহিতেছেন—

"সেই ত পরাণনাথ পাইলুঁ—
যাহাঁ লাগি মদন দহনে ঝুরি গেঁলু।"

রাজা দূর হইতে তৃষিত নয়নে চাহিয়া আছেন।

"নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈল ভাবান্তর—
হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চৈঃস্বর":—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপাঃ
তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ
কদম্বানিলাঃ।

সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥"
(সাহিত্যদর্পণ)

রাধাভাব-ভাবিত গৌর শ্রীকৃষ্ণকে ইহাই যেন বলিতে চাহিতেছেন—"(কুরুক্ষেত্রে) সেই তুমি, সেই আমি, সেই নবসঙ্গম—কিন্তু তথাপি হে দয়িত! আমার মন বৃন্দাবনের সেই মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত—তুমি বৃন্দাবনে উদয় হইয়া আবার আমাকে লইয়া লীলা কর।" প্রভুর রসে রসিক স্বরূপ ভাবানুযায়ী পদ গাহিয়া প্রভুর সঙ্গে ফিরিতে লাগিলেন।

মধ্যাহ্নে নৃত্যক্লান্ত প্রভু পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া ক্ষণিক বিশ্রাম করিতেছেন—সার্বভৌম প্রভৃতি ভক্তের উপদেশানুযায়ী রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র বৈষ্ণববেশে নব অভিসারিকার মতো ভীরু কম্পিত পদক্ষেপে প্রিয়তমের কাছে চলিলেন।

প্রভুর দুই চোখ বদ্ধ—ভূমিতে অর্ধ শয়ন করিয়া আছেন। রাজা ধীরে ধীরে পায়ে মাথা রাখিলেন—বক্ষ ভরিয়া উঠিল সুধারসে—নয়নে অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল—আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ভাগবতের শ্লোক। প্রভু আনন্দোৎফুল্ল মুখে বলিতে লাগিলেন, "বলো, বলো!" রাজা শেষে এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন :—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং,
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং,
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।"

প্রভু—"ভূরিদা, ভূরিদা, (হে বহুদাতা!)" বলিয়া চোখ বুজিয়াই রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন—"কে গো তুমি? কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইলে আমায়?"

রাজা চরণে পড়িয়া কহিলেন—"আমি যে তোমার দাসের দাস প্রভু।" প্রভু যেন না চিনিয়াই প্রতাপরুদ্রকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিলেন।

কৃতকৃতার্থ, পূর্ণ হইয়া রাজা বাহির হইয়া আসিলেন—লুটাইয়া পড়িলেন ভক্তদের পায়ে!

এই সেই রাজার প্রাসাদ!

মন্দির হইয়া স্বর্গদ্বারের পথে ফিরিতেছি—শুনিলাম পাশেই ভক্তপ্রবর 'যবন' হরিদাসের কুটীর। মন্দির ও ভক্তগণের ছায়াও যেন তাঁহার পাদস্পর্শে মলিন না হয় সেই ভয়ে হরিদাস এই কুটীরেই তাঁহার পুরীবাসের দিনগুলি কাটাইয়া গিয়াছেন। স্বয়ং প্রভুই প্রত্যহ একবার আসিয়া তাঁহার সহিত এখানে মিলিত হইতেন। শ্রীরূপের ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব নাটকেরও এইখানেই আরম্ভ। রোজ লক্ষ নামজপ সারা না হইলে হরিদাস খাদ্য স্পর্শ করিতেন না। বৃদ্ধ হইয়াছেন, এখন নামজপ সম্পূর্ণ করা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে—জপও সারা হয় নাই আহার্যও স্পর্শ করেন নাই। প্রভু শুনিয়া বলিলেন, "হরিদাস আর কেন? সারা জীবন তো এই করিলে এবার সংখ্যা কমাও তাহা নহিলে পারিবে কেন?"

হরিদাস সে কথার জবাব স্পষ্ট না দিয়া বলিলেন,—"প্রভু! আমার একটি প্রার্থনা তোমাকে রাখিতে হইবে! বলো রাখিবে?"

"তোমাকে অদেয় আমার কি আছে হরিদাস?" প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন।

হরিদাস বলিলেন,—"প্রভুগো! আমার মন বলে তুমি শীঘ্রই লীলা সংবরণ করিবে। আমাকে তোমার সেই নিষ্ঠুর লীলা দেখাইবার পূর্বে আমাকে বিদায় দাও। তোমার কমলচরণ আমার হৃদয়ে ধারণ করিয়া—নয়নে তোমার চাঁদমুখ দেখিতে দেখিতে আমার মৃত্যু হোক্—আমাকে তুমি এই বর দাও!"

প্রভু ব্যাকুল করুণ হাসি হাসিলেন—"তুমি তো কৃষ্ণের কৃপাপাত্র, যাহা চাও কৃষ্ণ তোমাকে তাহাই দিবেন। কিন্তু হরিদাস! তুমি চলিয়া গেলে আমার রহিল কি?"

হরিদাস বলিলেন,—"প্রভু মায়া ছাড়! আমার মতো একটি পিপীলিকার অভাবে পৃথিবীর কিছুই হানি হইবে না।" পরদিন সকালে ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু সেই কুটীরে আসিলেন। বলিলেন,—

"হরিদাস! কহ সমাচার?

হরিদাস কহে—প্রভু যে কৃপা তোমার।"

প্রভু ভক্তদের লইয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। হরিদাস নিজের সম্মুখে প্রভুকে বসাইলেন। তাঁহার দুই নয়নভৃঙ্গ প্রভুর মুখপদ্মে স্থাপিত হইল, অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসিতে লাগিল—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে প্রভুর পদে হরিদাস প্রাণকে লীন করিয়া দিলেন।

কীর্তনান্তে সেই দেহ কাঁধে করিয়া স্বয়ং প্রভু ভক্তগণ সহ সমুদ্রতীরে আসিলেন। বালুকা-শয্যায় মহাবৈষ্ণবের সমাধি রচিত হইল। সেই সমাধি সমুদ্রতীরে কালই দেখিয়া আসিলাম।

আমাদের পুরীবাসের কয়েকদিন কাটিয়া গেল, কিন্তু আজও কাশীমিশ্রের বাড়ীর খোঁজ পাইলাম না। আমাদের পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করি বারবার—তিনি যেন অবজ্ঞাভরে জবাবই দিতে চান না—বলেন—আগে 'আটিকা বন্‌ধন্ অ কর, জগন্নাথঙ্কর-শিঙার অ দরশন্ অ কর—কাশী মিশ্রের বাড়ী পরে যিবুঁ।' অন্য পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও সদুত্তর পাই না।

একদিন শেষে নিজেই বাহির হইলাম। পথে পথে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অবশেষে ঠিকানা মিলিল—গম্ভীরা বলিলেও চলে কিন্তু রাধাকান্ত মঠ বলিলেই সন্ধান ঠিক মিলিত।

এই তো সেই মঠ—এই সঙ্গের পথ দিয়াই তো রোজ যাই অথচ জানি না যে এখানেই রহিয়াছে আকাঙ্ক্ষিত ধন। বাড়ীটি দেখিয়াই আনন্দে অস্থির পদক্ষেপে ভিতরে ঢুকিলাম। সামনেই মন্দির আর সেই মন্দির আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন রাধাকান্তের বিগ্রহ—পাশে শ্রীরাধা ও ললিতা, বিশাখা—অনেক সখী! কাঞ্চী (?) হইতে আনা বিগ্রহ অপরূপ অঙ্গলাবণ্যে যেন জীবন্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পুরোহিত বলিলেন,—প্রভুর সময়েও এই বিগ্রহ ছিলেন এবং এইখানেই প্রভুর চোখে রাসলীলা প্রকট হইত। ঠিক জানি না—তবে এই কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে পাই নাই।

পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথায় ছিল প্রভুর ঘর এবং তাঁহার কোনও চিহ্ন আছে কি না? তিনি আরও ভিতরে একটি ঘরে পাঠাইলেন। আসিয়া দাঁড়াইলাম প্রভুর দরজায়। এই সেই ছোট্ট গৃহখানি—সেই গম্ভীরা দ্বাদশ বৎসরের লীলা নিকেতন! প্রভুর পূজারী আনিয়া সামনে ধরিলেন প্রভুর পাদুকা—কমণ্ডলু ও ব্যবহৃত কাঁথার এতটুকু এক খণ্ড! শ্রীচরণে নিত্য স্পর্শসুখ-প্রাপ্ত পাদুকা দুইটিতে মাথা ঠেকাইলাম। প্রতি দিবসের পদধূলি লিপ্ত দরজার চৌকাঠে মাথা পাতিয়া রহিলাম! আমার জীবনে তোমার প্রত্যক্ষ পরশ, এও কি সম্ভব?

চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল সোনার লেখা পাঁচশ' বৎসর পূর্বের ইতিহাসের এক একটি পৃষ্ঠা! এইটুকুতো ছোট ঘর—ছোট তাহার দরজা—এই দরজাতেই একদিন মধ্যাহ্ন আহার গ্রহণ করিবার পর দীর্ঘদেহ প্রভু আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। সেবক গোবিন্দ—প্রতিদিন এই সময়ে প্রভুর শরীরের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য তাঁহার শরীর সংবাহন করেন। প্রভু দরজা জুড়িয়া আছেন অথচ দরজার অপর দিকে যাইতে না পারিলে অঙ্গসেবার সুবিধা হয় না—তাই প্রভুকে একটু সরিবার জন্য গোবিন্দ মিনতি করিতে লাগিলেন। কতো যেন শ্রান্ত প্রভু বলিলেন—"না গোবিন্দ আমার নড়িবার সাধ্য নাই! তুমি যাহা খুশি কর।" প্রভু চোখ বন্ধ করিলেন।

বারবার বলিয়াও যখন ফল হইল না তখন গোবিন্দ আপন বহির্বাস দিয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গ

আচ্ছাদিত করিয়া মনে মনে প্রণাম করিয়া প্রভুকে লঙ্ঘন করিয়াই ঐ দিকে গেলেন—মার্দন-সুখে প্রভু নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেলে ইচ্ছাকৃত নিদ্রা ভাঙ্গিয়া প্রভু যেন বিস্মিত হইয়াই গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কি গোবিন্দ? তুমি খাইতে যাও নাই?" "আপনাকে লঙ্ঘন করিয়া কেমন করিয়া যাই?"

"তবে আসিয়াছিলে কেমন করিয়া?"

সে উত্তর গোবিন্দ প্রভুকে আর কি দিবেন; কিন্তু তিনিতো জানেন প্রভুর সেবার জন্য কোটী নরকভোগও যে কাম্য!

এই একজন আর একজন পণ্ডিত জগদানন্দ। পুরুষরূপ ধরিয়া যেন অভিমানিনী সত্যভামা আসিয়া গৌরের সেবার ভার লইয়াছেন স্বহস্তে।

সারারাত্রি গম্ভীরার কঠিন ভিত্তিতলে প্রভু মাথা রাখিয়া শুইয়া থাকেন—প্রেমের তীব্র দহনে মাথা ঠুকিতে থাকেন যখন জগদানন্দের অন্তর বিদীর্ণ হইতে থাকে। অতি সাহস করিয়া একটি তুলার বালিশ তৈরী করিয়া আনিয়াছেন—পাতিয়া পাতিয়া দিয়াছেন ছেঁড়া কাঁথাটির উপরে। দেখা মাত্র প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন "একি শুধু বালিশ কেন? একটি পালঙ্ক আনো; একজন মর্দনিয়া রাখো তেল মর্দন করিতে, তবেই তোমাদের বাসনা পূর্ণ হয়!" "জগদানন্দ চাহে মোরে বিষয় ভুঞ্জাইতে।" বালিশ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।

স্বরূপের কাছে খবর শুনিলেন জগদানন্দ—ওষ্ঠাধর দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হইয়া গেল—একটি কথা বলিলেন না।

আবার গৌড় হইতে পুরী পর্যন্ত দীর্ঘ এতখানি পথ কতকটা চন্দনের তেল লইয়া আসিয়াছেন বড় আশা করিয়া—বিনিদ্র রজনী জাগিয়া জাগিয়া প্রভুর মাথা উত্তপ্ত হইয়া উঠে—তাই এই ঠাণ্ডা তেলটি ব্যবহার করিলে প্রভুর একটু সুখ হয়! স্বরূপ পণ্ডিতের ইচ্ছা প্রভুকে জানাইলেন। প্রভু বলিয়া উঠিলেন, "অসম্ভব! 'সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায়—' সুগন্ধি তেল মাখিয়া আমি পথে বাহির হইব আর লোকে আমার সন্ন্যাসের নিন্দা করিবে তাহা হইবে না। বরং পণ্ডিতকে বলিও, এ তেল মন্দিরে দিক্ আরতির সময়ে জ্বলিবে তাহাই ভালো হইবে।"

স্বরূপের মুখে একথাও জগদানন্দ শুনিলেন—দ্বিতীয় বার আর অনুরোধ করিলেন না। পরদিন প্রভু জগদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তুমি বুঝি আমার জন্য চন্দনতেল আনিয়াছ?" কথা শেষ হইতে পারিল না জগদানন্দ বলিয়া উঠিলেন—"কে বলিল তোমাকে, আমি তোমার জন্য তেল আনিয়াছি? মিথ্যা কথা!" প্রচণ্ড গতিতে ঘর হইতে তেলের পাত্রটি আনিয়া প্রভুর সামনেই তাহা আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন পণ্ডিত। সমস্ত অঙ্গনে তেল ছড়াইয়া পড়িল, বাতাস ভরিয়া উঠিল সুগন্ধে—জগদানন্দ ঘরে দ্বার দিয়া উপবাসী পড়িয়া রহিলেন। তিন দিন উপবাসেই রুদ্ধগৃহে কাটিয়া গেল—ভক্তবৎসল প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, দরজায় আঘাত করিয়া ডাকিলেন—"জগদানন্দ! উঠ! আমি আজ তোমার ঘরে ভিক্ষা করিব।"

চোখে জল, মুখে হাসি—জগদানন্দ ভিক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নে আসিলেন প্রভু—বলিলেন, "এসো জগদানন্দ, আজ তোমাতে আমাতে একসঙ্গে বসিয়া প্রসাদ পাই।" আর কি অভিমান থাকে? পণ্ডিত মিনতি করিয়া প্রভুকে বসাইলেন—"তুমি খাও প্রভু! আমি কথা দিতেছি—আমি পরে প্রসাদ পাইব।"

অন্ন গ্রহণ করিয়া প্রভু বলিয়া উঠিলেন—"আহা ক্রোধের রান্না বুঝি এমনই সুস্বাদু হয়!"

* * *

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—ফিরিতে হইবে একলাই—প্রণাম করিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

পরদিন স্বামীকে সঙ্গে করিয়া আবার আসিয়া দাঁড়াইলাম—গম্ভীরার দরজায়—।

এক এক করিয়া শ্রোতা আসিতে লাগিলেন—বোধহয় প্রতিদিনকার নিয়মমতো শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ আরম্ভ হইল।

এই গম্ভীরার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে সাধারণ লোক-লোচনের অন্তরালে যে বৃহৎ গম্ভীর লীলা একাদিক্রমে দ্বাদশবর্ষ ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—তাহারই এক অংশ আজ পড়া হইতেছে শুনিলাম—

"শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব দর্শনে,
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে।"

অশ্রু, স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য, পুলক, স্বেদ—লোমকূপে রক্তোদ্গম—দন্ত হালিয়া পড়ে, হস্তপদের সন্ধিগুলি কখনও বিচ্ছিন্ন—কখনও ঐ সকল অঙ্গই আবার যেন শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে—এই অবস্থায় রাধাভাব-বিভাবিত গৌরসুন্দর মাত্র দুইজন অন্তরঙ্গ ভক্ত সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদ করিতেছেন—যেই জন্য তাঁহার অবতার।

কখনও স্বরূপের, কখনও রায় রামানন্দের কণ্ঠ ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিতেছেন—"সখিরে শুন মোর হত বিধিবল। আমার তনু মন চিত্ত কৃষ্ণ বিনা সকলি বিফল! আমার শ্রবণ, নয়ন, জিহ্বা সমস্তই অসার গো সখী! তাহারা তো কৃষ্ণকথা শোনেনা—কৃষ্ণরূপ দেখেনা—কৃষ্ণকথা তো বলেনা, ধিক্ ধিক্ এই জীবনে যৌবনে, কই কৃষ্ণ তো তাহা গ্রহণ করিলেন না।"

আবার বলিতেছেন,—"ওগো সখী, কৃষ্ণতো দর্শন দেনই না—তবুও যদিই কোনও শুভক্ষণে বা স্বপ্নে কৃষ্ণের দর্শন পাই—অমনি 'আনন্দ' আর 'মদন' এই দুই বৈরী আসিয়া উপস্থিত হয়—আমি নেত্র ভরিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইনা।"

"হায়রে হায়! আর কি কখনও কৃষ্ণ আমাকে দেখা দিবেন? কিন্তু আশা যে ছাড়িতেও পারি না":—

"পুনঃ যদি কোনওক্ষণ　কয়ায় কৃষ্ণ দরশন,
তবে সেই ঘটি, ক্ষণ, পল
দিয়া মাল্যচন্দন　নানারত্ন আভরণ
অলঙ্কৃত করিমু সকল।"

কাঁদিতে কাঁদিতে হঠাৎ যেন বিস্মৃত চেতনা ফিরিয়া আসিল সম্মুখে স্বরূপ ও রায়কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি না কৃষ্ণচৈতন্য? এতোক্ষণ স্বপ্নে যেন কি দেখিলাম, কি যেন প্রলাপ বকিলাম তোমরা কি কিছু শুনিয়াছ?" সেই স্বপ্নস্মৃতিই আবার জাগ্রত হইল আবার 'চৈতন্য' লুপ্ত হইতেছে—আবার 'হায়, হায়' করিয়া এক শ্লোক উচ্চারণ করিতেছেন—

"কই অবরহিঅং পেম্মা, ণহি হোই মাহুসে লোএ,
জই হোই কাংস বিরহো বিরহে হোন্ত
সিম কোঅী অই॥"

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম—সে কি সখী! মানুষের হয়? জাম্বুনদ হেমসম সেই প্রেম একবার হইলে আর কি তাহার বিয়োগ হয়, না বিয়োগ হইলেই লোকে বাঁচে?"

আবার হাহাকার করিয়া বলিতেছেন,—"কোথায় আমার কৃষ্ণপ্রেম! কেবল মিথ্যা দম্ভ লইয়া মরিতেছি আমার এ ক্রন্দনও যে মিথ্যা; কৃষ্ণপ্রেম শুদ্ধ সুনির্মল তাহা বহু দূরে; 'তবে যে করি ক্রন্দন—স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন, করি ইহা জানিও নিশ্চয়।' এ শুধু নিজের সৌভাগ্য যেন মানুষকে দেখানো।"

"এই মত দিনে দিনে—স্বরূপ রামানন্দ সনে
নিজভাব করেন বিদিত
বাহে বিষজ্বালা হয়　ভিতরে অমৃতময়,
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত।
এই প্রেমার আস্বাদন　তপ্ত ইক্ষু চর্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন,
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন।"

কৃষ্ণপ্রেম-বিষে তনুমন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে—

কিন্তু ভিতরে অমৃত রসধারার প্লাবন! নানা ভাবের প্রাবল্য যেন মত্ত গজের ন্যায় প্রভুর দেহ ইক্ষুবন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিতে লাগিল, গম্ভীরার ভিত্তির কঠিন পাষাণতলে মুখ ঘষিয়া মাথা ঠুকিয়া প্রভু কাঁদিতে লাগিলেন:—

"হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো,
হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো,
হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম,
হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে।"

"হে দেব, হে দয়িত! হে ভুবনের বন্ধু! হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণাসিন্ধু! হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম, হা হা কবে তুমি আমার নয়নদ্বয়ের গোচরীভূত হইবে?'

গম্ভীরার অন্ধকার প্রকোষ্ঠের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছি—হে নাথ, হে নয়নাভিরাম! কবে তুমি নয়নের দৃষ্টিভূত হইবে প্রভু!

জীবন*

শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র

[কবি Anna Laetitia Barbauld এর Life শীর্ষক কবিতার অনুবাদ]

জীবন, কিবা যে তুমি জানিনাকো, জানি শুধু
ছাড়ি মোরে যাবে একদিন,
কবে কোথা কেমনে বা দেখা হ'ল দুজনায়,
মানি, সে ত রহস্যে বিলীন।
তুমি যবে ছেড়ে যাবে, এই শির এই দেহ
অবশেষে যা কিছু আমার,
যেখানেই যে রাখুক, ফিরে না চাহিবে কেহ,
ছার সে ধূলির পুঞ্জ সার!
কোথা উড়ে যাবে, কোথা পথহীন গতি তব
নিয়ে যাবে অলক্ষ্যে তোমারে
অপরূপ এ বিচ্ছেদে মোরে কোথা খুঁজে পাব
মিশিয়া যে আছিল অন্তরে?
শ্রীহীন মলিন এই তনু আবরণ ছাড়ি
যাবে কি উড়িয়া তাঁর পানে
বিরাজেন যথা দীপ্তজ্যোতি মহাসিন্ধু, তুমি
যাঁর কণা এসেছ এখানে?

অথবা অদৃশ্য কোন ধ্যানমৌন শূন্য সম
বিস্মৃতির মহাশূন্যতায়
যুগ যুগ বাহি, কালে সমাধি টুটিলে পুনঃ
বিকশিবে নিজ মহিমায়?
কামনা-বেদনা-রিক্ত তবুত নহগো তুমি
কি তুমি বাখানি মোরে কও,
তুমি আর তুমি যাব নহ, তবে কিবা তুমি,
কাহার মতন তুমি হও?
জীবন, তোমার সাথে কাটানু অনেক দিন
মধুমাসে, ঘন বরষায়,
প্রিয় পরিজন হ'তে বিদায়—সে সুকঠিন
শ্বাস, অশ্রু বিনিময়ে, হায়!
তবে চুপে বহে যাও, কিছু না কহিও মোরে,
আপন সময় বেছে নিয়ো,
কোনো বা উজ্জ্বলতর লোকে আবাহন ক'রে
নিয়ো মোরে, বিদায় না দিয়ো।

অনাদিলিঙ্গ ৺কল্যাণেশ্বরের কাহিনী

স্বামী মৈথিল্যানন্দ

ভারতের সর্বত্র শিবলিঙ্গের পূজা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। স্কন্দপুরাণে লিঙ্গশব্দের অর্থ এইরূপ আছে—

"আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।

আলয়ঃ সর্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥"

আকাশকে লিঙ্গ বলা হয়, পৃথিবী তাহার আসন। সর্বদেবতার আলয় এবং লয়স্থান বলিয়া লিঙ্গ শব্দে অভিহিত করা হয়। বেদে নানা স্থানে পাওয়া যায়—"দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা॥" আকাশকে পিতা এবং পৃথিবীকে মাতা বলা হইয়াছে। আকাশ সর্বব্যাপী এবং সূক্ষ্মতম মহাভূত। ইহাকে জগৎ-পিতার প্রতীক এবং পৃথিবীকে জগন্মাতার প্রতীক বলিয়া ভারতের উপাসকগণ বিশ্বব্যাপী লিঙ্গে বিশ্বের জনক ও জননীর পূজা করিয়া আসিতেছেন। যজুর্বেদে আছে—"অশ্মা চ মে, মৃত্তিকা চ মে, গিরয়শ্চ মে, পর্বতাশ্চ মে, সিকতাশ্চ মে, বনস্পতয়শ্চ মে, হিরণ্যঞ্চ মে, অয়শ্চ মে, শ্যামং চ মে, লোহঞ্চ মে, সীসঞ্চ মে, ত্রপু চ মে যজ্ঞেন কল্পতাম্।" প্রস্তর, মৃত্তিকা, গিরি, পর্বত ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার শরীর রচনা করা হউক—ইহা বেদমুখে পরমপুরুষের আদেশ। অথর্ববেদে ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন—"এহ্যশ্মানমাতিষ্ঠাশ্মা ভবতু তে তনুঃ।" হে পরমেশ্বর! তুমি এই প্রস্তরে এস, এই পাষাণ তোমার শরীর হউক—এই বলিয়া ঋষি পরম পিতাকে প্রস্তরে আহ্বান করিয়াছেন।

প্রস্তরমূর্তিতে বা ধাতুমূর্তিতে শিবের আরাধনা করায় ঐ সকল শিবলিঙ্গ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। পুণ্যসলিলা নর্মদার জলে যে সব বিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায় তাহাকে হিন্দুশাস্ত্রে বাণলিঙ্গ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—"নর্মদাজলমধ্যস্থং বাণলিঙ্গমিতি স্মৃতম্।" কোন কোন শাস্ত্রে এমনও পাওয়া যায়—

"নর্মদা-দেবিকয়োশ্চ গঙ্গাযমুনয়োস্তথা।

সন্তি পুণ্যনদীনাঞ্চ বাণলিঙ্গানি সম্মুখে॥"

নর্মদা, দেবিকা, গঙ্গা ও যমুনা—এই সব পুণ্যনদীতে বাণলিঙ্গ দৃষ্ট হয়। সাধারণ প্রস্তর ও বাণলিঙ্গ ছাড়া ভারতের বহুস্থানে অনাদিলিঙ্গে শিবের উপাসনা চলিয়া আসিতেছে। এই অনাদিলিঙ্গ কি? পরম পুরুষ কোন কোন পুণ্যস্থলে যে প্রস্তর-খণ্ডের কোন আদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না তাহাতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অলৌকিক ঘটনা সৃষ্টি করিয়া উপাসকগণকে তিনি কৃতার্থ করিয়া থাকেন এবং ঐ সব অনাদিলিঙ্গের পূজার প্রবর্তন তিনিই করিয়া আসিতেছেন।

কলিকাতার উপকণ্ঠে বালি শহরে একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। সেখানে ৺কল্যাণেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ একটি অনাদিলিঙ্গ বহুকাল হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই মন্দিরে শুভাগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দর্শন ও অর্চনা করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পার্ষদগণও ঐরূপ করিয়াছিলেন। বেলুড় মঠের অনতিদূরে এই মন্দির বহু সাধু ও ভক্তগণের নিকট সুপরিচিত। বিশ্বাসযোগ্য পুরাণকাহিনী যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রায় ২০০ শত বৎসর পূর্বে বর্তমান মন্দির যথায় অবস্থিত তথায় বেতগাছের বন ছিল। বেত-বনের সন্নিকটে একটি বাগ্‌দী বাস করিত। তাহার একটি গাভী ছিল। সেই গাভীটি অতি প্রত্যূষে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিত এবং বেতবনে ৺অনাদিলিঙ্গের উপর দুগ্ধ বর্ষণ করিত। বাগ্‌দী

দুগ্ধদোহনের সময় কয়েকদিন দুগ্ধ না পাওয়ায় একদিন প্রত্যূষে গাভীর অন্বেষণে বাহির হয়। সে লক্ষ্য করিল যে তাহার গাভী বেতবনে ঢুকিয়া লিঙ্গোপরি দুগ্ধক্ষরণ করিতেছে। সেই বাগ্দীকে ৺অনাদিলিঙ্গ স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলেন, "তুমি তোমার গাভীকে বাঁধিয়া রাখিও না। সে আমাকে নিত্য দুগ্ধ দান করে। আমি এখানে বর্তমান, আমার নাম ৺কল্যাণেশ্বর।" ৺বাবা কল্যাণেশ্বরজীউর মাথায় একটি মণি জ্বলিত। একদা একজন নাগা সাধু ওখানে উপস্থিত হয় এবং ঐ মণিটির প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সে উহা লোভবশতঃ লইবার ইচ্ছা করে। ৺বাবা কল্যাণেশ্বরজীউর চারিদিকে ঘুঁটের পোর দিয়া ঐ মণিটি পৃথক্ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন সেই সাধুটি কুড়ুল দিয়া ৺বাবাকে যেমন আঘাত করে তেমন সময়ে মণিটি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়। এই কর্মের ফলে সাধু রক্তবমন করিয়া প্রাণত্যাগ করে।

এই ঘটনার পর ৺বাবা কল্যাণেশ্বরজীউ বালির ছয় আনি জমিদার রাজা ভগবতীপ্রসন্ন রায়কে স্বপ্নে বলেন, "তোমরা আমার মন্দির করিয়া দাও।" রাজার লোকেরা তখন বেতবন কাটিয়া স্থানটি পরিষ্কার করে এবং ৺অনাদিলিঙ্গের পরিমাপ জানিবার জন্য খনন করিতে আরম্ভ করে। অনেক দূর ভূগর্ভে খনন করার পরে ৺বাবা কল্যাণেশ্বরজীউ স্বপ্নে বলেন, "তোমরা খনন করিয়া আমার অন্ত পাইবে না। বৃথা শ্রম ত্যাগ কর।" ৺বাবার আদেশ পাইয়াও রাজা ভগবতীপ্রসন্ন মন্দির নির্মাণ করিবার কোন প্রয়াস পাইলেন না। মাহেশ অধিবাসী ৺কৃষ্ণচন্দ্র বসুকে মন্দির নির্মাণ করিবার জন্য ৺বাবা স্বপ্ন দিলেন। বসুমহাশয় তদনুসারে ৺বাবার মন্দির নির্মাণ করিতে লাগিলেন। মন্দির নির্মিত হইবার পর রাজার কর্মচারীরা তাঁহাকে মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিতে দিলেন না। এমনকি, লোক লাগাইয়া তাঁহাকে প্রহারের ভয় দেখাইলেন। তখন বসুমহাশয় উপায়ান্তর না দেখিয়া রাতারাতি মন্দিরের চূড়াতে বস্ত্র বাঁধিয়া ৺গঙ্গার পশ্চিমকূলে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রতিষ্ঠার পর রাজার প্রতিনিধিগণ ৺ঠাকুরদাস ঘোষালের হস্তে পূজার ভার অর্পণ করেন। রাজা ৺বাবা কল্যাণেশ্বরজীউর সেবার জন্য ৪০০ বিঘা জমি দেবোত্তর করেন। ৺ঠাকুরদাস ঘোষালের বংশধরেরা প্রায় চারি পুরুষ এখন পর্যন্ত সেবার কাজ চালাইয়া আসিতেছেন। বর্তমান সেবায়েত শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষাল মহাশয় প্রায় ৫৫ বৎসর একটানা সেবা করিয়া আসিতেছেন।

বালি শহরের নিকটবর্তী এবং দূরাগত নরনারীগণ এই মন্দিরে ৺বাবার দর্শন ও অর্চনা করিয়া শান্তিলাভ করিয়া আসিতেছেন। কল্যাণময় ৺বাবা কল্যাণেশ্বরজীউর কৃপায় শত শত লোক কল্যাণ লাভ করিতেছেন।

"সেকেলে হিন্দু অজ্ঞ হইলেও, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইলেও তাহার একটা বিশ্বাস আছে—সেই জোরে সে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে; কিন্তু সাহেবীভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদণ্ডহীন—সে চারিদিক হইতে কতকগুলি এলোমেলো ভাব লইয়াছে—তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, শৃঙ্খলা নাই—সেগুলিকে সে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই; কতকগুলি ভাবের বদহজম হইয়া খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

মহাভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকনাথ রায়

উপনিষদের যুগের পরে সমাজে ও ধর্মে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। বেদে জীবহিংসা নিষিদ্ধ হইলেও (মা হিংস্যাৎ সর্বভূতানি) যজ্ঞে পশুবলি অনুমোদিত হইয়াছিল। অনেকের মতে যজ্ঞে পশুবলির ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল জীবহত্যার সঙ্কোচ সাধন। যজ্ঞে ভিন্ন অন্যত্র জীবহত্যা নিষিদ্ধ হওয়ায়, মাংসলোলুপদিগের মাংস খাইতে হইলে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইত। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান অর্থশালী লোক ভিন্ন অন্যের অসাধ্য ছিল। ফলে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই মাংসভোজন অসম্ভব হইয়াছিল, এবং জীবহত্যা সংকোচিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে যজ্ঞে পশুবলিও নিন্দিত হইয়াছিল। উপনিষদেই যাগযজ্ঞ নিকৃষ্ট উপাসনা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল; এবং তাহার স্থলে ধ্যানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। অনার্যদিগকে সমাজে গ্রহণ করার ফলে তাহাদের মধ্যে প্রচলিত অনেক বিশ্বাস সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব সাধারণ লোকের বুদ্ধিগ্রাহ্য ছিল না। আবার যাগযজ্ঞের প্রতি শ্রদ্ধাও হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল। এই অবস্থায় সাধারণ লোকের বুদ্ধির উপযোগী করিয়া উপনিষদের তত্ত্ব-প্রচারের প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়াছিল। বৈদিক ও ঔপনিষদ্ যুগেও বেদবিরোধী লোকের অভাব ছিল না। যাহারা ইহলোককেই একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করিত এবং পরলোকে বিশ্বাস করিত না তাহাদের প্রভাব হইতে সাধারণ লোকদিগকে রক্ষা করিবার প্রয়োজনও ব্রাহ্মণরা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ধর্মের সারতত্ত্ব সমাজের সর্বস্তরে প্রচার এবং সমাজ-কল্যাণকর নীতির মাহাত্ম্য-খ্যাপনের জন্য উপনিষদের পরবর্তী যুগে দুইখানি মহাকাব্য দুই জন ঋষি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই দুই মহাকাব্যের নাম রামায়ণ ও মহাভারত। রামায়ণে সূর্যবংশীয় রাজাদিগের এবং মহাভারতে চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের কীর্তি বর্ণিত হইয়াছে এবং সাধারণ জনগণের বুদ্ধির উপযোগী করিয়া দর্শন, আচরণনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মহাভারত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কর্তৃক রচিত বলিয়া প্রখ্যাত। এই গ্রন্থে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের বিবরণের সঙ্গে অনেক প্রাচীন কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি, আচরণনীতি প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কথা আছে, "যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে"।

মহাভারত এক বিরাট গ্রন্থ। ইহার সকল ভাগ যে ব্যাসরচিত নহে, এ বিষয়ে বর্তমানে সকল পণ্ডিতই একমত। যুগে যুগে অনেক অজ্ঞাত কবি এই গ্রন্থের মধ্যে তাঁহাদের রচনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহার ফলে অনেক স্থলে একই ঘটনা বিভিন্নভাবে বর্ণিত দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে "প্রক্ষিপ্তকারদিগের রচনা-বাহুল্যে আদিম মহাভারত প্রোথিত হইয়া গিয়াছে।" উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন, যে আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে—পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে বর্তমান মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্বের অন্তর্ভুক্ত অনুগীতা ও ব্রাহ্মণ গীতার উল্লেখ নাই। সুতরাং এই দুই অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পর বর্তমান মহাভারতে ১০৭৩৯০ শ্লোক পাওয়া যায়। কিন্তু অনুক্রমণিকাধ্যায়ে লিখিত আছে যে মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা একলক্ষ। পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে প্রত্যেক পর্বের যে শ্লোক সংখ্যা দেওয়া আছে, তাহাতে ৮৭,৮৩৩ শ্লোক হয়, একলক্ষ হয় না। কিন্তু পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে আছে যে

মহর্ষি মহাভারত রচনা করিয়া দ্বাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক "হরিবংশ"ও রচনা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে হরিবংশকে যদি মহাভারতের অংশ বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা হইলেও মহাভারতের মোট শ্লোক সংখ্যা হয় ৯৬,৮৩৬, লক্ষ শ্লোক হয় না। সুতরাং বর্তমান মহাভারতে যে ১০৭৩৯০ শ্লোক পাওয়া যায় তাহার অনেকগুলি যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

পূর্বোক্ত অনুক্রমণিকাধ্যায়ে লিখিত আছে ব্যাসদেব প্রথমতঃ উপাখ্যান-ভাগ ত্যাগ করিয়া ২৪০০০ শ্লোকে "ভারত-সংহিতা" রচনা করেন। ইহাই "ভারত" নামে আখ্যাত, এবং তিনি পুত্র শুককে ইহাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। শুকদেবের নিকট বৈশম্পায়ন ইহা শিক্ষা করেন। বৈশম্পায়ন যখন জনমেজয়ের সভায় এই মহাভারত পাঠ করিয়াছিলেন তখন উগ্রশ্রবা তাহা শুনিয়াছিলেন, পরে উগ্রশ্রবাই নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণকে তাহা শুনাইয়াছিলেন। ইহাই মহাভারতে আছে। অনুক্রমণিকাতে আছে যে ২৪০০০ শ্লোকে ভারত-সংহিতা রচনার পর ব্যাসদেব ষষ্টিলক্ষ-শ্লোকাত্মক মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। তাহার কিয়দংশ দেবলোকে, কিয়দংশ পিতৃলোকে, কিয়দংশ গন্ধর্বলোকে এবং মনুষ্যলোকে প্রচলিত। কিন্তু এই অনৈসর্গিক ব্যাপার-ঘটিত কথাটাই যে প্রক্ষিপ্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।*

মহাভারতে আছে (আদিপর্ব ৬৩।৯৫-৯৭) ব্যাসদেব বেদ ও মহাভারত পাঁচ জনকে শিখাইয়াছিলেন—সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, শুক ও বৈশম্পায়ন। তাঁহারা পৃথক পৃথক ভারত-সংহিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, ও শুক প্রচারিত ভারত-সংহিতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বৈশম্পায়ন কথিত ভারত-সংহিতাই বর্তমানে মহাভারত নামে প্রচলিত আছে।

* বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র, নবম পরিচ্ছেদ।

মহাভারতের রচনাকাল

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খ্রীঃ পূঃ ১৪৩০ অব্দে হইয়াছিল, ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের মত। ব্যাসদেব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমকালিক। সুতরাং উক্ত যুদ্ধের পরের কয়েক বৎসরের মধ্যে মহাভারত রচিত হইয়াছিল ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের মতে খ্রীঃ পূঃ ১১০০ অব্দে অথবা তাহার নিকটবর্তী কালে মহাভারত রচিত হয়, এবং বর্তমান মহাভারতের অধিকাংশই খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত একই আকারে প্রচলিত আছে। ম্যাকডনেলের মতে মহাভারতের মূল অংশ খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু পাণিনি-সূত্রে যুধিষ্ঠির, কুন্তী, বাসুদেব, অর্জুন, নকুল ও দ্রোণের নাম পাওয়া যায় এবং আশ্বলায়ন এবং সাংখ্যায়ন গৃহ্য সূত্রে মহাভারতের প্রসঙ্গ আছে। এই সকল প্রমাণ হইতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অত্যল্প-কাল পরেই যে মহাভারতের মূল অংশ রচিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা যায়।

মহাভারতে বর্ণিত বিষয়

কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ মহাভারতের প্রধান বর্ণনার বিষয় হইলেও প্রাচীন অনেক কাহিনী ও কিংবদন্তী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত এই গ্রন্থের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পর্বে ধর্ম, দর্শন, আচরণ নীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা আছে। ভীষ্ম-পর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিবাদের সমন্বয় সাধন করিয়া ভক্তিমূলক ঈশ্বরবাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রাচীন উপনিষৎগুলিতে ত্রিমূর্তির কথা নাই। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবরূপী একই ঈশ্বরের তিন মূর্তির ধারণা উপনিষদোত্তর যুগে প্রবর্তিত হয় এবং বাসুদেব কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সর্বত্র গৃহীত ও পূজিত হন। মহাভারত হইতে ইহা জানিতে পারা যায়। মহাভারতে কোথাও

বিষ্ণু, কোথাও শিব পরমদেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

মহাভারত পঞ্চম বেদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। স্ত্রীজাতি ও শূদ্রদিগের বেদপাঠে অধিকার ছিল না। তাহাদিগের জন্য মহাভারত রচিত হইয়াছিল। মহাভারতে সকলেরই সমান অধিকার। লোকশিক্ষা এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। "যতো ধর্মস্ততো জয়:" গ্রন্থের সর্বত্র ধ্বনিত হইয়াছে।

মহাভারতে দার্শনিক তত্ত্ব

মহাভারতে বহু দার্শনিক মতের বর্ণনা আছে, কিন্তু ভগবদ্গীতা ভিন্ন অন্যত্র বিভিন্ন মতের সমন্বয়ের চেষ্টা নাই। সনৎ-সুজাত অধ্যায়ে সনৎ-সুজাত ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন, "যদি জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন হয় তাহা হইলে অভেদে একত্ব সম্পাদন অসম্ভব। পরমাত্মা জলচন্দ্রের ন্যায় অজ্ঞানপ্রভাবে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সংযোগে জীব বলিয়া খ্যাত হন। ঔপাধিক ভেদ দ্বারা তাঁহার মহত্ত্বের হানি হয় না।" "সমগ্রবেদ ও মন যাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না, সেই পরম ব্রহ্ম 'মৌন' বলিয়া অভিহিত। তিনি মৌনময়।" "এই বিশ্ব ব্রহ্মের উপাধি বিশেষ মাত্র।" "তপস্বী বেদ অনুসন্ধান না করিয়া পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। কিন্তু মন দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিবে না 'আমিদাস' এইরূপ বাক্য কদাচ প্রয়োগ করিবে না, কারণ ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিরা ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হন।" "বিদেহাধিপতি জনক বলিয়াছিলেন, আমার ঐশ্বর্যের পরিসীমা নাই কিন্তু আমি যাবপর নাই অকিঞ্চন। এই মিথিলা নগরী ভস্মাবশেষ হইলেও আমার কিছু মাত্র দগ্ধ হয় না।"

পঞ্চশিখ-জনদেব সংবাদে, সাংখ্যযোগ কথন, জনক-পঞ্চশিখ-সংবাদ প্রভৃতি অধ্যায়ে সাংখ্য ও যোগদর্শন ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পঞ্চশিখ-জনদেব-সংবাদে নাস্তিক জড়বাদ ও সৌগত (বৌদ্ধ) ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ (বৌদ্ধমতের উল্লেখ হইতে এই অধ্যায় যে প্রক্ষিপ্ত ইহা প্রমাণিত হয়) খণ্ডন করিয়া আত্মার দেহাতিরিক্ত অস্তিত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে। পরে "মোক্ষদশাতে, যদি বিশেষ জ্ঞান না থাকে, তবে জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিশেষ ফল কি? যখন আত্মনাশ-হেতু যমনিয়মাদি সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন লোকের প্রমত্তা ও অপ্রমত্ততায় লাভালাভ কি? আর মোক্ষদশাতে যদি বিষয়ের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে, কিংবা থাকিলেও উহা চিরস্থায়ী না হয়, তবে কোন্ ফলের নিমিত্ত লোকে মোক্ষবিষয়ে অভিলাষ করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়?" এই প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চশিখ বলিতেছেন, "জ্ঞানপ্রভাবে বুদ্ধি মন প্রভৃতি নিরাকৃত হইলে অবিদ্যানাশ-জনিত স্বরূপানন্দ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যাহারা দৃশ্য পদার্থ কখন আত্মা হইতে পারেনা বিবেচনা করিয়া অহংকার ও মমতা পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের সাংসারিক দুঃখ নিরাশ্রয় হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে। মোক্ষলাভার্থীদিগের কর্ম ত্যাগ করা কর্তব্য। সুষুপ্তিসময়ে জাগ্রদবস্থার ন্যায় ইন্দ্রিয়বিষয়, মন ও বুদ্ধি একত্র সমবেত থাকেনা। কিন্তু সে জন্য যে আত্মার নাশ হয়, তাহা নহে। সুষুপ্তি তমোগুণের কার্য। মন ও ইন্দ্রিয়াদির একত্র সংযোগকে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রের মূলীভূত মনোমধ্যে যে আত্মা অবস্থান করেন তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে।

"সাংখ্যযোগকথন" অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করিতেছেন, "মোক্ষলাভ হইলে জন্মমৃত্যুবৃত্তান্ত স্মরণ হয় কিনা? কোন বেদে কহে মোক্ষাবস্থাতেও বিশেষ জ্ঞান থাকে, কোন বেদে কহে থাকে না। ·· যদি জ্ঞান মাত্র না থাকে, তাহা হইলে সুষুপ্তির ন্যায় পুনরায় বিশেষ জ্ঞানের আবির্ভাব তো হইতে পারে।" উত্তরে ভীষ্ম বলিতেছেন, "জীবাত্মা যখন দ্বন্দ্ববিহীন নারায়ণাত্মক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন, তখন আর তাঁহার পাপপুণ্য থাকে না, আর

তাঁহাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক হইতে হয় না। জ্ঞানী পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইলেও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তখন দেহ-নিপাত পর্যন্ত তাহার শরীরমধ্যে অবস্থান করিয়া, তাঁহাকে জন্মান্তরীণ পাপপুণ্য ফল ভোগ করায়, কিন্তু সেই ফলভোগ-দ্বারা জীবন্মুক্তের সুখদুঃখের গুণাবির্ভাব হয় না।" ইহা সাংখ্যমত বলিয়া কথিত হইলেও প্রচলিত সাংখ্যে পরমাত্মার কথা নাই। পরে ভীষ্ম বলিতেছেন, "পুরাকালে মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজর্ষি করালকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই—সমুদায় জগৎই 'ক্ষর', দেবযানে দ্বাদশ সহস্র বৎসরে যুগ, চারি যুগে এক কল্প, দুই সহস্র কল্পে ব্রহ্মার একদিন ও একরাত্রি হয়; ব্রহ্মার দিনাবসানে রাত্রি হইলেই পৃথিবী ক্ষয় হইয়া যায়। রাত্রি প্রভাত হইলে ভগবান জাগরিত হইয়া ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। এই নারায়ণই হিরণ্যগর্ভ। বেদে তিনি মহান্, বিরিঞ্চি ও অজনামে এবং সাংখ্যশাস্ত্রে বিচিত্ররূপ, এক ও অক্ষর প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ত্রৈলোক্য উঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উনি আপনি আপনার সৃষ্টি করিবার মানস করিলে সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি হইতে মহৎতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। পরে মহৎতত্ত্ব হইতে অহংকার, অহংকার হইতে সূক্ষ্ম ভূতগণ, সূক্ষ্ম ভূত হইতে স্থূল ভূতগণ, পরে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মনের উদ্ভব হয়। এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বাতীত সনাতন বিষ্ণুই অক্ষর। তিনি তত্ত্বমধ্যে পরিগণিত না হইলেও সকল তত্ত্বে অবস্থান করেন বলিয়া পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পঞ্চবিংশতত্ত্ব বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। ঐ নিরাকার সর্বশক্তিমান মহাত্মা চেতনরূপে সর্বশরীরে অবস্থান করিতেছেন। নির্গুণ হইয়াও তিনি যখন সৃষ্টিসংহারকারিণী প্রকৃতির মধ্যে একীভাব অবলম্বন করেন তখন তিনি শরীররূপে পরিণত হইয়া সকলের গোচর ও জন্মমৃত্যুর বশীভূত হন। তখন তাঁহার দেহে আত্মাভিমান জন্মে। ইহার পরে আছে "জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পঞ্চবিংশতত্ত্বাতীত ষড়বিংশ পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন মনে করেন।" প্রচলিত সাংখ্যে ষড়বিংশ তত্ত্বের কথা নাই।

'অনুগীতা পর্বাধ্যায়ে আছে "সমাধিবলে বিশ্বরূপ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধ্যানভঙ্গ হইলেও তাহার অভিজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে। 'মন প্রাণের গতির' অধীন; প্রাণ মনের গতির অধীন নহে। এই জন্য মনের লয়ে প্রাণের লয় হয় না। আত্মা দুই প্রকার ক্ষর ও অক্ষর। উপাধিযুক্ত আত্মা ক্ষর, উপাধিবিহীন আত্মা অক্ষর। লোকে মহৎ তত্ত্বকে 'মতি, বিষ্ণু, জিষ্ণু, শম্ভু, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, উপলব্ধি, খ্যাতি, ধৃতি ও স্মৃতি প্রভৃতি নামে নির্দেশ করিয়া থাকে।…ঐ মহৎতত্ত্বের হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ, কর্ণ, সর্বত্র বিদ্যমান। উনি সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন।……যে মহাত্মা গুহাশায়ী, বিশ্বরূপী, বুদ্ধিমান, ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি, পুরাতন পরম পুরুষ মহৎতত্ত্বের গতি সর্বশেষ অবগত হইতে পারেন…তিনি বুদ্ধিতত্ত্বকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন।" এই অধ্যায়ের অন্যত্র নানাবিধ দার্শনিক মতের উল্লেখ আছে। "কোন কোন ব্যক্তি আত্মার অস্তিত্বে সংশয় করেন। কাহারও কাহারও ঐ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।…কেহ কেহ আত্মাকে অনিত্য, কেহ কেহ নিত্য বলেন। কেহ বলেন আত্মা ক্ষণভঙ্গুর, কেহ কেহ তাহাকে একমাত্র বস্তু বলেন। কেহ কেহ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কেহ কেহ পুরুষকে প্রকৃতির সহিত মিলিত বলেন। জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা দেশ ও কালকে চিরস্থায়ী বলিয়া কীর্তন করেন। কোন কোন ব্যক্তির মতে এই মত নিতান্ত হেয়।…কেহ কেহ কর্মানুষ্ঠানের, কেহ কেহ কর্মত্যাগের প্রশংসা করেন। কেহ কেহ সতত অহিংস, কেহ কেহ হিংসাপরায়ণ।…"

ভগবদ্গীতা অধ্যায়ে যে দর্শন বিবৃত হইয়াছে তাহা পরে আলোচিত হইবে।

মহাভারতে বৌদ্ধ ও দিগম্বর জৈনদিগের উল্লেখ আছে। গ্রন্থের সর্বত্র বেদের প্রাধান্য স্বীকৃত এবং নাস্তিক মত নিন্দিত হইয়াছে। কিন্তু দুই এক স্থলে বেদ সম্বন্ধে সংশয়ও প্রকাশিত হইয়াছে।

সমাজনীতি

এই যুগে বর্ণাশ্রম ধর্ম দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজ 'ব্রাহ্মণ' ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল। ক্রোধবর্জন, সত্যকথন, সম্যক্‌রূপে ধনবিভাগ, ক্ষমা, স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদন, পবিত্রতা, অহিংসা, সরলতা ও ভৃত্যের পোষণ—এই নয়টি সর্বধর্মের সাধারণ ধর্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের প্রধান ধর্ম ইন্দ্রিয় দমন ও বেদাধ্যয়ন। শান্তস্বভাব, জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ অসৎকার্যের অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া সৎপথে থাকিয়া যদি ধন লাভ করিতে পারেন তাহা হইলে দার পরিগ্রহপূর্বক সন্তান উৎপাদন, দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান তাহার অবশ্য কর্তব্য। ধন বিভাগ করিয়া ভোগ করাই সাধু ব্যক্তির কর্তব্য। ব্রাহ্মণেরা বেদ রক্ষা করিয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহারা ক্ষত্রিয়দিগের নমস্য। কিন্তু অত্যাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণের দণ্ডবিধান অবশ্য কর্তব্য। অধর্মে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে অধর্ম হয় না। পাপাচারী ব্রাহ্মণকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবে।

ধনদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম; যাচ্ঞা, যাজন ও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। দস্যুবধে উদ্যত হওয়া ও সমরে পরাক্রম প্রকাশ ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্তব্য। রাজা অন্য কোনও কর্ম করুন বা না করুন, আচারনিষ্ঠ হইয়া প্রজাপালন করিলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন।

দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সদুপায়ে ধনসঞ্চয় এবং পুত্রনির্বিশেষে পশুপালন ক্ষত্রিয়ের নিত্যকর্ম। বৈশ্য যদি অন্যের ধেনুর রক্ষক হয়, তাহা হইলে ছয়টি ধেনুরক্ষার বিনিময়ে একটি ধেনুর দুগ্ধ, শত ধেনু রক্ষার জন্য বৎসরে একটি গো-মিথুন পাইবে। অন্যের ধন লইয়া বাণিজ্যে লিপ্ত হইলে লব্ধ ধনের সপ্তম ভাগ এবং কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হইলে উৎপন্ন শস্যের সপ্তমাংশের একাংশ বেতনস্বরূপ গ্রহণ করিবে।

তিন বর্ণের পরিচর্যাই শূদ্রের কর্তব্য। রাজাদেশ ব্যতীত অর্থসঞ্চয় শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ। শূদ্রের ভরণপোষণ এবং ছত্র, বেষ্টন, শয়ন, আসন, উপানৎ-যুগল, চামর ও বস্ত্র প্রদান করা অন্যান্য বর্ণের অবশ্য কর্তব্য।

ব্রাহ্মণ হইতেই অন্য তিন বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্য ঐ তিন বর্ণের স্বভাবতঃই যজ্ঞে অধিকার আছে। মানসযজ্ঞে সকল বর্ণেরই অধিকার আছে, ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ভূত বলিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ব্রাহ্মণের জ্ঞাতিস্বরূপ। সকল বর্ণই সর্বপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থাশ্রমকে সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ বলেন। যিনি ধর্মপথে থাকিয়া, ধন উৎপাদন করিয়া যজ্ঞে ব্যয় করেন, তিনি সাত্ত্বিক সন্ন্যাসী। যিনি গার্হস্থ্য সুখ বর্জন করিয়া মোক্ষ কামনায় বনে ভ্রমণ করত দেহত্যাগ করেন তিনি তামস সন্ন্যাসী। আর যে জিতেন্দ্রিয় ঋষি বৃক্ষমূলে অবস্থান করিয়া কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা না করিয়া ভিক্ষায় পর্যটন করেন, তিনি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। গৃহস্থাশ্রম ব্রহ্মচর্যাদি তিন আশ্রমের তুল্য।

আচরণনীতি

মহাভারতে বহুস্থানে সদাচারের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। সদাচারের আদর্শ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, মুনিদিগের বিভিন্ন মত। ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত; মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন, তাহাই উৎকৃষ্ট পন্থা। সত্য সকল ধর্মের সার। সত্যই তপঃ, যাগযজ্ঞ ও পরব্রহ্ম স্বরূপ। একমাত্র সত্যেই সকল প্রতিষ্ঠিত। মান-

দণ্ডের একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অন্যদিকে সত্য আরোপিত হইলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হয়। কিন্তু যেখানে সত্য মিথ্যারূপে এবং মিথ্যা সত্যরূপে পরিণত হয়, সেখানে সত্য কথা না বলিয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য। প্রাণিগণের অভ্যুদয়, ক্লেশনিবারণ ও পরিত্রাণের জন্যই ধর্মের সৃষ্টি। অতএব যাহা দ্বারা প্রজাগণ অভ্যুদয়শালী, ক্লেশবিহীন ও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাই ধর্ম।

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ইহারা পুরুষার্থ। ইহাদের মধ্যে ধর্ম মোক্ষলাভের উপায়। মোক্ষই পরম পুরুষার্থ। ইহা ধর্ম দ্বারা লভ্য। মোক্ষ-লাভের উপায়স্বরূপ যে সকল নিয়ম উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাই মোক্ষধর্ম।

সকলেই সুখ কামনা করে এবং দুঃখ পরিহারের জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু সুখ ও দুঃখ উভয়ই অনিত্য। সুখদুঃখে সমতা, সুখে নিস্পৃহতা ও দুঃখে অনুদ্বিগ্ন থাকা—ইহাই শান্তিলাভের উপায়।

অহিংসা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, "অহিংসাই মানুষের পরম ধর্ম, পরম দান, পরম তপ, পরম যজ্ঞ, পরম বল, পরম মিত্র, পরম সুখ, পরম সত্য, পরম জ্ঞান। পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুদানের ফলও অহিংসা-ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। পৃথিবীতে আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর কিছু নাই। অতএব সমস্ত প্রাণীর আত্মাতে দয়াবান হওয়া কর্তব্য। মাংসভোজিগণ নরকে গমন করে এবং বার বার তির্যক্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া অন্য কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হয়। যজ্ঞ ব্যতীত অন্য কার্য উপলক্ষ্যে পশুহিংসা করিলে রাক্ষসবৎ ব্যবহার করা হয়। তবে মৃগয়াকালে মানুষের মনে এই ভাবের উদয় হয় যে, হয় মৃগেরা আমাকে বিনাশ করুক, না হয় আমি উহাদের সংহার করিব। এই জন্য মৃগয়া পাপজনক নহে।

সকলেই সুখ কামনা করে, কিন্তু সুখ পুরুষার্থ নহে। কামনার পরিতৃপ্তি দ্বারা কামনার শান্তি হয় না। যত পাওয়া যায়, তৃষ্ণা ততই বর্ধিত হয়। "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ঃ এবাভিবর্ধতে॥" কাম্য বস্তুর উপভোগে কাম শান্ত হয় না। আগুনে ঘৃত ঢলিলে যেমন অগ্নি বর্ধিত হয় উপভোগের ফলেও তেমনি কামনা বর্ধিত হয়। সমাজের মঙ্গলের জন্য ধর্মের প্রয়োজন, কিন্তু ধর্মের ফল সুখ নহে। "যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ" মহাভারতে উক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু কৌরবদিগের পরাজয়ে ধর্মের যে জয় ঘোষিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত পক্ষে জয় নহে। পুত্রগণ হত, বন্ধুগণ সমরক্ষেত্রে পতিত, সমগ্র ভারতে গৃহে গৃহে আর্তনাদ! এই অবস্থায় হয়ত রাজ্যলাভকে যুধিষ্ঠির জয় বলিয়া গণ্য করেন নাই এবং তাহাতে সুখবোধ করেন নাই। তবুও মহাভারতকার ধর্মকেই আশ্রয়ণীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কেননা মানবসমাজ ধর্ম দ্বারাই বিধৃত।

বেদ ও উপনিষদের মতো মহাভারতেও কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এই কর্মবাদের সহিত ইচ্ছার স্বাধীনতার সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে। মানুষের কর্ম দ্বারা পূর্ব-কৃত কর্ম রূপান্তরিত হয়। পূর্বজন্মে কৃত যে সকল কর্মের ফল বর্তমান জীবনে আরব্ধ হইয়াছে, তাহারা প্রারব্ধ কর্ম এবং যে সকল কর্ম ভবিষ্যতে ফলদানের জন্য সঞ্চিত আছে, তাহারা সঞ্চিত কর্ম। বর্তমান জীবনের কর্ম আগামী কর্ম। প্রারব্ধ কর্মের ফল হইতে নিষ্কৃতি নাই, কিন্তু সঞ্চিত ও আগামী কর্ম জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা সম্ভবপর।

ঈশ্বরের অনুগ্রহেই সঞ্চিত ও আগামী কর্মের ধ্বংস হইতে পারে। ঈশ্বরই কর্মফলদাতা।

আনন্দ তীর্থে

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

আনন্দের তীর্থধামে উপনীত হইনু পথিক
ধূলা,—সেথা স্বর্ণ রেণু, শিলা,—সৌধে খচিত মাণিক
লতা সব সোমলতা, বৃক্ষশাখে কুসুম পারিজাত
সুস্বাদ মধুর ফলে তৃপ্ত তুষ্ট সবে দিনরাত
সেথাকার নরনারী।
ঘনচ্ছায় বসি বৃক্ষতলে
অবধূত দার্শনিক চোখে মুখে আনন্দ উথলে
ধর্মকথা নাহি কয়, নাহি করে মন্ত্র জপ তপ
নামে সে সহজানন্দ সুখে সহ্য করে শীতাতপ
সারল্যে শিশুর মত।
শুধাইলে মুক্তির বারতা
নিত্যসিদ্ধ মুক্তিবাদ কহে এক বিস্ময়ের কথা
মুক্তাঝরা হাসিরাশি সেই তার যুক্তির পসরা
যেথায় যখন থাকে সেথা ধন্য মানে যেন ধরা
আনন্দ বন্যায় তার।
বলে মুক্ত আমি, মুক্ত তুমি
বন্ধন ভুলিয়া গিয়া ধরিত্রীর স্বর্ণ ধূলা চুমি
গাহো এ মুক্তির গান; অবগাহি সুগভীর স্তরে
অন্তরের চিদানন্দ অন্তর বাহির যাবে ভ'রে।
সুপ্তি মুক্তি সুষুপ্তির অচেতনে ভূমার পরশ
জাগ্রতে লভিবে যবে পাবে তবে মধুব্রহ্মরস
প্রশ্নের উত্তর নাই, প্রাণ উত্তরায়ণের পথে
বিশ্বাস পাথেয় নিয়া অবাধে উত্তরে মনোরথে
আলোকিত শুক্ল পথে।
তার পরে শুক্ল কৃষ্ণ নাই
যাহা শুক্ল তাহা কালো উভয়তঃ আনন্দই পাই
দেখি কিংবা দেখি নাকো, শুনি কিংবা শুনি নাকো
কানে,
থাকা না-থাকার বুদ্ধি আমি-তুমি কি জানি কে
জানে
আনন্দ অমৃতরূপ মধুর মধুর মধু হতে
আত্যন্তিক সুখসিক্ত হয় চিত্ত পরতে পরতে।
বাঁধা আছে যে-বন্ধনে, সে-বন্ধন ইন্দ্রজাল বাঁধা,
পরমাণু পরিমাণ, তার লাগি মিথ্যা হাসা কাঁদা!
জানিনা আদিত্যবর্ণ, জানিনাকো তমসার পার,
স্বভাবসুলভ সিদ্ধ নিরন্তর আনন্দ তোমার
এ এক অচিন রাজ্য শিশুদের বেশী পরিচিত
অধরে মধুর হাস্য, কলহে কুতর্কে হয় ভিত;
মিষ্ট কি বুঝানো যায়? রসনায় নিতে হয় রস,
অন্তরে আনন্দ ফুটে প্রভাতের ফুল্ল তামরস।
সুরাসুর নারীনর সে সুধার সতত ভিখারী
যদ্যপি অমূল্য সুধা, মূল্য নাই যে চায় সে তারি।
শুধু লৌল্য মূল্যে মিলে সে মুক্তির আনন্দের স্বাদ
সর্বজনে করে লাভ সার্বভৌম ভূমার আহ্লাদ।

'মতুয়ার বুদ্ধি'

ডাঃ এস্ আহাম্মদ্ চৌধুরী

পরমহংসদেব বলতেন, "আমার ধর্ম ঠিক, অপরের ধর্মমত মিথ্যা এই রকম ধারণা করার নাম "মতুয়ার বুদ্ধি।" এই সহজ সত্য কথাটিই জগতের যত বিভেদ, দ্বন্দ্ব, রেষারেষি, মারামারি ও কাটাকাটির মূল কারণ। আমরা দেখতে পাই যে, শুধু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যেই এই বাদ-বিসম্বাদ সীমাবদ্ধ নহে, বিভিন্ন মতাবলম্বী নানা সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ আজ এইরূপ দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষে লিপ্ত। কখনও কখনও এইরূপ মতভেদের পরিণাম তর্কাতর্কি হ'তে আরম্ভ ক'রে হাতাহাতি এমনকি

নরহত্যার পর্যায়ে পৌঁছায়। ধর্মকে অবলম্বন ক'রে পাশবিক প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের পরস্পর নরহত্যা ও তজ্জনিত রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হওয়ার কথা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। পরমহংসদেব তাই দুঃখ করে বলতেন, "মা, সবাই মনে করে তার আপন ঘড়িটি ঠিক চলছে। কিন্তু মা কারও ঘড়িইত ঠিক চলছে না।" ঘড়ি ঠিক চলছে কি না চল্‌ছে তাহা পরখ করে দেখতে হলে মাঝে মাঝে সূর্যঘড়ির সাথে মিলিয়ে নিতে হয়। অর্থাৎ অন্তররূপ ঘড়ির মনরূপ কাঁটা, অহংজ্ঞান, ভেদবুদ্ধি, ও মায়াময় সংসারের মিথ্যামোহ থেকে মুক্ত হয়ে কতটা ভগবানের দিকে চলছে, বিবেক-বুদ্ধি ও আত্মান্বেষণ (Self Searching) দ্বারা বিচার করে তাই দেখে নিতে হবে। মন ঘড়িটির এই পরখ করার চেষ্টায় যতটা আমরা বহির্জগৎ ছেড়ে অন্তর্জগতের দিকে এগুতে পারব ঘড়ি ততটাই ঠিক চলতে থাকবে। আর ঘড়ি যত বেশী ঠিক চলতে থাকবে তত বেশী আমরা উদার ও পরমত-সহিষ্ণু হতে পারব। মতের ব্যবধান কমতে থাকবে আর পরকে বুকের কাছে টেনে এনে আপনার জন বলে গ্রহণ করতে পারব। পাত্র যত সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র হবে দ্রব্য তাতে ততটাই কম ধরবে। পাত্র যত বড় হবে, ধারণক্ষমতাও তার তত বেশী হবে। একসের ঘটিতে কি পাঁচসের দুধ ধরবে? কিন্তু পাঁচসের ঘটিতে একসের দুধ ধ'রে আরও জায়গা থাকবে। তাই মনকে সঙ্কীর্ণতামুক্ত করে যতটা উদারভাবাপন্ন করা যাবে অপরের মতকে ততটা নিজের অন্তরে স্থান দেওয়া যাবে। তাতে অপরের প্রতি বিদ্বেষভাবটাও ক্রমে ক্রমে কেটে যাবে। মন নির্মল হবে, বিদ্বেষ ও ভেদবুদ্ধির তরঙ্গ মনকে নাড়াচাড়া করে বিভ্রান্ত করতে পারবে না, সেই স্বচ্ছসলিল অন্তরের আত্মার দিকে তাকালে যা দেখা যাবে তা প্রাণারাম—তা সচ্চিদানন্দ। কিন্তু কথাটা বলা যত সহজ কাজটি তত সহজ নয়। পরমহংসদেব তাই বলতেন, "সংসারী লোকের মাঝে মাঝে দিন কতক নির্জনে সাধন ভজন দরকার"। তিনি বলতেন "যেমন করেই হোক একবার বাবুর সাথে দেখা হওয়া চাই, তা দারোয়ানের ঘাড় ধাক্কা খেয়েই হোক আর দেয়াল ডিঙ্গিয়েই হোক, বাবুর সাথে দেখা হলে পর তিনিই সব বুঝিয়ে দিবেন।" বাবুর বাড়ীর খোঁজটা যদি জানা না থাকে, তবে যারা বাবুর বাড়ী যাওয়া আসা করেন তাদের কাছে জিজ্ঞেস করলে দয়া করে তারা পথের কথাটা বলে দিবেন। যিনি পথ দেখিয়ে দিবেন তিনিই গুরু। সেই পথ ধরে বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সাথে চলে গেলেই হলো। বাবুর বাড়ী যাওয়ার কিন্তু একটি মাত্র রাস্তা নয়। অনেক রাস্তাই আছে। যিনি যে রাস্তা দিয়েই বাবুর বাড়ীতে গেছেন আর যে রাস্তা তাঁর ভাল লেগেছে তিনি সেই রাস্তার কথাই বলে দেবেন।

বিভিন্ন ধর্মমত ভগবানেরই সৃষ্টি, যেমন বাগানে হরেক রকম ফুল। বিভিন্ন ফুলের বিভিন্ন সৌন্দর্য ও মাধুর্য। যার যে ফুলটি ভাল লাগে সে তা তুলে নেয়। যার যেমন অভিরুচি, অধিকারী ভেদে ও রুচিভেদে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি। যার যেটি পেটে সয়। মুড়িঘণ্ট, ভাজা, টক, মিষ্টি যার যেমন রুচি। যেমন ভাব তেমন লাভ। আমার কাছে যেটি ভাল লাগে অপরের কাছে সেটিই ভাল লাগতে হবে—এ শুধু হঠকারিতা—মহাপাপ। আমার শুধু দরকার গুরুবাক্যে বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও একাগ্র-চিত্তে সাধন। এই ব্যাকুলতা একবার জাগলেই বাবু নিজে এগিয়ে আসিবেন। মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ বলতেন, "আল্লার দিকে তুমি হেঁটে চললে তিনি তোমার দিকে দৌড়ে আসেন।" পরম-হংসদেব বলতেন,—মায়ের দেওয়া মুখের চুষনী অসার জেনে ছেলে যখন চুষনী ফেলে দিয়ে চীৎকার করতে থাকে, মা তখন রান্নাবান্না ফেলে দৌড়ে এসে কোলে তুলে মাই দেন।" আসল কথা হ'ল তাঁকে ভালবাসা,—প্রাণঢালা ভালবাসা, তাঁকে

সবার চেয়ে আপন মনে করা, অন্তর দিয়ে তাকে ডাকা, তা সে যে ভাবেই হোক্, যে নামেই হোক্, যে প্রথারই হোক্ আর যে ধর্ম অবলম্বন করেই হোক্। ঠাকুর বলতেন বড় ছেলেরা বাবাকে "বাবা" বলে ডাকে। যে ছোট ছেলে "বাবা" বলতে পারে না সে হয়ত "বা" কিংবা "পা" বলে। তাই বলে কি বাবা তার উপর রাগ করেন। ঈশ্বর শুধু আমাদের মনের ভাবটি গ্রহণ করেন—বাহিরের লোক দেখানো ভাবটি নয়। তাই তো তিনি ভাবগ্রাহী জনার্দন। পরমহংসদেব বলতেন, "পুকুর থেকে সবাই একই বস্তু নেয় কিন্তু নাম বিভিন্ন; কেউ বলে জল, কেউ বলে পানি আর কেউ বা বলে ওয়াটার।" তিনি বলতেন, "ছাদে উঠা নিয়ে কথা, তা কাঠের সিঁড়ি, পাকা সিঁড়ি, বাঁশের মই অথবা দড়ি যাহা কিছু অবলম্বন করেই হোক্ ছাদে উঠলেই হলো।" যার যেটি ভাল লাগে সেটি ধরে উঠলেই চলবে। গন্তব্যস্থল এক, পথ বিভিন্ন। তাই পথ নিয়ে ঝগড়ার দরকার কি? ঠাকুর বলতেন, "যত মত, তত পথ।"

আমাদের তাই 'মতুয়ার বুদ্ধি' ছাড়তে হবে। নিজের মনের সঙ্কীর্ণতা দূর করে সকল মতবাদকে এখানে ঠাঁই দিতে হবে। পরমতসহিষ্ণুতা যার নেই, বুঝতে হবে যে তার নিজের ধর্মের মর্মও উপলব্ধি হয়নি। সে অনেক পিছনে পড়ে আছে। কারণ কোন মহাপুরুষই অপর ধর্মকে হিংসা অথবা বিদ্বেষ করার নির্দেশ দেননি। ভেদাভেদ ও সঙ্কীর্ণতা মানুষের সৃষ্টি। ধর্মের নৈতিক বিধান সর্বত্রই এক। শুধু ভগবৎ আরাধনার প্রথা ও সামাজিক আচারপদ্ধতি বিভিন্ন। বৈচিত্র্যই ভগবানের সৃষ্টির বিধান। তাহা বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন মতবাদ। সত্য সর্বত্রই সত্য। ঠাকুর বলতেন, "ঈশ্বরের কি ইতি করা যায়? তিনি সাকার, নিরাকার আরও কত কি হতে পারেন।" তিনি এত সহজ করে বুঝিয়েছেন যে ভাবলে প্রাণ শীতল হয়। এই অণবিক যুগের জগৎ যদি এই মহাপুরুষের কথায় আজ একটু কান দিত আর একটু তাঁর কথামত চলতে শিখতো তবে যুদ্ধের আতঙ্ক আর ধ্বংসের ভয় দূর হতো। পৃথিবীতে সত্যিকার শান্তি বিরাজ করতো।

শ্রীশ্রীমীনাক্ষী দেবী

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

দাক্ষিণাত্যে তীর্থের অন্ত নাই। প্রতি গ্রামেই প্রায় একটা ক'রে মন্দির আছে। অধিকাংশ মন্দিরই চোল, পাণ্ড্য এবং বিজয়নগর রাজাদের সময়ে নির্মিত হ'লেও অনেকক্ষেত্রেই সে সব স্থানে দেবতার আবির্ভাব বহুপূর্বেই হয়েছিল। কোথায়ও এক হাজার, কোথায়ও দু'হাজার এবং কোথায়ও বা আরও বেশীদিন আগে দেবতাদের আবির্ভাব হয়েছিল। এই সব মন্দিরগুলি দাক্ষিণাত্যের কৃষ্টি, সভ্যতা, স্থাপত্য ও শিল্পের জলন্ত নিদর্শন। তখন রাজারা অকাতরে লক্ষ লক্ষ টাকা ঐসব মন্দির নির্মাণে খরচ করেছেন। ইদানীং কোনও কোনও মন্দির মেরামতের জন্য দাক্ষিণাত্যের ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় চেটিয়াররা বহুলক্ষ টাকা খরচ করেছেন। কাঞ্চীপুরমে একাম্বরনাথের মন্দির মেরামত করতে একজন চেটিয়ার আঠারো লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। মন্দিরকে কেন্দ্র ক'রে অনেক শহর এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। অসংখ্য মন্দির হ'লেও কয়েকটি মন্দির এবং সেই সেই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী

দেবতা খুবই সুপরিচিত ও বিখ্যাত এবং প্রত্যহ হাজার হাজার ভক্ত নরনারী সেই সব মন্দির দর্শনে যান এবং তথাকার দেবতাদর্শনে মনে অনির্বচনীয় শান্তি উপলব্ধি করেন। এই বিখ্যাত মন্দিরগুলির মধ্যে কাঞ্চিপুরমে ৺কামাক্ষী, একাম্বরনাথ ও বরদারাজের মন্দির, চিদাম্বরমে ৺নটরাজের মন্দির, ত্রিচিনাপল্লীতে ৺শ্রীরঙ্গম ও জম্বুকেশ্বরের মন্দির, মদুরায় মীনাক্ষী দেবীর মন্দির, রামেশ্বরে ৺রামেশ্বরের মন্দির—মাদ্রাজরাজ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। এই প্রবন্ধে মাদ্রাজরাজ্যের প্রাচীনতম শহর মদুরার ৺মীনাক্ষী দেবী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

মীনাক্ষী দেবী সম্বন্ধে কিছু বলার পূর্বে মদুরা শহর সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন।

মদুরা শহর

তামিলে দীর্ঘ বর্ণের' যথা—ধ, ভ, থ প্রভৃতির প্রচলন নেই। 'ধ'-এর স্থলে সাধারণতঃ 'দ' উচ্চারিত হয়। 'মধুর' শব্দ হ'তে 'মদুর' এবং 'মদুরা' হয়েছে একথা অনেকে বলেন। ইহার অর্থ 'মিষ্ট'। কথিত আছে যে শহরের সুউচ্চ মনোহর সৌধগুলি দর্শনে শিব অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং ইহার উপর সুধা (মধু) বর্ষণ করেন, এবং তদবধি ইহা মদুরা নামে পরিচিত।

ঐতিহাসিকরা বলেন যুক্তপ্রদেশের মথুরানগরী হতে অসংখ্য হিন্দু এখানে আসিয়া বহুকাল পূর্বে বসতিস্থাপন করেন এবং ইহার নাম 'মথুরা' রাখেন, তদবধি ইহা 'মদুরা' নামে পরিচিত হয়। পূর্বেই বলেছি, মদুরা দাক্ষিণাত্যের প্রাচীনতম শহর। বিগত দু'হাজার বৎসর যাবৎ ইহা দ্রাবিড় কৃষ্টি ও সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপে অবস্থিত। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত-গণ ইহাকে দাক্ষিণাত্যের 'এথেন্স' (গ্রীসের রাজধানী ও খুব প্রাচীন শহর) নামে অভিহিত করেন।

তামিল সাহিত্যের প্রধান পরিষদ 'তামিল সঙ্গম্' এই মদুরাতেই প্রথম স্থাপিত হয়। বিখ্যাত তামিল কবি তিরু আপোয়ার বলেছেন, "বর্তমান পাটনাতে এলে বুদ্ধও হয়ত নিজেকে অপরিচিত মনে করবেন কিন্তু মদুরা শহরে অদ্যাপি প্রাচীন কৃষ্টি, সভ্যতা প্রভৃতি পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত।" যদি কোনও বিদেশী প্রাচীনকালের হিন্দুদের রীতিনীতি, আধ্যাত্মিক জীবন, কৃষ্টি, সভ্যতা যদি দেখতে চান তবে তাঁর পক্ষে মদুরা শহর এবং মীনাক্ষী মন্দির দর্শন অপরিহার্য। মদুরার ইতিহাসকে পৌরাণিক, মাধ্যমিক ও আধুনিক এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। পাণ্ড্য রাজারা প্রাচীনকালে এখানে রাজত্ব করতেন এবং কথিত হয় যে লঙ্কাদ্বীপের প্রথম রাজা বিজয় (খ্রীঃ পূঃ ৫০০ শতাব্দ) এই পাণ্ড্য রাজাদের জামাতা ছিলেন। মধ্যযুগে বিজয়নগরের নায়েকরা এখানে রাজত্ব করেন এবং মীনাক্ষীদেবী সুন্দরেশ্বরের (শিব) বর্তমান মন্দির এঁরাই নির্মাণ করেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে দিল্লীর মুসলমান সম্রাট কর্তৃক মদুরা আক্রান্ত হ'লে বিজয়নগরের মহারাজা মুসলমানদের পরাস্ত করে ধীরে ধীরে এখানকার রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। বিজয়নগরের শাসকদের মধ্যে বিশ্বনাথ নায়েক (১৫৫৯) ও তিরুমল নায়েক (১৬২৩) সমধিক প্রসিদ্ধ। মাদ্রাজ হ'তে মদুরার দূরত্ব ৩০৫ মাইল এবং তৃতীয় শ্রেণীর রেলভাড়া ৯৫০ টাকা। প্রসিদ্ধ ভাগাই নদী এই শহরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

মীনাক্ষীদেবীর মন্দির

দাক্ষিণাত্যের বৃহত্তম এই মীনাক্ষীদেবীর মন্দির মদুরা শহরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। পূর্বোল্লিখিত বিশ্বনাথ নায়ক খ্রীষ্টীয় ১৫৬০ অব্দে এই মন্দিরের নক্সা প্রস্তুত ও মন্দিরের নির্মাণ কার্য শুরু করেন। মন্দিরকে কেন্দ্র করে চারিধারে প্রধান রাস্তাগুলি মন্দিরের চতুর্দিকস্থ সীমা-দেওয়ালের সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত। মন্দিরটির সর্বাপেক্ষা বহিঃস্থ দেওয়ালগুলির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৮৪৭ ফিট ও ৭৯২ ফিট।

মুসলমান আক্রমণকারী মালিক কাফুর খ্রীষ্টীয় ১৩১০ সালে মহুরা আক্রমণ পূর্বক মীনাক্ষীদেবীর পুরাতন মন্দির ভূমিসাৎ করেন। বর্তমান মন্দিরটির নির্মাণকার্যে তখনকার দিনে এক কোটী কুড়ি লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল এবং নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হয়েছিল একশো কুড়ি বছরে। মন্দিরের চারদিকে চারটি বৃহৎ গোপুরম্ (প্রবেশদ্বার) আছে, সেগুলির উচ্চতা ১২০ হ'তে ১৫২ ফিট। বহুদূর হ'তে এই বিরাট গোপুরমের চূড়াগুলি দৃষ্ট হয়। গোপুরমের দরজার দুপাশের পাথরগুলি ৩০ ফিট লম্বা এবং ঐগুলির প্রত্যেকটি একখানি পাথর (Single Stone)। গোপুরমের উপর বহুপ্রকারের অসংখ্য সুদৃশ্য মূর্তি এবং রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের বহু কাহিনী চিত্রিত। এই চারটি গোপুরম্ ছাড়াও মন্দিরাভ্যন্তরে আরও পাঁচটি প্রবেশ দ্বার আছে। উত্তর প্রবেশ-দ্বারের সন্নিকটে পাঁচটি আশ্চর্যজনক স্তম্ভ দেখা যায়—উহাদের সঙ্গীতস্তম্ভ বলা হয়। একটি অখণ্ড গ্রাণাইট পাথরের মধ্যে বাইশটি সরু সরু গোলাকার স্তম্ভ খোদিত হয়েছে এবং উহার প্রত্যেকটিকে আঘাত করিলে বিভিন্ন রকমের সুমিষ্ট সুর নির্গত হয়। এতদ্ব্যতীত মন্দিরের মধ্যে সহস্রস্তম্ভমণ্ডপ, কল্যাণমণ্ডপ প্রভৃতি অবস্থিত।

মন্দিরের প্রধান প্রবেশদ্বারের দুপাশে আটটি সুবৃহৎ স্তম্ভে দেবীর অষ্টশক্তির মূর্তি বিদ্যমান। উহার পরই মীনাক্ষীদেবীর মূল মন্দিরে যাওয়ার দীর্ঘ পথ—১৬০ ফিট লম্বা। মূল মন্দিরের পথে স্বর্ণপদ্ম পুষ্করিণী (Golden-lily tank) বর্তমান। উহাকে পরিক্রমা করে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। প্রত্যেক ধর্মপরায়ণ হিন্দু এই পুষ্করিণীর জলকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করেন। এই জলে স্নান করলে সর্বপাপ হ'তে মুক্ত হওয়া যায়। কথিত আছে ব্রহ্মহত্যার পাপ হ'তে মুক্তি পাওয়ার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র এই পুষ্করিণীতে স্নান করেছিলেন। পুষ্করিণীর উত্তর ও দক্ষিণের দেওয়ালে নানারূপ চিত্র (Fresco painting) অদ্যাপি বর্তমান। চিত্রগুলিতে ইন্দ্রের ব্রাহ্মণহত্যা, তারপর ইন্দ্রের দরবার, রম্ভা ও উর্বশীর নৃত্য প্রভৃতি দেখানো হয়েছে। পুষ্করিণীর উত্তর দিক হ'তে মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের সোনার চূড়া দেখা যায়। নিষ্ঠাবান যাত্রীরা মন্দিরের প্রবেশের পূর্বে এই পুষ্করিণীর জল স্পর্শ করেন। প্রবেশ-দ্বারের দুধারে দেবীর দুই পুত্র গণেশ ও সুব্রহ্মণ্যের (কার্তিক) দুটি ছোট মণ্ডপ। ধাতুনির্মিত সুবৃহৎ দুজন দ্বারপালক মন্দির পাহারায় নিযুক্ত। মন্দির এত বড় এবং এত বিভিন্ন রকমের কারুকার্য-শোভিত যে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াও অসাধ্য। একমাস যাবৎ প্রত্যহ মনোযোগ সহকারে কয়েক ঘণ্টা ক'রে দেখলে মন্দির সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা হ'তে পারে। প্রথম দিন পরিচালকের (guide) সাহায্য ব্যতীত মন্দিরে ঢুকলে বার হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। গোলক ধাঁধাঁর মত মনে হয়।

দুঃখের বিষয় মন্দিরের প্রধান প্রবেশমণ্ডপটি বাজারে পরিণত হয়েছে। ফুল ফল ছাড়াও অসংখ্য প্রকারের পণ্যদ্রব্যের দোকানে স্থানটি পরিপূর্ণ। আয়ের লোভে মন্দির কর্তৃপক্ষ এই সুপ্রাচীন বিরাট মন্দিরের ভাবগাম্ভীর্য অনেকটা নষ্ট ক'রে ফেলেছেন। মন্দিরের অর্থের কোনও অভাব নাই। লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রয়েছে—যাত্রীরাও বহু টাকা ও স্বর্ণালঙ্কারাদি প্রত্যহ প্রণামীস্বরূপ দান করেন। কাজেই এই দোকানগুলি অবিলম্বে তুলে দেওয়া উচিত।

দেবীর মূল মন্দিরের প্রবেশপথে বিভিন্ন স্তম্ভ-গাত্রে নানারূপ মূর্তি অঙ্কিত আছে। ঐগুলিতে দেবীর জন্ম, শৈশব, শাসন প্রভৃতির বিবরণ অতি সুন্দর ভাবে দেখানো হয়েছে।

মীনাক্ষী দেবী

মহুরা শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন মীনাক্ষী। মাছের মত চোখ ব'লে এঁর নাম নাম মীনাক্ষী।

এঁর জন্মবৃত্তান্ত ও আবির্ভাব কাহিনী অদ্ভুত। পাণ্ড্য বংশে মলয়ধ্বজ নামে একজন বিখ্যাত ধর্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। তাঁর কোনও ছেলেপুলে না থাকায় তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। যজ্ঞান্তে পুত্রের পরিবর্তে যজ্ঞকুণ্ড হ'তে তিনটিস্তন-বিশিষ্ট কুমারী কন্যা আবির্ভূতা হ'ন—এঁরই নাম মীনাক্ষী। রাজা মলয়ধ্বজ কন্যার এই অদ্ভুত আকৃতি দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হন এবং এই ভেবে মন গভীর দুঃখে ভারাক্রান্ত হয় যে, একটি মাত্র সন্তান, তাহারও অদ্ভুত রূপ। প্রার্থনার ফলে রাজা দৈববাণী শোনেন যে, যখনই এই কুমারী তাহার ভবিষ্যৎ স্বামীকে দেখবে তখনই তাহার তৃতীয় স্তন অন্তর্হিত হবে। এই বাণী শুনে রাজা অনেকটা আশ্বস্ত হন। মলয়ধ্বজের মৃত্যুর পর মীনাক্ষীই পাণ্ড্যরাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং তাঁর অপূর্ব কৌশল, তেজ ও বুদ্ধিমত্তা প্রভাবে অনেক রাজ্য জয় করেন। যজ্ঞ হ'তে উৎপন্ন হয়েছেন ব'লে দেবী বলেই তাঁকে সকলে পূজা করতে থাকে। তাঁর রাজত্বকালে প্রজাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অবধি ছিল না; কাজেই অচিরেই তিনি দ্রাবিড় জাতির হৃদয় জয় করেন। মাঝে মাঝে উত্তরাখণ্ড হ'তে আর্যরা আক্রমণ করতে আসতেন, কিন্তু কখনও তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে পারেন নি। অবশেষে একদিন যুদ্ধ করতে করতে তিনি সুন্দরেশ্বর নামে এক সুন্দর বীরপুরুষের সম্মুখীন হ'ন এবং এক অব্যক্ত লজ্জা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তৃতীয় স্তন অন্তর্হিত হয়। এই সুন্দরেশ্বর আর কেহই নহেন, স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব এবং মীনাক্ষী হচ্ছেন পার্বতী। রাজকীয় জাঁকজমকের সহিত সুন্দরেশ্বর ও মীনাক্ষীদেবীর উদ্বাহকার্য সম্পন্ন হয়। স্থূল শরীরান্তে এঁরা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রথমে দেবীর মন্দির এবং পরে সুন্দরেশ্বরের মন্দির নির্মিত হয়। সুন্দরেশ্বরের মন্দির আকারে দেবীমন্দিরের দ্বিগুণ হ'লেও যেহেতু মীনাক্ষী মদুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেহেতু তাঁর প্রাধান্য বিন্দুমাত্রও খর্ব করা হয় নি। তীর্থযাত্রী এবং পূজারী প্রত্যেকেই প্রথমে দেবীকে দর্শন করেন ও তাঁর পূজা করেন, পরে সুন্দরেশ্বরের মন্দির দর্শন করেন। বিরাট মন্দিরের তুলনায় দেবীর প্রস্তরমূর্তি ছোট হ'লেও, দেবী যেন সর্বৈশ্বর্য নিয়ে সেখানে বিরাজিতা। অতি সুন্দর ও সৌষ্ঠব মূর্তি। ভক্তিভরে একাগ্রচিত্তে দেবীকে দর্শন করলে সত্যই মায়ের উপস্থিতি যেন অনুভূত হয় এবং দর্শকের হৃদয় অপার্থিব আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ মীনাক্ষী দেবীর মূর্তিদর্শনে অচিরাৎ সমাধিস্থ হয়েছিলেন এবং বহুক্ষণ সে অবস্থায় ছিলেন। করুণাময়ী জননী অকাতরে করুণা বিলাচ্ছেন—সেখানে উচ্চনীচ ভেদ নাই, স্ত্রী-পুরুষের ভেদ নাই, পণ্ডিত মূর্খের ভেদ নাই, ব্রাহ্মণশূদ্রের ভেদ নাই—সকলেই মায়ের সন্তান, মায়ের কাছে সকলেই এক। মায়ের দর্শনেই সন্তানের মন ভরপুর ও তৃপ্ত। যুগ যুগ ধরে মা এখানে অকাতরে কৃপা বিতরণ করছেন—তাঁর অবোধ সন্তানদের অবিশ্রান্ত স্নেহধারায় সিক্ত করছেন। জয় মা!!

'ক'রো বিশুদ্ধ মন'

শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস

আশা-প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়েছে ব'লে ;
বেদনার জ্বালা রেখ না মর্মতলে।
যে দিয়াছে ব্যথা মর্মে তোমার—
 রটাইয়া অপযশ ;
সময় থাকিতে ধর বুকে তারে
 নাও ক'রে প্রেমে বশ।
শত্রুকে দাও উচ্চ আসন
 অমানীরে দাও মান ;
বেলা নাই ভেবে, অনুরাগ-ফাগে
 রাঙাইয়া নাও প্রাণ।
হৃদয়-দুয়ার রাখো রাখো খুলে, ভাই ;
সবে ভালোবেসে সবাকার জয় গাই।

মিছে কেন দুখে করিবে গো প্রাণপাত ?
ধূলির ধরায় সব হ'বে ধূলিসাৎ।
দুঃসহ দুখ দারুণ বেদনা
 যাও ভুলে হাসিমুখে ;
বিপদের দিনে দাঁড়াতে ভুলনা
 শত্রু-মিত্র দুখে।
উদার পরাণে সযতনে বাঁধ
 নিখিলে প্রেমের ডোরে ;
ধর্মের রাগে রাঙিয়া হিয়ায়
 ক'রো কাজ সাঁঝে-ভোরে
হরি-গুণ-গানে ক'রো বিশুদ্ধ মন ;
কোরো নাক মিছে অসহায় ক্রন্দন।

মিথ্যা মায়ার কুহকেতে পড়ে তুমি,
দুখে ধূ-ধূ বুক করিয়াছ মরুভূমি।
কোরো নাক আর আপনারে ছোট
 জীবনেরে ধিকারি ;
দুখ কোথা রবে ? ভেবে দেখ মনে
 পরপারে দিলে পাড়ি ?
মিথ্যা যশের ধনের ভিখারী
 সাজিয়া রয়েছ দুখ ;
সেই বেদনায় বিদীর্ণ করি'
 জীর্ণ করেছ বুক।
আজি সব ভুলে তাঁহার শরণ নাও
প্রেম বুকে ধরে, প্রেমিকের চোখে চাও।

কোটী তারকায় হয়েছে রাতের কালো ;
দেখ হাসে ধরা, পুলকে উজলি আলো।
লতায়-পাতায় প্রেমে জড়াজড়ি
 বিহগ গাহিছে গান ;
মিলনের গীতি গাহিছে তটিনী
 কুলু কুলু ধরি' তান
উদার আকাশ অনাহত সুরে
 পুলকে আলোকে-ভরা ;
সঙ্গীতময় হইয়া হাসিছে
 যেন গো নিখিল ধরা।
যে আসে আসুক, হৃদি-দ্বার খুলে দাও ;
আপনার ভেবে, কাছে টেনে' সবে নাও।

নারী—ঘরে ও বাহিরে

শ্রীমতী শোভা ছুই

মাতাপিতার আদরিণী কন্যা পতির হাত ধরে এলো শ্বশ্রূ-গৃহে। অর্ধ প্রস্ফুটিত কিশোরী চোখে স্বপ্নের ঘোর, হৃদয়ে প্রেমের তুফান। পৃথিবী তখন মধুময়, অন্তরে বাহিরে চারিধারে মধু মধু মধু। পতির সোহাগে, শাশুড়ীর যত্নে, দেবর-ননদের আদরে বধূর জীবন কানায় কানায় পূর্ণ। দিনের পর দিন কাটে সুখের আবেশে।

অবশেষে উৎসব শেষ হয় একদিন। সামনে এসে দাঁড়ায় কঠিন বাস্তব। বধূর নিকট সংসারের সহস্র দাবি। আর সে শাশুড়ীর আদর কিংবা স্বামীর সোহাগে মগ্ন থাকতে পারে না। সে এখন পতিগৃহে অধিষ্ঠাত্রী দেবী—গৃহ-লক্ষ্মী। সমস্ত সংসার তার মুখাপেক্ষী। গৃহকে আনন্দময় করার দায়িত্ব তারই উপর।

এ দায়িত্বই নারীজীবনের চরম দায়িত্ব। একটি সংসার সুষ্ঠুভাবে চালানো একটি সাম্রাজ্য চালানোরই নামান্তর। সকলের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে, সকলকে ভালোবেসে, গুরুজনদের সেবা করে, নিজেকে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া কম আনন্দের কথা নয়। স্বামী যদি পত্নীর প্রিয়তম হন, তাহলে সেই প্রিয়তম জীবনসঙ্গীর মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী তাঁর প্রিয় হবে না কেন? হয়তো তাঁদের অনেক দোষ আছে, আছে অনেক নীচতা, অনেক স্বার্থপরতা, তবু তাঁরা স্বামীর আত্মজন। এঁদের কষ্ট দিলে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে স্বামীকেই কষ্ট দেওয়া হয়। অতএব তাঁদের সব কিছুই ক্ষমণীয়। এই ভাব মনে রাখলে আর কোন অশান্তি আসবে না।

সহিষ্ণুতা, প্রেম ও নিঃস্বার্থপরতা এই তিনটি মহৎগুণ যদি প্রত্যেক নারীর মধ্যে থাকে তাহলে সংসার সুখের আগার হয়। নারীই সংসার-সম্রাজ্ঞী। অতএব তাঁর সেইরূপ গুণ থাকা উচিত। তিনি গুরুজনদের বিশেষ শ্রদ্ধা এবং সম্মান দেখাবেন। ছোটদের শাসনও করবেন আবার বুকেও টানবেন। সংসারের সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাঁরই উপর নির্ভর করছে। কাজেই অতি সাবধানে এবং সতর্কতার সহিত তাঁর চলতে হবে। সংসারে যার যে প্রাপ্য, যার যে সম্মান, যার যে মর্যাদা তাকে তাই দিতে কুণ্ঠিত হলে চলবে না। তিনি নিশ্চয়ই সহশীলা হবেন। তাঁর অসীম ধৈর্য থাকবে। তিনি সমদৃষ্টিসম্পন্না এবং সুবিবেচিকা হবেন। সকলের অনলস সেবা, সকলকে আন্তরিক ভালবাসা, সকলের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হয়ে যে নারী নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারেন তিনিই হন যথার্থ সংসারের কল্যাণদায়িনী গৃহলক্ষ্মী, সংসার-সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী।

নারীর পূর্ণ বিকাশ মাতৃত্বে। কঠিনতম কাজ সন্তানপালন, এখানেই নারীর চরম পরীক্ষা। একটি সন্তানকে যথার্থরূপে মানুষ করতে মাতার অনেক সংযম এবং অনেক ত্যাগের প্রয়োজন। মাতার কথাবার্তা, আচারব্যবহার, চলাফেরা অত্যন্ত সংযত হওয়া দরকার। সর্বদা মনে রাখতে হবে শিশু তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি ব্যবহার এবং প্রত্যেক পদক্ষেপ অনুকরণ করবে। তাঁর সঙ্গেই শিশুর ঘনিষ্টতম সম্বন্ধ। তাঁর চরিত্রের প্রভাবই সবচেয়ে বেশী পড়বে ওর উপর। অতএব অতি সাবধানে এবং সতর্কতার সহিত নিজের চরিত্রকে গঠন করা দরকার। মাতা সুশিক্ষিতা না হলে সন্তান সুশিক্ষা কি করে পাবে? অবশ্য কয়েকটি বই মুখস্থ করে কতকগুলি ডিগ্রী অর্জন করতে

পারলেই শিক্ষিতা হওয়া যায় না। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের চরিত্রকে বজ্রের ন্যায় দৃঢ় করে। ত্যাগ, সংযম, সহিষ্ণুতায় ভূষিত করে। শিক্ষার কাজই মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ, প্রকৃত শিক্ষিতা নারীর মধ্যেই দেখা যায় নারীর বিভিন্ন রূপ। কখনও সেবিকা কল্যাণী বধূ, কখনও প্রেমিকা পত্নী, কখনও মমতাময়ী গৃহিণী, কখনও মহীয়সী মাতা।

নারীর কি শুধু ঘরেই কাজ? রান্না, খাওয়া, গেরস্থালী, আর সন্তানপালন—? দিনের পর দিন একই কাজের পুনরাবৃত্তি? এইভাবে যাবে জীবন কেটে? তারা কি করবে না বাইরের কোন কাজ? কোন উপকার? সমাজের কোন সংস্কার? তারা পাবে না বাইরের আলো?

এইগুলি আধুনিক নারীর প্রশ্ন।

নারী সবসময় ঘরেই আবদ্ধ থাকবেন বাইরে আসবেন না, বিশেষতঃ এ যুগে হতেই পারে না। তবে পুরুষের কর্মক্ষেত্র যেমন বাইরে প্রসারিত নারীর তেমন অন্দরে। নিজের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করে এবং দায়িত্ব পূর্ণরূপে বহন করে তবে বাইরের কাজ। আজকাল অর্থ-সঙ্কটের দিনে অনেক নারী অফিসে কিংবা স্কুলে চাকরি করেন, অনেকে সমাজসেবা কিংবা রাজনীতি করেন, এঁদের অধিকাংশ সময় বাইরেই কাটাতে হয়। দেশসেবা, সমাজসেবা, স্বাধীন উপার্জন খুবই ভালো কথা, কিন্তু এতে যদি ঘর-সংসারের বিশেষ ক'রে সন্তানের ক্ষতি করে তাহলে কি বাইরের কাজ করা উচিত? অনেক জায়গায় দেখা যায়—মা গেছেন অফিসে, কিংবা স্কুলে, কিংবা অন্য কোন কাজে। বাচ্চাগুলি ঝি-চাকরের কাছে। দিনের পর দিন তাদের থাকতে হয় ঝি কিংবা চাকরের কাছেই। তারা মাইনে করা অশিক্ষিত লোক। বাচ্চারা বিরক্ত করছে অতএব মেরে ধরে এক জায়গায় বসিয়ে রাখলে, ঠিকমত স্নান করালে না। ভালো করে খেতে দিলে না। বাচ্চাদের ভাগের দুধ-মাছ নিজেরাই খানিকটা খেয়ে ফেললে। এসব তো আছেই। তাছাড়া নোংরা হাতে, নোংরাভাবে খাওয়ান, আজে-বাজে কথা শেখানো, ভূত, পেত্নী, জুজুর ভয় দেখানো প্রত্যেক ঝি চাকর করবেই। এতে বাচ্চাগুলোর স্বাস্থ্য ও স্বভাব দুইই নষ্ট হয়, ভীতু হয়ে যায়। নিষ্প্রভ ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

কাজেই ঘর ও শিশু অবহেলা করে বাইরের দায়িত্বে জড়িয়ে পড়লে শিশুদের সমূহ ক্ষতি। শিশুদের ক্ষতি অর্থাৎ দেশেরই ক্ষতি। শিশুরাই দেশের মেরুদণ্ড, শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ, শিশুরাই দেশের সম্পদ। এই শিশুগুলিকে প্রকৃত মানুষ করতে পারলে দেশ ও সমাজের প্রভূত উপকার। ওদের অবহেলা করলে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। তবে এই অর্থসঙ্কটের দিনে অনেক মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্ন মধ্যবিত্ত মা ভগিনীরা স্কুল, অফিসে চাকরি নিতে বাধ্য হন। হয়তো তাঁরা কচিছেলে-মেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণের তেমন সুব্যবস্থা করতে পারেন না, তা সত্ত্বেও তাঁদের উপার্জনের জন্যে বাইরে বেরোতেই হয়; কারণ তাঁদের আয়েই সংসার চলে, কাজেই চাকরি না করে উপায় নেই। কিন্তু অনেক আধুনিক নারী আছেন যাঁদের অবস্থা বেশ সচ্ছল তথাপি তাঁরা স্বাধীন উপার্জনের মোহে সংসার এবং শিশুদের অবহেলা করেই চাকরি করেন। যাঁরা ঘরের কর্তব্য পালন করেও বাইরের কাজ করতে পারেন তাঁরা যথার্থই প্রশংসার যোগ্য।

এই যুগে নানা কারণে নারীর বাইরে বেরোনো অপরিহার্য। ট্রামে, বাসে, পথে, ঘাটে, শিক্ষায়তনে, অফিসে, দেশসেবায়, সমাজ-সেবায় সবটাতেই নারী যাচ্ছেন পুরুষের পাশে সমান তালে পা ফেলে। এ অতিশয় আনন্দের কথা। নারীর জাগরণে দেশের জাগরণ, নারীর উন্নতিতে দেশের উন্নতি। কিন্তু একটা বিষয় সব সময় মনে রাখা দরকার কোন অবস্থাতেই তাঁর নারীত্বের খর্ব যেন না হয়। তিনি যেন স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

আজকাল একদল উগ্র-আধুনিক নারী দেখা যায় যাঁরা নিজেদের আধুনিকত্ব জাহির করার জন্ত পোষাক-পরিচ্ছদ এবং হাব-ভাব এমন করেন যে দেখলে লজ্জা হয়। তাঁদের উড়ন্ত-দোলানো-ফাঁপানো শ্যাম্পু চুল, সুরমালিপ্ত চক্ষু, অঙ্কিত ভ্রূ, রঞ্জিত ওষ্ঠ, পেন্টেড মুখ, পরিধানে অতি সূক্ষ্ম শিফন কিংবা নাইলন, অর্ধ খোলা ব্লাউস পুরুষদের বিভ্রান্ত করে তোলে। তাঁরা যাচ্ছেন হয়তো অফিসে কিংবা অধ্যয়নে অথবা অন্ত কোন কাজে—কি দরকার এই মোহিনী বেশে? কি দরকার দেহ-সম্ভার অন্তের সামনে তুলে ধরবার? হয়তো তাঁদের মনে অত্যধিক আধুনিক হবার ইচ্ছে ছাড়া আর কিছু নেই, কিন্তু ফল হয় অন্তরকম। এ বেশ দেখে যদি ছেলেদের মনে কামনার আগুন জ্বলে কিংবা তারা বাচালতা প্রকাশ করে অথবা তাঁদের ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করে তাহলে কি ছেলেদের খুব দোষ দেওয়া যায়? এইসব নারীর পেছনেই ছেলেরা ঘোরা ফেরা করে। এঁরাই ছেলেদের দ্বারা প্রতারিত হন।

নারীর পোষাক হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং এবং ভব্যতাযুক্ত, এমন পোষাক তাঁরা করবেন যাতে তাঁদের মাতৃত্ব ফুটে ওঠে এবং মহিমান্বিত দেখায়। নারী হবেন লজ্জাশীলা। লজ্জাই নারীর ভূষণ, লজ্জাই নারীর সৌন্দর্য, লজ্জাই নারীর মহিমা। অবশ্য লজ্জা মানে এই নয় ঘোমটা টেনে বাড়ীতে বসে থাকা। অথবা বাইরের কোন লোক দেখলেই কাঁপতে কাঁপতে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে পড়া। নিজের শালীনতা ও মর্যাদা বজায় রেখে চলা ফেরা উচিত। নিজের গাম্ভীর্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখলে সকলেই সম্মান করবে। নারীর তিনটি রূপ। কন্যা, ভগিনী ও মাতা। কন্যারূপে আসে স্নেহ, ভগিনীরূপে ভালোবাসা, আর মাতারূপে আসে শ্রদ্ধা, বয়সানুযায়ী এই তিনটি রূপ যদি তাঁদের পোষাকে এবং ভাব-ব্যঞ্জনায় ফুটে ওঠে তাহলে কোন কুপ্রবৃত্তিই ছেলেদের মনে আসবে না। বরং শ্রদ্ধায় তারা মাথা নত করবে।

নারী ঘরে হবেন সেবিকা বধূ, প্রেমিকা পত্নী, কর্তব্যপরায়ণা গৃহিণী এবং মমতাময়ী জননী, আর বাইরের কর্মযোগে তিনি কর্মকুশলা ব্যক্তিত্বসম্পন্না এবং সকলের স্নেহময়ী মা।

বিবেকানন্দের দিব্য ব্যক্তিত্বের প্রভাব

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্, সাহিত্যরত্ন

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "দাও এবং গ্রহণ কর—এটাই নীতি। ভারতবর্ষ যদি আবার উন্নত হতে চায়, তাকে অবশ্যই তার আধ্যাত্মিক রত্নরাজি পৃথিবীর সব জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং প্রতিদানে অন্যান্য জাতির নিকট হতে যা-কিছু গ্রহণীয় তাও গ্রহণ করবার জন্ত প্রস্তুত থাকতে হবে।" পাশ্চাত্যে ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির প্রচার বিবেকানন্দের অন্যতম জীবনব্রত ছিল এবং এই কার্য তিনি প্রশংসনীয় কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যাত্ম-অনুভূতি, দেব-দুর্লভ ব্যক্তিত্ব ও ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতিতে বিশাল পাণ্ডিত্য অনেক পাশ্চাত্য মনীষীর উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। পাশ্চাত্য মনীষিগণ স্বামীজীর দিব্য ব্যক্তিত্বে কিরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—ইহা বাস্তবিকই এক বিস্ময়কর কাহিনী। এখানে তিনটি প্রধান দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব।

• • •

প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌রূপে জার্মান মনীষী ম্যাক্স্ মূলারের

নাম সুবিদিত। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে প্রাচ্য বিদ্যার প্রথম অধ্যাপক-পদের সৃষ্টি হওয়ার পর হইতে তদানীন্তন প্রায় সকল জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়েই সংস্কৃতের পঠন-পাঠন চলিতে থাকে। সংস্কৃত শিক্ষায় এত অধিক বিদ্যার্থী আত্মনিয়োগ করিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বিদেশে শিক্ষাদান-কার্যে আহূত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক ম্যাক্স-মূলারের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। মূলার ফরাসী মনীষী বারনুফের ছাত্র ছিলেন। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থসাহায্যে ঋগ্বেদের একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করেন (১৮৪৯-১৮৭৫)। ১৮৫০ খৃঃ তিনি অক্সফোর্ডে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ১৯০০ খৃঃ মৃত্যু পর্যন্ত তথায় বাস করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের সংস্করণ ব্যতীতও মূলার 'ভারতীয় ষড়্দর্শন', 'রামকৃষ্ণ—তাঁহার জীবনী ও উপদেশ', 'প্রাচ্যের ধর্মশাস্ত্রসমূহ (পঞ্চাশ খণ্ড)' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন মার্কিন দেশে বেদান্তপ্রচারে ব্রতী ছিলেন তখন অধ্যাপক তাঁহাকে অক্সফোর্ড-পরিদর্শনের জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। ১৮৯৬ খৃঃ মে মাসে অক্সফোর্ডে মূলারের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎকার হয়। 'নাইন্‌টিন্‌থ সেন্‌চুরি ম্যাগাজিনে' ম্যাক্সমূলার-লিখিত 'প্রকৃত মহাত্মা'-শীর্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি মনোরম প্রবন্ধ পাঠ করিয়া স্বামীজী স্বনামধন্য অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলেন। স্বামীজীর সহিত কথাপ্রসঙ্গে অধ্যাপক মন্তব্য করিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া কেশব সেনের ধর্মীয় মত পরিবর্তিত হইয়াছিল। এই বিষয়টি অধ্যাপকের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করিল। তদবধি মূলার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে যাহা কিছু উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন ঐগুলি পরম আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন। বিবেকানন্দের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়া অধ্যাপক স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন যে প্রয়োজনীয় উপাদান পাইলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে একখানা পুস্তক লিখিতে প্রস্তুত আছেন। বলা বাহুল্য, স্বামীজী উপাদান দিতে সম্মত হইলেন। কিছুদিন পর মূলারের বিখ্যাত পুস্তক 'শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁহার জীবনী ও উপদেশ' প্রকাশিত হয়। পুস্তকের ভূমিকায় অধ্যাপক লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষ, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলিতে রামকৃষ্ণের নাম সম্প্রতি এত অধিকবার প্রকাশিত হইয়াছে যে, আমার মনে হয় তাঁহার পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত ও উপদেশ-সম্বলিত একখানা গ্রন্থ কেবল ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার ও আধ্যাত্মিক সম্পদের প্রতি অনুরাগীদের নিকটই নহে, পরন্তু ধর্ম ও দর্শনের অগ্রগতি সম্বন্ধে আগ্রহশীল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের স্বল্পসংখ্যক মনীষীর নিকটও সমাদৃত হইবে। এই ভারতীয় ঋষির জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য তাঁহার একনিষ্ঠ সাক্ষাৎ শিষ্যদের নিকট হইতে এবং ভারতের সংবাদপত্র, মাসিক পত্রিকা ও নানা পুস্তক হইতেও সংগ্রহ করিয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত উপদেশাবলীর মতো এত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে যে দেশ অনুপ্রাণিত, সে দেশ কখনও অজ্ঞ পৌত্তলিকের দেশ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ হইতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, মানবাত্মায় ও পরিদৃশ্যমান জগতে ঈশ্বরের যথার্থ অস্তিত্ব ভারতবর্ষে যেরূপ গভীর ও ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়, এরূপ আর কোথাও হয় না; ঈশ্বরে পরমানুরাগ—কেবল তাহাই নহে, সম্পূর্ণ ভগবত্তন্ময়তা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে যেমন স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এমন আর কোথাও দেখা যায় না।"

অক্সফোর্ডে বিবেকানন্দ ও মূলারের মধ্যে অতি হৃদয়গ্রাহী কথাবার্তা হইয়াছিল:

বিবেকানন্দ— আজকাল সহস্র সহস্র লোক শ্রীরামকৃষ্ণকে পূজা করে।

মূলার— এই দেবমানব যদি পূজিত না হন, তবে আর কে পূজিত হবেন? জগতের লোক-দিগকে তাঁর কথা জানাবার জন্য তোমরা কি করছ?

বিবেকানন্দ— আমি অতি সামান্যভাবে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ প্রচার করবার চেষ্টা করছি।

মূলার— তোমার প্রচারকার্যে আমি খুব উৎসাহ দিচ্ছি।

আহারান্তে মূলার স্বামীজীকে অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় ও বড্‌লিয়ন পুস্তকাগার দেখাইলেন। ভারতবর্ষ ও তাহার সংস্কৃতি সম্বন্ধে অধ্যাপকের জ্ঞানের প্রসার ও অনুরাগ দেখিয়া বিবেকানন্দ বিস্মিত হইলেন। স্বদেশপ্রেমিক আচার্য অধ্যাপক মূলারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কখন ভারত-দর্শনে যাবে? যিনি আমাদের পূর্বপুরুষগণের উচ্চ চিন্তারাশি এত অধিক নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন করেছেন, তাঁকে ভারতের সকলেই সোল্লাসে অভিনন্দিত করবেন।" অধ্যাপকের মুখমণ্ডল প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তিনি সাশ্রুনেত্রে বলিলেন, "তা' হলে সম্ভবতঃ আমি আর ফিরে আসব না। আমার দেহ আরাধ্য ভূমি ভারতে সমাহিত হবে।" রাত্রিতে যখন স্বামীজী রেলষ্টেশনে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন বৃদ্ধ অধ্যাপক ঝড়-বাদলের মধ্যেও স্বামীজীকে আন্তরিক বিদায়-সংবর্ধনা জানাইবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী ইহাতে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "বিদায়-অভিনন্দন জানাবার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করে এখানে না আসলেই ভাল হতো।" অধ্যাপক সপ্রেম উত্তর দিলেন, "রামকৃষ্ণের একজন উপযুক্ত শিষ্যকে দর্শন করার সৌভাগ্য প্রতিদিন উপস্থিত হয় না।" এই দেখা-সাক্ষাতের ফলে অধ্যাপকের সহিত স্বামীজীর বন্ধুত্ব গাঢ় হয়। উভয়েই পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাপোষণ এবং রীতিমত পত্রালাপ করিতেন। বিবেকানন্দ বলিতেন, "আমার বিশ্বাস স্বয়ং সায়ণ ম্যাক্‌সমূলাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া অবধি আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। কি অদ্ভুত অধ্যবসায়, আর বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রে কি অসাধারণ পারদর্শিতা! অক্সফোর্ডে বৃদ্ধ ও তাঁহার পত্নীকে দেখিয়া আমার বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর কথা মনে পড়িয়াছিল। আর বিদায়কালে বৃদ্ধের কি অশ্রুপাত!"

* * *

জার্মানীতে বহু পণ্ডিত ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের আলোচনায় বরাবরই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। তথায় উপনিষৎসমূহ ও ভগবদ্গীতার অনেক অনুবাদ হইয়াছে। এ বিষয়ে দার্শনিক পল ডয়সনের কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। ডয়সন ১৮৮৯ খৃঃ হইতে ১৯১৯ খৃঃ পর্যন্ত কিয়েল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মনীষী শোপেনহাওয়ারের শিক্ষায় গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়া ডয়সন সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং অদ্বৈত বেদান্তের একজন পরমোৎসাহী অনুবর্তী হন। শোপেনহাওয়ার-কৃত শাঙ্করভাষ্যসমেত বেদান্তসূত্রের জার্মান অনুবাদের সহিত ডয়সন ষাটখানা উপনিষদ্ ও মহাভারতের দার্শনিক অংশগুলির অনুবাদ সংযুক্ত করেন। ছয় খণ্ড দর্শনের ইতিহাসের প্রথম তিন খণ্ডে ভারতীয় দর্শন আলোচিত হইয়াছে। সমসাময়িক জার্মান দার্শনিকদের মধ্যে ডয়সনের মতো আর কেহই পাশ্চাত্ত্যের জন্য বেদান্তের উপযোগিতা এত গভীর-ভাবে উপলব্ধি করেন নাই।

বিবেকানন্দের সহিত ডয়সনের সাক্ষাৎকার বড়ই মনোমুগ্ধকর বৃত্তান্ত। স্বামীজী যখন ইউরোপের দেশগুলিতে ভ্রমণে নিযুক্ত ছিলেন, তখন ডয়সন তাঁহাকে জার্মানীতে কিয়েল-পরিদর্শনের জন্য সাদর আহ্বান জানান। ডয়সন-দম্পতি স্বামীজীকে তাঁহাদের কিয়েলস্থ আবাসে অতি সমাদরে সংবর্ধনা

করেন। স্বামীজীর প্রচারকার্য ও উহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ডয়সন বেদ ও উপনিষদ্ বিষয়ে তাঁহার নিজ গ্রন্থ হইতে কতিপয় পৃষ্ঠা আবৃত্তি করিলেন। আবৃত্তির পর ডয়সন বলিলেন, "বেদান্তের এমনি চিত্তাকর্ষিণী শক্তি যে, মানুষ মুহূর্তে বাহ্যজগৎ ভুলিয়া যায় এবং উহার অধ্যয়ন তাহার মনকে অধ্যাত্মরাজ্যের সর্বোচ্চ ভূমিতে তুলিয়া দেয়। উপনিষদ্, বেদান্তদর্শন ও শাঙ্কর ভাষ্য মানুষের সত্যানুসন্ধানের মহত্তম অভিব্যক্তি। বেদান্ত-অধ্যয়নই আমার একমাত্র নেশা।" ডয়সনের বেদান্ত ও উপনিষদের প্রতি গভীর অনুরাগ দেখিয়া বিবেকানন্দ অত্যন্ত প্রীত হন। বেদান্তের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া ডয়সন বলিলেন, "অতএব বেদান্ত অভ্রান্তরূপে বিশুদ্ধ চারিত্রিক নীতির দৃঢ়তম অবলম্বন এবং জীবন-মৃত্যুর তাপ ও ক্লেশে পরম সান্ত্বনা। ভারতীয়গণ, বেদান্তকে ধরিয়া থাক।"

স্বামীজী তাঁহার স্বীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতির আলোকে কয়েকটি জটিল ও দুর্বোধ্য উপনিষদের শ্লোক বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। অধ্যাপক ইহাতে নূতন আলোক পাইলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্বামীজী তাঁহার দিব্য ব্যক্তিত্ব ও বেদান্তের নবালোকসম্পাতকারী ব্যাখ্যা দ্বারা অধ্যাপক ডয়সনের হৃদয় জয় করেন। ডয়সনের গৃহে বিবেকানন্দ চারিশত পৃষ্ঠার একখানা কবিতা-পুস্তকের বিষয়বস্তুগুলি অর্ধঘণ্টায় আয়ত্ত এবং বিনাস্খলনে আবৃত্তি করিয়া অধ্যাপকের অপরিসীম বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। ভারতীয় সন্ন্যাসী ডয়সনকে সহাস্যে বলিলেন, "এত বড় একখানা গ্রন্থ অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করা একজন যোগীর পক্ষে অসম্ভব নয়। প্রত্যেকেই ইহা করিতে পারে। তুমি জান আমি কামকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী। আজীবন অখণ্ড ব্রহ্মচর্য-পালনের ফলে আমি এই আশ্চর্য স্মৃতিশক্তির অধিকারী হইয়াছি। পাশ্চাত্য-বাসীদের অনেকেই ইহা বিশ্বাস না করিতে পারে, কিন্তু ভারতে ব্রহ্মচর্যের ফলে এরূপ দৃঢ় স্মৃতিশক্তির অধিকারীর অসদ্ভাব নাই।" ডয়সন স্বামীজীর উক্তির যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

*　　*　　*

স্কটিশ অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিডসের নাম ভারতীয় মনীষিগণের নিকট অজ্ঞাত নয়। যে-সকল ভারতীয় স্বদেশে ও বিদেশে পণ্ডিত ও লেখক বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই মনীষীর নানা বিষয়ে মৌলিক গবেষণার সহিত পরিচিত। গেডিডস্ দুইবার—একবার ১৯১৪ এবং আবার ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে—ভারতে আসিয়া মোট দশ বৎসর বাস করেন। তিনি এ দেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া যুবকদিগকে বিভিন্ন বিষয়ের মৌলিক গবেষণায় প্রোৎসাহিত করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, অন্তর্দৃষ্টি, সহানুভূতি, ভারতীয় ভাবধারার গভীর অবধারণা এবং সত্যনিষ্ঠা বহু উৎসাহী ছাত্র ও অধ্যাপককে তাঁহার সান্নিধ্যে আকর্ষণ করিয়াছিল। যে ঘটনাপরম্পরা তাঁহাকে হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল্যনির্ধারণে উদ্বুদ্ধ করে, তৎসম্বন্ধে জগৎ কিছুই জানে না। হিন্দুজীবনদর্শনের সহিত গেডিডসের প্রথম সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটে আমেরিকায়, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরেই ১৮৯৩ খৃঃ যুবক বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। উভয়ের সাক্ষাৎকার সুদূরপ্রসারী ফল প্রসব করে। প্রাচ্য-দেশীয় দৈহিক ও মানসিক সংযম-শিক্ষা প্যাট্রিক ও তাঁহার পত্নী আমার উপর এরূপ শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, পরবর্তী কালে তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের 'সরল রাজযোগ' নামক যোগ-শিক্ষাসম্বন্ধীয় পুস্তকখানি অন্তঃপ্রকৃতিজয়ের জন্য তাঁহাদের পুত্রকন্যাদিগকে উপহার দিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃঃ বসন্তকালে নিউইয়র্কের মিস্ জোসেফাইন ম্যাকলিওড্ কলিকাতায় বিবেকানন্দের ইংরেজ-

শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার সহিত দেখা করেন। নিবেদিতা মিস্ ম্যাকলিওড্‌কে বলিয়াছিলেন, "তুমি যদি প্যাট্রিক গেড্ডিসের নাম কখনও শুনিয়া থাক, তাহা হইলে তাঁহার অনুসরণ কর। শিষ্য করিতে হইলে তাঁহার মতো লোককেই শিষ্য করিতে হয়।" প্যাট্রিক তখন নিউইয়র্কে বক্তৃতা দিতেছিলেন, সুতরাং বিবেকানন্দের অনুগতা শিষ্যা ম্যাক্লিওড্ প্যাট্রিকের সহিত তথায় সাক্ষাৎ করেন। এইরূপে স্কটিশ অধ্যাপক ও মার্কিন মহিলার মধ্যে দীর্ঘ সৌহার্দ্যের সূত্রপাত হইল।

১৯০০ খৃঃ প্যারি প্রদর্শনীতে বিবেকানন্দের সহিত প্যাট্রিকের পুনঃ সাক্ষাৎ হয়। প্রদর্শনীতে বিবেকানন্দ ও আরও আমন্ত্রিত অনেক খ্যাতনামা প্রতিনিধি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ১৯০০ খৃঃ নিবেদিতাও প্যারিতে গিয়া অধ্যাপক গেড্ডিসের সমাজতত্ত্বের গবেষণা-প্রণালী ও দর্শন শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সহিত কয়েক মাস অতিবাহিত করেন। নিবেদিতার 'দি ওয়েব অব্ ইণ্ডিয়ান লাইফ্' নামক গ্রন্থখানি প্যাট্রিকের নামে উৎসৃষ্ট হইয়াছে। ১৯০০ খৃঃ গ্রীষ্মকালে প্যারিতে বিবেকানন্দের সহিত প্যাট্রিকের সাক্ষাতের ফলে ভারত ও উহার অন্তরাত্মার প্রতি অধ্যাপকের অনুরাগ বহুধা প্রবৃদ্ধ হইল। দশ বৎসর পর তিনি বিবেকানন্দের 'রাজযোগে'র ফরাসী সংস্করণের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন এবং ইহার চারি বৎসর পর ভারত ভ্রমণে বাহির হন—ইহাতে তাঁহার জীবনের দীর্ঘ দশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়। নিবেদিতা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া অধ্যাপক গেড্ডিস বলিয়াছেন, "নিবেদিতা ছেলেমেয়েদের সহিত গৃহের মেজেতে অগ্নিকুণ্ডের আলোকে বসিয়া তাঁহার 'Cradle-tales of Hinduism' (ক্র্যাডল্ টেইলস্ অব হিন্দুইজম্) অর্থাৎ হিন্দুধর্মের শিশুকাহিনী বিবৃত করিতেন—ইহা তাঁহার লিখনশক্তি ও বর্ণন-মাধুর্যকেও হার মানাইত। এরূপ বিবৃতিকালে আগ্রহশীল কোন কোন ছেলে-মেয়ের মন প্রাচ্যদেশের মহোচ্চ আদর্শের দিকে স্বতঃই প্রধাবিত হইত।" তরুণচিত্তে নিবেদিতার প্রভাব সম্বন্ধে অধ্যাপক গেড্ডিস্ যাহা লিখিয়াছেন, নিজগুরু বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার সংশ্রব সম্পর্কেও তদ্রূপ বলা যাইতে পারে। * * *

বিদেশে ভ্রমণকালে পাশ্চাত্ত্য সমাজের প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে লব্ধকীর্তি নরনারীগণের সহিত বিবেকানন্দের পরিচয় হইয়াছিল—ইহার উল্লেখ আমরা বিবেকানন্দের জীবনচরিত, পত্রাবলী ও স্মৃতিকথায় পাই। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বামীজীর ভাবধারা ও বেদান্ত-ব্যাখ্যানে গভীর অনুরাগ প্রকাশ করেন এবং তাঁহার দিব্য ব্যক্তিত্বে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট হন। অনেকে নূতন আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ ও দীক্ষিত হন। কত শিল্পী, বিজ্ঞানী, মনীষী, ধর্মতত্ত্বজ্ঞ, দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানবিৎ স্বামীজীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন; সারা বার্নার্ড ও মাদাম ক্যাল্ভে, টেস্লা ও মাক্সিন্, ম্যাক্সমূলার ও ডয়সন, গেড্ডিস্ ও উইলিয়ম জেমস্ এবং বহু ক্যাথলিক ধর্মযাজক ও গির্জা-ঐতিহাসিকের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মনীষিগণের অনেকেই বিবেকানন্দের মধ্যে এমন কিছু অত্যদ্ভুত, জীবনপ্রদ আধ্যাত্মিক শক্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন, যাহার দুর্জয় প্রভাবে তাঁহারা মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়াছিলেন। আর বিবেকানন্দ প্রকৃতপক্ষেই এ যুগে এক নূতন আধ্যাত্মিক বার্তা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন জড়বাদী পাশ্চাত্ত্যে। যে-কেহ এই ধর্মাচার্যের সংস্পর্শে একবার আসিয়াছেন তাঁহার জীবনই সার্থক হইয়া গিয়াছে। বিবেকানন্দের মতো লোকাতীত-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষ একটা যুগের চিন্তানায়ক; যে-দেশে ও যে-যুগে তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, সে দেশ ও সে-যুগ ধন্য।

শ্রীভরত

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

লহ গো প্রণাম অয়ি শ্রীরামজননি!
আর্য-বনবাস-কথা আমি নাহি জানি।
রাজ্যতৃষা নাহি মাতঃ! নাহি অন্য আশ্—
শুধু জানি তিনি প্রভু আমি তাঁর দাস।
মোর অভিলাষে যদি এই নির্বাসন—
পিতৃহত্যা পাপ তবে করুক স্পর্শন।
তার লাগি অভিশাপ: যার প্রেরণায়
অগ্রজের ভাগ্যলক্ষ্মী ম্লান বেদনায়
হউক উন্মাদ সেবা—ছিন্নবস্ত্রধারী!
বৃত্তি তার হক ভিক্ষা! নারীবধকারী
যে পাপে নিমগ্ন হয়—তার সেই পাপ!
যার লাগি অযোধ্যার এই দুঃখ তাপ—
রবির উদয় আর গমন সময়
শয্যাশ্রিত-মানবের যত পাপ হয়
হক সেই অপরাধ! লভি' উপকার
যে-জন তাহার ঋণ না করে স্বীকার;
অপরের দেবতায় রহে যার দ্বেষ,
নাহি করে দূর যেবা অপরের ক্লেশ;
বারিদান নাহি করে যে তৃষ্ণার্ত-নরে;
পিতা ও মাতার সেবা যে-জন না করে—
এই সব পাপ মোরে করে যেন গ্রাস
আমার ইচ্ছায় যদি এই বনবাস।
রামের অযোধ্যা আর অযোধ্যার রাম—
সেই রাম-পদে আমি জানাই প্রণাম!

সতী জাসলবুন

স্বামী জপানন্দ

চাষণী জাসলবুন পূর্ণযৌবনা। যেন ছাঁচে ঢালা সোনার কান্তি তার। যাকে বলে ঠিক্‌রে পড়ছে রূপ। মাথায় ঘড়ার উপর ঘড়া রেখে মন্থর গতিতে যাচ্ছিল কূয়া হ'তে জল আনতে। কূয়া গ্রামের বাহিরে এক নালার কাছে। গ্রামান্তরে যাবার পথও তার পাশ দিয়ে গিয়েছে! কূয়ার অনতিদূরে এক প্রকাণ্ড বট গাছ, তার ছায়ায় পথিকরা শ্রান্তি দূর করে। হাজারো পক্ষীর কলগানে মুখরিত থাকে সেই বট। গ্রীষ্মের দিনে গৃহপালিত পশুর আশ্রয় আর রাখালদের ক্রীড়াভূমি সেই বটের নীচে সাধু-যোগীরাও ধুনি জালিয়ে বসেন, এবং সেখানে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মিলন-নাটকও হয়। মেয়েদের মিটিং্ করবার কায়েমী স্থল হচ্ছে সর্বত্র ঐরূপ কূয়া আর বট অশ্বত্থের স্নিগ্ধ ছায়া। জল ভরতে ভরতে সংসারের যাবৎ সুখ-দুঃখের কথা, টীকা-টিপ্পনী এবং কখনও বা গৃহবিবাদের মীমাংসা সেইখানে মেয়েকোর্টে হয়ে থাকে। কলহও বাধে কখন-সখন, তবে শীঘ্রই শান্তি-সন্ধি অপরে করে দেয়। এসব যেমন অন্যত্র হয়ে থাকে। এখানেও হ'তো।

কিন্তু—আমরা যে দিনের কথা বলছি, সে দিন কূয়ার কাছে গ্রামের কেহই ছিল না: মাত্র ছিল অতুলনীয় রূপবান্ এক যুবক যোদ্ধা তেজস্বী এক অশ্বের উপর, বটতলায়। সে যেন কারো অপেক্ষা ক'রছিল। জাসলবুনকে দেখে সে ঘোড়া নিয়ে কূয়ার ধারে এসে বল্লে,—"বুন, বড্ড তৃষ্ণা পেয়েছে। একটু জল দাও।…এই ঘোড়াটাকে আগে একটু দাও। (চুমকী মেরে

ঘোড়ার গলায় থাপ্পড় মেরে আদর করলে)। জলপান করে তৃপ্ত হয়ে বল্লে,—"বুন, অগ্নি সেবা নেওয়া অনুচিত মনে করি, বিশেষ করে চারণীর কাছ থেকে; কিছু গ্রহণ করলে আমি আপ্যায়িত হব।" এই ব'লে একটি টাকা দিতে গেল।

"না, ভাই, এ সেবা তো মানুষ মাত্রেরই করা উচিত। এ সেবার বদলে পয়সা নিলে আমি যে ধর্মচ্যুত হব।"—বল্লে চারণী—

"আচ্ছা, তোমার এক ভাই তোমায় দিচ্ছে, এই ভেবে নাও!"

"যদি ভাই-ই হলে, তবে বুনের (বোন, ভগ্নি) বাড়ী না-খেয়ে যাওয়া শোভা পায় না। তুমি যদি খেতে রাজী হও তো আমিও নিতে রাজী হতে পারি।*" এই আগ্রহ সেই যুবক ঠেলতে পারলে না। গেল জাসলের বাড়ী তার সঙ্গে। চারণী তাকে বসবার আসন দিলে। কিন্তু বাড়ীতে আর কেহ নাই দেখে মের যুবক একটু চঞ্চল হয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করল—"বুন, চারণ বাড়ীতে নাই।"

"না, ভাই, সে রোজগারে গ্রামান্তরে গেছে।"

"তবে আমি যাই, বুন; অন্য একদিন এসে তোমার হাতের রান্না খেয়ে যাব এখন!"

"তা'ও কী হয়, ভাই, রুটি তৈরী আছে। খেয়ে তবে যাও। অবেলায় আবার কোথা গিয়ে খাবে!···আর তুমি এসেছ তোমার বুনের বাড়ী। তা'তে দোষ ত কিছুই নাই, ভাই!"

"পবিত্র তুমি, দুনিয়ার কূট মলিন গতি জান না। অপবাদ রটাবে লোকেরা।"···

(সে দেখছিল আসেপাশের বাড়ীর মেয়েরা উঁকিঝুঁকি মারছে।)

"ঈশ্বর তো অন্ধ নহে ভাই, সে দেখছে!" বল্লে জাসল।

* গুজরাতী ভাষায়—"তমে"—তুমি বলে, "আপ"—আপনি গ্রামদেশে বলা প্রচলিত নাই। এটি মুসলমানদের দেওয়া।

বড় বড় দুটি বাজরার রুটি ও একবাটী দই এবং একটা গুড়ের ড্যালা ও লঙ্কার আচার এনে অতি প্রীতির সাথে তাকে খেতে দিলে। ঐ পবিত্র ধর্ম-ভগ্নির হাতের রান্না অমৃতোপম লাগলো! আর কা'রই বা তা না লাগে?—আহারান্তে গন্তব্য স্থানে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বল্লে—"বুন, এই তোমার ভাইয়ের বাড়ী কবে আসছ? তোমার বৌদি তোমায় দেখলে খুব খুশী হবে!"

"ঈশ্বরেচ্ছায় সুযোগ পেলেই একবার আসবো, ভাই! তবে একটা কথা বলে রাখি। আমার কোন ভাই নাই, তুমিই আজ হ'তে ভাই হ'লে! আমার আপদবিপদে ভায়ের কর্তব্য করতে যেন ভুল না।"

"তোমার ভাই কর্তব্যভ্রষ্ট হবে না, বুন। ঈশ্বর সাক্ষী।" এই বলে সে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল।

(২)

জাসলবুনেরও শত্রুর অভাব ছিল না। পার্শ্বের বাড়ীতেই যে গৃহস্থ থাকতো—তার গৃহিণীর সঙ্গে জাসলের মনের মিল ছিল না। প্রায়ই একটু আধটু বচসা হয়ে যেত। তার কারণ ছিল ছোট-খাট অনেক, তবে বড় কারণ ছিল ঐ গৃহিণীর একটু বেচাল কথাবার্তা তার পতির সঙ্গে। তার-পক্ষে এমন অবসর ছাড়া অসম্ভব। জাসলকে টিট্‌ করবার মত এমন সুযোগ আর নাও আসতে পারে! তাই, ঐ যুবককে দেখবামাত্র বিদ্যুৎবেগে এ বাড়ী সে বাড়ী গিয়ে সে বয়োজ্যেষ্ঠা গৃহিণীদের খবর দিয়ে ডেকে আনলো এবং তার বাড়ীর ভিতর হ'তে বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখাতে লাগলো জাসলের অপকর্ম, অপরিচিত সুন্দর যুবাপুরুষের সঙ্গে তার অবাধ উঠাবসা, কথাবার্তা এবং উভয়ের স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি আর হাস্যমধুর মুখমণ্ডল!—"স্বামী ঘরে নাই, আর ঐ পরপুরুষকে ঘরে ঢুকিয়েছে! চারণের মুখে কালি দিলে কুলটা।"—এরূপ টিপ্পনী সহযোগে

জাসলের অসচ্চরিত্রতা ও নিজের সতীপনার ছাপ দিতে লাগলো।

"ওরা বাড়ীতে না থাকলে, আমার বা ওদের কোন আত্মীয় এলেও কথা কই না। পরপুরুষ ত দূরের কথা! কুলবধূর কী এ আচরণ সাজে?—"

মের যুবক চলে যেতেই মেয়েদের দল এসে জাসলকে ঘিরে ফেল্লে।—"কে ও পুরুষ? কেন এসেছিল? কতদিনের আলাপ? কোথায় থাকে? ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারো প্রশ্নের ঝড় বহিতে লাগলো। তাদের এই সব প্রশ্নের পিছনে যে কী ভাব ছিল, তা জাসলের বুঝ্‌তে আর বিলম্ব হ'ল না। সে মাত্র বল্লে,—"ও আমার ধর্মভাই, লাভুভা মের।" পাশের বাড়ীর গৃহিণী এগিয়ে গিয়ে বল্লে,—"শোন কথা! মের হলো ওর ধর্মভাই! কবে থেকে লা?" "আজ থেকেই, দিদি!"—দৃঢ়স্বরে জবাব দিলে জাসল। "বটে! অত হাসাহাসি। অত পরিচয় আজকেরই সব? সত্য গোপন থাকবে না লা। সত্য গোপন থাকবে না। সতীমা সত্য প্রকট ক'রবেনই ক'রবেন।"—ব'লে উক্ত প্রতিবেশিনী দু-চার বার মাথা নাড়া দিয়ে সতীদেবীর আবির্ভাবের হুমকী দিলে।

"হাঁ, দিদি, সত্য গোপন থাকবে না!" ব'লে জাসল ভিতরে চলে গেল।

"তেজ দেখেছ! মাগী ছিনালী করে গ্রামের মুখে কালি দিলে, আবার সবাইকে চোখ রাঙাচ্ছে। সতীমা!…"*

অতঃপর সকলে নানাপ্রকার জল্পনা—কল্পনা, ইঙ্গিত-ইসারা করতে করতে যে যার গৃহে প্রত্যাগমন ক'রল। এই ঘটনার চর্চা গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে। মোড়লেরা ব্যস্ত হয়ে কিংকর্তব্য স্থির করবার জন্ত গ্রামের সার্বজনিক মণ্ডপে একত্রিত হলেন। জাসলের স্বামী, যে গ্রামান্তরে কার্যোপলক্ষে গিয়েছিল, ফিরে আসতেই মোড়লেরা তাকে ডেকে তার স্ত্রীর কীর্তি—যা তাঁরা গৃহিণীদের নিকট শুনেছিলেন, গুরুগম্ভীর স্বরে শুনিয়ে বল্লেন,—"এই সব প্রত্যক্ষদর্শিনীদের কথায় অবিশ্বাস করবার মত কিছুই নাই। আমাদের গ্রামে এরূপ পাপ ছিল না!" "চারণজাতির মুখে কালি পড়লো," বল্লে একজন। "মেয়েটার স্বভাব আগে থেকেই চঞ্চল ছিল"—বল্লে কোন বৃদ্ধ। "আমার ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ের কথা হয়েছিল। কিন্তু ঐ জন্ত আমি রাজী হই নাই।"—বল্লে তৃতীয় কেহ। "সে যাহা হউক, এর একটা সুবিচার হওয়া দরকার, যাতে অন্ত মেয়েরা না শিখে!" বল্লেন এক বয়োবৃদ্ধ।……

জাসল ছিল গড়বীর (চারণকে গড়বী বলে) প্রাণ, তার সম্বন্ধে এই ভীষণ অপবাদ তাকে পাগল করে দিলে। রাগে ক্ষোভে সে মৃতপ্রায় হয়ে কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান-শূন্য হয়ে গেল এবং জাসলকে এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করার দরকার দেখল না। গ্রাম-বৃদ্ধেরা যা বলেছেন তা সত্যই হবে, অতএব জিজ্ঞাস্য আর কী থাকতে পারে?—মণ্ডপ হ'তে সে সোজা বাড়ী এসেই রন্ধনকার্যে ব্যাপৃতা জাসলের মাথায় সজোরে মারল লাঠির বাড়ি।—জাসল অজ্ঞান অচেতন হ'য়ে সেই খানেই ঢলে পড়ল। রক্তের প্রবাহ বয় ভাসিয়ে দিলে,—"কালমুখী, আমার কুলে কালি দিলি"—এই ব'লে চারণ করলে পুনঃ পদাঘাত।

(৩)

লোকে এসে চারণকে ধরে বাহিরে নিয়ে গেল। দু' একটি সধবা বৃদ্ধা জাসলের মাথায় মুখে জল দিয়ে তার চেতনা-সম্পাদনের ক্ষীণ প্রচেষ্টা করতে লাগলো। যখন তার জ্ঞান হ'লো সে উঠে বসে করজোড়ে বল্লে,—"জগদম্বে! মা, সতের মুখ রাখ!"

* সতীদেবী হ'চ্ছেন চারণদের কুলদেবী। সতীমা সতীমেয়ের শরীরে আবির্ভূ'তা হন—সতের অপমান হলে। ভর হলে—দেহ কাঁপে, মাথার চালনা বেশী হয়। হুঙ্কার দেয়। অভিশাপ দেয়—ইত্যাদি।"

—থরথর থরথর কাঁপতে লাগলো তার দেহ এবং মুখমণ্ডল এক অপূর্ব তেজো-দীপ্ত হয়ে উঠলো! তার সেই তেজোদ্দীপ্ত মুখাকৃতি দেখে সবাই বুঝলে—সতীমা আবির্ভূতা হয়েছেন। তখন মেয়েরা ধূপ-ধুনা এনে তার সম্মুখে রাখলে এবং 'ক্ষমা কর অপরাধ, ক্ষমা কর!' বলে বার বার ক্ষমা চাইতে লাগলো। গড়বী চারণ তখন বুঝতে পারলে যে, সে ভয়ঙ্কর ভুল করেছে। তার উচিত ছিল জাসলকে একবার জিজ্ঞাসা করা। তা না করেই নিরপরাধিনী জাসলকে মেরে সে অত্যন্ত অপরাধ করেছে। সে ভয়ে ভয়ে জাসলের সামনে গিয়ে মাথার পাগড়ী খুলে রাখলে এবং কাতরভাবে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলে। তখন জাসল বল্লে,—"তোমরা কেহ শীঘ্র গিয়ে আমার ভাইকে খবর দাও। বোলো তাকে—তার বুন আর এ সংসারে বেশীক্ষণ নাই। আর বোলো—সতী হবার সব সামগ্রী নিয়ে আসতে। মাত্র তার অপেক্ষায় আছি এ দেহে!…ওরে ভাই, তোর বুন হবে সতে প্রতিষ্ঠিত, আয় শীঘ্র আয়!" —এই বলে সে ধ্যানস্থ হলো।

একজন অশ্বারোহী তীর বেগে ঘোড়া দৌড় করে গেল লাভুভা মেরের গ্রামে এবং তাকে জাসলের সংবাদ জানালে। লাভুভা তা শোনবামাত্র হায় হায় করে বজ্রাহতের মত আছাড় খেয়ে পড়লো। অতঃপর একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বুনের আদেশ অনুসারে সতী হবার সব সামগ্রী নিয়ে গেল জাসলের বাড়ী।

গ্রামের বাহিরে সেই বটবৃক্ষের নীচেই হয়েছে চিতা সাজান। লোকে লোকারণ্য। আবাল-বৃদ্ধবনিতা সবাই জয় ঘোষণা করছে,—"জয় সতীমা, জয় সতী জাসল!" আর কুলবধূরা মঙ্গলগীতি গাইছে। সতী জাসল বুনকে সঙ্গে নিয়ে তার ধর্ম-ভাই লাভুভা মের 'সামগ্রী' হাতে নিয়ে বটতলায় আসছে। রাস্তার আগে আগে মেয়েরা সিঁদুর ও ফুল ছড়াতে ছড়াতে আসছে। মাঝে মাঝে জয় ঘোষণায় দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।…সতী জাসল ধরেছে এক অপূর্ব রূপ, পবিত্র তেজ তার অঙ্গ হ'তে বাহির হচ্ছে। অবাক্ হয়ে দেখছে সবাই! তার নামে অকারণ বদনাম রটিয়েছিল যারা, ভয়ে তারা কাঁপছে, আর 'ক্ষমা কর সতীমা, অপরাধ ক্ষমা কর!' বলছে।…লাভুভা মের কাঁদতে কাঁদতে বল্লে,—"বুন, এইখানে তোর সঙ্গে প্রথম দেখা। এইখানেই আবার শেষ দেখা দিলি!… আমার জন্যই তো তোর এ দুর্ভোগ…আমার জন্যই…" বলে সে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো।

"ছিঃ ছিঃ ওকি ব'লছো ভাই আমার! তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায়,—তোমাকে 'ভাই' করতে পারাতেই ত আজ আমার এই সৌভাগ্য হলো! আমি সতী হ'তে পারলাম। ভাই, তুমি এই সতী বুনের আশীর্বাদে চিরদিন সতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে!" —সান্ত্বনা দিলে জাসল।

ভাই লাভুভা তখন বুনের হাত ধরে চিতায় উঠতে সাহায্য করলে। জাসলবুন চিতার উপর আসন করে বসলে—প্রথমে লাভুভা, পরে অন্য সকলে যথাবিধি তার পূজা করলে। তারপর—তারপর অগ্নির লেলিহান জ্বালা দেখতে দেখতে সতী জাসলবুনের পবিত্র দেহ ভস্মীভূত করে ফেল্লে …'জয় সতীমায়ের জয়' রবে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো,—জয় সতী জাসলের জয়!"

দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি-কথা

অধ্যাপক নীরদবরণ চক্রবর্তী, এম্-এ

বুদ্ধি নিয়ে মানুষ জন্মেছে। তাই মানুষের স্বভাবই এই যে—সে চিন্তা করে। কোন না কোন বিষয়ে চিন্তা না করে মানুষ থাকতেই পারে না। জীবনধারণের সহজ উপায় নিয়ে যেমন মানুষ চিন্তা করে, ঠিক তেমনি আবার জগৎ ও জীবনের জটিল প্রশ্ন নিয়েও সে চিন্তা করে। 'শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি' মানুষের সমস্ত চিন্তাকে কলুষিত করতে পারে না। জীবনধারণের অতিরিক্ত নানা জটিলতার মধ্যেও তার চিন্তা পথ করে নেয়। জীবনের পথে চলতে চলতে যে সব চিন্তা মানুষের মনে এসে ভিড় করে দাঁড়ায়, তারই মধ্য থেকে সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল রূপ নিয়ে দার্শনিক চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মানুষের জীবনের স্বাভাবিক চিন্তা থেকেই এই দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি। কিন্তু সর্বদেশে ও সর্বকালে একই রকম ভাবে এর উৎপত্তি হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী এবং দেশ ও জাতির বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানুষের দার্শনিক চিন্তা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হ'য়েছে। আমরা যদি দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করি, তবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তির বিভিন্নতা দেখে সত্যি আশ্চর্য হই। এখানে আমরা সংক্ষেপে দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তির উল্লেখযোগ্য কারণগুলোর আলোচনা করবো।

(ক) বিস্ময় থেকে দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতে বিস্ময় থেকেই দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব হ'য়েছে। মানুষ যখন প্রথম এই জগৎ দেখলো তখন তার বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। সুউচ্চ পর্বত, তরঙ্গ-সঙ্কুল সাগর, গহন অরণ্য, আকাশের অগণ্য নক্ষত্র, দিনের সূর্য ও রাত্রের চন্দ্র মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছে। বার বার মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে—এই বিচিত্র জগৎ কিভাবে সম্ভব হ'ল? শুধু তাই নয়। মানুষের জন্ম আবার তার মৃত্যু—এও কি কম বিস্ময়? মৃত্যুতেই কি জীবনের শেষ—না মৃত্যুর পরেও একটা জীবন আছে? —এ প্রশ্নও মানুষের মনে জেগেছে। এই পৃথিবীতে যা কিছু গভীর ও গহন, বিরাট ও মহান্—তার পেছনে কোন বিরাট শক্তি কাজ করছে কি-না কে জানে! এই জাতীয় নানা প্রশ্নই মানুষের মনে এসেছে। মানুষ চিন্তা করেছে—প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করার চেষ্টা করেছে। কখনও হয়ত সে উত্তর হ'য়েছে ভীত মানুষের আত্ম-দুর্বলতার স্বীকারোক্তিমাত্র, আবার কখনও বা নানা উদ্ভট কল্পনা-জালে জড়িত। কখনও কখনও কিন্তু এই সব উত্তরের মধ্যে মানুষের চিন্তা-শক্তি ও বুদ্ধির প্রাখর্যেরও পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রাচীন গ্রীসে এইভাবেই ত দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি হয়েছিল।

(খ) সংশয় থেকে দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি

আধুনিক পাশ্চাত্ত্যদর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখি—বেকন থেকে শুরু করে অনেক আধুনিক দার্শনিকের চিন্তা-ধারাই সংশয় থেকে শুরু হ'য়েছে। এখানে মনে রাখতে হবে—রেনেসাঁর পর যে সমস্ত দার্শনিক চিন্তা পশ্চিমে হ'য়েছে—সবই আধুনিক দর্শনের আওতায় পড়ে। এই বিচারে বেকন একজন আধুনিক দার্শনিক। বেকনের জন্মের আগে মধ্যযুগে যুরোপে যে সমস্ত দর্শন হ'য়েছে, তার কোন একটাও বাইবেল আর চার্চের প্রভাব এড়াতে পারেনি। তখনকার দিনে

পাদ্রীদের দাপট ছিল প্রচণ্ড। সমস্ত দার্শনিক চিন্তা তাঁরাই নিয়ন্ত্রিত করতেন। তার ফলে যে দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল তা যেন বাইবেলের নব ভাষ্য। বাইবেলের বিরুদ্ধে কোন কথা বলার দুঃসাহস তখন কোন দার্শনিকেরই ছিল না। সেজন্য স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ মধ্যযুগীয় কোন দর্শনেই বিশেষ পাওয়া যায় না। বেকন এসে এই জাতীয় চিন্তা-ধারায় সংশয় প্রকাশ করলেন। বাইবেলে যা আছে, তা-ই অভ্রান্ত সত্য—এমন কথা মানতে তিনি রাজী নন। অভিজ্ঞতার কষ্টি-পাথরে যা সত্য বলে নির্ণীত হবে—তা-ই সত্যিকারের সত্য। নির্মোহ মন নিয়ে দার্শনিককে তারই গলায় জয়মালা পরিয়ে দিতে হবে। বুদ্ধির মুক্তি ঘোষণা করলেন বেকন। বিশ্বাসের স্থানে অভিজ্ঞতা দার্শনিক চিন্তায় স্থান পেল। অভিজ্ঞতায় যাকে সত্য বলে জানবো তাকেই শ্রদ্ধার আসনে বসাতে হবে—এই হল বেকনের মূলমন্ত্র।

পরবর্তী কালে ডেকার্টের চিন্তায় এই সংশয় আরও গভীর হ'য়ে দেখা দিল। যা কিছু সংশয় করা যায় তিনি তাই সংশয় করে বসে আছেন। সংশয় করতে করতে এমন একটা জায়গায় এসে তিনি দাঁড়ালেন—যেখানে সংশয় আর সম্ভব নয়। সংশয়-শেষে প্রাপ্ত সেই তত্ত্বের নাম দিলেন তিনি নিঃসংশয় সত্তা। অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত সমস্ত বস্তুকে তিনি সংশয় করলেন। অন্ধকার রাত্রে রজ্জুতে যেমন মিথ্যা সর্প দেখি তেমনি প্রত্যক্ষলব্ধ এই জগৎ ভ্রান্ত হ'তে পারে। স্মৃতি ত অভিজ্ঞতা থেকেই জন্মে। অভিজ্ঞতা-লব্ধ বস্তুর অনুপস্থিতিতে অভিজ্ঞতার পুনঃপ্রাপ্তির নামই ত স্মৃতি। অভিজ্ঞতা যদি ভ্রান্ত হয়, স্মৃতিও নিশ্চয়ই ভ্রান্ত হবে। কল্পনা-লব্ধ বস্তু-সত্তা সম্বন্ধে সহজেই সংশয় পোষণ করা যায়। সুতরাং ডেকার্ট তাকেও সংশয় করলেন। এমন করে ডেকার্ট একে একে অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও কল্পনালব্ধ সমস্ত বস্তুকেই সংশয় করেছেন। অঙ্ক-শাস্ত্রে আমরা যে জ্ঞান পাই তাও সংশয় করা যেতে পারে। কোন দুষ্টা সরস্বতীর প্রভাবে পরে যে অঙ্কশাস্ত্র আমরা গ্রহণ করিনি—তার কি প্রমাণ আছে? সুতরাং অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞানও গ্রহণযোগ্য নয়। সর্বশেষে ডেকার্ট বল্লেন—সব কিছু সংশয় করলেও সংশয়াত্মাকে ত আর সংশয় করা যায় না। সংশয়াত্মাকেই যদি সংশয় করা হয়, তবে সংশয় করবে কে? সুতরাং সংশয়াত্মাকে নিঃসংশয় সত্তা বলে স্বীকার করতেই হবে। ডেকার্টের সমস্ত দার্শনিক চিন্তা এই নিঃসংশয় সত্তাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

কাণ্ট তাঁর পূর্বসূরীদের চিন্তাধারা সংশয় করেই নিজের স্বাধীন মত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। লক্, হিউম্ প্রভৃতি অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মতে—আমাদের সমস্ত জ্ঞানই অভিজ্ঞতা থেকে আসে। কাণ্ট এই মতবাদে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। অঙ্কশাস্ত্রে আমরা যে সমস্ত সাধারণ প্রতিজ্ঞার (universal proposition) জ্ঞান পেয়ে থাকি, তা'ত কখনই অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায় না। আর অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞান জ্ঞানই নয়—এমন কথাও ত বলা চল্‌বে না। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মতে ধারণা থেকেই জ্ঞান পাওয়া যায়। কিন্তু কাণ্ট প্রশ্ন করলেন—শুধু ধারণা বলে কি কিছু আছে? সমস্ত ধারণাই ত কোন না কোন বিশেষ বস্তুর ধারণা। সুতরাং শুধু ধারণা আমাদের কোন জ্ঞানই দিতে পারে না। ধারণা আর বস্তুর মিলন হ'লেই আমাদের জ্ঞান হয়। অভিজ্ঞতা থেকে পাই আমরা বস্তু আর বুদ্ধি থেকে পাই ধারণা। সুতরাং অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি—এই দু'ই মিলেই আমাদের জ্ঞান সৃষ্টি করে থাকে। কাণ্টের এই মত অভিজ্ঞতাবাদী ও বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মতবাদের সংশয়ের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে।

(গ) উপযোগিতা-বোধ থেকে দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি

আধুনিককালে একজাতীয় দার্শনিক চিন্তাধারা উপযোগিতা-বোধ থেকে উদ্ভূত হ'য়েছে। যেমন, ডিউই ও সীলার এই মতবাদে বিশ্বাসী। তাঁদের মতে—এমন চিন্তাই করা উচিত জীবনে যার প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা আছে। কোন্ বস্তু জীবনের কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ করে—এই বিচারেই বস্তুর সত্যতা নিরূপণ সম্ভব। দার্শনিক চিন্তা মানুষকে জীবন-পথে চলতে সাহায্য করে; নানা বিপদে সত্যপথ প্রদর্শন করে। সুতরাং দার্শনিক চিন্তা এই উপযোগিতা-বোধ থেকেই শুরু হবে।

(ঘ) জ্ঞান-প্রীতি থেকে দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি

পশ্চিমদেশে দর্শনের প্রতিশব্দ 'ফিলসফি'। 'ফিলস্' ও 'সফিয়া'—এই দুটো গ্রীক শব্দ থেকে 'ফিলসফি' শব্দের উৎপত্তি হ'য়েছে। 'ফিলস্' শব্দের মানে হচ্ছে প্রেম বা প্রীতি। আর 'সফিয়া' মানে জ্ঞান। সুতরাং ফিলসফি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে—জ্ঞান-প্রীতি। প্রাচীন গ্রীসে 'সফিস্টস্' নামে একদল লোক ছিল। তারা সবার কাছেই নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করে বেড়াত। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস নিজেকে এদের থেকে আলাদা করবার জন্য নিজের পরিচয় দিতেন জ্ঞান-প্রেমিক রূপে। সেই থেকেই দার্শনিক জ্ঞান-প্রেমিক আর দর্শন জ্ঞান-প্রেম বা প্রীতি বলে পরিচিত হ'য়ে আসছে।

মানুষ বুদ্ধি নিয়ে জন্মেছে। তাই বিশ্বের সমস্ত রহস্য জান্‌বার আগ্রহ তার পক্ষে একান্তভাবেই স্বাভাবিক। জ্ঞান লাভ করবার এই আগ্রহশীলতাই মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে দিয়েছে। মানুষের মহত্ব, গাম্ভীর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এই আগ্রহশীলতার উপরই একান্তভাবে নির্ভর করে। পশু যে জগতে জন্মেছে তার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তার নাই। কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন মানুষের মনে সর্বদাই জাগছে। কেন এত জাগে?—এর একমাত্র উত্তর জিজ্ঞাসাই মানুষের স্বভাব। যেদিন জিজ্ঞাসা থাম্‌বে—সেদিন মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি মানুষের এই অনন্ত জিজ্ঞাসা থেকেই হ'য়েছে। প্রত্যেকেই নিজেকে ভালবাসে। নিজের স্বভাব প্রত্যেকেরই ভাল লাগে। জিজ্ঞাসা যেহেতু মানুষের স্বভাব, সুতরাং মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তার প্রেমিক হ'য়ে উঠে। জিজ্ঞাসা করে মানুষ আনন্দ পায়। সুতরাং দার্শনিক চিন্তা মানুষের অন্তরের আনন্দের ব্যাপার। যাকে আমি ভালবাসি, যাতে আমার আনন্দ হয়, তা জীবনের কোন্ ক্ষুদ্র প্রয়োজনে আস্‌বে—তা কখনও ভাবি না। দার্শনিক চিন্তাও জীবনের কোন কাজে আস্‌বে—তা ভাববার অবকাশও আমাদের নাই। চিন্তার আনন্দ আছে। চিন্তা না করলে ভাল লাগে না—এই ত যথেষ্ট। এই যে কানন-কুন্তলা সুন্দরী ধরণী আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে—এর উৎপত্তির ইতিহাস কি? ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মত এই নবজাত শিশুটির জন্ম হ'ল কেন? পাশের বাড়ীর সুগঠিত দেহ তরুণটির অকালমৃত্যুরই বা কারণ কি? মৃত্যুই কি জীবনের শেষ—না মৃত্যুর পরেও আর একটা জীবন আছে? আকাশের এত তারা, গাছের এত ফুল ও ফল, দিনের ঐ সূর্য আর রাত্রির নিদ্রাহীন চন্দ্রকে সৃষ্টি করলো কে? এ জাতীয় কত প্রশ্নই মনে আসে। স্মরণাতীত-কাল থেকে মানুষ এ সব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু চরম উত্তর আজও মেলেনি। মানুষ তাতে একটুও দুঃখিত নয়। এ সব প্রশ্ন সে বরাবরই করে—আর নিজের মত করে উত্তর দিয়ে আনন্দ পায়। বহু পুরাতন প্রশ্নের নূতন নূতন উত্তর বের করায় মধ্যেই মহা আনন্দ।

আনন্দ মানুষকে প্রেরণা দেয়। তাই আনন্দ পায় বলেই মানুষ দার্শনিক চিন্তা করে।

(ঙ) জাগতিক দুঃখ-দুর্গতি থেকে মুক্তি লাভের ইচ্ছা থেকে দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি

ভারতবর্ষে দার্শনিক চিন্তা প্রধানতঃ বিস্ময়, সংশয় বা উপযোগিতাবোধ থেকে জন্ম লাভ করেনি। এখানকার দার্শনিক-চিন্তার উৎপত্তির ইতিহাস একটু নূতন ধরনের। ভারতবর্ষের দার্শনিকেরা উপলব্ধি করেছেন—

'বড় দুঃখ, বড় ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দারিদ্র্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।'

এ সংসার এক মরুভূমি বিশেষ। এখানে জরা, মৃত্যু, ব্যাধি জীবনের সমস্ত আনন্দ-রস নিয়ত শুষে নিচ্ছে। 'এ যে কান্নাভরা, ঘেন্নাধরা পৃথিবী।' এখানে অসাম্য, অসন্তোষ, আশাভঙ্গ, অত্যাচার, অবিচার মানুষের জীবনকে নিয়ত বিষিয়ে তুলছে। এই দুঃখের সাগর পার হওয়ার উপায় খুঁজতে হবে। বুঝতে হবে—কেন এত দুঃখ। দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার চিন্তাই হবে আমাদের একমাত্র চিন্তা। তাই ভারতবর্ষের দার্শনিকেরা দুঃখের কারণ আর দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় বের করতে যথেষ্ট শক্তি ব্যয় করেছেন। ভারতবর্ষে দার্শনিক চিন্তা জাগতিক দুঃখ-দুর্গতি থেকে মুক্তিলাভের ইচ্ছা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দার্শনিকেরা বলেছেন—সত্য-দৃষ্টির অভাবই দুঃখের জন্য দায়ী আর সত্যদৃষ্টি-লাভ মুক্তির একমাত্র উপায়। তাই নিত্যকালের ভারতীয় দার্শনিকের প্রার্থনা—

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।

অসৎ থেকে আমাকে সতে নিয়ে চল, অন্ধকার থেকে নাও আলোতে, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃত-লোকে উত্তীর্ণ করে দাও। এই প্রার্থনার মধ্যেই ভারতীয় দর্শনের মর্মবাণী মর্মরিত হ'য়ে উঠেছে।

মহামিলন

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

সব কিছু হয় তাঁরি ইচ্ছায়
তাঁহারি শকতি দিয়ে
মাঝখানে শুধু জটলা পাকাই
আমরা 'আমা'রে নিয়ে।

তাঁর ইচ্ছার বিদ্যুৎ-ছটা
বুদ্ধির দর্পণে
আমারে যখন ফুটাইয়া তোলে,
আমি ভাবি বসে মনে
এ বুঝি আমারি জ্ঞানের আলোক,
আমারি চিন্তা, বল,
আমি বুঝি মোর চেতনাবিভায়
করিতেছি ঝলমল।

এইটুকু বোধ সবাকারে দিয়ে
সবার হৃদয়-কোণে
নিজেরে লুকায়ে মেলা দেখিতেছ
জীবনের সবখানে
কতদিনে তুমি ভাঙিবে এ ভুল
কোন মিলনের ক্ষণে
নিঃশেষে মোর সব কিছু লয়ে
মিশিব তোমার সনে?

উনবিংশ শতাব্দীর মানস-ভূমি

শ্রীপ্রণব ঘোষ, এম্-এ

ব্যক্তির জীবনের মতো জাতির জীবনেও শান্তির চাইতে সংঘাতের মূল্য কম নয়। নানা সংঘাতের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিচেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। তার জন্যে অনুকূল ও প্রতিকূল উভয়বিধ প্রভাবেরই প্রয়োজন। এই দ্বৈতশক্তির মধ্য দিয়ে যাত্রা করে মানুষ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য খুঁজে পায়। সেই বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতাসাধনেই তার সার্থকতা। জাতির জীবনেও অন্তর ও বাহিরের সংঘাতের প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষের অন্তরের সামঞ্জস্যের প্রয়োজনেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করে গীতার বাণী প্রচারিত হয়েছিল। আবার বহির্জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যের প্রয়োজনে গ্রীক সভ্যতা, ইসলাম সভ্যতা এবং ইংরেজ-মারফৎ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা এদেশে এসেছে। এই তিনটি সভ্যতাকেই ভারতীয় চেতনা ধীরে ধীরে আত্মগত করে যুগোপযোগী রূপান্তরকে স্বীকার করে নিয়েছে। বহির্জগৎ থেকে এই তিনটি সভ্যতার বাণী ভারতের অন্তর্জগতে প্রবেশ করেছে। কিন্তু ভারতসংস্কৃতির উদার গ্রহণশীলতা এদের মধ্যে মিলনের ঐক্যসূত্রটি আবিষ্কার করে নিয়ে আরো বিস্তৃত, আরো উদার হয়ে উঠেছে।

উনিশ শতকের ইতিহাস ভারতের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ পরিবর্তনের ইতিহাস। এবং সে ইতিহাসের পুরোধা ছিল বাংলার মনীষা। তাই আজকাল উনিশ শতকের বাংলাদেশ সম্বন্ধে মনীষীমহলে বিশেষ চর্চার আয়োজন দেখা দিয়েছে। আধুনিক বাঙালী তথা আধুনিক ভারতীয় সমাজ উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক জাগরণের উত্তরাধিকারী। এ জাগরণ নিশ্চিতভাবেই ইংরেজের সংস্পর্শে এবং সঙ্ঘর্ষে (অন্তরে বাহিরে) দেখা দিয়েছিল, আর এ আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল নবগঠিত মধ্যবিত্ত সমাজ। জাতির গণজীবনের সঙ্গে এ সমাজের যোগ ছিল কম। তাই কালক্রমে মধ্যবিত্তসমাজের ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই নবজাগরণের প্রভাবও স্তিমিত হয়ে এলো। আজ বিশ শতকের মধ্যভাগে এসেও গণজীবনের প্রাধান্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, মধ্যবিত্তসমাজেরও মূল্যবোধ বিপর্যস্ত। এমন যুগসন্ধির মুহূর্তে দ্বিখণ্ডিত বাংলার বেদনাহত চিত্ত যে স্বীয় প্রাণশক্তির উৎস সন্ধান করছে তার মধ্য দিয়েই জাতির জীবনীশক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দার 'উনবিংশ শতাব্দীর পথিক'* বইটিতে ভারতপথিক রামমোহন, বাংলা সমাজ-বিপ্লবে বিদ্যাসাগর; বিলাতে কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ, উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক পটভূমি—এই প্রবন্ধপঞ্চকের মধ্য দিয়ে মোটামুটি-ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর নবচেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এই আলোচনার সঙ্গে তাঁর 'বঙ্কিম-মানস' বইটি যোগ করলে উনিশ শতকের মানস-পটভূমি আর একটু সম্পূর্ণ হয়। অবশ্য ডিরোজিও এবং তাঁর ছাত্রমণ্ডলীর বিস্তৃত আলোচনা ছাড়া উনিশ শতকের পটভূমি কখনই সম্পূর্ণ হয় না। তাছাড়া, যে রবীন্দ্রনাথের সাধনার অনেকখানি উনিশ শতকের ফসল তাঁর সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা এ প্রসঙ্গে অবশ্য করণীয়। সে যাই হোক, লেখক নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে উনিশ শতকের মনীষীদের যে মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন, তা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। কারণ, এ শুধু তাঁর একার মতামত নয়। বাংলাদেশের শিক্ষিতসমাজের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ উনিশ শতকের নবজাগরণকে কোন্ দৃষ্টিতে

* 'উনবিংশ শতাব্দীর পথিক' ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দার; পরিবেশক—ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২; পৃষ্ঠা—১২০; মূল্য—তিন টাকা।

দেখে থাকেন, তার পরিচয় এ বইটিতে পাওয়া যাবে।

রামমোহন প্রসঙ্গের ভূমিকায় লেখক বলেছেন—"...বৃটিশ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত এই নতুন ভূম্যধিকারী শ্রেণী এবং ইংরেজ বণিকের দক্ষিণহস্ত ভাগ্যান্বেষী মধ্যবিত্তের দলই ভারতের নতুন জীবন ও সংস্কৃতির অগ্রদূত ও নির্মাতা। সুতরাং একদিক থেকে, এদের জীবন-ইতিহাস বৃটিশ ভারতের জীবন ও সংস্কৃতিরও ইতিহাস।" এই মধ্যবিত্ত সমাজ নেতাহিসাবে স্বদেশীয়দের মধ্যে রামমোহন রায়কেই সর্বপ্রথম লাভ করেছিল। লেখক 'ভারতপথিক রামমোহন' প্রবন্ধটিতে রামমোহনের যুগধর্মকে আত্মসাৎ করবার যে অসাধারণ শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন সেকথা অবশ্য স্বীকার্য। ইংরেজ-আগমনের ফলে যে পার্থিব কল্যাণের দ্বার ভারতবাসীর সামনে উন্মুক্ত হতে চলেছিল সে কথা রামমোহন যতখানি দূরদৃষ্টি নিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, সে যুগের ভারতীয় বা অভারতীয় অন্য কেউ অতখানি বুঝতে পারে নি। তাই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভারতবাসীকে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন অগ্রণী। কিন্তু হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান কোন ধর্মমতের ধারাকেই তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করেন নি। নানা শাস্ত্র মন্থন করে যে একেশ্বরবাদের যুক্তি তিনি গ্রহণ করেছিলেন তারই নিকষে এই ধর্মমতগুলির তিনি বিচার করেছেন এবং বেদান্তের পুনরালোচনার দ্বারা হিন্দুধর্মের সারভাগকে জগৎ-সমক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মূর্তিপূজাই যে হিন্দুধর্মের একমাত্র পরিচয় নয়, একথাটা সেদিন বিশ্ববাসীকে জানাবার প্রয়োজন ছিল, বেদান্ত যে আমাদের ধর্মচেতনার ভিত্তি একথা জানানোর প্রয়োজন ছিল স্বদেশবাসীকে। তাই মুণ্ডকোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—"An attentive perusal of this (Mundakopanishad) as well as the remaining books of the Vedanta will, I trust, convince every unprejudiced mind, that they, with great consistency, inculcate the unity of God; instructing men, at the same time,in the pure mode of adoring him in spirit. It will also appear evident that the Vedas, although they tolerate idolatry for those who are totally incapable of raising their minds to the contemplation of the invisible God of nature, yet repeatedly urge the relinquishment of the rites of idol worship, and the adaption of a pure system of religion, on the express ground that the observance of idolatrous rites can never be productive of eternal beautitude." এ মন্তব্যের শেষভাগের কথাগুলি আমাদের অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাসে অপ্রমাণিত। মনে রাখা প্রয়োজন যে, রামমোহনের অধ্যাত্মবিষয়ক বিতর্ক ও আলোচনা বুদ্ধিবাদী চেতনার ফল, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি থেকে সঞ্জাত নয়।

রামমোহনের একেশ্বরবাদ-মূলক সিদ্ধান্তের কারণ সম্বন্ধে লেখক বলছেন—"রাজা যে ধর্মমতে উপনীত হয়েছিলেন তা যে সেকালের সামাজিক পরিবেশে ব্যবহারিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা নিঃসন্দেহ। ...... মানুষের মানস-প্রকরণের বৈশিষ্ট্য এই, যতোই সে তার আপন সংকীর্ণ সীমা লঙ্ঘন করে, বহু জাতের বহু মানুষের সাহচর্যের মাধ্যমে সমস্ত মানুষের মধ্যে ক্রিয়াকর্ম, স্নেহ, মমতা, অনুভূতি ও হৃদয়বৃত্তির ঐক্য ও মিল অনুভব করে, ততোই সে বিরোধ উত্তীর্ণ হয়, ততোই সমগ্র মানবজাতির ও তাদের সৃষ্টিকর্তার

একত্বে সে নিঃসন্দেহ হয়। সমগ্র মানুষ যখন এক, তখন তাদের সৃষ্টিকর্তাও এক; অথবা সৃষ্টি-কর্তা এক ও অভিন্ন বলেই সমগ্র মানুষ এক—এমনি ধরনের চিন্তার উদ্ভব হয়।" রামমোহনের সময়ে বহু জাতির মিলন আবার নতুন করে অনুভব করা যাচ্ছিল—এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু উপনিষদের ঋষিবৃন্দ অধ্যাত্মসাধনার ফলস্বরূপ এই ঐক্যচিন্তা লাভ করেছিলেন। সর্বজীবে ব্রহ্মদর্শনকে তাঁরা অধ্যাত্ম-উপলব্ধির বিষয় বলে মনে করতেন। রামমোহনের মধ্যে তেমন কোন উপলব্ধি জাগে নি। তবে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত অভিনিবেশ-সহকারে পর্যালোচনা করে তিনি যে ঐক্যের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন, তার পিছনে হিন্দু, ইস্‌লাম ও খ্রীষ্টধর্মের পথিকদের মিলনচেতনাও কাজ করেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। অধ্যাত্ম-প্রশ্নের এই মৌলিক দিকটির সুসম্পূর্ণ উত্তর আমরা আমরা পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনার মধ্য দিয়ে লাভ করি। এই দিক থেকে রাজা রামমোহনে যে চিন্তার সূত্রপাত, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যে সে চিন্তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধিসঞ্জাত পূর্ণতা।

রামমোহন সম্বন্ধে লেখকের এই যথার্থ মন্তব্যটি স্মরণীয়—"…জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারেই হোক, যুগের অন্তর-প্রেরণাকে কে কতো বেশি আয়ত্ত করেছেন এবং কার কর্ম, চিন্তা ও আদর্শের মধ্য দিয়ে ইতিহাস আপনাকে সৃষ্টি করেছে," এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, "সেখানে রামমোহন সর্বাগ্রচারী।" রামমোহনের মধ্য দিয়েই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যসভ্যতার মিলনের সূচনা।

"বাংলা সমাজ-বিপ্লবে বিদ্যাসাগর" প্রবন্ধটিতে অরবিন্দবাবু সুন্দরভাবে তৎকালীন সমাজ-পরিবেশে বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। উনিশ শতকের অপরাপর মনীষীদের সম্বন্ধে নানা মত থাকলেও বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে প্রায় সব মুনিরই একমত। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বে কারু সংশয় নেই। কারণ, তাঁর সব কাজই মানুষকে অবলম্বন করে। আর উনিশ শতকের মূল সুরও ঐ মানবতাবাদ। বিদ্যাসাগরের জীবন-সাধনার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক বলছেন: "জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা কি, এর পরিণতি বা স্বরূপ কি, এসব সমস্যা সম্পর্কে তাত্ত্বিক বা দার্শনিক আলোচনা তিনি কখনও করেন নি এবং করার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেন নি। নিজস্ব কর্ম ও মনোভাবের গভীর সামাজিক মূল্য সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন কি না বলা কঠিন। তবে, তাঁর কর্ম যেমন নিঃসঙ্কোচ, দ্বিধাহীন, ও পৌরুষদৃপ্ত তাতে মনে হয়, বাস্তব মানুষের জীবনতীর্থে উপনীত হওয়াই যেন তাঁর আদর্শ। ……এ এক অপূর্ব জীবনবেদ, অবশ্যই ইউরোপের আশীর্বাদ-পাওয়া।"

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে এ দৃষ্টিভঙ্গীর যাথার্থ্য স্বীকার করে নিয়েই দু'একটি কথা বলা চলে। বিদ্যাসাগর ভারতবর্ষের প্রাচীন জীবনধারার ঐতিহ্যকে এক-দিকে বরাবর আঁকড়ে ধরেছিলেন—তা হলো জীবনযাত্রার সরলতা এবং সুপবিত্র অথচ সুকঠোর একনিষ্ঠা। এ দু'টিই ব্রাহ্মণ্যচেতনার দান। কর্মোদ্যমের ক্ষেত্রে তিনি যে য়ুরোপীয়দের তুল্য উদ্যম প্রকাশ করে গেছেন তার পিছনেও কি এই পুরুষপরম্পরাগত সত্যাশ্রয়ী দৃঢ়তা ছিল না? ("চারিত্রপূজা" বইটিতে রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে এই দিকটি আলোচনা করেছেন।) বিদ্যাসাগরের ধর্মমত সম্বন্ধে তাঁর ছোট ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের "বিদ্যাসাগর-জীবন-চরিত" বইটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ বইটি পড়লে এই সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক-ভাবে মনে আসে যে, বিদ্যাসাগর তখনকার দিনের কোন ধর্মান্দোলনের সঙ্গে জড়িত না থাকলেও ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। নাস্তিক ছিলেন না। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের নিজের বক্তব্য এই—"এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন তা বেশ বুঝি,

তবে ঐ পথে না চলিয়া এ পথে চলিলে, নিশ্চয় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, এ সকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও করি না। বাঙালীর জীবনে বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে বড়ো দান—তাঁর সমবেদনা-ভরা বিরাট হৃদয়, আর সেই হৃদয়ানুভবকে প্রত্যক্ষ কর্মে রূপান্তরিত করবার শক্তি।

"বিলাতে কেশবচন্দ্র" প্রবন্ধটিতে লেখক কেশবচন্দ্রের জীবনের একটি বিশেষ অংশের উপর জোর দিয়ে দেখিয়েছেন যে বিলাতে বাসকালে কেশবচন্দ্র ইংরেজের শুভবুদ্ধির উপরে আস্থা রেখেও কেমন নিশ্চিত অঙ্গুলি-সঙ্কেতে ইংরেজ-শাসনের ত্রুটিগুলি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এর মধ্য দিয়ে কেশবচন্দ্রের সমকালীন বাঙালী তথা ভারতীয়-মানসে স্বাধিকার-বোধের চেতনায় কতখানি বিকাশ ঘটেছে, সেকথা সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর পথিক হিসেবে কেশবচন্দ্রের এ পরিচয় নিতান্ত অসম্পূর্ণ। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বোম্বাইতে ধর্মসম্মেলন—বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে এই বৎসর ৺দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আয়োজিত নানাবিধ ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ ব্যতীত ১৩ই অক্টোবর সকল ধর্মের প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটি ধর্মসম্মেলনেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় সমবেত প্রতিনিধিমণ্ডলী ও শ্রোতৃবৃন্দকে অভ্যর্থনা করিলে বোম্বাই রাজ্যপাল ডক্টর হরেকৃষ্ণ মহতাব একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। বোম্বাইএর ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি জি খের ছিলেন সম্মেলনের মূল সভাপতি এবং প্রদেশ-কংগ্রেসের নায়ক শ্রী এস কে পাটিল প্রধান অতিথি। বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন রেভারেণ্ড ডক্টর এইচ সি মাস্কারহেন্হাস (খ্রীষ্টধর্ম), দস্তুরজী কুটার (জরথুষ্ট্র ধর্ম), মৌলানা এম্ এম্ কে শিহাব (ইসলাম), অধ্যাপক মাধবাচার্য (বৌদ্ধধর্ম), ডক্টর অমৃতলাল এস্ গোপানি (জৈনধর্ম) এবং অধ্যাপক নলিন এম্ ভট্ট (হিন্দুধর্ম)

লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র—লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের (ঠিকানা—68, Dukes Avenue, Muswell Hill, London, No. 10) ১৯৫৫ সালের সপ্তমবার্ষিকী কার্যবিবরণী আমরা পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে এই কেন্দ্রের কর্মব্যাপৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী ঘনানন্দজী প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবারে কিংসওয়ে হলে ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন এবং রবিবারে কেন্দ্রস্থ উপাসনাকক্ষে ধ্যান-শিক্ষাদান ও উপনিষদ্ আলোচনা করিয়াছেন। স্যর জন স্টুয়ার্ট ওয়ালেস্, মিঃ কেনেথ ওয়াকার, মিঃ নরম্যান মার্লো, শ্রী পি ডি মেহ্তা এবং শ্রী এস্ সামন্তও বক্তৃতা এবং ধর্মালোচনা পরিচালনায় সাহায্য করিয়াছেন। কয়েকটি তরুণদলের জন্য এবং য়িহুদী (Jewish) ও মেথডিস্ট (Methodist) সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

এই কেন্দ্রের 'Vedanta for East and West' নামক ইংরেজী ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি বহুল প্রচারিত হইয়া গত সেপ্টেম্বরে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। 'Women Saints of East and West'—(প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নারীসাধিকামালা) শিরোনামায় শ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষ-জন্মজয়ন্তীর স্মারক হিসাবে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আলোচ্যবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব, খ্রীষ্টের জন্ম ও পুনরভ্যুত্থান দিবস এবং বুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবতিথি সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হয়।

উদ্বোধন

শ্রীশ্রীসারদামণিদেবীস্তুতিঃ

ডক্টর-শ্রীযতীন্দ্রবিমলচৌধুরী-বিরচিতা

ভুবনবিমোহনে সারদামণে সারং দেহি জগদ্ধাত্রি।
বেলুড়স্থানে পুণ্যপ্রধানে চরণরেণুধনদাত্রি ॥১
গদাধরধর্ম- সুনিগূঢ়মর্ম পতিপূজনগ্রহীত্রী
লজ্জাবরণে প্রচ্ছন্নধনে পাপতাপশোকহর্ত্রি ॥২
কামারপুকুর- পূর্ণলীলাধর- চিরসাধনসঙ্গিনী।
ত্রেতাদ্বাপর- পূর্ণাবতার- "রাম" "কৃষ্ণ"-প্রপালিনী ॥৩
কামিনীকাঞ্চন- ত্যাগবরণ- সর্বশক্তি-প্রদায়িনী।
তেলোভেলোবন- দস্যুপ্রধান- দুহিতৃপদপ্রার্থিনী ॥৪
সারদানন্দ- বিবেকানন্দ- "আম্‌জাদ" সমদর্শিনী।
ধর্মমধ্যমণি- নিখিলপাবনী ত্রিভুবনজননী জননী ॥৫
ভারতমখিলং মাতৃপদবলং ত্বং হি মাতৃশিরোমণিঃ।
জগদম্বিকা জয়রামবাটিকা- দীন-গৃহ-প্রকাশিনী ॥৬
"গণয় স্বীয়ং বিশ্বং সর্বং" শেষবচঃপ্রচারিণী।
"প্রসূতিঃ সতাং তথা চাসতাং" সর্বসুতসংরক্ষিণী ॥৭
বরমাতৃপদে সুখদে বরদে যতের্নতিকোটী জননি!
বিশ্ববরেণ্যে স্মরণসুপুণ্যে জগদম্ব নারায়ণি ॥৮
মাতর্দিশি দিশি তবাশীরাশি বিতরতু ক্ষেমং বিধাত্রি!
যতীন্দ্রবিমলে তাপবিহ্বলে কৃপাং বর্ষয় বিশ্বধাত্রি!
যতীন্দ্রবিমলে মাতৃধনবলে পদং নিধেহি বিশ্বধাত্রি ॥৯

বঙ্গানুবাদ : ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী কৃত

বিশ্বমনোরঞ্জিনী সারদামণি, তুমিই সকলকে সার-পদার্থ, অথবা সত্যজ্ঞান দান কর, জগদ্ধাত্রি! তুমিই মহাপুণ্যময় বেলুড়মঠে চরণ-ধূলি দান ক'রে, সেই স্থানকে অপূর্ব সম্পদে বিভূষিত করেছিলে। ১॥

তুমিই শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মের মূলীভূত অর্থ, অথবা তত্ত্ব; তুমিই পতির পূজা গ্রহণ করেছ।[১] কিন্তু লজ্জাপটাবৃতা হয়ে তুমি তোমার এই অনুপম আধ্যাত্মিক সম্পদকে গোপন করে রেখেছিলে। তুমিই

১ ফলহারিণী কালী পূজার রাত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাতৃদেবীকে আদ্যাশক্তিরূপে পূজা নিবেদন করেন এবং তাঁরই শ্রীপাদপদ্মে জপমালা সহ তাঁর সমস্ত সাধন-ভজন বিসর্জন দেন। এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নেই।

আমাদের পাপ, তাপ ও শোক হরণ কর।২॥ তুমিই কামারপুকুরের পূর্ণলীলাময় দেবতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চিরকালের সাধন-সঙ্গিনী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ত্রেতাযুগের অবতার রাম এবং দ্বাপরযুগের অবতার কৃষ্ণের এক অপূর্ব সমন্বয়। তুমিই এই সমন্বিত পূর্ণাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পালয়িত্রী।৩॥ তুমিই তাঁকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগে সর্বশক্তি দান করেছিলে। তুমিই তেলোভেলো-বনের প্রধান দস্যুর কন্যা হতে চেয়েছিলে।৪॥

তুমিই শ্রীমৎস্বামী সারদানন্দ, শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দ ও আমজাদ্‌কে সমান দৃষ্টিতে দেখেছিলে।[২] তুমিই ধর্মের কেন্দ্রস্বরূপা, তুমিই বিশ্বের পবিত্রতাদায়িনী, তুমিই ত্রিভুবনজননী, তুমিই জননীস্বরূপা।৫॥

ভারতবর্ষ চিরকালই মাতার বলেই বলীয়ান। কিন্তু তুমিই সকল মাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠা মাতা। এইভাবে জগতের মাতা হয়েও, তুমি লীলাভরে জয়রামবাটিকায় এক দীন-দরিদ্র গৃহে আবির্ভূতা হয়েছিলে।৬॥ "জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ ; কেউ পর নয়,—জগৎ তোমার"—এই তোমার শেষ বাণী। তুমিই বলেছিলে "আমি সতেরও মা, আমি অসতেরও মা"—তুমিই সকল সন্তানকে রক্ষা কর।৭॥

সুখদায়িনি বরদায়িনি জননি! তোমারই বরেণ্য শ্রীপাদপদ্মে যতীন্দ্রের কোটি কোটি প্রণতি। তুমিই বিশ্ববরেণ্যা, তোমার স্মরণমাত্রই মহাপুণ্য ; তুমিই বিশ্বজননী নারায়ণি।৮॥

মাতঃ! তোমারই অজস্র আশীর্বাদ দিকে দিকে কল্যাণ বিতরণ করুক। তাপক্লিষ্ট যতীন্দ্রবিমলে কৃপাবারি বর্ষণ কর, বিশ্বধাত্রি! মাতৃসর্বস্ব যতীন্দ্রবিমলে শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন কর, বিশ্বধাত্রি।৯॥

২ মুসলমান রাজমিস্ত্রী আমজাদের সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর উক্তি—"শরৎ (সারদানন্দ) আমার যেমন ছেলে, আমজাদও আমার ঠিক তেমনই ছেলে।"

শ্যামা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

এক হাতে খড়্গ তব অন্যহাতে ধরি আছ তুমি,
বরাভয়, তুমি শ্যামা তুমি বঙ্গভূমি।
বাঙ্গালী তোমারে পূজিয়াছে
তোমারি মাঝারে তারা যুগে যুগে শক্তি খুঁজিয়াছে।
তুমি রামপ্রসাদের মাতা
বাঙ্গালীর বক্ষে বক্ষে তোমার আসন আছে পাতা।
তোমারে কমলাকান্ত করিয়াছে পূজা,
মামুলী পূজার মাঝে বৃথা তোমা খুঁজা।
ভক্তি বিনা হয়না মা শক্তি আরাধনা
শক্তি বিনা বৃথা সর্ব জাতীয় সাধনা।
ভক্তি যদি নাহি থাকে বৃথা তবে উৎসবের ঘটা,
বৃথা তবে বাদ্যভাণ্ড আলোকের ছটা।
রামপ্রসাদের মত মায়েরে আহ্বান যদি করো,
তার চেয়ে পূজা নাই বড়।

কথাপ্রসঙ্গে

বর্ষশেষ

খ্রীষ্টাব্দ ১৯৫৬ সাল শেষ হইতেছে, পৌষ-অন্তে উদ্বোধনেরও আর একটি বৎসর—এই পত্রিকার ৫৮তম বর্ষ আমরা পিছনে ফেলিয়া যাইতেছি। বর্ষশেষে সারা বৎসরের হিসাব-নিকাশের কথা মনে পড়ে, আগামী বৎসরের জন্ত নূতন সঙ্কল্প, নূতন আশা জাগ্রত হয়, নূতন শক্তি সঞ্চিত হয়।

মানব-প্রগতির পথ সরলরেখায় প্রসারিত নয়, উহা আঁকিয়া বাঁকিয়া, সম্মুখে ও পশ্চাতে আন্দোলিত হইতে হইতে চলে। ভ্রমপ্রমাদ এ পথের বাধা নয়, অগ্রগতির বলিষ্ঠ অবলম্বন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—মিথ্যা হইতে সত্যে নয়, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে মানবাত্মার অভিযান। অতএব বিগত বৎসরে আমাদের ভুলত্রুটির জন্ত আমরা আত্মধিক্কার দিব না, যে অন্ধকার দেখিয়াছি তাহাতে নিরুৎসাহ হইব না। মানবাত্মার চিরভাস্বর মহিমা মনে রাখিয়া উহার বিকাশের জন্ত আমরা অধিকতর যত্নশীল হইব। আমাদের সাধনা এখনকার সাধনা, এখানকার সাধনা। কবে কোন্ সুদূর আশমান হইতে কাহার ইচ্ছায় কোন্ স্বর্ণযুগ নামিয়া আসিবে সেই অলস আশা আমাদের নয়। শ্রীভগবান আমাদের শুনাইয়াছেন—"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ" (গীতা—৬।৫)। আমরা নিজেরাই নিজদিগকে উদ্ধার করিব, কোন বিপর্যয় কোন দ্বন্দ্বসংঘাতেই অবসন্ন হইব না। জানি—যদি আমাদের আগ্রহের মধ্যে কোন ফাঁকি না থাকে তাহা হইলে আমাদের অন্তরশায়ী ভগবান আমাদিগকে শক্তি দিবেন, আমাদিগের লক্ষ্যে পৌঁছিবার বাধা একে একে দূর করিয়া দিবেন।

আমাদের ব্যাপৃতি প্রধানতঃ মানুষকে লইয়া। পরিবার বল, সমাজ বল, রাষ্ট্র বল আখেরে মানুষই তো সব কিছুর মূলে। মানুষ যদি খাঁটি হয়, সবল হয় তাহা হইলে ঐগুলিও স্বচ্ছ থাকে, শক্তিশালী থাকে। অতএব আমরা ডাক দিতে চাই মানুষকে। অবাস্তব অসম্ভব কল্প্য লোকের দাবি তাহার উপর আমরা চাপাইব না। শুধু বলিব—মানুষ তুমি পবিত্র হও, ঈশ্বরবিশ্বাসী হও, মানুষকে ভালবাসিতে শিখ, সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে বিসর্জন দিয়া বৃহৎ মানবসেবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত কর। ইহারই নাম তো ধর্ম। মানুষ তুমি ধার্মিক হও।

শ্রীমা সারদাদেবী

শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী শ্রীমা সারদাদেবীর ১০৪তম পুণ্য জন্মতিথি—অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী এই বৎসর পড়িয়াছে ৮ই পৌষ, রবিবারে (২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৫৬)। বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ এবং অন্তান্ত শাখাকেন্দ্রে উহা যথারীতি অনুষ্ঠিত হইবে। যুগপৎ যিনি ছিলেন মানবী ও দেবতা, যাঁহার শুদ্ধ দেহমনের আধারে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মহামাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন আবার শ্রীরামকৃষ্ণের যুগব্রত সাধনে যিনি তাঁহাকে দিব্যপ্রেরণা দিয়া গৌরবান্বিতা—সেই মহিমময়ীর উদ্দেশ্যে আমাদের সহস্র প্রণাম। তাঁহার নিষ্কলুষ চরিত্রসুষমা এই সুখদুঃখ-স্বার্থ-সংঘাতময় পৃথিবীতে আমাদের জীবনে লইয়া আসুক স্নিগ্ধ পবিত্রতা, অটুট ধৈর্য ও ক্ষমা, নির্ভীকতা, সহানুভূতি এবং সর্বোপরি শ্রীভগবানে অনন্ত বিশ্বাস ও ভালবাসা। জয় মহামায়ীকী জয়!

মহাপুরুষ-স্মরণে

এই পৌষে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দুই জন মহাপুরুষের জন্মদিন উপলক্ষ্যে আমরা তাঁহাদের জ্ঞান-বৈরাগ্য-প্রেম-সেবাময় জীবনের অনুধ্যান করিয়া ধন্ত হইব। ১২ই পৌষ, বৃহস্পতিবার (২৭।১২।৫৬) এবং ২৩শে পৌষ, সোমবার (৭।১।৫৭) যথাক্রমে পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী (মহাপুরুষ মহারাজ) এবং স্বামী সারদানন্দজীর

(শরৎ মহারাজ) শুভ জন্মতিথি। মহাপুরুষ মহারাজ খ্রীঃ ১৯২২ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত দ্বাদশ বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সংখ্যায় আমরা তাঁহার দুইটি স্বলিখিত পত্র প্রকাশিত করিলাম। পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর (১৯০১-১৯২৭) সঙ্ঘের সম্পাদকের গুরু দায়িত্ব বহন করিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষদ্বয়ের অনবদ্য চরিত্র আমাদিগের নিকট আধ্যাত্মিক সাধনা ও নিষ্কাম কর্মে বিপুল প্রেরণা উপস্থাপিত করে।

স্বাগত

ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ২৫০০তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে ভারতে এক বৎসর ধরিয়া যে উৎসবাদি চলিতেছে তাহার অন্তিম অনুষ্ঠানসমূহ আরম্ভ হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে পৃথিবীর নানা দেশ হইতে বৌদ্ধ প্রতিনিধিগণ তথাগতের জন্মভূমি সন্দর্শন করিতে আসিয়াছেন। এই সকল বৌদ্ধ ভ্রাতা ও ভগিনীগণকে—বিশেষতঃ, তিব্বতের মহামান্য অতিথিদ্বয়—দালাই লামা ও পাঞ্চেন লামাকে আমরা স্বাগত অভিনন্দন জানাইতেছি।

খেলাঘর

অনিরুদ্ধ

ভাঙে ঘর ভাঙে খেলাঘর
ভরে দিক ধুলায় ধুলায়;
মূক ব্যথা জমে হৃদি 'পর
ধুলা! তবু নয়ন ভুলায়।

জানি—আর পিছে চাওয়া নয়
গেছে মিটে হিসাব-নিকাশ;
জানি—বৃথা স্মৃতির সঞ্চয়
তবু কেন নিভৃত নিশ্বাস?

মিছা যদি ক্রীড়ার অঙ্গন
কান্না যদি শুধুইরে ছায়া—
কাল যদি অখিল-হরণ
সব শেষে কেন তবে মায়া?

নাই নাই ওরে শেষ নাই
ভাঙা শুধু মনের বিভ্রম;
যাহা খেলা রয়েছে তাহাই
চিরসত্য কামনা পরম।

সে কামনা অতীতেরে টানে
রাখে ধরি' অসীমের বুকে;
সুখ দুখ এক বলি মানে
লাভক্ষতি একক্ষণে চুকে।

রচিল সে কী বিপুল গেহ!
খেলিছে যে সনাতন খেলা;
খেলাঘর লাগি তাই স্নেহ
ফুরায় না খেলিবার বেলা।

মায়ের প্রকাশ

শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্তী

'লজ্জাপটাবৃতা' চিরঅবগুণ্ঠনবতী মা— তোমার মানবদেহধারণের শতবর্ষজয়ন্তী-উৎসবমুখে তোমার ঘোমটা খুলিয়াছ। স্বয়ং ব্রহ্মময়ী তুমি। আবার স্বয়ং ব্রহ্মকর্তৃক সমপূজিতা—মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিতা তুমি,—তোমার স্থূলদেহে আবির্ভাব এবং বিদ্যমান থাকাকালীন বিরল ভাগ্যবান ভাগ্যবতী তোমার ছেলেমেয়েরা ছাড়া আর তেমন কেহ শ্রীমুখারবিন্দ দর্শনের এবং তোমার রাতুল চরণযুগল দর্শন-স্পর্শনের সুযোগ লাভ করে নাই। কিন্তু আজ? দেখিতেছি দিকে দিকে অভূতপূর্ব জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—যদিও ব্রহ্মশক্তির নর-নারীদেহে আবির্ভূত-আবির্ভূতা হইবার সময় হইতেই এই জাগরণের পালা আরম্ভ। স্বয়ং ঠাকুরের নর-দেহাবলম্বনে প্রকটিত 'ভাবৈশ্বর্য' অন্যাধিক প্রকাশিত

হইলেও তুমি স্বয়ং মহাশক্তি 'সুগুপ্তা' না থাকিলেও, 'গুপ্তা' ছিলে, আজ, মা তুমি 'ব্যক্তা'—সুব্যক্তা হইয়া চলিয়াছ।

সর্ব চেতনার সারভূতা সর্বচেতনাসমাহৃতা তুমি —"যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভীধীয়তে" আজ "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"—চৌদ্দ পোয়া দেহাবলম্বনে প্রকটিতা তুমি বিশ্বব্যাপ্তা হইয়া চলিয়াছ—তোমার কৃপাবলে জীবের নূতনদৃষ্টি ভঙ্গীতে। 'বুদ্ধিরূপেণ', 'শান্তিরূপেণ' প্রভৃতি শতরূপে তো তুমি আছই, এখন 'মাতৃরূপেণ' যুগ প্রয়োজনে তুমি আসিয়াছ—বিশেষ ভাবে। জীবের রুদ্ধদৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে। বিকৃতদৃষ্টি সৃষ্টিপ্রপঞ্চ হইতে অপসারিত হইতেছে। মানুষ দিব্য দৃষ্টি, খাঁটি দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতেছে। যাহা দেখে নাই তাহা দেখিতেছে। যাহা ভুল দেখিত তাহা ঠিক দেখিতেছে।

ধূলার ধরণীতে তুমি আসিয়াছ এবং আছ, থাকিবেও আরো বহুকাল। তুমি যাহাকে যেমন দেখিবার শক্তি দিয়াছ সে তেমন দেখিতেছে—আর প্রচারের ধুম লাগিয়াছে। কেহ দেখিতেছে—ঠাকুর ও তুমি অভিন্ন! বহির্দৃষ্টিতে খোলসে মাত্র তফাৎ! পৃথক করিয়া ঠাকুরকে কেহ বলিতেছে পরমপুরুষ, তোমাকে বলিতেছে—পরমা প্রকৃতি। কেহ দেখিতেছে তুমি সাক্ষাৎ জগদম্বা, আদ্যাশক্তি। কেহ দেখিতেছে একান্ত গ্রাম্য বলিয়া গ্রাম্য কুলবধূ—আকারে-প্রকারে চাল-চলনে। যে যাহা দেখিতেছে —ঠিকই দেখিতেছে, তবে তারও ঊর্ধ্বে আরও দেখিবার কত কি! "কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে।"

কেহ বা আফশোষ করিতেছে তুমি শ্রীচৈতন্য-লীলায় উপেক্ষিতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া! তদীয় পার্ষদগণ, ভক্তগণ, ভাবধারাপ্রচারকগণ প্রিয়াজীর প্রতি নাকি অবিচার করিয়া গিয়াছেন। তবে এই সারদা-জীবনালোকে যদি আমরা প্রিয়াজীকে দেখি—আফশোষের কি আছে? সতী-সীতা, রাধা, প্রিয়াজী ইঁহাদের নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিবার আলোক আজ পাওয়া গিয়াছে। যুগনায়ক ও যুগনায়িকারা কি বস্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবনালোকে তাহা আমরা দেখিতেছি। তখন যাহা হয় নাই, এখন হইতেছে। "যখন যেমন তখন তেমন।" যুগ-প্রয়োজন মূল কথা।

তবে ইহাও দেখিতেছি, মা, তোমাকে নিয়া যেন একটা আড়ম্বরও চলিতেছে। এখনই! পরের কথা সহজেই অনুমেয়। প্রচারের আবরণে প্রসার-প্রতিপত্তির ব্যবসাও চলিতেছে। চিত্র-জগতেও তোমরা দুজন পৃথক বা একত্র পার্ষদগণ সহ অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয়ে প্রকটিত প্রকটিতা হইতেছ। কতকিছু লেখা দেখা যাইতেছে, কোথাও কোথাও 'এক গোয়াল গরু' না হইয়া 'এক গোয়াল ঘোড়া'ও হইতেছে! মনে রাখা উচিত স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ পার্ষদগণ পর্যন্ত মায়ের সম্বন্ধে লিখিতে, বলিতে ভীত সন্ত্রস্ত হইতেন। "মহাশক্তি! মহাশক্তি" বলিতে বলিতে তাঁহারা নীরব হইতেন।

তবে কি—আজিকার এসকল ধৃষ্টতা হইতেছে? জিজ্ঞাসা সমীচীন। না—ধৃষ্টতা হইবে কেন? বলিয়াছি তো—"মা, তুমি ঘোমটা খুলিয়াছ।" আর আমাদের সান্ত্বনা—এও তাঁরই ইচ্ছা। অনেকের অবিশুদ্ধ দেহমন শুচি শুদ্ধ পবিত্র হইয়া উঠিতে পারে এ সকল অভিনয় বা রূপকের সহায়েও। অতিরঞ্জন ও সত্যগোপন প্রচেষ্টাদির মধ্যেও দুইদশজন লেখক-পাঠক-বক্তা-শ্রোতার খাঁটি বস্তুর স্পর্শ লাভ হইতে পারে। শক্তিপূত ভাব ও ভাববাহক নাম তো পৌঁছিতেছে—শত সহস্রের কানে, কোনও কোনও ভাগ্যবান ভাগ্যবতীর প্রাণেও পৌঁছিবে, জীবন ধন্য হইয়া যাইবে। অবশ্য 'নাচিয়া গাহিয়া' অনেকে 'কুজন' বলে, আর অনেকে 'রৌরবে' যায়—যার যেমন অদৃষ্ট।

আর আমাদের কথা—অত শত দেখা বুঝা

ভাবা চিন্তার প্রয়োজনই বা কি? আমরা জানি, বুঝি :—

"মা এসেছে মোদের কি আর ভাবনা ভাই?
দুখের বোঝা দূরে ফেলে আর সকলে নাচি গাই।"

উপসংহারে আর একটি কথা। অভিনয়ের কথার আভাস দিয়াছি। অভিনয় ত অভিনয়, সকলেই জানে কিন্তু স্বয়ং ঠাকুর ও মায়ের নূতন সংস্করণের আবির্ভাবও আরম্ভ হইয়াছে। এদিকে একটুখানি হুঁশিয়ার থাকা আমাদের কল্যাণপ্রদ। খাঁটি অবতার আর মেকী অবতার।

"Beware of false prophets!" (Christ)

"সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল।"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত) ইত্যাদি সতর্ক বাণী আমাদের জন্য রহিয়াছে।

'কপালমোচন'—এ আর যখন তখন যত্র তত্র হয় না। এবার জীবের বহুভাগ্যে 'কপালমোচন' অবতরণ করিয়াছেন। হাজার বছরের অন্ধকার ঘর এক দেশলাই কাঠিতে আলোকিত হইয়া গিয়াছে। মধ্যাহ্ন দিবালোকে জগৎ সমুদ্ভাসিত হইয়া চলিয়াছে। চক্ষুষ্মান দেখিতেছে, লণ্ঠন নিয়া খোঁজাখুঁজির দুর্ভাগ্য কি তবুও আমাদের যাইবে না?

দেবতা

শ্রীঅটলচন্দ্র দাশ

দেবতা খুঁজি না মঠে মন্দিরে ধেয়ানে তপস্যায়,
পেয়েছি তাহারে মোর কুঁড়েঘরে ধরণীর এ' ধুলায়।
মোর পরিবারে পরিজন হ'য়ে সেই যে গো সেবা মাগে,
রোগে দুখে অনাহারে জাগরণে মোর লাগি' নিতি
জাগে।
ভিখারীর বেশে মোর ঘরে এসে সেই চেয়ে যায় ভিখ,
রূপ দেখাইতে বধূ হ'য়ে পরে কপালে সিঁদুর-টিপ।
ষড়ৈশ্বর্যে ভরে দিয়ে গেলো এই চারু সংসার,
প্রেম প্রীতি স্নেহ ভালবাসা দিল কত রূপে অনিবার।
বিরহ বিষাদ ঈর্ষা দ্বন্দ্ব তাহারই আশীর্বাদে—
ঝরে অবিরাম এ' জীবন ঘিরি' কত বিচিত্র ছাঁদে।
প্রলোভন-ত্রুটি পতনচ্যুতিতে ভরি' সৃজনের পথ,
সেই তো দেখালো কোথায় রয়েছে সংযম-মনোরথ!
তনয় জায়ায় অনুজে জনকে জননীর সাজে রাজি'
অনুদিন সে যে মোর পাশে ফিরে চাহিয়া
অর্ঘ্যসাজি।
দৈন্য দুঃখ অপমান ঘৃণা তপশ্চর্যা বরি'
পরিবার প্রতিপালনেতে পূজা প্রতিক্ষণ আমি করি।
জাগ্রত দেবে অবহেলা করি' পাষাণ-প্রতিমা-মূলে,
বিশ্বপ্রাণীর বেদী হ'তে দূরে শূন্য আঁধার কূলে—
অলস মৃতের বন্ধ নয়নে ওঠে যেই কালো ছায়া,
সে নহে ঠাকুর—মিথ্যা স্বপন, সে যে মরণের মায়া।

মহাপুরুষ মহারাজের পত্র

(জনৈক ব্রহ্মচারীকে লিখিত)

(১)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা

"Aspect Lodge",
Spring field P. O.
Nilgiris (Madras) 17. 5. 24

শ্রীমান—

তোমার পত্র মাদ্রাজ হইয়া এখানে আসিয়াছে। * * * আমি —র জন্য খুব চিন্তিত রহিয়াছি এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তাঁর মঙ্গলের জন্য সর্বদা প্রার্থনা করিতেছি। তাঁর রোগের যন্ত্রণা তুমি যেরূপ লিখিয়াছ তাহা পড়িয়া কষ্টবোধ হয়, অবশ্য শরীর-ধারণ যিনিই করিয়াছেন তাঁহাকেই কম আর বেশী কষ্ট পাইতে হয়। প্রভুর স্মরণ মনন তিনি যতটুকু পারেন করুন। তোমরা যথাসম্ভব তাঁর সেবা করিতেছ শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। * * * প্রভু তাঁর মঙ্গলই করিবেন। সু—র জন্য বড়ই দুঃখ হয়, বেচারা একে চক্ষু নিয়ে নিজেই ব্যতিব্যস্ত

তাঁর উপর আবার এই বিপদ। প্রভু দীনদয়াল ভক্তরক্ষক ভক্তপ্রতিপালক, তিনি উহাদের নিশ্চয় মঙ্গল করিবেন। সু—অতি ভাল ছেলে, প্রভু তার মঙ্গল করুন—সতত প্রার্থনা করি। *** আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। *** এই নীলগিরি পর্বত অতি রমণীয় এবং শীতল, স্থান অতি স্বাস্থ্যকর। হাওয়া খুব চমৎকার। ২।১ মাইল দু'বেলাই একটু একটু বেড়াচ্ছি। প্রভুর কৃপায় ভাল আছি। জুন মাস পর্যন্ত এখানে থাকিবার ইচ্ছা, পরে Bangalore যাওয়ার কল্পনা, এখন প্রভু যা করেন। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—তোমরা নিঃস্বার্থ মহা উচ্চকর্ম করিতেছ, প্রভু তোমাদের বিশ্বাসভক্তি অচল অটল করিয়া দিন, তোমরা ধর্মজীবনে উন্নত হও।

(২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা

Godavari House
Ootacamund, S. India
26. 8. 26

শ্রীমান—

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তোমার মার পীড়া ক্রমেই বাড়িতেছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। মার কঠিন পীড়িতাবস্থায় ছেলের তাঁকে দেখিতে যাওয়া সঙ্গত বা অসঙ্গত তাহা ছেলের হৃদয় বুঝিতে পারে, তাহা আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হয় না। তবে যদি তোমার তাঁর সেবাশুশ্রূষা করিবার একান্ত দরকার হয় অর্থাৎ আর যদি কেহ তাঁর সেবা করিবার সে রকম লোক না থাকে এবং সেবার অভাবে তাঁর শরীর শীঘ্র ত্যাগ হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে পুত্রের একান্ত কর্তব্য তাহা করা। তোমার অন্য ভাইবোন তো আছে? তা নইলে শুধু শুধু বাড়ী গিয়ে 'আহা মার বড় অসুখ, কি হবে' ইত্যাদি করতে যাওয়ায় লাভ কি? তুমি ডাক্তার নও যে রোগের কোনরূপ উপশম করতে পারবে।

ঠাকুর ভক্তের প্রাণের প্রার্থনা নিশ্চয় শুনেন ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস। প্রার্থনার বিশেষ ফল এই যে ঠাকুর আমাদের হৃদয়ে আছেন এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়, ক্রমে ক্রমে তাঁর Existence (অস্তিত্ব) হৃদয়ে feel (অনুভব) করা যায় স্পষ্টরূপে—ইহা অপেক্ষা আর অধিক লাভ কি আছে? সুতরাং প্রার্থনা খুব করিবে। ব্যাকুলতা তাঁর কৃপায় অধিক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন যে তোমার তাহা নাই তা নয়, তবে যা আছে তুমি তাহা অপেক্ষা আরও অধিক চাও, তা হবে তাঁর কৃপায়। তিনি অহেতুক দয়াল ঠাকুর, দয়া করবার জন্যই তাঁর নবরূপ ধরে ভূতলে আসা—এবং জীবকে এইসব বিশ্বাসের কথা বলবার জন্যই এখনও আমাদের জগতে রেখেছেন তাই তোমাকে এসব বলছি। আমি আন্তরিক আশীর্বাদ করি, তুমি ঠাকুর ছাড়া যেন জীবনে আর কিছু না চাও, না জান। তুমি, সু—, শৈ— প্রভৃতি সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ***

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের কথা

স্বামী সিদ্ধানন্দ

কাশী হইতে জনৈক ভক্ত কলিকাতা আসিলে পূজনীয় লাটু মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের জন্য কাশীর বেগুন ও পেয়ারা দিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীমাকে জানাইতে বলিয়াছিলেন, "আমার সেই দক্ষিণেশ্বরের মা।" মা একটু মুচকি হাসিয়াছিলেন। মা একবার নিজমুখে বলিয়াছিলেন, একমাত্র লাটু

ছাড়া আমার কাছে আসিবার আর কারও আদেশ ছিল না। লাটু কি কম গা? লাটুর সেবা কর। তার কাছে তুমি থাক, তোমার কল্যাণ হবে।

অনেকের ধারণা পূজনীয় লাটু মহারাজ স্ত্রী-লোকদের ঘৃণা করিতেন। ইহা ঠিক নয়। তিনি ভক্তিমতী স্ত্রীলোকদের সেবা লইতেন কিন্তু কাহাকেও প্রায়ই পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে দিতেন না। স্ত্রীলোকদের বলিতেন, কাশীতে বেশী ঘোরাঘুরি করিও না। স্বামীকে প্রাণভরে সেবা করবে। স্ত্রীলোকের স্বামীই দেবতা। স্বামীকে ভগবৎজ্ঞানে প্রাণভরে সেবা করলে কল্যাণ হবে।

পূজনীয় লাটু মহারাজ গুরুভক্তির উপর বড় জোর দিতেন। ভগিনী নিবেদিতার গুরুভক্তির কথা খুব বলিতেন। কাশ্মীর যাওয়াকালীন স্বামীজী ঘোড়া থেকে নাবছেন আর নিবেদিতা জুতার ফিতা খুলে দিচ্ছেন। লাটু মহারাজ প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন—"গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্।" বলিতেন,—গুরুর কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়, গুরুর সঙ্গ না করলে গুরুর মহিমা বুঝা যায় না। তবে ইহাও বলিতেন যে, সব সময়ে গুরু শিষ্যে একসঙ্গে থাকা ঠিক নয় কারণ, গুরু রাগ করিতেছেন, সাধারণ লোকের ন্যায় দেহযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন এই সব দেখিয়া সংশয় আসিতে পারে। গুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধি করিতে নাই। ভগবান মনে করিতে হইবে।

কাশীতে রোজ শিবদর্শন ও গঙ্গাস্নান করিতে বলিতেন। বলিতেন, আমার খুব ইচ্ছা হয় রোজ দর্শন করি কিন্তু শরীরের জন্য পারি না। তোমরা আমার নকল করিও না। বৈশাখ মাসে মহারাজ রোজ গঙ্গাস্নান, বেলপাতায় রামনাম লিখিয়া ফল মিষ্টি লইয়া বিশ্বনাথ দর্শনে যাইতেন। অন্নপূর্ণা বাড়ীতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কিছুক্ষণ জপ করিতেন।

গয়ায় পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধের কথায় খুব জোর দিতেন। স্বামীজীর শিষ্য শরৎ চক্রবর্তী গয়ার পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন। তাঁকে চিঠি লিখে ভক্তদের শ্রাদ্ধাদি করাইয়া দিতে অনুরোধ করিতেন। ইহাও লিখিতেন,—ভক্তটিকে যত্ন করিবে, ইহাতে তোমার কল্যাণ হবে।

সাধুদের নির্ভরতা সম্বন্ধে খুব জোর দিতেন। বলিতেন,—নিঃসঙ্গ, নিরালম্ব না হলে তাঁহার উপর নির্ভর করা যায় না। তাঁর উপর নির্ভর করলে তিনি সব সুবিধা করে দেন। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে নাই। সাধুরা ভাবে, কোথায় থাকব, কোথায় খাব। এই সব দুর্বলতা। সাধুদের নির্জন স্থান দেখে তপস্যায় লাগা উচিত বলিতেন।

যে কোন সম্প্রদায়ের সাধু শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের নিকট মাঝে মাঝে ভিক্ষার জন্য আসিতেন, তিনি কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। জনৈক দণ্ডী সন্ন্যাসী (নাম স্বামী মাধবানন্দ) লাটু মহারাজের কাছে আসিতেন ও ভিক্ষা করিতেন। হঠাৎ একদিন সাধুটি ভিক্ষার জন্য দেরিতে আসায় লাটু মহারাজের সেবক তাঁহাকে বলিল যে, রান্না হইয়া গিয়াছে, এখন আর ভিক্ষা হবে না। লাটু মহারাজ শুনিয়া তখনই বলিলেন,—সেকি! আবার ভাত রান্না কর। সাধুজীকে বলিয়া দিলেন, যে দিন ভিক্ষা করিবে সে দিন সকালে আসিয়া বলিয়া যাইবে তাহা হইলে আর কোন গোল হইবে না। মহারাজ উভয়কেই সামঞ্জস্য করিয়া দিলেন যাহাতে কাহারই কোন অসুবিধা না হ‍। ঐ দণ্ডী সাধুটির লাটু মহারাজের প্রতি খুবই শ্রদ্ধা ছিল।

জনৈক ভক্ত মহিলাকে বলিয়াছিলেন শুধু গঙ্গা-স্নান করে কি হবে, ভিখারীকে কিছু দিতে হয়। রোজ পয়সা না দিতে পার, এক মুঠো করে চাল দিও। ভক্ত মহিলাটি মহারাজের আদেশ প্রতি-পালন করিয়াছিলেন।

পূজনীয় লাটু মহারাজ আশ্রিতবৎসল ছিলেন, যাহাকে আশ্রয় দিতেন কোন অন্যায় কাজ করিলেও তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিতেন না। জনৈক ব্রহ্মচারী অদ্বৈত আশ্রমে ছিল, কোন কারণে মহাপুরুষ মহারাজ তাহাকে চলিয়া যাইতে বলেন। তখন শীতকাল। কোথাও আশ্রয় না পাইয়া সে লাটু মহারাজের শ্রীচরণে আসিয়া পড়িল। মহারাজ তাহাকে আশ্রয় দিলেন।

মায়ের স্মৃতি

(এক)

শ্রীসুশীলকুমার সরকার

আজ মনে পড়িতেছে ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালনের কথা। ইহার প্রায় এক বৎসর পূর্ব হইতে কাজ করি ই, আই, রেলওয়ের হেড্ অফিসে। ১৯০৫ সালের বাসন্তী অষ্টমীর দিন মায়ের কৃপালাভ করিয়াছিলাম। মা তখন কলিকাতার বাগবাজার ষ্ট্রীটের একটি ভাড়া বাড়ীতে থাকিতেন। কলিকাতায় তাঁহার সহিত বিশেষ কথাবার্তা বলার সুবিধা হইত না। মনে বড় কষ্টবোধ করিতাম। গুরুভ্রাতাদের ও বন্ধু-সন্ন্যাসীদের কাহাকেও কাহাকেও মনের এই আক্ষেপের বিষয় জানাইলাম। তাঁহারা বলিলেন, মা যখন জয়রামবাটীতে থাকিবেন সেখানে জো সো করিয়া একবার যাইবেন, সেখানে গিয়া দেখিবেন, তিনি যেন অন্য এক মা অর্থাৎ মা কলিকাতায় যেন শ্বশুরবাড়ীতে আসার মত থাকিতেন—বধূর মত, আর জয়রামবাটীতে তাঁহার বাপ-মার বাড়ীতে যখন থাকিতেন, তখন ঠিক ঘরের মেয়ের মত। সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম।

১৯০৭ সালে বড়দিনের পূর্বে মা জয়রামবাটীতেই আছেন; আমিও বড়দিনের সময় ৮।৯ দিনের জন্য অফিসে ছুটি পাইব। সংকল্প করিলাম এ সুযোগ ছাড়া হইবে না। কয়েকজন বন্ধুর নিকট প্রস্তাব করায় তাঁহারাও আমার সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সে সময় প্রায় প্রত্যহই অফিসের পর মাষ্টারমহাশয়ের (শ্রীম) নিকট যাইতাম। মাষ্টার-মহাশয়ের নিকট এই শুভসংকল্প জানাইতে তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়া নিরতিশয় উৎসাহ প্রদান করিলেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজও শুনিয়া খুব উৎসাহ দিলেন। রওনা হইবার পূর্বে তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যাইতে বলিলেন। আরও বলিলেন, তোমরা জয়রামবাটীতে এবার মায়ের জন্মতিথি পালন করবে। শুনিয়া আমি একটু বিপন্ন বোধ করিলাম, কেননা এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। পূজনীয় মাষ্টার-মহাশয়কে জানাইতে তিনি বলিলেন,—ও সব আপনাদের ভাবতে হবে না, মা-ই সব করিয়ে নেবেন।

২৪শে সকালের গাড়ীতে আমাদের যাত্রা করিবার দিন। ২৩শে অফিসের পর পূজনীয় শরৎ মহারাজের সহিত দেখা করিলাম। তিনি ফল, ময়দা, মিষ্টি, কপি ও একখানা কাপড় গুছাইয়া রাখিয়াছিলেন ও দশটি টাকাও দিলেন। মেসে ফিরিয়া দেখি পূজনীয় মাষ্টার মহাশয় আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনিও উৎসবের ব্যয়ের জন্য দশ টাকা আমার হাতে দিলেন। আমি ও তিন বন্ধু (প্রবোধচন্দ্র দে, মণীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশচন্দ্র মিত্র; মণীন্দ্রবাবুর বাড়ী আরামবাগ) ২৪শে সকালে হাওড়া স্টেশন হইতে তারকেশ্বরের গাড়ী লইলাম। কয়েকঘণ্টার মধ্যে তারকেশ্বর পৌছিলাম এবং বাবা তারকনাথকে দর্শনাদি করিয়া পদব্রজে রওনা হইলাম। পথে নৌকাযোগে একটি নদী পার হইতে হইল। মায়ের জীবনের সহিত বিশেষভাবে জড়িত বিখ্যাত তেলোভেলোর মাঠ পার হইয়া আমরা যখন আরামবাগে মণীন্দ্রবাবুর বাড়ীতে পৌছিলাম তখন রাত্রি প্রায় আটটা।

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া আমরা জয়রামবাটী অভিমুখে রওনা হইলাম। কামারপুকুর পৌছিলাম বেলা প্রায় নয়টায়। ঠাকুরের বাড়ীতে প্রণামাদি করিয়া জয়রামবাটী পৌছিতে সাড়ে দশটা বাজিল। জয়রামবাটী গ্রামে প্রবেশ করিতেই প্রবোধবাবু গান ধরিলেন—

"কোলের ছেলে ধুলো ঝেড়ে নে কোলে তুলে,
কত কাদা মেখেছি গায়, কত কাঁটা ফুটেছে যে পায়
কত পড়ে গেছি, গেছে চলে যে ছিল যেথায়।"
ইত্যাদি—

শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম এখানে মা আমাদের অবগুণ্ঠনাবৃত্তা নন। সস্নেহে কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

যে সব জিনিসপত্র আনিয়াছিলাম সব তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বলিলাম,—মা, পরশু আপনার জন্মতিথি, তাই শরৎ মহারাজ এই সব জিনিসপত্র ও টাকা পাঠিয়েছেন। আমাদের বলে দিয়েছেন আপনার জন্মতিথি পালন করতে। আর মাষ্টার মহাশয়ও ঐ জন্য এই টাকা দিয়েছেন।

আমরা যৎসামান্য কিছু কিছু প্রণামী মায়ের চরণপ্রান্তে রাখিতেই মা একেবারে ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—তোমরা কোথায় পাবে, তোমাদের এসব কেন? বাস্তবিকই আমাদের তখন সামান্য চাকরি ছিল। পরে মা আমাদের বাহিরে বিশ্রাম করিতে বলিলেন ও একটু পরেই মুড়ি ও মিষ্টি জলখাবার পাঠাইয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই আমাদের স্নান হইয়া গেলে মা আমাদিগকে আহারের জন্য ডাকিলেন। আমরা মায়ের প্রসাদ না পাইয়া আহার করিতে অস্বীকার করায় বলিলেন,—তোমরা কাল থেকে এত কষ্ট করে এসেছ, এখন খেতে বস, আমি প্রসাদ পরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। মা কিছু পরে একটি বাটিতে করিয়া দুধমাখা ভাত পাঠাইয়া দিলেন।

তিথিপূজার দিন কাজকর্মের সাধারণ ব্যবস্থা হইয়া যাইবার পর মা আমাদিগকে স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন ও একেএকে তাঁহার শোবার ঘরে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। প্রথমে ডাক পড়িল আমার। যাইয়া দেখি মা তক্তাপোশের উপর বসিয়া নীচে পা ঝুলাইয়া আছেন—শরৎ মহারাজ যে কাপড়খানা পাঠাইয়াছিলেন উহা পরিয়া। আমি প্রণাম করিতেই মা ফুল দেখাইয়া দিলেন। আমি তাঁহার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম এবং আনন্দে বিভোর হইয়া যেন এক নেশার ঘোরে বাহিরে আসিলাম। বহুক্ষণ পর্যন্ত সে বিভোরাবস্থা যে যায় নাই তা বেশ মনে পড়ে। ক্রমে ক্রমে বন্ধুবর্গের প্রণাম ও পূজাদি হইয়া গেল। গ্রামের লোকেরা আসিতে লাগিল। কুটনো কোটা, জল আনা, রন্ধনাদি চলিতেছে। সব দিকে মায়ের প্রখর দৃষ্টি।

রাত্রি প্রায় সাড়ে ৬টায় রন্ধনকার্য শেষ হইল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের আসন হইল এবং পরে অন্য সবার। সকলে প্রসাদ পাইবার সময় মায়ের যে কি আনন্দ তাহা যিনি না দেখিয়াছেন তিনি অনুভব করিতে পারিবেন না।

মায়ের সঙ্গে একলা বসিয়া একটু কথা বলি এই আকাঙ্ক্ষা আমার বহুদিন হইতেই ছিল কিন্তু কিছুতেই তাহা পূর্ণ হয় নাই এবং এজন্য বড় বেদনা অনুভব করিতাম। এমনকি মনে মনে কখনও কখনও অভিমান হইত। আমরা গরীব সন্তান আমরা সর্বদা যাওয়া আসার সুযোগও পাই না, তবে কি কলের পুতুলের মত দীক্ষা নিলাম, প্রণাম করিলাম, প্রসাদ পাইলাম—ব্যস্। এর উদ্দেশ্যই বা কি? পরিণামই বা কি?—ইত্যাদি নানারূপ তরঙ্গ মনকে আলোড়িত করিত। উক্ত তিথিপূজার একদিন পর আমার সর্দি লাগিয়াছে মা খবর পাইয়া আমাকে স্নান করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। আমার বন্ধুরা স্নান করিতে চলিয়া গেলে একটু পরেই মা আমাকে তাঁহার ঘরে ডাকাইলেন। আমাকে নীচে বসিতে বলিয়া তিনি তক্তাপোশের উপর বসিলেন এবং বলিলেন,—কি বাবা, তোমার কথাটা কি বল দেখি! আমি তো অবাক! হঠাৎ মনে হইল, তাহা হইলে মা সত্যই অন্তর্যামিণী। তিনি তো আমার মনের কথা সবই জানেন দেখিতেছি। চোখে জল আসিল। মাকে বলিয়া ফেলিলাম,

"মা, কলকাতায় থাকতে আপনাকে প্রণাম করতে যাই আর কত আশা করি যদি একটি কথা বলেন। তা কচিৎ একটা কথা বলেন কিনা, দর্শনের আনন্দ ও একটা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ির হয়ে আসি। আর ভাবি, তাহলে আমি কি মার অপদার্থ ছেলে, আমার কথা কি মার মনে আছে? তাঁর কত ধনী, জ্ঞানী, মানী, গুণী, ত্যাগী ছেলে! এই সব সাত পাঁচ কত কী চিন্তা আসে।" সব শুনিয়া মা আমাকে এমন একটি কথা বলিলেন যাহাতে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া গেলাম ও কাঁদিয়া ফেলিলাম। মা আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন, আমি এক নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া মার চরণে মস্তক রাখিয়া এক ভাবরাজ্যে চলিয়া গেলাম এবং কিছুক্ষণ পরে এক নূতন উন্মাদনা লইয়া বাহিরে আসিলাম।

এইরূপে বাহিরের ঘরে একাকী কতক্ষণ বসিয়া আছি, এমন সময় শুনিতে পাইলাম, পাড়ার কোনও মহিলার সঙ্গে কথোপকথনচ্ছলে মা বলিতেছেন, "দেখ, আমার মা দুঃখ ক'রে বলতেন, সারদার আমার একটিও ছেলে হ'ল না। আজ যদি মা বেঁচে থাকতেন, তাহলে তিনি দেখে কত খুশী হতেন। আজ আমার কত ছেলে! তারপর এক জনের যদি পাঁচটি ছেলে হয় তাহলে পাঁচটি পাঁচ রকমের হয়, আর আমার ছেলেরা সব নিখুঁত—সব সোনার চাঁদ।" মার এই উক্তিটি আমি মঠের অনেক সাধু ও গুরুভ্রাতার সামনে বলিয়াছি।

এইবার আমাদের ফিরিয়া আসার পর্যায়। এই কয়দিন সকালে সন্ধ্যায় মার সঙ্গে মন খুলিয়া নানারূপ কথাবার্তায় মহানন্দে কাটিয়া গেল। স্থির হইল আমরা ৩০শে ডিসেম্বর সকালে পুনরায় ঐ পথে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিব। মা বলিয়া দিলেন আমরা ঐ দিন যেন কামারপুকুরে রাত্রিবাস করিয়া যাই। উক্ত ৩০শে সকালে আমরা অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া ৭।৭২ টার সময় মার পদধূলি ও আশীর্বাদ লইয়া কামারপুকুর রওনা হইলাম। মাকে প্রণাম করিয়া সামনের দিকে যেন আর পা যায় না। মাকে ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ চায় না। এ কী হইল! ১½ বৎসর বয়সে পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, গর্ভধারিণীর স্নেহে লালিতপালিত, দুনিয়ায় তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও জানিতাম না। কিন্তু এ কী হইল! এ মা যেন তাঁহাকেও ছাড়াইয়া যাইতেছেন! একবার মনে হইল, বন্ধুদের চলিয়া যাইতে বলি, আমি কিছুদিন পরে যাইব। কিন্তু office, কর্তব্য মনে পড়িল। এক রকম জোর করিয়া মন বাঁধিলাম। ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। মা কিন্তু দরজার সামনে বাহির হইয়া দাঁড়াইয়াই আছেন—যতদূর দেখা যায় মা আমাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াই আছেন। আমরা দৃষ্টির অন্তরালে না যাওয়া পর্যন্ত মা একইভাবে আমাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। আমিও যন্ত্রচালিতের মত অগ্রসর হইলাম। সেই স্বর্গীয় আনন্দের স্মৃতি ও দৃশ্য বর্ণনা করা আমার সাধ্য নাই। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এই আনন্দের অধিকারী হইয়াছেন। মা, ধন্য তোমার করুণা! ধন্য আমার কুল, ধন্য আমার জনকজননী যাঁদের পুণ্যফলে আজ এই অসীম করুণাময়ী জগজ্জননীর সন্তানপদবাচ্য হইয়াছি।

আমরা কামারপুকুরে আসিয়া রাত্রিবাস করিয়া পরদিন আরামবাগ ও তারকেশ্বর হইয়া সন্ধ্যায় কলিকাতা পৌঁছিলাম। পরদিন সকালে উদ্বোধনে গিয়া মার প্রদত্ত প্রসাদ পূজনীয় শরৎ মহারাজকে দিয়া মার তিথিপূজা-সংক্রান্ত সমুদায় বর্ণনা করিলাম। তিনি সব শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পরে মাষ্টার মহাশয়ের নিকট গিয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীমার প্রসাদ দিলাম ও ঘটনাবলী বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, "ধন্য আপনারা!"

(দুই)

শ্রীআশুতোষ সেনগুপ্ত

খ্রীঃ ১৯১২ সালের গ্রীষ্মকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসি-শিষ্য স্বামী সুবোধানন্দজীর (খোকা মহারাজ) শুভ পদার্পণে বরিশালের ভক্তগণ আনন্দে ভরপুর। আমি তখন বি-এম কলেজের ছাত্র, স্থানীয় মিশনে যাতায়াত করি। পূজনীয় খোকা মহারাজের সহিত আলাপ-পরিচয় হইয়া গেল, তাঁহার স্নেহ লাভ করিলাম। পরবর্তী বৎসর পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের উৎসবে বেলুড় মঠে যাই। ইহাই আমার কলিকাতা অঞ্চলে প্রথম যাওয়া। মঠে পূজনীয় খোকা মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন,—সাধারণ উৎসবের পরে যাবে। (সে সময় স্বামীজীর তিথিপূজার দিন তাঁহার তিথি-উৎসব এবং পরবর্তী রবিবারে তাঁহার 'সাধারণ উৎসব' সম্পন্ন হইত।) তদনুযায়ী আমি কয়েকদিন মঠেই রহিয়া গেলাম। পূজনীয় খোকা মহারাজের খাটের পার্শ্বেই একটি চৌকিতে আমার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

একজন সন্ন্যাসীর সহিত শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে কথা হইল। রাসবিহারী মহারাজ (স্বামী অরূপানন্দজী) তখন ব্রহ্মচারী, মঠেই থাকেন। তাঁহার সহিত একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে কলিকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী গিয়া তাঁহার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলাম। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম ও মনে মনে পাঠ করিলাম—

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

জনৈক সাধু সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবার কথা ও এই মন্ত্রটি আবৃত্তি করিবার কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। মন্ত্রট আমার পূর্ব হইতেই মুখস্থ ছিল। প্রণামকালে করুণাময়ী শ্রীশ্রীঠাকুরঘরে আসনে উপবিষ্টা ছিলেন —মনে হইল যেন যোগযুক্তা।

প্রণাম করিয়া উঠিয়া ঠাকুরঘরেই একপাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। মা তাঁহার খাটের উপর শ্রীপদ ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। রাসবিহারী মহারাজ তাঁহার পায়ের নিকট বসিয়া আস্তে আস্তে কি যেন বলিলেন। "খোকা মহারাজ ব'লে দিলেন" —এই কথাটি আমার কানে পৌঁছিলে মনে করিলাম যে আমার কথাই হইতেছে। পরে শুনিলাম করুণাময়ী বলিলেন, কালকে হবে। কিছুক্ষণ পরে রাসবিহারী মহারাজের সাথে নীচে নামিয়া আসিলাম। রাত্রে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতেই প্রসাদ গ্রহণ ও থাকা হইয়াছিল।

পরদিন যথারীতি গঙ্গাস্নান করিয়া প্রস্তুত রহিলাম। একজন সাধু আমাকে সময় মত ডাকিয়া লইয়া গেলেন। গিয়া দেখিলাম করুণাময়ী পূজার আসনে উপবিষ্টা, নিকটে একখানা আসন পাতা। আদিষ্ট হইয়া আমি ঐ আসনে বসিলাম। করুণাময়ী আমার হাতে একটু জল দিয়া বলিলেন,—আচমন কর। আমার বিলম্ব দেখিয়া ঐ বিষয়ে আমার অজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়া নিজের হাতে একটু জল লইয়া প্রতিবারে শ্রীবিষ্ণু বলিয়া অঙ্গুলি দ্বারা তিনবার ঐ জল নিজের মুখের মধ্যে ছিটাইয়া দিয়া আমাকে ঐরূপ করিতে আদেশ করিলেন। আমি যথাযথ আদেশ পালন করিলে নিম্নোক্ত মন্ত্রটি পাঠ করাইলেন—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্।

মন্ত্রটি আমার পূর্বে জানা ছিল না। যাহা হউক একবার শুনিয়াই মুখস্থ হইয়া গেল। অতঃপর মা কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। * * * মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইলাম। * * *

অতঃপর করুণাময়ী বলিলেন,—ঠাকুরের কাছে বল, 'ঠাকুর, আমার ইহপরকালের পাপ তুমি গ্রহণ কর।' তাঁহার আদেশমত এবার মুক্তকণ্ঠেই বলিলাম,—ঠাকুর, আমার ইহপরকালের পাপ তুমি গ্রহণ কর। একটি টাকা দিয়া প্রণাম করিলে

শ্রীশ্রীমা উহা স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। প্রণাম করিয়া মায়ের পবিত্র চরণকমল ললাটে ও বক্ষে ধারণকালে মা বলিলেন, ব্যথা, ব্যথা! মূঢ় আমি ঐ কথায় তখন কর্ণপাত করি নাই, যদিও আমার জানা ছিল যে মায়ের পায়ে বাত। করুণাময়ী তখন দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলেন। শুনিলাম, গোলাপ-মা আস্তে আস্তে বলিতেছেন, গুরুর পা রুমাল দিয়ে মুছে নিতে হয়। আমি মূঢ়, তাই ইহ ও পরকালের পাপগ্রহণ, ব্যথা, কোন কথাই তখন বুঝি নাই। তাই আজ সতত হৃদয়ে বাজে, "ব্যথা, ব্যথা!" মার ব্যথার প্রতিদানে করুণাময়ী আমার মাথায় পদ্মহস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন,—ভক্তিলাভ হোক্।

*　　*　　*

দীর্ঘদিন কাটিয়া গেল। সংসারে প্রবেশ করিয়াছি। বিবাহের দুই বৎসর পর গর্ভধারিণী জননীকে হারাইলাম। পিতৃবিয়োগ হয় কৈশোরে। নানারূপ সাংসারিক অশান্তি চরমে উঠিয়াছে। বরিশাল জেলার একটি গ্রাম্য স্কুলে শিক্ষকতা করি। স্ত্রীর হিষ্টিরিয়া রোগ। বিশ্রাম ও চিকিৎসার জন্য স্ত্রীকে তাহার পিতা লইয়া যান। পূজার বন্ধে স্ত্রীকে দেখিতে যাইয়া শুনিলাম স্ত্রী কোন দেবতার কবচ পাইয়াছে ও মন্ত্র লওয়ার জন্য কোন দেবতা নির্দেশ দিয়াছেন। সকল ব্যাপারই তাহার মূর্ছাকালীন হইয়াছিল। আমি নিজেও অনুরূপ কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করিলাম। পূজার বন্ধের পরে কর্মস্থল হইতে রাসবিহারী মহারাজের কাছে সব কথা জানাইলাম। তাঁহার উপদেশমত পত্রে করুণাময়ী শ্রীশ্রীমাকে লিখিলাম যাহাতে স্ত্রী তাঁহার কৃপালাভ করিতে পারে। অহেতুক করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা অনুমতি দিলেন। পত্র পাইয়া উল্লসিত প্রাণে বড়দিনের ছুটির অপেক্ষা করিতে লাগিলাম এবং যথাসময়ে স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতা আসিয়া বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র বাসায় উঠিলাম। বৈকালে রাসবিহারী মহারাজের সঙ্গে দেখা হইতেই তিনি আমাকে করুণাময়ীর চরণসমীপে লইয়া গেলেন। প্রণাম করিয়া এক পাশে দাঁড়াইলে শুনিলাম রাসবিহারী মহারাজের কথার উত্তরে করুণাময়ী বলিলেন,—কালকে হবে। পরদিন যথারীতি গঙ্গাস্নানের পর স্ত্রীকে করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র চরণ-সমীপে পৌঁছাইয়া দিয়া প্রণাম করিয়া নীচে যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। নির্বিঘ্নে স্ত্রীর দীক্ষা হইয়া গেল। দেখিলাম তাহার খুব পরিতৃপ্তি লাভ হইয়াছে। তাহাকে শ্রীশ্রীমা মা বলিয়াছিলেন,—তোমার স্বামীকে যাহা দিয়াছি তোমাকেও তাহাই দিই। করুণাময়ী কতগুলি নির্মাল্য স্ত্রীর কাছে দিয়া বলিয়াছিলেন,—ইহা তোমার স্বামীকে দিও। একটি কথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমার স্ত্রীর তখন স্বাস্থ্যের যেরূপ অবস্থা (অসুখ খুব বেশীই হইয়াছিল ও প্রায়শই মূর্ছা হইত) ছিল তাহাতে তাহার পক্ষে কোন কাজকর্ম করিতে পারা তো দূরের কথা তাহাকে কলিকাতা নিয়া আসাও সমস্যাপূর্ণ ছিল। কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ কোন কথাই তখন মনে হয় নাই এবং স্ত্রীরও পথে বা কলিকাতা থাকাকালে রোগের কোন আক্রমণ হয় নাই। ক্রমে তাহার অসুখ সারিয়া গিয়াছিল।

পরবর্তী দিন বরিশাল এক্স্প্রেসে দেশে যাওয়া স্থির হইল। গঙ্গাস্নান করার পরে আমি একাই করুণাময়ীর চরণদর্শনে যাই। উপরে গিয়া দেখিলাম, রাজরাজেশ্বরী স্বীয় পালঙ্কে উপবিষ্টা—চরণযুগল ভূমিসংলগ্ন। দৃষ্টির মধ্যেও কেহ কোথাও নাই। রাজরাজেশ্বরী বরদা মূর্তিতে অবস্থিতা। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামকালীন মনে মনে বলিলাম,—মা, তোমার কাছে কি চাইতে হবে ব'লে দাও। (মনে মনে সব সময়ই করুণাময়ীর সঙ্গে তুমি করিয়া কথা বলি) প্রণামের পরে নতজানু

হইয়া যুক্তকরে প্রাণ ভরিয়া সম্বোধন করিলাম,—মা! স্নেহ-বিগলিতকণ্ঠে করুণাময়ী উত্তর দিলেন,—কি?

* * *

মা।—ওঁর (ঠাকুরের) নামেই সব হবে।

বাংলা ১৩২৭ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতা আসিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীমাকে চিকিৎসার্থ জয়রাম-বাটী হইতে কলিকাতায় আনানো হইয়াছে। শরীর বিশেষ অসুস্থ, সেই বৎসরই শ্রাবণ মাসে মহামায়া লীলাসংবরণ করেন। জননীর শারীরিক অসুস্থতার জন্য সকলের মনেই বিষাদ। মায়ের শরীর বিশেষ অসুস্থ হইলেও শ্রীচরণদর্শনে বঞ্চিত হইলাম না। সকালের দিকে একটু বেশী বেলায় করুণাময়ীর পুণ্য-দর্শন মিলিল। এবারে দ্বিতলে অন্য প্রকোষ্ঠে দেখিয়াছি। পূর্বপূর্ব বারে শ্রীশ্রীঠাকুর-ঘরেই দেখিয়াছি। এইবারে প্রথমতঃ দেখিলাম মা অব-গুণ্ঠনাবৃতা। গোলাপ-মা তাঁহার স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—ছেলেমানুষ গো, মা, ছেলেমানুষ। তৎক্ষণাৎ দেখিলাম পূর্বপূর্ব বারের ন্যায় সীমন্ত পর্যন্ত কাপড়, হৃদয় ও পৃষ্ঠদেশও অনাবৃত। খাটের উপরে পা ছড়াইয়া একটি শিশুকে কোলে লইয়া বামহাতের তলায় শিশুটির মস্তক ও তাহার বক্ষদেশে দক্ষিণহস্ত রাখিয়া দুলাইয়া দুলাইয়া করুণাময়ী শিশুটিকে আদর করিতেছেন। ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তর নতজানু হইয়া যুক্তকরে বসিলে স্নেহ-সিক্তস্বরে জননী জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভালো আছো?—হাঁ, বলিয়া উত্তর দিতেই করুণাময়ীর সঙ্গিনীগণ আমি যাহাতে আর বিলম্ব না করি তদ্রূপ নির্দেশ দিলেন। বুঝিলাম জননীর শারীরিক অসুস্থতার জন্যই ঐরূপ বলা হইয়াছিল। সুতরাং আর বিলম্ব করা সম্ভব হইল না। আমার দিকে পরিষ্কারভাবে তাকাইয়াই কুশলপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখিলাম শ্রীবদনে কোন অসুস্থতার চিহ্ন তো নাইই, অধিকন্তু সেই অলৌকিক মুখশ্রী ও নয়ন-যুগলের অভিনব ভাব বর্ণনা করিতে আমার লেখনী অক্ষম, ভাষা মূক।

"সত্যিকারের মা"

শ্রীমতী রেণুকণা দেবী

আঁধারে যখন ঢাকিল ধরণী, নীরবে চরণ ফেলে
নব প্রভাতের সূচনা লইয়ে জননী তুমি গো এলে।
জড় নিদ্রায় মগ্ন চিত্ত তন্দ্রাজড়িত চোখে
তব আগমন-পদধ্বনিতে চাহিল জ্যোতির্লোকে।
সহসা দেখিল জননী তোমায়, স্নিগ্ধ মাতৃরূপে,
অভয় করেতে করুণাপাত্র অঞ্চলে ঢাকি চুপে—
সিক্তিয়া দিতে এসেছ নামিয়া অমরার গৃহ ছেড়ে
সবাকার ব্যথা, দুঃখের জ্বালা, জননী-হৃদয়ে হেরে।
শুভ্রশুচিতাস্পর্শে নাশিছ কলুষ কালিমা যত,
অসুর-দম্ভ চরণের তলে সভয়ে রয়েছে নত।
সকল মহিমা আবরণে ঢাকি, সাজি সাধারণ মেয়ে
দীনের কুটীরে এসেছ জননী, দীনের তনয়া হয়ে॥
অন্যায় দেখি দীপ্ত আঁখিতে মৃদু ভর্ৎসনা করি,
পরক্ষণেতে আবার ক্ষমিয়া, সাদরেতে কর ধরি,
কত আশ্বাসে, অভয় জানায়ে, স্নিগ্ধ কোমল স্বরে
বলেছ, "মা আমি সত্যিকারের, তোদের ভাবনা
কিরে?"
দিবস-যামিনী সন্তান লাগি ব্যাকুল চিন্তাধারা,
তোমারে ঘেরিয়া রহিয়া রহিয়া করেছে আপনা
হারা।
ঘুচাইতে ব্যথা, সকলি ত্যজিয়া, শুধু সবাকার তরে,
কত ভাবে তুমি করিয়াছ সেবা কল্যাণ ছুটি করে।
দেশ জাতিভেদ কিছু নাহি রাখি স্থানকাল নাহি বাছি
অকাতরে তব অহেতুক কৃপা সবারে দিয়াছ সেঁচি।
সত্যিকারের ওগো মা আমার কল্যাণময়ী অয়ি!
জননী সারদা! জ্ঞানপ্রদায়িনী শ্রীরামকৃষ্ণময়ী।

জননী জগদ্ধাত্রী

স্বামী ক্ষমানন্দ

আশ্বিনের সুমঙ্গল মহানবমীর নবীন উষায় শ্রীশ্রীদুর্গার শুভ আবির্ভাবে আমরা যে দিব্য আনন্দের অধিকারী হইয়াছিলাম উহাতে পুনঃ পুনঃ সুস্নাত হইবার জন্য কোজাগরী পূর্ণিমা ও দীপান্বিতা অমানিশায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে সেই পরাশক্তির আরাধনার আয়োজন। এই নিত্য অস্তিত্বকে পুনরায় নিবিড়ভাবে অনুভব করিবার জন্যই ঠিক এক মাসের ব্যবধানে, কার্তিকের শুক্লা নবমী তিথিতে পুনরায় তাঁহার আগমন-গীতি দশদিক ভরিয়া তুলিল। পশুশক্তির পরাভবে মূর্তিমতী ব্রহ্মবিদ্যা সিংহপৃষ্ঠে আবির্ভূতা হইলেন চতুর্ভুজা জগদ্ধাত্রীরূপে।

> ধাত্রী মাতা সমাখ্যাতা ধারণে চোপগীয়তে।
> ব্রহ্মাণাঞ্চৈব লোকানাং নাম ত্রৈলোক্যধাত্রিকা ॥
> যস্মাদ্ধারয়তে লোকান্ বৃত্তিমেষাং দদাতি চ।
> ডু ধাঞ্ ধারণে ধাতুর্জগদ্ধাত্রী মতা বুধৈঃ ॥
> (দেবীপুরাণম্)

ধাত্রী সন্তানবৎসলা জননী। সাদরে সকলকে বক্ষে ধারণ—স্বীয় পীযূষদানে পরিপালন করেন বলিয়াই তিনি জগন্মাতা। ধা-ধাতুর অর্থ ধারণ ও পোষণ। নিখিল বিশ্ব ধারণ করিয়া সকলকে জীবিকাদানে পরিপোষণ করিতেছেন বলিয়া সুধীবৃন্দ তাঁহাকে জগদ্ধাত্রী বলিয়া থাকেন। শ্রীচণ্ডীতে (১।৭০) ইনিই স্থিতিসংহারকারিণী বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কেবলমাত্র তাঁহার অশুভনাশিনী—ভীষণ মূর্তির অন্তরালেই যে সেই জগৎপাবনী মাতৃমহিমা বিকাশ পায় এমন নয়, অধিকন্তু উহার মাধুর্য ফুটিয়া উঠে—আমাদের অন্তরের সংকীর্ণতা ও অজ্ঞানতা দূরীকরণে। ইহাই বেদান্তবেদ্য অজ্ঞাননিরোধক আত্মজ্ঞান-প্রাপ্তি বা স্বস্বরূপানন্দে অবস্থিতি। এই যুগলীলা-কাহিনী বেদ, তন্ত্র ও পুরাণাদিতে বহুধা সমর্থিত।

ইন্দ্রাদি দেবতারা কল্পান্তস্থায়ী। পদাধিকার বলে তাঁহারা সৃষ্টির শৃঙ্খলা-বিধানে নিযুক্ত হন। এমনই কোন এক কার্তিকের শুক্লা নবমী তিথিতে নবীন উষার আহ্বানে ত্রেতাযুগের প্রথম অরুণোদয় হইল। ইহার প্রারম্ভিক উৎসবে নিজ নিজ কর্তব্য কার্যে অধিষ্ঠিত দেববৃন্দের মুখমণ্ডলে কর্তৃত্বের পরিতৃপ্তি। তাঁহাদের সমগ্র সত্তা বিজয়গৌরবে আচ্ছন্ন এবং নিজেরাই ঈশ্বর-পদবাচ্য এই চিন্তায় অহংকৃত। ঠিক এমনই সময়ে তাঁহাদিগকে বিমূঢ় করিয়া অদূরে আবির্ভূত হইল পর্বতোপম এক তেজঃপুঞ্জ। অসংখ্য সূর্যের কিরণমণ্ডিত হইলেও উহা চন্দ্রকোটি-সুশীতল। দুর্নিরীক্ষ্য বটে কিন্তু অসহনীয় নয়। ভীত চকিত দেবমণ্ডলীর মধ্যে বায়ু বয়োজ্যেষ্ঠ,—মহাকাশ হইতে তাঁহারই প্রথম অভ্যুদয়।[১] তিনি উহার স্বরূপ জানিবার জন্য আসিতেই জ্যোতির মধ্য হইতে প্রশ্ন হইল—কে তুমি? আমি মাতরিশ্বা। তাঁহার বিধিসম্মত কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করিবার সাহস কাহার থাকিতে পারে এই চিন্তা তাঁহার মনে আসামাত্রেই পুনর্জিজ্ঞাসা—কি তোমার—বীর্যবত্তা ও কর্মকুশলতা? প্রভঞ্জন-রূপ দেখাইয়া বায়ু তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন, এমনই সময়ে একটু তৃণখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইল তাঁহার সম্মুখে। উহাকে স্থানচ্যুত করিতে পার? সমস্ত শক্তিপ্রয়োগ করিয়াও ব্যর্থকাম বায়ু ফিরিয়া আসিলেন অবনতমস্তকে। অগ্নিরও অনুরূপ দশা হইল। এবার ইন্দ্রের পালা। সকলে ব্যর্থকাম হইলেও—তিনি নিশ্চয়ই উহার ইতিবৃত্ত জানিতে পারিবেন—এই বিশ্বাস ও ভরসা তাঁহার ছিল।

১ কাত্যায়নী-তন্ত্রে এই মত সমর্থিত, কিন্তু কেনোপনিষৎ ও দেবীভাগবতে অগ্নিই পুরোবর্তী হইয়া উহা জানিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন।

কিন্তু তিনি উপস্থিত হওয়া মাত্রেই উহা অন্তর্হিত হইল। দেবরাজ বলিয়া তাঁহার এই অভিমান থাকা স্বাভাবিক, প্রথমেই তাহা ব্যাহত হইল। পূর্বানুগদের ন্যায় তিনি না ফিরিয়া শ্রদ্ধার সহিত সেই পূজ্যপাদের স্বরূপ জানিবার জন্য ধ্যানস্থ হইলেন। অমনি আকাশমার্গে আবির্ভূতা হইলেন বহুশোভমানা হৈমবতী উমা—ধৃতবিগ্রহবতী ব্রহ্মবিদ্যা; তাঁহার আস্তিক্যবুদ্ধি প্রসূত আত্মজ্ঞান। ইন্দ্রের তাদৃশ ভক্তি দর্শনে ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী উমা প্রাদুর্ভূতা হইলেন স্বর্ণভূষণে বিভূষিতা সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সহিত নিত্যযুক্তা হিমাচলসুতা ভগবতীরূপে। আচার্য সায়নের ভাষ্যেও ইহারই অনুরূপ প্রতিধ্বনি, আরও দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট ভাষায়—হিমালয় কন্যা গৌরীই উমা এবং ইহার দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সময়ে কোন্ বিশেষ মূর্তি যে তিনি ধারণ করিয়াছিলেন উহার কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা উক্ত গ্রন্থাদিতে পাই না। সেটির সন্ধান পাওয়া যায় বেদোত্তর কাত্যায়নী তন্ত্রে—

তেজস্যান্তর্হিতে তস্মিন্ চমৎকারকলেবরে।
মৃগেন্দ্রোপরি সুস্মেরা সর্বালঙ্কারভূষিতা॥
চতুর্ভুজা মহাদেবী রক্তাম্বরধরা শুভা।
বালার্কসদৃশী দেহা নাগযজ্ঞোপবিতিনী॥
ত্রিনেত্রা কোটিচন্দ্রাভা দেবর্ষিমুনিসেবিতা।
দর্শয়ামাস দেবানামেবং রূপং জগন্ময়ী।
ততস্তাং তুষ্টুবুর্দেবা জগদ্ধাত্রীং জগন্ময়ী॥

সেই তেজোরাশিকে স্তিমিত করিয়া কোটি-চন্দ্রপ্রভাময়ী ও রক্তিমাভ অনিন্দ্য মূর্তি ধারণ করিয়া ত্রিনয়না চতুর্ভুজা মঙ্গলময়ী মহাদেবী, দেবর্ষি নারদ ও অন্যান্য মুনিদের দ্বারা অভিনন্দিতা হইয়া সহাস্যবদনে আবির্ভূতা হইলেন। পরিধানে তাঁহার রক্তবস্ত্র, সর্বাঙ্গে অলঙ্কারের প্রাচুর্য, গলদেশে সর্পের উপবীত এবং তিনি সিংহপৃষ্ঠে সমাসীনা। এই পরমকল্যাণদাত্রী দেবী জগদ্ধাত্রীকে জগতের মূলাধার বলিয়া জানিতে পারিয়া দেববৃন্দ প্রণত হইলেন, তখনই তাঁহাদের অহমিকার বিলুপ্তি ও নিঃশ্রেয়স আত্মজ্ঞানের অভ্যুদয় হইল। তাঁহাদিগকে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই মহামায়ার এই সকল প্রচেষ্টা, আর উহা না হইলে লোকপাল বা গণনেতাদের জীবনে উদার দৃষ্টি বা ব্যবহারে নিরপেক্ষ চিন্তাধারা আসিতে পারে না, ফলে তাঁহাদের উপযোগিতাও ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

ধ্যানমন্ত্রে উল্লেখ না থাকিলেও দেবীপ্রতিমায় সিংহনিপীড়িত হস্তী দৃষ্ট হয়। উহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত (১।৬।৩) উক্ত হইয়াছে: 'জগদ্ধাত্রীরূপের মানে জান? যিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন। তিনি না ধরলে, তিনি না পালন করলে জগৎ পড়ে যায়, জগৎ নষ্ট হ'য়ে যায়। মন-করীকে যে বশ করতে পারে তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন। * * * মন মত্ত করী, সিংহবাহিনীর সিংহ তাই জব্দ করছে।'

ইহার সমর্থনে একটি কিংবদন্তী শুনা যায়। হিমালয় হইতে অবতরণকালে গঙ্গা পর্বতের গুহায় আবদ্ধ হইলেন। তিনি ভগীরথকে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া তাঁহার ঐরাবতের সাহায্যে নির্গমনের পথ করিয়া দিবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন। স্বীয় ক্ষমতায় সমধিক সচেতন ঐরাবত পথিমধ্যে এক অত্যন্ত অশোভন প্রস্তাব করিল। ইহা জানিয়াও সকলের কল্যাণের জন্য দেবী এই অমর্যাদা অঙ্গীকার করিলেন কেবলমাত্র একটি শর্তে। তাঁহার জলকল্লোলের তিনটি প্রবাহপাতে সে অবিচলিত থাকিতে পারিলে তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার কোন অন্তরায় থাকিবে না। অবতরণ-পথ সুগম হইল। সেই জলস্রোত সব কিছুকে প্লাবিত করিয়া দুর্বার বেগে বহিয়া চলিল। নিমজ্জনোন্মুখ ঐরাবত সেই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে এবং স্মৃতি-বিলুপ্তির পূর্বমুহূর্তে মাতৃচরণে ঐকান্তিক আত্মনিবেদন করিল। মাতৃনামের আমিয়শক্তি। সঙ্গে সঙ্গে

সেই কালস্রোতকে প্রশমিত করিয়া অনুপম এক মাতৃমূর্তি তাহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার প্রাণ রক্ষা হইল বটে কিন্তু এই মাতৃত্বের অবমাননাকারীর দেবরাজ্যে স্থান হইল না। ইন্দ্রের শাপে সে তথা হইতে নির্বাসিত হইল এবং পৃথিবীতে আসুরিক বৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিল। পুনরায় ফিরিয়া যাইবার উপায় কোথায়,—দেবীবাহন সিংহের নখরাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়া সে পুনরায় পূর্ব মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হইবে। অশান্ত মনকরীকে যখন আমাদের বিবেকসিংহ সংযত করিতে সমর্থ হয় তখনই আমাদের অন্তরে চৈতন্যময়ী জগদ্ধাত্রীর প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়। ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদক এ এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব। এই মূর্তিতে এ ভাব স্বতঃস্ফূর্ত ও অনায়াসলব্ধ, অন্যস্থানে এই সব ভাবের আরোপ করিতে হয়।

কুরুক্ষেত্র মহাসমরে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জয়লাভের জন্য অর্জুনকে দুর্গাস্তব করিতে উপদেশ দিলেন। সর্বপ্রকারে স্তুতি করিয়াও তাঁহার আশা মিটিল না। তাই বলিলেন, ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাম্, বেদিত শ্রেষ্ঠ বস্তুসমূহের মধ্যে তুমি ব্রহ্মবিদ্যা। দেবী প্রসন্ন হইয়া অর্জুনকে এই মহিমময়ী মূর্তিতে দর্শন দিলেন। সেইজন্যই মনে হয় গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে "গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াম্" এই উক্তির উল্লেখ দেখা যায়। পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্করত্ন তাঁহার গীতার দেবীভাষ্যে ইহা বিশেষভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। "গীতায় জগদ্ধাত্রী মন্ত্র আরাধনা করিতেই অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রধান উপদেশ, সুতরাং জগদ্ধাত্রী মাতাই দুর্গা ও ব্রহ্মবিদ্যা। গীতাতেও যে জগদ্ধাত্রী-মন্ত্রের উপদেশ আছে তাহা গুপ্তভাবে আছে। অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে জগদ্ধাত্র্যা একাক্ষরী বিদ্যা লব্ধা" দেবী জগদ্ধাত্রীর একাক্ষর মন্ত্র পাইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

দ দুর্গাবাচকং দেবি উকারশ্চাপি রক্ষণে।
বিশ্বমাতা নাদরূপা কুর্বর্থো বিন্দুরূপকঃ॥

দ কার, উকার এবং বিন্দু এই তিনের মিলনেই এই 'দূঁ' মহামন্ত্র। সংক্ষিপ্তাকারে দ অক্ষরটি দুর্গাপদের বাচক। উ অর্থে রক্ষণ উকারে যুক্ত হইয়া ব্রহ্মের অব্যক্তরূপ প্রকাশ করিবার জন্য নাদের প্রতীকরূপে বিন্দুর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এখানে উহা একই অর্থে প্রযুক্ত। অধিকন্তু ইহার দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারাত্মক সমুদয় কার্যের মূলীভূত কারণ হিসাবে ক্রিয়াবাচক 'কুরু' এই অর্থই প্রকাশ করে। ইহাদের দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, জগন্মাতা নাদময়ী অব্যক্তরূপিণী ব্রহ্মময়ী দুর্গা (তুমি আমাদের এই অজ্ঞানান্ধকার হইতে) রক্ষা কর। অর্জুন যে সেই সময়ে এই মন্ত্র লাভ করিয়া জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন তাহা বেশ বুঝা যায়।

বৎসরের বিভিন্ন সময়ে এই পূজার বিধান থাকিলেও কার্তিকের পূজা সমধিক প্রচলিত। সূর্য চন্দ্র ও ইন্দ্রাদি দেবতারা ইঁহার আরাধনা করিয়া অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন এবং রাবণাত্মজ মেঘনাদেরও কার্তিকী পূজার প্রভাবে ইন্দ্রজিৎ হইবার কাহিনী তন্ত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পূজা সূর্যোদয় হইতে অস্তকালব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজার তিন দিন ধরিয়া যে পূজার বিধান ইহা তাহারই সংক্ষিপ্ত ক্রম, এবং সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজার বিধান এখানে সূর্যোদয় হইতে তিন তিন প্রহরে বিভক্ত এবং আদ্য (প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন), মধ্য (অপরাহ্ণ পর্যন্ত) এবং অন্ত (সায়ংকাল অবধি) পূজা বলিয়া কথিত। শারদীয়া পূজার ক্রম এখানে অনেকাংশে অনুবর্তন করা হয়। দেবীর ধ্যানমন্ত্রে ইহা বিশেষ লক্ষণীয় যে নারদাদৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্—দেবর্ষি নারদ প্রমুখ মুনিগণ ত্রৈলোক্যবন্দিতা দেবীকে আরাধনা করিতেছেন কারণ তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করেন, এবং দেবী উহারই পরা বিগ্রহ বলিয়া তাঁহাদের ইষ্টস্থানীয়। এ জন্যই

সম্ভবতঃ এই পূজায় ঋষি পংক্তির (জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, ভৃগু, গৌতম, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, শিব, নন্দীশ্বর, কহমিক ও স্বণ্ডিক) প্রতিও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতে হয়। শ্রদ্ধাবনতচিত্তে আমরাও এই দুর্লভ আত্মজ্ঞানের জন্য তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি—

"আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে।
ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রী নমোঽস্তু তে॥"

আধার ও আধেয়রূপিণী, মেধা বা ধারণাশক্তিদায়িনী, সমূহকর্মফলবিধাত্রী, শাশ্বতপদগম্যা, স্থিরস্বভাবা, আত্মজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী, সনাতনী দেবী জগদ্ধাত্রীকে প্রণিপাত করি।

বৃন্দাবনের পথে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পৃথিবীর পথ ঘুরে গেছে আজ পতন-অভ্যুদয়ে
ইতিহাস হোতে মুছে গেছে প্রিয় প্রাচীন দিনের লেখা।
ঘুমায়ে পড়েছে কি যেন কাহিনী অদূরে কালীয় দহে,
মনের পাতায় ফুটে আছে কার মসীকজ্জল রেখা!
বৌদ্ধ পাঠান তুর্কী মোগল এ পথে দিল কি হানা?
কালের জটায়ু-বিহগের কবে হেথায় ভেঙেছে ডানা।

পুরানো যুগের পুরাণের বাণী পাওয়ার মুখে মুখে
ছায়াভরা বাটে কান পেতে শুনি, ধীরে ধীরে পথ চলি।
প্রেমের বন্যা বয়ে গেছে যেথা যমুনার কালো বুকে,
সেথায় নাহিক একটু নমুনা?—আছে শুধু কথাকলি!
কত না জীবন-নাট্যের হেথা যবনিকা পাত হোলো,
জীর্ণপুঁথির ছিন্ন পাতাটি সাবধানে আজ খোলো।

সঙ্গীহারানো পাখী গেছে উড়ে, নীড়ও হারালো জানি,
মৃত হয়ে গেছে মহা আকাশের হাজার হাজার তারা।
ভূগোলের সাথে ইতিবৃত্তের তবু শুনি কানাকানি,
রূপের মাঝারে অরূপের খেলা ধরায় বহিছে ধারা।
আমারে ডাকিছে বৃন্দাবনের তৃণ আর কিশলয়,
ওদের নাড়ীতে জড়ানো আমার পার্থিব পরিচয়।

মহাজীবনের স্মৃতিকাগারের পাষাণসমাধি-তলে
মসজিদ আর ভগ্ন প্রাসাদে স্মরণ-দ্বন্দ্ব আনে।
দুঃস্বপনের গহন তিমিরে কৌস্তুভমণি জ্বলে,
হাজার হাজার বছরের আগে কি ছিল কে-ই বা জানে!
আদিমথুরার আয়তন হোতে যমুনা গিয়েছে দূরে,
আদিযুগের পটভূমিকায় কে গায় করুণ সুরে!

রাধাঋণ শোধ করিতে যে জন এসেছিল নদীয়ায়,
তারি খেলাঘর লীলাস্থলী যে ব্রজমণ্ডলে শোভে;
সেইতো দেখায়ে গেল অরণ্যে কোথা গোপীগণ গায়,
কোথা প্রেম বহে প্রভাতের সম প্রিয় আর প্রেয় লোভে;
মাঠের ভিতরে শুধায় আমারে মায়ার গোবর্ধন,—
রাধা-কুণ্ডেতে দেখেছ কি কারো মধুর আলিঙ্গন!

রাধাপ্রেমে সুর বংশীবটেতে উঠেছে একদা বুঝি?
নিকুঞ্জবনে তারি ঢেউ আজো দেয় কিগো দোল রাতে?
ভাবের পাগল হরিদাস স্বামী নিধুবনে যারে খুঁজি
সে কি গো গানের মালাখানি গাঁথে একা বসে
নিরালাতে?
হেথায় মীরার নয়নের বারি তুলেছে প্রাণের ঢেউ,
সেই সব দিন ফিরায়ে আবার—বলো, আনিবে
কি কেউ?

সন্ন্যাস ও কর্মযোগ

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"কৃষ্ণ, তুমি একবার কর্মত্যাগের কথা আর একবার কর্ম করিয়া যাইবার কথা বলিতেছ। ঠিক করিয়া বল ইহাদের কোনটি শ্রেয়ঃ।"[১]

উপনিষদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া গীতার সময় পর্যন্ত সন্ন্যাস-শব্দটির অর্থের ক্রমবিকাশ হইয়া আসিতেছিল। সন্ন্যাসের প্রকৃত তাৎপর্য কি? ইহা কি শুধু সন্ন্যাসীর চিহ্ন-ধারণ? এই তাৎপর্য যথাযথ না বুঝিবার দরুন অনেক বাদপ্রতিবাদের উদ্ভব হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের সময়েও সন্ন্যাস এবং কর্মের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব-বিচার চলিতেছে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় কর্ম এবং সন্ন্যাসের একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে ইহাই প্রতিপাদিত যে এই দুইটির মূলে একই প্রেরণা, অভিব্যক্তি শুধু আলাদা। শ্রীকৃষ্ণ প্রাচীন প্রণালী-গুলির সবই পরীক্ষা করিয়াছিলেন, উহাদের মধ্যে একটি নূতন অর্থ সঞ্চার করিয়া সবগুলির সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। আজিকার দিনেও আমাদের বহু বিষয়ের প্রকৃত অর্থ কি তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হইয়াছে। তবে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় একজন মহাপুরুষের প্রত্যক্ষানুভূতি, যদি এই ব্যাখ্যাগুলির পশ্চাতে থাকে তবেই উহা সকলের আকর্ষণীয় ও গ্রাহ্য হয় এবং সকলকে শক্তি দেয়, অন্যথা উহা তো শুধু বাক্যবিলাস।

মোগল-সাম্রাজ্যের যখন পতন হইল তখন বাদশাহী মোহরগুলিকে গলাইয়া আর্থিক লেন-দেনের জন্য নূতন ছাপ দিয়া চালু করিতে হইল। সেইরূপ প্রাচীন ভাবগুলিকে আজ নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। সোনা অর্থাৎ সত্য যাহা তাহা তো ঠিকই আছে।

এই নূতন দৃষ্টি দিতে পারেন কে? যিনি তত্ত্বকে জীবনে বাস্তব করিয়া তুলিয়াছেন। আমাদের দেশে ঋষি হলেন নির্দেশদাতা। তাঁহার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থানুসন্ধিৎসা নাই, অনাসক্তি এবং নিঃস্বার্থ লোকহিতই তাঁহার উপদেশের প্রেরণা। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন তিনি মন মুখ এক করিয়াছেন। এইরূপ লোককেই আমরা বিশ্বাস করি। নৈর্ব্যক্তিক এবং বিচার্য সত্য যখন এমন এক ব্যক্তিতে মূর্ত হইয়া উঠে যিনি ঐ সত্যের জন্যই বাঁচিয়া থাকেন এবং উহার জন্য মরিতেও প্রস্তুত তখনই বুঝিতে হইবে আমরা একজন যথার্থ পথপ্রদর্শক পাইয়াছি। সাম্প্রতিক কালে শ্রীরামকৃষ্ণ ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি যাহা শিক্ষা দিতেন তাঁহার জীবন ছিল উহাদের মূর্ত বিগ্রহ। আর তিনি যে উপদেশ দিতেন উহা যে ব্যক্তিকে বলিতেছেন ঠিক তাহার উপযোগী হইত। লোককে নির্দেশ দিবার আগে তিনি তাহাদের প্রকৃতি এবং শক্তি পরীক্ষা করিয়া লইতেন। সকলের জন্যই একই আদর্শ তিনি কখনও উপস্থিত করিতেন না।

অধিকাংশ মানুষ দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা ও সংগ্রাম লইয়া ব্যাকুল। মুক্তি সকলের আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইলেও কম লোকই উহার অনুসন্ধান করিতে পারে। এই বাস্তব জগৎকেই অহরহ আমাদের দেখিতে হয়। গীতা কি পন্থা নির্দেশ করেন? গীতার শিক্ষায় লক্ষ্য দুইটি—অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স। সামাজিক পটভূমিতে ব্যষ্টিগত সুখ যাহাতে হয় তাহাই অভ্যুদয়। আর নিঃশ্রেয়স এমন একটি অভাবের পরিপূর্তি যাহা সমাজের অতীত—যাহা মিটিলে মানুষ পূর্ণতা বা

১ সংন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥
(গীতা—৫।১)

মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। 'ধর্ম'কে অবলম্বন করিয়া 'অর্থ' এবং 'কামে'র নিয়ন্ত্রণ দ্বারা অভ্যুদয় আসে। 'ধর্ম' হইল একটি সমষ্টিগত চেষ্টা। সমাজকে বাদ দিয়া ব্যক্তির পক্ষে ইহা নিরর্থক। অতএব ধর্মের ধারণার মধ্যে জনগণের সুখ ও মঙ্গল অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু ইহাই মানবপ্রগতির শেষ কথা নয়। সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দল বাঁধিয়া চলি কিন্তু আমাদের যাত্রাপথের অন্তিম ধাপে আমাদিগকে একাই চলিতে হয়। পথ যেন তখন সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে, দুই বা তিনজনে চলা সম্ভবপর নয়। একটি উত্তুঙ্গ শিখরদেশে আরোহণের কথা ধরুন। প্রথমে আমরা অনেকে একসঙ্গে উঠিয়া চলি কিন্তু যত উপরে যাই তত দল পাতলা হইয়া আসে। সর্বোচ্চ শিখরে একজনের পিছনে আর একজনকে উঠিতে হয়, দল বাঁধিয়া আর অগ্রসর হওয়া চলে না। এখানে আর বন্ধুত্ব নাই। চতুর্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষ যেন এই সর্বোচ্চ শিখর। এখানে সকলকে একক হইতে হইবে। এই একাকিত্ব বুঝিতে পারিলে এবং উহাতে ভয় না পাইলে আমরা জীবনের পরিপূর্ণতা কি বস্তু হৃদয়ঙ্গম করি। সমাজ শেষ কথা নয়, উহা অনন্ত-পথযাত্রী মানুষের চলিবার একটি ধাপমাত্র। সামাজিক জীবনের কোলাহল এবং দ্বন্দ্ব আমাদের মানসিক শান্তির ব্যাঘাত জন্মায়। সামাজিক জীবন আমাদের প্রকৃত জীবনের উপরের দিক্ মাত্র, জীবনের গভীরে উহা স্পর্শ করে না। সেই গভীরে রহিয়াছে আত্মার অক্ষোভ্য প্রশান্তি—উহাই মানুষের স্বরূপ—তাহার জীবনের চরম লক্ষ্য।

কিন্তু সকলেই কি সেই লক্ষ্য পৌঁছিতে পারে, না পৌঁছিবার ক্ষমতা রাখে? সর্বোচ্চ পর্বতশিখরে আরোহণ কি সকলের জন্য? সেখানকার বায়ুমণ্ডল এত পাতলা যে অনেকেরই—শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। অতএব তাহাদের জন্য সামাজিক পরিবেশ 'অভ্যুদয়ের' ব্যবস্থা।

যাহা সর্বোচ্চ তাহা সর্বদাই নির্জন—যেমন গৌরীশৃঙ্গ। যাঁহারা জীবনের পরিপূর্ণতায় পৌঁছিয়াছেন—জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ তাঁহারা নিঃসঙ্গ। তাঁহাদের পরিবার বা সমাজ বা রাষ্ট্রের সহায়তার প্রয়োজন নাই। স্বকীয় মহিমায় তাঁহারা উত্তুঙ্গ গিরিশিখরের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকেন। মানুষ তাঁহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাঁহাদের নিকট হইতে সান্ত্বনা ও সাহস পায়। হিমালয়ের হাওয়া যেমন সমতলভূমিতে নামিয়া আসে সেইরূপ এই সকল মহাপুরুষগণের অনুপ্রেরণা সমগ্র সমাজ-দেহে নূতন প্রাণের সঞ্চার করে। মোক্ষ সকলে লাভ করিতে পারে না বটে কিন্তু যিনি মোক্ষলাভ করিয়াছেন তিনি সমাজে বিপুল শক্তি সংক্রামিত করিয়া যান। এই জন্য সমাজনীতি অর্থাৎ ধর্মের মধ্যে মোক্ষের আদর্শটি স্বীকৃত।

সর্বোচ্চ শৃঙ্গে যিনি উঠিতে পারিয়াছেন তিনি জ্ঞানাগ্নিতে সকল কর্ম দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন—তিনিই গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে উক্ত কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখিবার অধিকারী। অতএব অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন কর্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন শ্রেষ্ঠপন্থা কিনা, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন কর্মযোগ এবং কর্মসন্ন্যাস উভয়েই মানুষকে লইয়া যায় মোক্ষরূপ এই লক্ষ্যে। জীবনের সহস্র প্রকার বিক্ষেপের মাঝখানে সাম্য বজায় রাখিবার চেষ্টার নাম কর্মযোগ। আর সন্ন্যাস হইল আত্মারূপ দুর্গে সাক্ষাৎভাবে প্রবেশ। অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে কর্মযোগই পন্থা। যিনি শক্তিমান তাঁহার পক্ষেই ব্যতিক্রম সম্ভবপর। তাঁহার পক্ষে নিয়মকানুন দরকার হয় না। বিধিনিষেধ সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্যই। তোমার যদি উচ্চ পর্বতশিখরে উঠিয়া একা দাঁড়াইবার এবং স্বচ্ছন্দভাবে শ্বাসগ্রহণ করিবার শক্তি থাকে তো উত্তম কথা। এক লাফে সমুদ্র-উল্লঙ্ঘনকারী হনুমানের মত যদি তুমি মহাবীর হইতে পার তো অতি চমৎকার। কিন্তু সকলে যদি উহা না পারে তাহা হইলে তাহাদিগকে হীন

ভাবা উচিত নয়। পক্ষান্তরে যাহারা উহা পারিবেনা তাহারাও যেন ঐ মহাবীরত্বকে কটাক্ষ না করে।

কেহ কেহ বলেন (যেমন লোকমান্য তিলক) প্রত্যেককেই বিনা ব্যতিক্রমে সমাজের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া অবশ্যই বরাবর কর্মে নিরত থাকিতে হইবে। কিন্তু যাঁহার পক্ষে 'বেদা অবেদা' :—বেদ অবেদ হইয়া যায় তাঁহার কি কর্মে প্রয়োজন আছে? তাঁহাকে বিধিনিষেধের এলাকায় কিরূপে আনা যাইবে? তাঁহাদের জন্য আমরা আইন প্রণয়ন করিতে পারি না, করিবার সার্থকতাও নাই। কাহাকেও কিছু দিতে হইলে যাহার অভাব এবং আকাঙ্ক্ষা আছে তাহাকেই দেওয়া উচিত। যিনি নির্বাসনা এবং মুক্ত তিনি নিয়মের পারে। তাঁহাদের সম্বন্ধেই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।"

কিন্তু আমরা একটি ভুলও করিয়া বসিয়াছিলাম। মোক্ষের এই সর্বোচ্চ আদর্শ অধিকারি-নির্বিশেষে সকলের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলাম। ইহার ফলে সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ যেমন ব্যাহত হইয়াছিল তেমনি অতীন্দ্রিয় দিকের শ্রেষ্ঠতাও লোপ পাইয়াছিল। গীতা এইরূপ 'একদর' প্রণালীর ব্যবস্থা দেন নাই। গীতার বিশ্বাস মানব-প্রকৃতির বৈচিত্র্যে, প্রকৃতি-অনুযায়ী বিভিন্ন আধ্যাত্মিক সাধনায়। অতএব আমাদের সকলের জন্যই গীতায় পথনির্দেশ পাওয়া যাইবে। এই ভাবেই গীতা বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত।

গৌরীশৃঙ্গঅভিযানের সঙ্কল্প লইবার আগে প্রথমে আমাদিগকে ছোট ছোট পাহাড়গুলিতে উঠিতে হইবে। ব্যাপকতম অর্থে আমরা প্রত্যেকেই সাধক। বহুকে স্মরণপথে রাখিয়া অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ উভয়ই নিঃশ্রেয়স বা মুক্তির জনক। ইঁহাদের মধ্যে কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মযোগই বিশেষভাবে অবলম্বনীয়।"[২]

"যিনি বাস্তবিকই ত্যাগকে অবলম্বন করিয়াছেন তিনি সন্ন্যাসীর বাহিরের চিহ্ন ধারণ না করিলেও নিত্যসন্ন্যাসী। রাগ-দ্বেষ দ্বারা যিনি বিক্ষুব্ধ হন না, পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবরাশি হইতে যিনি মুক্ত তিনি সহজেই সংসারবন্ধন হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন।"[৩]

অতএব প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী ও কর্মযোগী—ইঁহাদের মধ্যে পার্থক্য নাই। "বালক-বুদ্ধিরাই সাংখ্য বা সন্ন্যাস এবং যোগ বা কর্মযোগের মধ্যে ভেদ করিয়া থাকে, জ্ঞানীরা নয়। যিনি একটিকে ঠিক ঠিক অনুসরণ করিতে পারেন তিনি উভয়েরই ফল প্রাপ্ত হন।"[৪]

"সাংখ্য (সন্ন্যাস) দ্বারা যাহা লাভ হইবে যোগ (কর্মযোগ) দ্বারাও তাহা পাওয়া যাইতে পারে। সাংখ্য ও যোগকে যিনি এক করিয়া দেন তিনিই যথার্থ তত্ত্বদ্রষ্টা।"[৫]

এই ছয়টি শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাস ও কর্মযোগের মর্ম বুঝাইয়াছেন। মৌলিক এবং নির্ভীক তাঁহার বাণী। মানবপ্রকৃতির গূঢ় বিশ্লেষণ করিয়া তিনি মানবজীবনের একটি সম্পূর্ণ দর্শন দিয়াছেন।

২ সংন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসংন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥
(গীতা—৫।২)

৩ জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥
(গীতা—৫।৩)

৪ সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥
(ঐ—৫।৪)

৫ যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
(ঐ—৫।৫)

সাধনা ও সেবা

শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করী রায়

জন্মজন্মান্তরের কত পুণ্যফলে দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করা যায়। ইহার সার্থকতা একমাত্র সাধনায়। সাধনার অর্থ ভগবানকে একান্তভাবে লাভ করিবার প্রচেষ্টা। সে চেষ্টা যুগযুগান্তর ধরিয়া কেবলমাত্র মানুষের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। সাধারণ মানুষের অজ্ঞানান্ধকার ঘুচিয়া যখন জ্ঞান-আঁখি খুলিয়া গিয়াছে তখনই তাহার সন্ধান আরম্ভ হইয়াছে সেই নিরাকার, নিরাধার, নির্বিকল্প পরব্রহ্মের।

তাই সংসারাসক্ত ভ্রান্তজীব একদিন সর্বত্যাগী হইয়া যোগীঋষি আখ্যা পাইয়াছেন, এবং আজীবন কঠোর সাধনার দ্বারা মুক্তির পথ-আবিষ্কারে চলিয়াছেন। কেহ পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন কেহ বিফল হইয়াছেন। তথাপি বিরত হন নাই। কিন্তু যোগীঋষিগণ ধ্যানে যাঁহার দর্শন পান নাই, আমরা বিষয়মদে মত্ত কীটানুকীট জীব কিরূপে ভগবানের সান্নিধ্যলাভ করিব? উপায় অবশ্যই আছে। চাই উদ্দাম আশা ও স্থিরপ্রজ্ঞ হইয়া প্রতীক্ষা। এইজন্যই আশাবাদী মানবের সাধনা অফুরন্ত, অসীমের সন্ধানও অনন্ত।

কবি গাহিয়াছেন—

"যতই না পাব তত পেতে চাব
ততই বাড়িবে পিপাসা আমার।"

সাধনমার্গ অতীব কঠিন। পূর্বজন্মের সুকৃতি এবং আন্তরিক ব্যাকুলতা উভয়ের মিলনের ফলে কাহারও কাহারও অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যায় তখন তিনি সেই পরব্রহ্মের দর্শনলাভ করিতে সক্ষম হন। সর্বাগ্রে চাই শ্রীভগবানের কৃপা। কৃপাময় কৃপা তো করিয়াই আছেন। তিনি যে ভক্তের একান্ত আপনজন। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ব্রহ্মময়ী রামপ্রসাদের আকুল ডাকে কন্যারূপে দেখা দিয়া বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। ভক্তের ডাকে তিনি নামিয়া আসেন। ভক্তকে না হইলে তাঁহার চলে না। তাই বিশ্বকবি গাহিলেন:—

"তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর—
তুমি তাই এসেছ নীচে, আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম যে হ'ত মিছে।"

সংসারে আমরা কি দেখিনা মাতা গৃহকর্মে ব্যাপৃতা, কিন্তু তাঁহার মনটি পড়িয়া থাকে সন্তানের প্রতি, কর্ণ উৎগ্রীব। শিশুসন্তানটি খেলিতে খেলিতে পড়িয়া গিয়া একবার 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেই মাতা শতকাজ ফেলিয়া যেখানে থাকুন না কেন সেই কাতর আহ্বানে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া সন্তানকে বক্ষে তুলিয়া লন এবং বেদনার স্থানটি কোমল স্নেহস্পর্শ দ্বারা সুশীতল করিয়া দেন। পার্থিব মাতার এই দৃষ্টান্ত হইতে হৃদয়ঙ্গম হয় বিশ্বজননীর অনিমেষ আঁখি সততই আমাদের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। যে স্নেহদৃষ্টি সৃষ্টি ব্যাপিয়া রহিয়াছে তাহা অতুলনীয়। মোহান্ধ আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না। ব্যাকুলভাবে সচেতন হইলেই তাহা উপলব্ধি করা যায়।

মাতার নিঃস্বার্থ বিমল স্নেহ লাভ করিতে হইলে কেবল তাঁহাকে একা প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিলে চলিবে না। সহোদর সহোদরা ভ্রাতাভগিনীদিগকে স্নেহপাশে বাঁধিতে হইবে। মাতার যে, সকল সন্তানের প্রতি সমদৃষ্টি, সমান স্নেহ। সুতরাং মাতা সুখী হন যদি প্রত্যেক ভাইভগিনী একে অপরকে নিঃস্বার্থ-ভাবে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসে এবং পরস্পর পরস্পরের জন্য প্রাণ ত্যাগ স্বীকার করে।

বিশ্বের জননী জগদ্ধাত্রী এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন তিনি মাতা জগৎব্যাপী তাঁহার সন্তান। এই বিশ্ব তাঁহারই একটি সুবিশাল প্রেম-পরিবার। সুতরাং তাঁহাকে ভালবাসিতে চাহিলে

সর্বাগ্রে বিশ্ববাসীকে প্রীত করিতে হইবে। জগৎ-সংসারে কেহ কাহারও শত্রু নহে, সকলেই মিত্র, সকলেই আত্মীয়, আপনজন। সুতরাং প্রীতি দ্বারা সকলের হৃদয় জয় করিতে হইবে। যাহাদের সহিত রক্তের সম্বন্ধ, যাহারা প্রিয় তাহাদের ভাল সকলেই বাসিতে পারে। কিন্তু এই বিশ্বের এককোণে পড়িয়া আছে কত দুঃস্থ, ঘৃণিত পাপী তাপী তাহাদের প্রেমালিঙ্গন কয়জনে দিতে পারে? যে পারে সেই ধন্য! তাহার সাধনা শ্রেষ্ঠ সাধনা। বিশ্বপ্রেম দ্বারা চিত্ত কোমল ও শুদ্ধ হয়। কোমলতা ও শুচিতা হইতে ক্ষমার উৎপত্তি। তখন কাহারও দুর্ব্যবহার আমায় পীড়া দিতে পারে না। সহজেই তাহাকে ক্ষমা করতে সক্ষম হই। কারণ তাহাকে যে আমি ভালবাসি। তাহা হইলে এই যে ক্ষমা করিবার শক্তি প্রীতির উৎস। ক্ষমার মূর্ত প্রতীক যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও শত্রুদিগের জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"পিতঃ ইহাদের ক্ষমা কর, ইহারা জানে না ইহারা কি করিতেছে।" এইরূপ ক্ষমা দ্বারা সাধনায় সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

সাধনার অপর ইঙ্গিত সেবা। ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ সহজ নহে। সুতরাং তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ কোথায়? তাঁহার সৃষ্ট প্রত্যেকটি জীবই মূর্তশিব। শিবজ্ঞানে তাহাদের সেবা করিলে বিশ্বনাথেরই সেবা করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ইহা জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাই তাঁহার সাধনা ছিল দরিদ্রনারায়ণের সেবা—তিনি বলিয়াছেন :—

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

মানবের সেবা প্রকৃত ভগবানেরই সেবা।

এই যুগেই আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি মহামানব মহাত্মা গান্ধী সাক্ষাৎ ভগবানের সেবাজ্ঞানে আজীবন দুঃস্থ, পীড়িত, অভাবগ্রস্ত হরিজনদিগের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। অহিংসা ও প্রেমই ছিল তাঁহার সাধনার মূল।

আমার প্রতিবেশী রোগযন্ত্রণায় কাতর, দুঃসহ শোকে মুহ্যমান, দারিদ্র্যের কশাঘাতে ক্লিষ্ট নিপীড়িত। আমার ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা তাহার সেবা, সান্ত্বনা, প্রতিকার না করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা জপ-ধ্যানে কাটাইলে ভগবানের সাধনা হয় না। ভগবান তাহাতে প্রীত হন না।

এক বিশিষ্ট ভক্তিভাজন সাধকের নিকট হইতে উপদেশ পাইয়াছিলাম রুগ্ন, ভগ্ন, সংসারতাপে তাপিত, শোকে জর্জরিত, দুঃস্থ অসহায় গৃহহারা যাহারা তাহাদের অর্থ সামর্থ্য দিয়া সাহায্য করিতে না পারিলে তাহাদের কল্যাণ ও শান্তির জন্য প্রতিদিন ভগবানের চরণে আকুল হইয়া প্রার্থনা করিলে ভগবানকেই প্রীত করা হয়। ইহা সাধনার অপর অঙ্গ। ঐ ভক্তের জীবনে এই সাধনার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়াছি।

ভগবানের প্রিয়কার্য সাধন অন্যতম সাধনা। তাঁহার প্রিয়কার্য কি? মানবসেবা। জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত সফল করিয়া তুলিতে হইবে আর্তের সেবা, সৎকার্যে ব্যয়, পরোপকারে নিয়োগ দ্বারা। মনে রাখিতে হইবে কামনা রহিত হইয়া, কারণ কর্মের একটা নেশা আছে, নিষ্কাম কর্ম সুকঠিন। এই কর্মই একদিন মানুষকে মোহগ্রস্ত করে; সুতরাং এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন একান্ত প্রয়োজন। কর্মের ফলাফলের আশঙ্কা না করিয়া, আমিত্ব বিসর্জন দিয়া সরলপ্রাণে সম্পূর্ণরূপে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া "প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কাজে তাঁর" প্রকৃত উপাসনা সাধনা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বীজমন্ত্রের মধ্যে অন্যতম মন্ত্র ছিল "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

এই উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

তিনি যখন হিমালয়ে একান্তে বসিয়া সাধনা করিতেছিলেন তখন তিনি পরমেশ্বরের বাণী শ্রবণ করেন, "এই পর্বতবাহিনী নীচগামী নদীর ন্যায় তুমিও নামিয়া গিয়া যে পরমানন্দ লাভ করিয়াছ তাহা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কর।"

মাতার অনাবিল অফুরন্ত স্নেহ যেমন একা উপভোগ করিয়া তৃপ্তি হয় না, সকল ভাইভগিনীর মধ্যে বণ্টন করিয়া প্রাণ আনন্দে উথলিয়া উঠে, সেইরূপ ভগবৎকৃপা একা লাভ করিয়া প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না, সেই অমৃত বিশ্ববাসীকে আস্বাদন করাইবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠে।

তাই ঋষি সুরলোকবাসী সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন :

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা, আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ,
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

জীবন

"ভাস্কর"

মহাকালসিন্ধুনীরে তরঙ্গহিল্লোলে
রূপরসছন্দময় শীর্ষে তার দোলে
কোটি কোটি প্রাণময় বুদ্বুদের রাশি,
ছড়ায় দিগন্তকোলে স্বচ্ছ সূক্ষ্ম হাসি
ক্ষণিকের তরে; শুধু ক্ষণিকের খেলা,
ক্ষণিকের রূপ-রাগ অঞ্জনের মেলা।
নাহি কোন অর্থ তার? শুধু মরীচিকা?
শুধুই নির্বাণ লভে স্ফুলিঙ্গের শিখা?

বিশ্বাস করিতে হবে, কোন অর্থ নাই
এই তুচ্ছ জীবনের নাহি কোন ঠাঁই
অনন্ত বিশ্বের তানে? প্রতি অণু তার
বিধাতার হাতে গড়া সুরের ঝংকার,
উদাত্ত মহিমাময় জলন্ত নিঃশ্বাস,
জ্ঞানবুদ্ধিপ্রেমময় আত্মার বিকাশ।
জীবন সাধনাধন তুচ্ছ আত্মভোলা
অনন্তের মণিকোঠা-মাঝে রবে তোলা।

পরাশরীয় উপপুরাণ

অধ্যাপক শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ,

সমগ্র সংস্কৃত-সাহিত্যের মধ্যে বোধহয় ভগবান ব্যাসদেবের নামে প্রচলিত গ্রন্থের সংখ্যাই অধিক। মহাভারত প্রভৃতির কথা বাদ দিলেও অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও বহুসংখ্যক উপপুরাণ এমনকি অনেক স্মৃতিগ্রন্থও—যেমন পরাশর-সংহিতা প্রভৃতি তাঁহারই লেখনীপ্রসূত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। এই ব্যাসদেব কে ছিলেন, এতগুলি গ্রন্থের রচয়িতা সত্যই তিনি কিনা—এই সব ঐতিহাসিক আলোচনার স্থান এই প্রবন্ধে নাই। ব্যাসদেবের নামে প্রচলিত একটি উপপুরাণের কথাই এ স্থলে আলোচিত হইবে।

অষ্টাদশ মহাপুরাণ কি কি ইহা লইয়া বিশেষ মতভেদ নাই। বিশেষ কথাটি বলিবার তাৎপর্য এই যে বায়ু বা শিবপুরাণ লইয়া কিছু গোলমাল। কোন কোন পুরাণে অষ্টাদশ মহাপুরাণের তালিকার মধ্যে হয় বায়ু, না হয় শিব, অথবা দুইটিই উল্লিখিত

আছে। কিন্তু উপপুরাণ লইয়া মতভেদের আর শেষ নাই। অনেকের মতে প্রথমে মহাপুরাণের ন্যায় উপপুরাণও ছিল অষ্টাদশ কিন্তু পরবর্তীকালে ইহা প্রায় অসংখ্যের পর্যায়ে পৌছিয়াছে। বস্তুতঃ বর্তমান সময়ে আমরা যে সমস্ত উপপুরাণের নাম পাই তাহাদের সবগুলিই যে আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহা নহে, অনেক উপপুরাণের নামটুকুই মাত্র অবগত আছি কিন্তু তাহাদের পরিধি, প্রকার ও আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। নানাকারণে তাহারা অধুনা অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ডাঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া কতকগুলি লুপ্ত উপপুরাণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন (Asiatic Societyর Journal এ তাঁহার 'Some Lost Upapuranas শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। বর্তমান প্রবন্ধকার কিছু প্রচীন পুঁথিপত্র অনুসন্ধান করিতে করিতে 'পরাশরীয় উপপুরাণ' সম্পর্কে কিছু তথ্য অবগত হন। এই পরাশরীয় উপপুরাণ বর্তমান সময়ে অপ্রাপ্য ; ইহার পুঁথিও প্রায় দুর্লভ। ইহা লইয়া ইতিপূর্বে কেহ আলোচনাও করেন নাই। কাজেই এই প্রসঙ্গে কিছু বলিবার অবকাশ আছে বলিয়া বোধ হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি সকল পুরাণগুলিই ব্যাসদেবের লিখিত বলা হইয়া থাকে। আলোচ্যমান পরাশরীয় উপপুরাণটিও ইহার ব্যতিক্রম নহে, ইহার নামটিই সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে 'বেদসারসহস্রনামটীকা' (বা শিবসহস্রনামটীকা ৯০নং জি ৮৪০১) নামক পুঁথি আছে। 'পরাশরীয়' উপপুরাণ হইতে এই পুঁথিতে কিছু পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই উদ্ধৃতিসমূহের উপর নির্ভর করিয়াই পরাশরীয় উপপুরাণ সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়াস পাইতেছি।

পরাশরীয় উপপুরাণ যে মূলতঃ শৈব উপপুরাণ ছিল সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 'অন্যনাং লব্ধজাতীনামাশ্রমানাং তথৈব চ। প্রাধান্যেন মহাদেবঃ পূজ্যো নান্যোঽস্তি সিদ্ধয়ে'। ('বেদসার-সহস্রনাম-টীকা' পুঁথি পৃষ্ঠা ১৯ ক) এই পঙ্‌ক্তিটি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে দেবাদিদেব মহাদেব ভিন্ন অন্য কেহই আর মনুষ্যকে মুক্তি দিতে সক্ষম নন, আর এক স্থলে বলা আছে যে, সকল মনুষ্যজাতি অপেক্ষা জম্বুদ্বীপনিবাসী মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ। তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পাইবার অধিকারী ব্রাহ্মণ। বস্তুতঃ বিপ্রেরা পৃথিবীর দেবতা বিশেষ (বিপ্রাদ্ বরিষ্ঠো নাস্তি কশ্চনঃ। বিপ্রঃ সমস্তমর্ত্যানাং দেবতা হি ন সংশয়ঃ' ॥ ঐ পৃষ্ঠা ৬৯খ)। কিন্তু এই পার্থিব দেবতা অপেক্ষা স্বর্গস্থ দেববৃন্দ অধিকতর বরেণ্য। সমস্ত দেবতার মধ্যে ব্রহ্মাই শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু লোকপালক মহাবিষ্ণুর স্থান ব্রহ্মা হইতেও উচ্চে। ('বিপ্রাদপি ভূদেবাদ্ বরিষ্ঠা দেবতা স্মৃতাঃ। দেবতাভ্যঃ সমস্তাভ্য শ্রেষ্ঠা (স্রষ্টা ?) ব্রহ্মাবরঃ স্মৃতঃ। ব্রহ্মণশ্চ মহাবিষ্ণুর্বরিষ্ঠঃ সর্বপালকঃ ॥' ঐ, ঐ) কিন্তু ইহা বলিয়াই গ্রন্থকার ক্ষান্ত হন নাই। মহাদেবের স্থান সমস্ত দেবকুল অপেক্ষাও উচ্চে। এমনকি তিনি ব্রহ্মা বা মহাবিষ্ণুরও পূজার্হ। তাঁহাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ('বিষ্ণোরপি বরস্সাক্ষাৎ রুদ্রঃ সংহারকারকঃ। সর্বেষামপি দেবানাং বরিষ্ঠঃ পরমেশ্বরঃ' ॥ ঐ, ঐ) প্রলয়ের দেবতা মহাদেবকে 'রাজাধিরাজ' বলা হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং অন্যান্য দেবতা সেই ত্রিপুরারি মহাদেবেরই আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। ('রাজাধিরাজঃ সর্বেষাং ত্র্যম্বকস্ত্রিপুরান্তকঃ। তস্যৈবানুচরাঃ সর্বে ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদয়ঃ সুরাঃ ॥' ঐ, ১৪ খ)

এইভাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে শৈবধর্মাধারী এই উপপুরাণ মাধ্যমে স্বদেবমাহাত্ম্যবর্ণনে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছে। এমনকি এ কথাও বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই যে সর্ববেদবেদান্ত-সকলপুরাণ-মহাভারত এমনকি বেদাবিরোধী স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ সর্বত্রই সেই একই কথা মহেশ্বরের আরাধনা

ভিন্ন গতি নাই। তাঁহার তৃপ্তি হইলেই সমগ্র জগৎ তৃপ্ত,—তাঁহার পূজাতেই বিশ্বদেবতার পূজা (সদা চ সর্ববেদান্তৈঃ সাদরং প্রতিপাদ্যতে। বেদানুসারিস্মৃতিভিঃ পুরাণৈর্ভারতাদিভিঃ॥ শ্রৌত-স্মার্ত সমাচারৈঃ স এবারাধ্যতে দ্বিজৈঃ। তচ্ছেষত্বেন চারাধ্যাস্তদন্যা সকলা অপি॥ ঐ, ৭৩ খ)। শিব-পুরাণে শিব-রহস্য হইতে 'অর্চয়ধ্বং মহাদেবং, ভজয়ধ্বং মহাদেবং প্রভৃতি প্রকাণ্ড পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া শিবপূজা-মাহাত্ম্য ও অনুষ্ঠানের প্রকার প্রণয়নের চেষ্টা করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ শৈবদর্শনের মূলীভূত কথাই এখানে বলা হইয়াছে। শিব এস্থলে অপ্রমেয়, শান্ত, স্বপ্রকাশ, সর্বসাক্ষী ও মুক্তিদাতা। ('অপ্রমেয়ায় শান্তায় স্বপ্রকাশায় সাক্ষিণে। স্বস্বরূপৈকনিষ্ঠানাং মুক্তিদায় নমো নমঃ' ॥ ঐ, ১১ খ) তিনি সর্বজগতের কারণ, স্বয়ম্ভু, ও সত্যাদিলক্ষণযুক্ত: (সর্বকারণমীশানঃ স্বান্তবঃ সত্যাদিলক্ষণঃ—ঐ ৭৩ খ) (মহাপাপবতাং নৃণাং শিবঃ সত্যাদিলক্ষণঃ ঐ ৯৪ ক) মহাকাল-স্বরূপ শিব সমগ্র তত্ত্বজ্ঞানের আধার। এই তত্ত্বজ্ঞানই হইল সকল শাস্ত্রের সারবস্তু। সর্বজ্ঞ দেবাদিদেবের কারুণ্য ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান প্রকটিত হয় না। ('যৎ সর্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তো যৎ সর্বহৃদয়ানুগম্। যৎ সর্বজ্ঞং বস্তু যৎ তত্ত্বং তদসৌস্থিতঃ' ॥—ঐ ১২০ ক)। তিনি স্বয়ং যোগমার্গ-শিখরে বিরাজমান—পরাশক্তিযুক্ত। (স্বাত্মভূতপরানন্দপরাশক্তিসমন্বিতম্। পরাহন্তামুসন্ধানপরম্ ক্রীড়য়ান্বিতম্॥ ঐ—১০৫ খ) শ্রৌতমার্গ-অনুবর্তিগণের বা নৈষ্ঠিকস্মার্তদিগের শিবভক্তিই পরা বা শ্রেষ্ঠ ভক্তি। ('অনেক-জন্মসিদ্ধানাং শ্রৌতস্মার্তানুবর্তিনাম্। পরতত্ত্বতয়া সাম্ব শিবো [চ] ভক্তিঃ সনাতনঃ' ঐ, ৯৪ ক)

পরাশরীয় উপপুরাণের ভাষা সহজবোধ্য ও সরল। মাঝে মাঝে লেখক উপমাদির মাধ্যমে আপনার বক্তব্যটি সুপরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটি অনুধাবনযোগ্য :—

'শিবদৃষ্টিস্তু সর্বত্র কর্তব্যা সর্বজন্তুভিঃ,।
রাজদৃষ্টিঃ যথামাত্যো ক্রিয়তে সর্বজন্তুভিঃ॥'

(বেদসারসহস্রনামটীকা, পৃষ্ঠা—৯৪ খ)। কাজেই দেখা যায় যে লেখকের কবিত্বশক্তিও নিতান্ত তুচ্ছ করিবার বস্তু নহে।

বেদসারসহস্রনামটীকা হইতে পরাশরীয় উপপুরাণ সম্পর্কে যাহা কিছু জানিতে পারা যায় তাহা লইয়া আলোচনা করা গেল। উপপুরাণটির বেশী পঙ্‌ক্তি টীকাতে উদ্ধৃত হয় নাই। কাজেই আরও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইতে পারিল না। তবে বিশ্বাস করি আলোচিত বহু পুঁথিপত্রে অনুসন্ধান করিলে পরাশরীয় উপপুরাণ সম্পর্কীয় অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। এ বিষয়ে সুধীসমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে প্রবন্ধকারের শ্রম সার্থক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

"নির্জনে সাধন খুব দরকার। যখন মনে কোন বিষয় উদয় হবে, জানবার ইচ্ছা হবে, তখন কেঁদে কেঁদে তাঁর নিকট প্রার্থনা করবে। তিনি মনের সমস্ত ময়লা ও কষ্ট দূর করে দেবেন, আর বুঝিয়ে দেবেন।"

—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

অবতার

৺যোগেন্দ্রকুমার ঘোষ, এম্-এ, বি-সি-এস, রায়বাহাদুর

[পরলোকগত লেখক বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে একজন শক্তিশালী সমালোচক ও দার্শনিক বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। পূর্বে অপ্রকাশিত তাঁহার বর্তমান প্রবন্ধটি (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের একটি অধিবেশনে পঠিত) অবতারবাদ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাগুলির একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা। অবতারবাদ হিন্দুধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "ঋষিরা রামচন্দ্রকে বললেন, 'হে রাম, আমরা জানি তুমি দশরথের ব্যাটা। ভরদ্বাজাদি ঋষিরা তোমায় অবতার জেনে পূজা করুন। আমরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাই।' * * * যার যেমন রুচি। আবার যার পেটে বা সয়। * * * ঋষিরা জ্ঞানী ছিলেন, তাই তাঁরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাইতেন। আবার ভক্তেরা অবতারকে চান—ভক্তি আস্বাদন করবার জন্ত। * * * রাম পূর্ণ ব্রহ্ম, পূর্ণ অবতার, এ কথা বার জন ঋষি কেবল জানত।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ২।২।৩)

এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবন্ধটি সুধীগণের অনুধাবনযোগ্য। —উঃ সঃ]

হিন্দুশাস্ত্রে পরমেশ্বরের দশ অবতারের উল্লেখ আছে। তাহার মধ্যে দশমটি কলির শেষভাগে আসিবেন। হিন্দুর কোন কোন সম্প্রদায় পৌরাণিক এই দশ অবতার ছাড়া আরও অবতার স্বীকার করেন, যথা বেদব্যাস, শঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আজকাল সকল বিষয়েই লোকের অনুসন্ধান প্রবৃত্তি বলবতী হইয়াছে। বিনা যুক্তিতে লোকে শাস্ত্রের কথাই বা শুনিবে কেন?

বঙ্কিমবাবু শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার প্রমাণ করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য। মনুষ্যজীবনে যতদূর উৎকর্ষ আশা করা যাইতে পারে শ্রীকৃষ্ণে তাহা হইয়াছিল। কিন্তু মনুষ্য বিদ্যাবুদ্ধি-সভ্যতায় যতই উন্নত হইতেছে আদর্শ ততই উপরে উঠিয়া যাইতেছে। পূর্বে যাহা আদর্শ ছিল সেই আদর্শে উপনীত মানুষ দেখিতে পায় যে চরম উন্নতি এখনও বহু দূরে। বেলুন ঊর্ধ্বে উঠিলে যেমন বোধ হয় যে আকাশ ভূপৃষ্ঠ হইতে তখন যতদূর ছিল এখনও ততদূর। ইহাও সেইরূপ। যেমন পরিদৃশ্যমান আকাশ অথবা চক্রবাল চক্ষের একটা ভেল্কি মাত্র, কোন বিষয়ের আদর্শও সেইরূপ মানসিক কল্পনা মাত্র। যেমন আদর্শ নদী, আদর্শ পর্বত, আদর্শ বৃক্ষ প্রভৃতির অস্তিত্ব নাই ও থাকিতে পারে না সেইরূপ আদর্শ মনুষ্যেরও অস্তিত্ব নাই ও থাকিতে পারে না।

মানবপ্রবৃত্তিগুলি চরম উৎকর্ষে নীত হইলে এবং তাহার সমস্ত গুহ শক্তির বিকাশ হইলে মানুষ যে মানুষই থাকিবে, তাহার প্রমাণ কি? আমরা গরিলা, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতিকে যে চক্ষে দেখি, চরম-উৎকর্ষতা-প্রাপ্ত মানব অর্থাৎ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠতম জীব আমাদের মত মানুষকে যে সেই চক্ষে দেখিবে না তাহার প্রমাণ কি? আদর্শ চিরকালই আপেক্ষিক এবং চিরকালই কাল্পনিক। সশরীরে বর্তমান পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ—যাহা চিরকালই অপরিবর্তিতরূপে আদর্শ থাকিবে এইরূপ আদর্শের অস্তিত্ব অসম্ভব।

তবে সমসাময়িক অন্যান্য মনুষ্য অপেক্ষা সমধিক শক্তিশালী এবং সর্বগুণে শ্রেষ্ঠ দুই এক জন মহাপুরুষ সময়ে সময়ে কোন কোন সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। কার্লাইল তাঁহাদিগকে 'হিরো' (Hero) বলিয়াছেন। যে দেশের লোক ভাবুকতা-প্রবণ, সে দেশে ঐরূপ মহাপুরুষের জন্ম হইলে অল্পকাল মধ্যেই তাঁহারা ঈশ্বরত্বে উন্নীত হইয়া থাকেন এবং লোকে তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিতে থাকে।

ঈশ্বরের পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব কিনা

এই কথার উত্তরে বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন যে, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ হওয়ার আশঙ্কা নাই কারণ অবতার অস্বীকার করিলে যীশু টেকেন না। যীশুর অবতারত্ব টিকিল কি না টিকিল, তাহাতে অবতারবাদ প্রমাণের কি আসে যায়? খ্রীষ্টানও অবতারবাদী—হিন্দুও অবতারবাদী। খ্রীষ্টানের অবতারবাদ সঙ্কীর্ণ, হিন্দুর অবতারবাদ বরং উদার। কিন্তু হিন্দু খ্রীষ্টান উভয়েই তো অবতারবাদী, সুতরাং তাহাদের মধ্যে অবতারবাদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে মতদ্বৈধের কোনই আশঙ্কা নাই। মতদ্বৈধের আশঙ্কা কেবল অবতারবাদী এবং অবতারবাদ-বিরোধীদের মধ্যে। সে মতদ্বৈধের মীমাংসা হয় নাই।

ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, এ কথাটা শৈশবাবধি শুনিতে শুনিতে আমাদের সহিয়া গিয়াছে। কিন্তু পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে হঠাৎ স্তম্ভিত হইতে হয়। ঈশ্বর কি পৃথিবী ছাড়া কোন উচ্চ স্থানে বসিয়া আছেন যে, তিনি তথা হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া আসিবেন? তিনি কি অবতার হওয়ার সময় ভিন্ন সৃষ্টির সকল স্থানেই থাকেন, কেবল পৃথিবীতেই থাকেন না? যে হিন্দু বলেন যে, প্রতি পরমাণুতে ঈশ্বর ওতপ্রোতভাবে বর্তমান; সর্বত্র প্রবিষ্ট বলিয়া যে হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরের অপর নাম বিষ্ণু; যে জাতির শাস্ত্রে ঈশ্বর স্বয়ং বলিতেছেন যে, মালাস্থ মণিগণ যেমন একই সূত্রে নিবদ্ধ, এই জগতের প্রত্যেক অংশ সেইরূপ আমাতে নিবদ্ধ; সেই হিন্দুর মুখে যখন শুনি যে ঈশ্বর পৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ হন, অর্থাৎ কোন স্থান হইতে নামিয়া আসেন, তখন তাহা বুঝিতে পারি না। এ কথা শয়তানবাদীদের মুখে শোভা পায়, কিন্তু হিন্দুর মুখে শোভা পায় না।

যাঁহারা মঙ্গলময় ঈশ্বর এবং অমঙ্গল ও পাপের জনক ঈশ্বর অর্থাৎ শয়তান, এই দুই ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাঁহাদের অবতার না মানিয়া উদ্ধার নাই। কারণ, তাঁহাদের মতে শয়তানই পৃথিবীটাকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে—পৃথিবীর সর্বত্রই শয়তানের রাজ্য। পূর্বে পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য ছিল বটে, কিন্তু বলবত্তর শয়তান তাহা কাড়িয়া লইয়াছে। অশাসিত এবং বিপক্ষ কর্তৃক আংশিকরূপে (অথবা সর্বতোভাবে) আয়ত্তীকৃত জমিদারীতে যদি জমিদার স্বয়ং অথবা উপযুক্ত কর্মক্ষম পুত্র মধ্যে মধ্যে দু'একবার পদার্পণ করেন, তবে যে দু'একজন প্রজা জমিদারের বাধ্য আছে, তাহারা কর-কবুলিয়ৎ দিয়া একরূপ বশীভূত থাকে, আর বিপক্ষের দলে যায় না। সেইরূপ দুই চারি জন সাধুলোক, যাঁহারা ঈশ্বরের দলে আছেন, তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য এবং বলবত্তর বিপক্ষ শয়তানের ভাঙ্গিবার জন্য স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের অথবা তদীয় একমাত্র পুত্রের পৃথিবীরূপ মফঃস্বলে আসার আবশ্যকতা আছে। শয়তানবাদী ঈশ্বর সর্বদা পৃথিবীতে থাকেন না। তিনি দেশকালে আবদ্ধ। আবশ্যকমত হয় তাহার পুত্র, না হয় তাঁহার বন্ধুকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দেন। শয়তানবাদীর অবতার স্বীকার না করিয়া উদ্ধার নাই। অবতার স্বীকার না করিলে তাহার শয়তানবাদ ছাড়িতে হয়।

হিন্দুর শয়তানবাদ নাই। হিন্দুর দেবাসুর-যুদ্ধ আছে বটে, কিন্তু দেবাসুরের যুদ্ধ এবং ঈশ্বর ও শয়তানের বিরোধ এক বিষয় নহে। দেবাসুরের যুদ্ধকাহিনীর মধ্যে অনেক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। মোটামুটি এই পর্যন্ত বলিলেই এক্ষণে চলিবে যে, যদি দেবাসুর-যুদ্ধকাহিনী দেবপূজক এবং দেবরক্ষিত হিন্দু এবং অসুরপূজক (অসুরো মহান্ বা অহুরমজ্‌দাপূজক) প্রাচীন পারসিকদের গৃহবিচ্ছেদ এবং বৈরিতার কাব্যাকার ইতিহাস হয়, তবে এক কথায়ই গোল মিটে। আর যদি দেবাসুরের যুদ্ধকাহিনী মানবহৃদয়ে সাধুপ্রবৃত্তি এবং অসাধুপ্রবৃত্তির অবিরাম যুদ্ধের রূপক হয়, তাহা হইলে হঠাৎ বোধ হইতে পারে যে, শয়তানবাদীর শয়তান ও ঈশ্বরের চিরবিরোধ যাহা, হিন্দুর দেবাসুরের যুদ্ধও তাহাই।

কিন্তু এ দুইটি এক জিনিস নহে। কোন অসুরই শয়তানের মত ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করে নাই। তাহারা যুদ্ধ করিত ইন্দ্রাদি দেবগণের সঙ্গে এবং তাহাদের লক্ষ্য ছিল ইন্দ্রত্বপদ। ইন্দ্রাদি দেবগণও যেমন ঈশ্বরের সৃষ্ট, অসুরগণও সেইরূপ ঈশ্বরেরই সৃষ্ট এবং ঈশ্বরের বরপ্রভাবে বলদর্পিত। শয়তান-বাদীদের শয়তানকে, তাঁহাদের মতে, ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নাই। ঈশ্বর শয়তানের সাধুতাই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু শয়তান তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিজের সৃষ্ট অসাধুতা দ্বারাই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। শয়তানের শয়তানত্ব ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে, তাহা তাহার নিজের। সে ঈশ্বরপ্রদত্ত বরে বলীয়ান নহে, তাহা তাহার নিজের। শয়তান নিজেই আর একজন ঈশ্বর —যদিও পাপের ঈশ্বর। শয়তানবাদীর ঈশ্বরের সমস্পর্দ্ধী প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, সুতরাং তাহাতে ঐশ্বর্যের অভাব। শয়তানবাদীর ঈশ্বর রজোগুণময়। তাঁহাতে এবং দণ্ডপুরস্কারের বিধাতা মনুষ্য-রাজাতে প্রভেদ অতি অল্প। হিন্দু মনে করেন যে পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, জ্ঞান-অজ্ঞান, রোগ-স্বাস্থ্য, বিষ-অমৃত সকলই এক পরমেশ্বর হইতে। ভগবানের মায়া হইতেই এই রজোগুণময় সৃষ্টি। যতক্ষণ আত্মা মায়াপাশে আবদ্ধ—ততক্ষণ আত্মারূপ স্ফটিক দর্পণে মায়াময় সংসারের রূপরসাদি বিষয়াসক্তিরূপ জবাকুসুমের ছায়া পতিত হইয়া রহিয়াছে, ততক্ষণই পাপপুণ্যে ভেদ, ধর্মাধর্মে ভেদ, জ্ঞান-অজ্ঞানে ভেদ। মায়াপাশ ছিন্ন হইলে—বিষয়াসক্তিরূপ জবাকুসুম অন্তর্হিত হইলে, আত্মা স্বকীয় স্বচ্ছরূপে অবস্থিতি করে, ইন্দ্রিয়গণ তখন আর স্বীয় স্বীয় বিষয়াভিমুখী থাকে না। তখনও আত্মার মুক্তি হইল না, কারণ তখনও তাহাতে সত্ত্বগুণ রহিয়াছে। যখন এই সত্ত্বগুণের পাশ ছিন্ন হয়, তখনই আত্মা মুক্ত হইল, ব্রহ্মে লীন হইল—নির্বাণ লাভ করিল। ব্রহ্ম সত্ত্বগুণেরও অতীত। যখন সত্ত্বগুণের উদয়, তখনও পাপপুণ্য ধর্মাধর্মের কোন কথা নাই। রজোগুণাবির্ভাবের সঙ্গেসঙ্গেই—অর্থাৎ আমি একটি স্বতন্ত্র পদার্থ এবং জগতের অন্যান্য সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক—এই আমিত্ব-জ্ঞানের বা অহংকারের সঙ্গেসঙ্গেই পাপ-পুণ্যাদির আবির্ভাব। জগতে কোটি কোটি "আমি" আছে। প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যত্নবান। প্রত্যেকেই রজোগুণে আবৃত, কারণ স্বতন্ত্র বিদ্যমানতার জ্ঞান (Individualityর জ্ঞান) রজোগুণের প্রধান লক্ষণ। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থবিশিষ্ট রজোগুণময় জগতে সৃষ্টিরক্ষার উপযোগী, সর্বভূতের হিতকর, সুতরাং সৃষ্টিবিকাশের সহায় যে সকল কার্য অথবা কার্যের জননী মানসিক প্রবৃত্তি, তাহাই পুণ্য এবং তদ্বিপরীত কার্য বা প্রবৃত্তি পাপ। রজোগুণের আবির্ভাবের সঙ্গেসঙ্গেই পাপ-পুণ্যাদির আবির্ভাব। সাত্ত্বিক অবস্থায় পাপও নাই, পুণ্যও নাই। সেই অবস্থায় সুখদুঃখাদির বোধ নাই, সুতরাং সুখ দুঃখ কিছুই নাই। সে চিন্ময় আনন্দের অবস্থা। শয়তান-বাদীর ঈশ্বর রজোগুণাত্মক। শয়তানবাদীর ব্রহ্ম-জ্ঞান রজোগুণের উপরে উঠে নাই। আধুনিক ইওরোপীয় দার্শনিকগণের লৌকিক ধর্মে যদিও শয়তানবাদ রহিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান অনেক উচ্চস্তরে উঠিয়া গিয়াছে। হিন্দুর ব্রহ্মজ্ঞান শয়তানবাদীদের ব্রহ্মজ্ঞানের অনেক উপরে। হিন্দু জানেন যে, রজোগুণ ঈশ্বরেরই সৃষ্ট। পাপ-পুণ্য-ভেদ রজোগুণের একটি কার্যমাত্র। সুতরাং যে পরমেশ্বর হইতে পুণ্য, সেই পরমেশ্বর হইতেই পাপ। কথাটা শুনিতে চমক লাগে বটে, কিন্তু কথাটা বড়ই ঠিক। (ক্রমশঃ)

"কলিতে সত্য চিন্তা হলে তার উত্তম ফল হয়।"

—শ্রীশ্রীমা

উৎসব-তীর্থে

শান্তশীল দাশ

জীবনের রুক্ষ পথে অবসর আসে ক্ষণে ক্ষণে,—
সে-ক্ষণ মধুর বড়ো ; মুছে দিয়ে যায় প্রত্যহের
গ্লানিময় অবসাদ ; নৈরাশ্যের দ্বিধা-খিন্ন মনে
জাগে কী প্রসন্ন দীপ্তি—আশীর্বাদ উর্ধ্ব আলোকের।

সে-আলোকে চেয়ে দেখি : চারিদিক আনন্দ-উজ্জ্বল ;
উদাত্ত সংগীতধ্বনি ভেসে আসে ; সুরের বন্যায়
প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র তুচ্ছ ক্ষুব্ধ কোলাহল
সে কোমল স্নেহস্পর্শে নিমেষে নিঃশেষ হয়ে যায়।

সংকীর্ণ বন্ধন-জাল ছিন্ন হয়, উন্মুক্ত উদার
প্রাঙ্গণে একত্রে এসে মিলনের বাজে ঐকতান ;
অসংখ্য সরিৎ-স্রোত মিলে মিশে সব একাকার
সাগরের বক্ষে এসে উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের গান।

বিরোধ-বিভেদ-দ্বন্দ্ব মিথ্যা সব প্রবঞ্চনাময়,
অনিত্যের জাল বুকে নিত্য শুধু ঘটায় প্রমাদ ;
জীবন-মাধুর্য-রস শুষে নিয়ে জাগায় সংশয়—
চলার পথের বুকে বেদনার ক্লান্ত অবসাদ।

সেই মিথ্যা স্তব্ধ হয় উৎসবের আনন্দ-সংগীতে ;
অশুচি, অসত্য যত নিত্যসঙ্গী প্রতি দিবসের,
নির্বাসিত সসংকোচে সুমঙ্গল শঙ্খের ধ্বনিতে ;
জীবন সার্থক হয় স্পর্শ লভি চিরসুন্দরের।

তোমারে প্রণাম করি হে সুন্দর, হে কল্যাণময়,
জীবনের পথে পথে তোমার করুণা-প্রস্রবণ
অজস্র ধারায় ঝরে, চলি তাই একান্ত নির্ভয় ;
তুমি আছ আত্মসঙ্গী সর্বত্র তোমার বিচরণ।

তোমার কল্যাণরূপ দেখি সর্বজনের মাঝারে,
তোমার প্রেমের মন্ত্র শুনি বাজে কণ্ঠে সবাকার ;
তোমার নিবিড় স্পর্শ আলিঙ্গনে প্রতি মানুষের,
তোমারে সবার মাঝে বারে বারে করি নমস্কার।

ত্রিপিটকের সুত্তপিটক*

অধ্যাপক শ্রীগোকুলদাস দে, এম্-এ

'নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স'

ত্রিপিটক একখানি থেরবাদীয় মূল বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থ। খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে কপিলবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থ ২৯ বৎসর বয়সে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন।

গয়াধামে ৬ বৎসর উগ্র তপস্যার পর বোধিবৃক্ষতলে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করে ভারতে বুদ্ধ হয়ে আবির্ভূত হন এবং বারাণসীতে প্রথম ধর্মদেশনা দেন। তারপর পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স থেকে আশি বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর তিনি আর্যাবর্তের নগর, রাজধানী, জনপদ ঘুরে তাঁর অহিংস ধর্ম প্রচার করেন। যেখানেই তিনি

* কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের সৌজন্যে।

যেতেন, সেই প্রদেশের প্রাকৃত ভাষায় ধর্মের উপদেশ দিতেন। তখন চলাচলের সুবিধা না থাকলেও, অসুবিধা ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য একটি রাস্তা উত্তর ভারতের রাজগৃহ থেকে বৈশালী, কুশীনগর, শ্রাবস্তী, কৌসাম্বী, সাঁচি, উজ্জয়িনী, মাহিষ্মতী, বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি অতিক্রম করে দক্ষিণ ভারতে আধুনিক অজন্তা এলোরার নিকটে প্রতিষ্ঠান নগরে গিয়ে শেষ হত।

এই রাস্তাটির বিশেষত্ব এই যে এটি প্রায় সবগুলি প্রাকৃতভাষা-কথনশীল প্রদেশের উপর দিয়েই যেত, যেমন মাগধী, পৈশাচী, সৌরসেনী, মারাঠী ইত্যাদি। মনে হয় এইজন্য সকল প্রাকৃত ভাষা আশ্রয় করে একটা সাধারণ কথ্যভাষা উঠেছিল, যে ভাষাতে তাঁর শিষ্যেরা পরস্পরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন। কিন্তু বুদ্ধদেব এই কথ্যভাষা গ্রহণ করেন নাই। যেখানে গেছেন সেই স্থানের প্রাদেশিক ভাষা ও আচারব্যবহার গ্রহণ করেছেন।

সাধারণতঃ তিনি রাজগৃহের বেণুবন ও শ্রাবস্তীর জেত-বন বিহারেই বেশীর ভাগ উপদেশ দেন। কিন্তু প্রয়োজন হলেই দূরে বা নিকটে যেতেন। সাধারণের বিশ্বাস যে গৃহীদের জন্য তিনি কিছু বলেন নি। ত্রিপিটক শুধু ভিক্ষুদের জন্য। কিন্তু তা নয়, তিনি যখন যেখানে যেতেন সাধারণের উদ্দেশেই উপদেশ দিতেন আর যা বলতেন তা গৃহীদেরই বলতেন, কেননা তারাই তাঁর জন্য সভার আয়োজনাদি করত। ত্রিপিটকেই দেখতে পাব এই সব সভায় তিনি প্রথমেই উপদেশ দিতেন জাতকের গল্প, দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের দুর্গতি, সংযমে স্বর্গ, সত্য দয়া দাক্ষিণ্যের উপকারিতা এবং পরে যখন দেখতেন কেহ কেহ পরাজ্ঞানের অধিকারী বা মোক্ষলাভের প্রয়াসী তখন তিনি বোধিবৃক্ষতলে উপলব্ধ মধ্যপথ উপদেশ দিতেন, মধ্যপথ কি না চতুরার্য সত্য—দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের অন্তকরণ, দুঃখের অন্তকারী মার্গ, আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ: সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাচা, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক আজীব, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি এবং ত্রিলক্ষণ: অনাত্ম্য, অনিত্য ও দুঃখ।

তাঁর প্রচারিত সত্যের নাম দিলেন ধর্ম-বিনয়। ধর্মের প্রধান অঙ্গ হল: আটটি ধ্যান ও বিদ্যাভ্যাস: প্রথম ধ্যানে চারিদিকে মঙ্গল ইচ্ছা ছড়িয়ে দিতে হবে—মা যেমন একটিমাত্র ছেলেকে নিজের প্রাণ দিয়ে রক্ষা করেন এরূপ সকলের প্রতি ভালবাসা ভাবতে হবে। দ্বিতীয় ধ্যানে আনন্দবোধ হবে। তৃতীয় ধ্যানে করুণার উদয় হবে, চতুর্থ ধ্যানে হবে জগতের প্রতি উপেক্ষাপূর্ণদৃষ্টি। আরও উপরে চারটি ধ্যান। এই আটটি ধ্যান বা সমাপত্তি। আর বিনয় হল দশটি শীল: প্রাণীহত্যা করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যা বলবে না, ব্যভিচার করবে না, ফুলমালা ধারণ করবে না ইত্যাদি। বিহারের আচার-ব্যবহারের নিয়ম পালন করবে, উপোসথ করবে, নিস্সয় নেবে, দৈনিক ভিক্ষায় যাবে। ক্রমে ভিক্ষুদের প্রধান কার্য দাঁড়াল লোকসেবা ও বিদ্যা-দান। বুদ্ধদেব তাঁর ধর্ম-বিনয় নানা আকারে ও প্রকারে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে প্রচার করলেন আর তাঁর সংঘ বিহারে বিহারে লোকসেবা ও বিদ্যাদান করতে লাগলেন।

বুদ্ধ ছড়িয়ে দিলেন তাঁর ব্রহ্মবিহার দিকে দিকে। মৈত্রী, মুদিতা, করুণা, উপেক্ষার ভাবে জগৎ স্পন্দিত হল; সর্বলোকে একাত্মক ভাব ফিরে এল। এই পুণ্যক্ষেত্রে আবার প্রতিভাত হল প্রাচীন সত্য—একমেবাদ্বিতীয়ম্, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

এইবার ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষায় প্রদত্ত উক্তি-গুলি সংগ্রহ করবার প্রয়োজন হল। বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর তাঁর শিষ্যেরা মহাধর্ম সম্মেলন করেন, রাজা অজাতশত্রুর সহায়তায় তার রাজগৃহের উপকণ্ঠে বেভার পর্বতের পাশে সপ্তপর্ণী গুহায়।

এই সম্মেলনে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষায় প্রদত্ত তাঁর উপদেশগুলিকে একত্র করে ও তাদের সাহিত্যিক রূপ দিয়ে আগম-পিটক নামে একটি পিটক সম্পাদিত হয়। গৃহীদের জন্য নয়, ভিক্ষুদের জন্য। এতে কৃতিত্ব দেখান আনন্দ এবং উপালি। আনন্দ 'ধর্ম' এবং উপালি 'বিনয়' সংকলন করেন, দুজনাই শাক্য-বংশীয়।

পিটক অর্থে পেটিকা বুঝায় (পেঁড়া বা পেঁটরা) যার মধ্যে মূল্যবান দ্রব্যাদি রাখা হয় এবং সহজে যাকে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। শত বৎসর পরে আর একটি ধর্মমহাসভা আহূত হয়, বৈশালীতে। বিনয়-সম্পর্কে কিছু মতভেদ ও গণ্ডগোল হওয়ায় আগম-পিটকটি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে 'ধম্ম' ও 'বিনয়' দুটি পৃথক পিটকের সৃষ্ট হয়। ক্রমে ধর্মের মধ্যে নানা বিরোধ উপস্থিত হলে মহারাজ অশোকের নেতৃত্বে তৃতীয় ধর্মমহাসভা পাটলিপুত্র নগরে আহূত হয় এবং একখানি দর্শন নিয়ে ধর্মের সুগভীর আলোচনাপূর্ণ অভিধর্ম্ম-পিটক সৃষ্টি হয়। এই ধর্ম্মবিনয় অভিধর্ম্ম-যোগে ত্রিপিটকে নিবদ্ধ হল থেরবাদীয় সমগ্র বুদ্ধদেবের ধর্ম। তখন লেখার প্রথা হয় নাই।

এক একটি পিটক মুখস্থ করে থের ভিক্ষুগণ আচার্য হলেন। কেহ ধর্মাচার্য, কেহ বিনয়াচার্য, কেহ অভিধর্মাচার্য ও তাদের বিষয়গুলিকে পেটিকার মত বয়ে স্থানান্তরে নিয়ে যেতে লাগলেন। ভারতে এই পিটকগুলির পরিবর্তন ঘটতে লাগল।

কিন্তু সুখের বিষয় যে ত্রিপিটক হওয়ার পরই মহারাজ অশোক সিংহলে সদ্ধর্ম প্রচার করার জন্য তাঁর পুত্র ভিক্ষু মহেন্দ্রের নেতৃত্বে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর একটি দল পাঠান আর তাঁরা সেখানে সদ্ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে ত্রিপিটক আজ পর্যন্ত সঠিক ও সচল রেখেছেন, তবে এখন মুখস্থ রেখে নয় পুঁথিতে লিখে; যেটা প্রথম আরম্ভ হয় সেটা সিংহলের রাজা ভটগামিনীর সময়ে প্রথম শতাব্দীতে।

ধর্ম-পিটকের আর একটি নাম সুত্তপিটক। এই পিটকে বুদ্ধদেবের প্রত্যেকটি ভাষণ 'এবং মে সুতং' এই কথাটি দিয়ে আরম্ভ হয়েছে তারই জন্য। 'আমি ইহা শুনেছি' বলছেন আনন্দ। এটি পাঁচ-ভাগে বা নিকায়ে বিভক্ত: দীঘ, মজ্ঝিম, অঙ্গুত্তর, সংযুক্ত ও খুদ্দক। দীঘ-নিকায়ে সুত্ত থেকে বড় বড় দীর্ঘ দীর্ঘ সুত্তন্ত আছে, যেমন বেদ থেকে বেদান্ত। মজ্ঝিম-নিকায়ে মধ্যম আকারের সুত্ত দেওয়া হয়েছে। অঙ্গুত্তর-নিকায়ে একটি অঙ্কবৃদ্ধি করে পর পর বুদ্ধদেবের ছোট ছোট বাণী ও জীবনী সাজানো হয়েছে। সংযুক্ত-নিকায়ে আছে এক একটি অধ্যায় এক একটি বিষয় নিয়ে, যেগুলিকে অন্য কোথাও দেবার সুযোগ পাওয়া যায়নি। আর খুদ্দক-নিকায় কতকগুলি প্রাচীন ও পরবর্তীকালের উক্তি-সংকলিত ছোট ছোট পুস্তকের সমাবেশে নিষ্পন্ন।

তখন সমস্ত ধর্মগ্রন্থ মুখস্থ করতে হত। এই বিভাগগুলি হয়েছে স্মরণশক্তিকে সাহায্য করার জন্য এরূপ মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু শুধু বাহ্যিক কারণে নয়। এই পাঁচটি বিভাগের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন উদ্দেশ্য আছে, সেগুলি এক নয় কিন্তু একসঙ্গেই হয়েছিল। 'পঞ্চ নেকায়িক পাঁচটি নিকায় জানেন' এই কথাটি গোড়া থেকেই শীলা-লেখতে পাওয়া যায়।

১। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে দীঘ-নিকায়ে ধর্মের উদার ও শ্রেষ্ঠ সত্যগুলির তত্ত্ব দেওয়া আছে। বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র 'অপ্রমাদ' শব্দটির বিশদ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ এখানে যেমনটি আছে আর কোথাও সেরকম নেই। পুরুষকারকে শ্রেষ্ঠ বলে অঙ্গীকার এই দীঘ-নিকায়ে পাওয়া যাবে :— নির্বাণের স্বরূপ, ধর্মের নানারূপ বিভাগ ইত্যাদি। কেবট্ট সুত্তন্তে নির্বাণের বর্ণনা :—বিঞ্ঞাণং অনিদস্সনং অনন্তং সব্বতোপহং—নির্বাণ অনিদর্শন অনন্ত সর্বদিকসঞ্চারী বিজ্ঞান, যেখানে আসাযাওয়া, জন্ম-মৃত্যু, ছোটবড় সব নিবৃত্তি পায়।

মহাপরিনির্বাণের মূল মন্ত্র 'বয়ধম্মা সংসারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথা'—জগতে সমস্ত বস্তু অনিত্য, আত্মশক্তিতে পরম উদ্দেশ্য বোধি উপলব্ধি কর।

আবার গৃহীদের জন্য উপদেশ--তাও আছে। সীগালোবাদ সুত্তন্তটিকে অনেকে 'গৃহীবিনয়' বলেন।

মজ্ঝিম-নিকায়ে শিক্ষা দীক্ষা সাধন প্রভৃতির কথা বিশদভাবে বলা হয়েছে। অধিচিত্ত, অধিশীল অধিপ্রজ্ঞার বিশদ বর্ণনা এবং বুদ্ধের প্রতি ভক্তি ভালবাসার ফল স্বর্গ, এ কথাও আছে। বুদ্ধদেবের পূর্বাচার্যদ্বয় আড়ার কালাম ও রুদ্রকরামপুত্রের কাহিনী ও তাদের কঠোর তপস্যা ও সাধনার বর্ণনাও আছে। মন সকলের শ্রেষ্ঠ। সেজন্য সাধনার প্রয়োজন। মনে ময়লা থাকলে দুর্গতি ও মন বিশুদ্ধ থাকলে সুগতি হয়। আবার বুদ্ধ বলছেন, যাঁরা কেবল আমাকে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন তাঁরাও বিশুদ্ধ হয়ে স্বর্গে যাবেন।

যেসং ময়ি সদ্ধামত্তং পেমমত্তং সব্বেতে সগ্‌গ পরায়ণা। এই সমস্ত মজ্ঝিম-নিকায়ের বিশেষত্ব।

৩। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বুদ্ধের ও তাঁর পূর্ববর্তী কুমার-সিদ্ধার্থ-জীবনের ছোট ছোট কথা পাই। খুব প্রাচীন ভাব ও পরবর্তী বোধিসত্ত্ববাদের সূচনা এতে বিদ্যমান। নির্বাণ অতি অল্প কথায় বুঝান হয়েছে।

যতো খো অয়ং ব্রাহ্মণ অনব সেসং রাগক্‌খয়ং, দোষক্‌খয়ং, মোহক্‌খয়ং, পটিসংবেদেতি এবং ব্রাহ্মণ সন্দিটিকো নিব্বানং হোতি—হে ব্রাহ্মণ যেখানে দেখবে নিরবশেষ মোহক্ষয়, দ্বেষক্ষয় রাগক্ষয় সেইখানেই জানবে ইহজগতে নির্বাণ বর্তমান।

ব্রত আচার, 'শীলব্রত পরামস' নামে বৌদ্ধধর্মে চিরকাল বর্জনীয়, কিন্তু আনন্দ বল্লেন, যে শীলব্রত অনুষ্ঠান করলে পাপ বাড়ে ও পুণ্য কমে সে শীলব্রত বর্জনীয়, আর যে শীলব্রত পালন করলে কল্যাণ হয় সে শীলব্রত করণীয়। এই কথায় ভগবান বুদ্ধ বলেন, আনন্দ যদিও এখন শিক্ষাধীন তবুও তার মত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি আর নেই। পরবর্তী যুগের মহাযানীয় ভাব এতে পড়েছে।

৪। সংযুক্ত-নিকায়ের সমস্তটি পুরাতন তত্ত্বে ভরা। দেবতা এসে যখন জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনি কিরূপ সংগ্রাম করে সংসার-সাগর অতিক্রম করেছেন' বুদ্ধদেব উত্তর করলেন 'অপ্পতিট্ঠাহং আবুসো অনায়ুহং ওঘং ওতরিং—পদক্ষেপ না করেই বা কোন সংগ্রাম না করেই আমি ভবসাগর পার হয়েছি।' বুদ্ধদেব ভগবানের আসন নিয়েছেন।

রাহুকে বলছেন—রাহু, সূর্যকে গিলো না, ছেড়ে দাও, ও আমার প্রজা, 'মা গিলি রাহু পজং মম পমুঞ্চ সুরিয়ং।' মহাকাল বিরাট রাক্ষসের মত সমস্ত গ্রাস করতে আসছে এজন্য বুদ্ধধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ হও। ভক্তি শ্রদ্ধার উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া হয়েছে। উপদেশগুলি প্রায় সবগুলিই গৃহীদের উদ্দেশ্যে।

৫। খুদ্দক-নিকায়ে মৌলিক উক্তি ও পরবর্তী কালের রচনার সমাবেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থের আবির্ভাব। যেমন খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, জাতক ইত্যাদি। খুদ্দক-পাঠে প্রাচীন ভাব। বুদ্ধদেব 'বরো বরঞ্ঞূ বরদো বরাহরো—যিনি শ্রেষ্ঠ হয়েছেন, শ্রেষ্ঠ জানেন, শ্রেষ্ঠ আনেন ও প্রদান করেন তাঁর ধর্ম খয়ং বিরাগং অমতং পনীতং—পাপক্ষয়কর বৈরাগ্যজনক, অতি শ্রেষ্ঠ অমৃত তত্ত্ব। পরবর্তী কালের রচনা—যেমন বুদ্ধ-বংশ, চর্য্যা-পিটক, নিদ্দেশ ইত্যাদি। এতে বোধিসত্ত্ববাদ 'যদা অহং কপি আসিং নদীকূলে দরিসয়ে', চর্যাপিটক—বলছেন আমি বাঁদর হোয়ে নদীকূলে পড়ে থাকতাম। উদান নামে খুদ্দক-পিটকের প্রাচীন গ্রন্থে আছে—অত্থি ভিক্‌খবে অজাতং অভূতং অকতং অসংখতং যদি ভিক্‌খবে অজাতং অভূতং অসংখতং ন অভবিস্‌স ইতো নিস্‌সরণং ন পঞ্ঞায়েথ'—হে ভিক্ষুগণ, অজাত [illegible]

অসংস্কৃত এক স্থান আছে, যদি তা না থাকত এই নশ্বর পৃথিবী থেকে মুক্তি সম্ভবপর হত না। যথ আপো চ পঠবী তেজো বায়ো ন গাধতি—ক্ষিতি অপ তেজ বায়ু যেখানে প্রবেশ করতে পারে না।

নতথ সুক্কা জোতন্তি আদিচ্চো ন প্পকাসতি
নতথ চন্দিমা ভাতি তমো তথ ন বিজ্জতি।

এই সুত্তপিটক পালি টেক্স্ট্ সোসাইটীর ২০ খানি গ্রন্থে সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর মানস-ভূমি

শ্রীপ্রণব ঘোষ, এম্-এ

(পূর্বানুবৃত্তি)

কেশবচন্দ্রের পরে "স্বামী বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ" প্রবন্ধটিতে লেখক* স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তারাশির বিশ্লেষণ করে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে স্বামীজীর ধ্যান-ধারণাকে যাচাই করতে চেয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দের সমকালীন ভাবপরিমণ্ডল সম্বন্ধে আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে, উনিশ শতকের প্রথম ভাগে যে ইংরেজ-সাহচর্য এদেশবাসীর "সর্বপ্রকার বৈষয়িক ও ব্যবহারিক সমৃদ্ধির একমাত্র উপায়" ছিল, উনিশ শতকের মাঝামাঝি এসে "সেই ইংরেজ-সাহচর্যই তখন ক্রমাগত ব্যর্থতা, নৈরাশ্য ও দুর্গতির বাহন হয়ে পড়েছে।" লেখকের ধারণা, সেই কারণেই তখনকার দিনের চিন্তানায়কেরা, যাঁরা রামমোহন রায়ের মানস-বংশধর তাঁরা, "... পুরাতন শ্রুতি-স্মৃতি-বিশ্বাস আর মোহের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে ব্যর্থ ও অস্বীকৃত বর্তমানের ক্ষতিপূরণ করছেন।" অর্থাৎ যেহেতু ব্যবহারিক জীবনে আর ইংরেজের সাহচর্যে উন্নতি হচ্ছে না, সেহেতু এদেশবাসীর মন ফিরে গেল ধর্মাচরণের দিকে। যদি তাই হয়, তাহলে রামমোহনের বেদান্ত-প্রচারের কারণ কি? দেবেন্দ্রনাথ কেন ভক্তির দৃষ্টি দিয়ে বেদান্ত-চিন্তাকে নূতন রূপ দিতে চাইলেন? অন্ততঃ এ দুজনের সময়ে তো ইংরেজ-সাহচর্য উন্নতির কারণ ছিল! রামমোহনের সাধনাই ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলন-সাধনা। ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্ত্যের ছাঁচে ঢেলে তৈরী করতে রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ অবধি কেউ চান নি। আসল কথা এই, পাশ্চাত্ত্যসভ্যতার আলোকে ভারতবর্ষে সে যুগে যে নবজাগরণ ঘটেছিল, সেই নবজাগরণ তখনই সার্থক হ'লো যখন জাতীয় ঐতিহ্যে আমরা সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লাম। আমরা যে কেবলমাত্র গ্রহীতা, বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের সমস্ত দখলটাই যে পাশ্চাত্ত্যের হাতে, এমন ধারণা থেকে মুক্তি না পেলে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনই ব্যর্থ হয়ে যেত। তাই উনিশ শতকে আমরা যেমন একদিকে পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেছি, আর একদিকে প্রাচ্য জ্ঞানবিজ্ঞান (শাস্ত্রজ্ঞান এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধিজাত জ্ঞান)—সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে উঠেছি। সেই সঙ্গে স্বদেশীয় সংস্কৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জেগেছে। এই নবযুগের বাণীই ছিল—"Give and take"—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে।" রামমোহনের রচনাবলীতে, বিদ্যাসাগরের জীবনে, বিবেকানন্দের সাধনায় ভারতবাসী নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। এই কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি অতিশয় যথার্থ—"If you want to know India, study Vivekananda. In him everything is positive and nothing negative."

* ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দার—'উনবিংশ শতাব্দীর পথিক' (ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২; মূল্য—৭৲ টাকা)।

ভারতীয় ঐতিহ্যের অধ্যাত্মচেতনার দিকটিকে লেখক একেবারে এড়িয়ে যেতে চান ব'লে স্বামীজীর বাল্য-পরিবেশে নাস্তিকতার প্রভাবটাই বেশী করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তার প্রমাণস্বরূপ লেখক স্বামীজীর বাবার কথা উল্লেখ করে বলেছেন—"পিতার স্নেহ-সান্নিধ্য এবং পঠনপাঠনে উৎসাহ অগোচরে নরেন্দ্রনাথের মনে প্রত্যক্ষবাদ, বুদ্ধিবাদী মনন এবং বিশ্লেষণধর্মী চিন্তার সূত্রপাত করে থাকবে।" এর পরেই ফুটনোটে লেখক জানাচ্ছেন—"নরেন্দ্রনাথের পিতা একখানা বাইবেল হাতে নিয়ে তাঁকে বলেছিলেন,—জগতে যদি ধর্ম কোথায়ও থেকে থাকে তো এখানে।" এর দ্বারা লেখক কী বুঝতে চেয়েছেন? বাইবেল কি কোন প্রত্যক্ষবাদীর মনঃপূত গ্রন্থ? বাইবেলকে যিনি শ্রদ্ধা করেন, তিনি ধর্ম সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন? হয়তো বহির্জীবনে তিনি কোন আচরণের ভক্ত হ'ন নি—এইটুকুই বলা চলে। তাছাড়া বিবেকানন্দের মাতা ভুবনেশ্বরীর ধর্মানুরক্তি, তাঁর পিতামহের সন্ন্যাস-গ্রহণ—এসব কিছুরও যে প্রভাব আছে এ কথা লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

স্বামীজীর জীবনের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার। নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মিলন-প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য—"নরেন্দ্রনাথ যখন এমনি সঙ্কটের মধ্যে দিন যাপন করছিলেন, তখন দক্ষিণেশ্বরের ঐ 'পাগল' ঠাকুরের খ্যাতি কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে; ঐ একটিমাত্র মানুষ স্থির বিশ্বাসে পরম আত্মনির্ভরতার সঙ্গে ঘোষণা করতে পারছেন, তিনি জেনেছেন, দেখেছেন (তাঁর ঐ আত্মবিশ্বাস এবং উক্তির সামাজিক এবং দার্শনিক মূল্য যতো অকিঞ্চিৎকরই হোক না কেন।)"

রামমোহন থেকে কেশবচন্দ্র অবধি ধর্মান্দোলনের নেতারা যে পরমসত্যকে নিয়ে কেবল মুখে ও লেখনীতে চর্চা করে গেছেন, সেই সত্যকে যিনি জীবনে উপলব্ধি করে দেখালেন, তাঁর বিশ্বাস বা উক্তির সামাজিক বা দার্শনিক মূল্য লেখকের কাছে অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের এই একটি উক্তির উপরে নির্ভর করেই উনিশ শতকের ধর্মান্দোলন নিজের সত্যকে উপলব্ধি করেছে। এই উক্তির উপরেই ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। সুতরাং এর সামাজিক বা দার্শনিক মূল্য অপরিসীম। ইতিহাস তার সাক্ষী।

লেখকের মতে যেহেতু রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে নরেন্দ্রনাথ "পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষবাদে বিশ্বাসী" থাকলেন না সেহেতু "মৃত্যু হলো তার।" অথচ একথা তিনি স্বীকার করেন, "রামকৃষ্ণই নরেন্দ্রনাথের মনে দরিদ্র জনসাধারণের সেবার আদর্শ ও কার্যক্রম উদ্দীপিত রাখছেন শেষ পর্যন্ত।" সুতরাং "যিনি মারলেন, এমনিভাবে তিনিই বাঁচিয়েও রাখলেন।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিতে ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে মানবকল্যাণের কোন বিরোধ ছিল না। স্বামীজীর মানবতাবোধও পাশ্চাত্যসভ্যতার ফসল নয়। ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনারই ফসল। অন্নময়, প্রাণময়, বোধময় চেতনায় মানব চৈতন্যের উন্নতির স্তরপরম্পরা উপলব্ধি করেই ভারতের মনীষা আব্রহ্মস্তম্বব্যাপী পরম ঐক্যের বাণী উচ্চারণ করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই জানতেন "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" কিন্তু এই সঙ্গে একথাও স্মরণীয়, উদরপূরণই একমাত্র ধর্ম নয়—ওটা জীবন ধর্মের প্রথম ধাপমাত্র। যথার্থ ধর্ম সর্বজীবে ব্রহ্মোপলব্ধি করে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব এমনিভাবেই নির্বিকল্পসমাধিকামী নরেন্দ্রনাথের মনে স্বামী বিবেকানন্দে পরিণত হবার বীজ বপন করে যান।

পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা তাই পরমসত্যলাভের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে বাস্তবজ্ঞানলাভের চেষ্টাও দেখি। ভারতপরিক্রমার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের

ব্যবহারিক জীবনের অতল দুর্দশা এবং পারমার্থিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে অনন্ত শ্রেষ্ঠতা—এ দুইই তাঁর চোখে পড়েছিল। বিশ্বসভায় হিন্দুধর্মের চিরন্তন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি ভারতবাসীর মনে নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে দিলেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর ঐহিক জীবনের উন্নতির জন্য নানা চিন্তায় বিভোর হলেন। কিন্তু সে ঐহিকতা ভারতের শ্রেষ্ঠ সত্যকে ভুলে গিয়ে নয়। বরং সেই সত্যকে আবার উপলব্ধি করবার জন্যে তিনি প্রথম ধাপ হিসাবে ভারতবাসীর ব্যবহারিক জীবনের উন্নতি চেয়েছিলেন। স্বামীজীর আমেরিকা-যাত্রার সঙ্গে তৎকালীন ভারতবর্ষে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আন্দোলনগুলিরও পরোক্ষ যোগ রয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তাই অরবিন্দবাবু মন্তব্য করেছেন—"সামাজিক-রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে স্বাধিকার-লাভের এবং জাতীয় ধ্যানধারণা আচার-আচরণ মনোভঙ্গি ইত্যাদির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করার যে আন্দোলন ভারতে দানা বেঁধে উঠেছে, আদর্শ ও লক্ষ্য, ভাব ও অনুপ্রাণনার দিক থেকে বিবেকানন্দের আমেরিকা অভিযান তার সঙ্গে ঐক্যবন্ধনে বাঁধা, এক। তার সমগ্র রূপের মধ্যেই ভারতীয় জাতীয়তা-বাদের বিশ্ব-অভিযানের প্রকৃত পরিচয়।" স্বামীজীর আমেরিকা-অভিযানকে কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদের অভিযান বললে তার সীমাকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করে ফেলা হয়। এ অভিযানের যথার্থ পরিচয় এর উদার মানবতাবোধ। ভারতের সংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠিত থেকেই আমেরিকাবাসীকে Sisters and Brothers of America বলে আহ্বান ক'রে স্বামীজী সেই মানবমৈত্রীরই পরিচয় দিয়ে-ছিলেন। তাই জাতীয়তাবাদে যার শুরু মানবতাবাদে তার বিশাল বিস্তার। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে এই সত্যটি ছিল বলেই তিনি আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যে অধ্যাত্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীকে পরম শান্তির পথ সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন—সেই প্রেরণাকেই স্বামীজী অন্য ভাষায় বলছেন "Conquest of England, Europe and America—this should be our one supreme mantra at present, in it lies the well-being of the country." সুতরাং স্বামীজীর বিশ্ববিজয় ভাবের দিক থেকে গ্রহণীয়, এতে কোন সন্দেহ নেই। অধ্যাত্মবিষয়ে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হয়েই তিনি ঘোষণা করেছিলেন—"Up, India, and conquer the world with your spirituality…"। এ বিশ্ববিজয়ের প্রয়োজন কি? "The world wants it; without it the world will be destroyed. The whole of the Western world is on a volcano which may burst tomorrow, go to pieces tomorrow." পাশ্চাত্ত্যের এই নিদারুণ অবস্থার কারণ কি? "Materialism and all its miseries can never be conquered by materialism. Armies when they attempt to multiply armies only multiply and make brute of humanity." পাশ্চাত্ত্য বস্তুবাদের বর্তমান পরিণতি একদিকে আমেরিকা ও রাশিয়ার মারণাস্ত্র-লীলায় এবং আর একদিকে চিন্তাজগতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কোন পরিণতির ইঙ্গিত করছে সে কথা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যে এই পাশ্চাত্ত্যজাতির সভ্যতা-সংকটে সত্যিই কিছু দিতে পারে এমন কথা বলা চলে। অরবিন্দবাবু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করছেন, "ভারতবর্ষ 'পুণ্যভূমি'—অতএব এর যা কিছু তাই মহৎ এবং শ্রেষ্ঠ; এই ধরণের অভিমানে তিনি বিক্ষুব্ধ।" কিন্তু একটু পরেই তিনি বলছেন, "ভারতবর্ষকে তিনি যখন

এর ভৌগোলিক সীমার মধ্যে স্থাপন করে বিচার করছেন, তখন তার আভ্যন্তরীণ জীবনের কলুষ, মানুষে মানুষে সম্পর্কের হৃদয়হীনতা ও অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে চিত্ত তাঁর বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু যখনই জাগতিক সম্পর্কের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের বিচার করছেন, তখন ভারতের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই জাগে নি তাঁর মনে।" তাহলে দেখা যাচ্ছে স্বামীজী ভারতের যা কিছু তাই মহৎ এবং শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছেন জাগতিক সম্পর্কে ভারতবর্ষকে বিচার করার সময়। আগেই বলেছি, জগৎসভায় অধ্যাত্মসাধনার পটভূমিতেই স্বামীজী ভারতবর্ষকে উপস্থাপিত করেছিলেন। সেদিক থেকে ভারতবর্ষের অনন্ত শ্রেষ্ঠতা অনস্বীকার্য। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু গ্রহণ করতে হবে এ কথা তিনি বহুবার বলেছেন। সেদিক থেকে 'ভারতের শ্রেষ্ঠতা' সম্বন্ধে তিনি মোটেই নিশ্চিন্ত ছিলেন না।

ভারতীয় ঐতিহ্যের মূলধারা হিসাবে অধ্যাত্মবাদকে গ্রহণ করলেও ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার দোষ ও গুণ সম্বন্ধে স্বামীজী সমান সজাগ ছিলেন। ধর্মের নামে অন্ধকুসংস্কারকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নি। তিনি যখন ভারতবর্ষের উদ্দেশে বলেছেন—"Thou blessed land of the Aryans, thou wast never degraded"—তখন ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার কথাই বলছিলেন, সমাজের জীর্ণতাকে তিনি অমরত্বের মালা পরাতে চান নি। ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িক কলহ একেবারে হয় নি তা নয়, তার কারণ ধর্ম নয়, ধর্মের নামে গোঁড়ামি। কিন্তু ভারতবর্ষ যেমন সব ধর্মমতকেই ভগবান লাভের পথ বলে স্বীকার করে নিয়েছে ("রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব"), এমনটি আর কোনো দেশের ধর্মচেতনায় ইতিহাসে এত সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি? হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে মতবাদের পার্থক্য মাঝে মাঝে সহনশীলতার সীমা অতিক্রম করেছে সত্য, কিন্তু সেটা ব্যতিক্রম মাত্র। যুগ যুগ ধরে ভগবান বুদ্ধকে যে হিন্দুরা অবতার ব'লে পূজা করে এসেছে সেইটেই বৃহত্তর সত্য। কিন্তু অরবিন্দবাবু একমাত্র বৌদ্ধ-বিহারের উপর হিন্দুদের আক্রমণের উল্লেখ করেই হিন্দুধর্মের সহনশীলতার "ঐতিহাসিক সত্যতা" অস্বীকার করতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য বলেছি। সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রবন্ধটি স্মরণীয়। সে প্রবন্ধে য়ুরোপীয় সভ্যতা ও ভারতবর্ষীয় সভ্যতার লক্ষণ বিচার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা বিরোধমূলক; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক। য়ুরোপীয় পোলিটিক্যাল ঐক্যের ভিতরে যে বিরোধের ফাঁস রহিয়াছে, তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখা যায়, কিন্তু তাহাকে নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে পারা যায় না। এইজন্য তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় প্রজায়, ধনীতে দরিদ্রে বিচ্ছেদ ও বিরোধকে সর্বদাই জাগ্রত করিয়াই রাখিয়াছে। ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সম্বন্ধ-বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে, সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া সংযত করিয়া তবে তাহাকে ঐক্য দান করা সম্ভব।" ভারতবর্ষে একদা সমাজ-বিন্যাসের মধ্য দিয়ে এই চেষ্টাই করা হয়েছিল। যদিচ, পরবর্তীকালে নানা অন্যায়ের দ্বারা সে ব্যবস্থা অত্যাচারে পরিণত হয়েছে, তবু তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। সে যাই হোক, ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার মূলকথাটি যে উদারতা ও সহনশীলতা, তার প্রমাণ হিন্দু-বৌদ্ধদের এককালের সংঘাত থেকে অপ্রমাণিত হয় না। ঐ সংঘাত ধর্মমতের জন্য হয় নি, হয়েছিল ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির স্পর্শ থাকায়। পরবর্তীকালের হিন্দু-মুসলমান সংঘাতও সেই এক কারণেই ঘটেছে।

(ক্রমশঃ)

হৈম-বিজয়া

স্বামী পূর্ণানন্দ

এসেছে পত্র,
কয়েক ছত্র,
অরুণ রাগের—
রক্তাক্ষরে লেখা। ১

হৈম তুষার
শুভ্র শিখরে,—
যেন সে উষার
প্রথম চরণরেখা ॥ ২

কলরবহীন—
পার্বতী ভাষা,
ভাবঘন অতি,
প্রশান্ত গম্ভীর। ৩

ক্ষণ ইঙ্গিতে
মর্মের বাণী,—
কহে যেন মোরে—
শতেক শতাব্দীর !! ৪

এনেছে পত্র,—
শুভ্র বক্ষে,
সে মহাকালের
চির রহস্যচিত্র ! ৫

ধেয়ান-মৌন,
সমাধি-মগ্ন,
বজ্র সমান—
প্রোজ্জ্বল সুপবিত্র ॥ ৬

তুষার-ঝঞ্ঝা
ছাড়ে হুঙ্কার।
গহন শূন্যে—
অনাদি সে ওঁকার ;—৭

উদাস কঠোর—
হিমেল বাতাসে,
তোলে যেন কোন্
অতীতের ঝঙ্কার !! ৮

নিরালা শূন্য—
শৈলশিখরে,—
তীব্র মরমী সুরে,—
একক ঈগল হাঁকে। ৯

হৃদয় নিভৃতে
চির বৈরাগী,—
উদাসীন সুরে—
বারে বারে মোরে ডাকে ॥ ১০

কহে যেন, ওই—
হের হিমালয়,
চির মনোহর,
শান্ত সাধন-ক্ষেত্র। ১১

নাহি ইতিহাস—
কত কাল ধরি,—
গৌরী ও হর—
মুদিয়া পদ্ম-নেত্র ;—১২

রয়েছে দুজন,
দোঁহাকার লাগি ;
কি গভীর ওই—
অবিচল তপোমগ্ন ! ১৩

মকর কেতন
যেথা পরাজিত ;
কাম-ধনু যেথা—
কোলো চিরতরে ভগ্ন !! ১৪

বিষয়ের বিষ,
ধনের গর্ব,
তোলে নাক' যেথা—
কাল-ভুজঙ্গ শির। ১৫

পশে নাক' যেথা
স্বার্থমথিত—
কোলাহল শত,
জলমান পৃথ্বীর !! ১৬

যেথা ধরণীর—
যশ-মান-ধূলি,
বিলীন—মৃত্যু-
তুষারশিলার তলে। ১৭

সর্ব বাসনা—
নিঃশেষ চিতে,—
শিবরূপ যেথা—
ফোটে প্রেমাশ্রু জলে ॥ ১৮

দূরাগত ধ্বনি,—
কহে যেন শুনি,—
দেখ—দেখ—চাহি,—
নাচে ওই মহাকাল ! ১৯

পৃথিবীর মায়া,—
চির মরু-তৃষা।
ছিঁড়ে ফেলে এসো,—
জনম-মৃত্যু-জাল ॥ ২০

জ্যোতির্বেদের দুই একটি কথা

শ্রীঅনাথবন্ধু মুখোপাধ্যায়

মূকের যেমন আনন্দ ও দুঃখ প্রকাশের মুখদর্পণ ও হাতের নানারূপ ভঙ্গি ভিন্ন অপর পন্থা নাই, তেমনি পরব্রহ্ম সম্বন্ধে 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' ভিন্ন যেন আর কোনরূপ ভাষা দ্বারা উহা প্রকাশের উপায় না পাইয়া বেদ উক্ত শব্দ দুটির প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সামবেদে "ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ" ইত্যাদি দ্বারা ক্রমসঙ্কোচের পর ক্রমবিকাশের যেন একটা ইঙ্গিত দিতেছেন। মহাপ্রলয়-কালে ঋত ও সত্য-স্বরূপ কেবলমাত্র পরব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। ইহা ব্যতীত সবই অন্ধকারময় ছিল। বস্তুবিজ্ঞানের একটি উপমা লওয়া যাক। বৈদ্যুতিক আলোকের প্রকাশের পশ্চাতে দুটি শক্তি বিদ্যমান থাকে—ধনাত্মক ও ঋণাত্মক শক্তি (Positive & Negative forces)। উহাদের পরস্পর আলিঙ্গনের ফলেই আলোর বিকাশ। পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকাকালে অন্ধকারময় অবস্থার উদ্ভব হয়। উপরোক্ত রূপে দুটি শক্তি নিজ নিজ কক্ষে সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকাকালে তমসাচ্ছন্ন ব্যতীত আর কি হইতে পারে?—ঋত ও সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, অক্ষয়, অব্যয় সাক্ষি-স্বরূপ ইহার পিছনে দণ্ডায়মান ছিলেন ইহাই শাস্ত্র-বাক্য। বালক যেমন বিজলিবাতির সুইচ টিপিয়া কখনো আলো জ্বালায়, কখনো বা বন্ধ করিয়া অন্ধকারময় করিয়া আনন্দ লাভ করে এবং তাহাকে প্রশ্ন করা হইলে উত্তর দেয় "আমার ইচ্ছা", 'কেন'র উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়, সেইরূপ সৃষ্টির সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হইলেও বালকের ঐরূপ উক্তি ভিন্ন অপর উত্তর পাইবার আশা নাই।

ইহার পরে সৃষ্টির প্রাক্কালে বীজাকারে অবস্থিত জীবকুলের প্রাক্তন কর্মহেতু স্ফূর্তিস্ফুরণ হইতে জলময় সমুদ্র উৎপন্ন হইল। এখানে সমুদ্র বলিতে পরোক্ষ শক্তিরূপ সমুদ্র সংজ্ঞাটি দেওয়া যাইতে পারে। সর্বদাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শক্তি পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। "Like things repel, unlike things attract" (সদৃশ বস্তু সদৃশ হইতে দূরে যায়, অসদৃশ বস্তু পরস্পরকে আকৃষ্ট করে) এই বৈজ্ঞানিক রীতিতে পরস্পরকে আকর্ষণ করার মাধ্যমে যে শক্তিটুকু পরস্পরকে ত্যাগ করিতে হয় তৎফলেই এক একটি সৃষ্টি হইয়া থাকে। কাজেই দেখা যায় বিশ্বসৃষ্টির সময় এরূপ ভাবের একটা শক্তির লীলা প্রকটিত হওয়ার ফলেই সেই সময় জলময় সমুদ্র হইতে প্রকাশমান জগতের ধাতা প্রভু উৎপন্ন হইল। পরপর সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি সাতটি গ্রহের সৃষ্টি হইল। স্বর্গাদি লোকের ও অনন্ত নক্ষত্র-পুঞ্জের সৃষ্টি হইল। এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলে কিভাবে ক্রমবিকাশ ও ক্রমসঙ্কোচ চলিতে লাগিল তদ্‌বিষয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান ইঙ্গিত দিতে লাগিলেন। সূর্য হইতে সৃষ্টির শক্তি চন্দ্র গ্রহণ করিলেন বীজকে অঙ্কুরিত করিবার জন্য। উক্ত শক্তিদ্বয় মিলনসময়ে পরস্পর যে শক্তিটুকু পরিত্যাগ করিলেন তৎফলেই প্রথমে আকাশ, পরে বায়ু, তৎপরে অগ্নি এবং জল, সর্বশেষে পৃথ্বীর উদ্ভব হইল। এই পাঁচটিই সৃষ্টির মৌলিক উপাদান। আকাশকে মৌলিক পদার্থ হিসাবে গ্রহণ করিতে বৈজ্ঞানিকগণ নারাজ। কিন্তু আর্যঋষিগণ আকাশতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সজাগ ছিলেন। কারণ ঐ ভূমিতে আরোহণ করিয়াই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিকগণও উহাকে অবলম্বন করিয়াই প্রোটন্ ইলেক্‌ট্রন্ গঠিত অতি সূক্ষ্মতম অণুপরমাণুর সন্ধান নিয়া পরোক্ষ শক্তির সহায়ে বাস্তব জগতে বহু কিছু

করিতেছেন, যাহার ক্রিয়া আমরা খোলা চোখে দেখিতে পাই এবং ইহার পিছনে অতি বড় শক্তি রহিয়াছে তাহাও তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা কী—সেইটি বলতে পারেন না। আর্যগণ দেহাত্মিকা বুদ্ধিকে ত্যাগ করিয়া "অবাঙ্‌-মনসগোচরম্"কে সন্ধান করিতে যাইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করিয়া বোবার আনন্দপ্রকাশের মত আকারে ইঙ্গিতে জীবগণের নিকট অনেক কিছু বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ভাষায় ব্যক্ত করিতে যাইয়া পরব্রহ্ম আখ্যা পর্যন্ত দিয়া গিয়াছেন। দর্শনাদি শাস্ত্রে উহা প্রকাশের যথেষ্ট উপকরণ রাখিয়া গিয়াছেন।

এখানে আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিতে যাইয়া বৈজ্ঞানিকের প্রাথমিক সূত্রগুলির সহায়তা লইয়া সৃষ্টি সম্বন্ধে একটু আভাস দিতে হইল। জ্যোতির্বিদের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্বের কোন আভাস পাওয়া যায় কিনা ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। শাস্ত্রে আছে রবিই সৃষ্টি-কর্তা। সমস্ত শক্তির উৎস উক্ত গ্রহে। আধেয় থাকিলেই আধারের প্রয়োজন। এই শক্তিকে ধারণ করিবার মত উপযুক্ত পাত্রের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে চন্দ্রকেই একমাত্র শক্তিমান্ পাত্র দেখিতে পাই। এই শক্তি ধারণ করার ফলেই চন্দ্র স্ত্রীপদ বাচ্য। প্রকৃত পক্ষে চন্দ্র পুরুষ, ইহার পরিচয় পরে পাওয়া যাইবে। শুধু তাহাই নহে, ইহাকে পরোক্ষশক্তি বলার দরুণ স্ত্রীগ্রহ বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ব্যবহারিক জগতে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদাভেদ এই কারণেই হওয়া সম্ভব। এইটুকু বলিলেই চন্দ্র সম্বন্ধে সব বলা হইল না। মাতৃবক্ষে চন্দ্রামৃত পান করিয়াই জীবগণ জীবনধারণ করিয়া থাকে। এ জন্যই উনি ক্ষীর-সমুদ্রের মালিক। পূর্ববর্ণিত পরম্পর শক্তি ত্যাগের ফলে যে সব ভূমি রচিত হইয়াছে তৎফলেই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্। এখন ইহাদের ব্যবহার কি ভাবে হইয়া থাকে তাহা বলা দরকার; রূপের জন্য চক্ষু, শব্দের জন্য কর্ণ, গন্ধের জন্য নাসিকা, রসের জন্য জিহ্বা, স্পর্শের জন্য ত্বক্। সাজাইবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় প্রথমে চক্ষু, পরে কর্ণ, তৎপরে নাসিকা তার পিছনে জিহ্বা, সর্বশেষ ত্বক্ এই ভাবেই বুঝি লোকে পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকে। শাস্ত্র কিন্তু পূর্বোক্তভাবে লক্ষ্য করেন নাই, প্রথমে আকাশ সৃষ্টি দেখিতে পাইলেন, পরে যথাক্রমে বায়ুর, রূপের, রসের, গন্ধের সন্ধান পাইলেন। এরূপ ভাবে রচনার তাৎপর্য বোধহয় ক্রমবিকাশের একটা আভাস। যেরূপ প্রত্যক্ষ পরোক্ষ শক্তির সহায়ে এক একটি সৃষ্টি করার পরে পরেই তাহাদের শক্তির হ্রাস হইতে থাকে, পরে যেটুকু থাকে তাহাকে পৃথ্বী আখ্যা দিলে পর ভুল হইবে না। উপরোক্ত বিন্যাসের সহিত গ্রহদের সম্পর্ক কি?—এই প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। তদুত্তরে বলা যায় আকাশ তত্ত্বের মালিক বৃহস্পতি, বায়ু তত্ত্বের শনি, তেজ তত্ত্বের মঙ্গল, জল তত্ত্বের শুক্র, পৃথ্বী তত্ত্বের বুধ। শেষোক্ত গ্রহটির সহিত পৃথিবীর ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক। বীজাকারে অবস্থিত জীবকুলের প্রাক্তন কর্মহেতু বৃত্তি স্ফুরণ হইতে জলময় সমুদ্রের উৎপত্তি; পূর্বে উহা উল্লিখিত হইয়া থাকিলেও কিভাবে জীবকুলের বীজ উক্ত সমুদ্রে যাইয়া পৌঁছায় তাহা বলা হয় নাই। কাজেই ইহার তাৎপর্যার্থ নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে হয়। পৃথ্বীতত্ত্বের মালিক বুধ চন্দ্রের ঔরসজাত পুত্র। ভাগবতে ইহার জন্মবৃত্তান্ত পাওয়া যায়। পিতার ধাতু—প্রকৃতি পুত্রে পাইয়া থাকে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় কোন ঘটনা ঘটিবার পূর্বে কারণের উৎপত্তি, পরে কার্য, তৎপরে পরিণতি। জন্মিবার কারণ পিতা, প্রকাশ সে স্বয়ং, পরিণতি তাহার পুত্র। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নবম ও পঞ্চম পর্যায়ে পড়িয়া যায়। ক্রমবিকাশের পঞ্চম পর্যায়ে বুধের স্থান। শাস্ত্রেও পঞ্চম স্থানকেই পুত্রস্থান বলিয়া অভিহিত করিলেন। কাজেই বুধকে পুত্র বলা যাইতে পারে। কৃষক যেমন ক্ষেত্র হইতে

ধান্য আনিয়া উৎকৃষ্ট শস্যটি বীজ রাখিয়া বাকী গুলি খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে, সেইরূপ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় সৃষ্টির স্থূল অংশগুলি বিভিন্ন ভাবে জীবগণ এখানে ভোগ করিয়া থাকে। সূক্ষ্মতম অংশগুলি মনে হয় বীজাকারে চন্দ্রে যাইয়া অবস্থান করে। উল্লিখিত পদ্ধতিতেই জীবমাত্রের বারংবার আসাযাওয়ার একমাত্র হেতু। এখন মানব-দেহে কিভাবে গ্রহগণ অবস্থান করিয়া নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান তাহার কি হদিশ দিতে পারেন তাহা নিরূপণ করা প্রয়োজন। ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

জন্মকালীন গ্রহ-সংস্থান যাহাই থাকুক—মানব-দেহে গ্রহবিন্যাসের নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে কিনা এবং ক্রমবিকাশ ও ক্রমসঙ্কোচের ধারাই বা কি? গুহ্যদেশের দুই অঙ্গুলি ঊর্ধ্বে বুধগ্রহের অবস্থান; ওখানে পৃথ্বী তত্ত্বের উদ্ভব। তৎপর মেঢ্র দেশ হইতে লিঙ্গের বা রসের উৎপত্তি, ঐ স্থানের মালিকানা-স্বত্ব শুক্রের। নাভিমূলে অগ্নির উদ্ভব, মঙ্গলের স্থান; হৃদয়দেশ কল্পনার স্থান, শনি উহার স্বত্বাধিকারী। কণ্ঠে শব্দের উৎপত্তি, বৃহস্পতির স্থান; ভ্রূদেশ-সংযোগ সূত্রের স্থান, চন্দ্র উহার কর্তা; মস্তকোপরি রবির স্থান, ওখানে সমস্ত শক্তির উৎসের উৎপত্তি। এখানে দেখিতে পাওয়া যায় সর্বশুদ্ধ ভূমি সাতটি, নিম্ন পাঁচটি ভূমির স্রষ্টা রবি ও চন্দ্র। চন্দ্র একাই সকলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। রবি আত্মার, চন্দ্র মনের নির্দেশক। উভয়ই সত্ত্বগুণের আধার। উহাদের প্রকৃতিগত গুণানুসারে মানবমাত্রেই সত্ত্বগুণী হওয়া শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু হায়! উহাদের প্রেরণায় মানবগণ হাবুডুবু খাইতেছে। তাইত শাস্ত্রকার রবিকে পাপ-গ্রহ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। কেন করা হইয়াছে? —মানবমনে ইনিই এই কর্তৃত্বাভিমানটি প্রকৃষ্ট-রূপে বপন করিয়া নিশ্চিন্ত হন। কাজেই প্রত্যেক মানব মদগর্বে গর্বিত হইয়া সৃষ্টির সব কিছুর উপর কর্তৃত্ব করিতে যাইয়া এত দুঃখ, এত কষ্ট, তদুপরি বার বার যাতায়াতের যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। এখানেই শুধু পাপগ্রহ বলা হয়। উল্লিখিত অহঙ্কারটির বসবাস করিবার স্থান কোথায়?—মনো-জগতে। উহার মালিকানা চন্দ্রে। শাস্ত্র ইঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ—সত্ত্বগুণী, অজাতশত্রু, অতিশুভ গ্রহ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অন্যরূপ দেখা যায়। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও ক্ষেত্রে কোন্‌টি সৎ কোন্‌টি অসৎ তাহা প্রথমে বাত্‌লাইয়া থাকেন, এজন্যই তিনি পাপ-সংজ্ঞায় অভিহিত হন নাই। মনের দুটি স্তর আছে;—একটি জাগ্রত মনের স্তর, তাহার কাজ বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া চলা। অপরটি সুষুপ্ত মন, তিনি সংযোগ রক্ষা করেন পরমাত্মার সঙ্গে। যিনি উক্ত মনের সন্ধান পাইয়াছেন তিনিই সর্বপ্রকারে এই অহঙ্কারটিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ভূমানন্দ লাভ করিয়াছেন। তখনই রবির সত্ত্বগুণের পরিচয় পাওয়া যায়। চন্দ্র সম্বন্ধে বলিবার যথেষ্ট রহিয়াছে। ইনি সকলের সহিত সহযোগিতা করিতে উন্মুখ। দেহের মধ্যে ইনি জাগ্রত মনের রূপ পরিগ্রহ করিয়া নিম্ন ভূমিতে —নাভি, লিঙ্গ, গুহ্যমূলে বসবাস করেন। তখন যথাক্রমে মঙ্গল, শুক্র, বুধের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্যই যেন প্রস্তুত। মঙ্গল অগ্নিরও যন্ত্রের উপর কার্য করিয়া থাকেন, উঁহার প্রকৃতি বড়ই উগ্র, সর্বদাই যেন 'যুদ্ধং দেহি' ভাব, শারীরিক ও মানসিক শক্তির পোষক ও ধারক, কাজেই যুদ্ধই যেন ইঁহার পেশা। এহেন গ্রহের সহিত চন্দ্র যখন হাত মিলান তখন সমাজ-বিশৃঙ্খলা, পররাজ্য-জয় প্রভৃতি বহু প্রকারের অনর্থ ঘটাইয়া থাকেন। কিন্তু যখন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত সংগ্রাম বাধাইবার প্রেরণা দিয়া তাহাকে বিজয়ের মাল্য প্রদান করেন তখনি বলা চলে বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, প্রকৃত বীরত্বের পরিচয় ওখানেই।

শুক্রের একটু ইতিবৃত্ত জানা থাকিলে সুবিধা হয়। ইঁহার কর্তৃত্ব লিঙ্গমূলে, অতি স্থূল বস্তুর রস হইতে শুরু করিয়া অতি সূক্ষ্মতম অংশে পৌছিয়া নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন। কাজেই তিনি যে জগৎতত্ত্বের মালিক, অতএব রস-উদ্ভাবক এবং যাবতীয় ভাবে রসোপভোক্তা—কদর্য হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ পর্যন্ত, ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। কদর্য সম্বন্ধে চাক্ষুষ প্রমাণ রহিয়াছে, নাই শুধু ব্রহ্মানন্দ-রস-নিষ্কাসনে। জ্ঞানীকে তাঁর সাধনাগারে বসাইয়া এটা নয়, ওটা নয় ইত্যাদিতে সূক্ষ্ম মন প্রেরণা দিয়াই চলিয়াছেন, যতক্ষণ না তিনি অমৃতত্ত্বের সন্ধান পান। বৈজ্ঞানিককে সন্ধান দিবার ভঙ্গি কিন্তু অনুরূপ। গবেষণাগারে বসিয়া তিনি প্রত্যক্ষ পরোক্ষ শক্তির আশ্লেষণ বিশ্লেষণের অঙ্ক কষিয়াই যাইতেছেন, যে পর্যন্ত না তিনি শক্তিকে বাস্তবে রূপ দিতে পারিতেছেন। বুধগ্রহ পৃথ্বীতত্ত্বের মালিক। তিনি উজ্জ্বল কিরণ জালকেও তাঁহার নিজ শক্তিপ্রভাবে আবরিত করিয়া অন্ধকারে পরিণত করেন। এমন যে প্রখর সূর্য, চন্দ্রের রশ্মিজাল তাহাকেও মলিন করিতে কুণ্ঠিত নয়। ঋষিরা বলিতেছেন, বুধ—বুদ্ধিদাতা, যুক্তিবাদী, ভেদস্রষ্টা। সুতরাং জীবকে যখন ব্যক্তিত্ববোধের যুক্তি ও বুদ্ধি জোগান তখন তিনি পৃথ্বীতত্ত্বের মালিকানাস্বত্বে স্বত্ববান। বন্ধনের অতি পঙ্কিল হ্রদে নিক্ষেপ করিয়া বন্ধনরজ্জু হাতে রাখিয়া দেন মজা দেখিবার জন্য। এস্থলে বলা চলে,—হে বুধ, সত্যই তুমি প্রত্যক্ষপ্রমাণের মূর্ত বিগ্রহ! যখনই তুমি দার্শনিকের নেতি নেতি বিচারের যুক্তি প্রদর্শন করাইয়া বিচারের পথ দেখাও এবং নির্বাণ অবস্থায় পৌছাইয়া দিয়া অনুমানকে প্রত্যক্ষের মত গোচরীভূত করাও তখনই বুঝি তোমার রাহুমুক্ত অবস্থা? বৈজ্ঞানিকগণকে কি তুমি অবগত করাও যে, তুমি কি বস্তু? যাহার ফলে তোমারই বুকে সৃষ্টিধ্বংসের নমুনা প্রতিনিয়ত পরীক্ষিত হইতে চলিয়াছে। ধন্য তোমার পরোক্ষ শক্তির বিকাশ! দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিভিন্নভাবে তোমার মহিমা কীর্তন করিয়া পিতা ও পুত্র যে একই বস্তু (চন্দ্র ও বুধ) তাহা প্রমাণ করিয়া থাকেন।

চন্দ্রের সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হইয়াছে। এখন ইনি যে অর্ণব উপাধিটি গ্রহণ করিয়াছেন, উহার প্রমাণ কোথায়?—তাপমান যন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় পারাটি নীচুতেই পড়িয়া থাকে। উহাকে ঊর্ধ্বমুখী করিতে হইলে উত্তাপের প্রয়োজন। উপরোক্ত গ্রহটি যে মনের ও জলের অধিপতি তাহা সর্ববাদিসম্মত। জলের শৈত্যগুণ আছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ অবস্থায় মনের স্বভাবই হইয়াছে নিম্ন ভূমিতে থাকা। সৃষ্টি-কর্তা যেন অঙ্গুলিনির্দেশে জীবগণকে ইঙ্গিত করিতেছেন, নাভিমূলে তাকাও—সেখানে দেখিতে পাইবে অগ্নি (Electricty) পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। উহার সহায়তায় মনকে বাষ্পাকারে ঊর্ধ্বে তুলিয়া লও, তখন তুমি দেখিতে পাইবে তোমার নিম্নভূমির বিকাশই সব নয়। জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার চোখের গড়ন এমনি ভাবে ন্যস্ত যে উপরের দিকে তাকাইবার শক্তিই তোমার নাই। বাহিরে কতটুকু দৃষ্টি তুমি দিতে পার?—তাহাও তো সীমাবদ্ধ। তুমি তো জান স্থূল অগ্নির মালিক কে—তিনি যে যোদ্ধা তাহাও তুমি জান। তোমার যুদ্ধের আয়োজন দেখিলে পর তিনি নিজেই অগ্রসর হইয়া তাঁহার আগ্নেয় শক্তির প্রভাবে তোমার মনকে উপরে তুলিয়া দিবেন। তখন তুমি দেখিতে পাইবে তোমার উপরের স্তরে কোন্ কোন্ শক্তি বিরাজ করিতেছে। সেই অনুযায়ী তুমি জ্ঞানী, কর্মী, ভক্ত যেটি তোমার অভিরুচি—সেইভাবে ও পথে জীবনকে পরিচালিত করিতে পারিবে। নিম্নভূমির কাজ তো প্রতিনিয়ত দেখিতে পাইতেছ—আহার নিদ্রা, মৈথুন। উহা সম্পাদন করিতে যতটুকু শক্তি ও কর্ম-

প্রেরণা দেওয়া দরকার তাহা তো তিনি প্রদান করিয়াই যাইতেছেন।

বৈজ্ঞানিকগণ মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার জন্য অনেক তোড়জোড় করিতেছেন, হয়ত বা যাইতেও পারেন। ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ইহা দ্বারা পৃথিবীর উপর মঙ্গলের প্রভাব বিন্দুমাত্র হ্রাস পাইবে না। ঋষিকুমারগণ গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া উক্ত সব লোকে গমনাগমন করিতেন বলিয়া পুস্তকাদিতে পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উহাতে বস্তু-বিজ্ঞানের সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না। কাজেই বিশ্বাস করিতে মন সহজে রাজী হইতে চায় না। অথচ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার মত সুযুক্তিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ধরুন, কোন শিশুর শৈশবে পিতৃবিয়োগ হইলে কুমার অবস্থায় তাহার পিতা ছিল কিনা প্রশ্ন করিলে, সে তাহার পিতার চেহারা ও প্রকৃতির বিষয় বর্ণনা না দিতে পারিলেও—'ছিল না' একথা বলিবার তাহার শক্তি নাই, কেননা তাহার জন্মিবার কারণ তাহার পিতা এবং প্রকাশ সে স্বয়ং—এ অবস্থায় অস্বীকার করিবার যুক্তি কোথায়? বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিকগণ নিজেরা উক্ত গ্রহে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর লোকও সেই সুযোগ গ্রহণ করিবে। পুরাকালে কিন্তু সে সুবিধা ছিল না। যে বালক ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া গুরুর উপদেশমত প্রাণায়াম দ্বারা নিজকে উপযুক্ত করিতেন, তিনিই শুধু ঐ সব লোকে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইতেন। বর্তমানে উহা প্রবাদবাক্যে পরিণত। শাস্ত্রে ঐরূপ ভ্রমণের সঙ্কেত দেওয়া আছে। সূর্যলোক, চন্দ্রলোক প্রভৃতি সাতটি লোকের কথাও উল্লেখ আছে। উহাদের প্রকাশ বাহিরেও যেরূপ দেহমধ্যেও তদ্রূপ। ঐ রকম লোকে যাইতে হইলে চন্দ্রই এক মাত্র কাণ্ডারী, যেহেতু মনের নির্দেশক উক্ত গ্রহ। তিনি যখন সূক্ষ্মাকারে মনোময়, বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান করেন তখন বৈজ্ঞানিক এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া গবেষণা করেন—দার্শনিক ও সাধক অন্তভাবে উহা উপলব্ধি করেন। ক্রমবিকাশের যে ধারা নির্দিষ্ট আছে সেই অনুযায়ী দেখা যায় নাভিমূলে প্রাণময় কোষের অধিষ্ঠান। ইনিই নিজ শক্তি দ্বারা মনকে বায়বীয় অবস্থায় উপরের দিকে বায়ু তত্ত্বের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারেন। উক্ত স্থান হইতে মনোময় বিজ্ঞানময় কোষের কার্যারম্ভ হয়। তৎপরেই আকাশতত্ত্ব বিরাজমান, সেখানে শুধু স্বরের উৎপত্তি। শাস্ত্রকার বলিতেছেন এখানে পৌঁছিলে মৃত্যু। একথা বলিবার তাৎপর্য কি? এখানে কাহার নাশ দেখিতে পান? অন্নময় কোষের বা দেহাত্মিকা বুদ্ধির কি? ইহাই কি শাস্ত্রের মর্মার্থ? তাহা না হইলে বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণুপরমাণুর হিসাব মিলাইবার পক্ষে সুযোগ ঘটে না। জ্ঞানী ও যোগীর তত্ত্বানুসন্ধান সফল হয় না। স্তব-স্তুতির মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা দ্বারা কি এইটিই প্রমাণিত হয় যে, তেজ হইতেই সব দেবদেবীর আবির্ভাব? তেজ ভিন্ন তো রূপদান করিবার শক্তি আর কাহারও নাই। তমোগুণী মঙ্গল মানবের ও দানবের রূপ দান করিতে পারে। সত্ত্বগুণী সূর্যেরই দেবতার রূপ দান করিবার ক্ষমতা। চন্দ্র বা জল তো অরূপ। কিন্তু দুয়ের সমবেত চেষ্টার ফলেই শুদ্ধসত্ত্ব অবয়ব সৃষ্টি হইয়া থাকে। সাধক আকাশমার্গে পৌঁছিলেই সত্ত্বগুণাশ্রয়ী মায়ের রূপ দর্শন, তাঁর কথা শ্রবণ, তাঁর সান্নিধ্যে স্পর্শানুভব, তাঁর চরণকমলের আঘ্রাণ, আনন্দরসে আপ্লুত হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়া থাকেন। পঞ্চতত্ত্বের সমন্বয় ওখানেই সাধিত হয়। ক্রমসঙ্কোচের পরিণতি ওখানেই দৃষ্ট হয়।

প্রশ্ন

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

প্রভু, তুমি কি আমার জীবনের আশা
তুমি কি আমার মরমের ভাষা
তুমি কি আমার প্রেম-ভালবাসা
স্বরগের পরিমল ?

ওগো, তুমি কি আমার হৃদিরঞ্জন
তুমি কি আমার প্রিয়-বন্ধন
তুমি কি আমার দুঃখখণ্ডন
করো মোরে উজ্জ্বল ?

প্রভু, তুমি কি আমার জনম-মরণ
তুমি কি আমার জীবন-ধারণ
তুমি কি আমার সকল-কারণ
জনম জনম ধরি ?

ওগো, তুমি কি আমার যশ-সৌরভ
তুমি কি আমার জয়-গৌরব
তুমি কি আনিছ সুখ-বৈভব
জীবন পূর্ণ করি ?

প্রভু, তুমি কি আমার নয়নের বারি
তুমিই কি মোর সন্তাপহারী
তুমি কি আমার সবশুভকারী
রয়েছ সতত জাগি ?

ওগো, তুমি কি আমার আঁধারের আলো
তুমি কি আমার জীবনের ভালো
তুমি কি দগ্ধ হৃদয়েতে ঢালো
অমৃত—শান্তি লাগি ?

প্রভু, তুমি কি আমার ধ্যানের মুরতি
তুমি কি আমার শক্তি-ভকতি
তুমি কি আমার একান্ত গতি
সংসার-নির্বাণ ?

ওগো, তুমিই কি তাই জীবনে মরণে
সাথে সাথে থাকো সকল স্মরণে
চিরদিন তব কমল-চরণে
রহিবে আমার প্রাণ ?

পুণ্যক্ষণ

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন বসু

বাসনার বনে আগুন লাগিবে ভস্ম হইবে যেই সে ক্ষণে—
ভক্তিডালায় ফুল-চন্দন রবে প্রাণ-মন সে শুভদিনে।
প্রেমের প্রদীপ জ্বলিবে সেদিন কত যে তাহার ঠিকানা নাই,
পাপেরে হানিবে প্রবল আঘাত পাপীরে আপন করিবে তাই।
দেহের লালসা আত্মার লাগি লজ্জায় সব নিলে বিদায়,—
হৃদয় কাঁদিবে তোমারি লাগিয়া, কোথায় তোমার দীপ্তি হায়!
সারা জগতের প্রকৃতির মাঝে যবে এই প্রাণ চাবে মিলন,
সুদূর দরীর নির্জনতায় সত্যের মাঝে খুঁজিবে ক্ষণ।
যেদিন যেক্ষণে আধারে ফেলিয়া পৌঁছিবে ঐ দূর সীমায়,
জীবন মরণ সুখদুঃখ সব এক হ'য়ে যাবে ও রাঙা পায়।

ফ্রান্সে জননী সারদাদেবীর জন্মোৎসব

স্বামী জীবানন্দ

প্যারিস শহর হইতে ২২ মাইল দূরে গ্রেজ (Gretz) নামক স্থানে রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র (Centre Vedantique Ramakrishna)। এই কেন্দ্রের সূত্রপাত করিয়াছিলেন স্বামী যতীশ্বরানন্দজী (বর্তমানে ব্যাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ), ১৯৩৬ সালে, শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর সময়। ঐ কার্যের স্থায়ী রূপ দিবার জন্য স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজীকে ১৯৩৭ সালে ফ্রান্সে পাঠানো হয়। তিনি ধীরে ধীরে কাজটি গড়িয়া তুলিতেছিলেন, এমন সময় ইওরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লাগিয়া যায়। যুদ্ধের কয়েক বৎসর নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ ফ্রান্সেই রহিয়া যান এবং দক্ষিণ ফ্রান্সে বক্তৃতা ও ক্লাস প্রভৃতি চালাইতে থাকেন। যুদ্ধ শেষ হইলে ১৯৪৬ সাল হইতে তিনি অধ্যাপক রেনোঁ (Prof. Renou) কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি সপ্তাহে উপনিষদ্-সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন এবং একটি দার্শনিক-গবেষক সমিতির উদ্যোগে সরবঁ (Sorbonne) নামক স্থানে সর্বসাধারণের জন্য নিয়মিত বক্তৃতাদিও দিতে থাকেন। এই বক্তৃতাগুলির প্রভূত সমাদর হয়।

১৯৪৮ সালে জনৈক ভক্তের বদান্যতায় গ্রেজে বেদান্তকেন্দ্রের বর্তমান স্থায়ী জমি ও বাড়ী কেনা হয়। তদবধি কেন্দ্রের ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক বহুমুখী কর্মধারা এখান হইতেই নির্বাহ হইয়া আসিতেছে। গত বৎসর এই কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীমায়ের ১০৩তম জন্মোৎসবের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ মূল ফরাসী হইতে অনুবাদ করিয়া শ্রী পি শেষাদ্রি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রে (আগস্ট, ১৯৫৬) প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা উহা অবলম্বনে ঐ উৎসবটির একটি পরিচিতি উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দিতেছি।

১০৩তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষ্যে ৪ঠা জানুআরি, '৫৬ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী বলেন যে জননী সারদাদেবীর দৃষ্টিভঙ্গী একটি নিশ্চিত আধ্যাত্মিক আদর্শের সন্ধান দেয়। শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে 'শাশ্বত নারী-প্রকৃতি'টির (Eternal Feminine) স্বরূপ হইল ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ।

'মায়ের কথা' হইতে কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ মিঃ জি পিটোএফ্ পাঠ করেন। এইগুলিতে শ্রীশ্রীমায়ের দেবী-ভাবটি পরিস্ফুট ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'ও সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।'

স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী বলেন :

"চিরন্তনী নারী-প্রকৃতি (Eternal Feminine) সম্বন্ধে ধারণার সহিত পাশ্চাত্য খ্রীষ্টান জগৎ সুপরিচিত। কুমারী সাধ্বী মাতা অনুতপ্ত জীবাত্মা ও ত্রাণকর্তার মিলন-সেতুস্বরূপ, তিনি ঈশ্বরকৃপা-লাভের পথ দেখাইয়া দেন। ভারতবর্ষে বৈষ্ণবেরা লক্ষ্মীদেবীর কৃপার উপরে বিশেষ জোর দিয়া থাকেন; তাঁহাদের মতে লক্ষ্মীর প্রসাদেই মুক্তি অর্থাৎ দুঃখের নিবৃত্তি হয়। বিশেষ করিয়া শ্রীসম্প্রদায়-প্রবর্তক বৈষ্ণবাচার্য রামানুজের মতে সাধকের ভগবানের শ্রীপাদপদ্মলাভে লক্ষ্মীমন্ত্রই প্রধান সহায়ক। হিন্দুধর্মের অন্যান্য সম্প্রদায়েও (শৈব এবং শাক্ত মতে) শাশ্বত নারী-সত্তা সম্বন্ধে ধারণা দেখিতে পাই, ঈশ্বরের সক্রিয় শক্তি মায়া হইতেই জগৎ উদ্ভূত। মায়ার প্রসন্নতা ব্যতীত মোক্ষ বা মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই।"

অতঃপর সিদ্ধেশ্বরানন্দজী তাঁহার উক্তির দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ভাবার্থ পরিস্ফুট করেন :

"আমাদের ইচ্ছাশক্তি আংশিক-দর্শনদুষ্ট। বাহ্যিক

বা আভ্যন্তরিক সর্বপ্রকার পরিমাণশূন্য সত্তাকে 'পরিমিত' করিবার·· আমাদের অন্তহীন প্রয়াস। মূলতঃ দ্বৈতদর্শনেই পাপের উদ্ভব। হাজার হাজার রকমের জিনিস আমরা দেখিতেছি! এই দোষ দূর করা যাইতে পারে একমাত্র চিত্তশুদ্ধির দ্বারাই। ······'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই সার্বভৌম সত্য 'আমি কর্তা নই; ঈশ্বরই সমস্ত কর্মের নিয়ন্তা' এই বোধ হইতেই আসে। কেবল একটি মাত্র ইচ্ছা আছে, ইহা হইল ঐশ্বরিক ইচ্ছা। এইরূপে অজ্ঞানের আবরণ সরাইয়া আমরা জ্ঞানের উচ্চতম ভূমিতে আরোহণ করিতে পারি। যিনি ঠিক ঠিক শরণাগত তিনিই নিজেকে অকর্তারূপে জানিতে পারেন; শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় তিনি নিজেকে 'ঝড়ের এঁটো পাতার মতো' দেখেন। এই যে শরণাগতির অবস্থা যখন ঈশ্বরেচ্ছার উপর আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে তখনই চিরন্তনী নারী-প্রকৃতির উপলব্ধি হয়। স্ত্রী প্রকৃতির লক্ষণ কি? আবিষ্ট সত্তা। যেহেতু পরমপুরুষ আমাদিগকে উদ্ধারের জন্য আসেন সেইজন্য আমাদের উচিত আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমিত্বগুলিকে তাঁহারই ইচ্ছার উপর সমর্পণ করিয়া কর্মে ব্রতী হওয়া। জার্মান মরমিয়া সাধক একহার্ট বলিয়াছেন,—আত্মাকে 'নারী' শব্দে প্রকাশের চেয়ে অনুপম ভাষা আর কি আছে? ···· আত্মা নারীসত্তাবিষ্ট হইয়া নূতনরূপে প্রকাশোন্মুখ হয়—এইভাবেই ঈশ্বরের পিতৃসমুচিত হৃদয়ে খ্রীষ্টের পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে।

"যে ব্যক্তির নিষ্ক্রিয় অবস্থাটির উপলব্ধি হইয়াছে তিনিই ঐশ্বরিক ও আপেক্ষিক সত্তার মধ্যে—পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে মহামিলনের মধ্যস্থতা করিতে পারেন।

"শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী সম্পূর্ণ ত্যাগ অর্থাৎ আত্ম-বিলুপ্তির জীবন যাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জীবনদর্শন আমাদের চলার পথের আলোকবর্তিকা-স্বরূপ। খ্রীষ্টধর্মতত্ত্বানুযায়ী তাঁহাকে সাধ্বী মাতা (Blessed Virgin) বলা যাইতে পারে, সাধ্বী মাতারই মত তিনি ছিলেন জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যবর্তিনী ও মিলনকারিণী। জনৈক কার্থুসিয়ান্ মঠাধ্যক্ষ (Carthusian Friar) লিখিয়াছেন, 'সার্থক ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে বলিতে হয়—তিনি মেরী যিনি আমাদিগকে পবিত্র করেন অর্থাৎ সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর করিয়া প্রিয়তমের সহিত মিলনযোগ্য করিয়া দেন।'

"আবার যেমন বাইবেলে আছে, 'প্রভু' 'প্রভু' করিয়া ডাকিলেই মুক্তিলাভ হয় না, সেইরূপ শ্রীশ্রীমাকে চিন্তা করা ও মাতৃনাম বার বার উচ্চারণই যথেষ্ট নয়। আমরা বরং তাঁহার আদর্শকে অনুসরণ করিব। তাঁহার আদর্শ কি? ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। আমরা যাহারা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় অনুপ্রাণিত তাহাদের নিকট শ্রীশ্রীমা চিরন্তনী মাতৃসত্তার মূর্তিমতী বিগ্রহস্বরূপিণী। গুরু যাঁহার মধ্য দিয়া আমরা ঈশ্বরের কৃপালাভ করি, যিনি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ, শ্রীমা ছিলেন সেই গুরুশক্তির প্রতীক।

"শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি-স্মরণে আমাদের এই প্রার্থনাই হউক যেন আর আমরা দৈনন্দিন কর্তব্যকর্মে নিজেদের কর্তারূপে না ভাবি—তাঁর ইচ্ছাতেই সমুদয় নিয়ন্ত্রিত এই চিন্তাই যেন আমাদের মনে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত থাকে। যখন 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী' এই অবস্থায় আমরা উপনীত হইব তখনই পাইব মুক্তির পরম আস্বাদ।"

মিস্টার জর্জ পিটোয়েফ (Mr. Georges Pitoeff) শ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিকের আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "শ্রীশ্রীসারদাদেবী সেই অদৃশ্য শক্তি—যে শক্তি সমস্ত রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের উৎসাহদাত্রী ও পরিচালিকা। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কাজ 'তাঁরই কাজ' ভগবদ্‌বুদ্ধিতে কর্ম করিবার এই পথনির্দেশ ছিল অধ্যাত্ম জীবন

গড়িবার জন্য তাঁর প্রধানতম উপদেশ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাপ্রয়াণের পর তাঁহার ত্যাগী ভক্ত সন্তানগণের জন্য শ্রীমা সর্বদা প্রার্থনা করিতেন তাহারা যেন 'ঘুরেবেড়ানো সাধু না হইয়া একটি আদর্শ সন্ন্যাসিসঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতে পারে। মা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাদের যেন থাকিবার আশ্রম ও মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব না হয়, যাহাতে তাহারা নিশ্চিন্তে ঠাকুরের উপদেশ পালন ও ধ্যানভজনাদি করিতে পারে আর জগতের ত্রিতাপদগ্ধ নরনারী তাহাদের নিকট আসিয়া শান্তি ও সত্যের সন্ধান-লাভের সুযোগ পায়।

"শ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তিনি আমাদিগকে শিখাইয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ভগবানের অবতাররূপে দেখিতে এবং তাঁহাকে আরাধনা করিতে। শ্রীশ্রীমায়ের সংস্পর্শ ও সান্নিধ্য ছিল এক বিস্ময়কর শক্তির উৎস। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার আশীর্বাদ লাভ না করিয়া আমেরিকা-যাত্রা করেন নাই। মায়ের অতি সামান্য কথায়, অতি ক্ষুদ্র কর্মের মধ্যেও অসীম শক্তি লুকাইয়া থাকিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'ও আমার শক্তি।' স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার জনৈক গুরুভাইকে লিখিয়াছিলেন,—মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, ক্রমে পারবে। আমাদের মধ্যে কেউই তাঁর মহিমা বুঝিনি। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার সম্ভব হবে না। মা-ঠাকরুন ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন।..."

"শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন আমাদের চক্ষুর সম্মুখে অফুরন্ত মাতৃস্নেহরূপে প্রতিভাত হইয়াছে—যে স্নেহ নিজের আমিত্বকে নিঃশেষে বিলীন করিয়া দিয়া সর্বোপরি বর্তমান থাকিত; যাহারা তাঁহার নিকট আসিত তাহাদিগকে খাওয়ানো, আদর-আপ্যায়ন, সেবা-শুশ্রূষা ও আধ্যাত্মিক উপদেশদানের মধ্য দিয়া ইহা অজস্রধারায় প্রকাশ পাইত। শ্রীমায়ের জীবনচরিতকার এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: 'যতদিন স্বাস্থ্য ও সামর্থ্যে কুলাইয়াছে ততদিন পর্যন্ত ভক্তসেবা অপেক্ষা কিছুতেই তাঁহার বেশী আনন্দ ছিল না। তিনি রান্না করিতেন এবং সহস্তে তাহাদিগকে পরিবেশন করিতেন ও বাসনপত্র ধুইতেন। জাতিবর্ণধর্ম-নির্বিবেশে সকলে তাঁহার স্নেহলাভ করিয়াছিল। যদি কেহ তাঁহার সেবা লইতে আপত্তি করিত তিনি গভীর স্নেহস্পর্শে সমস্ত আপত্তি ঠেলিয়া ফেলিতেন—বলিতেন, বাবা, কী আর তোমার জন্য করেছি? আমি কি তোমার মা নই? একি মায়ের কাজ নয় যে, সকল রকমে সন্তানদের সেবা করা—নিজের হাতে তাদের এঁটোও পরিষ্কার করা?

"শ্রীমায়ের পুত্রসন্তলাভের বর্ণনা-প্রসঙ্গে মায়ের সাক্ষাৎ শিষ্যেরা তাঁহার অভাবনীয় যত্ন ও স্নেহ-ভালবাসার কথাই বলিয়া থাকেন। একজন বলেন, 'মায়ের শুধুমাত্র অবস্থিতিই শিষ্যের সমক্ষে সত্য উদ্ঘাটন করিয়া দিত। নীরবে তাঁহার শ্রীচরণতলে উপবেশন করিলেই যাহাকে সাধারণতঃ আমরা সত্য বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা মুহূর্তমধ্যে স্বপ্নের মত উড়িয়া যাইত; আর শাস্ত্রে যাহাকে সত্য বলিয়া নির্দেশ করা হয়—সেই সত্যের আলোক সহসা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।'

"ভারতীয় ঐতিহ্যে সমস্ত দানের মধ্যে পারমার্থিক দানকেই শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়া থাকে। এই অধ্যাত্ম সম্পদ্ শ্রীশ্রীমা সহস্র সহস্র তৃষিত নরনারীর উপর এমনকি অনধিকারী হইলেও অকাতরে ঢালিয়া দিয়াছেন। ইহার প্রসার এইরূপ গভীরভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল যে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দ বলিয়াছেন, 'যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছি না—সব মায়ের নিকট চালান দিচ্ছি।' বস্তুতঃ শ্রীমা প্রায়ই বলিতেন, 'দীক্ষা দিলে গুরুকে শিষ্যের

সমস্ত পাপ ও দুঃখকষ্টের বোঝা বইতে হয়। আমার কাছে যারা আসে তাদের মধ্যে অনেকে দুষ্কার্য করতেও ইতস্ততঃ করে না। কিন্তু তারা মা ব'লে আসে, দুঃখ জানায়। তাদের ফিরিয়ে দিতে পারি না, যতটুকু পাবার তারা যোগ্য তার থেকেও বেশি তাদের দিই।"

জন্মদিন

শ্রীচারুচন্দ্র বসু, এম্-এস্‌সি, বি-এল

জন্মদিন। জন্মদিনে ভগবৎস্মরণ কর্তব্য। কেন? জন্মসমস্যাটি শাশ্বত, চিরন্তন। যুগের পর যুগ মানুষ জন্মিয়াই চলিয়াছে, মানুষ ভাবে। সুতরাং জন্মসমস্যা মানুষকে সদাই এটা জানিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছে। ইহা জানা দরকার। যে জানিতে পারে, সে পারে। ইহা অপরে অপরকে ঠিকমত বুঝাইতে পারে না। ইহা জানিবার পথটি ধরা যাক্, দুর্গম অরণ্য প্রদেশে। সেখানে যানবাহনের অভাবে সমস্ত পথটুকু নিজের পায়ে হাঁটিয়া পার হইতে হয়। যাঁহারা সেই পথে চলাচলে অভ্যস্ত তাঁহাদের কাছে তাঁহাদের দয়ায় নিজ সামর্থ্যানুসারে কিছু কিছু নির্দেশ পাওয়া যায়। যে পথে চলিয়া এই সমস্যার মর্মোচ্ছেদ করা যায় সেই পথের কথা সর্বদাই তাচ্ছল্যের বা অবিশ্বাসের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং কাহারও বোধগম্য হয় না। 'হয় না' কেন সে সমস্যা এখন তুলিব না। ঘটনাটি সত্য—'হয়—না"। তবে উপায়। উপায় ভগবৎস্মরণ। ভগবৎস্মরণের পর ভগবৎশরণ।

'জন্ম' কথাটি যেইমাত্র উঠে তখনই শরীরের কথাটা আসিয়া পড়া অনিবার্য। সঙ্গে সঙ্গে দেহাভিমানী 'আমি'র পিছনের আত্মার কথাটা আসিয়া পড়ে। শরীরকে স্বাভাবিক আমরা ভোগায়তন বলিয়াই জানি। ইহা যোগায়তনও বটে। বহির্মুখীনতায় ভোগ; অন্তর্মুখীন অনুসন্ধানে যোগ। অনুসন্ধান কার? আমার নিজের, অর্থাৎ আত্মার। আত্মাই খাঁটি। এই শরীর সেই আত্মোপলব্ধির দ্বার। সুতরাং ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার। কেননা আত্মাই ব্রহ্ম। সে কথা পরে আসিতেছে।

কোন একটা অনির্বচনীয়া শক্তির প্রভাবে আমাদের মুখ্য শুদ্ধচৈতন্য আবৃত আছে। জাগ্রৎ-চৈতন্য নিদ্রার যেমন আবৃত থাকে মুখ্যচৈতন্যও আমাদের জাগ্রদবস্থায়, (শুধু জাগ্রদবস্থায় কেন জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অর্থাৎ আমাদের পরিচিত তিন অবস্থায়) সেইরূপ আবৃত রহিয়াছে। শুধু যদি আবৃতই থাকিত হয়ত কোনো সময় আবরণ উন্মোচিত হইতে পারিত। আবরণশক্তির সহিত আর একটা শক্তি রহিয়াছে যাহাকে বিক্ষেপশক্তি বলা যায়। বিক্ষেপের জন্য বহির্মুখীনতা, বিপরীত গতি। বিক্ষেপশক্তির কারণে আমাদের চৈতন্য-প্রতিবিম্ব ভুলপথে অগ্রসর হয়। বিক্ষেপশক্তির প্রভাবের সময়েও আবরণশক্তি রহিয়াছে। আবরণ-শক্তির প্রভাবে তত্ত্বের 'অগ্রহণ' এবং বিক্ষেপ-শক্তির ফলে 'অন্যথাগ্রহণ' হয়। অর্থাৎ 'জানিতে পারিতেছি না' এই বোধটার নাম ধরা যাক্ 'অগ্রহণ' এবং "ইহা ত এইরূপই' এমন যে ভুলজ্ঞান তাহার নাম অন্যথাগ্রহণ। দৃষ্টান্ত জাগরণ ও নিদ্রা। (এখানে অবশ্য স্বপ্ন জাগরণের অন্তর্ভুক্ত।) সুষুপ্তি আবরণ অবস্থা, সেখানে শুধু অগ্রহণ। আমি নামক মুখ্যবস্তু, যাহার কখনও অপলাপ করা যায় না তাহাও অগৃহীত থাকে। জাগরণে সেই অগ্রহণ

ত রহিয়াই গেল ; বাস্তবিক আমি কি, কে, কোথায়, কেন ইত্যাদি প্রশ্ন অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। তদুপরি এই ত আমি মনুষ্য, অমুক তারিখে এইরূপভাবে আমার জন্ম, আমি বুদ্ধিমান, আমি স্বামী, পুত্র, বিত্ত, গৃহাদিবান চেতনপুরুষ ইত্যাদি বহু উপাধিতে আমাকে গ্রহণ করিয়া থাকি, ইহার দ্বারা মুখ্য বস্তুর অন্যথাগ্রহণ হইয়া যায়। বিক্ষেপ-জাত অন্যথাগ্রহণে আবরণশক্তির প্রভাব আরও বাড়ে। 'ভুল'—জানি কেমন করিয়া ? আমার ঐ বিক্ষেপ সহভুব জাগ্রদ্‌বোধই ত ঠিক হইতে পারে। চার্বাকপন্থীর বা জড়বাদীর এই আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে 'ইহা যে ভুল' তাহা জানি, কেননা ঐ অনুভবে অনাবিল চিত্তপ্রসাদ আসে না! অজ্ঞাত জিনিস জানিলে আনন্দ অনিবার্য। জ্ঞান ও আনন্দ অবিচ্ছেদ্য। উহারা পৃথক সত্তা নহে। একই জিনিসের দ্বিবিধভাবের যুগপৎ এক উপস্থিতি। আর এক কথা—অজ্ঞান জ্ঞাননাশ্য, অর্থাৎ জ্ঞান উপস্থিত হইলে তদ্বিষয়ক অজ্ঞান নষ্ট হইতে বাধ্য। অজ্ঞানের নাশ হইলে অজ্ঞান পুনরাক্রমণ করিতে পারে না। ভ্রমবশে রজ্জুকে সর্প মনে করিতে করিতে যদি সর্পরূপ অজ্ঞান রজ্জুজ্ঞানের দ্বারা নাশিত হয়, পুনরায় সেই রজ্জুখণ্ডে আর সর্পভ্রম উৎপন্ন হইতে পারে না। আমার জাগ্রত অবস্থার স্বাভাবিক আমি আমাকে সেইরূপে পুনরাক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করে না। আমার শাশ্বত প্রশ্ন পুনরুত্থিত হয়। সুতরাং জন্ম, আত্মা, বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধানের নিবৃত্তি হয় না।

ভৃগু নামক প্রসিদ্ধ বরুণপুত্র, পিতার সমীপে *উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হে ভগবন্, আমায় ব্রহ্ম* উপদেশ করুন।" পিতা তাহাকে বলিলেন, "শরীর প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্—ইহারাই ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার। অনন্তর আরও বলিলেন,—"*যতো বা ইমানি* ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি।"

[যাহা হইতে এই অখিলভূতবর্গ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হইয়া যদ্দ্বারা বর্ধিত হয় এবং বিনাশকালে যাহাতে গমন করে ও যাহাতে বিলীন হয় তাহাকেই জানিতে ইচ্ছুক হও। তিনি ব্রহ্ম]। ভৃগু একাগ্রতা অবলম্বনে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া—'অন্নই ব্রহ্ম' ইহা জানিলেন। কারণ পিতৃ-প্রদত্ত সঙ্কেত মিলাইয়া দেখিলেন যে অন্ন হইতেই ভূতবর্গ জাত হয়, জন্মিয়া অন্নের দ্বারা জীবন ধারণ করে এবং বিনাশকালে অন্নাভিমুখে প্রতিগমন করে ও অন্নে বিলীন হয়। উহা জানিয়া পিতার সকাশে উপস্থিত হইলে পিতা বুঝিলেন ভৃগু স্থূল পাঞ্চভৌতিক শরীরকে বুঝিতেছে। লক্ষ্য করে নাই অন্নের উৎপত্তি বিনাশ আছে। মুখে বলিলেন "একাগ্রতা সহায়ে ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করো ; একাগ্র তপস্যাই ব্রহ্ম।" ভৃগু পুনরায় তপশ্চর্যা করিয়া অনুধাবন করিলেন—সর্বানুস্যূত একটি মহাপ্রাণ-প্রবাহ রহিয়াছে। সুতরাং সেই 'প্রাণই ব্রহ্ম' ইহা জানিলেন। [ইহার সহিত জড়বাদের Cosmic Force বা Cosmic Lifeএর কিছু সামঞ্জস্য থাকিতে পারে !] পিতৃপ্রদত্ত formula আলোচনা করিয়া মিলাইলেন—প্রাণ হইতেই এই ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হইয়া প্রাণের দ্বারা বর্ধিত হয় এবং অবশেষে প্রাণাভিমুখে গমন করিয়া প্রাণে বিলীন হয়। পিতা দেখিলেন ইন্দ্রিয়াদি-বেষ্টিত প্রাণশক্তিকে ভৃগু চেতন বলিয়া ধারণা করিয়াছে। বোঝে নাই যে প্রাণ অচেতন, অতএব উহা ব্রহ্ম নহে। তিনি জানেন স্বকীয় চেষ্টা ব্যতীত অনুভূতি লাভ করা যায় না। ভৃগু *আরও অনুসন্ধান করুক। সুতরাং পূর্বোক্ত সেই* এক কথারই পুনরুক্তি করিলেন—"আরো তপস্যা করো, তপস্যাই ব্রহ্ম।" ভৃগু নিজেই বুঝিতে *পারিলেন যে অচেতন বস্তু (প্রাণ) ব্রহ্ম হইতে* পারে না। তাঁহার মনে হইল "মনই ব্রহ্ম।" Formula বা সঙ্কেত ত বেশ খাটে। মন হইতেই

এই ভূতবর্গ জাত হয়, জাত হইয়া মনের দ্বারা বর্ধিত হয় এবং বিনাশকালে মনেরই অভিমুখে প্রতিগমন করে ও মনেই বিলীন হয়। উহা জানিয়া ভৃগু পুনরায় পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি এবারেও স্বীকৃত না হইয়া আবার তপস্যা বিধান করিলেন। তখন ভৃগুর খেয়াল হইল মনও অচেতন। (চেতন আত্মার অতি সান্নিধ্য হেতু মনকে আমরা চেতন বলিয়া ভুল করি)। ভৃগুর আরও খেয়াল হইল মন অনিশ্চয়াত্মক, সংকল্প-বিকল্পাত্মক। অতিসূক্ষ্ম হইলেও মন শরীরধর্মী, অর্থাৎ ক্ষণপরিণামী, নাশ্য। দৃশ্য পদার্থবর্গের অন্যতম।

এবার বুঝিলেন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি (বিজ্ঞান) ই ব্রহ্ম। এইরূপে সমষ্টি জ্ঞানশক্তি ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্ট আদি পুরুষ পর্যন্ত পৌঁছিবার পরেও পিতা তপস্যার নির্দেশ দেওয়ায়, বিচারে ভৃগু দেখিলেন, বুদ্ধিতেও সুখদুঃখের অনুভূতি থাকে, কিন্তু মুখ্যব্রহ্মে ত সুখদুঃখ নাই। চিন্তা করিয়া ভৃগু—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি ইতি"—জানিলেন পূর্ণানন্দই ব্রহ্ম।

লৌকিক বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ-জনিত আনন্দ—খণ্ডানন্দও নহে। ইহা আনন্দের আভাসমাত্র। এই আনন্দাভাস ভয়শূন্য নহে। যেখানে ভয় সেখানে আনন্দ নাই! রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতে ইহার কাব্যরূপ এই প্রকার—

আমি যখন ছিলেম অন্ধ
সুখের খেলায় বেলা গেছে পাইনি ত আনন্দ।
ভিত ভেঙ্গে যেই এলে ঘরে ঘুচলো আমার বন্ধ
সুখের খেলা আর রোচেনা, পেয়েছি আনন্দ॥
সেদিন আমি পূর্ণ হলেম ঘুচলো আমার দ্বন্দ্ব
দুঃখসুখের পারে তোমায় পেয়েছি আনন্দ॥

ভৃগুর উপাখ্যানটি রূপক নহে। পুরাকালে তত্ত্বদর্শী পিতা পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা দিতেন। তবে উপাখ্যানটিকে যুক্তিপরম্পরা ধরিয়া ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হইতে হয়। অবশ্য অতি স্থূলত্বেও ইহার অনুরূপ ভাব একটু চিন্তা করিলেই পাওয়া যায়। অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়-আনন্দময়-সমন্বিত পঞ্চকোষবিশিষ্ট শারীর পুরুষ উপলক্ষ্য মাত্র।

যাহা হউক এই ভৃগুসম্বন্ধী (ভার্গবী) বিদ্যা হইতে জানা যায় যে, জন্মবৃত্তান্তের সম্যক আলোচনার ফলে ধাপে ধাপে মুখ্য বস্তুতে পৌঁছান যায়। এবং ইহাও জানা যায় যে সাধারণতঃ আমরা আমি বলিতে যে স্থূল বস্তুটিকে বুঝিয়া বসি, উহা ঐ সম্বন্ধে শেষ কথা নহে। এবং উহা আদৌ ঠিক কথা নহে। কিন্তু উহা ঠিক পথ ধরাইয়া দিতে পারে। সেই হিসাবে দেহতত্ত্বানুষ্ঠান যোগানুষ্ঠান।

দেখা গেল আমরা পঞ্চকোষ মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া প্রত্যেকটিকেই আমার "আমি" বস্তু বলিয়া ভুল করিতেছি। পঞ্চকোষ গণনায় পঞ্চম কোষ আমাদের শরীরসম্বন্ধী বলিয়া মুখ্য আনন্দ নহে। উহার ওপারে মুখ্য আনন্দ। দার্শনিকেরা তাহা এই ভাবে বুঝাইয়া থাকেন।—আমাদের শরীর তিনটি, স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর, কারণশরীর। অন্নময় কোষে স্থূল শরীর। পশুপক্ষী সরীসৃপ কীটাদি নির্বিশেষে সর্বভূত সাধারণ। আসিল, থাকিল, বাড়িল, হ্রাস-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, পরিণমিত হইল, শেষে নষ্ট হইল, অর্থাৎ ইহা ষড়-বিধ ভাববিকারী। 'জায়তে, অস্তি, বর্ধতে, অপক্ষীয়তে, পরিণমতে, নশ্যতি।' স্থূল-শরীরে যখন আমরা ব্যবহার করি তখন আমাদের *জাগ্রদবস্থা। [অবশ্য দার্শনিক দৃষ্টিতে ইহাও নাকি একরূপ স্বপ্নাবস্থা—নিদ্রান্তর্ভুক্ত, সে কথা এখন থাক্, পরে যদি অন্য প্রসঙ্গে উঠে দেখা যাইবে।]* তখন স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর পিণ্ডিতভাবে অপৃথক বিজড়িত থাকে। সেই জন্যই এই অন্নময় স্থূল শরীর হইতে আমাদের ছুটি কম। এবং ইহারই সাহায্যে

আমাদিগকে পার হইতে হইবে। সেই জন্যই বরুণ বলিয়াছেন শরীর ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার।

ঠিক এতদাকৃতি বিশিষ্ট আমাদের—সূক্ষ্ম শরীর। প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় এই তিন কোষের একত্রীভূত সূক্ষ্মপদার্থ। আমাদের স্থূল শরীরের প্রথম অনুপস্থিতি বোঝা যায় যখন আমরা স্বপ্ন দেখি। সেখানে শুধু সূক্ষ্ম শরীরের ব্যবহার। তৈজস (=তেজোময়) শরীর। নিজেই গড়ে, নিজেই দেখে। নিজেই উপাদানকারণ, নিজেই নিমিত্ত-কারণ, নিজেই দ্রষ্টা। আমাদের সেই এই সূক্ষ্ম শরীরটি বর্তমান জন্মে সৃষ্ট হয় নাই বটে, তবে ইহা পূর্ববর্তী অন্যান্য জন্মের সূক্ষ্ম শরীরের সহিত তুলনীয় নহে। আমাদের এই জন্মের এই শরীরের যেমন শৈশব কৌমার যৌবনাদি পরিবর্তন হয়, সূক্ষ্মশরীরেও তেমনি প্রতি জন্মে এবং প্রতিজন্মের মধ্যেও নিয়ত বাসনা-জনিত সংস্কারের হ্রাসবৃদ্ধি সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিছু কিছু বোঝা কমিয়া কিছু কিছু বাড়িয়া ক্রমান্বয়ে অভিনবত্ব প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। জন্মে জন্মে ইহার এই আচরণ। আদিম সৃষ্টিতে ইহার উৎপত্তি। সেই দৃষ্টিতে আমরা "অমৃতস্য পুত্রাঃ"। কেন এই উৎপত্তি কেহ জানে না। যখন অজ্ঞাত কিছুই অবশিষ্ট থাকে না তখনই জানে। শুধু স্থূল শরীর হইতে অব্যাহতি পাইলেই বা লইলেই কোনো লাভ নাই। লাভ নাই, অলাভ থাকিতে পারে। জোঁক যেমন এক তৃণখণ্ড ছাড়িয়া অন্য তৃণ আশ্রয় করে, দূরের যাত্রী যেমন আবশ্যকমত নৌকা, গোশকট, বাষ্পযানাদি ত্যাগ এবং গ্রহণ করে, সূক্ষ্মশরীর সেইরূপ অন্য একটি আলম্বন গ্রহণ করে। এই জন্যই ধীর ব্যক্তিরা দেহান্তরকে যৌবন-বার্ধক্যাদি পরিবর্তনের অন্যতম বলিয়াই গ্রহণ করেন। শোকগ্রস্ত হন না।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

অনেক সময় তাহাই মনে করেন। ছেঁড়া কাপড় ছাড়িয়া নূতন কাপড় পরার মতো, বলেন। পুরাতন আকারের গহনা ভাঙিয়া নূতন গহনা পরার মতো বলেন। সুতরাং এই সূক্ষ্ম শরীরকে ঠিক পথে চালিত করিয়া ইহার ভার বোঝা কিছু কমাইয়া দিবার চেষ্টা করা উচিত। স্বপ্নের মারফতে স্থূল শরীর সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্ব জানা যায় বলিয়া স্বপ্নকে আমাদের শিক্ষক বলা যাইতে পারে। স্বপ্ন আমাদিগকে বোঝায় যে প্রতীতিকালে সত্য হইলেও তাহা মিথ্যা হইবার বাধা নাই। জাগ্রৎ প্রতীতিকেও বরং দৃষ্টান্ত অনুযায়ী মিথ্যা সাব্যস্ত করাই সঙ্গত। যে আমাকে একবার মিথ্যা কথা বলিয়া ঠকায় তাহাকে যেমন আমরা আর বিশ্বাস করিতে পারি না তেমনি আমাদের প্রতীতিকে আমরা কিরূপে বিশ্বাস করি? সূক্ষ্ম শরীর আমাদের স্বপ্নের আধার। এমনও ত হইতে পারে যে আমাদের স্থূল-সূক্ষ্ম-মিশ্রিত জাগ্রত শরীরটা, 'ভিন্ন আর এক-রকম' স্বপ্নের আধার। যদিও বা তাহা না হয়, দেখা যাইতেছে যে সূক্ষ্ম শরীর থাকিলে প্রবাহক্রমে শরীররূপ স্বপ্নের পর স্বপ্ন চলিতে থাকিবে। বোঝা ক্রমান্বয়ে কিছু কিছু হালকা না করিলে স্বপ্ন-পরম্পরা চলিতেই থাকিবে। স্বপ্নভঙ্গেই আনন্দ। আনন্দে ছুট।

এই সূক্ষ্মশরীরেরও অভ্যন্তরে আমাদের আনন্দময় কোষ। যখন স্থূলসূক্ষ্মমিশ্রিত বা শুধু সূক্ষ্ম শরীরের ব্যবহার করি অর্থাৎ জাগ্রৎক্রীড়াদি করি বা স্বপ্ন দেখি তখনও আনন্দময় কোষ তাহাতে ব্যাপ্ত থাকে। যখন সূক্ষ্ম শরীরের উপাদান যেগুলি, সেই উপদ্রবকারী ইন্দ্রিয়গণ এবং কামনা বাসনা আদি অনর্থরাশি কারণে সাময়িক লীন হইয়া অনুপস্থিত থাকে তখন আমরা শুধু আনন্দময় কোষ ব্যবহার করি। ইহাতে শুধু আনন্দানুভূতি। ইহাই আমাদের দৈনন্দিন নিদ্রা। স্বপ্নহীন সুষুপ্তি। এই খানেই আমরা সর্ব-উপদ্রবরহিত, নিশ্চিন্ত, অভয়। কিছুকাল নিবৃত্ত থাকিয়া আমাদের কর্মফল আবার

আমাদিগকে ঠেলিয়া কার্য ব্যবহারে প্রণোদিত করে। ঠিক যেমন যেমন গচ্ছিত রাখিয়াছিল, ঠিক তেমনই ফেরত দেয়। বদল হইবার উপায় নাই। এইজন্যই ইহাকে কারণ শরীর বলা হয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ব্যবহারাদি (অব্যক্ত অব্যাকৃত) কারণ শরীরে লীন থাকে মাত্র।

উপদ্রবরহিত বলিয়া এই সুষুপ্তি আমরা অপছন্দ করি না। তবু কর্মজগতে আমাদের মনে হইতে থাকে যে ইহা কতকটা আমাদের বিনাশস্বরূপ। ঘুম ভাঙ্গিলে আমরা বলি বেশ সুখে ঘুমাইয়াছিলাম। (অর্থাৎ শুধু আনন্দময় কোষে ছিলাম।) কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরো বলি—"কিছুই জানিতে পারি নাই।" আমাদের সেকথার উদ্দেশ্য আমরা যাহা জানিতে চাই, তাহা জানিতে পারি নাই। মহাভ্রমবশতঃ খতিবেগে ইন্দ্রিয়মারফত যে বিষয়াদি আমরা ভুল করিয়া জানিতে চাই তাহা জানিতে পারি নাই। সেইটাই আফ্‌শোষের বিষয় হয়। কিন্তু ইহার তাত্ত্বিক ইঙ্গিত এই যে মুখ্যতঃ যাহা আমাদের একমাত্র জ্ঞাতব্য তাহা জানা হয় নাই। অজ্ঞানাবৃত সুষুপ্তিতে কি লাভ হইল? বস্তু ত অগৃহীত রহিল, আগে বলিয়া আসিয়াছি।

তাহা হইলে কি চাই? গ্রহণ কিসে হইবে? চাই সচেতন সুষুপ্তি। ইহাকে সমাধি বলা যায়। যোগসমাধি যোগলভ্য বটে, কিন্তু সমাধি বিচারলভ্যও বটে। পদার্থ একই। উভয়ই ভগবৎকৃপা সাপেক্ষ। সেইজন্য চাই জাগরবিক্ষেপ হইতে জাগ্রদ্‌বিরতি। ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় অবিরত বিষয়-ইন্দ্রিয়-সংযোগ আকাঙ্ক্ষা ও তৎসাধনে লিপ্ত থাকি। তাই সময় সময় ছুটি নিতে হয়। ছুটিটা উৎসবের দিন। উৎসব আনন্দের জন্য, আনন্দসাপেক্ষ। আনন্দই ত ভগবান। তাই জন্মদিনে ভগবৎস্মরণ দ্বারা বিরতিলাভ এবং আনন্দোৎসব।

আপত্তি তোলা যায়—কতক বোঝা যায়, কতক বোঝা যায় না—পঞ্চকোষ ত্রিবিধ শরীর, জাগ্রদাদি বিবিধ অবস্থা, জন্মমৃত্যুপ্রবাহ ইত্যাদি কথা হইতেছিল সেখানে ভগবান আসিয়া উপস্থিত হইলেন কি করিয়া। তাহার উত্তর এই যে, ভগবানের স্বভাবই এই—সর্বদাই উপস্থিত। নিজেকে অব্যাহত রাখিয়া অতিবিরুদ্ধ বস্তুর মধ্যে যুগপৎ সম্যক উপস্থিতি। অত্যাশ্চর্য স্বভাব। ভগবান ত আসিয়া পড়িবেনই, ডাকিলেও আসিবেন, না ডাকিলেও আসিবেন। জানিলে ত আসিয়াছেনই, না জানিলেও আসিয়াছেন। তাঁহার যাওয়া নাই, সেইজন্য আসাও নাই। আসা-যাওয়াই নাই, সদৈকরসম্। বুদ্ধি অহঙ্কারাদি সর্বোপাধি বিনির্মুক্ত পঞ্চকোষাতীত আমিও ত মনে হইতে পারে সদৈকরসম্। যাক্ আমি থাকি, না থাকি তিনি সর্বদাই আছেন। তিনি নাই তাহা যখন অসম্ভব তখন আমি যতক্ষণ আছি, সেই ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরং সুহৃদং সর্বভূতানাং অনাহূত অতিথিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সম্যক্ সম্বর্ধনা করা যাক্। ফল কি? যুক্তিতে বোঝা যায় না। ঋষিদের অভিজ্ঞতাই গ্রাহ্য। ভগবান নিজ মুখেই ত বলিয়াছেন—

> তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
> দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
>
> গীতা ১০।১০
>
> তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
> নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥
>
> গীতা ১০।১১
>
> অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
> তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
>
> গীতা ৯।২২

সুতরাং জন্মদিনে উৎসব করো, আনন্দ করো; প্রার্থনা করো জন্ম সার্থক হউক। এই উপলক্ষ্যে পরম ঋষিদেরও নমস্কার করি—

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

আমি

ওমর আলী

বিস্মৃতির অতল কুয়াসা
মরে ব্যর্থ আশা
অন্ধকার জিজ্ঞাসায় যবনিকা টানি'।
আলোকের দীপ্ত বাণী
মুহূর্তে মিলায়ে যায়, পায়নিক' ভাবা !

কালের করাল আঘাতে,
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাতে,
নেমে আসে কোন ফাঁকে তারকার দূত
কিংবা ঘন সুদীপ্ত বিদ্যুৎ
ভাষাহীন মেলেনি উত্তর।
ভেসে আসে অতীতের তীব আর্তস্বর।

পঞ্চভূতে সৃষ্টি এই মানবের কায়া
মোরা বলি মায়া
বহুত্বের কেন্দ্রপথে 'আমি' ডুবে যায়
তীক্ষ্ণ হতাশায়।
'আমি' কেবা মেলেনি উত্তর
আবর্তিত শূন্যপথে আজো তার
সুকরুণ স্বর ॥

সমালোচনা

ভারতের সাধক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—শঙ্করনাথ রায়-প্রণীত ; প্রকাশক—শ্রীসুধীর মুখার্জি, রাইটার্স সিণ্ডিকেট, ৮৭ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ ; প্রথম খণ্ডে ৩০৯ ও দ্বিতীয় খণ্ডে ৩৩২ পৃষ্ঠা ; মূল্য—প্রতিখণ্ড পাঁচ টাকা।

ঐতিহাসিক লেখকদের সব কিছু মনে রাখিবার প্রয়োজন নাই ; যাহারা চরিতকথা লিখিতে প্রবৃত্ত তাঁহাদের পক্ষে অনেকটা বিস্মৃতির অভ্যাসও দরকার। যতটুকু মনে পড়িতেছে এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন কোন এক বিশিষ্ট ইংরেজ চরিতকার। বাংলা জীবনীসাহিত্য অনুপেক্ষণীয় সম্ভাব্যতার দিকে অগ্রসর হইতেছে ; কোন কোন জীবনী যথার্থ সাহিত্যের মর্যাদাও লাভ করিয়াছে, কিন্তু সাধক ও লোকগুরু ধর্মবীরদের জীবনীরচনা বহুক্ষেত্রেই শিল্পপদবী পায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সবকিছু লিপিবদ্ধ করিবার এক প্রবল আগ্রহ লেখকের শিল্পচেতনাকে অভিভূত করিয়া রাখে। এক অবাস্তব কুহেলিকা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে আচ্ছন্ন করিয়া তোলে। ভক্তির উচ্ছ্বাসই এই সকল গ্রন্থের প্রধান সম্বল হইয়া দাঁড়ায়।

সুদৃশ্য এই 'ভারতের সাধক' পড়িয়া মনে হইল লেখক একজন কুশল চরিতশিল্পী। আতিশয্যের ঘূর্ণাবর্তে তিনি পড়েন নাই ; সুস্থির বস্তুনিষ্ঠায় 'অপাস্ত ফল্গু' যাহা কিছু সার, যাহা কিছু গ্রাহ্য তাহাই প্রশংসনীয় বিন্যাসকৌশলে আমাদের উপহার দিয়াছেন। এই সুপাঠ্য গ্রন্থের প্রণেতাকে অভিনন্দিত করি।

প্রথম খণ্ডে আটজন সাধক মহাপুরুষের কথা আলোচিত। ইঁহারা শ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামী, শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী, শ্রীগম্ভীরনাথজী, স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী, শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা, বামা ক্ষেপা, শ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী ও স্বামী নিগমানন্দ। দ্বিতীয় খণ্ডে আচার্য রামানুজ, শ্রীমধুসূদন সরস্বতী, ভক্ত দাদু, শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবানদাস বাবাজী, শ্রীভোলানন্দগিরি, প্রভু জগদ্বন্ধু ও শ্রীসন্তদাস বাবাজীর জীবনীর আলোচনা। প্রথম খণ্ডের ভূমিকা অত্যন্ত

অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বিদ্যালয়ের (৫নং নিবেদিতা লেনে, বাগবাজার, কলিকাতা) সুবর্ণ জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষ্যে ভগিনী নিবেদিতার অনুরাগী দেশবাসীর নিকট হইতে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, 'নিবেদিতা সুবর্ণ জয়ন্তী পরিষদ' কর্তৃক তাহা হইতে ৫০০০৲ টাকার জি, পি, নোট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নিবেদিতা বক্তৃতা'র ব্যবস্থার জন্য সিণ্ডিকেটের নিকট জমা করা হইয়াছিল। বক্তৃতার বিষয় এবং বক্তানির্বাচনের দায়িত্ব সিণ্ডিকেটের উপরই ন্যস্ত করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় এই বৎসর প্রথম এই বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত ১২ই হইতে ১৪ই অগ্রহায়ণ (২৮শে হইতে ৩০শে নভেম্বর, ১৯৫৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে অপরাহ্ণ ৩টার সময় এই বৎসরকার বক্তৃতা দিয়াছেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ। বক্তৃতার বিষয় ছিল—'ভগিনী নিবেদিতার জীবন ও কীর্তি।'

তিনদিনই এই বক্তৃতা শুনিতে দ্বারভাঙ্গা হলে বহু নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। তিনদিনকার সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে—বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ এবং কলিকাতা নগরীর মেয়র শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীগোপাল হালদার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত।

উদ্বোধনের নূতন সম্পাদক—আগামী ৫৯ বর্ষ হইতে (মাঘ, ১৩৬৩) উদ্বোধনের সম্পাদনার ভার স্বামী নিরাময়ানন্দের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। বিদায়ী সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো বেদান্ত সমিতির কর্মিরূপে মার্চের শেষে আমেরিকায় চলিয়া যাইবেন।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে সুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ—ঢাকার বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ লেখক ও পণ্ডিত অধ্যাপক সুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ, এম্-এ গত ২০শে আশ্বিন পরিণতবয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া উদ্বোধনে নিয়মিত সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি লিখিতেন। এই অমায়িক উদার শিক্ষাব্রতী হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

দিল্লীর সাধারণ গ্রন্থাগার—"এশিয়ার মধ্যে সর্বাধুনিক"—সম্প্রতি দিল্লীতে উনেস্কোর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে এশিয়ার গ্রন্থাগার-সংক্রান্ত সমস্যাবলী সম্পর্কে যে সকল আলাপ আলোচনা হয় এবং গ্রন্থাগারসমূহের উন্নতির জন্য যে সকল সুপারিশ করা হয় গত ৩১শে অক্টোবর লণ্ডনে এইচ, এম, স্টেশনারী অফিস কর্তৃক প্রকাশিত 'এশিয়ার সাধারণ গ্রন্থাগার' নামক পুস্তিকায় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। * * * আলোচ্য পুস্তিকায় দিল্লীর সাধারণ গ্রন্থাগারটিকে "এশিয়ার সর্বাপেক্ষা কর্মব্যস্ত ও সর্বাপেক্ষা আধুনিক" পাঠাগার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থাগার প্রথম চার বৎসরে ১,০০০,০০০ পুস্তক 'ইস্যু' করে এবং মাসে প্রায় ৭০,০০০ পাঠককে নিয়মিতভাবে পুস্তক সরবরাহ করে।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে ভারতের একজন লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তির তুলনায় ব্রিটেনের একজন লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তি অন্ততপক্ষে সাতগুণ বেশী পড়ে। (ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস)।

চট্টগ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব—চট্টগ্রাম বহরপুরস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির উদ্যোগে সম্প্রতি যুগাবতারের ১২১ তম জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। পূজা, কথামৃত পাঠ ও আলোচনা এবং একটি ধর্মসভা উৎসবের অন্যতম কর্মসূচী ছিল। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে বহু নরনারীকে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যার পর ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী আলোচনা করেন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শ্রীদেবেন্দ্রদাস চৌধুরী।

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৫৮-তম বর্ষ

(১৩৬২ মাঘ হইতে ১৩৬৩ পৌষ)

সম্পাদক

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

বার্ষিক মূল্য পাঁচ টাকা

প্রতি সংখ্যা আট আনা

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(বর্ণানুক্রমিক)

মাঘ, ১৩৬২ হইতে পৌষ. ১৩৬৩

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
অক্ষয় রত্ন (কবিতা)	শ্রীসরযূবালা দেবী	২৫১
অনাদিলিঙ্গ ৬কল্যাণেশ্বরের কাহিনী	স্বামী মৈথিল্যানন্দ	৬৩৯
অনাস্তুত (কবিতা)	শ্রীনরেন্দ্র দেব	৫০০
অনির্বাণ (কবিতা)	শান্তশীল দাশ	২৪০
অপ্রকাশিত লোক-সঙ্গীত	শ্রীঅমলেন্দু মিত্র	১০৫, ৩৬৯
অবতার (অপ্রকাশিত রচনা)	৬যোগেন্দ্রকুমার ঘোষ	৬৯৯
অভয় কবচ (কবিতা)	শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য	৩৭৫
অভয়-দান	শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী	১৭
অভী (অপ্রকাশিত রচনা)	৬কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫০
অভেদ (কবিতা)	ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত	৪৮৮
অমরকণ্টক (ভ্রমণ-কাহিনী)	শ্রীমতী বাসন্তী দেবী	২৫১
অর্জুনের প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী	৪২৩
"অর্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ"	ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	৩৮
অষ্ট্রিয়ার পথে	মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	৫৮৯
অসতো মা সদ্গময় (কবিতা)	বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	৩৪৪
আকান্ ব্রহ্মবাদ	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	৪৮২
আগমনী (কবিতা)	শ্রীচিত্ত দেব	৪৮১
আত্মার প্রকাশ-ক্ষেত্রে (কবিতা)	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৬২৯
আত্মাশক্তি	স্বামী জীবানন্দ	৫১৯
আনন্দ-তীর্থে (কবিতা)	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	৬৪৭
আমার সকল নিয়ে (কবিতা)	চিত্ত দেব	৯২
আমি (কবিতা)	ওমর আলী	৭২৫
আমি ও আমার	শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী	৫১২
আমি যে গ্রামে আছি	শ্রীনীরদবরণ বসু	২১৩
আরতি (গান ও স্বরলিপি)	ইন্দিরা দেবী ও শ্রীদিলীপকুমার রায়	৫১০
আলোকের উদ্বোধন	...	১
আশ্চর্য	...	৬১৭
আসে (কবিতা)	শ্রীকমুদরঞ্জন মল্লিক	৪৭০

বিষয়	লেখক—লেখিকা	পৃষ্ঠা
আহ্বান	...	৫৭
ইচ্ছাশক্তির প্রভাব	শ্রীনিত্যরঞ্জন গুহঠাকুরতা	৩১৬
ইতিহাসাশ্রিত জাতক	শ্রীজয়দেব রায়	২৩৮
ঈশ্বর কেমন ?	স্বামী নিখিলানন্দ	৬২৫
উৎ-শিষ্ট	...	১৬৯
উৎসব-তীর্থে (কবিতা)	শান্তশীল দাশ	৭০২
উদ্বোধন (কবিতা)	ওমর আলী	৪৯
উপাসক ও উপাস্য	স্বামী বিবেকানন্দ	১২১
উমার পরীক্ষা	স্বামী মৈথিল্যানন্দ	৪৭৮
ঊনবিংশ শতাব্দীর মানসভূমি	শ্রীপ্রণব ঘোষ	৬৬৯,৭০৬
একটি সন্ধ্যার স্মৃতি	শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	১৫৭
একতাই বল	শ্রীমতী শোভা দুই	৩২১
একের প্রকাশ (কবিতা)	শ্রীশক্তিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২৭
এখানে—ওখানে (কবিতা)	আবদুল গণি খান	৪২৯
এমন কাজল রাতে কে দিলরে মায়ার বন্ধন (কবিতা)	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৩৫৮
এস পুনঃ দয়াল ঠাকুর (কবিতা)	শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার বসু	৮৫
এসো (কীর্তন)	শ্রীদিলীপকুমার রায়	৩৬
কথাপ্রসঙ্গে		২,৫৮, ১১৪, ১৭০, ২২৭, ২৮২, ৩৩৮, ৩৯৪, ৪৫১, ৫৬২, ৬১৮, ৬৭৫
কথামৃতে কৃপা ও পুরুষকার	বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	৭৬
কবীর (কবিতা)	কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়	৫৭৬
কবীর-বাণী (কবিতা)	শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার	৪৩
করো বিশুদ্ধ মন (কবিতা)	শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস	৬৫৩
কর্মময় উপাসনা (কবিতা)	কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়	৩৪৯
'কাঁচা আমি' ও 'পাকা আমি'	স্বামী বিশুদ্ধানন্দ	২১
কাব্যে অলংকার প্রয়োগের তাৎপর্য	ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত	৪৯০
কামাখ্যা-তীর্থপথে (কবিতা)	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৫৬৭
কৃষ্ণ	স্বামী বিবেকানন্দ	৪০২
কোথায় সুখ, শান্তি কিসে (কবিতা)	নরেন্দ্র দেব	২৪৩
"কৈলাস-শিখরে রম্যে গৌরী পৃচ্ছতি শঙ্করম্"	শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী	২৯৩
কৈলাসের দীক্ষা (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৩১৩
খেলাঘর (কবিতা)	অনিরুদ্ধ	৬৭৬
গঙ্গা (কবিতা)	শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	২৩২

বিষয়	লেখক—লেখিকা	পৃষ্ঠা
গৃহং তপোবনম্ (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	১৬
গৌতম বুদ্ধ (সংকলন)	স্বামী বিবেকানন্দ	২৩৩
গ্রামে দুর্গোৎসব	শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী	৪৬৪
চণ্ডীমণ্ডপ (কবিতা)	কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়	১৩৬
"চলিয়াছি সেই আশা নিয়া (কবিতা)	শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	৪৮৯
চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতি	আচার্য শ্রীনন্দলাল বসু	৫২১
জননী জগদ্ধাত্রী	স্বামী ক্ষমানন্দ	৬৮৭
জননী ভগবতী দেবী	শ্রীপ্রণব ঘোষ	৩৫৮
জননী-সীতাস্তুতিঃ	ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	৪৫৬
জন্মদিন	শ্রীচারুচন্দ্র বসু	৭২০
জয় জীবনের, জয় মরণের জয় (কবিতা)	বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	২০
জয়তু বুদ্ধ জয় (কবিতা)	শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩২
জাতকের উপকরণ	শ্রীজয়দেব রায়	৫৪৪
জাতিভেদের মূলকথা ও ক্রমপরিণতি	স্বামী বিশ্বরূপানন্দ	৪২৮
জীবন (কবিতা)	শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র	৬৩৮
জীবন (কবিতা)	"ভাস্কর"	৬৯৬
জীবন-জিজ্ঞাসা (কবিতা)	শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক	৩৭৯
জীবন-দেবতা (কবিতা)	আবদুল গণি খান	৯৭
জীবন-নাট্য		৩৩৭
জীবন-মৃত্যু (কবিতা)	শ্রীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	১৯৩
জীবন-যজ্ঞ		১১৩
জ্যোতির্গময় (কবিতা)	শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী	৫৫৪
জ্যোতির্বেদের দুই একটি কথা	শ্রীঅনাথবন্ধু মুখোপাধ্যায়	৭১১
"ডুব., ডুব্, ডুব."	স্বামী বিশুদ্ধানন্দ	২৪৭
তীর্থত্রয়	স্বামী মহানন্দ	৩৫৩
তুমি আজো ইতিহাসে সভ্যতার শাশ্বত বিগ্রহ (কবিতা)	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	২২৯
তুমি কি আমার (কবিতা)	মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	৫৪৪
তুমি লীলাময় (কবিতা)	শ্রীকৃষ্ণধন দে	৫৮৪
ত্রিপিটকের সুত্তপিটক	অধ্যাপক শ্রীগোকুলদাস দে	৭০২
থের গাথা থেকে	অধ্যাপক শ্রীগোকুলদাস দে	২৩৫
দান (কবিতা)	শান্তশীল দাশ	৫৪৯
দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি-কথা	অধ্যাপক নীরদবরণ চক্রবর্ত	৬৬৫

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
দিব্য প্রেম	স্বামী বিবেকানন্দ	২৮৯
দুঃখ-নিবৃত্তি—নির্বাণ	শ্রীতারকচন্দ্র রায়	২৪০
দৃষ্টি (কবিতা)	শান্তশীল দাশ	৪২৭
দেবতা (কবিতা)	শ্রীঅটলচন্দ্র দাশ	৬৭৮
দ্বারকায় কয়েকদিন	শ্রীবিজনকুমার গোস্বামী	৪১৭
দ্বয়ী (কবিতা)	শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ	৪৩৮
ধর্ম	স্বামী বিরজানন্দ	৪৭২,৫৬৯
ধর্মজীবন ও নারী	শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী	৪২৪
ধর্ম কোথায় সবল এবং দুর্বল	স্বামী প্রভবানন্দ	১৮১
ধর্মের রূপায়ণ	স্বামী বিবেকানন্দ	৮৬০
নমো নমঃ (কবিতা)	আনোয়ার হোসেন	৫৫৪
"নাচুক তাহাতে শ্যামা"	স্বামী জীবানন্দ	৬০৮
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" (কবিতা)	বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	৩০৭
নারী—ঘরে ও বাহিরে	শ্রীমতী শোভা গুই	৬৫৪
নিবেদিতা (কবিতা)	শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর	৫৯৯
নিষ্কাম সেবাই সর্বোত্তম ভক্তি	আচার্য বিনোবা ভাবে	১৪
নীলের গান	শ্রীজয়দেব রায়	২০৪
পরম পুরুষ (কবিতা)	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৫১৮
পরলোকে মহেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৫৬৮
পরলোকে শ্রীরামানুজাচারী	...	৬২৩
পরাশরীয় উপপুরাণ	অধ্যাপক শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়	৬৯৬
পাঞ্চজন্য (কবিতা)	শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	৪১২
পাঞ্চরাত্র আগমে শক্তিতত্ত্ব	শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী	৫৮৫
পাঠকের পত্র	...	৩৮০
পিপাসিতা (কবিতা)	শ্রীদিলীপকুমার রায়	২৯৫
পুণ্যক্ষণ (কবিতা)	শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন বসু	৭১৬
পুণ্যস্মৃতি	শ্রীমণিমোহন মুখোপাধ্যায়	৯৩
পূর্ণিমা শর্বরী (কবিতা)	শ্রীরবি গুপ্ত	৫৩৮
পৃথিবীতে মহান্ ঐক্য প্রতিষ্ঠা	ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষাল	২৬৮
প্রশ্ন (কবিতা)	শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ	৭১৬
প্রসাদ (কবিতা)	শান্তশীল দাশ	১৩৫
প্রাচীন ভারতে শিক্ষার ধারা	স্বামী জগন্নাথানন্দ	৩০৩
প্রাত্যহিক জীবনে বেদান্ত	স্বামী মাধবানন্দ	৪৯৭

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
প্রার্থনা (কবিতা)	কাজি মোঃ হাসমৎ উল্লাহ	৬১১
প্রেম (কবিতা)	শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	৪১৩
ফ্রান্সে জননী সারদাদেবীর জন্মোৎসব	স্বামী জীবানন্দ	৭১৭
বর্ষোৎসবে (কবিতা)	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	১৭৬
বাংলার কথকতা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১৩৭
বাংলার তন্ত্রসাধনা	স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ	৫০৩
বাল্মীকি ও অজাতশত্রু	স্বামী জীবানন্দ	২৬০
বিচার ও বিশ্বাস	বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	৫১৬
বিবিধ সংবাদ	…	৫৬, ১১১, ১৬৮, ২২৪, ২৮০, ৩৩৪, ৩৯০, ৪৪৮, ৬১৩, ৭২৮
বিবেকানন্দের দিব্যব্যক্তিত্বের প্রভাব	শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত	৬৫৬
‘বিশ্বাসে মিলয়ে—’	অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুজাতা হাজরা	২৩০
বুদ্ধবাণী	…	২২৮
বৃথা	…	৩৯৩
বৃন্দাবনে সাধুসঙ্গ	শ্রীমতী লীলাবতী সরকার	১৮৬
বৃন্দাবনের পথে (কবিতা)	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৬৯০
বৈষ্ণব-সাহিত্যে প্রেমের রূপ	বেলা দে	৫৪৭
ব্রহ্মচর্য	…	২৮১
ভক্ত নামদেব	স্বামী দিব্যাত্মানন্দ	১৫১
ভক্তি	স্বামী বিশুদ্ধানন্দ	৩৪৫
ভগবান (কবিতা)	শ্রীমতী উমারাণী দেবী	১৫০
ভগবান শ্রীবুদ্ধের অন্তিম ভোজন	শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র	২৪৪
ভগিনী নিবেদিতা	শ্রীমতী বাসনা দেবী	৫৯৪
ভজনের উৎস	শ্রীতড়িৎকুমার বসাক	৪৩৯
ভবতারিণীবন্দনম্ (স্তোত্র)	শ্রীশ্রীনিবাসকান্ত কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ	৩৭০
ভাইবোনের পূজা ও বিদ্যার্থী	শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী	১২৮
ভাবের ভুবন (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৬২৩
ভূমৈব সুখম্ (কবিতা)	বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	১২৮
‘মতুয়ার বুদ্ধি’	ডাঃ এস আহাম্মদ চৌধুরী	৬৪৭
মহাদৃষ্টি	…	৫৬১
মহাপুরুষ মহারাজের পত্র	…	৬৭৮
মহাপ্রভুর নীলাচল	শ্রীমতী সুধা সেন	৬৩০
মহাভারতীয় দর্শন	শ্রীতারকচন্দ্র রায়	৬৪১

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
মহামিলন (কবিতা)	স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ	৬৬৮
"মা আছেন আর আমি আছি"	স্বামী বিশুদ্ধানন্দ	১৩৩
মা শুচঃ (কবিতা)	বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	১৮৫
মাতৃ-আহ্বান (কবিতা)	শ্রীহৃদয়রঞ্জন প্রামাণিক	৫৩৪
মানুষ	শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৭৯
মায়ের প্রকাশ	শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্তী	৬৭৬
মায়ের স্মৃতি	শ্রীসুশীলকুমার সরকার ও শ্রীআশুতোষ সেনগুপ্ত	৬৮১
মাহেশের রথ	শ্রীকুমুদবন্ধু সেন	৫৫০
মুণ্ডক উপনিষৎ (কবিতা)	'বনফুল'	১৫, ১৮০, ২২৫, ২৮৮, ৪৬৩
ম্যাথু আরনল্ড	অধ্যাপক রেজাউল করিম	৩০
রবীন্দ্রকাব্যে কাব্যতত্ত্ব	অধ্যাপক শ্রীবাবুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৯
রামকৃষ্ণ মিশন বন্যা-সেবাকার্য—আবেদন	...	৫৬৮, ৬২৪
রামায়ণের আখ্যানভাগের একদিক —শাস্ত্র-সমস্যা	শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়	৮৬
রামায়ণের রূপান্তর	কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়	১৯৪
"রামেশ্বরম্" তীর্থসৈকতে (কবিতা)	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৩০৩
লীলাময়ী (কবিতা)	শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৫৩৪
লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ	স্বামী বিরজানন্দ	১৭৭
লোয়ন-লাথা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৩৭০
"শরৎকালে মহাপূজা"	স্বামী ক্ষমানন্দ	৪৫৭
শারদা (কবিতা)	কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়	৪৫০
শিক্ষা	শ্রীমতী লীলা মজুমদার	৫০১
শিব ও শক্তি	স্বামী অচিন্ত্যানন্দ	৬০৪
শিলাব্রহ্ম (কবিতা)	কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়	৪০১
শোনাও সেই অগ্নিমন্ত্র (কবিতা)	বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	৬০৩
শ্যামা (কবিতা)	কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়	৬৭৪
শ্রীকালহস্তীশ্বর (ভ্রমণকাহিনী)	স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ	২০০
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগীতা (কবিতা)	অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত	৪০৭
শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম	স্বামী জীবানন্দ	৪০৯
শ্রীচৈতন্য-বিরচিত 'শিক্ষাষ্টক' স্মরণে	শ্রীপ্রণব ঘোষ	১৪৩
শ্রীপতির "বিশেষাদ্বৈতবাদ"	ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী	৫৩৪
শ্রীপশুপতিনাথে শিবরাত্রিমেলা	শ্রীঅহিভূষণ চট্টোপাধ্যায়	২৫১
শ্রীভরত (কবিতা)	শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৬৬১

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
শ্রীমধ্বাচার্য	শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী	৪১৯
শ্রীরাধা	ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	৪১৩
শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে	ডক্টর কালিদাস নাগ	৫৩১
শ্রীরামকৃষ্ণ-শিক্ষা (কবিতা)	শ্রীচারুচন্দ্র বসু	২১৭
শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার বাণী	স্বামী বিরজানন্দ	৬৪
শ্রীরামকৃষ্ণ ও নারীদের আদর্শ	ডক্টর রমা চৌধুরী	৭০
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ		৫২, ১০৯, ১৬৪, ২২০, ২৭৭, ৩২৮, ৩৮৬, ৪৪৪, ৫৫৯, ৬১৪, ৬৭২, ৭২৭
শ্রীরামকৃষ্ণায়	শ্রীদিলীপকুমার রায়	৪০১
শ্রীশ্রীচণ্ডী	ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	২০৭
শ্রীশ্রীদুর্গাস্তোত্রম্	শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী	৪১৯
শ্রীশ্রীমীনাক্ষী দেবী	স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ	৬৪৯
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও গীতার ব্রহ্মতত্ত্ব	শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৮১
শ্রীশ্রীরাস	শ্রীমতী সরোজবালা দেবী	৬১১
শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের কথা	স্বামী সিদ্ধানন্দ	২৫, ৬৭৯
শ্রীশ্রীসারদামণিদেবীস্তুতিঃ	ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	৬৭৩
শ্রেষ্ঠ শিল্প (কবিতা)	অনিরুদ্ধ	১২০
সংস্কৃত-শিক্ষাপ্রসঙ্গে	স্বামী জীবানন্দ	৩৬৫
"সত্যিকারের মা" (কবিতা)	শ্রীমতী রেণুকণা দেবী	৬৮৬
সতী জাসলবুন	স্বামী জপানন্দ	৬৬১
সত্যের সন্ধানে	শ্রীমতী লীলা মজুমদার	১২
সন্ন্যাস ও কর্মযোগ	স্বামী রঙ্গনাথানন্দ	৬৯১
সন্ন্যাসী (কবিতা)	শ্রী নি. চ. ব	২৮
সমর্পণ	অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য	৫৫৪
সমালোচনা		৫০, ১৬১, ২১৮, ২৭২, ৩২৩, ৩৮১, ৪৪১, ৫৫৬, ৭২৫
সাধক কমলাকান্ত	শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়	৪৪
সাধক রামপ্রসাদ	সাহিত্যশ্রী শ্রীউষা বসু	৫৭৭
সাধনা	স্বামী বিশুদ্ধানন্দ	৫৭৯
সাধনা ও সেবা	শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করী রায়	৬৯৪
সায়াহ্নে (কবিতা)	শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার	৬০৭
সিদ্ধি (কবিতা)	শ্রীমতী রেণুকণা দেবী	২৬৭
স্বামী বাসুদেবানন্দজীর দেহত্যাগ		২৮৭
স্বামী বিবেকানন্দ (কবিতা)	শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৭
স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণে	স্বামী বীতশোকানন্দ	১৪৮
স্বামীজী ও শক্তির বাণী	শ্রীভাগবত দাশগুপ্ত	২৫
স্মৃতির অঞ্জলি	শ্রীমতী শীলা সেন	৩৭৭
হিমালয় অঙ্কে মেরু	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর	৯৮
হিমালয়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ	স্বামী নিরাময়ানন্দ	৫৩৯, ৬০০
হৈমবিজয়া (কবিতা)	স্বামী পূর্ণানন্দ	৭১০